দশ দিগন্ত

সমরেশ বসু

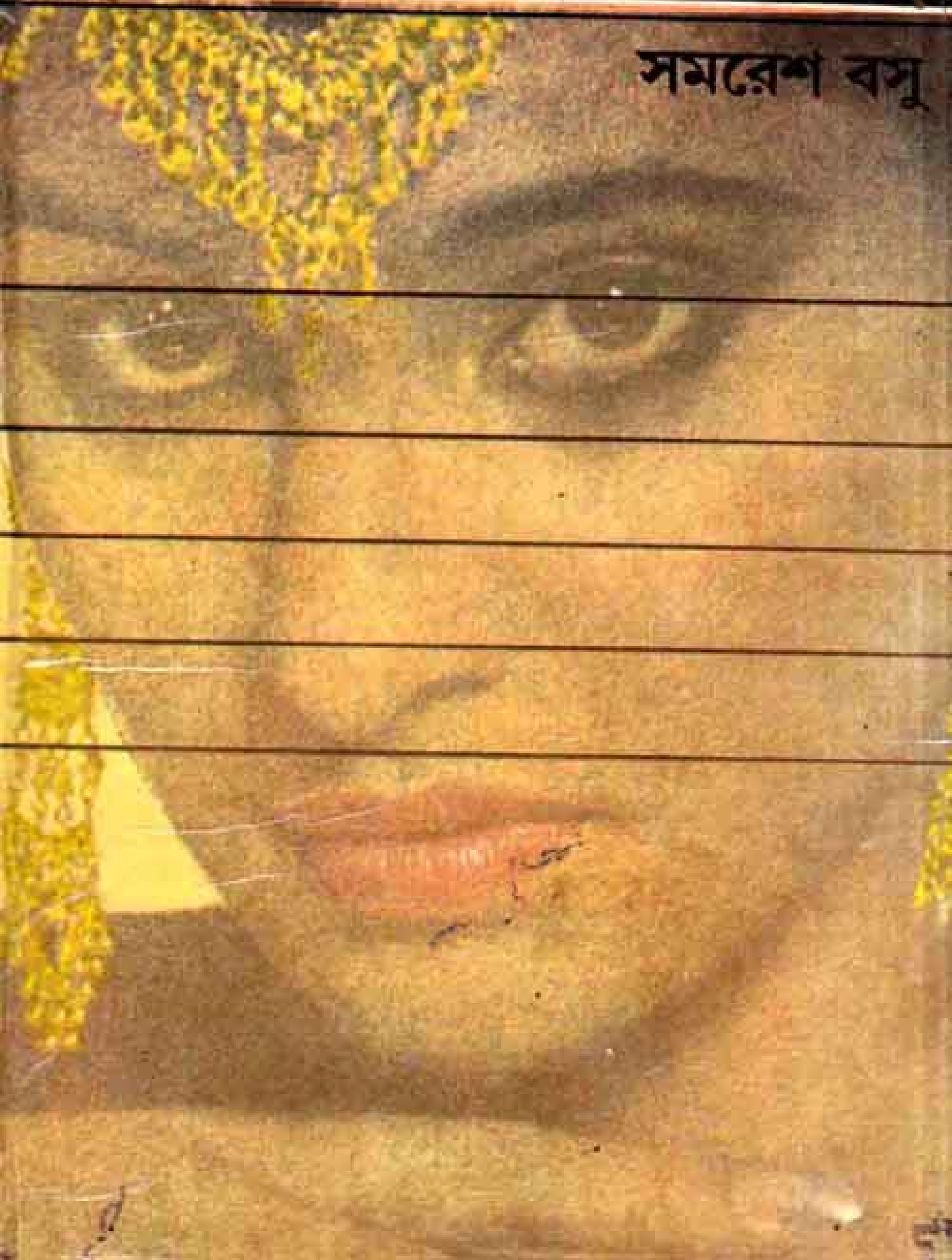

সূচীপত্র

রূপায়ণ	…	…	৯
গন্তব্য	…	…	৯৩
বিষের স্বাদ	…	…	১৮১
অগ্নিবিন্দু	…	…	২৫৫
অন্ধকার গভীর গভীরতর	…	…	৩০৯
বারোবিলাসিনী	…	…	৩৬৯
অলিন্দ	…	…	৪৫৭
চৈতি	…	…	৫৩৩
অন্ধকারে আলোর রেখা	…	…	৬১৩
আঁখির আলোয়	…	…	৬৮৭

boiRboi.net

রূপায়ণ

boiRboi.net

ঘাড়তে অ্যালার্ম বেজে উঠল। এ ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দ, তীব্র তীক্ষ্ণ একটানা ক্রিং ক্রিং শব্দ না। অনেকটা জলতরঙ্গের বাজনার মতো। যেন কেউ পিয়ানোর বুকে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে, নিচু সুরে দ্রুত একটি তরঙ্গ তুলল। নামকরা মেকারের বিশেষ ভাবে তৈরি করা টাইমপিস। এ শব্দ চমকে জাগিয়ে তোলে না। বিরক্তি উৎপাদন করে না। অনেকক্ষণ ধরে বাজলেও শুনতে খারাপ লাগে না। বাড়িসুদ্ধ লোকের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয় না।

অ্যালার্মের জলতরঙ্গের সুরঝংকার মুহূর্তের বিরতি দিয়ে দিয়ে প্রায় তিরিশ সেকেন্ড বাজল। নীরার চোখের পাতা কাঁপল। ওর ঘুম ভেঙেছে। ভেঙেছে, কিন্তু যেন ভাঙেনি, এমনি একটা তন্দ্রালু ভাব। নীরা একবার চোখ মেলে তাকাল। আবার বুজল। অ্যালার্মের সুর-তরঙ্গের ধ্বনি শুনল। ওর খাটের ধারেই, আখরোট কাঠের কাশ্মীরী টি-পয়ের ওপরে টাইমপিসটি বসানো। কারুকার্য করা কাঠের ফ্রেমে তিন দিক মোড়া রুপোলী টাইমপিস। নীরা ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে, বোতাম টিপে, শব্দটা বন্ধ করতে পারে। কিন্তু করল না। প্রায় আধ মিনিট ধরে বেজে একেবারে থেমে গেল।

নীরা তথাপি চুপ করে শুয়ে রইল। ও জানে, এ শব্দ অন্য কোন ঘরে পৌঁছয়নি, অতএব এখনো কেউ জাগেনি। এমন কি কণাও না, নীরার ঘুম ভাঙলেই যে প্রথমে ওর ঘরে আসে চা নিয়ে। বলতে গেলে কণাই নীরার ঘুম ভাঙায়। রোজ সকাল সাতটায় কণা চা নিয়ে ঢোকে। কোন দিনই প্রায় ডেকে নীরার ঘুম ভাঙাতে হয় না। সাতটার সময় এমনিতেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের একটা আলস্য জড়িয়ে থাকে। কণা চা নিয়ে ঢুকলেই সে আলস্যটুকু কেটে যায়। নীরা উঠে বসে। কণার মুখের দিকে তাকায়। কণাও নীরার মুখের দিকে তাকায়। একটু হেসে, টি-পয়ের ওপর ট্রে রেখে, নেটের মশারিটা তুলতে যায়। নীরা তার আগেই উঠে বসে। খোলা চুলের গোছা পিছনে ঠেলে দেয়। গায়ের ঢাকনাটা সাবধানে সরিয়ে, স্লিপিং গাউনটা পা অবধি টেনে দেয়। নিজের হাতে মশারি সরিয়ে খাটের ধারেই বসে। কণা জিজ্ঞেস করে, চা ঢালব, বড়দি?

নীরা বলে, ঢালো।

ঘুম থেকে উঠে কণার মুখ দেখতে নীরার খারাপ লাগে না। কালোর ওপরে বেশ সুশ্রী সুন্দর মুখখানি। সারা শরীরে এবং মুখে একটি স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। ডাগর চোখ দুটি গভীর কালো। মুখের হাসিটি মিষ্টি আর সরল। নীরার দিকে তাকিয়ে হাসবার সময় স্বভাবতই একটি সম্ভ্রমের ছোঁয়া লেগে থাকে। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়।

কণাকে কোনরকমেই দাসীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। নীরা তাকে কোনদিন সে চোখে দেখেওনি। কণা ভদ্র পরিবারের অল্পশিক্ষিতা মেয়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে উঠেছিল এক গরিব আত্মীয়ের বাড়িতে। বাবা মা ভাই বোনেরা

boiRboi.net

এখনো সবাই পূর্ববঙ্গেই রয়ে গিয়েছে। বাবার অবস্থাও ভাল নয়। কিন্তু কেবল সেইজন্যই কণাকে কলকাতায় পাঠানো হয়নি। ডাগর হয়ে ওঠা মেয়েকে বাবা-মা সেখানে রাখতে সাহস পায়নি। তা ছাড়া কলকাতায় গেলে কণা হয়তো কিছু পড়ে শিখে রোজগারও করতে পারে। তার বাবার মনে সে রকম আশাও ছিল। আশা একেবারে বিফলে যায় নি। কণা এখন নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করছে।

কণার সেই গরিব আত্মীয়টি নীরার বাবার ফার্মে অল্প মাইনের চাকরি করে। তার ডিপার্টমেন্টের হেড ক্লার্ককে ধরে নীরার বাবার কাছে আর্জি করেছিল, মেয়েটির কোন গতি করা যায় কী না। বাবা এক কথায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওসব মেয়েদের বিষয়, তাঁর কন্যা নীরাই একমাত্র বলতে পারে। মেয়েটিকে নিয়ে তার আত্মীয় যেন নীরার সঙ্গে দেখা করে। বাবা মুখ ফুটে কারোকে ফেরাতে পারেন না। তার ফলে নীরা যে কত অসুবিধেয় পড়ে, বাবার সে কথা মনে থাকে না। তাঁর ধারণা নীরা যা করবে, সেটাই ঠিক।

কণার সেই আত্মীয়টি তাকে নিয়ে এসেছিল। কণাকে দেখে নীরার ভাল লেগেছিল। কথাবার্তাও পছন্দ হয়েছিল। মনে মনে খুশি হয়েছিল মেয়েটির আত্মসম্মানবোধ দেখে। কণাকে ও বাড়িতে রেখেছিল। প্রথমে কিছুই স্থির করতে পারেনি, কণাকে কী কাজ দেবে। বাড়ির আর পাঁচটি সাধারণ ঝিয়ের কাজ করতে দিতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পেরেছিল, মেয়েটির অনেক গুণ। মোটা-মুটি লেখাপড়া জানে। বাংলা হাতের লেখাটি চমৎকার। কিছু কিছু সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ জানে। নিতান্ত গান শুনে, নভেল পড়ে খুশি থাকা আর দশটা মেয়ের মতো না। অকারণ কোন উচ্ছ্বাস নেই। অথচ হাসিখুশি বুদ্ধিমতী। নীরা লক্ষ্য করেছিল, কণার দৃষ্টি সজাগ। বিশেষ করে নীরার প্রতি। নীরার প্রতিটি কাজের দিকে কণার লক্ষ্য। কখন নীরার কী প্রয়োজন, কণা আপনা থেকেই বুঝতে পারত। দেখে শুনে নীরা কণাকে ওর নিজের ব্যক্তিগত কাজেই লাগিয়েছিল। মনে মনে কণার প্রতি একটু স্নেহ অনুভব করেছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে কণার সঙ্গেই নীরার চোখাচোখি হয়। একটু হাসি বিনিময়ও হয়।

●

আজ এই ভোরে, এখন কণা আসবে না। নীরা চোখ বুজেও জানে, এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। ও নিজের হাতেই ঘড়িতে দম দিয়ে রেখেছিল গতকাল রাত্রে। কণাকে সে-কথা জানায়নি। জানাতে ইচ্ছা করেনি। আজ ভোরের এক দেড় ঘণ্টা ও একলা থাকতে চায়। একলা, জেগে জেগে, স্মৃতিচারণ করতে চায়।

নীরা চোখ খুলল। সুখনিদ্রা থেকে জেগে ওঠার কোন তৃপ্তির ছাপ নেই ওর মুখে। ওর দৃষ্টি অন্যমনস্ক। মুখে ব্যথার ছায়া। ওর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আবার চোখ বুজল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপল। বুকের কাছে টনটনিয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হলো। তারপর ওর চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল। ও আরো জোরে ঠোঁটে ঠোঁট টিপল। কিন্তু উদ্গত কান্নাকে কোন রকমেই যেন রোধ করতে পারল না। ওর মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল। কান্নার আবেগে সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি উপুড়

boiRboi.net

হয়ে বালিশে মুখ গুঁজল। কান্নার বেগ কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। শরীর কাঁপতে লাগল। ঘাড়ের ওপর, বালিশের ওপর চুল ছড়িয়ে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে, এই কান্নার কাছে ও অসহায়। বালিশে মুখ চেপে কান্নার মধ্যেই দু'বার ডেকে উঠল, মীরা···মীরা···

কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কান্নার বেগ থামল। নীরার শরীর স্থির হলো। ওর চোখের সামনে মীরার চেহারাটা জেগে উঠল। না, মীরার সেই টানা চোখে ঝিলিক-হানা হাসি, অপরূপ সুন্দর মুখের সেই ছেলেমানুষী চটুল ভাব, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রায়-উদ্ধত যৌবন ভরা শরীর, চঞ্চল হরিণের মতো ছুটে বেড়ানো সেই চেহারাটি না।

নীরার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই চেহারা। মীরার ফর্সা সুন্দর মুখে যেন কেউ গাঢ় করে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। গাঢ়তর কালি তার চোখের কোলে। যেন গভীর পরিখার মধ্যে ঢোকানো দুটি আলোহীন অন্ধকার ভয়ার্ত চোখ। সারা মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আর ভয়ের অভিব্যক্তি। ঠোঁট দুটি একেবারে নীল। ঠোঁটের কষে ফেনা। চুল আলুথালু। আঁচল মাটিতে লোটানো। কোমরের কাছ থেকে শাড়ির বন্ধনী প্রায় খুলে পড়েছে, শায়ার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। বুকের জামার বোতাম পর্যন্ত লাগানো ছিল না।

নীরার চোখের সামনে, মীরার সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস—হ্যাঁ বীভৎস, আর্ত চেহারাটাই ভেসে উঠছে। মীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ভেজানো দরজার ওপরে। তখনো যেন ভাল করে ভোর হয়নি। হেমন্ত গিয়ে নতুন শীত পড়তে আরম্ভ করেছিল। রাত্রি বড় হয়েছিল, ভোর হতে দেরি। তখন সাড়ে পাঁচটা বেজেছিল। আজকের এই সময়। কিন্তু এখন শীতের সময় না, তাই কিছুটা আলো ফুটে উঠেছে। তিন বছর আগে, এক নতুন শীতের ভোরে, তখনো অন্ধকার। নীরার ঘরে একটি জিরো পাওয়ারের নীলাভ আলো জ্বলছিল। ও তখন গভীর ঘুমে মগ্ন।

সহসা দরজায় জোরে শব্দ হতেই নীরার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু বুঝে ওঠবার আগেই মীরা এসে মশারিসুদ্ধ ওর বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর্ত-তীক্ষ্ণ কিন্তু নিচু স্বরে ডেকে উঠেছিল, দিদি, দিদি।

নীরা ঝটিতি উঠে বসেছিল। একটা দিশেহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়েছিল। পরমুহূর্তেই জোর করে টেনে মশারি সরিয়ে দিয়েছিল। মীরা তখন ওর কোলের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। জিরো পাওয়ারের নীলাভ আলোয় স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পায়নি। কেবল কোলের কাছে লুটিয়ে পড়া মীরার আলুথালু চেহারাটাই দেখতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কী হয়েছে মীরা? মীরা! এমন করছিস কেন?

মীরা যেন দলা পাকানোর মতো করে, নীরার কোলের কাছে আরো নিবিড় হয়ে এসেছিল। রুদ্ধ আর্ত নিচু স্বরে বলেছিল, সব জ্বলে যাচ্ছে দিদি, বুকের মধ্যে পুড়ে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।

নীরার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহে ও তীব্র আর্তনাদ করে উঠেছিল, কী হয়েছে মীরা! কী করেছিস তুই?

boiRboi.net

মীরা সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারছিল না। ওর গোটা শরীরটা পাকিয়ে দুমড়ে যাচ্ছিল। ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল, আর খোলা বুকের ওপরে জোরে জোরে হাত ঘষছিল। নীরা লাফ দিয়ে উঠে আগে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। খাটের ওপর ছুটে এসে মীরাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। তখনই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, মীরার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি। সমস্ত মুখখানি কালি মাখা। চোখের কোলে গভীর গর্ত, দৃষ্টি ভয়ার্ত কিন্তু স্তিমিত। ঠোঁট নীল, ঠোঁটের কষে ফেনা।

নীরা চিৎকার করে উঠেছিল, মীরা! কী করেছিস তুই? কী সর্বনাশ করেছিস?

মীরা একটু মাথা নেড়ে যেন নীরার কথায় সায় দিয়েছিল। তেমনি রুদ্ধ আর্তস্বরে বলেছিল, হ্যাঁ দিদি, আমি সর্বনাশ করে বসেছি। আমি বিষ খেয়েছি।

নীরা আর্তনাদ করে উঠেছিল, মীরা! মীরা!

মীরা অসহায় দু'হাত বাড়িয়ে নীরাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, আমাকে বাঁচাও দিদি, আমাকে বাঁচাও। আমি মরতে চাই না।

নীরাও মীরাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। ওর চোখে তখন ভয় আতঙ্ক হতাশা।

মীরা আবার বলে উঠেছিল, আমি বুঝতে পারিনি দিদি, আমার এখনো বাঁচবার সাধ। ভেবেছিলাম, দীপক আমার যে সর্বনাশ করেছে—

নীরা কেঁপে উঠে আর্তনাদ করে উঠেছিল, দীপক!

সেই মৃত্যু-বিষের জ্বালার মধ্যেও মীরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল, হ্যাঁ দিদি, দীপকদা—দীপক—দীপক আমার সর্বনাশ করেছে। কারোকে বলতে পারিনি। ভয়ে কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমার মরাই ভাল। তাই—তাই আমি—উঃ দিদি, জ্বলে যাচ্ছে, আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আমি বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচাও।

নীরার শরীর যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল। একটি নাম শুনে, ওর নিজেরই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই ও ডুকরে চিৎকার করে উঠেছিল, বাবা, বাবা! শীগগির এসো।

ততক্ষণে অনেকেই জেগে উঠেছিল। সকলেই নীরার ঘরে ছুটে এসেছিল। বাবার শরীর খারাপের কথা তখন আর নীরার মনে ছিল না। বাবারও সে কথা মনে ছিল না। চিৎকার শুনে তিনি ছুটে এসেছিলেন। নিচের থেকে বাবার সেক্রেটারী অবিনাশ চ্যাটার্জী দৌড়ে এসেছিলেন। তাকে দেখে আগেই নীরা বলে উঠেছিল, চ্যাটার্জী কাকা, এখুনি ডাক্তারকে টেলিফোন করুন। ডাক্তার ঘোষকে এখুনি আসতে বলুন। বলে দিন মীরা বিষ খেয়েছে। বলুন ঘুমের বড়ি খেয়েছে।

বাবা মধুসূদন রায় ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠেছিলেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের ওপর বসে, নীরার কোল থেকে মীরাকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলেন। হা হা স্বরে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মীরা, মীরু মা আমার, কেন, কোন্ দুঃখে তুই এমন সর্বনাশ করলি!

মীরার হাত তখন স্খলিত হয়ে পড়ছিল। বাবাকে ভাল করে জড়িয়ে ধরতে

পারছিল না। চোখের পাতা একটু একটু করে যেন বুজে আসছিল। গলার ভিতর থেকে স্বর জাগছিল না। কোন রকমে ফিসফিস করে বলেছিল, পাপ⋯ করেছি বাবা। বড় অপমান⋯অন্যায়⋯অন্যায় আমার⋯

মধুসূদন অসহায় ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় একবার নীরার দিকে তাকিয়েছিলেন। নীরা দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

মধুসূদনের চোখ জলে ভাসছিল। বলেছিলেন, তুই আমার এইটুকু মেয়ে। হাসছিস, ছুটে বেড়াচ্ছিস। তুই কী অন্যায় করবি, তুই কী পাপ করবি, মা? আমি তা বিশ্বাস করি না।

মীরা তখন মধুসূদনের কোলে এলিয়ে পড়ছিল। স্খলিত জড়ানো স্বরে বলেছিল, করেছি বাবা, করেছি। দিদির কাছে সব শুনতে পাবে।⋯কিন্তু বাবা, আমি বাঁচতে চাই, তোমাদের ছেড়ে যেতে চাই না⋯

মীরা দু'হাত তুলে ধরেছিল। নীরা তাড়াতাড়ি সেই দুটি হাত ধরে মীরাকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। ডেকেছিল, মীরা, এখুনি ডাক্তার আসছে, তুই বেঁচে উঠবি। মনে একটু জোর কর।

মধুসূদন কেঁদে উঠে বলেছিলেন, তোকে আমরা কেমন করে মরতে দেবো। আমার কাছে কেন তুই সব বলিসনি। তোর দিদিকে কেন বলিসনি। তা হলে তোকে আমরা এই সর্বনাশ করতে দিতাম না।

মীরা মাথা নেড়েছিল, প্রায় চুপি চুপি স্বরে বলেছিল, বুঝতে পারিনি বাবা⋯ বুঝতে পারিনি।⋯লজ্জায় অপমানে ভয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম⋯

মীরা কথাগুলো বলছিল খুব নিস্তেজ ভাবে। চোখ চেয়ে থাকবার চেষ্টা করেও চেয়ে থাকতে পারছিল না। বুজে আসা অন্ধকার চোখের মধ্যে তারা দুটো ক্রমেই অনড় হয়ে উঠছিল। কেউ যেন মীরার মুখে, পরতে পরতে কালি মাখিয়ে দিচ্ছিল। ঠোঁটের কষে ফেনা গড়িয়ে পড়ছিল। ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলতে চাইছিল। নীরার মনে হয়েছিল, মীরা যেন বলছে, বাঁচাও, বাঁচাও⋯আমাকে বাঁচতে দাও

পনর মিনিটের মধ্যেই পারিবারিক ডাক্তার ঘোষ ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তখন আর বিশেষ জীবনের স্পন্দন ছিল না। ডাক্তার তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ মীরাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন। গাড়ি প্রস্তুতই ছিল। তবে, মীরাকে আর নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। নীরার খাটে, নীরার আর মধুসূদনের কোলে ভাগাভাগি করে, মীরার জ্বালা শেষ হয়েছিল। মীরার অর্ধেক শরীর ছিল নীরার কোলে, অর্ধেক মধুসূদনের। ডাক্তার ঘোষ শেষবারের জন্য মীরার নাড়ি দেখেছিলেন। পারিবারিক প্রৌঢ় ডাক্তারের চোখে হতাশা ফুটে উঠেছিল। তিনি মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলেছিলেন, সব শেষ।

মধুসূদন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, শেষ? সব শেষ?

তারপরে আবার ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠেছিলেন। নীরা মৃত বোনের কোলে মুখ চেপে কেঁদে উঠেছিল।

●

নীরা আস্তে আস্তে উঠে বসল। চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছে। গায়ের

boiRboi.net

চাদরটা দিয়ে ও চোখ মুছল। সদ্য ঘুম ভাঙা তাজা ভাবটি আর নেই। কান্নায় চোখ লাল। চোখের কোল ফুলে উঠেছে। মুখের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিল। কিন্তু মশারির বাইরে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নীরা ওর বিছানা আর খাটের ওপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

এই ঘর, এই সেই খাট আর বিছানা। তিন বছর আগে, এক শীতের ভোর ভোর অন্ধকারে, মীরা এখানেই নীরার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই বিছানার ওপরেই মীরার শেষ জ্বালা জুড়িয়েছিল। তিন বছর পরে, আজ সেই দিনটি নয়, যে দিনটিতে মীরা ভয়ে লজ্জায় অপমানে বিষ খেয়ে নিজের জীবন শেষ করেছিল। শেষ করেও, বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় এ ঘরে ছুটে এসেছিল। আজ মীরার জন্মদিন।

এই জন্মদিনেই, সেই কালো কুৎসিত বীভৎস দিনটির কথা মনে পড়ে যায়। বড় বেশি করে মনে পড়ে যায়। অথচ নীরা বা ওর বাবা সেই আত্মহত্যার দিনটির কথা ভুলেই থাকতে চায়। কিন্তু থাকতে চাইলেও ভুলে থাকা যায় না। মীরার জন্মদিনের আলোয়, এ বাড়ির কোণে কোণে যেন অন্ধকার জমে ওঠে। গভীর ভারি অন্ধকার যেন আপনা থেকেই থমথমিয়ে উঠতে থাকে। ফুলের আর ধূপের গন্ধে, দীপের আলোয়, কোন কিছুতেই সেই অন্ধকারকে দূরে সরানো যায় না। বোধহয় আর কোন দিনই যাবে না। একটি জন্মদিনের ওপরে চির অন্ধকারের ছাপ পড়ে গিয়েছে। এ দিনটি যেন এ বাড়ির অত্যন্ত আদুরে ছোট মেয়ের জন্মদিনের স্মৃতি নয়। মৃত্যুদিনের শোক, দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে ভরা।

গতকাল রাত্রে নীরা নিজের হাতে ফুল আর মালা কিনে এনেছে। এ বাড়িতে ওদের প্রকাণ্ড বাগান আছে। সেখানে নানা ফুলের সমারোহ। দু'জন মালী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, সারাদিন কাজ করে। তাদের বলে দিলে ফুল আর মালার অভাব হতো না। কিন্তু বাড়িতে কারোকে কিছু জানাতে ইচ্ছা করে না। জানাজানি করে বাড়ির সবাইকে ব্যস্ত করে তুলতে ইচ্ছা করে না। নীরার ইচ্ছা নয় যে, বাড়ির পাচক, চাকর-বাকর, বিভিন্ন কর্মচারী, সবাই এই দিনটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠুক। যতটা সম্ভব নীরবে আর নিঃশব্দে একটু স্মৃতিপালন করা যায়। জাঁকজমকের কোন ব্যবস্থাই নয়। নীরা নিজের হাতেই সমস্ত কিছু করে। করার এমন কিছু নেই। ধূপ দীপ জ্বালিয়ে, মীরার ফটোতে একটি মালা পরিয়ে দেয়।

নীরা ওর বাবাকেও যেন জানতে দিতে চায় না। না জানাই ভাল। জানলেই মধুসূদনের ভাবান্তর ঘটবে। কিন্তু তাঁকে জানাতে হয় না। তিনি সবই জানেন। সবই তাঁর মনে থাকে। মনে থাকার কথাটা, মধুসূদন মুখ ফুটে বলতে চান না। নীরাকেও বলেন না। মীরার স্মৃতি তিনি নিজের মনেই বহন করেন। নীরা যেন তাতে মনে কেমন একটা অপরাধ বোধ করে। অথচ তার কোন কারণ নেই।

গতকাল সারাদিন নীরা কাজে ব্যস্ত থেকেছে। অফিসে, ওর চেম্বার থেকে, কয়েকবার ওকে বাবার চেম্বারে যেতে হয়েছে কথা বলবার জন্য। জরুরী প্রয়োজনে ইণ্টার-কনেক্টেড টেলিফোনেও কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু রাত পোহালেই যে মীরার জন্মদিন, সে বিষয়ে একটি কথাও হয়নি। নীরা ইচ্ছা করেই তোলেনি। ভেবেছে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর মধুসূদন

BDRboi.net

রায়, তাঁর নিজের কাজে যতটা ব্যস্ত থাকেন, থাকুন। অকারণ তাঁর মনে শোকের স্মৃতি জাগিয়ে না তোলাই ভাল। শোকের স্মৃতি ছাড়া আর কী বলা যায়। অন্যতম ডিরেক্টর, স্বয়ং নীরা রায়ও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছে। যদিও ব্যস্ত থাকতে পারেনি। নিজের কাছে নিজেই ভান করেছে। কিন্তু অফিসার আর কর্মচারীদের চোখে একেবারে ফাঁকি দিতে পারেনি। তারা প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, মিস রায় টেবিলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কাজের প্রসঙ্গে, হঠাৎ কথা হারিয়ে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত কাজের কথা মনে করতে পারেনি। অবাক অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। তারপরেই তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফাইল টেনে নিয়েছে।

নীরার আলাদা গাড়ি আছে। কিন্তু সারাদিন কাজের পরে, অধিকাংশ দিন বাবার সঙ্গে এক গাড়িতেই বাড়ি ফিরে আসে। কখনো কখনো কোথাও যেতে হলে নিজের গাড়িতে যায়। বাবাকে বলে দেয়, তুমি বাড়ি যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

কোথায় কী জন্য, সে কথা মধুসূদন কখনো জিজ্ঞেস করেন না। করার কোন কারণ নেই। তিনি জানেন, বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে নীরা বাবাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। তিনি শুধু বলেন, বেশি দেরি করো না যেন।

নীরা জানে, বাবা একলা বাড়িতে থাকতে পারেন না। এক ঘরের মধ্যে বাবার সঙ্গে মুখোমুখি বসে থাকতে হয় না বটে, কিন্তু নীরা বাড়িতে আছে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছে, গল্প করছে, তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত। নীরা তা জানে বলেই পারত-পক্ষে বাড়ির বাইরে থাকে না। ওর যারা বন্ধু-বান্ধবী, সবাইকেই আমন্ত্রণ করে। ওর নিজেরও অনেক আমন্ত্রণ থাকে। ক্লাবে, বিভিন্ন সংস্থার সভায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, সিনেমায় থিয়েটারে। বাবাকে ছেড়ে ও প্রায় কোথাও যায় না। নিতান্ত এড়াতে না পারলে যেতে হয়। সামাজিকতা একেবারে বর্জন করা যায় না।

গতকাল নীরা অফিস থেকে বেরোবার সময় লক্ষ্য করেছিল বাবাকে কেমন ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। তাঁকে একলা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু ও যে ফুল আর মালা কিনতে যাবে, সে কথাটা বাবাকে বলতে চায়নি। বলেছিল, বাবা, তুমি যাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।

মধুসূদন নীরার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, আচ্ছা। বেশি দেরি করো না যেন।

নীরা বলেছিল, না বাবা, আমি একটু ঘুরেই চলে যাচ্ছি।

নীরা মার্কেট থেকে ফুল আর মালা কিনে বাড়ি ঢুকেছিল। কণাকে ফুল আর মালা দিয়ে বলেছিল, এগুলো ভালভাবে জল দিয়ে রাখ। সকালে যেন টাটকা থাকে।

নীরা ভেবেছিল কণা কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে। কারণ কণা প্রায় এক বছর এ বাড়িতে এলেও মীরার গত জন্মদিনটির আগে আসেনি। গত বছর মীরার জন্মদিনের কয়েকদিন পরে কণা এসেছিল। সেই জন্যই আরো বিশেষ করে কণাকে ও ওর নিজের কাজে নিয়েছিল। মীরার অভাব কণা মেটাতে পারবে এমন কথা ঠিক ভাবেনি। কণার মতো একটি মেয়ে কাছাকাছি থাকলে অনেকটা ভাল লাগবে এ কথা মনে হয়েছিল।

boiRboi.net

কিন্তু কণা কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। কিছু জিজ্ঞেস করেনি। নীরার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে মালা আর ফুলের মোড়ক নিয়েছিল। কণার কাছ থেকে সরে যেতে গিয়ে নীরার হঠাৎ মনে হয়েছিল কণা কিছু জিজ্ঞেস করলে ও বিরক্ত হতো না। মনে পড়ল, কণাকে যে ওর ভাল লেগেছিল তার কারণ কণাও প্রায় মীরারই বয়সী। বিশেষ করে মীরা যে বয়সে মারা গিয়েছিল কণার এখন প্রায় সেই বয়স।

নীরার মনে হিসাব জেগে উঠল। হিসাব করে দেখল, মীরা বেঁচে থাকলে, আজ পঁচিশ বছর বয়সে পড়ত। একুশ বছরের জন্মদিন পার করে, মীরার জীবনে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। নীরার মনে আছে, মীরার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে, ওদের এই অভিজাত পাড়ায়, রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে আত্মহত্যার ঘটনাটি মেটেনি। পুলিসের একজন হোমরা-চোমরা এসেছিলেন তদন্ত করতে। বাবার পক্ষে আপত্তি করার কিছু ছিল না। নীরা নিজেই পুলিস অফিসারকে বলেছিল, শুধু এইটুকু অনুরোধ, দেখবেন কোন স্ক্যাণ্ডাল যেন ছড়িয়ে না পড়ে।

পুলিস মহল সেই কথা রেখেছিল। তারা ঘটনাটা সংবাদপত্রে দেয়নি। কিন্তু ময়না তদন্তের নির্দেশ তারা দিয়েছিল। নীরা তাতেও আপত্তি করেছিল। ওর আপত্তি টেঁকেনি। মধুসূদন ঘটনার আকস্মিকতায় এবং শোকে দুঃখে এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, পুলিসকে একটি কথাও বলতে পারেননি। অথচ মীরা একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল। ওর আত্মহত্যার কারণ এবং প্রমাণের ব্যাপারে, সেই চিঠিই অনেকখানি। এখনও সেই চিঠির কথা নীরার স্পষ্ট মনে আছে। চিঠিটা নীরার উদ্দেশেই লেখা ছিল। নীরাকেই উদ্দেশ করে কেন, মীরার চিঠির প্রথম লাইনেই সে কথা লেখা ছিল:

'দিদি, আমার এই কলঙ্কের কথা বাবাকে লিখে যেতে পারলাম না। মরবার মনস্থ করেও, বাবার কথা মনে করে, লজ্জায় আর অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। বাবাকে এ-সব কথা লেখা যায় না। আমার উপায় নেই, আমাকে মরতেই হবে। আমি বিষ যোগাড় করেছি। আমার হাতের সামনেই রয়েছে, তার আগে, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আসলে আমি তোমারই সর্বনাশ করেছি। তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কেমন করে করলাম কিছুই বুঝতে পারিনি। কবে থেকে এমন সর্বনাশের খেলায় মেতে গিয়েছিলাম নিজেও জানতে পারিনি। যখন জানলাম তখন আমার ফেরার উপায় নেই। আমার শেষ সর্বনাশ তখন হয়ে গিয়েছে! তুমি কি দিদি কিছুই বুঝতে পারনি? পেরে থাকলে আমাকে সাবধান করনি কেন? আমাকে শাসন করনি কেন, আমাকে ধরে মারনি কেন? আজকের এই সর্বনাশ আর অপমানের চেয়ে সেও যে অনেক ভাল ছিল। তবু আমি বাঁচতে পারতাম।

আসলে তুমি হয় কিছুই বুঝতে পারনি। পেরে থাকলেও নিজেকে গোপন করে রেখেছ। কেন জানি না আজ এই সময়ে আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়তো লুকিয়ে কেঁদেছও। তবু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারনি। তোমার হয়তো বুক ফেটেছে,

boiRboi.net

অপমানে পুড়ে গেছে, তবু মুখে হাসি বজায় রেখেছ। নিজের অবস্থা কাউকে বুঝতে দাওনি। চুপ করে দূরে সরে থেকেছ।

দিদি, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা করলে, আমার মরেও শান্তি। বাবাকে বোলো, তাঁকে আর এ মুখ দেখাবার নয়। তাই আমি মরছি। আমার বাবার মত লোকের মেয়ে হয়েও কেমন করে এমন কাজ করলাম, জানি না। এক সময়ে আমি সব কথাই বলে ফেলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যখনই মনে হলো, আমি বুঝি তোমার হাত থেকে 'তাকে' কেড়ে নিচ্ছি, তখনই আমার মনে অপরাধের চিন্তা ফুটে উঠল। আমার আর মুখ খুলতে সাহস হয়নি।

এ চিঠিতে আমি 'তার' নাম উচ্চারণ করলাম না। আমি জানি, সে অত্যন্ত দুর্বল এবং লোভী চরিত্রের মানুষ। গভীরতা দৃঢ়তা বলে 'তার' কিছুই নেই। কোন শিরদাঁড়া নেই। 'তাকে' আমি দুশ্চরিত্র লম্পট বলতে চাই না। কিন্তু সে কোনদিক থেকেই তোমার যোগ্য ছিল না। তোমাকে সে ভালবাসতে পারেনি। শ্রদ্ধা করত, ভয় পেত তার চেয়ে বেশি। ভাল সে কারোকেই বাসতে পারে না। জানে শুধু ভোগ করতে। অতএব 'তাকে' আমি দায়ী করে যেতে চাই না। দায় যা কিছু আমার। আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। দিদি, আবার বলি, আমাকে ক্ষমা করো। বাবাকে বোলো আমাকে যেন ক্ষমা করেন। —ইতি হতভাগিনী মীরা।'

নীরা ভেবেছিল, মীরার সেই চিঠি দেখবার পরে পুলিস আর ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। কিন্তু পুলিস ছাড়েনি। মীরার মৃতদেহ ওরা নিয়ে গিয়েছিল। ময়না তদন্তে তাদের সন্দেহ নিরসন হয়েছিল। তদন্তের রিপোর্টেই জানা গিয়েছিল, মীরা তখন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

নীরা ভাবছিল, চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চাদর দিয়ে মুখ মুছল। এ বাড়িটা ছিল আনন্দে উচ্ছল। সেই প্রথম নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ডাইরেক্টর, দোর্দণ্ডপ্রতাপ-শালী কর্মঠ উদার হাস্যপরায়ণ স্নেহময় মধুসূদন রায় ভেঙে পড়লেন। সেই নিরানন্দ বিষণ্ণতার আবহাওয়া এখন তেমন গভীর ভাবে ছায়া ফেলে নেই। নিয়মিত কাজ-কর্ম বিশ্রাম ইত্যাদির মধ্যে গল্প-গুজব হয়, হাসির শব্দও বাজে। কিন্তু মীরা বেঁচে থাকতে এ বাড়িতে যে আবহাওয়া ছিল তা কোনদিনই ফিরে এলো না।

নীরার মা মারা গিয়েছিলেন অনেক ছোটবেলায়। নীরার সামান্য একটু মনে আছে মাকে। মীরার একেবারেই ছিল না। মীরা সেজন্য নীরার কাছে প্রায়ই অনুযোগ করত, তোমার বেশ মাকে মনে আছে। আমি কেন কিছুতেই মনে করতে পারি না?

দুঃখের মধ্যেও নীরার হাসি পেত। বলত, কী করে তোর মনে থাকবে বল। তোর দু'বছর বয়সে মারা গেছে, আমার তখন পাঁচ বছর বয়স। আমারই কি ভাল করে মনে আছে নাকি। একটা ঝাপসা মুখ চোখের সামনে জেগে ওঠে। হাসি হাসি ঝাপসা মুখ। কিন্তু বাড়িতে মায়ের যে ফটোটা আছে, সেই মুখটা না। আমার যে মুখটা মনে পড়ে, সেটা অন্যরকম। ফর্সা রঙ, আর একটু চওড়া ভাবের মুখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা খোঁপা, কিন্তু ঘোমটা

boiRboi.net

দেওয়া নেই।

মীরা হাঁ করে শুনত না, গিলত। তার পরেও দুঃখ আর অভিমানের সুরে বলত, আমি আর একটু বড় হওয়া পর্যন্ত কি মা অপেক্ষা করতে পারল না? বলতে বলতে মীরার চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠত। নীরারও বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত। কথা ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেত।

কিন্তু মা ওদের এত ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল, আর বাবা এবং বিধবা ছোট পিসিমা এসে এমন ভাবে বুক দিয়ে আগলে ধরেছিলেন, মায়ের অভাবটা ওরা অনুভব করার অবকাশ পায়নি। মায়ের অভাবটা বাবা নিজেই নিজের মধ্যে বহন করেছেন। তার কোনো ভার কারোর ওপর চাপাতে চাননি। আজও হয়তো মায়ের স্মৃতি বাবার মধ্যে গভীর ভাবে আছে। থাকলেও তা তাঁর নিজের মধ্যেই। নীরা আর মীরাকে তিনি মানুষ করে তুলেছেন একটা আলোর বৃত্তের মধ্যে রেখে। সেখানে কোন দুঃখ বা বিষণ্ণতার ছায়া পড়েনি।

নীরার জ্ঞান হওয়ার পর, বড় হওয়ার পরে, মীরার আত্মহত্যার অঘটনই এ বাড়িতে প্রথম শোকের অন্ধকার, বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছিল। মায়ের মৃত্যুর সময়ে বাবার যৌবন ছিল। সামলিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বাইরে তাঁর বিরাট দায়িত্বের কাজ, ঘরে নীরা আর মীরা, এই নিয়ে তাঁর জগতকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। রীতিমতো সুখী আলোড়িত জগৎ। স্নেহ হাসি আনন্দের ঝংকার সেখানে সব সময়ে বেজেছে।

মীরার মৃত্যুর পরে বাবা কয়েকদিন অফিসে যেতে পারেননি। বসে থাকবারও উপায় ছিল না। বেরোবার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল। নীরা বলেছিল, বাবা, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমি অফিসে যাব।

—অফিসে যাবে? বাবার শোকমগ্ন চোখে বিস্ময়ের ঝলক লেগেছিল।

নীরা বলেছিল, হ্যাঁ, এখন থেকে তুমি আর একলা যেতে পারবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

বাবা নীরার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অফিসে গিয়ে কী করবে মা?

নীরা বলেছিল, কাজ করব।

—কাজ করবে?

—হ্যাঁ। তুমি তো আমাদের নিতান্ত মেয়ে করে মানুষ করনি। ছেলের মতো করে সব শিক্ষা দিয়েছ। তুমি তো নিজেই কতদিন বলেছ, আমি আর মীরা কোম্পানির ডিরেক্টর। তুমি যখন থাকবে না, তখন আমরাই সব ভার নেব।

মধুসূদন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন। নীরা বুঝতে পারছিল, মীরার নামটা শুনে, তাঁর বুকের মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল। গলা বুজে এসেছিল। কথা বলতে পারছিলেন না। নিজেকে সামলাতে সামলাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। নীরা বাবার বুকে হাত রেখে ডেকেছিল, বাবা!

মধুসূদন যেন একটু চমকে উঠেছিলেন, হ্যাঁ মা।

তারপরে একটু করুণ হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাই তো বলেছি মা, তোমরা দু'বোন, তোমরাই আমার সব। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর তোমরাই ভবিষ্যৎ ডিরেক্টর। ডিরেক্টর তোমরা এখনই, কেবল অফিসে বসনি। কিন্তু তোমরা কোনদিন অফিসে

boiRboi.net

পাবে, সে কথা তো আমি ভাবিনি। এ পরিবারে আরো দু'জন ডিরেক্টর আসবে। অফিস কারখানার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তারা নেবে, তা-ই তো ভেবেছি।

অর্থাৎ, তিনি ভেবেছিলেন, দুই মেয়ের বিয়ে দেবেন। দুই জামাইও কোম্পানির ডিরেক্টর হবে। অফিস কারখানার কাজ-কর্ম তারাই দেখাশোনা করবে।

নীরা বলেছিল, তোমার মনের কথা জানি বাবা। বলে নীরা একটু সময় চুপ করে ছিল। আবার বলেছিল, তুমি যা ভেবেছিলে, মীরা চলে যাবার পরে, আর তোমাকে সে ভাবে ভাবতে দেবো না বাবা।

মধুসূদন নীরুকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, তা বললে কী করে হবে নীরু। তোকে সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব আমি।

বিয়ে! এক মুহূর্তের জন্য নীরার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। স্ফুরিত ঘৃণায় ঝিলিক হেনেছিল চোখে। একটি মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মীরার শেষ চিঠির ছত্রগুলো ভেসে উঠেছিল চোখের ওপরে। মনে মনে বলেছিল, না, আর বিয়ের চিন্তা কোনদিন নয়। নীরা রায়ের সে সাধ সমূলে শেষ হয়েছে।

নীরা বাবাকে বলেছিল, এ কথা কেন বলছ বাবা! আমি কি সংসারে প্রতিষ্ঠিত নই? এ সংসার কি আমার সংসার নয়?

মধুসূদন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। এ সংসার তোর বৈকি! আজ তোকে বাদ দিলে মধুসূদন রায়ের আর সংসার বলতে কী থাকবে? একটা শূন্য। কিন্তু সে কথা বলছি না নীরু। আমি তোর বিয়ের কথা বলছি।

নীরা দৃঢ় স্বরে বলেছিল, সে চিন্তা এখন থাক বাবা। মোটের ওপর আজ থেকে আমি তোমার সঙ্গে অফিসে যাব। কোন কাজ করতে না দাও, না দেবে। তোমাকে একলা ছেড়ে দেবো না আর।

মধুসূদন কথা বলতে পারেননি। বোধ হয় আবার তাঁর গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। কন্যার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েছিলেন।

নীরা বলেছিল, তা ছাড়া, আমি সারাদিন এ বাড়িতে একলা কী করব?

—একলা?

মধুসূদন বিস্মিত গলায় কথাটা উচ্চারণ করেই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। নীরা বুঝতে পারছিল, বাবা ওর একাকিত্বের কথা শুনে অসহায় বিস্ময়ে অনেক কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন, এ বাড়িতে কন্যাদের এত বন্ধু-বান্ধবীর আনাগোনা, খানা-দানা, ছুটোছুটি, হই-হুল্লোড়, সব সময়েই হাসি আনন্দ গান, তার মধ্যে নীরা একলা থাকবে কেন। তারপরেই হঠাৎ কী ভেবে যেন নিজেই চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, তাও তো বটে। বেশ, যে ক'দিন তোমার বাড়ি ভাল না লাগে আমার সঙ্গে অফিসেই যাবে।

নীরা বুঝতে পেরেছিল, বাবা ওর মনোভাবকে নিতান্তই সাময়িক ভেবেছিলেন, তাই বলেছিলেন, যে ক'দিন তোমার বাড়িতে ভাল না লাগে। কিন্তু নীরাই শুধু জানত, মনে মনে ও কী স্থির করে নিয়েছিল। মীরার আত্মহত্যা যে ওর জন্মান্তর ঘটিয়েছিল, সে-কথা ও বাবাকে তখন বলতে পারেনি। বলতে পারেনি, ওর একটা জীবনের ওপরে চিরদিনের জন্য একটা যবনিকা নেমে এসেছে। সে যবনিকা আর

boiRboi.net

নতুন করে কোনদিন উঠবে না। মীরার বিদায়ের সঙ্গেই একটা জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, ভাবনা-চিন্তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সব বিদায় নিয়েছে। আর একটা নতুন জীবনের সংক্রান্তির মুহূর্তে ও এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সে সব কথা ও বাবাকে বলতে পারেনি। বাবার কথার প্রতিবাদও করেনি। তাঁর সঙ্গে অফিসে বেরোবার সম্মতি আদায় করেই তখনকার মতো নিরস্ত হয়েছিল। তবে বাবার সেই 'যে ক'দিন' আর শেষ হয়নি। মীরার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে সেই যে বাবার অফিসে বেরোতে আরম্ভ করেছিল, আজও তার শেষ হয়নি। শেষ হবার আর কোন উপায়ও মীরা রাখেনি। নীরা রায় এখন নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন দায়িত্বশীল ডিরেক্টর। এখন সে একজন ব্যস্ত কর্মী। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং এখন নীরা রায়কে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।

হয়তো সেটা সম্ভব হয়ে উঠত না। মধুসূদন যে রকম ভেবেছিলেন, সে রকম ভাবেই, কিছু দিন পরে, নীরাকে বাড়িতে এসে বসে থাকতে হতো। কিন্তু মীরার মৃত্যুর এক মাস পার হতেই বাবার প্রথম স্ট্রোক হয়েছিল। তাঁর বুকে মীরার আত্ম-হত্যার আচমকা আঘাতটাই অনেকখানি ছিল। সে আঘাত কতখানি গভীর এবং ব্যাপক, তা তিনি নিজেই বোধহয় বুঝে উঠতে পারেননি। শোক তাঁর কোন্ মূল পর্যন্ত আক্রমণ করেছিল, অনুমান করা যায়নি। সবকিছু ভুলে থাকবার জন্য তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আগে স্বাভাবিক অবস্থায় যা করতেন না, তা-ই করতে আরম্ভ করেছিলেন ; রোজ ফ্যাক্টরিতে যাওয়া-আসা করছিলেন। অথচ আগে সপ্তাহে একদিন যেতেন কিনা সন্দেহ।

নীরা সঙ্গ ছাড়েনি। কিন্তু বাবাকে ওভাবে ছুটোছুটি করতে বারণ করেছিল। সকলেই বারণ করেছিল। বিশেষ করে, বাবার কাজেকর্মে যিনি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী, ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জেনারেল ম্যানেজার বি কে বসু (ব্রজকিশোর বসু) বার বার এত পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছিলেন ; নীরা শেষ পর্যন্ত বাড়ির ডাক্তারকে দিয়েও বাবাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। বাবা একটু হেসে সেই একই কথা বলতেন, কই, এমন বেশি কিছু পরিশ্রম করছি না তো। রোজ একবার ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি, এই যা।

নীরাই বলেছিল, তা-ই বা কেন যাবে বাবা ! ফ্যাক্টরিতে কোন গোলমাল নেই। কাজকর্ম ভালভাবে তো চলছে।

মধুসূদন বলতেন, আমার মনটা একটু ভাল থাকে মা। খালি অফিসের কাজ করতে ইচ্ছা করে না।

এ কথা শুনলে নীরা বিশেষ কিছু বলতে পারত না। তা ছাড়া, মনে মনে একটু অস্বস্তি থাকলেও অশুভ কিছু চিন্তা করেনি। কিন্তু সেই অশুভ ঘটনাই ঘটেছিল। বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। সেই প্রথম স্ট্রোক। তেমন মারাত্মক কিছু না। তবু চার মাস তিনি অফিসে যেতে পারেন নি। বাবা যেতে চেয়েছেন, ডাক্তার কিছুতেই অনুমতি দেননি।

সেই চার মাসের মধ্যেই নীরার নতুন জন্মান্তরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে বাবাকে দেখা, অর্থাৎ সেবিকা, আর একদিকে নীরা রায় নামে একটি তরুণী নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন যোগ্য ডিরেক্টর রূপে জন্ম নিচ্ছিল। তখন বি কে বসুই

boiRboi.net

ওকে সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। পারিবারিক প্রথানুযায়ী ব্রজকিশোর বসুকে নীরা বোসকাকা বলেই ডাকে। ছেলেবেলা থেকে তা-ই শেখানো হয়েছিল। ঠাকুর্দার দ্বারা নিয়োজিত লোক তিনি। বাবারই বয়সী। ঠাকুর্দা বাবাকে যেমন খুব অল্প বয়সে ডিরেক্টরের দায়িত্ব দিয়ে কাজে টেনে নিয়েছিলেন, ব্রজকিশোর বসুকেও সেইরকম অল্পবয়সেই কাজে নিয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। লোকচরিত্র বুঝতেন। কাজের মানুষ চিনতেন। ব্রজকিশোরকে তিনি সামান্য একটি কেরানীর কাজ দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। ব্রজকিশোরও তাঁর গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁকে সমস্ত বিভাগে কাজ করিয়ে, কোম্পানির সমগ্র চেহারাটি অবহিত করিয়ে মধুসূদনের একজন যোগ্য সহকারী, না, সহকারী বললে ভুল হবে, যোগ্য সহযোগী হিসাবে তৈরি করে তুলেছিলেন। ব্রজকিশোর সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন। মধুসূদনের পরেই নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং পরিচালনার দায়-দায়িত্বে কারো নাম করতে হলে, ব্রজকিশোর।

নীরা ছেলেবেলা থেকেই ব্রজকিশোরকে ওদের বাড়িতে দেখেছে। শুনেছে, ঠাকুর্দা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নিতান্ত কর্মচারী হিসাবে দেখতেন না। বাড়িতে ডেকে আনতেন, বাড়ির ছেলের মতোই দেখতেন। ব্রজকিশোরকে বিয়ে দিয়ে, ঠাকুর্দাই সংসারে প্রতিষ্ঠা করে যান। নীরা শুনেছে, বাবার বিয়ের আগে ঠাকুর্দা ব্রজকিশোরের বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলতেন, এক ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এবার আর এক ছেলের বিয়ে দিতে হবে।

মধুসূদন আর ব্রজকিশোরের ব্যক্তিগত সম্পর্কও বিশেষ প্রীতি আর বন্ধুত্বপূর্ণ। দুজন দুজনকে 'রায়' আর 'বোস' ডাকেন। অফিসে দশজনের সামনে 'আপনি' করে বলেন। ঠাকুর্দার প্রত্যাশা কোনদিক থেকেই বিফলে যায়নি। ব্রজকিশোর এখন নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিশেষ কর্তাব্যক্তি তো বটেই, রায় পরিবারে আত্মীয়ের থেকেও বেশি।

মধুসূদন একমাস পরে মোটামুটি আরোগ্য লাভ করেছিলেন। যদিও দুশ্চিন্তার শেষ হয়ে যায়নি। সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। এক মাস পরে, নীরা বাবার অনুমতি চেয়েছিল, তোমাকে দেখাশোনা করার পরে, আমি রোজ কিছু সময়ের জন্য অফিসে যাব।

মধুসূদন এক কথায় সম্মতি দিতে পারেননি। বলেছিলেন, তুই আবার একা একা অফিসে যাবি কেন নীরু?

নীরা বলেছিল, আমি তো বোসকাকার সঙ্গে একটু-আধটু কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলাম, আমার একটু শেখা হচ্ছিল। সেটা একেবারে বন্ধ করতে চাই না। তুমি অনুমতি দাও বাবা।

মধুসূদন নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সময় চুপ করে ছিলেন। বলেছিলেন, ভয় পাচ্ছিস কেন নীরু?

নীরু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কিসের ভয় পাব বাবা?

মধুসূদন সরাসরি জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, আমি তো এখনো আছি রে!

নীরা বলেছিল, তুমি আবার কোথায় যাবে বাবা। তুমি তো থাকবেই। আমিও

boiRboi.net

তোমার সঙ্গে আরো ভাল ভাবে থাকতে চাই।

মধুসূদন তথাপি চুপ করে ছিলেন। নীরা বলেছিল, আপত্তি করো না বাবা। আমার যদি ভাল লাগে, আপত্তি করবে কেন! আমাকে একটু কাজকর্ম শিখতে দাও। বিজ্ঞান আর অর্থনীতি তো তুমি আর এমনি এমনি পড়াওনি আমাকে। আমিও তা পড়িনি। সেসব একটু কাজে লাগাতে দাও। আমার তাতে ভালই হবে।

মধুসূদন অন্যদিকে তাকিয়ে, চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়েছিলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁ রে নীরু, বাড়িটা আজকাল বড় চুপচাপ হয়ে গেছে। তোর বন্ধুরা কেউ আর আসে না?

চকিত মুহূর্তের জন্য নীরার মুখে লাল ছোপ ধরে গিয়েছিল। বন্ধুরা বলতে বাবা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটা একেবারে স্পষ্ট না হলেও, এক মুহূর্তের জন্য লজ্জাটা রোধ করতে পারেনি। ও তাড়াতাড়ি বলেছিল, হ্যাঁ, কেউ কেউ আসে তো।

—আমি তো দেখতে পাই না।

—খুব কম আসে। তোমার শরীর খারাপ, তুমি কী করে দেখতে পাবে! কেউ কেউ আসে, একটু আধটু গল্প করি।

মধুসূদনের কপালে কয়েকটি রেখা পড়েছিল। নীরা দেখেছিল, অন্যমনস্ক চিন্তার রেখা।

ও আবার বলেছিল, তা ছাড়া, আমার আজকাল শুধু শুধু গল্প করতে ভাল লাগে না বাবা। কাজকর্ম নিয়েই আমি ভাল থাকি। আমার হাতে সময় নেই দেখে, অনেকে আজকাল আসে না।

মধুসূদন বলেছিলেন, তুই নিজেই বোধহয় সবাইকে বারণ করে দিয়েছিস?

কথাটা একেবারে মিথ্যা না। মুখের ওপর কারোকে কিছু না বললেও, নীরার আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে, আগের মতো হাসি গল্প আনন্দ নিয়ে ও আর থাকতে চায় না। থাকতে পারে না। মীরার মৃত্যু একদিকে যেমন অনেক কিছু ভেঙেচুরে দিয়েছে, তেমনি আর এক দিক থেকে নীরার মধ্যে কিছু গড়ে তুলতে চেয়েছে। সেই গড়ে তোলার সঙ্গে ওর পুরানো জগতের কোন মিল নেই। সেই পুরানো জীবন যাপন, পুরানো কথা, হই-হুল্লোড় আনন্দ, গান বাজনা পার্টি বেড়ানো, সেসব কোন কিছুই ওর নতুন চিন্তার জগতে নেই। সে কথা ও মুখ ফুটে কারোকে কিছু বলেনি। ওর আচরণ থেকেই সবাই আন্দাজ করে নিয়েছে। যারা ওর উদাস এবং অমনোযোগী আচরণ থেকে ওকে বুঝতে পারেনি, তাদের জানিয়ে দিয়েছে, নীরা বাড়ি নেই। টেলিফোন এলে কোন সাড়া দেয়নি। তারপরে যখন সবাই দেখেছে, নীরা ওর বাবার সঙ্গে অফিসে ফ্যাক্টরিতে যাতায়াত আরম্ভ করেছে, তখন অনেকেই বুঝেছিল, নীরা আর সেই নীরা নেই। ওর অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

নীরা বলেছিল, বারণ কারোকে করিনি বাবা। কিন্তু আমার যে আর ওসব ভাল লাগে না। চিরদিন কি এক রকম ভাল লাগে? তুমি বোধহয় আমার জন্য মিছিমিছি ভাবছ!

মধুসূদন বলেছিলেন, তুমি একেবারে সব ছেড়েছুড়ে এত কাজ নিয়ে মেতে উঠলে ভাবতে হয় বৈকি।

boiRboi.net

নীরা হেসেছিল। হেসে বাবাকে প্রবোধ দিয়ে, নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিল। বলেছিল, কিছুই ছাড়িনি বাবা। এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় গিয়েছি। কাজকর্ম করতে গিয়ে কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়। আমি তাদের নিয়ে বেশ থাকি।

মধুসূদন একটি নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, দেখিস মা, যোগিনী হয়ে যাসনি যেন।

নীরার বুকে কথাটা খচ্ করে লেগেছিল। তথাপি হেসেছিল। বলেছিল, যোগিনী হবো কেন বাবা। আমি একটা জাঁদরেল মেয়ে ডিরেক্টর হবো।

মধুসূদন কিন্তু হাসেননি। বলেছিলেন, বেশ, যেতে চাস যা।

নীরা বলেছিল, তা হলে তুমি বোসকাকাকে বলে দিও।

মধুসূদন ব্রজকিশোরকে বলে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন বললে ভুল হবে। তিনি ব্রজকিশোরের মতামত চেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। নীরার সৌভাগ্য, ব্রজকিশোর আপত্তি করেননি বরং তাঁর উৎসাহই ছিল।

তিনি বলেছিলেন, এ তো খুব ভাল কথা। আজকাল মেয়েরা কত কী করছে। নীরা যদি কোম্পানির কাজকর্ম বুঝে নিতে চায়, তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমি সর্বতোভাবে নীরাকে সাহায্য করব।

মধুসূদনই দ্বিধা করে বলেছিলেন, কিন্তু বোস, অন্য দিকটাও ভাববার আছে।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ দিক, রায়। নীরার বিয়ে তো?

—হ্যাঁ।

—এতে চিন্তার কি আছে? নীরাকে যে বিয়ে করবে, সে নিশ্চয়ই এমন ছেলে হবে না, নিতান্ত একটি ঘোমটা টানা মেয়ের বর। নীরা আর তার ভাবী স্বামী, দু'জনেই তো নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং দেখাশোনা করবে। তুমি বৃথাই ভাবছ, রায়।

—বলছ?

—হ্যাঁ, বলছি। নীরার এ মনোভাবকে আমি প্রশংসা করি। ওর অধিকার আছে সব কিছু শিখে নেয়ার। কেন ও একজন অকেজো ডিরেক্টর হয়ে থাকবে? তা ছাড়া, আমাদের নীরু মা ভাল করে লেখাপড়া শিখেছে, যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। এই যে সামান্য কিছুদিন ও তোমার সঙ্গে গিয়েছিল, তার মধ্যেই আমি ওর কিছু কিছু জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। দৃষ্টি ওর খুব সজাগ, সব দিকে লক্ষ্য আছে। ডিপার্টমেন্টাল সমস্ত চীফদের সঙ্গেই আমি ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। নীরা তাদের সকলের সঙ্গেই অনায়াসে কথা বলেছে, মিশতে পেরেছে, শিক্ষানবীশের মতো কাজকর্ম বুঝতে চেয়েছে। নীরার ব্যবহারে সকলেই সুখী।

মধুসূদন একটু অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এত কথা আমার জানা ছিল না।

ব্রজকিশোর বলেছিলেন, আমি অবিশ্যি ভেবেছিলাম, নীরা নিতান্ত কৌতূহল-বশতই সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চাইছে, কাজের বিষয় বুঝতে চাইছে। তোমার কথা থেকে বুঝতে পারছি, নীরা পুরোদস্তুর কাজকর্ম করতে চাইছে। আমি মনে করি, সেটা খুবই ভাল।

মধুসূদন বলেছিলেন, বেশ, তা-ই হোক। এক সময় মনে করতাম, ভবিষ্যতের

boiRboi.net

সব কিছুই আমার হাতে। যা করবার আমিই সব করব। সেটা যে ভুল মনে করেছি, দু'তিন মাসের মধ্যেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। সে অহংকার আর আমার নেই। আমি কি জানতাম, নীরা এ ভাবে আত্মহত্যা করবে, আমি হঠাৎ এতটা অসুস্থ হয়ে পড়ব! ভবিষ্যতে যদি এই থাকে, আমার নীরু নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন পুরোদস্তুর ডিরেক্টর হবে, তবে তা-ই হোক।

ব্রজকিশোর বলেছিলেন, রায়, এতে তোমার সৌভাগ্যই সূচিত হচ্ছে। নীরা একাধারে তোমার ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই।

মধুসূদন বলেছিলেন, হয়তো তা-ই। তবু মন মানে না বোস। আমার মেয়েটা সুখী হলেই আমি সুখী।

ব্রজকিশোর উক্তি করেছিলেন, আমার মনে হয়, কাজকর্মের মধ্যে থাকলে নীরা সুখীই হবে।

মধুসূদন নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিলেন, তা হলে এ বিষয়ে সব ভার তোমার।

—একশোবার। এই নতুন কাজটি পেয়ে আমিও সুখী।

দু'জনের মধ্যে এসব কথাবার্তার বিষয় নীরা ব্রজকিশোরের কাছ থেকেই শুনেছিল। তারপর থেকে, নীরা নিয়মিত অফিসে যেতে আরম্ভ করেছিল। ব্রজকিশোর অফিস যাবার পথে নীরাকে তুলে নিয়ে যেতেন। চার মাস পরে তার প্রয়োজন হয়নি। মধুসূদনকে ডাক্তার আবার অফিসে যাবার অনুমতি দিয়েছিল। নীরা বাবার সঙ্গে যেত, কিংবা বলা যায়, ও বাবাকে নিয়ে যেত। তবে মধুসূদনের কাজকর্ম অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোন জটিল কাজ করা একেবারেই নিষেধ করা হয়েছিল। নিতান্ত যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকুই করার নির্দেশ ছিল।

সেই থেকে নীরার যাওয়া আর বন্ধ হয়নি। বন্ধ হওয়ার আর কোন প্রশ্ন নেই। নীরা রায় এখন নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি অপরিহার্য সত্ত্বা। ডিরেক্টর হিসাবে ওর কাজ এখন মধুসূদনের থেকে বেশি। ওর এখন আলাদা অফিস ঘর। নীরা খুব সাধারণ অফিস ঘরই চেয়েছিল। ব্রজকিশোর তা শোনেননি। বলেছিলেন, ডিরেক্টরকে ডিরেক্টরের মতোই থাকতে হবে। সব কিছুই মানানসই হওয়া চাই। রীতিমতো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, আধুনিক সাজে সাজানো অফিস ঘর। সবই হয়েছিল ব্রজকিশোরের নির্দেশ এবং পছন্দমতন। মধুসূদন পর্যন্ত নীরার ঘর দেখে হেসে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ওহে বোস্, এ যা ডিরেক্টরের ঘর হয়েছে দেখছি, এর পরে তো আর আমার ঘরে কেউ যেতেই চাইবে না।

ব্রজকিশোরও ঠাট্টা করে জবাব দিয়েছিলেন, তুমি হলে সেকেলে ডিরেক্টর। তোমার বিরাট হলঘরের মতো ঠাণ্ডা অফিস ঘর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেলভেট মোড়া চেয়ার, মোটা গালিচা পাতা, যাকে বলে রাজদরবার। ওটা হল বনেদি। একে বলে মডার্ন। এর টানটা তো একটু বেশিই হবে।

মধুসূদন বলেছিলেন, তাইতো দেখছি। বেশ ভালই হয়েছে।

ব্রজকিশোর আবার বলেছিলেন, তোমার ঘরে আর যাবার দরকারই বা কী। এখন থেকে না হয় সবাই এ ঘরেই আসবে।

মধুসূদন হেসেই বলেছিলেন, হ্যাঁ, নিরু আমার কাজকর্ম কেড়ে নেবার

boiRboi.net

যোগাড় করেছে।

নীরা বলেছিল, ইশ্ ! এত ক্ষমতা আমার এখনও হয়নি বাবা। তোমার সবকিছু কাজকর্ম যেদিন বুঝে নিতে পারব, সেদিন বুঝব, আমি কিছু করতে পেরেছি।

কথাটা মিথ্যা নয়। মধুসূদন রায় আগের তুলনায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ। কাজকর্মও তাঁর অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথাপি, ডিরেক্টর এম রায় নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর সর্বরক্ষক। তাঁর উপদেশ, পরামর্শ এবং কৌশল ছাড়া কোম্পানি চলতে পারে না। ব্রজকিশোর-এর দৃষ্টি এবং চিন্তা যথেষ্ট সজাগ। বিভাগীয় প্রধানেরাও সকলেই বিজ্ঞ, কর্মঠ, কাজ সম্পর্কে সচেতন। তবু মধুসূদন রায়ের পরামর্শ ছাড়া কারোরই চলে না।

নীরারও না। নীরাকে প্রতি পদেই বাবার কাছে যেতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের সকলের কাছেই ও কাজ শিখে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে, এখনো তা নেয়। কারণ, শেখবার কোন শেষ নেই। ওপরওয়ালার কোন গাম্ভীর্য নিয়ে ও কাজ শিখতে যায় না। কাজ শিখতে যায় শিক্ষানবীশের মতোই। সকলের সঙ্গেই সম্পর্কটা ও সহজ করে নিয়েছে। অন্যান্যেরাও ওর কাছে সহজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নীরা জানে, ওর বিশেষ শিক্ষাটা বাবার কাছেই। বাবা একদিকে যেমন লেবার আর প্রোডাকশন বোঝেন, অন্য দিকে তেমন ফিনান্স আর মার্কেটও বোঝেন। বাবা হলেন ঠাকুর্দার উপযুক্ত উত্তরসূরী। সেই হিসাবে নীরা এখনো কিছুই না। নীরা চায়, ও হবে মধুসূদন রায়ের উপযুক্ত উত্তরসূরী।

●

আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। পর্দা সরিয়ে, চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে কণা ঢুকল। মশারির মধ্যে নীরাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হলো সে। আখরোট কাঠের টি-পয়ের ওপর চায়ের ট্রে রাখতে গিয়ে, টাইমপিসটা দেখতে পেল। নীরা কণার দিকে সরাসরি তাকাল না। ও বুঝতে পারছে, কণা নিশ্চয়ই মনে মনে অবাক হচ্ছে। নীরা কোনদিনই এ ভাবে বসে থাকে না।

কণা চায়ের ট্রে রেখে, মশারি তুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, চা ঢালব বড়দি ?

নীরা বলল, ঢালো।

কণা চা ঢেলে, নীরার দিকে কাপ এগিয়ে দিল। নীরা কণার দিকে না তাকিয়ে, কাপ নিল। অন্যান্য দিন সকালবেলা ওদের দু'জনের মধ্যে চোখাচোখি হয়। একটু হাসি বিনিময় হয়। একটু হাসি বিনিময় হয়, যাকে বলা যায়, নিরুচ্চারে সুপ্রভাত জানানো। তারপরে কণা জিজ্ঞেস করে, কাল ঘুম হয়েছিল তো বড়দি ? কথা প্রসঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা হয়। বাড়ির বিষয়ে সব কথা। ঝি চাকর পাচক বেয়ারা, কারা কী বলছে না বলছে, ইত্যাদি। নীরা যে আসলে কণার কাছ থেকে বাড়ির সকলের কাজের হিসাব নেয়, তা নয়। বা কণা যে কারো নামে অভিযোগ করে, তাও না। কণার কাছ থেকেই ও সকলের কথা জানতে পারে। কার কী দরকার, কার সঙ্গে কার ঝগড়া, কে কার পিছনে লেগেছে, কার কী সমস্যা, এসব নিয়েই কথা হয়। তার মধ্যে অনেক সময় হাসি ঠাট্টার ব্যাপারও থাকে। কণা কথা বলে ঘর গোছগাছ করতে করতে। নীরা কথা বলে চা খেতে খেতে।

আজ নীরা কোন কথা বলল না। চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দিল। কণার দিকে চোখ তুলে তাকাল না। কারণ জানে, ওর চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ওর বিষণ্ণ মুখ থেকে এখনো হয়তো কান্নার ছাপটুকু সব মিলিয়ে যায়নি। কী দরকার কণাকে এ মুখ এখন দেখিয়ে। ওর মনে মনে কী হচ্ছে, সে কথাও কণাকে জানাবার দরকার নেই। কণা হয়তো মনে মনে অবাক হচ্ছে, অনেক কিছু ভাবছে। তা ভাবুক। এ মুহূর্তে নীরার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

কণাও কোন কথা বলল না। নীরার চা খাবার পরে, কণার একটি বিশেষ কাজ, নীরার বাসি চুলগুলো জোরে টেনে আঁচড়ে দেওয়া। কণা চিরুনি হাতে করে এগিয়ে এলো না। জিজ্ঞেস করল, বড়দি চুল আঁচড়ে দেবো ?

নীরা বলল, না, থাক।

কণার সামান্য যেটুকু গোছগাছ করার তা-ই করতে লাগল। নীরা লক্ষ্য করল, কণার চোখে মুখে কোন কৌতূহল নেই, বরং একটু গম্ভীর ভাব। অকারণ কৌতূহল কণা কখনোই প্রকাশ করে না। মেয়েটির সেটাও একটা গুণ। নীরা জিজ্ঞেস করল, ফুল আর মালা যত্ন করে রেখেছ তো কণা ?

কণা বলল, রেখেছি।

নীরা খালি কাপ ডিস বাড়িয়ে ধরল। কণা এগিয়ে এসে হাতে নিল। নীরা বলল, কণা, তুমি বোধ হয় জান না, আজ—

নীরার গলায় কথাটা যেন আটকে গেল।

কণা বলল, জানি।

নীরার ছলছলে চোখে বিস্ময়। কণার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি জানো ?

কণা হাতের কাপ ডিসের দিকে চোখ রেখে বলল, ছোড়দির জন্মদিন।

নীরা জিজ্ঞেস করল, কে বলল তোমাকে ?

কয়েক মাস আগে আপনিই বলেছিলেন।

তাই নাকি ? আমার তো মনে নেই।

আমার মনে আছে। যেদিন বলেছিলেন, সেদিনটা ছিল—

কণা কথা শেষ করল না। নীরার দিকে একবার তাকাল, আবার চোখ নামিয়ে নিল। নীরার চকিতে মনে পড়ে গেল, সেই দিনটা ছিল মীরার আত্মহত্যার দিন। মনে পড়ে গেল, কণাকে ও নিজেই বলেছিল, তার বোন আত্মহত্যা করেছে। নীরা না বললেও কণা জানতে পারত। হয়তো জেনেও ছিল বাড়ির লোকদের কাছ থেকে। শুধু আত্মহত্যার কথাই বলেছিল, তার কার্যকারণ কিছুই ব্যাখ্যা করেনি। বাড়ির লোকেরা সত্যি মিথ্যা কিছু বলে থাকতে পারে কণাকে। কণা সে কথা কোনদিন কিছু বলেনি। নীরা বলল, হ্যাঁ কণা, তোমার ঠিকই মনে আছে। আমার বোনের আজ জন্মদিন।

নীরা চুপ করে বসে রইল। কণা নীরার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আবার কাজে মনোনিবেশ করল। কাজ শেষ করে কণা বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে দেখতে গেল, সেখানে সব জিনিস ঠিক ঠিক আছে কি না। সেখান থেকে বেরিয়ে

boiRboi.net

এলে, নীরা বলল, দেখে এসো তো কণা, বাবা জেগেছেন কী না।

কণা বলল, আপনার ঘরে আসবার আগেই দেখেছি, বাবা তাঁর ঘরে জেগে বসে আছেন।

জেগে বসে আছেন? নীরার ভুরু কুঁচকে উঠল। চোখে জিজ্ঞাসা। খানিকটা আপন মনেই বলল, এত তাড়াতাড়ি তো বাবা ওঠেন না।

কণা বলল, আমি একবার ওঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম জানালা খোলা। উনি বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসে আছেন।

নীরা ওর কোমরের কাছ থেকে চাদরটা টেনে সরিয়ে দিল। শ্লিপিং গাউন নামিয়ে দিল পায়ের পাতার কাছাকাছি। খাট থেকে নামতে নামতে বলল, তাহলে আমি আর দেরি করব না। স্নানটা সেরে নিই।

কণা বলল, তাহলে আমি যাচ্ছি।

কণা বেরিয়ে গেল। নীরা দরজা বন্ধ করে দিল।

●

আবার যখন নীরা দরজা খুলল তখন অফিসে যাবার জন্য ও তৈরি। মীরার মৃত্যুর পরে রঙীন শাড়ি পরা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। সালোয়ার কামিজ বা অন্যান্য আঁট পোশাক তো অনেক দূরের কথা। কসমেটিকস্-এর ব্যবহারও একেবারে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন সে-সব বজায় রাখতে পারেনি। মধুসূদনের চোখে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, নীরু, আমার কথাটা একটু মনে রাখিস। আমার চোখের সামনে তুই এমন সাদা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াসনে।

নীরা সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিল, সাদা কোথায় দেখলে বাবা! আমি তো বেশ পাড়ওয়ালা শাড়ি পরি।

মধুসূদন বলেছিলেন, আমার চোখে ওগুলো মোটেই সুন্দর লাগে না। রঙীন জামা-কাপড় পরা কি ভুলে গেছ? আমার একটা মেয়ে, সেও যদি এরকম সেজে থাকে, আমার চোখে সয় না।

নীরা বলেছিল, এবার থেকে রঙীন পরব।

নীরা আবার রঙীন শাড়ি জামা পরতে আরম্ভ করেছিল। বাবার কথাগুলো ওর বুকের মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল। অথচ কয়েক মাস পরে হঠাৎ আবার রঙীন জামা-কাপড় পরতে গিয়েও নীরার মনটা বারে বারে থমকে গিয়েছিল। মীরার মৃত্যুর জন্যই যে বাধা বোধ করেছিল, তা নয়। ওর সমস্ত শরীরের মধ্যেই যেন একটা প্রতিবাদ জেগে উঠেছিল। প্রতিবাদে মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখে জেগে উঠেছিল বিতৃষ্ণা। ও যে ভেবেছিল, পুরানো জীবনের কোনকিছুতেই আর ফিরে যাবে না। কিন্তু বাবা! বাবার কণ্ঠকে বাড়িয়ে তুলতে পারেনি। বাবার দৃষ্টি সজাগ। কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন, দেখেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, নীরা আপনা থেকেই আবার সাজগোজ করবে। যখন বুঝেছিলেন, সে আশা নেই, তখন আর না বলে পারেননি।

নীরা আবার রঙীন শাড়ি জামা পরতে আরম্ভ করেছিল। অনেক দিন পরে রঙীন জামা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজেকেই যেন অচেনা লেগেছিল। নিজেকে বড়

boiRboi.net

উজ্জ্বল, বড় ঝকঝকে মনে হয়েছিল। অথচ পুরানো জীবনের তুলনায় ঔজ্জ্বল্য কতটুকু। কিছুই না। তখন রঙ জড়িয়ে থাকত সমস্ত শরীরকে ঘিরে। ফর্সা মুখের ওপরেও থাকত একটু রঙের ছোঁয়া। রক্তিম ঠোঁট দুটিকে আরো একটু রাঙিয়ে না তুলতে পারলে মন মানত না। ডাগর কালো চোখে কাজল না মাখলে মনে হতো চোখের দৃষ্টি যেন তেমন স্পষ্ট হয়নি। সকলের দিকে তাকাবে কেমন করে। জামার ছাঁট-কাট একেবারে লেটেস্ট ডিজাইনের না হলেই যেন তখন শরীরে সহজ ছন্দটা জেগে উঠত না। নীরা নামে সেই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটির অঙ্গে যে একটি স্বাভাবিক হিল্লোল খেলা করত, মনের মতো সাজ না থাকলে তাও যেন তেমন হিল্লোলিত হতো না।

নীরা বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস চেপে রঙীন শাড়ি জামা পরেছিল। বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন জীবনে সেই নতুন, তাই একটা লজ্জা আর সঙ্কোচের ভাব ছিল। বাবা ওর দিকে তাকিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, বাহ্, এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। বুঝলি রে নীরু, এখন আমার বড় রঙের দরকার। দু'চোখ ভরে কেবল রঙ দেখতে চাই।

বাবার চোখের সামনে সব কিছুই কতখানি বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই কথাটিতেই বোঝা গিয়েছিল! নীরা জানত, সেই বিবর্ণতা বাবার চোখের না, ভিতরের। একলা মীরা—না, শুধু মীরা নয়, তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, বাবার ভিতরের রঙ অনেকখানি শুষে নিয়েছিল। নীরা রঙীন হয়ে উঠলেও সেই রঙ আর পুরোপুরি ফিরে আসবে না। তবু নীরা রঙীন হয়েছিল। তবে সেটা শাড়ি জামাতেই। চোখে, ঠোঁটে, শরীরের আর কোথাও প্রলেপ লাগাতে পারেনি।

কিন্তু আজকের দিনটিতে তাও সম্ভব না। আজ নীরা রঙীন শাড়ি জামা পরেনি। পরতে পারেনি। বছরের এই দিনটিতে আর পরতেও পারে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীরা নিজেকে একবার দেখল। কালো পাড়ের একটি তাঁতের শাড়ি পরেছে। তথাপি যেন নিজেকে বড় উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। আটাশ বছরের নীরা। এখনো নিজের দিকে তাকালে নিজেই কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে। অথচ ওর এই রূপ আর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু করার নেই। ব্যথা আর গাম্ভীর্যে ও যেন থমথম করছে। কিন্তু প্রকৃতি ওকে দু'হাত ভরে এত দিয়েছে, সেটাকে কোন রকমেই আড়াল করে রাখা যায় না। সেই প্রকৃতি ওর বাবা মায়ের রক্তস্রোতের প্রবাহ দিয়ে, ওকে ভরিয়ে দিয়েছে। মীরাকেও তা-ই দিয়েছিল। বাবা প্রায় গর্ব করে বলতেন, দু'পাশে দুই মেয়ে নিয়ে চলে যাব। যেখান দিয়ে যাব সেখানে দ্যুতি ছড়িয়ে থাকবে। মেয়েদের রূপ নিয়ে বাবার ভারী অহংকার। বাবার অহংকারের উৎসটা বাইরে থেকেও এসেছে। মধুসূদন রায়ের দুই মেয়ের রূপ নিয়ে সকলের মুখে এক কথা।

দরজায় শব্দ হলো। নীরা আয়নার কাছ থেকে সরে এসে দরজা খুলে দিল। কণা দাঁড়িয়ে আছে। নীরা বলল, তুমি ফুল আর মালা একটা রেকাবিতে করে মায়ের ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। বাবা কি করছেন জানো?

কণা বলল, বাবা চান সেরে পোশাক পরে বসে আছেন।

নীরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আজকের দিনটা বাবার মনে আছে তো? না

boiRboi.net

থাকলেও নীরা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় না। বাবা যদি ভুলে থাকতে পারেন সেটাই ভাল। অন্যান্য দিনও বাবা মোটামুটি আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকেন। নীরা তৈরি হয়ে বাবাকে নিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে। সেখানে বসেই সকালবেলার খাবারের সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ পড়া, খবরের বিষয়ে কিছু আলোচনা কথাবার্তা হয়। তার মধ্যে এসে যোগ দেন ব্রজকিশোর—বোসকাকা। সেটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তিনি রোজ আসেন। খাবার খান বা না খান একটু চা বা কফি নিয়ে বসেন। রাজনীতির আলোচনাটাই বেশি হয়। না হয়ে উপায় নেই। এখন প্রতিদিনই রাজনৈতিক সংকট বাড়াবাড়ির দিকে।

নীরা মধুসূদনের ঘরে এসে দেখল, অফিসের পোশাক পরে তিনি একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখলেই বোঝা যায়, দৃষ্টি তাঁর অন্যমনস্ক। কি এক গভীর ভাবনায় যেন ডুবে আছেন। নীরা ঘরে ঢুকতে ওর দিকে ফিরে তাকালেন। নীরা জিজ্ঞেস করল, তুমি তৈরি হয়ে গেছ বাবা?

মধুসূদনের দৃষ্টির অন্যমনস্কতা ঘুচল না। বললেন, হ্যাঁ মা, তৈরি হয়েই আছি। তোমার হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ বাবা।

—তাহলে উঠি, চল।

মধুসূদন উঠে দাঁড়ালেন। নীরা লক্ষ্য করে দেখল, বাবার চোখে এখনো সেই অন্যমনস্কতা। তিনি এগিয়ে এসে নীরার কাঁধে একটি হাত রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, এখন আমরা তোমার মায়ের ঘরে যাব তো।

কথাটা শুনেই নীরার বুকে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ঝিলিক খেলে গেল। নীরা কি ভুলই না ভেবেছিল। বাবা কখনো এই দিনটিকে ভুলে থাকতে পারেন? তাঁর বুকে শুধু দাগ লেগে নেই, সারা বছর এই দিনটির জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁর ভাববিহ্বল অন্যমনস্কতা আর কিছুই না। বাবা মীরার কথাই ভাবছিলেন। ও তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, বাবা, আমরা এখন মায়ের ঘরে যাব।

—চল।

নীরাকে তিনি ছাড়লেন না। ওর কাঁধে হাত রেখে গায়ের কাছে জড়িয়ে নিয়ে চললেন। মায়ের ঘরের দরজার সামনে এসে দেখা গেল, কণা ফুল আর মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা তার হাত থেকে রেকাবি তুলে নিল। ভেজানো দরজা ঠেলে বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকল। দেওয়ালের একদিকে নিচু চৌকির ওপরে পাশাপাশি দুটি বড় ফটো। একটি মায়ের আর একটি মীরার। এটা বাবারই নির্দেশ ছিল। মীরার ছবি মায়ের পাশে, এই ঘরে থাকবে।

মায়ের মৃত্যুর পরে এঘরে আর কেউ থাকেনিনি। মায়ের খাট বিছানা আলমারি, ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসপত্র, যা যেখানে যেমন ছিল তেমনিই আছে। কোথাও কিছু সরানো হয়নি। এ ঘর প্রতিদিনই ঝাড়মোছ করে পরিষ্কার রাখা হয়। তথাপি ব্যবহারের অভাবে এই নির্জন একাকী ঘরটিতে কেমন একটা পুরানো ছাপ পড়েছে।

নীরা বাবার সঙ্গে ফটোর সামনে এসে দাঁড়াল। কেউ কোন কথা বলল না।

boiRboi.net

প্রায় দু'মিনিট কাটবার পরে মধুসূদনের যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। বললেন, হ্যাঁ, যা করবার কর, আমি তোমার মায়ের খাটে একটু বসি।

তিনি সরে গিয়ে খাটে বসলেন। নীরা এগিয়ে গিয়ে মীরার ফটোতে মালা পরিয়ে দিল। দুটো ফটোরই নিচে কিছু ফুল জড়ো করে রাখল। ধূপদানিতে ধূপকাঠি সাজানো ছিল। পাশেই দেশলাই রয়েছে। নীরা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল। আর কিছুই করার নেই। এই দিনটির জন্য আর কোন আড়ম্বরের ব্যবস্থাই নেই। মধুসূদনও চাননি। নীরাও চায়নি। এই দিনটিকে এই ঘরের মধ্যেই সীমাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। স্মৃতিচারণের জন্য বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। একজন তার কন্যাকে, আর একজন তার বোনকে, এভাবেই স্মরণ করতে চেয়েছে। তাও দিনের বাকি সময়ের মধ্যে কোন অনিয়ম সৃষ্টি করে নয়। বাকি সারাদিন অন্যান্য দিনের মতোই কাজে-কর্মে অতিবাহিত হয়।

নীরা সরে এসে বাবার কাছে দাঁড়াল।

মধুসূদন বললেন, বস্ নীরু।

নীরা তাঁর পাশে বসল। নীরা এখন মনে করতে পারে না মীরার এই ফটোটা কে তুলেছিল। এনলার্জ করে এখন ফটোটা অনেক বড় করা হয়েছে। দু'দিকে চুল খোলা, ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসির আভাস। আয়ত চোখ মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, নীরার মনে হচ্ছে যেন ওর দিকেই মীরা তাকিয়ে আছে। এমন ছবি মীরার কম আছে। চোখের কটাক্ষে হাসির ঝিলিকে ঝলকানো ছাড়া মীরার ফটোই উঠত না। মীরা যে সব সময়ে হাসিতে ঝলকিয়ে থাকত। ওর চোখের কালো তারার দিকে তাকালেই মনে হতো, বাঁধভাঙা হাসি সেখানে থমকে রয়েছে।

মধুসূদন বললেন, এ মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ ভাবতে পারে, এ মেয়ে পাপের কিছু জানত।

নীরা একথার কোন জবাব দিল না। মধুসূদন জবাবের প্রত্যাশাও করেননি। তিনি নিজের মনেই বলছিলেন। আবার নিজের মনেই বললেন, পাপের কিছুই জানত না। অবুঝ শিশু যেমন খেলতে খেলতে সাপের মুখে গিয়ে পড়ে, তেমনি পড়েছিল।

নীরার বুকের মধ্যে যেন সহসা অন্ধকার ঘিরে এলো। অন্ধকারের ছায়া ওর মুখে ফুটে উঠল। মধুসূদন নীরার পিঠে হাত রাখলেন,—কিছুই জানতে দিল না। পাপ পাপ করে সব কিছু ছেড়ে চলে গেল। ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা বোধ বুদ্ধি ছিল। মাথাটাই খারাপ করে ফেলেছিল। আমাদের কথা ভুলে গিয়েছিল, আমরা বা ওর···।

মধুসূদনের স্বর বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর কথা শুনতে শুনতে নীরার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। গলার কাছে যেন কিছু ঠেলে আসতে চাইছে। ও ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইল। কিন্তু চোখ শুকনো রাখতে পারল না। মীরার ছবিটা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল।

দুজনের কারোর মুখেই খানিকক্ষণ কথা শোনা গেল না। মধুসূদন-এর চোখে জল নেই, কিন্তু তার ভিতরে ঝরছে, বোঝা যায়। বাইরের থেকে নিজেকে স্থির আর

boiRboi.net

শান্ত রাখতে চাইছেন।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার তাঁর গলার স্বর শোনা গেল, মীরা বেঁচে থাকলে এখন কত বছর বয়স হতো ওর ?

নীরা কেশে, গলা পরিষ্কার করে বলল, পঁচিশ।

মধুসূদন উচ্চারণ করলেন, পঁচিশ !

তারপরে তাঁর যেন খেয়াল হলো, নীরা কাঁদছে। ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কাঁদিসনে নীরু। কেবল জীবন মরণ বলে বলছি না, এখন মনে হয়, সংসারের অনেক কিছুই মানুষের নিজের হাতে নেই।

নীরা এতক্ষণে কথা বলল, তা জেনেও মন মানতে চায় না। মীরার সামনে এসে দাঁড়ালে সে কথা আরো বেশি করে মনে হয়।

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বললেন, তা ঠিক। যা মানুষের হাতে নেই, সেই পরিণতির জন্যই তাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

একটু থেমে আবার বললেন, তোর মা আগে গিয়েছিল, তা-ই এসবের কিছুই সে জানল না। কিন্তু এসব কথা থাক। তোর তো মনে আছে, মীরু আমাদের ছেলেবেলায় খুবই দুষ্টু ছিল, তাই না ?

নীরা বলল, কেবল ছেলেবেলায় কেন বাবা। বড় হয়েও দুষ্টু কম ছিল নাকি ? কাকে কখন কি বলবে, কার পিছনে লাগবে, সেই ভেবে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। আর একবার যদি কারো সঙ্গে একটু তর্ক লাগাতে পারত, তা হলে তো কথাই ছিল না। ওর কথার তোড়েই সবাই ভেগে যেত।

মধুসূদন যোগ করলেন, হাসির তোড়েও। কথা হাসি, কোনটাতেই ওর সঙ্গে পারবার যো ছিল না। অথচ বোকা ছিল না মোটেই। আমি ওর কথা শুনলে অবাক হয়ে ভাবতাম, এত কথা জানে কি করে, ভাবে কি করে। বলতে বলতে হঠাৎ যেন একটু হেসে উঠলেন। বললেন, সেই কি বলে, আজকাল সব ছেলেমেয়েরাই নাচে। তোকে অবিশ্যি কোনদিন নাচতে দেখিনি। কি নাচ রে সেটা ?

নীরার ঠোঁটেও যেন একটু হাসির আভাস দেখা দিল। বলল, তুমি বোধ হয় টুইস্টের কথা বলছ ?

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। সেই একবার মীরারই জন্মদিনে, ওর বন্ধুরা সকলেই নাচল। মীরাও নাচল। সে নাচ দেখে তো আমি হেসেই বাঁচি না। ওটাকে যে আবার নাচ বলে আমি তা-ই বুঝতে পারিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, আমার সামনে একদল ছেলেমেয়ে শরীরের অদ্ভুত বিকট অঙ্গভঙ্গী করছে। পরে সে কথা বলেছিলাম বলে আমার সঙ্গে কি তর্ক। আমাকে বুঝিয়ে ছেড়েছিল ওটা একটা ভাল নাচ এবং কষ্ট করে শিখতে হয়।

নীরার ঠোঁটের হাসি যেন আর একটু স্পষ্ট হলো বাবার কথা শুনতে শুনতে। মীরা সত্যি খুব ভাল নাচতে পারত। কেবল টুইস্ট নয়, পাশ্চাত্য যে কোন নাচেই মীরার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নীরাও নাচতে জানে। কিন্তু মীরার মতো না। বলল, ওর নাচ দেখে সবাই প্রশংসা করত।

boiRboi.net

মধুসূদন বললেন, একটু পাগলীও ছিল আমার এই মেয়েটা। তোকে তো

কোনদিন ওরকম নাচতে দেখিনি। তুই বুঝি শিখিসনি?

নীরা যেন লজ্জা পেল। বলল, একটু একটু শিখেছিলাম।

মধুসূদন বললেন, তোকে দেখে ঠিক তা মনে হয় না। মীরার মতন একটু পাগলী না হলে ও সব যেন ঠিক মানায় না।

নীরা বলল, পাগলী না বাবা, মীরা ছিল প্রাণবন্ত।

—তা ঠিক। একেবারে টগবগে মেয়ে। অথচ—

মধুসূদন চুপ করে গেলেন। নীরা জানে বাবা কি বলতে চাইছিলেন, অথচ সেই মীরার মতো মেয়েকে মাত্র একুশে পড়তে না পড়তেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হলো।

নীরা বলল, আসলে এত ছেলেমানুষ ছিল, ভীষণ ভয় পেয়েছিল।

মধুসূদন বললেন, ঠিক বলেছিস, ভয় পেয়েছিল। ভয় পেয়েছিল, লজ্জাও পেয়েছিল। তাই মুখ খুলতে পারেনি। অথচ একবার যদি মুখ খুলতে পারত। আমি তো জানি, তার লজ্জা বা ভয় পাবার কিছুই ছিল না।

নীরা বলল, সে কথা আমরা জানি বাবা, মীরা জানত না। তুমি ঠিকই বলেছ, ওর মাথার ঠিক ছিল না।

মধুসূদন ঘাড় নাড়লেন। মীরার ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরে হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, অথচ নীরু, আমরা তো কারো ক্ষতি করিনি।

নীরার বুকে কথাটা যেন শেলের মতো বিঁধল। কারোর বলতে, বাবা কার কথা বলতে চাইছেন, নীরা তা জানে। কথাটা ওর বুকে শুধু বিঁধল না, মুখে যেন কালি লেপে গেল। অথচ তার কোন কারণ নেই। মীরার আত্মহত্যার মধ্যে ওর কোন পাপ নেই। মধুসূদনও নিশ্চয় সে কথা বলতে চাননি। তবু মনটা কেমন অতর্কিতে কালো হয়ে ওঠে। মীরার শেষ চিঠিটা কেবল চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

মধুসূদন নীরাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে যেন নিজের মনেই বললেন, কেবল যে আমার মীরা গেছে তা-ই না। আরো অনেক ক্ষতি হয়েছে।

নীরা বুঝতে পারছে, শেষের কথাটা ওর উদ্দেশ্যেই। নীরার বলতে ইচ্ছা করল, ওর কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেনি। কিন্তু বলল না। দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে নীরা বলল, চল বাবা, এবার উঠি।

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ চল।

নীরা মধুসূদনকে নিয়ে বাইরে এলো। নিজের হাতেই দরজাটা টেনে দিল। কণা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। নীরা কোন কথা না বলে বাবার সঙ্গে খাবার ঘরে এলো। ব্রজকিশোর আগে থেকেই এসে বসেছিলেন। খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন।

মধুসূদন বললেন, এসে গেছ?

ব্রজকিশোর কাগজ সরিয়ে রেখে বললেন, এই একটু আগেই এলাম।

মধুসূদন চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আজ একটু নীরুর মায়ের ঘরে গিয়ে বসেছিলাম। মীরার আজ জন্মদিন।

boiRboi.net

ব্রজকিশোর কেবল উচ্চারণ করলেন, ও।

বেয়ারা নীরার দিকে তাকিয়ে ছিল অনুমতির অপেক্ষায়। নীরা তাকে খাবার পরিবেশন করতে বলল। খাবার পরিবেশিত হলো। কিন্তু আজ সকালবেলার খাবারের টেবিলের আসর জমল না। সকলেই প্রায় চুপচাপ। সামান্য দু-একটা কথাবার্তা হলো। খাবারের শেষে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ টেনে নিলেন সবাই। কোন আলোচনা হলো না। এক সময়ে সবাই কাগজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। অফিসে বেরোবার সময় হয়েছে।

●

অফিসে এসে নীরা ওর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে গিয়ে বসল। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো কাজে কোন উৎসাহ বোধ করল না। এই ঘরে এই টেবিলের কাগজপত্রে ওর মন নেই। ওর মন আজ অন্য জগতে, অন্যখানে। সে কথা কারোকে বলা যাবে না, অথচ কাজে ওর কোন উৎসাহ না থাকলেও, যাদের ওপরে কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে, তারা সবাই একে একে আসতে আরম্ভ করল। নীরা বুঝতে পারছে, তাদের চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। মিস রায়কে তারা এরকম বিষণ্ণ চুপচাপ নিরুৎসাহ কোনদিন দেখেনি। গত বছর ঠিক এই দিনটিতে দেখে থাকলেও, সে কথা তাদের মনে নেই।

নীরা সবাইকে জানিয়ে দিল, আজ ও একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকবে। কেউ যেন ওর ঘরে না আসে। তারপরে ওকে ঘিরে ধরল অন্য এক জগৎ। পিছনে ফেলে আসা আর এক জগৎ। এটা ওর স্মৃতিচারণ নয়। পিছনের সেই দিনগুলো আজ জোর করে ওর মনের জগতে ঢুকছে। সেই দিনগুলো ওকে আজ রেহাই দেবে না। ভুলে থাকতে চাওয়া স্মৃতিতে আঘাত করে, খুঁচিয়ে, ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইছে।

প্রথমেই ওর চোখের সামনে যে মানুষটি ভেসে উঠছে, সে একজন যুবক। শুধু একজন যুবক মাত্র না। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, কিন্তু শিশুর মতো কোমল, চোখের দৃষ্টি স্বপ্নিল। একদা মনে হয়েছিল দেবশিশুর মতো সরল কোমল নিষ্পাপ। সে যে পাপী, আজও সে কথা মনে হয় না। সে যে জেনে শুনে কোন পাপ করতে পারে, তাও প্রমাণিত হয়নি। শিশু যেমন তার ন্যায় অন্যায় বোঝে না, অনেকটা সেইরকম। সে কি করেছে যেন সে নিজেই জানে না। নীরা যদি তাকে ছেলেবেলা থেকে জানত, মিশতে পারত, তাহলে হয়তো বুঝতে পারত। অল্প জলে খেলতে খেলতে গভীর জলে গিয়ে পড়ত না। সাবধান হতে পারত।

কিন্তু সে এসেছিল আচমকা। নীরা তখন তেইশটি বর্ষার বর্ষণে ভরপুর, জোয়ার ওর কূলে কূলে, কানায় কানায় ছাপাছাপি। যদিও, বাইরে তা নিতান্তই শান্ত। ভিতরেও ওর নিজের ব্যক্তিত্ব বিবেচনা বুদ্ধি কম ছিল না। ওর চারপাশে এখন অনেক ভিড়, উৎসবের মেলার মতো। সকলেই সেই নিস্তরঙ্গ ভরা কূলে বাতাস তুলতে চেয়েছিল, ঢেউ জাগাতে চেয়েছিল। পারেনি। অথচ নীরা নিরুৎসবের অন্ধকারে মুখ গুঁজে থাকেনি। সকলের সঙ্গে সমান তালে চলেছে, মিশেছে হেসেছে খেলেছে গেয়েছে। উৎসব থেকে সরে যায়নি।

সে উৎসব ওর ভিতর দুয়ারটাকে খুলতে পারেনি। একজন এসে খুলে দিয়েছিল। কেমন করে খুলে দিয়েছিল, আজ আর নীরা যেন তা ভাল করে বুঝতে পারে না।

boiRboi.net

ভাবলে, যন্ত্রণার থেকেও একটা মর্মাহত অসহায় বোবা বোধ জেগে ওঠে। একটা বিস্ময় আর ধিক্কার ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এখন কেবল এইটুকু মনে আছে, দুটি স্বপ্নিল চোখ যেন প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। যে প্রদীপ দুটি নীরার সামনে এসে ওর রূপের আরতি করেছিল। যে প্রদীপের আলোয় ওর গুণের স্তুতি ঝকঝকিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে রকম তো অনেক প্রদীপের আলোই ফুটেছিল। নীরার ভিতর দুয়ারের খিল তো খুলে যায়নি। তাই সেই দৃষ্টির মধ্যে আরো কিছু ছিল। শিশুর মধ্যে যে কোমলতা থাকে, একটি অজ্ঞান অসহায়তা থাকে, সেইরকম কিছু ছিল। যে আপনা থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, যাকে বুদ্ধি আর বিবেচনা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সে তখন সদ্য ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। যেন সারা পৃথিবীতে কিছু না পেয়ে নীরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর নীরার মধ্যেই সে তার স্বপ্নকে দেখতে পেয়েছিল। সে কথা সে অনেকবার পাখির শিস্ দেবার মতো নীরার কানে গুঞ্জন করেছে। সে এসেছিল তার বাবার সঙ্গে। তার বাবা নামকরা ব্যারিস্টার। তার চেয়ে, ব্যারিস্টারের সুনাম দুর্নাম দুই-ই বেশি ছিল রাজনীতিতে। ব্যারিস্টার আর. এল মুখার্জী মধুসূদন রায়ের বন্ধু। তাঁর ছেলে দীপক মুখার্জী, দীপক, যে নাম শেষবার উচ্চারিত হয়েছিল মীরার মুখে। শেষবার, মীরার মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে আকণ্ঠ বিষের জ্বালায় যখন নীরার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন সেই নাম উচ্চারিত হয়েছিল। সে নাম আর কখনো সশব্দে উচ্চারিত হয়নি।

পাঁচ বছর আগে দীপক কদিন এসেছিল, সেই দিন প্রথম দর্শনেই নীরার স্তব্ধ কূলে সহসা কোন্ দিক থেকে বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঢেউ লেগেছিল। দীপকের মুগ্ধতা ছিল এত গভীর আত্মহারা, যে গুরুজনদের কথাও তার মনে ছিল না। তার চোখের প্রদীপে আরতি দেখা গিয়েছিল। নীরা ওর বুকে ঢেউ নিয়ে সরে এসেছিল। মনে হয়েছিল, এ কি অবুঝ শিশু! নীরার সবই মনে আছে, প্রথম দিনের এক ঘণ্টা আলাপের পরেই একটু নিভৃতে পেয়ে দীপক বলেছিল, মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

নীরা একটু বক্র হেসে, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি কথাটা বুঝে ফেললেন কেমন করে?

দীপক সেই বিদ্রূপ গায়ে মাখেনি। তার স্বপ্নের ঘোর একটুও কাটেনি। বলেছিল, তা বলতে পারব না। তবে এটা বোঝাবুঝির ব্যাপার না, যা সত্যি দেখতে পেলাম তাই বললাম। আপনাকে যদি আগে দেখতে পেতাম, তা হলে আমি বাইরে যেতাম না।

নীরা বিদ্রূপ করেই হেসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, বিদেশে আপনি কাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন?

দীপক বলেছিল, বিশেষ কারোকেই না। কিন্তু মন যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কারোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

নীরা বলেছিল, আপনার বাবা বলছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল, আপনি বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করবেন।

boiRboi.net

—কিন্তু আমি বাবাকে বলেছিলাম, পড়াশোনা করার জন্য আমি বিদেশে যাচ্ছি না। বিদেশকে আমি দেখতে যাচ্ছি।

নীরা অবিশ্বাসের হাসি হেসে আবার বলেছিল, কিন্তু আমার মধ্যে হঠাৎ এমন কী দেখতে পেলেন যে এরকম করে বলছেন।

দীপক তার দুই চোখের উজ্জ্বল প্রদীপ মেলে ধরে বলেছিল, তা বলতে পারব না আমার এই যুক্তি ব্যাখ্যাহীন কথার জন্য। আমি নিজেই হেল্‌পলেস্‌ ফীল করছি। আপনাকে দেখে আমার যা মনে হলো তা-ই বললাম। মনে হচ্ছে, এমন একজনকে আমি আর কখনো দেখিনি, অথচ দেখতে চেয়েছিলাম, দেখতে পেলাম।

লোকটা মিথ্যুক, না ভাবুক, না শিশু নীরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু তার সেই স্বপ্নমুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি। ওর মুখে রঙ লেগেছিল। ওর বুকে ঢেউ লেগেছিল। শুধু ঢেউ না, তার সঙ্গে স্রোতের তীব্র টান ছিল। ওকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। যদিও মেয়েদের প্রকৃতিগত কারণেই, নিজের অবস্থাটা ও দীপককে বুঝতে দেয়নি। ব্যাপারটা যেন একটা আবেগপ্রবণ ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু না, এবং নীরা সেটাকে হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না. এইরকম একটা ভাব করেছিল। ঠোঁটের কোণে চোখের ঝিলিকে অবিশ্বাস আর বিদ্রূপের আভাস ফুটিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু শিশু যেমন কিছুই বোঝে না, সে শুধু তার ইচ্ছা আর আবদার নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে, দীপকের অবস্থাটা ছিল সেইরকম। সে বলেছিল. দেখা যখন পেলাম. প্রতিদিন দর্শনের অনুমতিটা যেন পাই।

নীরা একই ভঙ্গিতে হেসে বলেছিল, রইল সেই অনুমতি। আপনি বাবার বন্ধুর ছেলে। যেদিন খুশি আসবেন।

দীপক সেই কথার ধার কাছ দিয়ে যায়নি। সে বিদেশ ঘোরা ছেলে, বিলিতিয়ানার পরিবেশে মানুষ। তথাপি তথাকথিত বিলিতি চাল রক্ষা করে কথা বলেনি। বরং বলতে গেলে অনেকটা বাচালের মতোই বলেছিল, বাবার বন্ধুর ছেলে হিসাবে যেদিন খুশি আসবার অনুমতি আপনার কাছে চাইনি। আপনার কাছে অনুমতি চেয়েছি আপনার কাছে আসব বলে। যে অনুমতিটা অন্য কারো কাছ থেকে পেলে হবে না, এবং সেটা প্রতিদিনের জন্য।

সোজা এবং সরল কথা, তার মধ্যে কোন দ্ব্যর্থতা ছিল না। সেটাও দীপকের একটা বৈশিষ্ট্য। কথা বাড়ালে বাড়ানো যেত। নীরা তা বাড়ায়নি। যেন মজা পেয়েছে দীপকের কথা শুনে, এমনি একটা ভঙ্গিতে হেসেছিল, বেশ তো, আসবেন।

দীপক বলেছিল. এই কথাটুকুই যথেষ্ট। হাতে পেয়ে গেলাম যেন স্বর্গের চাবিকাঠি। কৃতজ্ঞতার থেকে বেশি, খুশিতে আমার মনটা ভরে উঠছে

নীরা ভেবেছিল দীপক বুঝি ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠবে। কিন্তু হাততালি দেয়নি। তার চোখের প্রদীপকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল। মুগ্ধ আবেগে জ্বলজ্বল করছিল তার মুখ। স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাকিয়েছিল নীরার দিকে। যে তাকানো কোন ব্যক্তি, পরিবেশ, এবং কিছুই মানে না।

তারপর থেকে দীপক প্রত্যহ আসতে আরম্ভ করেছিল। নীরা নিজেও খেয়াল

boiRboi.net

করেনি, সেই প্রাত্যহিকতার স্রোতে ও কবে ভেসে গিয়েছিল। মনে করতে পারে না, সেই প্রত্যহের মধ্যে কবে থেকে ওর ভিতরেও একটা অপেক্ষা জেগে উঠেছিল। একজনের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করা, ওর জীবনে সেই প্রথম আর নতুন। অপেক্ষা, কখন সেই বিশেষ গাড়িটির শব্দ শোনা যাবে, পায়ের শব্দ গলার স্বর বেজে উঠবে !

অল্পদিনের মধ্যেই কত অনায়াসে দীপক আপনি থেকে 'তুমি'-তে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নীরার মনে আছে দীপকের সেই কথাগুলো, আমি আর 'আপনি' বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। বেড়াটা না টপকালে আর চলছে না।

দীপকের সেটাই ছিল অনুমতি চাওয়ার ধরন। নীরাকে মুখ ফুটে অনুমতি দিতে হয়নি। দীপক নিজে থেকেই 'তুমি' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। নীরাও যে কবে থেকে সেই সম্বোধনে ডেকেছিল, মনে করতে পারে না। অথচ, অনেক আগেই ওর মনে হয়েছিল, দীপকের মতো ছেলেকে আপনি করে বলা যায় না। তবু নিজে আগে থেকে বলতে পারেনি।

যতই দিন যাচ্ছিল, ততই বোঝা যাচ্ছিল, দীপকের সঙ্গে নীরার অমিলটাই বেশি। বেশির ভাগ সময়েই মনে হতো, দীপক যেন অনেকটা আবেগপ্রবণ প্লে-বয় টাইপ। অজস্র স্বপ্নমাখা প্রেমের কথায় কথায় সে প্রগল্ভ। সেজন্য তার স্থান কালের দরকার হয় না। কারো দিকে দৃক্‌পাত করার প্রয়োজন হয় না। সে আবেগে ভরে আছে, আবেশে ডুবে আছে। কিন্তু সে একলা থাকতে পারে না, চলতে পারে না। একলা আপন মনে গভীর ভাবে কিছু ভাবতে পারে না। একজনকে—নীরাকে নিয়ে সে মেতে থাকতে চায়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর সঙ্গে কেবল আকুতি ভরা মুগ্ধ প্রাণের কথায় বাজতে চায়। নীরাকে নিয়ে ছুটে যায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কখনো ছুটিয়ে নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের ধারে। কখনো নদীর তীরে, মাঠের মাঝখানে। খোলা আকাশের তলায় নীরাকে বসিয়ে বলে, এখানে বসে তোমাকে একটু দেখি। খোলা আকাশের নিচে এই প্রকৃতি কত সুন্দর, তা হলেই আমি সেটা বুঝতে পারব।

দীপকের এরকম কথা শুনলে নীরা বলত, প্রকৃতি তার নিজের গুণেই সুন্দর। প্রকৃতিকে দেখবার জন্য অন্য কারো দরকার হয় না।

দীপক বলত, আমার হয়। তুমি আছ, তাই আমার কাছে প্রকৃতি আছে। এই আকাশ গাছপালা সমুদ্র নদী মাঠ সব কিছুই তোমাকে ঘিরে। তুমি ছাড়া আর সবই নীরস। এই রূপের মাঝে তুমি আমার অরূপ। আমার মনে আর মস্তিষ্কে তোমার অধিষ্ঠান। সেই জন্যই আমি প্রকৃতিকে দেখতে পাই।

এরকম বলতে বলতেই সে মুখ বাড়িয়ে নিয়ে আসত মুখের দিকে। কিংবা হাতটা টেনে নিয়ে ভরিয়ে দিত চুমোয় চুমোয়। এমনও হয়েছে, দীপক ওর পাগলা আবেগের বশে মুখ নামিয়ে নিয়ে এসেছে নীরার পায়ের ওপর। বলত, এমন সুন্দর দুটি পা আমি কখনো দেখিনি।

নীরা লজ্জায় পা টেনে নিত। কিন্তু একটা আবেগে আবেশে ওর ভিতরটা যেন কেমন অবশ হয়ে থাকত। ক্ষুধাকাতর শিশুর মতো, দীপক দু'হাত যেন সব সময়েই মায়ের বুকে বাড়িয়ে ছিল। গভীর আর তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে যেন সব সময়েই

boiRboi.net

টলমল করত।

দীপক যে কেবল বাইরের প্রকৃতির বুকেই ওকে টেনে নিয়ে ছুটে যেত তা না। শহরের হোটেল রেস্তোরাঁয় ক্লাবে, সবখানেই ছুটে বেড়াত। নীরা ছুটে বেড়িয়ে দাপাদাপি করার মেয়ে না। অথচ, দীপকের টানে ভেসে যেত, থাকতে পারত না। নিরলস প্রেম ছাড়াও ওর জীবনে সমাজ সংসার পরিবার কাজ, সব কিছুর ভাবনাই ছিল। জগতের বহুতর বিষয়ে ওর মনে নানা তর্ক, নানান কৌতূহল। হৃদয়সর্বস্ব আবেগপ্রবণ মেয়ে ও না, স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকে মেপে নেওয়া ওর চরিত্রের মধ্যে আছে। প্রেম ছাড়াও জগৎ-সংসারের আরো অনেক বিষয়ে দীপকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করত। দীপকের তাতে নিতান্ত অনীহা। নীরা অনেক দিন বলেছে, দীপক, সংসারে তুমি অচল।

দীপক বলেছে, সেখানে আমি সচল হতে চাই না। আমি কেবল হৃদয়ের বীণায় বাজতে চাই।

নীরার মনে হতো, ওসব কথা শুনতে ভাল, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে অর্থহীন। ও বলেছে, হৃদয়ের বীণাটা সংসারকে বাদ দিয়ে এমন কথা তোমাকে কে বলেছে?

দীপক বলেছে, কেউ বলেনি। হৃদয়-বীণাটা যদি সংসারের মধ্যেই থাকে তা হলে সেটার দায়িত্ব তুমিই নিও। কিন্তু আমি যেন বাজতে পারি। আমাকে অচল করে দিও না।

দীপকের কথা শুনে নীরা মনে মনে হেসেছিল। বিদ্রূপ করে নয়। সে হাসির মধ্যে স্নেহ ছিল এবং একটু সুখও ছিল। দীপক সংসারে অচল হলেও নীরার মধ্যেই জেগে থাকতে চেয়েছিল। মনে করেছিল, দীপক এক রকম অসহায় দামাল শিশু। এরকম পুরুষকে মেয়েদের নিজেদের চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দীপক ওর কাছে শিশুর মতোই আত্মসমর্পণ করেছিল। সব কিছুর ঊর্ধ্বে নীরা দীপককে অবিশ্বাস করেনি। তাকে দুর্বলচরিত্র সম্ভোগকাতর একটি যুবক বলে ভাবেনি।

ভাবেনি বলেই, নীরার লক্ষ্যে পড়েনি, মীরার ঊনিশ বছরের দুরন্ত বসন্তে কবে আগুন লেগেছিল। যে আগুন দীপক লাগিয়েছিল। আবেগ আর উচ্ছ্বাসপ্রবণ মীরা, জীবনটা ওর কাছে ছিল ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গে খেলার মত। মীরার প্রাণের বেগ ছিল উত্তাল। বুদ্ধি বা চিন্তার গভীরতা তেমন ছিল না। হাসিখুশি, নিষ্পাপ, নির্ঝরের মত কলকলানো।

নীরা দেখেছিল, অনেক সময়েই দীপক মীরার সঙ্গে হাসিতে কথায় মেতে আছে। নীরা বাড়িতে না থাকলে ওরা দুজনে একত্র সময় কাটিয়েছে। নীরার মনে কখনো কোন সন্দেহ হয়নি। বরং মনে হয়েছে দুটিই সংসার অনভিজ্ঞ শিশু। শেষের দিকে মাঝে মাঝে নীরার মুখে চকিতে একটু সংশয়ের ছায়াপাত হয়েছে। তাও মীরার আচরণের জন্যে না, দীপকের আচরণে। নীরার প্রতি দীপকের অমনোযোগিতায়। নীরা বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও যখন দেখত দীপক মীরার কাছে থেকে সরে আসতে চাইছে না, নীরাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার থেকেও মীরার সঙ্গে গল্পে কথায় মশগুল, তখন ওর মনে ঈষৎ সংশয়ের ছায়াপাত ঘটেছে।

সংশয়ের থেকেও বলা ভাল, মনটা একটু বিষণ্ণ হতো। কিন্তু দীপক ওর কাছে

boiRboi.net

এলেই মনের ছায়া ফুৎকারে উড়ে যেত। বরং নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দিত। ভাবত, সরলচিত্ত দীপক কোন কিছুই ভেবে চিন্তে করে না। সবটাই তার ছেলেমানুষী আবেগে ভরা। কখনো কখনো এমনও হয়েছে, দীপক মীরাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে। নীরার মনে চকিতে একটু বিষণ্ণতার ছায়া খেলে গিয়েছে। দীপক ফিরে এসে নীরাকেই বলেছে তাদের বেড়ানোর গল্প। বলেছে, তোমার বোন মীরা হলো একটা প্রবল বন্যা, কল্লোলিনী। বন্যাও বটে। কেবল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক এক সময় ওকে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

নীরা হেসে বলেছে, তোমাদের দুজনে মিলেছে ভাল।

হ্যাঁ, তোমার ভাষায়, আমরা দুজনেই পাগল। কিন্তু দু'রকমের পাগল আমরা। আমার মতো পাগলকে সামলাতে তোমার দরকারই বেশি।

নীরা এ সব কথার মধ্যে কখনো সন্দেহের কিছু খুঁজে পায়নি। এমন কি, নীরার সঙ্গে মিলিয়ে যখন মীরার তুলনা করেছে, তখনো নীরার কিছু মনে হয়নি। মীরাকে স্নেহ করে, ভালবাসে, সেটাই স্বাভাবিক বলে জেনেছে। মীরাকে কে না ভালবাসত। কিন্তু দীপকের প্রমত্ত খেলা, খেলতে খেলতে কোন্ সর্বনাশের খাল কাটছিল, নীরা তা বুঝতে পারেনি। ও যে কাউকেই অবিশ্বাস করেনি। সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা স্বাভাবিক মেলামেশা উচ্ছ্বাস আর আনন্দ বলেই মনে করেছিল।

একেবারে শেষের দিকে, অদৃশ্য রন্ধ্রের ভিতরে সর্বনাশ যখন তার ষোল কলা পূর্ণ করেছে তখন দীপকের মধ্যে একটু যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। পরিবর্তন মীরার মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। দীপকের যাতায়াত কমে গিয়েছিল। নীরাকে গিয়ে তাকে খুঁজে আনতে হতো। তার কথার ফুলঝুরিতে বারুদের মশলা যেন কমে এসেছিল। মীরাকে ঘরের বাইরে কম বেরোতে দেখা যাচ্ছিল। কথা কম শোনা যাচ্ছিল, হাসি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীপককে মীরার কাছে ছুটতে দেখা যায়নি। মীরাকেও দীপকের কাছে আসতে দেখা যায়নি।

নীরার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। কোন কটু সন্দেহে না- একটা জিজ্ঞাসু কৌতূহলে। ও দীপককে জিজ্ঞেস করেছিল, মীরার সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেখছি না যে? তোমরা ঝগড়া করেছ নাকি?

দীপক বলেছিল, তা একরকম বলতে পারো। আমাকে বোধহয় ওর আর ভাল লাগছে না। মীরা কী বলছে?

ও বলছে ওর শরীর ভাল নেই। বেশির ভাগ সময় ঘরে থাকে। কোন কোন সময় অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে চলে যায়।

মীরা তাই বলেছিল, ওর শরীর ভাল নেই। দেখেও তা-ই মনে হয়েছিল। চোখের কোল বসা, মুখের রঙে সেই উজ্জ্বলতা নেই। শুকনো, অসুস্থতার ছাপ। নীরা জিজ্ঞেস করেছিল, কী অসুখ করেছে তোর?

মীরা বলেছিল, অসুখ কিছু না, শরীরটা ভাল নেই।

—সেটাও ডাক্তারকে বলা দরকার।

মীরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, ডাক্তারকে বলার কোন দরকার নেই। এমনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

boiRboi.net

নীরা আরো জিজ্ঞেস করেছিল, দীপকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি ?

মীরা অন্যদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না।

—তবে কথা বলিস না যে ?

—এমনি।

মীরা সরে গিয়েছিল। শেষের কিছুদিন দীপকের কথা জিজ্ঞেস করলে মীরা জবাব এড়িয়ে যেত, সরে যেত। দীপকও হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত। অথচ দীপক যাওয়া আসা ক্রমেই আরো কমিয়ে দিয়েছিল। কোন কটু সন্দেহ না করলেও নীরার মনে অস্বস্তি জমে উঠেছিল। অশান্তি বোধ করছিল। ওদের দুজনের মধ্যে একটা কিছু ঘটেছে, সে বিষয়ে নীরার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কী ঘটেছে, বুঝতে পারেনি। কটু নয়, একটাই যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ ওর মনে জেগেছিল, মীরা আর দীপক কি পরস্পরকে ভালবেসেছে ? কথাটা ভাবতে ওর বুকের শিরায় টান পড়েছিল, টনটনিয়ে উঠেছিল। ওদের আচরণ নীরাকে শুধু ভাবিয়ে তোলেনি, মনে মনে কেমন যেন একটা অসম্মান বোধ করেছিল। একজন ওর পরম স্নেহের বোন। আর একজন প্রেমিক। তারা যদি ওর কাছে নিজেদের গোপন করে চলে, মুখ ফুটে কিছু না বলে, তা হলে আত্মসম্মানে লাগে বৈকি। বিশেষ করে ওর মতো মেয়ের পক্ষে।

তা-ই একেবারে শেষের কয়েকটা দিন নীরা চুপ করে ছিল। মীরাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। দীপক না এলেও তাকে ডেকে আনতে যায়নি। এলেও জিজ্ঞেস করেনি, কেন সে আসেনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা উদ্বেগ ওকে অস্থির করে তুলছিল। বিশেষ করে, মীরার জন্যই ওর উদ্বেগ বেশি ছিল।

এখন নীরার মনে হয়, কেন ও চুপ করে ছিল। ওর চোখ ওকে এমন করে ফাঁকি দিয়েছিল কেমন করে। কেন ও সব স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কেন এত বিশ্বাস করেছিল। কেন ও মীরাকে চেপে ধরেনি। তা হলে শেষ সর্বনাশকে হয়তো ঠেকানো যেত।

কিন্তু মীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষ খেয়ে নীরার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারেনি। সারল্য আর বিশ্বাস ওর চোখের সামনে একটা পর্দা ঢেকে রেখেছিল। শুধু অবাক লাগে, ঘৃণায় মন পুড়ে যায়, যখন ভাবে, তারপরেও দীপক নীরার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে টেলিফোন করেছিল। নীরা শুধু একটা জবাব দিয়েই রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল, তোমার গলার স্বর শুনতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

দীপকের সঙ্গে সেই ওর শেষ কথা। ভাবতে ভাবতে নীরা ওর টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ল। চুল এলিয়ে পড়ল। টেবিলের কাঁচে নিজের মুখটাও দেখতে পেল ও। এই মুহূর্তে যেন জীবনের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি প্রবঞ্চনা অপমান আর শোক ওর মুখে নতুন করে ছায়া ফেলেছে। ঝড় নয়, ঝড়ের ছদ্মবেশে কিছু দমকা হাওয়ার বেগ কেমন করে ওর স্তব্ধ কুলে ঢেউ তুলেছিল। হায় নীরার হৃদয়—নীরার প্রেম।...

●

—নীরু !

ব্যগ্র স্বরের ডাক শুনে নীরা টেবিল থেকে মাথা তুলল। ওর ঘরের দরজা ঠেলে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজকিশোর। বললেন, শিগগির এসো, রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

boiRboi.net

—বাবা !

নীরা একবার উচ্চারণ করেই ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। ছুটে ব্রজকিশোরের পিছনে পিছনে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মধুসূদনকে ততক্ষণে ঘরের একপাশে ডানলোপিলোর ডিভানের ওপরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন ডিপার্টমেণ্টাল প্রধান ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন। তাঁর কোট খুলে নেওয়া হয়েছে। টাই আলগা করে দেওয়া হয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে, চোখ চেয়ে আছেন। মুখের বর্ণ লাল, থমথমে একটা ব্যথার অভিব্যক্তি যেন ফুটে রয়েছে।

ব্রজকিশোর নীরার কাছে মুখ নিয়ে বললেন, বোধহয় অ্যাটাক হয়েছে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। এখুনি এসে পড়বে।

নীরা মধুসূদনের কাছে এগিয়ে গেল। কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে, বাবার একটি হাত ধরল। আর একটা হাত বুকের কাছে আলতো করে ছোঁয়াল। মধুসূদনের গলায় শব্দ হলো, হুঁ হুঁ।

নীরা প্রায় চুপি চুপি স্বরে জিজ্ঞেস করল, কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

মধুসূদন অনেকটা গোঙানো স্বরে বললেন, বুকের কাছে।

নীরা মধুসূনের ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপা দিল, থাক বাবা, কথা বোলো না।

মধুসূদন নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। ঠোঁট নেড়ে উঠল। নীরার বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে এলো। জোর করে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইল, যেন কোন শব্দ বেরিয়ে না আসে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চোখের জল আটকে রাখতে চাইল। বলল, কিছু ভেবো না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শাড়ির আঁচল তুলে মধুসূদনের চোখের জল মুছিয়ে দিল। অথচ ওর নিজের ভিতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

এ সময়ে ডাক্তার এলেন। এসে এক নজরে মধুসূদনকে দেখেই তাঁর ব্যাগ খুললেন। প্রেসার মাপবার যন্ত্র বের করে কয়েক সেকেণ্ড নাড়ি দেখেই প্রেসার মাপলেন। একবার ব্রজকিশোরের দিকে দেখলেন। পর পর দুটো ইনজেকশন দিলেন দু'হাতে। সরে গিয়ে ব্রজকিশোরকে বললেন, স্ট্রোক হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান, না বাড়িতে ?

নীরা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, অসুবিধে না হলে বাড়িতেই নিয়ে যেতে চাই।

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, বাড়িতে যত ভাল ব্যবস্থাই থাকুক, হাসপাতালের তুলনায় কিছু অসুবিধে হবেই। ইমারজেন্সি কেস্।

নীরা ব্রজকিশোরের দিকে তাকাল। ব্রজকিশোর বললেন, তা হলে হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া যাক।

ডাক্তার বললেন, আমারও তাই ইচ্ছা। বেশি দেরি করার সময় নেই।

ব্রজকিশোর সরে গিয়ে টেলিফোন রিসিভার তুলে ডায়াল করতে লাগলেন।

নীরা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, কি রকম অবস্থা এখন ?

ডাক্তার বললেন, প্রেসার বেশ হাই। হার্টের অবস্থাও বেশ ভাল মনে হচ্ছে না।

boiRboi.net

হাসপাতালে গিয়েই ই. সি. জি. করাতে হবে, তা হলে হার্টের সঠিক অবস্থাটা বোঝা যাবে। এই কি ওঁর প্রথম স্ট্রোক ?

নীরা বলল, এটা দ্বিতীয় বার।

সকাল বেলা ভাল ভাবেই অফিসে এসেছিলেন ?

নীরার চোখে একটা ছায়া খেলে গেল। বলল, বাইরে থেকে ভালই মনে হয়েছিল। তবে মনের অবস্থা ভাল ছিল না।

ডাক্তার বললেন, কোনরকম ওরিজ অ্যাংজাইটিজ্ অথবা এক্সাইটমেণ্ট ?

না। আমার ছোট বোন তিন বছর আগে আত্মহত্যা করেছিল। আজ তার জন্মদিন ছিল।

ডাক্তার নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। এ সময়ে নীরাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষ এসে পড়লেন। মধুসূদনকে দেখলেন। যে ডাক্তার দেখেছেন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। সব শুনে তিনিও হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বললেন। ব্রজকিশোর জানালেন, পি জি-তেই নিয়ে যাওয়া যাক। আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য মধুসূদনকে যখন গাড়িতে তোলা হল, তখন তিনি প্রায় অচৈতন্য।

●

সাতদিন পরে মধুসূদন মারা গেলেন। অধিকাংশ সময় অক্সিজেন দিয়েই তাঁকে রাখা হয়েছিল। প্রথম দিকে কয়েকদিন তাঁর কখনো সখনো জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কথা বলতে পারেননি। ঘোলাটে চোখের স্থির তারায় নীরাকে খুঁজেছেন। নীরা কোন সময়েই প্রায় মধুসূদনের কাছ ছেড়ে যায়নি। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বারে বারেই ওর মনে হয়েছে, উনি কিছু বলতে চান। পারেননি, বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল চোখে জল জমে উঠেছিল। শেষের কয়েকদিন তাঁর আর জ্ঞান হয়নি।

নীরা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল, বাবার জ্ঞান আর ফিরে আসবে না। আসেনি। যখন তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল, নীরার প্রথমেই একটা কথা মনে হল, মীরার জন্মদিনের ঠিক সাতদিন পরে বাবা মারা গেলেন। আসলে এই মৃত্যু, সাতদিন আগে, সকালবেলাতেই মধুসূদনের ভিতরে ছায়া ফেলেছিল। সেই সকালে তা বোঝা যায়নি।

মৃতদেহ বাড়িতে আনা হল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিতরা উপস্থিত হল। যে যেখানে খবর পেয়েছে, সকলেই এসেছে। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর অফিস কারখানা ছুটি হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই প্রচুর লোক সমাগম হল। নীরাও সকলের সঙ্গে শ্মশানে গেল। কিন্তু নীরাকে শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে দেখল না কেউ।

নীরার ভিতরে অখণ্ড শূন্যতা। সেই শূন্যতায় এ মুহূর্তে কোন হাহাকার জাগল না। চোখের জলে ভাসিয়ে দিল না। কান্নায় উদ্বেল করল না। অনুভূতি যেন অবশ আর মৃত। এরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়েই শ্রাদ্ধাদি মিটে গেল।

কয়েক দিন পর, আস্তে আস্তে নীরার মনে হল, বাড়িতে বড় লোকজনের ভিড়। বড় কলরব। আস্তে আস্তে যেন চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল ও। দেখল, ওকে সব

boiRboi.net

সময়েই আত্মীয় স্বজন বা কেউ না কেউ ঘিরে আছে। তারা সবাই ওকে নানা পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশ দিচ্ছে, স্বার্থ এবং কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করতে চাইছে। এদের মধ্যে দীপকের বাবা ব্যারিস্টার আর এল মুখার্জিও আছেন। নীরার যেন নতুন করে মনে পড়ল, বাবার মৃত্যুর দিনও উনি এসেছিলেন।

এই সব ভিড়ের মধ্যে ব্রজকিশোর কাছে থেকেও দূরে দূরে রয়েছেন। কণা মেয়েটা প্রায় কাছেই আসতে পায় না। কবে থেকে এরকম ঘটছে, নীরা যেন মনেই করতে পারছে না। এ বাড়িতে যেন এক উৎসব চলছে, অন্য এক নাটক অভিনীত হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে এক ধরনের নিষ্ঠুর উপহাস বলে মনে হল।

এ কথা মনে হতেই, ব্রজকিশোরকে নীরা আলাদা ডেকে নিয়ে গেল মধুসূদনের ঘরে। বলল, বোসকাকা, আমি কোথাও যেতে চাই। অন্তত কিছুদিনের জন্য কোথাও ঘুরে আসতে চাই।

ব্রজকিশোর সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন, সে তো খুব ভাল কথা। আমারও তাই ইচ্ছা, তুমি কোথাও একটু ঘুরে এস। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি আর তোমার কাকীমাও যেতে পারি।

নীরা বলল, তাহলে তো খুব ভাল হয়। বাবা নেই এখন—

নীরা কথাটা শেষ করতে পারল না। হঠাৎ যেন ওর বুকের কাছে আটকে গেল, এবং মুহূর্তে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝরিয়ে কেঁদে উঠল। বাবা নেই, কথাটা ওর মুখ থেকে এই প্রথম উচ্চারিত হল, আর তা-ই যেন ওর শূন্যতার মধ্যে প্রথম ঘোষিত হল, বাবা নেই।

ব্রজকিশোর সান্ত্বনা দেবার জন্য একবার ডাকলেন, শোন নীরু—

নীরু কান্নার বেগে তা শুনতে পেল না। ব্রজকিশোর চুপ করে রইলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর নীরাকে তিনি কাঁদতে দেখেননি। ওকে একটু কান্নার অবকাশ দেওয়া উচিত। যদিও নীরাকে কাঁদতে দেখে ওঁর নিজের ভিতরটাও যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সেটা মধুসূদনের কথা ভেবে না, এই মেয়েটির কথা ভেবেই। তিনি জানেন, আত্মীয় স্বজন যারাই থাকুক, তেমন করে আপনজন বলতে ওর আর কেউ নেই। এই আঘাত সামলে উঠতে নীরার অনেক সময় লাগবে।

বেশ খানিকটা সময় পরে নীরার কান্না প্রশমিত হল। ব্রজকিশোর বললেন, তুমি যা হারিয়েছ, তা কখনো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তবে এইটুকু বলতে পারি নীরু, আমি সব সময়ে তোমার জন্য আছি। যতদিন বাঁচব, থাকব।

নীরা বলল, সেটাই আমার ভরসা বোসকাকা। আপনি ছাড়া আর কাউকে নিজের বলে ভাবতে পারছি না।

ব্রজকিশোর বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে মা। তোমার যা বুদ্ধি আর মন আছে, অনেককেই আপন করে নিতে পারবে।

নীরার, দুঃখের মধ্যেও, ঠোঁটের কোণে একটু তিক্ত হাসি দেখা দিল। বলল, কিন্তু, বোসকাকা, যে আপন লোকেরা এখন আমাকে ঘিরে আছে, তাদের নিয়ে যে আমি আর থাকতে পারছি না।

ব্রজকিশোর বললেন, আমি এদের কথা বলছি না। তোমার কাজকর্মের মধ্যেই

boiRboi.net

তুমি তাদের খুঁজে পাবে। এখন তুমি বাইরে যেতে চাও, সেটা ভালই। এসব আপন লোকের হাত থেকে বাঁচা যাবে। কোথায় যেতে চাও বল, আমি দু-একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলছি।

নীরা বলল, সেটা আপনিই ঠিক করুন। একটা কোন নিরিবিলি জায়গায় যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়।

ব্রজকিশোর বললেন, গোপালপুরে যাবে? গোপালপুর অনুসী?

নীরা একটু ভেবে বলল, তাই চলুন।

ব্রজকিশোর একটু কেশে বললেন, সেই ভাল। তবে এ ক'দিন তোমাকে কাজ-কর্মের কথা কিছু বলিনি। এখনও তেমন কিছু বলছি না, কেবল—

নীরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বোসকাকা, কাজকর্ম ফেলে রাখার ইচ্ছা আমার নেই। সে-রকম জরুরী কাজ কিছু থাকলে বাইরে না হয় না-ই বা গেলাম।

না না, সে-রকম জরুরী কিছু হলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলতাম। বাইরে তোমার যাওয়া দরকার। আর একটা খবর তোমার জানা দরকার, বিজিত জাপান থেকে ফিরে এসেছে।

বিজিত কে?

নীরার প্রশ্নে ব্রজকিশোর যেন একটু অবাক হলেন, এবং তিনি কিছু বলবার আগেই নীরার ভুরু সোজা হয়ে উঠল। বলল, ও, বিজিত মজুমদার?

হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। পরশুদিন এসে পৌঁছেছে। রায়ের মৃত্যু সংবাদে খুবই শকড্। এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত আসতে পারেনি। আমাকে খালি বলল, ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন, কিছু মনে নেই। জীবনে এই প্রথম পিতৃশোক কাকে বলে জানতে পারলাম। কথাটা সত্যি। রায়কে বিজিত বাপের মতই মনে করত।

নীরা সহসা কোন কথা বলতে পারল না। বিজিতের কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে লাগল। মনে মনে ভাবল, বিজিত মধুসূদনকে পিতৃতুল্য মনে করত, সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি মধুসূদনও তাকে পুত্রতুল্যই মনে করতেন। এই ব্রজকিশোরকে যেমন নীরার ঠাকুর্দা উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন, বিজিতকেও তেমনি মধুসূদন। ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পাস করে বিজিত মধুসূদনের কাছে এসেছিল। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। বিজিতের দরকার ছিল চাকরির। তার বাবা মারা গিয়েছিল ছেলেবেলায়। সে একমাত্র সন্তান। মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে থেকে বি. এস-সি পাস করেছিল। মামাদের পক্ষে এঞ্জিনিয়ারিং পড়াবার ক্ষমতা ছিল না। বরং বিজিত কিছু উপার্জন করবে, সেটাই ছিল তাঁদের প্রত্যাশা।

মধুসূদন সব কথা শুনে, সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি করেননি। বিজিতকে তাঁর ভাল লেগেছিল, মনে মনে প্রত্যাশা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, ছেলেটি সুযোগ পেলে উন্নতি করতে পারবে। তিনি বিজিতকে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মাসে মাসে তার মাকেও কিছু কিছু সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

নীরা এসব কথা ওর বাবার মুখেই শুনেছে। বিজিত কয়েকবার এ বাড়িতেও

boiRboi.net

এসেছে। বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নীরার মনে হয়েছিল, নিতান্তই মুখচোরা এক বালক। ভালভাবে কথা বলতে পারত না। নীরা বা মীরা, কারো সঙ্গেই কখনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এ বাড়িতে সে ঘন ঘন আসতও না। বিজিত বরাবর একটু দূরে দূরে থাকত, সে দূরত্বটা রয়েই গিয়েছে। অথচ বিজিত বয়সে এমন কিছু বড় না। নীরার সমবয়সী হতে পারে, কিংবা দু-এক বছরের বড় হতে পারে। বয়স অনুপাতে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা কখনও হয়নি।

বিজিত ভাল ভাবেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিল। তখন তাকে দেখে তেমন মুখচোরা লাজুক বলে মনে হত না। তবে খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হত। তার ব্যবহার থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যেত, সে কোনরকমেই নীরাদের নিজের সমকক্ষ মনে করতে পারত না। এমনি সে আসত কম। ফলে একটা দূরত্ব বরাবরের জন্য থেকেই গিয়েছিল। নীরা বা মীরার অনেক ছেলে-বন্ধু ছিল। বিজিত কখনও সে পর্যায়ে আসেনি। অবিশ্যি মালিকের কন্যাদের মত যে নীরাদের দেখেছে, মনে হয়নি। বিজিতের নিজের মধ্যেই স্বাভাবিক সংকোচের ভাব ছিল।

বিজিত এঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরে ফ্যাক্টরিতে কাজে লেগেছিল। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ঘটকের আণ্ডারে দু-বছর কাজ করার পরে, মধুসূদন লক্ষ্য করেছিলেন, বিজিতের কাজকর্ম চিন্তাধারার মধ্যে একটা নতুনত্বের ঝোঁক আছে। এঞ্জিনিয়ার ঘটকও বিজিতের কাজকর্মে খুব খুশি ছিলেন। মধসূদন দেখেছিলেন, নতুন কিছু সৃষ্টির প্রতি বিজিতের বিশেষ উৎসাহ। তখনই তিনি বিজিতকে বাইরে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন। সেই বিজিত উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে ফিরে এল। মধুসূদন দেখে যেতে পারলেন না।

নীরা মনে করল, বিজিতের প্রতি বাবার কর্তব্য ওকে পালন করতে হবে। ব্রজকিশোরকে জিজ্ঞেস করল, বিজিতকে আপাতত কোন্ পোস্টে দেওয়া যায় বোসকাকা?

ব্রজকিশোর বললেন, বিজিতের নতুন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট একটা নিতান্ত ফরমাল ব্যাপার। বিজিত নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন স্টাফ। এতকাল ছুটিতে ছিল। রেকর্ডে তাই আছে। কিন্তু এখন তাকে আর পুরোনো পোস্টে রাখা চলে না। সেই জন্যই নতুন অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা বলছিলাম। তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল, বিজিত ফিরে এলে তাকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফ এঞ্জিনিয়ারের পোস্টে দেওয়া হবে।

নীরা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বলল, তাহলে তো আর কথাই নেই। আমি বরং চিন্তা করছিলাম, বিজিতবাবুর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিয়ে কোন অশান্তির সৃষ্টি হবে কি না।

ব্রজকিশোর বললেন, কিছুমাত্র না। মিঃ ঘটক ছাড়াও মোটামুটি সকলেই জানে তোমার বাবা বিজিতকে কোন্ পোস্ট দিতে চেয়েছিলেন। তোমার কাজ হচ্ছে বিজিতকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া, একটা সার্কুলার জারি করা, আর মিঃ ঘটকের সঙ্গে টেলিফোনে একবার এ বিষয়ে কথা বলা। আর দু-একটা ছোটখাটো কাজ, সেগুলো আমিই ব্যবস্থা করে ফেলব। বিজিতের একটা গাড়ির দরকার হবে। আমাদের ডেভলপমেণ্টের বাড়তি গাড়ি গ্যারেজে আছে। সেখান থেকেই একটা গাড়ি আপাতত

ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ফিরে আসার পরে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

নীরা বলল, তা হলে সার্কুলার আর চিঠি কাল তৈরি করে নিয়ে আসবেন।

হ্যাঁ, সকালের দিকেই সেটা নিয়ে আসব, তুমি সই করে দেবে। বিজিতকে তা হলে তোমার সঙ্গে কাল বিকেলে দেখা করতে বলে দেব। ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চিঠিটাও তখনই দিয়ে দিও!

নীরা জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা বেরোচ্ছি কবে বোসকাকা?

ব্রজকিশোর বললেন, পরশুই আমরা বেরিয়ে যাব। আমি চলি, তোমার কাকিমার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে ফেলি গিয়ে, কোথায় যাব।

ব্রজকিশোর বিদায় নিলেন।

পরের দিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় মধুসূদনের সেক্রেটারী ব্যানার্জী নীরার ঘরে টেলিফোন করে জানালেন, বিজিত এসেছে। তাকে তিনি নিচে অফিস রুমে বসিয়েছেন। নীরা বলল, বসতে বলুন, যাচ্ছি।

নীরা তৈরিই ছিল। বিজিতের আসার সময় আগে থেকেই ঠিক ছিল। নীরা নিচে নেমে বাবার অফিসঘরে এল। মধুসূদন বাড়িতে যখন কাজকর্ম করতেন, এ ঘরে বসেই করতেন। বাবার মৃত্যুর পরে নীরা এ ঘরে আজ এই প্রথম এল। ঘরে ঢুকে নীরা দেখতে পেল, টেলিফোনের দিকে মুখ করে পিছন ফিরে একজন বসে আছে।

নীরা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে এল। ওর পায়ের শব্দ পেয়েই বিজিত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। নীরা চকিতে একবার বিজিতের দিকে দেখল। বিজিত কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, নমস্কার।

নীরা বাবার চেয়ারে না বসে, পাশের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বসুন।

বিজিত বসল। তারপরে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। তাদের দুজনের মাঝখানে মধুসূদন এসে দাঁড়ালেন। নীরা জানে, মধুসূদনের জন্য বিজিতের মনে কি অবস্থা। সেই চিন্তাটাই যেন বাবার জন্যে ওর মনকে উদ্বেল করে তুলতে লাগল। কিন্তু এ সময়ে ও নিজেকে স্থির রাখতে চাইল। বিজিতের সামনে শোকে ভেঙে পড়তে সংকোচ হল। কাজের কথা বলবার জন্যই বিজিতকে আসতে বলা হয়েছে। তবু ওর আশঙ্কা, বিজিত নিজেই হয়তো বাবার কথা তুলবে। তখন হয়তো নীরা নিজেকে সামলাতে পারবে না।

কিন্তু বিজিত কোন কথাই বলল না। সে চুপ করে বসে আছে। নীরা একবার দেখল। বিজিত মাথা নিচু করে বসে আছে। নীরার মনে হল, বিজিতের অবস্থা ওর মতই। মধুসূদনের প্রসঙ্গ তুলতে চাইছে না। আরও একটু সময় ওরা দুজনেই চুপ করে রইল। যেন এই নীরবতার মধ্যেই মধুসূদনের সহসা মৃত্যু দুজনার আলোচিত হয়ে গেল। অনেক সময় কথার থেকে নীরবতাই মানুষকে অনেক বেশি মুখর করে তোলে।

নীরা জিজ্ঞেস করল, বাইরে কেমন ছিলেন?

বিজিতের গম্ভীর স্বর শোনা গেল, ভালই, কাজকর্মে কেটে গিয়েছে।

নীরা দেখল, বিজিতের ভাবভঙ্গি প্রায় একরকমই আছে যেন। অথচ চেহারা

boiRboi.net

অনেক বদলে গিয়েছে আগের থেকে চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে। সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে, অনেক স্মার্ট লাগছে। ছেলেমানুষি ভাবটা পুরো-মাত্রায় বজায় আছে। এখন অবিশ্যি বিজিতের মুখ গম্ভীর। কিন্তু তার কালো চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার সঙ্গে সেখানে হাসি আর কৌতুক যেন মেশামেশি করে আছে। আগে যেমন একটা গোবেচারা ভাব ছিল, সেটা তার নেই।

নীরা জিজ্ঞেস করল, এর মধ্যে কারখানায় গিয়েছিলেন নাকি ?

বিজিত বলল, হ্যাঁ, আমি মিঃ ঘটকের সঙ্গে দেখা করেছি। অফিসেও সকলের সঙ্গে কথা বলেছি।

নীরার মনে হল, যদিও বিজিতের উচিত ছিল ওর সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু সেটা বিজিত স্বাভাবিক কারণেই পারেনি। ব্রজকিশোরের কাছে সেকথা ও আগেই শুনেছে। নীরা বলল, বাবার ইচ্ছা ছিল আপনি ফিরে এলে ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফ এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব আপনাকে দেবেন।

নীরা দেখল, বিজিতের মাথা এত নিচু, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। মুহূর্তের মধ্যে নীরার গলার কাছেও যেন কিছু ঠেলে এল। ও বুঝতে পারছে, বিজিত এই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কথা বলতে পারছে না। দেখে মনে হচ্ছে বিজিতের সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট, শক্ত হয়ে আছে। আবার মধুসূদন ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। নীরা ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে নিজেকে দমন করল। সামনে যে ফাইলটা ছিল সেটা খুলে ধরল চোখের কাছে। একেবারে ওপরেই রয়েছে ওর সই করা বিজিতের নিয়োগপত্র।

বিজিতের নিচু গম্ভীর স্বর শোনা গেল, আমাকে দিয়ে উনি যা চেয়েছিলেন তার কিছু দেখে গেলেন না, দেখবেনও না।

নীরা মুখ না তুলেই বলল, সেটা আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য।

কথার শেষে নীরা চোখ তুলে বিজিতের দিকে দেখল। তার চোখ রক্তিম, মুখ থমথমে। সে যেন কিছু বলবে বলে নীরার দিকে তাকিয়েও কিছু বলল না। নীরা আবার বলল, আপনাকে দিয়ে যা চেয়েছিলেন, আপনি তাই করবেন।

বিজিত বলল, সেটাই আমার কর্তব্য।

নীরা ফাইল থেকে নিয়োগপত্রটি বিজিতের দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, আপনার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার।

বিজিত হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

নীরা বলল, আমি কিছুদিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে অন্যান্য কথা বলা যাবে ?

বিজিত চেয়ার ছেড়ে উঠবার উদ্যোগ করে বলল, আচ্ছা, আমি তা হলে—

নীরা বলল, বসুন, বসুন। আমি আপনাকে উঠতে বলিনি। আপনাকে খবরটা দিয়ে রাখছিলাম, আগামীকাল আমি বাইরে যাচ্ছি।

বিজিত বসে বলল, মিঃ বোসের কাছে শুনেছি।

ইতিমধ্যে কোন অসুবিধা হলে চালিয়ে নেবেন।

boiRboi.net

নিশ্চয়ই। অসুবিধা আর কি হতে পারে।

নীরা দেখল, বিজিতের সঙ্গে আপাতত ওর আর কোন কথা নেই। অথচ বসতে বলে চুপ করে থাকা যায় না। বলল, একটু চা খান।

বিজিত বলল, থাক না এখন।

থাকবে কেন, একটু চা তো।

নীরা বেল বাজাল। নিচের অফিস-বয় এল। তাকে চা দিতে বলল। ভাবল, বাবা বেঁচে থাকলে বিজিতের সঙ্গে আজ তাঁর অনেক কথা হত। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু বিজিতের পক্ষে যেমন সমস্ত ব্যাপারটা অভাবনীয় এবং নতুন, নীরার পক্ষেও তাই। বিজিত ভাবেনি মধুসূদনের পরিবর্তে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওকে কথা বলতে হবে। এ পরিস্থিতিকে বিজিত কী ভাবে দেখছে কে জানে। সে যে ভাবেই দেখুক, নীরাকে এই বিজিতকে নিয়েই কাজ করতে হবে। এখনো পর্যন্ত কাউকে নিয়ে নীরাকে কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হয়নি। বিজিতকে নিয়েও পড়তে হবে না, আশা করা যায়।

কিন্তু বিজিতকে তেমন অভিজ্ঞ আর ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হচ্ছে না। সে কী ধরনের কাজকর্ম শিখে এসেছে, পরে তা জানা যাবে। এখন তো তাকে যেন রীতিমত ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। এই প্রথম নীরার মনে হল, বিজিতের শরীরের গঠন লম্বা চওড়া শক্ত হলেও চোখে মুখে যেন একটি মেয়েলি ভাব।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মানুষটা খাঁটি হলেই হল, এবং নীরার মনে হচ্ছে সেদিক দিয়ে বিজিতকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। ও জিজ্ঞেস করল, এখন তো আপনি জাপান থেকে আসছেন?

বিজিত বলল, হ্যাঁ। শেষের এক বছর উনি (মধুসূদন) আমাকে জাপানে কাটিয়ে আসতে বলেছিলেন। জাপানে স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সম্পর্কে আমি যাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি। উনি এখান থেকে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ইংল্যাণ্ড থেকে আমাকে জাপানে আনিয়েছিলেন। কিন্তু—

বিজিত চুপ করল। নীরা জানে, বাবার কথাই বিজিতের মনে আসছে। বাবার ইচ্ছানুযায়ী যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করে এসেছে, তা যোগ্য এবং ন্যায্য জায়গায় ব্যক্ত করা হল না।

চা এল। বিজিত চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনাকে আমি ওঁর (মধুসূদনের) চিঠিগুলো দেখাতে চাই, যে সব চিঠি তিনি আমাকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জাপানেও লিখেছিলেন। সে সব চিঠি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, ভবিষ্যতে ওঁর কী ধরনের পরিকল্পনা ছিল।

বিজিতের এই প্রস্তাবে নীরা যেন বাবাকে জানবার একটা নতুন কূল পেল। মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। বলল, খুবই ভাল হয়। আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়—

বিজিত বলে উঠল, না না, এটা কোন ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা নয়। আমি কিছু বলার থেকে, ওঁর পরিকল্পনা মতই কাজে হাত দিতে চাই। তাতে কেবলমাত্র আপনার অনুমোদন আর সমর্থন আমার দরকার।

boiRboi.net

বিজিতের কথাবার্তা শুনে এখন তাকে বেশ চতুর আর বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতের কাজের ব্যাপারে পাছে নীরার সঙ্গে তার কোন বিরোধ হয়, সেই জন্যই বাবার চিঠিগুলো ওকে দেখাতে চায়। নীরা বলল, আশা করি, বাবার ইচ্ছামত কাজের ব্যাপারে আমার অনুমোদনের অভাব হবে না।

নীরা কথাটা একটু গম্ভীর মুখে বলল। বিজিত একবার নীরার মুখের দিকে দেখল। বলল, আপনার ওপরেই সব নির্ভর করছে। আপনি ফিরে এলেই চিঠিগুলো আপনাকে দিয়ে দেব।

নীরার মনে হল, বিজিতের কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে, নীরার সঙ্গে তার বিরোধ হতে পারে, অথচ নীরা ওর বাবার পরিকল্পনা মত ঠিক কাজ করতে পারবে না। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, বাবার পরিকল্পনা মত কাজ হবে না, আপনার মনে কি এরকম কোন সন্দেহ আছে ?

বিজিত চকিতে একবার নীরাকে দেখল, চোখাচোখি হল। বিজিত টেবিলে আঙুল ঘষতে ঘষতে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, দেখুন মিস রায়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর যে আংশিক শেয়ার ডিস্ট্রিবিউট করা আছে, সেই সব শেয়ার হোল্ডারদের পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড আছে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ঘটক আছেন। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ছাড়াও আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মিঃ বোস আছেন। আপনার অনুমোদনের জন্য এঁদের সকলের অনুমোদন আপনাকে আদায় করতে হবে। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর নিয়ম তা-ই, অতীতেও তা-ই হয়েছে। যিনি আসল ব্যক্তি, তিনি আজ আমাদের মাঝখানে নেই। সেই জন্যই বলছি, আপনার ওপরেই সব নির্ভর করছে।

নীরা তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয়, তাঁদের কাছ থেকে কোন বাধা আসবে।

বিজিত হঠাৎ কোন জবাব দিল না। এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, তাঁরা বাধা দেবেনই এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু সকলেই মধুসূদন রায়ের মত বিচক্ষণ আর সাহসী নন। তাঁর মত সকলেই নতুন অভিযানে নামতে সাহস পায় না। অনেকেই হয়তো দ্বিধা করবেন, ভয় পাবেন। সেই কথাই বলছি।

নীরা গম্ভীর স্থির গলায় বলল, সে দায়িত্ব আমার। বাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবেই।

বিজিতের চোখের তারায় ঝিলিক হেনে গেল। তার মুখ ঝক-ঝকিয়ে উঠল। সে নীরার কথায় আর কোন মন্তব্য করল না। বলল, উনি যত চিঠি লিখেছেন, সব চিঠিতেই বোঝা যেত, ওঁর মনে একটুও শান্তি নেই। কিন্তু কাজের কথায় খুব উৎসাহী ছিলেন।

নীরার চোখের সামনে মধুসূদনের মূর্তি ভেসে উঠল। গত কয়েক বছর বাবার মনের অবস্থা কী ছিল নীরার থেকে বেশি আর কে জানে। ও নিচু স্বরে বলল, এ বাড়ির যে অবস্থা, তাতে মনের অবস্থা ভাল থাকতে পারে না।

বিজিত শুধু বলল, জানি।

নীরা বিজিতের দিকে তাকাল, বিজিতও তাকিয়েছিল। চোখ সরিয়ে নিল।

boiRboi.net

তারপরে বলল, আমি তা হলে চলি ?

নীরা বলল, আসুন।

বিজিত বেরিয়ে গেল। নীরা পিছন থেকে তাকে দেখল। ভাবল, কী জানে বিজিত ? নিশ্চয়ই মীরার আত্মহত্যার কথাই বলতে চেয়েছে। তা ছাড়া আর কি জানে ? দীপকের সঙ্গে নীরার ব্যাপারটাও জানে নাকি।

আশ্চর্যের কী আছে। জানলেও নীরার কিছু যায় আসে না। ওটা একটা অন্ধকার পর্ব, অন্ধকারেই চিরদিন পড়ে থাকবে।

●

বেড়াতে বেরিয়েও নীরা যেন মনের মধ্যে তেমন শান্তি পেল না। কলকাতা থেকে কাছাকাছির মধ্যে ও একটা নির্জন জায়গায় যেতে চেয়েছিল। নির্জন জায়গাতেই এসেছে। কাকীমা অর্থাৎ ব্রজকিশোরের স্ত্রীর পরামর্শ মত কলকাতা থেকে ওরা সোজা গাড়ি নিয়ে পালামৌ জেলায় এসেছে। এক জায়গায় অনেক দিন না কাটিয়ে বিভিন্ন বাংলোয় দু-একদিন করে কাটিয়ে চলেছে।

ছোটনাগপুরের এই সব পার্বত্য অঞ্চল, অরণ্যের নিবিড় বেষ্টনীতে যেন স্বপ্নের দেশ হয়ে আছে। ছায়ানিবিড় বনে বনে এখন পাতা ঝরছে। অজস্র অনামী ফুলে সেজে আছে বন। যেখানেই যায় সেখানেই পাহাড় নদী কল্‌কল করে। ঝরনা বয়ে যায় কুলুঝুলু শব্দে। কত রকম পাখি যে চোখে পড়ে, আর কত বিচিত্র তার ডাক। ময়ূর আর বনমোরগেরা এত কাছে ঘুরে বেড়ায় যে মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যায়। কিন্তু অসম্ভব। বিদ্যুৎগতিতে উধাও হয়ে যায়। রাত্রে হরিণ আর ময়ূরের ডাক শোনা যায়। জঙ্গলের মানুষেরা সরল আর উদার।

সবই সুন্দর, বন গভীর নির্জন ও নিবিড়। নীরাও নিবিড় হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু মনটা যেন স্থির হতে চায় না। পিছনে যেন ওর অনেক টান রয়ে গিয়েছে। কলকাতার কথাই বারবার মনে হয়। কলকাতার বাড়ি অফিস কারখানা, এ সবই যেন ওর পিছনে ছায়ার মত লেগে রয়েছে।

কিন্তু আসলে কি তাই ? তা না। সব কিছুর থেকেও বেশি, বাবার চিঠিগুলোর কথাই ওর বারে বারে মনে পড়ে যায়। বিজিতকে ওর হিংসা হয়। বাবার সঙ্গে তার অনেক চিঠি আদান প্রদান হয়েছে।

নীরা যদি বাইরে থাকত, তাহলে ও বাবার কাছ থেকে অনেক চিঠি পেতে পারত। বাবাকে আরো বেশি জানতে চিনতে পারত। সেদিক থেকে বিজিত ভাগ্যবান। বাবাকে হয়তো সে নীরার থেকেও বেশি চেনে। নীরার একটা অভিমান আর ক্ষোভ জমে ওঠে। যদিও তার কোন অর্থ নেই।

এই বনে বনে নির্জনে বেড়াতে ভাল না লাগবার কারণ তাই। বাবার চিঠিগুলো যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কেবলই মনে হচ্ছে, ওর এখন বেড়াবার সময় নয়, কাজ করার সময়। শেষ পর্যন্ত মাত্র বারো দিন বেড়াবার পরে নীরা ব্রজকিশোরকে জানাল, ও এবার কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। ব্রজকিশোর এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক হলেন। ভেবেছিলেন, দু-এক দিনের মধ্যেই পূর্বঘাট পর্বতমালার আরণ্যক অঞ্চলের দিকে যাত্রা করবেন। কম করে এক মাস ঘোরা হবে।

ব্রজকিশোর জানতে চাইলেন, তোমার শরীর খারাপ করছে না তো?

নীরা বলল, না, শরীর ঠিকই আছে। কিন্তু এভাবে বেড়াতে ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে কাজের মধ্যে থাকলেই ভাল থাকব।

কাকীমা বললেন, কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না নীরু। সারা জীবনই তো কাজ করবে। এখন একটু বেড়িয়ে যাও।

নীরা বলল, না কাকীমা। মনের শান্তির জন্যই তো আসা। আমি যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। তা ছাড়া এতদিনে আমাদের বাড়িও নিশ্চয় ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার ফিরেই যাই।

নীরার জন্যই বেরনো হয়েছিল। নীরাই যখন ফিরতে চাইছে, আপত্তির কিছু থাকল না। ব্রজকিশোর সবাইকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

●

নীরা রাত্রে কলকাতায় ফিরল। বাড়িতে যা আশা করেছিল তাই হয়েছে। ওকে না পেয়ে সকলেই প্রায় চলে গিয়েছে। পরদিন সকালেই নীরা অফিসে গেল। বাবার মৃত্যুর পরে এই প্রথম অফিসে এল। নীরা অফিসে এসেই কারখানায় ফোন করে বিজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করল। বলল, আপনার অসুবিধা না হলে, আজই বাবার চিঠিগুলো দেখতে চাই।

ওপার থেকে বিজিতের জবাব এল, এখনই যদি চান, তাহলে আমি বাড়ি থেকে চিঠিগুলো এনে আপনাকে পেঁৗছে দিতে পারি।

নীরা বলল, তাই দিন।

নীরা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রায় একমাসের কাজ জমে আছে। নিজের কাজগুলোই ওকে আগে শেষ করতে হবে। কেবল নিজের নয়, মধুসূদনের কাজও এখন ওর মাথায়। তাঁর ফাইল পত্র কোথায় কী রেখে গিয়েছেন, সেগুলোও ওকে দেখতে হবে। একটা প্রধান কাজ অ্যাকাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্ট। ওটার সবটাই মধুসূদন দেখা-শোনা করতেন।

লাঞ্চের আগেই বিজিত এল। ছোট একটি মরক্কো লেদার কেস্ সে নীরার হাতে তুলে দিল। বলল, বছর পাঁচেকের মধ্যে চল্লিশটা চিঠি উনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সবই এর মধ্যে আছে।

মধুসূদনের চিঠির গুচ্ছ এত যত্ন করে রাখতে দেখে নীরা মনে মনে খুশি হল। ও নতুন করে বুঝতে পারল, বাবার প্রতি বিজিত কতখানি অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল। বাবাও অবিশ্যি তাকে ভালবাসতেন। এত চিঠি বাবা তাঁর সন্তানদের লেখেননি। লেখার দরকার হয়নি।

বিজিত আবার বলল, চিঠিগুলো আপনার পড়া হয়ে গেলেই আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

নীরা বলল, আমি আপনাকে দু-একদিনের মধ্যেই ডাকব। বলতে গেলে, এই চিঠিগুলো দেখবার জন্যই নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে পারলাম না।

বিজিত বলল, আমিও তাই ভাবছিলাম, অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন।

নীরা চামড়ার কেসটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। বিজিত উঠে দাঁড়াল। বলল, চিঠিগুলো একান্তই ব্যক্তিগত। আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন!

boiRboi.net

নীরার মুখ মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে উঠল। একটা রাগের হাল্কা অনুভব করল। বিজিতের দিকে তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে কিছু বলবে মনে করেও চুপ করে গেল। একটু পরে গম্ভীর গলায় বলল, আপনার চিঠি আপনি সবই ফেরত পাবেন। কাজের জন্যই চিঠিগুলো দেখার দরকার।

বিজিত ঘাড় নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই। ভুল বুঝবেন না। চিঠিগুলো আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান সম্পদের মত, সেইজন্যই বলছিলাম।

চিঠিগুলো বিজিতের কাছে কেন, নীরার কাছেও যথেষ্ট মূল্যবান। তবু চিঠিগুলো তো ওর বাবারই লেখা। তবে অন্য একজনকে লেখা। আর সেজন্যই একথা ওকে শুনতে হচ্ছে। ওর মুখে একটা কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। বলল, আপনার মূল্যবান সম্পদ আপনারই থাকবে।

বিজিত চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, আমি যাচ্ছি। যখনই ডেকে পাঠাবেন আমি চলে আসব।

নীরা জিজ্ঞেস করল, কাজকর্ম শুরু করতে অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

বিজিত বলল, না। কোথাও কোন পরিবর্তনই তো হয়নি। যেমন দেখে গিয়েছিলাম সব ঠিক তেমনই আছে। কারখানায় ঢুকে মনে হল, আমি যেন দু-এক দিনের জন্য কোথাও গিয়েছিলাম।

বিজিতের কথার মধ্যে বিশেষ একটা অর্থ আছে। তার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে কারখানার পরিবর্তন আশা করেছিল।

নীরা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনি হয়তো পরিবর্তন আশা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

নীরার কথার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। কিন্তু বিজিতকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, বাবার পক্ষে নতুন করে কিছু করা সম্ভব হয়নি। বোধহয় আপনার জন্যই বাবা অপেক্ষা করছিলেন।

বিজিত কিছু বলল না। চেয়ার থেকে উঠে ছোট করে বলল, যাচ্ছি।

বিজিতের যাবার পথে তাকিয়ে নীরা হাসল। বিজিতের মনে মনে অনেক আশা আর উদ্দীপনা। তার কথা থেকেই তো বোঝা যায়। সে কারখানার পরিবর্তন দেখতে চায়। নতুন পরিকল্পনাকে রূপায়ণের স্বপ্ন তার মনে। বিজিতকে দেখলে মনে হয়, জীবনের কোন জটিল আবর্তে এখনো তাকে পড়তে হয়নি। কোন অন্ধকারের স্পর্শ লাগেনি। মন তাজা, কাজের উন্মাদনায় মেতে আছে। ভবিষ্যতের কাছে তার অনেক আশ্বাস।

নীরা চামড়ার কেসটার দিকে তাকাল। একটা ব্যথা আর আনন্দের অনুভূতিতে কেসটা দু'হাতে তুলে নিল। কপালে ছোঁয়াল। তারপর কেসটা খুলে বুভুক্ষুর মত চিঠিগুলো দেখল। দেখে আবার কেসটার মুখ বন্ধ করল। অফিসের কাজকর্মের মধ্যে এ চিঠি পড়া যাবে না। রাত্রে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে একে একে সব চিঠিগুলো পড়তে হবে।

*

নীরা রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে মধুসূদনের সমস্ত চিঠি খুলে নিয়ে বসল। ইংরেজিতে

boiRboi.net

লেখা। সবই হাতে লেখা, তার মানে মধুসূদন চিঠিগুলো নিজের হাতে খামে বন্ধ করে পোস্ট করতে দিতেন।

প্রথমদিকের চিঠিগুলো নিতান্ত খবরাখবর নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদেশে বিজিতের কী সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে, কী ভাবে তার চলা উচিত সে বিষয়ে উপদেশ। একটা সময়ে বেশ কিছুদিন চিঠি লেখেননি। তারপরে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে মীরার আত্মহত্যার সংবাদ জানিয়েছেন। ঘটনাটাকে তিনি আচমকা সাপের ছোবল খাওয়ার মত বর্ণনা করেছেন। কিছু ব্যক্ত না করেও জানিয়েছেন, মীরা সমাজের একটা পাপের এবং ভুলের শিকার। এর জন্য ক্রোধ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ-ভাবে করার কিছু নেই। লিখেছেন, তাঁকে এই বিষক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে হবে। তার-পরের চিঠিগুলোতেই শুরু হয়েছে নতুন পরিকল্পনার কথা। প্রত্যেকটা চিঠিতেই বাবার মানসিক অশান্তি এবং বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাজের কথাই বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে, এবং নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে, তিনি যে বিজিতের ওপরেই নির্ভর করছেন, সে কথাও অনেকবার লিখেছেন।

কোন চিঠিতে লিখেছেন, বিজিত সেখানে যে অভিজ্ঞতা, শিক্ষালাভ করছে, সে সবই যেন সে ভারতবর্ষের বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ভাবতে পারে। কেননা, মনে রাখতে হবে, এদেশেই তার পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে।

পরিকল্পনার প্রধান এবং মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বৈদ্যুতিক ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি নতুন কারখানা তৈরি করা। এ-রকম কারখানা তৈরি হওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে কথাও অনেক আলোচিত হয়েছে, এবং বিজিতের সঙ্গে মধুসূদন একমত হতে পেরেছেন। চিঠিগুলোর মধ্যে দুজনের তর্ক বিতর্কেরও অনেক ছাপ রয়েছে। এক জায়গায় মধুসূদন লিখেছেন, বিজিত সমস্ত ব্যাপারটা দূর থেকে দেখছে, একটা উন্নত দেশের কাজ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছে। ফিরে কাজে হাত দিতে গেলে বাস্তবের চেহারা অনেক বদলে যাবে। কখনো লিখেছেন, বিজিতের ধারণার সঙ্গে তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছে।

ব্যাঙ্কের সাহায্য কতখানি পাওয়া যাবে, সরকারী সাহায্য মিলতে পারে কি না, সে সব বিষয়ও আলোচনা হয়েছে। একটা চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন, বিজিতের চিঠি পড়ে তিনি যেন চোখের সামনে বৈদ্যুতিক ভারী যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু বিজিত ফিরে না এলে কিছুই হবে না। লিখেছেন, তিনি কারোর সঙ্গেই এখনো নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলেননি। বিজিত ফিরে এলে তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলে সকলের সঙ্গে মিটিং করবেন। তবে এটাই তাঁর স্বপ্ন এবং সিদ্ধান্ত।

একটা চিঠিতে লিখেছেন, চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ঘটক যথেষ্ট কুশলী এবং কর্মঠ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সেকালের। বিজিতকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে। জানিয়েছেন, তিনি প্রতিদিনই নতুন পরিকল্পনা কী ভাবে কার্যকরী করা হবে সে বিষয়ে একটা কার্যক্রম এবং পদ্ধতি নোট করছেন। বিজিত ফিরে এলে সে সবই তিনি তার হাতে তুলে দেবেন।

boiRboi.net

যত পড়তে লাগল নীরা ততই অবাক হল। এসব বিষয়ে কোনদিন কথা হয়নি। অথচ এত ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাকেই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁর আর বিজিতের মধ্যে।

নীরা লজ্জিত কৌতূহলে দেখল, মধুসূদন একটা চিঠিতে ওর কথাও উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, বিজিত ফিরে এসে একজন নতুন ডিরেক্টরের দেখা পাবে। সে একজন মহিলা, এবং গর্বের বিষয় মহিলাটি তাঁরই কন্যা নীরা। এ জায়গাটা পড়তে গিয়ে নীরা চোখের জল রোধ করতে পারল না।

শেষের দিকে একটা চিঠির কিছু লাইন নীরার বুকের মধ্যে বিঁধে রইল। 'মানুষ সকলেই অনিশ্চিত আয়ু নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে। আমিও তাই এসেছি। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, আর হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। তবে মৃত্যু নিশ্চয় এতটা নির্দয় হবে না যে, তুমি ফিরে আসার পরে, কাজটা শেষ করে যেতে পারব না।' মধুসূদন কেন লিখেছিলেন একথা। বাহ্যত তাঁর কোন অসুখ-বিসুখই ছিল না। নিয়মিত কাজকর্ম করছিলেন। করতে করতে সহসা অসুস্থ হয়ে মারা যান। বাবা কি বিশেষ কিছু অনুভব করেছিলেন ? ভিতরে ভিতরে কিছু টের পেয়েছিলেন ? হয়তো তাই। একজন আগন্তুকের ছায়া হয়তো দেখেছিলেন। যার নাম মৃত্যু।

চিঠি পড়া শেষ করে, নীরা ঘড়িতে দেখল তিনটে বেজে গিয়েছে। তথাপি আলো নিভিয়ে শুতে গিয়ে ঘুম এল না। মধুসূদনের চিঠির হস্তাক্ষর চোখের সামনে জেগে রইল, আর তাঁর গলার স্বরে যেন শোনা যেতে লাগল পরিকল্পনার বিষয়।

●

নীরার ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। কণা চা নিয়ে এসে অঘোরে ঘুমোতে দেখে আর ডাকেনি। ওর আজ নতুন ব্যস্ততা। প্রথমেই মনে হল, বাবার চিঠিগুলো আগে ব্রজকিশোরকে দেখানো দরকার। তিনি আসবেন একটু পরেই। নীরা তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরি হয়ে নিল। খাবার ঘরে গিয়ে দেখল, ব্রজকিশোর ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন, সংবাদপত্র পড়ছেন। ডাকলেন, এস মা। আমি এসে পড়েছি।

নীরা বসে বলল, আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। বোসকাকা, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসু চোখে নীরার দিকে তাকালেন। নীরা বলল, জরুরী মানে আর কিছু না, আপনাকে আজ সারাদিন বসে কতকগুলো চিঠি পড়তে হবে। আমি কাল রাত তিনটে অবধি পড়েছি।

কার চিঠি ?

বাবার। প্রায় চল্লিশটা চিঠি বাবা বিজিতবাবুকে লিখেছিলেন। বিজিতবাবু আমাকে সব চিঠিগুলোই পড়তে দিয়েছিলেন। চিঠিগুলো আপনার পড়া দরকার। আমার মুখ থেকে শুনলে কিছু হবে না।

ব্রজকিশোরের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। জিজ্ঞেস করলেন, কোন বিপদ আপদের ব্যাপারে নাকি ?

নীরা মাথা নেড়ে বলল, না না, তা নয়। বাবার ভবিষ্যৎ প্ল্যান প্রোগ্রাম কী ছিল, কী করতে চেয়েছিলেন, সে সব কথা জানা যাবে। বিজিতবাবু ফিরে এলে বাবা

boiRboi.net

আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কিন্তু সে সময় আর পেলেন না। আপনি পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

ব্রজকিশোর এবার উৎসাহিত হলেন। বললেন, নিশ্চয়ই পড়ব। বিজিত এটা খুব ভাল কাজ করেছে যে, চিঠিগুলো তোমাকে দিয়েছে।

নীরা বলল, বিজিতবাবু প্রথমদিনেই আমাকে চিঠির কথা বলেছিলেন। গতকাল আমাকে দিয়েছেন। বোসকাকা, আমার মনে হয়, আমাদের সামনে অনেক কাজ।

খাবার টেবিলে খেতে খেতেই কথাবার্তা হল। অফিসে গিয়ে নীরা চিঠিগুলো ব্রজকিশোরকে দিল। নিজের ঘরে বসে কয়েকটা কাজ সেরেই ও গেল মধুসূদনের ঘরে। নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে মধুসূদন অনেক কথা লিখেছিলেন। চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথায় সেই কাগজ-পত্র আছে কে জানে। সেই লেখা খুঁজে পাওয়া দরকার।

ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে চারটে বড় বড় স্টিলের আলমারি। টেবিলের ডেস্ক। আলমারিগুলো সম্পর্কে সন্দেহ হয়, ওখানে হয়তো থাকবে না। ওখানে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর অনেক পুরনো আর নতুন ফাইল-পত্র ভরতি হয়ে আছে। টেবিলের ড্রয়ারগুলো আগে দেখা দরকার। নীরা চাবির গোছা নিয়ে প্রত্যেকটি ড্রয়ার খুলে দেখল। অনেক কাগজ, অনেক ফাইল আছে। কিন্তু সেই বিশেষ বিষয়ের কাগজপত্র কোথাও নেই।

প্রায় হতাশ হবার মুখে একটা বড় সাইজের নোটবুক চোখে পড়ল। আগের থেকেই দেখেছে, কিন্তু নোটবুকটাকে আমল দেয়নি। এবার সেটা টেনে নিল। পাতা উল্টোতে উল্টোতে নোটবুকের মাঝখানে গিয়ে পাওয়া গেল সেই ঈপ্সিত লেখার সন্ধান। ওপরেই লেখা আছে, নিউ প্রজেকশন, হেভি ইলেকট্রিক্যাল পার্টস অ্যান্ড মেসিনারিজ।

নীরা পাতার পর পাতা উল্টে গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে অনেক কথা লেখা। কী ভাবে নতুন প্রজেকশন শুরু হবে, তার বিস্তৃত বিবরণ। নতুন প্রজেকশন যে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এরই একটি নতুন প্রচেষ্টা, সে কথা বলা আছে। টাকা কী ভাবে সংগ্রহ হবে, তার খুঁটিনাটি পন্থার উল্লেখ রয়েছে। এমন কি কারখানার সাইট কোথায় হবে, সে বিষয়েও মতামত দেওয়া আছে। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, পাঁচ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে হলে ভাল হয়, একথা লেখা রয়েছে।

নীরা কতক্ষণ ধরে নোটবুক পড়ছিল খেয়াল নেই। ব্রজকিশোর এসে ওকে ডাকলেন। তখন লাঞ্চ টাইম পেরিয়ে গিয়েছে। ব্রজকিশোর বললেন, তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পরে শুনলাম তুমি এখানে।

নীরা বলল, বসুন বোসকাকা। চিঠি পড়লেন ?

ব্রজকিশোর বললেন, এক নিশ্বাসে। আমিও তোমারই মত একসাইটেড।

নীরা নোটবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমাদের জন্য আরো একসাইটমেণ্ট রয়েছে। এই নোটবুকটা পড়ে দেখবেন। এটাই আমি এতক্ষণ দেখছিলাম। মনে হচ্ছে, বাবা সমস্তই ছকে গিয়েছেন।

ব্রজকিশোর নোটবুকটা হাতে নিয়ে বললেন, আশ্চর্য, রায়ের মনে যে এরকম

boiRboi.net

একটা পরিকল্পনা ছিল, একদিনও জানতে পারিনি। দেখছি, বিজিতের জন্যই সে বিশেষ ভাবে অপেক্ষা করছিল। বিজিতের চিঠিগুলো আমরা দেখিনি। মনে হচ্ছে, বিজিতও রায়কে অনেক কথা লিখেছিল। সে সব বিজিতের সঙ্গে আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব।

নীরা বলল, আপনার এই নোটবুকটা পড়া হয়ে গেলেই আমরা একবার বিজিত-বাবুর সঙ্গে বসতে পারি।

ব্রজকিশোর ঘড়ি দেখলেন। নীরা বলল, না, এখুনি আপনাকে নোটবুক পড়তে বলছি না। চলুন, আমরা খেতে যাই। তারপরে আপনি পড়ুন। বিজিতবাবুর সঙ্গে আগামীকাল কথা বলা যাবে।

পরের দিন সকালে ব্রজকিশোর তাঁর পূর্ণ সম্মতি জানালেন। তাঁর মতে, মধুসূদন যে ভাবে সব লিখে গিয়েছেন, সে ভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। নীরা আবেগ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, আমিও তাই ভেবেছি বোসকাকা। এবার আপনি মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করুন।

তিন দিনের নোটিশে অ্যাডভাইসরি বোর্ডের মিটিং ডাকা হল। তার মধ্যে বিজিতের সঙ্গে নীরা আর ব্রজকিশোরের কয়েক দফা আলোচনা হল। বিজিত মধুসূদনকে কী কী পরামর্শ দিয়েছিল সে-সব কথা বলল।

কিন্তু প্রথম দিনের মিটিং-এ কিছুই সাব্যস্ত করা গেল না। অ্যাডভাইসরি বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য হঠাৎ কোন মতামত দিয়ে উঠতে পারলেন না। চীফ এঞ্জিনিয়র ঘটক সমস্ত ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। অন্য তিনজন সদস্যেরও প্রায় তাই মতামত। সকলেই মধুসূদনের চিঠি এবং নোটবুকের বিবরণ দেখতে চাইলেন। এই মিটিং-এ বিজিত উপস্থিত ছিল। সে কিন্তু কোন কথা বলেনি।

সাতদিন সময় নেওয়া হল। স্থির হল ইতিমধ্যে মধুসূদনের চিঠি আর নোটবুক পড়ে নেবেন।

কিন্তু নীরা সাতদিন স্থির হয়ে থাকতে পারল না। যদিও ওর মতামতটাই সব থেকে বড়, তথাপি সকলেই যাতে একমত হতে পারে সেটাই দরকার। ব্রজকিশোরের সঙ্গে ও ঘন ঘন বসল, কথা বলল। বুঝতে পারল, ফাইনান্সের প্রশ্নটাই সব থেকে বিতর্কের সৃষ্টি করবে। মধুসূদন দু'রকম ব্যবস্থার কথা লিখে রেখে গিয়েছেন। ফাইনান্স কর্পোরেশন এবং ব্যাঙ্ক।

নীরা এই সাতদিনের মধ্যে একদিন বিজিতকেও ডাকল। বিজিতের কথাবার্তা অন্যরকম, একটু রোখো রোখো। তার বক্তব্য, নীরা একলাই সব কিছু করতে পারে। অ্যাডভাইসরি বোর্ডের অনুমতির জন্য ওকে অপেক্ষা না করলেও হবে। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড, বোর্ডকে একটা নীতি হিসাবে রেখেছে। সদস্যদের মধ্যে যারা শেয়ারহোল্ডার, তাদের শেয়ার নগণ্য। সুপ্রীম পাওয়ার শ্রীমতী নীরা রায়ের। তিনি যা করবেন তাই হবে।

বিজিত একেবারে মিথ্যা কথা বলেনি। কিন্তু তার কথার ধরন দেখলেই বোঝা

যায়, সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই মানতে রাজী না। নীরা সে ভাবে কাজ শেখেনি। ওর ধৈর্য অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত না দেখে ও হঠাৎ কিছু করবে না।

বিজিত আরো বলল, অ্যাকাউণ্টেণ্ট, অডিটর, এঁদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন। মিঃ বোস তো আছেনই। এঁরা ঠিক থাকলে সব ঠিক আছে।

একটু থেমে, কী ভেবে বিজিত আবার বলল, অবিশ্যি এসব কথা আমার বলা চলে না। আমি অন্য কাজের লোক। যেদিন থেকে অনুমতি পাব সেদিন থেকেই আমি শুরু করব।

নীরা বলল, আগামী মিটিং-এ আপনি কিছু বলুন। এমন ভাবে বলুন যাতে সবাই কন্‌ভিন্সড্ হতে পারেন।

বিজিত হাসল একটু, বলল, আপনি বললে নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু মিঃ ঘটক আমাকে ইতিমধ্যে কয়েকবারই শুনিয়েছেন, এরকম একটা হেভি প্রজেক্ট একটা বাতুলতা মাত্র। এ কিছুতেই হতে পারে না।

নীরা বলল, মিঃ ঘটকের বয়স হয়েছে, ওঁকে আমরা খাটাতে চাই না।

বিজিত একবার নীরার মুখের দিকে দেখল। বলল, এরকম অনেককেই হয়তো রেহাই দিতে হবে।

নীরার গলা নিচু, স্বর দৃঢ়, যাঁরা রেহাই চান, তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে।

বিজিত বলল, ঠিক আছে, আপনি পারমিশন দিলে মিটিং-এ আমি বলব।

বলেই সে হাতের ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, ওহ্, দেরি হয়ে গেল। আমি এবার উঠব।

নীরা জিজ্ঞেস করল, কারখানা যাবেন তো ?

বিজিত বলল, না, আমি একটু বম্বে রোডের দিকে যাব। মানে, পাঁচ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে, পঞ্চাশ মাইল ঘুরে আসব।

নীরার খেয়াল হল, মধুসূদন নতুন কারখানার জায়গা হিসাবে এই রাস্তার কথাই লিখে রেখে গিয়েছেন। নীরা কব্জি উল্টে হাতের ঘড়ি দেখল। বেলা সাড়ে তিনটে। অবিশ্যি এই কয়েকদিন আগে বেড়িয়ে ফেরবার সময়ও সেই রাস্তা দিয়েই এসেছে। তবু হঠাৎ ওর মনে হল, বিজিতের সঙ্গে ও যাবে। বলল, আমি আপনার সঙ্গে গেলে আপনা অসুবিধা হবে ?

বিজিত অবাক হয়ে বলল, আপনি যাবেন !

অসুবিধা আছে কিছু ?

আমার কিছু নেই। ফিরতে দেরি হয়ে যেতে পারে। আপনি সারাদিন অফিস করেছেন, তারপরে এতটা রাস্তা।

কিছু হবে না। আপনি কি নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাবেন ?

হ্যাঁ।

নীরা একমুহূর্ত ভাবল। বলল, আমার গাড়িতে গেলে অবিশ্যি ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত।

বিজিত বলল, সেটা দেখুন, তবে আমি নিজে চালিয়ে যেতেই ভালবাসি।

নীরা রাজী হল, তাই চলুন। এক মিনিট, আমি দুটো টেলিফোন করে নিই।

boiRboi.net

বলে একটা ফোন করল ব্রজকিশোরকে। আর একটা বাড়িতে, কণাকে। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

নিচে এসে বিজিত গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরল নীরার জন্য।

নীরা বলল, আমি সামনেই বসব। বলে ও নিজেই দরজা খুলে বসল।

বিজিত অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে বসল। গাড়ি স্টার্ট করল।

কয়েক মিনিট পরেই নীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কলকাতার রাস্তায় এত স্পীডে গাড়িতে চড়তে ও অভ্যস্ত না। ও না বলে পারল না, এত স্পীডে চালাবেন না, আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

বিজিত আচমকা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল, ওহ্, আয়াম স্যরি।

নীরা বলল, আপনি কি সব সময়ে এরকম স্পীডে চালান নাকি?

বিজিত একটু কুণ্ঠিত হেসে বলল, হ্যাঁ, তাই তো চালাই।

নীরা বলল, খুব অন্যায় করেন। যে কোন মুহূর্তে অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে। এর মধ্যেই আপনি একবার ট্রাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছেন।

বিজিত বলল, তখন অন্যদিকে গাড়ি ছিল না।

তাই বলে চালিয়ে দেবেন? পুলিশও তো আছে, নম্বর নিয়ে নিতে পারে।

পুলিশ ছিল না, দেখেছি।

নীরা বলল, ও, সেটাও দেখে নিয়েছিলেন!

কথাটা গম্ভীর ভাবে বললেও, নীরার হাসিই পাচ্ছিল। মনে মনে না বলে পারল না, আচ্ছা ছেলেমানুষ তো! ইংল্যাণ্ড জাপান ঘোরা একজন যুবক, নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর চীফ এঞ্জিনিয়র, সে কি না পুলিশ নেই দেখে অবলীলায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছে! তাও তার পাশে বসে আছে কোম্পানীর ডিরেক্টর। আর এই লোকের ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের এক বিরাট কর্মকাণ্ড। হাসি পেলেও নীরা একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না। বিজিত নিতান্ত অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নয় তো?

বিজিত হাওড়ার ব্রিজ পার হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি ভাল গতিতেই এল। তারপরে তাকে প্রতি পদে পদেই বাধা পেতে হল। রাস্তা খারাপ, মাঝখানে ট্রাম লাইন এবং সংকীর্ণ। নীরার অস্বস্তি হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, বিদেশেও কি ও-রকম স্পীডে গাড়ি চালাতেন নাকি?

বিজিত একটু হাসল। বলল, দু'বার ফাইন দিয়েছি।

চমৎকার! নীরার আবার হাসি পেল মনে মনে। কিন্তু গম্ভীরভাবে বলল, সব সময়ই একটু সময় হাতে রেখে কাজে বেরোবেন, তা হলে তাড়াতাড়ি চালাবার দরকার হবে না। অভ্যাসটা বিপজ্জনক।

একটা ট্রামকার ওভারটেক করার পরে বিজিত জবাব দিল, আসলে আমি স্পীডের ব্যাপারটা লক্ষই করিনি।

নীরা বলল, কী করে করবেন, আপনি যে ওতেই অভ্যস্ত। কিন্তু অভ্যাসটা বদলানো দরকার। আপনার অনেক রেসপনসিবিলিটি আছে।

গার্ডেনরীচ সাইডিং-এর কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করাতে হল। গেট বন্ধ, বিরাট

boiRboi.net

লাইন পড়েছে। হাওয়া থাকলেও নীরার মুখে রোদ এসে পড়ছে। বিজিতের মুখে রোদ পড়েনি। কিন্তু সেও দরদর করে ঘামতে আরম্ভ করেছে। বিজিত ওর পাশের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, আপনি একপাশে এসে বসুন, রোদ লাগবে না। আমি একটু নেমে দাঁড়াই।

সে নেমে গেল। নীরা ড্রাইভারের সীটের দিকে সরে গেল। এখন আর ওর মুখে রোদ লাগছে না। স্টিয়ারিং-এর দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, ও অনেক কাল নিজের হাতে গাড়ি ড্রাইভ করেনি। কিন্তু বিজিত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? বাইরে ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল না, বাঁদিকে তাকিয়ে দেখল, বিজিত দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। দৃষ্টি লেভেল ক্রসিংয়ের দিকে। সে বোধহয় জানে না নীরা তাকে দেখতে পাচ্ছে।

নীরার হঠাৎ মনে হল, সেই পুরনো বিজিত আর এই বিজিতে অনেক তফাৎ হয়ে গিয়েছে। তখন কি সিগারেট খেত? কখনো দেখা যায়নি। এখন তাকে বেশ পাকা ধূমপায়ী বলে মনে হচ্ছে। নীরা না থাকলে হয়তো অনেক আগেই সিগারেট ধরাত। ডিরেক্টরের সম্মানে পারেনি। অথবা, সদ্য বিলাত ঘুরে এসেছে, মহিলার পাশে বসে সিগারেট খেতে ভদ্রতায় বেধেছে। তবে নীরাকে ছায়া দেবার জন্য যে বিজিত নেমে গিয়েছে, এতে তার বুদ্ধি আর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নীরা দেখল, বিজিতের শার্টের বুক খোলা, চওড়া রক্তাভ বুকে হাওয়া লাগাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে সিগারেট, মুখে বিরক্তি। লেভেল ক্রসিং-এর দিকেই তাকিয়ে আছে। নীরা ভাবল, শুধু ধূমপানের ওপর দিয়েই চলছে, না কি শ্রীমান বিলেত থেকে সুধাপানেও পোক্ত হয়ে এসেছে? তাছাড়া এতগুলো বছর বাইরে কাটিয়ে এল নিতান্ত কি নির্ভেজাল ভাবেই? বিদেশে বিদেশিনী এবং দেশিনী সবই ছিল। কোথাও কি মনের লেন-দেন ঘটেনি? এ ব্যাপারে ছেলেদের বিশ্বাস নেই।

নীরা হঠাৎ দেখল বিজিত এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির সারি নড়তে আরম্ভ করেছে। ও তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় সরে গেল। বিজিত গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

নীরা তখন নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জা বোধ করছে। বিজিতকে নিয়ে এত কথা ভাববার ওর কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ কত কথাই ভেবে বসল এইটুকু সময়ের মধ্যে। ও গম্ভীর ভাবে চুপ করে বসে রইল।

আন্দুল পেরোবার পরেই গাড়ির গতি আবার বাড়তে আরম্ভ করল। রাস্তা যতই ফাঁকা আর চওড়া হতে লাগল স্পীডোমিটারের কাঁটা ততই ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকল। কিন্তু বিজিতের সেদিকে কোন খেয়াল আছে বলে মনে হল না। নীরা যে তার পাশে বসে আছে সে কথাটাও বোধহয় মনে নেই। নীরা ওর চুলের গোছা সামলে রাখতে পারছে না। গায়ে কপালে চোখের ওপর এসে পড়ছে, বারে বারেই সরিয়ে দিচ্ছে। বিজিতের ভুরু পর্যন্ত গোটা কপাল এলোমেলো চুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, তার মুখটাই বদলে গিয়েছে।

স্পীডোমিটারের কাঁটা ক্রমে একশো কুড়ি স্পর্শ করল। ছোট পাতলা ফিয়াট গাড়ি থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে চাকার তলায় একটা সামান্য পাথর থাকলেও গাড়িটা ছিটকে আর এক দিকে আছড়ে পড়বে। নীরার যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট

boiRboi.net

হচ্ছে। মনে হচ্ছে আর একটু সময় এরকম চলতে থাকলে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অথচ বিজিতের একটুও লক্ষ্য নেই। ও প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, আস্তে চালান!

বিজিত সঙ্গে সঙ্গে গতি কমিয়ে বলল, ওহ্, সরি।

প্রায় ষাটের কাছে কাঁটা নেমে এল। নীরা বিজিতের দিকে ঘুরে তাকাল, একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কি বিশেষ কোন কাজে বিশেষ কোথাও যাচ্ছেন?

বিজিত একটু সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে বলল, না তো!

তবে এত জোরে চালাবার মানে কী? আমি কী বলেছিলাম তখন?

বিজিত এবার সত্যি অপ্রস্তুত আর লজ্জিত হয়ে উঠল। বলল, মাফ করবেন, আমার একবারে মনে ছিল না, মানে আমি—

নীরা বলে উঠল, স্ট্রেঞ্জ! এর মধ্যেই আপনি ভুলে গেলেন? আপনার খেয়াল নেই আর একজন আপনার সঙ্গে রয়েছে?

বিজিতের মুখ একেবারে অপরাধী বালকের মত হয়ে উঠল। কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে আবার বলল, মাফ করবেন, অন্যায় হয়ে গেছে।

নীরা মুখ ফিরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে ও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করল, মনে মনে একটু যেন লজ্জাও পেল।

নীরা বুঝতে পারছে, গতিটা বিজিতের কোন ইচ্ছাকৃত ব্যাপার না, এটাই তার স্বাভাবিক গতি। তার ভিতরটা পূর্ণমাত্রায় ছুটে বেড়াচ্ছে। তার গতিবেগটা এতই বেশি, নীরার একটু আগের কথা মনে নেই। কিন্তু মনে না থাকাটা অন্যায়। পাশেই নীরার অস্তিত্ব ভুলে যাবে কেন। ছেলেদের এই গতিবেগকে এই জন্যই ওর সন্দেহ হয়। ওরা যখন ছোটে তখন কোন দিকে খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকে না কার কোথায় কতখানি সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে!

নীরা বলল, আপনি তো রাস্তার দু'পাশটা দেখতে এসেছেন, না কি?

বিজিত বলল, হ্যাঁ।

কিন্তু যেভাবে চালাচ্ছিলেন, তাতে দেখা হচ্ছিল?

বিজিত বলল, আমি তো দেখতে দেখতেই যাচ্ছিলাম।

নীরা একটু হাসল, জিজ্ঞেস করল, কী দেখলেন?

বিজিত বলল, এমনি বিশেষ কিছু না। মোটামুটি দুপাশের খোলা জায়গায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি ভাবছি মিঃ রায় ঠিক এ রাস্তার ওপরেই কারখানার কথা কেন ভেবেছিলেন। এ বিষয়ে আমাকে কিছু লেখেননি।

নীরা বলল, বোধহয় অন্য কোথাও সেরকম সুবিধার জায়গা নেই। কলকাতার আশেপাশে, কোথাও আর জায়গা আছে বলে তো মনে হয় না। বিজিত বলল, তা ঠিক। তবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কারখানা করবার সব দিক থেকে উপযুক্ত জায়গা এখানে পাওয়া যাবে কি না। প্রথমত কলকাতার সাহায্য আমাদের পেতেই হবে। দ্বিতীয়ত পোর্টের সাহায্য আমাদের দরকার। তারপর কাছাকাছির মধ্যে কাজের লোকজন জোগাড় না হলে অসুবিধা হবে। তা ছাড়া আমি বিশেষ করে

boiRboi.net

ভাবছি, এ অঞ্চলে গভর্নমেণ্টের জমি আছে কি না।

নীরা জিজ্ঞেস করল, গভর্নমেণ্টের জমি কি আমাদের দরকার?

বিজিত বলল, ফাইনান্স কর্পোরেশনের সাহায্যটা আমরা নিতে পারি। আপাতত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে নিরানব্বুই বছরের লিজ নিয়ে কারখানা শুরু করা যায়। প্রাইভেট সোর্সের জমি পেতে নানান অসুবিধা আর জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে আমরা উৎসাহ পেতে পারি। এখনই জমির জন্য আমাদের টাকা খরচের দরকার হবে না। উপরন্তু, বিল্ডিং-এর জন্যও কর্পোরেশন আমাদের কিছু টাকা দিতে পারে। আমরা যা খরচ করব, তার ফিফটি পার্সেণ্ট কর্পোরেশন দেবে। এনি হাউ, আমার মতে গভর্নমেণ্টের জমি পেলেই ভাল হয়।

নীরা জিজ্ঞেস করল, সেটা কি ভাবে জানা যাবে?

বিজিত বলল, রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। বিশেষ বিভাগে, যেখানে ম্যাপ আর নথিপত্র আছে।

বিজিত এতখানি ভেবেছে দেখে নীরা মনে মনে খুশি হল। জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয়, এদিকে কারখানা করলে অসুবিধা হবে?

বিজিত বলল, সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। এ বিষয়ে আর সকলের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তবে মিঃ রায় যখন এ অঞ্চলের কথা ভেবেছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে কোন বিশেষ চিন্তা ছিল।

বিজিতের কথা শেষ হবার আগেই, নীরা দেখল, ডানদিকের নিবিড় নারকেল গাছের মাথার ওপরে খণ্ড খণ্ড বিচিত্র মেঘের সারি। বেলা শেষের রক্তাভা তার গায়ে। দূরে রূপনারায়ণের জল চিক চিক করছে। সামনেই রূপনারায়ণের সেতু। নীরা বলে উঠল, ওহ্, আমরা এখানে চলে এসেছি!

বিজিত বলল, আমরা পঞ্চাশ মাইল এসেছি?

নিশ্চয়ই। এই তো রূপনারায়ণের ব্রিজ। এখানে দাঁড়াবেন না, ব্রিজটা পার হয়ে দাঁড়ান।

বিজিত ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকে গাড়ি দাঁড় করাল। আগে নীরা নামল। নেমে ও সোজা ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। সূর্য অস্ত গিয়েছে। আসন্ন সন্ধ্যা, কিন্তু এখনো ছায়াঘন দিনের আলো রয়েছে। রূপনারায়ণের এক দিকে রেলের সেতু। আর এক দিকে নদী একটা বাঁক নিয়ে দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে, স্রোতের ধারায়, রক্তিম আকাশের রক্তাভা লেগেছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। দূরে গাছপালা দুলছে।

নীরা ব্রিজের প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়াল। যেন মনে হল ও একটা স্বপ্নের জগতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর কানের পাশে বাতাসের শন শন শব্দ। কপালে গালে চুল উড়ে এসে পড়ছে। তবু সরিয়ে দেবার কোন ইচ্ছা হচ্ছে না। মনটা গভীর একটা প্রশান্তিতে যেন ভরে উঠছে। গভীর প্রশান্তির মধ্যে আস্তে আস্তে একটা বেদনার তরঙ্গ এসে দোলা দিতে লাগল। বাবার কথা মনে পড়তে লাগল। মীরার কথা মনে পড়ল। একটা তীব্র কষ্টের অনুভূতি, না, যেন একটা বিবাগী ব্যথার মত বুকের কাছে টন টন করতে লাগল। ভাবল, জীবনটা এমন নিবিড় গভীর প্রশান্তির শুধু

না। এই নদীর মত বহু বাঁকে ফেরা, স্রোত এবং ঘূর্ণীর আবর্তে আবর্তিত। সুখ দুঃখ জ্বালা জটিলতা সবই তার মধ্যে থাকে।

নীরা কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ওর খেয়াল নেই। সহসা ফ্লুরেসেণ্ট আলোগুলো জ্বলে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ওর আচ্ছন্নতা কেটে গেল। দেখল নদীর বুকে সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে এসেছে। আকাশে কয়েকটা তারা ঝিকিমিকি করছে। এবার ও ডাইনে বাঁয়ে তাকাল, দেখতে পেল ব্রিজের আর এক দিকে বিজিত পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা এগিয়ে গিয়ে ডাকল, চলুন।

বিজিত সঙ্গে সঙ্গে ফিরল, বলল, চলুন।

গাড়ির কাছে এসে বিজিত বলল, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল। আপনাকে ডাকব ভাবছিলাম, কিন্তু মনে হল আপনি খুব তন্ময় হয়ে আছেন।

নীরা বলল, হ্যাঁ, আমার খুব ভাল লাগছিল। আমি এভাবে দাঁড়িয়ে রূপ-নারায়ণকে আর কখনো দেখিনি।

বিজিত গাড়ি স্টার্ট করল। ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সেতু পার হয়ে কলকাতার দিকে চলল। কিন্তু এবার গতিবেগ আর বাড়ছে না। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটবার পরে নীরা এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, শুনেছিলাম, আপনার মা আছেন। আরো কেউ আছেন নাকি?

বিজিত বলল, আর কেউ থাকবার কথা ছিল না। আমি বাইরে থাকবার সময়ে আমার মামা মারা যান। ছেলেবেলা থেকে আমি মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছি। মামা মারা যাবার পরে, পরিবারের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। দুই মামাতো ভাইকে এখন আমার কাছে এনে রেখেছি। একজন ইস্কুলে আর একজন কলেজে পড়ে।

নীরা ভেবে দেখল, বিজিতের কর্তব্য এবং কৃতজ্ঞতাবোধ দুটোই আছে। কিন্তু কেন হঠাৎ ও এরকম একটা প্রশ্ন করতে গেল! আসলে নীরার মনটা বেশ উদার হয়ে উঠেছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বিজিত একজন ওর পদস্থ কর্মচারী, এটাকে কোন বাধা বলে মনে হচ্ছে না।

নীরা বিদেশের কথা তুলল। জানতে চাইল বিজিত সেখানে কেমন ছিল।

বিজিত বলল, কাজ আর লেখাপড়া নিয়েই ও ব্যস্ত ছিল। এতগুলো বছরের মধ্যে দু'সপ্তাহের জন্য ফ্রান্স আর এক সপ্তাহের জন্য ইটালিতে গিয়েছিল।

নীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কোথাও নয়?

বিজিত হেসে বলল, সময় ছিল না। ঠিক মত কাজ করতে গেলে সপ্তাহে এক-দিনের বেশি সময় পাওয়া যায় না। অন্যান্য দিনেও আড্ডা দেবার সময় পাওয়া যায় না। মিঃ রায়ের খুব ইচ্ছা ছিল আমি যেন একবার ইউ. এস. ঘুরে আসি। সে সময় ছিল না। তবে উনি আমাকে জাপানে যে কারণে এক বছর কাটিয়ে আসতে বললেন, সে বিষয়ে কোন কথাই হল না। ভেবেছিলেন, আমি ফিরে এলে বলবেন।

নীরা চুপ করে রইল। ভাবল, বাবার অনেক ভরসা ছিল বিজিতকে নিয়ে।

বিজিত হঠাৎ বলল, আপনি একবার বাইরে ঘুরে আসুন না।

নীরা অবাক হয়ে বলল, আমি!

নয় কেন?

boiRboi.net

নীরা এ ভাবে বললেও, মনে মনে বহুবার এই চিন্তাটা তার এসেছে। অনেকবার ভেবেছে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবে। আজকাল আর সে সব ভাবনা বিশেষ আসে না। যখন মীরা বেঁচে ছিল, যখন জীবনটা অন্য একটা স্রোতে চলছিল, তখন বাইরে যাবার কথা ভাবত। অনেকবার কথাবার্তাও হয়েছে, পৃথিবীর পশ্চিম জগৎটা ঘুরে আসবে। কিন্তু সে সব এখন অতলে চলে গিয়েছে।

নীরা বলল, ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন তো সামনে অনেক কাজ, বছর দুয়েক কোথাও যাওয়া যাবে না।

বিজিত বলল, কেন যাওয়া যাবে না। প্রাথমিক কাজকর্মগুলো শুরু করে দিয়ে অনায়াসেই চলে যেতে পারেন। আশা করি সে দায়িত্ব আমরা বহন করতে পারব।

নীরা হঠাৎ কোন জবাব দিল না। কেবল এই মুহূর্তে ওর মনে হল, ও কত একা। একলা একলা ও কোথায় যাবে। ইওরোপ আমেরিকায় একলা বেড়িয়ে বেড়াতে কি ওর ভাল লাগবে। অবশ্য এখানেও একলা। কিন্তু এই কলকাতায় একলা থাকার মধ্যেও জীবনের অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে। প্রতিদিনের অফিস আছে, বাড়ি আছে, সর্বোপরি কলকাতা শহরটা আছে। এ কথা বিজিতকে বলা যায় না। সে বুঝবে না।

নীরা যদি বাবার সঙ্গেও যেতে পারত, তাহলে সব থেকে ভাল হত। সে কথা ভেবে তার লাভ নেই।

বিজিত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাদের ওপর ভরসা করতে পারছেন না?

নীরা বলল, তা নয়। আপনাদের ওপর ছাড়া কাদের ওপর ভরসা করব। আসলে আমার যাবার সে রকম মন নেই।

বিজিত আবার বলল, আমার মনে হয় আপনি কিছুকাল বিদেশে কাটিয়ে এলে ভাল হয়। আপনাকে আমি যে রকম দেখেছিলাম, সেই তুলনায় আপনাকে অন্য-রকম দেখছি।

নীরা মনে মনে অবাক হলেও সহজভাবেই জিজ্ঞেস করল, কী রকম।

বিজিত বলল, মানে, আপনাকে যে রকম দেখেছি, সেরকম নেই। আপনি যেন খুবই টায়ার্ড আর ডিপ্রেসড্।

নীরার পক্ষে কি সেটা খুব আশ্চর্যের কথা? আর বিদেশে গেলেই কি ওর বিমর্ষতা আর অবসন্নতা দূর হয়ে যাবে? মনে তো হয় না। কিন্তু নীরার বিমর্ষ অবসন্নতা বিজিতের চোখেও পড়েছে? বিজিত আসলে সেই পুরনো দিনের নীরার কথা বলছে। যখন নীরার জীবনটা ছিল রোমান্টিক রসে পূর্ণ। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসতে চাইল। নীরা তা দমন করল।

গার্ডেনরীচ লেভেল-ক্রসিং খোলা আছে দেখে বিজিত বলে উঠল, যাক, খোলা আছে।

নীরা হেসে বলল, ভয় পাচ্ছিলেন বন্ধ থাকবে?

কিছুই তো বলা যায় না।

নীরা হঠাৎ বলল, আপনি ইচ্ছে করলে স্মোক করতে পারেন।

boiRboi.net

বিজিত চমকে উঠে শব্দ করল, অ্যাঁ ?

নীরা মনে মনে হাসল। গাড়ি দাঁড় করাতে হলে বিজিত নেমে নিশ্চয় সিগারেট ধরাত। এতক্ষণ গাড়ি চালিয়ে আসছে, বেচারিকে একটু ধূমপানের অনুমতি দেওয়া দরকার।

বিজিত কিন্তু কোন কথা নয়, নীরার অনুমতি পেয়েই সিগারেট বের করে গাড়ি চালাতে চালাতেই বেশ পটুতার সঙ্গে দেশলাই জ্বেলে ধরাল।

নীরাদের বাড়ির সামনে এসে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন রাত্রি ন'টা বেজেছে। নীরা তখন সত্যি ক্লান্ত বোধ করছে। তবু বিজিতকে বলল, একটু চা বা কফি কিছু খেয়ে যান।

বিজিত বলল, এখন থাক। আপনার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যাই।

নীরা বলল, ঠিক আছে। পরশুর মিটিং-এ আপনি থাকছেন।

আচ্ছা। সম্মতি জানিয়ে বিজিত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

●

নির্ধারিত দিনে মিটিং বসল। সকলেই এসেছেন। মধুসূদনের চিঠি এবং নোট-বুক সকলেরই পড়া হয়ে গিয়েছে। কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট মিঃ মুখার্জিও আজকের মিটিং-এ আছেন। বিজিতও রয়েছে। কিছুক্ষণ আলোচনার পরেই বোঝা গেল চীফ এঞ্জিনিয়র মিঃ ঘটক এবং বাইরের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনজন নতুন প্রজেক্টের বিরুদ্ধে মত পোষণ করছেন। তাঁরাই তাঁদের বক্তব্য আগে বললেন। পদাধিকার বলে মিটিং-এর সভাপতি নীরা।

অন্যান্যেরা কিছু বলার আগে ব্রজকিশোর সভার কাছে প্রস্তাব করলেন, কোম্পানীর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফ এঞ্জিনিয়রকে কিছু বলতে দেওয়া হোক। নীরার সঙ্গে তাঁর সেভাবেই কথা হয়েছিল। নীরা সম্মতি দিল।

বিজিত উঠে দাঁড়াতেই, বিরুদ্ধ সদস্যদের একজন বললেন, বোর্ডের সদস্য হিসাবে স্বয়ং চীফ এঞ্জিনিয়র যখন অন্য মত পোষণ করেন, তখন সদস্য না হয়েও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফের কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

নীরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি মনে করি আছে। কারণ স্বর্গত মধুসূদন রায় বেঁচে থাকতে এঁর সঙ্গে নতুন প্রজেক্ট নিয়ে অনেক পত্রালাপ করেছেন, আপনারা জানেন। এবং নতুন প্রজেক্টের কথা ওঁর চিঠি থেকেই উত্থাপিত হয়েছে। সেই হিসাবে, আমি মনে করি, সভার কাছে উনি বললে ভাল হয়।

মিঃ ঘটক বলে উঠলেন, এ বক্তব্য কি রেকর্ড হবে ?

নীরা বলল, যদি আপনারা না চান, হবে না। তবে আমি কোন বাধা দেখি না।

ঘটক বললেন, কিন্তু উনি বোর্ডের সদস্য নন।

ব্রজকিশোর বললেন, ঠিক আছে, রেকর্ড হবে না।

মিঃ ঘটকের এবং আরো কয়েকজনের মুখের বিরক্তি ও গাম্ভীর্য তাতে ঘুচল না। বিজিত বলতে উঠল। একটানা প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে সে বলে গেল। ভবিষ্যতের প্রজেক্টের সে একটা মোট চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরল। বিশেষ ভাবে বলতে চাইল,

BoiRboi.net

নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকবে। নতুন কোন চাপ সৃষ্টি হবে না। সদস্যদের মনে এটা নিয়ে কোন ভীতি থাকতে পারে ভেবেই সে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে বলল। মার্কেট সম্পর্কে সে যে নির্ভয় সে কথাও জানাল। সবশেষে তার বক্তব্য ঃ এসব তার নিজের কথা নয়, মিঃ রায়ের কথাই সে একটু ছকে সাজিয়ে বলল মাত্র।

বিজিত বলবার সময় কোন বাধা পেল না। সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপরে ব্রজকিশোর বললেন, মোটামুটি বিজিতের বক্তব্যের সমর্থনে। বাকী দুজন সদস্য, কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী আর চীফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মিঃ মুখার্জী নতুন প্রজেক্টের সমর্থনে মতামত দিলেন। মিঃ মুখার্জী অর্থকরী দিকটাই বিশদ ভাবে বললেন। সকলের শেষে নীরা বলল। ওর কথায় অবিশ্যি যুক্তির থেকে আবেগটাই বেশি প্রকাশ পেল। ও এই নতুন প্রজেক্টকে পিতার আরব্ধ কাজ এবং ব্রত পালন হিসাবে ব্যাখ্যা করল।

এই মিটিং-এই মোটামুটি স্থির হয়ে গেল, নতুন প্রজেক্ট হবে। পরবর্তী আর একটি সভা ডাকা হল। বিষয়সূচী, কী ভাবে প্রাথমিক কাজ শুরু হবে।

পরবর্তী সভার আগেই, বিজিত একদিন টেলিফোন করে নীরার কাছে এল। রাইটার্স থেকে হাওড়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাণ্ডের একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছে। পঁচিশ মাইলের মধ্যেই একটা জায়গাও সে চিহ্নিত করে এনেছে। জায়গাটা রাস্তার ওপরেই। নীরা ব্রজকিশোরকে ডাকল। তিনজনে মিলে জায়গাটার বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। বিজিতের বক্তব্য ঃ যতটা কাছাকাছি থাকা যায় ততই ভাল। সে এখনই জায়গাটা দেখে আসতে চায়। কেননা তারপরেই অনেকগুলো কাজ আরম্ভ করতে হবে। নীরা নিজে তো সঙ্গে যেতে চাইলই, ব্রজকিশোরকেও নিয়ে যেতে চাইল। আজ আর নীরা বিজিতকে গাড়ি চালাবার সুযোগ দিল না। ওর নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোল। চালক ওর ড্রাইভার।

যাবার সময় রাইটার্স থেকে বিজিত তার পরিচিত একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে গেল। এই কর্মচারীটি জায়গাটা সঠিক দেখাতে পারবে।

গন্তব্যে পেঁছে জায়গাটা বের করতে বেশি সময় লাগল না। প্রায় কুড়ি বিঘার মত জমি। রাস্তা থেকে খুব বেশি নিচে না হলেও জমিটা নিচুই। রাস্তার সমান করতে বেশ কিছু ব্যয় হবে। ব্রজকিশোর নিচু জমি দেখে একটু আপত্তি তুললেন। সরকারী কর্মচারীটি এ অঞ্চলের জমি সম্পর্কে বিশেষ অবহিত। সে জানাল, গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাণ্ড সবই প্রায় একরকম। বরং কোথাও কোথাও জমি এর থেকেও নীচু। কলকাতার কাছাকাছি এর থেকে ভাল জমি পাওয়া অসম্ভব।

নীরা দেখল বিজিত আর কোন জমি দেখবার পক্ষপাতী না, এবং সে যেন ধরে নিচ্ছে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এমন কি বিজিত একথাও একবার বলল, বেশি দেখতে গেলে কালহরণ হবে মাত্র। যেন সব ব্যাপারটা বিজিতের একলারই। এটাকে নীরার ঈর্ষা বলা যাবে কি না বলা যায় না, কিন্তু ও রেগে উঠল। ও ব্রজকিশোরকে বলল, বোসকাকা, জমি সম্পর্কে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা আরো জমি দেখতে চাই।

boiRboi.net

বিজিত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করল না। ব্রজকিশোর বললেন, মিঃ মুখার্জী, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী এবং অন্য একজন এক্সপার্টকে দিয়ে দেখিয়ে মতামত নিলেই হবে।

নীরা বলল, তাই করুন।

এ বিষয়ে বিজিতের সঙ্গে নীরা আর কোন কথা বলল না। ব্রজকিশোর একবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মত কী বিজিত?

বিজিত বলল, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে।

বিজিতের জবাবটা শোনবার জন্য নীরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। জবাব দেবার সময় একবার নীরার দিকে ও দেখল। নীরা ওর গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে নিল।

পরের দিনই ব্রজকিশোরের সঙ্গে আবার জমি নিয়ে কথা হল। একজন সরকারী সিভিল এঞ্জিনিয়রকে ডাকা হল। তারপরে মিঃ মুখার্জী এবং চক্রবর্তীকে নিয়ে নীরা আবার জমিটা দেখতে গেল। এবার আর বিজিতকে ডাকা হল না। কিন্তু সকলের মতে এ জায়গাটাই উপযুক্ত বিবেচিত হল। নীরা তথাপি আরো জমি দেখবার কথা তুলল। কেউ আপত্তি করল না। সারাদিনের সময় নিয়ে আরও জমি দেখা হল। এক্সপার্টের মতামত নিয়ে দেখা গেল, প্রথম জায়গাটাই ঠিক বাছাই করা হয়েছে।

এই সাতদিনের মধ্যে আর একটা মিটিংও হয়ে গিয়েছে। সেই মিটিং-এ বিজিতকে ডাকা হয়নি। ব্রজকিশোর বলেছিলেন, নীরা প্রয়োজন বোধ করেনি। সেই মিটিং-এ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে জমি নিয়ে নেগোসিয়েশনের বিষয় স্থির হয়েছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অফিসার মিঃ নন্দীকে।

প্রায় ন'দিন পরে নীরা বিজিতকে টেলিফোন করল। তাকে কারখানায় পাওয়া গেল না। নীরা জানিয়ে রাখল, সে এলেই যেন ওকে অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিজিত এল চারটের পরে। নীরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, আপনার খবর কী, কোথায় ছিলেন আপনি?

বিজিত বলল, আজকের সকালের কথা বলছেন?

না, গত ন'দিন ধরেই আপনার কোন খবর নেই।

বিজিত বিব্রত হয়ে বলল, আপনি খোঁজ করেছিলেন নাকি আমার?

নীরা বলল, খোঁজ না করলে আসতে নেই?

বিজিতকে একটু বিষাদগ্রস্ত মনে হল। কী বলবে ভেবে পেল না। একটু পরে বলল, আপনি ডাকেননি। তাই আসিনি।

নীরা জিজ্ঞেস করল, ওবেলা কোথায় ছিলেন?

রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিলাম।

কেন?

আই. আর. ও. মিঃ নন্দী ডেকে নিয়ে গেছলেন।

আপনাকে! কেন?

জমির ব্যাপারে নেগোসিয়েশনের জন্য কথাবার্তা বলতে।

তার মানে কী মিঃ নন্দী তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারলেন না?

বিজিত বলল, তা ঠিক নয়। মিঃ নন্দী জানতেন, আমি আগেই নেগোসিয়েশন

boiRboi.net

কিছুটা এগিয়ে রেখেছিলাম।

আগেই এগিয়ে রেখেছিলেন? তার মানে আপনি জানতেন ওই জমিটাই নেওয়া স্থির হবে?

অনুমান করেছিলাম।

নীরার মনের উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছিল। ওর ইচ্ছা ছিল বিজিতকে ডেকে ও নিজেই বলবে, প্রথম দেখা জমিটাই কারখানার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে এবং বিজিতের সিদ্ধান্তই ঠিক। কিন্তু বিজিত সেজন্য অপেক্ষা করেনি, সে নিজে যা বুঝেছে তাই করেছে। নীরা বলল, কিন্তু নেগোসিয়েশনের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। আপনি আগেই কথা বললেন কেন?

বিজিত বলল, ভাবলাম কাজটা এগিয়ে থাকবে।

নীরা বলল, অন্যায় করেছেন। আর এভাবে কাজ এগিয়ে রাখবেন না।

বিজিত একবার নীরার দিকে দেখল, বলল, আচ্ছা।

বিজিত প্রায় এক কথাতেই যেন সব শেষ করে দিল। নীরা জিজ্ঞেস করল, আরো কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছেন নাকি?

রেখেছি।

নীরার চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কী করেছেন?

বিজিত বলল, জমিটা ইমিডিয়েট্‌লি উঁচু করবার জন্য ছাই রাবিস আর মাটি ঢালবার ঠিকেদারকে ডেকেছি।

সে কার সঙ্গে কথা বলবে?

আপনাদের সঙ্গে।

ওকে আপনি ডাকতে গেলেন কেন?

বিজিত চুপ করে রইল, কোন জবাব দিল না। এতক্ষণ অনেক প্রশ্নের জবাব দেবার পরে, এই প্রথম দেখা গেল, সে নীরব এবং তার মুখে শক্ত অথচ একটা হাসির ছোঁয়া যেন লেগে আছে। শুধু তা-ই না, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি এসবে আপত্তি করছেন!

নীরা বলল, হ্যাঁ, আপনার যা কাজ আপনি তাই করবেন।

বিজিত বলল, আচ্ছা।

নীরা পরমুহূর্তে আর কোন কথা খুঁজে পেল না। বিজিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তা হলে এখন যাচ্ছি।

নীরা কিছু জবাব দেবার আগেই ব্রজকিশোর ঢুকলেন। নীরাকে কিছু বলতে গিয়েও বিজিতকে দেখে বলে উঠলেন, এই যে বিজিত, তুমি এখানে আছ, ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ দরকার।

বিজিত চকিতে একবার নীরার মুখের দিকে দেখল, জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্রজকিশোর বললেন, মিনিস্টার মজুমদারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে না?

হ্যাঁ।

তোমার সঙ্গে কথা বলে উনি খুব খুশি। এইমাত্র আমার সঙ্গে ফোনে কথা হল।

boiRboi.net

জমির ব্যাপারে তদন্তের জন্য উনি দেরি করবেন না। বললেন, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের হাতে বিষয়টা তুলে দিলে দেরি হবে, উনি এক সপ্তাহের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমাকে উনি আগামী পরশু আর একবার যেতে বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে জমি উঁচু করার জন্য তুমি যে ঠিকেদারকে বলেছ, আমাদের আই. আর. ও. তার বদলে আর একজনের কথা বলছে। কিন্তু মিঃ নন্দী যার কথা বলছে আমি জানি সে লোকটা ফাঁকিবাজ। আমাদের হেভি প্রজেক্টের ব্যাপারে—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বিজিত নরম গম্ভীর স্বরে বলল, মিঃ বোস, ও লোকটিকে ডেকে আমি অন্যায় করেছি। এ বিষয়ে আপনারা যা ব্যবস্থা করবেন, তাই হবে।

ব্রজকিশোর অবাক হয়ে বললেন, তার মানে ?

বিজিত কিছু বলল না। ব্রজকিশোর একবার নীরার দিকে দেখলেন।

নীরা বলল, বসুন বোসকাকা।

বিজিত আবার বলল, আমি যাচ্ছি।

সে বেরিয়ে গেল। ব্রজকিশোর অবাক হয়ে নীরার দিকে তাকালেন। নীরার চোখে মুখে লজ্জা ফুটে উঠল। ব্রজকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বল তো ? বিজিতকে একটু অন্যরকম লাগল।

নীরা বলল, আমি বিজিতবাবুকে কয়েকটা কথা বলেছি। অবিশ্যি কথাগুলো একটু রাফ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে উনি সমস্ত ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি করেছেন।

ব্রজকিশোর তবু অবাক, বললেন, তাই নাকি ? কি ব্যাপার বল তো ?

নীরা সব ঠিক বলতে পারছে না, এমনি একটা ভাব। তারপরে জানাল, বিজিতকে ও কি কি বলেছে। ব্রজকিশোর সব শুনে চুপ করে রইলেন।

নীরা জিজ্ঞেস করল, আমি কী অন্যায় করেছি বোসকাকা ?

ব্রজকিশোর আমতা আমতা করে বললেন, দোষ ঠিক বলব না, তবে কী না, ওকে বোধ হয় এতটা না বললেই পারতে। সকলেই সকলের কাজ করবে ঠিকই, তবু আমার মনে হয়, বিজিতের দায়িত্বই বোধ হয় বেশি। ও যা করছে, তা ওর উৎসাহে আর গরজেই করছে। তবে তোমার যদি মনে হয়ে থাকে—

নীরা বলে উঠল, না, না, আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। এখন বরং মনে হচ্ছে আমি ওঁকে একটু বেশি বলে ফেলেছি।

নীরা নিজের মনটা বুঝতে পারছে। কিন্তু সে কথা ব্রজকিশোরকে বোঝাতে পারছে না। নীরা মনে মনে বিজিতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে, সে কথা কেউ জানে না। ও বলল, জমি উঁচু করার জন্য বিজিতবাবু যাকে কণ্ট্রাক্ট দিতে চান, তাকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ব্রজকিশোর বললেন, তাই করব। তোমাকে একটা কথা বলি। বিজিত কেবল একটা প্রবল উৎসাহ নিয়েই নামেনি, একটা চ্যালেঞ্জও ওর মধ্যে আছে। আমার মনে হয়, তুমি ওর প্রতি নির্ভর করতে পার।

নীরা বলল, তাতে বিজিতবাবুর ওপরে বেশি চাপ পড়বে না কী ?

boiRboi.net

ব্রজকিশোর বললেন, চাপ পড়লে ও নিজেই বলবে। তবে সমস্ত ব্যাপারটার প্রস্তুতি-পর্ব সবই ওর মাথার মধ্যে তৈরি হয়ে আছে।

নীরা স্বীকার করল, আমার ভুলই হয়ে গেছে। আমি সব ঠিক করছি।

ব্রজকিশোর আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। নীরা হাত তুলে ঘড়ি দেখল। খানিকটা অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা ফাইলপত্র দেখল, দু-একটা রিপোর্ট এবং চিঠি পড়ল। এইভাবে আধঘণ্টা সময় কাটিয়ে কারখানায় টেলিফোন করল। বিজিতকে চাইল। শোনা গেল, সে কারখানায় নেই। আর প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আবার ফোন করল। তখনও শোনা গেল, বিজিত কারখানায় নেই।

নীরা অতঃপর মিঃ নন্দীকে ডাকল। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। মিনিস্টার কী বলেছেন না বলেছেন, জমির ব্যাপারে কত দেরি হতে পারে ইত্যাদি। যদিও সবই ওর জানা। ভেবেছিল নন্দীকে জিজ্ঞেস করবে, তিনি কেন বিজিতকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। নন্দী নিজে থেকেই সে কথা বললেন, বিজিত যাওয়াতে কী সুবিধা হয়েছে, মিনিস্টার কী রকম ইম্প্রেসড্‌ হয়েছেন তাও বললেন। নন্দীকে বিদায় দিয়ে নীরা মিঃ মুখার্জিকে ডাকল, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। প্রধানত নতুন প্রজেক্ট এবং ব্যাংকে তার নতুন অ্যাকাউণ্ট খোলা নিয়ে কথা হল। মিঃ মুখার্জিকে বিদায় দিয়ে আবার কারখানায় টেলিফোন করল। অফিস বেয়ারার সেই একই জবাব, সাহেব এখনো কারখানায় আসেননি।

নীরা ঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা। তার মানে, আজ বিজিত কারখানায় ফিরবে না। নীরার এখান থেকে বেরিয়ে, হয় সে বাড়ি গিয়েছে বা অন্য কোথাও গিয়েছে। কোথায় যেতে পারে কে জানে। একটা অস্বস্তি আর অশান্তির কাঁটা মনের মধ্যে বিঁধে আছে। বিজিতের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। এখন নিজের উত্তপ্ত কথাগুলো মনে করে নিজেরই লজ্জা করছে। ওর চোখের সামনে ভাসছে বিজিতের জিজ্ঞাসু অবাক চোখ। সে বুঝতে পারছিল না, নীরা কেন ওরকম কথা বলছে।

ব্রজকিশোর এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি যাবে তো নিরু?

নীরা বলল, হ্যাঁ, এইবার যাব।

নীরা ভেবেছিল, ও কারখানায় যে কয়েকবার টেলিফোন করেছে, সে খবর পেয়ে বিজিত নিশ্চয় ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিন্তু পরের দিন বিজিতের কাছ থেকে কোন টেলিফোন পর্যন্ত এল না। নীরাও টেলিফোন করল না। ভাবল, দেখা যাক বিজিত কী করে।

বিজিত কিছুই করল না। তার পরের দিন বেলা তিনটের একটু আগে ব্রজকিশোর এলেন নীরার ঘরে। গম্ভীরভাবে বললেন, মিঃ নন্দীর আজ বিজিতকে নিয়ে রাইটার্সে যাবার কথা। মিনিস্টার মজুমদার চারটের সময় যেতে বলেছেন। বিজিতকে বিশেষ করে। মিঃ নন্দী এখন বিজিতকে কারখানায় টেলিফোন করেছিলেন আসবার জন্য। বিজিত জানিয়েছে, ডিরেক্টরের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব না।

নীরার ভুরু কুঁচকে উঠল, বলল, তাই নাকি?

ব্রজকিশোর বললেন, ছেলেমানুষ আর কাকে বলে। মিনিস্টার ওকে খাতির করে

boiRboi.net

যেতে বলেছেন, সেসব ওর গ্রাহ্য নেই।

নীরার চোখে বিজিতের মুখটা ভাসল। ছেলেমানুষ তো বটেই, এখন বোঝা যাচ্ছে, গোঁয়ারও আছে খানিকটা। ছেলেমানুষি গোঁয়ার্তুমি। ও জিজ্ঞেস করল, মিঃ নন্দীর সঙ্গে আমি গেলে কেমন হয় ?

তুমি যাবে ? সেটা অবিশ্যি খারাপ কিছু হবে না, তবে—। ব্রজকিশোর কথাটা শেষ করলেন না।

নীরা জিজ্ঞেস করল, ইনফ্লুয়েন্সড্ হবেন না ?

মজুমদার অলরেডি ইনফ্লুয়েন্সড্, বিজিত সব করেই এসেছে। বিজিতকে ওঁর খুব ভাল লেগেছে।

নীরা একবার ভাবল, বিজিতকে ভাল লাগতে পারে, ওকেই বা লাগবে না কেন। কিন্তু ও নিজেকে সংযত করল। নিজের জিদের জন্য কাজের ক্ষতি করে লাভ নেই। ও টেলিফোন করল বিজিতকে।

বিজিতের চেনা গলা শোনা গেল, হ্যালো, বিজিত দত্ত।

আমি মিস রয় বলছি।

বলুন।

আপনি মিঃ নন্দীর সঙ্গে এখনই রাইটার্সে চলে যান, ব্যাপারটা জরুরী।

নিশ্চয়ই যাব, এখনই যাচ্ছি।

বিজিতের গলার স্বর এত মোলায়েম আর বাধ্য, যে নীরার কানে বিদ্রূপের মত শোনাল। ও বলল, রাইটার্স থেকে ফিরে এখানে একবার আসবেন।

আচ্ছা।

নীরা ফোন নামিয়ে রাখল।

ব্রজকিশোর বললেন, আমি নন্দীকে খবরটা দিই।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। নীরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপরে কাজে মন দেবার চেষ্টা করল।

সাড়ে পাঁচটার সময় ব্রজকিশোর এসে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি যাবে তো ?

নীরা বলল, বিজিতবাবুকে আসতে বলেছি। আপনি চলে যান, আমি পরে যাচ্ছি।

ব্রজকিশোর বললেন, বিজিতের সঙ্গে কাল কথা বললেও তো হবে। কতক্ষণ বসে থাকবে ?

নীরা বলল, বলেছি যখন একটু দেখেই যাই।

ব্রজকিশোর বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন, কোন কিছু নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নীরা বুঝতে পারছে ব্রজকিশোর চিন্তিত হচ্ছেন। নীরা কি সত্যি খুব দুশ্চিন্তা করছে ? ওর নিজের সেরকম তো মনে হচ্ছে না। সামনে এত বড় একটা কাজ, তার জন্যে ওর মনে একটুও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। কেন নেই তা ও জানে না। ওর নিজেরও ধারণা সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর নিজের যদি কোন চিন্তা থাকে, তা হলে একটাই আছে, নতুন কাজের মধ্যে ওর ভূমিকা যেন ছোট হয়ে না যায়।

প্রায় পৌনে সাতটার সময় বিজিত এল। নীরা ঘড়ি দেখে বলল, বসুন।

boiRboi.net

বিজিত বসল। নীরা জিজ্ঞেস করল, মিঃ নন্দী কোথায় ?

তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

রাইটার্সে আজ কী হল বলুন ?

সবই হয়ে গেল। আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছলাম। ম্যাপ কাগজপত্র সবই সঙ্গে ছিল। মিঃ মজুমদার দুজন অফিসারকে ডেকে পাঠালেন, কথা বললেন, কাগজপত্র দেখলেন, বলতে গেলে ঘরে বসেই তদন্ত করলেন, অনুমোদনপত্রে সই করেও দিয়েছেন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিভাবে আমরা অগ্রসর হব, কী চিন্তা করছি। সব শোনবার পরে, অফিসারদের বিদায় দিয়ে বললেন, তাঁর কিছু বেকার ক্যান্ডিডেট আছে, ভবিষ্যতে তাদের যেন আমরা কাজে নিই। অবিশ্যি যার যে-রকম যোগ্যতা, তাকে সেইভাবে নিলেই হবে। আমি বলেছি, আমরা তা নেব। বলেই বিজিত নীরার দিকে একবার দেখল, আপনার কি মনে হয় ঠিক বলেছি ?

বিজিত কথাটা কেন বলল, নীরা তা জানে। বলল, ঠিকই তো বলেছেন। একটু থেমে নীরা আবার বলল, যখন যেটা ভাল বুঝবেন সেই রকমই বলবেন বা করবেন, তার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের দরকার নেই।

নীরা কথাটা বলছিল টেবিলের দিকে তাকিয়ে, পেনসিল ঠুকতে ঠুকতে। কথার শেষে চোখ তুলে দেখল, বিজিত ওর দিকে জিজ্ঞাসু অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বিজিত দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাল। বলল, আপনি শুধু আমাকে একটু বিশ্বাস করবেন।

নীরা বলল, আপনাকে আমি একটুও অবিশ্বাস করি না। কেবল একটা কথা, আমাকে সব কিছু জানাবেন।

বিজিত বলল, কোন কাজই আপনাকে না জানিয়ে করা সম্ভব না। কেবল ছোটখাটো কাজে আপনাকে ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। দেখছি তো, আপনার উপর কত কাজের চাপ।

নীরা বলল, তা হোক, আমি কাজকে ভালবাসি, তা সে ছোট বড় যা-ই হোক। কাজই আমার জীবন।

বিজিত নীরার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিজিতের দিকে তাকিয়ে নীরার হঠাৎ কেমন লজ্জা করে উঠল, বিজিতের চোখে যেন একটা বিষণ্ণ করুণ ছায়া। কেন, বিজিতের এই দৃষ্টির অর্থ কী ? মুহূর্তের মধ্যেই নীরা অনুমান করে নিল। নীরার জীবনটা শুধু কাজের, এই কথাটাই বিজিতের দৃষ্টি বদলে দিয়েছে। নীরা গম্ভীর হয়ে উঠল। ও উঠে দাঁড়াল। বিজিতও উঠে দাঁড়াল। নীরা টেবিলের পাশ থেকে ওর ব্যাগ তুলে নিল। জিজ্ঞেস করল, আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

বিজিত ঘড়ি দেখে বলল, আপাততঃ বাড়ি।

নীরার পিছন পিছন বিজিত ঘরের বাইরে এল। অফিস ফাঁকা। নীরার বেয়ারা দুজন দাঁড়িয়ে আছে। সেলাম করল। দুজনেই লিফটে নিচে নেমে এল। বিজিত বলল, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল আজ।

নীরা বলল, আপনার ?

আমার তো রোজই দেরি হয়। আমি এ সময়ে কারখানা থেকে ফিরি।

boiRboi.net

নিচে গাড়ির সামনে এসে নীরার ড্রাইভার এগিয়ে আসবার আগেই বিজিত গাড়ির দরজা খুলে ধরল। নীরা চকিতে একবার বিজিতের দিকে দেখে গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বিজিত দরজা বন্ধ করে দিল। নীরা অস্ফুটে একবার বলল, চলি।

ওর গাড়ি এগিয়ে গেল।

●

এর পরে নতুন প্রজেক্টের কাজ শুরু হল পূর্ণোদ্যমে। এক বছরের মধ্যে নতুন কারখানা ইমারত গড়ে উঠল। বিদেশ থেকে ভারি যন্ত্রপাতিও এসে পড়েছে ; এবং তা বসতেও আরম্ভ করেছে। মেসিনারি সবই কানাডা থেকে আনা। যে-কোম্পানী মেসিনারি দিয়েছে তারা একজন বিশেষজ্ঞও পাঠিয়েছে।

বিজিত প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। নীরাও বাদ নেই। নীরা দুদিক সামলে চলেছে। একদিকে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ, আর একদিকে নতুন কারখানা। অবিশ্যি বিজিতও দুদিক রক্ষা করে চলেছে। বিজিত নীরার কথা রেখেছে। সে সব সময়ে নীরাকে সব জানিয়েছে, বুঝিয়েছে। নীরা নিজের উৎসাহে সব সময়েই নতুন প্রজেক্টের কাজে থাকবার চেষ্টা করে। প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় অফিস থেকে বেরিয়ে পঁচিশ মাইল দূরে নতুন কারখানায় যায়। হয় একলা না হয় বিজিতের সঙ্গে। ফিরতে রোজই অনেক রাত্রি হয়ে যায়। বিজিত বা ব্রজকিশোর দুজনেই নীরাকে নিরস্ত করতে চায়, পারে না। কিন্তু এ সবের মধ্যে নীরার কাছে আজ আর গোপন নেই, বিজিত সব সময়েই ওর কাছে কাছে থাকতে চায়। বিজিত মুখে বলে, নীরার এত পরিশ্রম সইবে না। তবু অফিসে বা কারখানায় সে নীরাকে খুঁজে বেড়ায়, টেলিফোনে যোগাযোগ করে। নীরার আর সেই মন সেই চোখ না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু ওকে দেখলে যে বিজিতের চোখে মুখে আলো ফুটে ওঠে, ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, তা ও স্পষ্ট দেখতে পায়।

নীরা ভাবে, ওর নিজের কি সে-রকম কিছু হয় ? যত ভাবে, বিজিতের সামনে তত গম্ভীর হয়ে উঠতে চায়। না, বিজিতের চোখের আলোকে ও আর উজ্জ্বল করে তুলতে চায় না। জীবনের একটা দিকে ওর যবনিকা পড়ে গিয়েছে। সেখানে আর কোন নতুন দৃশ্যের অবতারণা ঘটবে না।

ইতিমধ্যে কয়েকবার নতুন কারখানার কাজ দেখাশোনা করে নীরা বিজিতের সঙ্গে রূপনারায়ণের ব্রিজে গিয়েছে। কিন্তু গিয়েই আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। মনে মনে ওর একটাই ধ্বনি, না-না-না।

●

দু'বছর পূর্ণ হবার আগেই কারখানা সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। এবার কারখানা উৎপাদনের জন্য তৈরি। কানাডার বিশেষজ্ঞ আগেই ফিরে গিয়েছে। কারখানায় নতুন লোক ভরতি চলছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের প্রতিদিন নিয়োগ করা হচ্ছে। স্থানীয় লোকদের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু অতিরিক্ত লোক বাইরের নানান জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে। এমন কি নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং থেকেও আপাততঃ কিছু মেকানিককে নতুন কারখানায় নেওয়া হয়েছে। বিজিত-ই প্রথম নতুন কারখানার নাম পেশ করেছে, সকলেই তা সানন্দে অনুমোদন করেছে। বিশেষ করে নীরা। নতুন

কারখানার নাম দেওয়া হয়েছে, 'মধুসূদন হেভি ইলেকট্রিকাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড।' তা ছাড়াও বিজিত একটি প্রস্তাব দিয়েছে, অফিস বিল্ডিং-এর সামনে যে বাগান তৈরি হচ্ছে, সেখানে মধুসূদনের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হোক। নীরা খুশি হয়েছে, অবাক হয়েছে আর ভেবেছে, এসব চিন্তা কি কেবল বিজিতের মাথায় আসে ? নীরার মাথায় আসে না কেন ? সব বিষয়েই নিজেকে বিজিতের কাছে পরাজিত মনে হয়। দু বছর আগে হলে, বিজিতের ওপর নীরার রাগ হত। এখন আর হয় না। ও এখন বিজিতকে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, কেবল গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ, না মধুসূদনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা-ই তাকে সতত চেতনায় জাগ্রত করে রেখেছে। তার ভিতর দিয়েই বিজিতের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে।

কর্মী নিয়োগের সময়েই, কলকাতার একজন সুবিখ্যাত ভাস্করকে দিয়ে, মধুসূদনের আবক্ষ মর্মর মূর্তি তৈরি করান হল। ব্রজকিশোর মত প্রকাশ করলেন, কারখানার দ্বারোদ্ঘাটনের দিনই, মধুসূদনের মূর্তি উন্মোচন করা হোক এবং তা করা হোক শ্রমমন্ত্রীর দ্বারাই, যিনি কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করবেন বলে তিনি আশা করছেন। এসব বিষয়ে আলোচনা চলছিল, নীরার কলকাতার অফিস ঘরে বসেই।

ব্রজকিশোরের কথা শুনে নীরা বিজিতের দিকে তাকাল। বিজিত তখন মাথা নিচু করে একটি বিদেশী এঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকার পাতা উল্টে দেখছিল। বিজিতের এরকম আচরণ মোটেই খুব স্বাভাবিক মনে হল না। বিশেষ করে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের সময়। নীরা বিজিতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, ব্রজকিশোরের দিকে তাকাল। ব্রজকিশোরও ওর দিকে তাকালেন। দুজনের চোখেই কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা।

নীরা জিজ্ঞেস করল, বিজিতবাবু, আপনি কী কিছু ভাবছেন ?

বিজিত যেন খানিকটা চমকাবার ভাব করে, মুখ তুলে তাকাল। বলল, না, কিছুই ভাবছি না।

নীরার চোখে সংশয়। জিজ্ঞেস করল, বোসকাকা যা বললেন, আপনি সব শুনেছেন তো ?

বিজিত খুব সংক্ষেপে বলল, শুনেছি।

বিজিতের এই সংক্ষিপ্ত জবাবে, নীরার সন্দেহ দৃঢ় হল, বিজিত ঠিক মন খুলে কথা বলছে না। আজকাল বিজিতকে চিনতে ওর বেশি সময় লাগে না। আগে হলে হয়তো বিজিতের এই আচরণকে ওর কিছুই মনে হত না। এতক্ষণে ব্রজকিশোরের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছে। সব বিষয়ে উৎসাহী বিজিতের কথাবার্তা এরকম হওয়া উচিত না। নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে কোথাও কিছু আটকাচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই নীরার ভ্রূকুটি দেখা দিল। ও যেন একটু বিরক্তই হল। জিজ্ঞেস করল, বোসকাকা যা বললেন, সে বিষয়ে আপনার কী মনে হচ্ছে ?

বিজিত স্বাভাবিক মুখেই বলবার চেষ্টা করল, ঠিকই তো আছে। কোন অসুবিধা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

নীরা বিজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বিজিত তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। নীরার মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না,

boiRboi.net

ব্রজকিশোরের প্রস্তাব সমূহ বিজিত গ্রহণ করতে পারেনি। নীরার খারাপ লাগছে, বিজিত সে কথা মুখ ফুটে বলছে না কেন! যে অন্যান্য বিষয়ে এত কথা নিজের থেকেই বলতে পারে, তার হঠাৎ এরকম দ্বিধা বা বিরাগ কেন! যদিও ব্রজকিশোরের প্রস্তাব, নীরার খুবই উপযুক্ত বলে মনে লেগেছে।

এবার নীরা কিছু বলার আগেই ব্রজকিশোর বিজিতকে বললেন, বিজিত, তোমার কথার মূল্য অনেকখানি। আমার প্রস্তাবে যদি তোমার কিছু মনে হয়ে থাকে, তুমি অনায়াসে বলতে পার। আজকাল তো তোমার সঙ্গে কথা না বলে কোন ডিসিশনই আমরা নিই না।

বিজিত খানিকটা বিব্রতভাবে বলল, তার জন্য না। এসব বিষয়ে, এই উন্মোচন উদ্ঘাটন ইত্যাদি নিয়ে আপনারা যা ঠিক করবেন, তাই হবে। এতে আমার আর কী বলার থাকতে পারে।

নীরা সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন তীক্ষ্ন গলায় বলে উঠল, আপনার বলার কিছু না থাকতে পারে। জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আপনার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনি কী করতেন?

বিজিত একবার নীরার অপলক ঝলকানো চোখের দিকে দেখল।

ব্রজকিশোরের দিকে ফিরে বলল, আসলে কী জানেন, কোন বিষয়েই মন্ত্রী আমলা বা রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে কিছু করা আমার মনঃপূত নয়।

নীরা বলে উঠল, সে কথাটা বলছেন না কেন?

বিজিত গম্ভীরভাবেই বলল, কিন্তু আপনাদের এসব বিষয়ে কিছু বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। এটা নিতান্তই আমার একটা নিজস্ব মতামত। আপনাদের ভাল নাও লাগতে পারে।

নীরা এবার সহসা কিছু বলল না। ব্রজকিশোরও না। দুজনেই একটুখানি সময় চুপচাপ। সেই ফাঁকে বিজিত আবার বলল, সাধারণতঃ সবাই যা করেন, আর যেটা সব দিক থেকে মানানসই দেখায়, আপনারা সেই মতোই তো সব করছেন, ঠিকই তো আছে।

তথাপি সেই মুহূর্তেই নীরা কোন কথা বলল না। ব্রজকিশোরও না। অথচ নীরার মন বলছে, বিজিত যেন ঠিক কথাই বলছে। ওর মন সায় দিচ্ছে। কিন্তু বিজিতের মধ্যে যে এরকম একটা বিরোধী মনোভাব আছে, কখনও জানা যায়নি। বরং এরকম ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ সরকার ঘেঁষা হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সহায়তা বা সমর্থন পেতে চায়। তাতে অনেক সুবিধা। ব্রজকিশোর সেইভাবে চিন্তা করতেই অভ্যস্ত। ইতিপূর্বে মধুসূদন বেঁচে থাকতে, নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বা নেতারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে মধুসূদনের ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল।

নীরা মনে মনে বিজিতকে সমর্থন করলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। ব্রজকিশোর কী বলেন, সেটাই ও শুনতে চায় এবং প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে ব্রজকিশোর যা পরামর্শ দেবেন, নীরা কার্যতঃ সেটাই অনুমোদন করবে। ও ব্রজকিশোরের দিকে তাকাল। ব্রজকিশোর দ্বিধায় পড়েছেন বোঝাই যাচ্ছে। বিজিতের ইচ্ছা তিনি ঠিক

boiRboi.net

মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বিজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী ভেবে এ কথা বলছ বল তো ? তুমি কি কোন রাজনৈতিক নেতার সম্পর্কেই একথা বলছ ?

বিজিত একটু হেসে বলল, নিশ্চয়ই। কিন্তু এ নিয়ে ভাববেন না। যা মনস্থ করেছেন তা-ই করুন।

ব্রজকিশোর বললেন, তা কেন বিজিত ? তুমি যখন এ রকম ভাবছ, তখন আমাদেরও ভাবা উচিত, কী বল নীরা ?

নীরা নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে বলল, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই বোসকাকা। সবাই মিলে যা ডিসাইড করবেন তাই হবে। তবে আমি বিজিতবাবুর কাছে জানতে চাইছি, মন্ত্রী বা নেতা না হলে অন্য আর কীভাবে করা যায় ?

ব্রজকিশোর বলে উঠলেন, একজাক্টলি, আমিও সেটাই বিজিতের কাছে জানতে চাইছি। বিজিত, তোমার কি অলটারনেটিভ কিছু মাথায় আছে ?

বিজিত একটু হেসে বলল, ওভিয়াসলি, অন্যরকম একটা চিন্তা আমার মাথায় আছে। আমি ভাবছিলাম, দেশের এমন কোন ব্যক্তি কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করুন যিনি নিজের চেষ্টায় কষ্ট করে কারখানা তৈরি করেছেন, জীবনে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সার্থক হয়েছেন। অর্থাৎ যিনি বোঝেন, একটা কারখানা তৈরি করার ব্যাপারটা কী। এরকম দু-চারজন ব্যক্তি আমাদের দেশে আছেন, দেশের মানুষ যাঁদের শ্রদ্ধা করে। রাজনৈতিক নেতারা বা মন্ত্রীরা এসব ব্যাপারে নিতান্তই বাইরের লোক, তারা এসব বোঝেন না। উৎপাদন, অর্থনীতির ওপর তাঁদের সে দৃষ্টিভঙ্গীও নেই। নিতান্ত পদমর্যাদা আর নামের জোরেই তাঁরা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, আমার বলার উদ্দেশ্য এ-ই।

নীরা বিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সে যখন কথা বলছিল, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে তার সুচিন্তিত দৃঢ়তা এবং মুখের ভাবে একটা প্রত্যয় ফুটে উঠছিল। সে কী বলছে, তা সে জানে, তার বিশ্বাস থেকেই বলছে। নীরা তাকে মনে মনে সমর্থন করলেও, ব্রজকিশোরের জবাব শোনবার জন্য তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। ব্রজকিশোর এক কথাতেই সায় দিয়ে বললেন, যথার্থ বলেছ, ঠিক বলেছ, কোন সন্দেহ নেই। আমরা এঁদের ডাকি কেন, নেহাৎ নিজেদের কিছু সুবিধার কথা ভেবে। কেননা, সময় বিশেষে এঁরাও নানান সুবিধার জন্য আমাদের কাছে আসে। যাই হোক, সে আলোচনায় গিয়ে আমাদের দরকার নেই। তা হলে ঠিক করে ফেলা যাক, আমরা কাকে আনতে পারি। তুমি কি কারোর কথা ভেবেছ বিজিত ?

বিজিত ব্রজকিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেটা আপনিও ঠিক করতে পারেন। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আপনি আমার থেকে বেশী জানেন।

ব্রজকিশোর কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, তুমি যে রকম বলছ, সে রকম দেখতে গেলে, রাজনারায়ণ চৌধুরী মশায়ের কথাই আমার আগে মনে আসছে। ওঁর অবিশ্যি যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আজকাল কোথাও বিশেষ বেরোন না।

বিজিত বলে উঠলো, খুব ভাল হয়। আর. এন চৌধুরীকে পেলে তো কোন কথাই নেই। উনিই সব থেকে উপযুক্ত লোক। আমি ওঁর জীবনী কিছু কিছু পড়েছি। মাত্র সতের বছর বয়স থেকে নিজের চেষ্টায় এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা তৈরি

boiRboi.net

করতে চেয়েছিলেন। বহু পরিশ্রম করে, মধ্য বয়সে তিনি আর. এন. চৌধুরী হতে পেরেছিলেন।

নীরা বললো, ওঁকে আমি আমাদের বাড়িতে একবার দেখেছি। বাবাকে খুব ভালবাসতেন।

ব্রজকিশোরের একটি নিশ্বাস পড়লো, বললেন, হ্যাঁ, মধুসূদনকে খুবই স্নেহ করতেন। তোমার বাবার থেকেও উনি বয়সে বড়।

নীরা বললো, বোসকাকা, তাহলে এই ব্যবস্থাই করুন। উনিই আমাদের নতুন কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করুন। সেটাই সব দিক থেকে ভালো হবে। বাবার আত্মাও শান্তি পাবে।

ব্রজকিশোর বললেন, বেশ। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে কে যাবে? আমি যেতে পারি। তবে তুমিও আমার সঙ্গে যেও।

নীরা বললো, নিশ্চয়ই, আপনি বললেই যাব।

ব্রজকিশোর বললেন, হ্যাঁ, তুমি গেলে উনি খুশি হবেন।

বলে, বিজিতের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এখন দেখছ বিজিত, তুমি মুখ না খুললে কী হত? এড়িয়ে গেলে খুবই অন্যায় করতে। একটা ভাল কাজ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।

বিজিত একটু লজ্জিত হেসে একবার নীরাকে দেখল। বললো, আমার প্রস্তাবটা আপনাদের কেমন লাগবে তাই ভাবছিলাম।

নীরা জবাব দিল, আমাদের যে খুব ভালো লেগেছে, তা বোধহয় এখন বুঝতে পারছেন।

বিজিত এ কথার কোন জবাব দিল না। বললো, তবে মন্ত্রী বা নেতাদের নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করবেন।

ব্রজকিশোর বললেন, সেটা তো স্বাভাবিক নিয়ম মাফিকই হবে। সমস্ত ভি. আই. পি-দের নিমন্ত্রণ করা হবে। এখন বলতো, মধুসূদনের মূর্তি উন্মোচন করবেন কে? আর. এন. চৌধুরী?

বিজিতের মুখে অল্প হাসি। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, এসব ক্ষেত্রে পাবলিসিটির খানিকটা দরকার আছে বটে। কিন্তু আমি আবার সেভাবে দেখি না। এ পাবলিসিটির খুব মূল্য আছে বলে মনে হয় না। কোনো নির্লোভ সৎ মধুসূদন রায়ের অন্তরঙ্গ, মূর্তি উন্মোচন করতে পারেন। আর সেটা—।

বিজিত থেমে গেল। নীরা এবং ব্রজকিশোর দু'জনেই তার দিকে তাকালেন। বিজিত ব্রজকিশোরের দিকে চেয়ে বললো, আপনি করলেই ভাল হয়।

আমি? ব্রজকিশোর বিস্ময়ে এবং প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন।

বিজিতের সঙ্গে নীরার চোখাচোখি হল। বিজিত বললো, আমি তো মনে করি, আপনিই সেই ব্যক্তি, যিনি মধুসূদন রায়ের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত। তাঁর পরে যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি হলেন আপনি। আপনি ছিলেন তাঁর বন্ধু, তাঁর চিন্তা ভাবনার অংশীদার। বাইরের নামকরা অতিথিতে আমাদের কী দরকার।

boiRboi.net

ব্রজকিশোর তথাপি মাথা নাড়ছিলেন, এবং বারে বারেই কিছু বলবার চেষ্টা করছিলেন। আর নীরাকে বিজিত কখনো এত মুগ্ধ করতে পারেনি। এ মুহূর্তে ও বিজিতের দিক থেকে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। একদিকে ব্রজকিশোরের নাম করার আকস্মিকতার আনন্দ এবং বিজিতের প্রতি মুগ্ধতায় মনে মনে কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করছে। বললো, এর থেকে আর ভালো, সুন্দর এবং উপযুক্ত কিছু হয় না। বিজিতবাবু আপনাকে সত্যি ধন্যবাদ।

ব্রজকিশোর বলে উঠলেন, না, না, নীরা মা শোন—।

কোন কথা শুনব না বোসকাকা। এ আমার পুণ্যি।

ব্রজকিশোর সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। টেবিলের দিকে মাথা নিচু করে রইলেন। নীরার সঙ্গে বিজিতের দৃষ্টি বিনিময় হল। নীরার উজ্জ্বল চোখের তারা ঝিকমিক করছে। ব্রজকিশোরের অস্ফুট স্খলিত গলা শোনা গেল, মধুসূদনের পাথরের মুখ আমি উন্মোচন করব। সে আমার বড় সম্মান, বড় আনন্দ···কিন্তু··· কিন্তু বুড়োকে তোমরা কাঁদিয়ে দিলে।···

বলতে বলতেই ব্রজকিশোর উঠে দাঁড়ালেন, দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখের কোণে জল চিক চিক করছে। নীরা ডাকলো, বোসকাকা।

ব্রজকিশোর মুখ না ফিরিয়েই বললেন, একটু পরে আসছি মা, একটু পরেই আসছি।

বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নীরার সঙ্গে আবার বিজিতের দৃষ্টি বিনিময় হল। বিজিত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আগেই, নীরা বললো, সত্যি বিজিতবাবু, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না।

বিজিত বললো, ধন্যবাদের কী আছে। আমার সত্যিকারের যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি।

নীরা যেন বিজিতের কথা শুনলই না, বললো, হয়তো এ কথা কোন দিনই আমার মাথায় আসতো না। কিন্তু আপনি যখন বললেন, মনে হল, আমার মনের ঘুমন্ত কথাগুলোকে আপনি জাগিয়ে তুলছেন। আশ্চর্য, আমি এত সুখী হয়েছি। সত্যি, নির্লোভ, বিশ্বস্ত, বাবার অন্তরঙ্গ মানুষ হিসাবে বোসকাকা মহৎ। আমরা আমাদের কাছের জিনিস দেখতে পাই না, অভাবে পড়ে দূরে হাতড়ে বেড়াই। কী করে আপনার মাথায় এল বলুন তো?

বিজিত হেসে উঠলো। বললো, কী করে আবার, স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা করতে গিয়ে মনে এল।

নীরা বললো, কিন্তু আমার মনে তো এসব আসে না? আপনার মাথায় কি সব সময় এসব ঘোরে নাকি?

বিজিত একটু গম্ভীর হয়ে বললো, না, আমার অন্যান্য কাজও তো আছে।

নীরার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। বিজিত মুখ টিপে একটু হাসলো। নীরা বললো, সে আমি জানি, আপনার অনেক কাজের চিন্তা আছে। আমার এক এক সময় কী মনে হয় জানেন? আপনি যেন আমাকে জব্দ করার জন্যই এরকম আশ্চর্য এক একটা কথা বলেন।

boiRboi.net

বিজিত অবাক হয়ে বললো, তার মানে ?

তার মানে, তা না হলে আপনার মাথাতেই কেবল এ সব কথা আসে কেন ?

বিজিত এবার স্থান কাল ভুলে হোহো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে উঠে বললো, সরি ম্যাডাম, সরি।

নীরা নিজেও তখন মুখ নামিয়ে নিয়েছে। হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। যদিও সেটা বিজিতকে জানতে দিতে চায় না। তা না চাক। বিশ্ব সংসারের প্রকৃতি তার এমনরূপেই চলমান, তাকে সব সময়েই সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হয় না। এ মুহূর্তে, বিজিত নিজেও যেন হঠাৎ কেমন বদলে যায়! তার মুখের চেহারা বদলে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি, দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। তা হলে, পয়লা বৈশাখ, আই মিন ফিপটিনথ্ এপ্রিল টারগেট করেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

নীরা জবাব দিতে একটু দেরি করল। এখন ওর বুকের কাছে ব্যথা করছে। ব্যথাটা বেশ কিছু দিন থেকেই ও অনুভব করছে। ওর ডান দিকের বুকের, ডান দিক ঘেঁষে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ব্যথাটা যেন জোরে বাজছে। ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, ব্যথাটা কেমন। বলা যায় না যেন একটা বিস্ফোটক। অথচ টনটনানি সেইরকম। একটা মৃদু ব্যথা সব সময়ে লেগে থাকেই। যেন মনে হয়, স্তনের ডান পাশে, কোন কারণে আঘাত লেগেছে, (যদিও কখনো লাগে নি) এবং তার জন্য ব্যথা করছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ সেই ব্যথা তীব্র হয়ে ওঠে। এখন এই মুহূর্তে, ব্যথাটা সেইরকম তীব্র মনে হচ্ছে। ওর লজ্জিত নত মুখে হাসি ছিল। কিন্তু হাসি রাখা সম্ভব হল না। কোন রকমে বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঙলা বৎসরের প্রথম দিনই আমাদের দিন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করুন।

বিজিত চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও, থমকে দাঁড়ালো। নীরার দিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, মিস রায়, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে ?

নীরা সেই মুহূর্তেই কোন জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রেখেই চুপ করে রইলো। ওর এক হাত বুকের কাছে। আর এক হাত টেবিলের ওপর এগিয়ে দেওয়া। বুকের ওপর হাতটা ক্রমাগত চেপে বসতে বসতে, আস্তে আস্তে শিথিল হল। এবং আস্তে আস্তে হাতটি টেবিলের ওপরে নেমে এল। ক্লান্ত স্বর শোনা গেল, না, কোন কষ্ট হচ্ছে না বিজিতবাবু। আপনি যান। দয়া করে আমার ড্রাইভারকে ডেকে দিন, বলুন, আমি এখনই বাড়ি যেতে চাই।

বিজিত দ্রুত বেরিয়ে গেল। নীরার ঘরে ড্রাইভার ঢুকে সেলাম দিল। নীরা চেয়ার থেকে উঠে বললো, বাড়ি যাবো।

ড্রাইভার বললো, জী মেমসাব।

নীরা চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগেই, ড্রাইভার বেরিয়ে গেল। নীরা দেখতে পেল না, বিজিত ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ নীরা এই মুহূর্তে ভাবছে, বিজিত কোথায় গেল। বিজিত কি ওকে বিদায় দিতে পারতো না ?

নীরা গাড়িতে উঠে বললো, বাড়ি চল।

গাড়ি এগিয়ে চললো।

boiRboi.net

●

শুভ নববর্ষ, আজ বৈশাখের প্রথম দিন। আজ 'মধুসূদন হেভি ইলেকট্রিকাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর দ্বারোদ্ঘাটন। আজ থেকে কারখানায় প্রথম উৎপাদন শুরু। পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট হিসাবে বেলা সাড়ে দশটায় প্রথম বৈদ্যুতিক এঞ্জিনের সুইচ অন্ করা হবে এবং তা করবেন আর এন. চৌধুরী। নতুন কারখানার হুইসল্ও তখনই বাজবে। শ্রমিক কর্মচারিদের প্রতি সেই রকম নির্দেশ দেওয়া আছে।

মধুসূদনের মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানও আজই। কারখানায় দ্বারোদ্ঘাটনের আগে উন্মোচন অনুষ্ঠান। অতিথি অভ্যাগতরা সকালবেলাই চলে এসেছেন। কারখানার কর্মচারি ও শ্রমিকদের উপস্থিতিতে একটি ছোট মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হল, নতুন অফিস বিল্ডিং-এর সামনের বাগানে। বাগানের মাঝখানে মধুসূদনের আবক্ষ মর্মর মূর্তি।

আর. এন. চৌধুরীর পৌরোহিত্যে, ব্রজকিশোর সজল চোখে, মূর্তি উন্মোচন করলেন।

নীরা দাঁড়িয়েছিল আর. এন.-এর পাশে। আর. এন. পলিতকেশ সৌম্য বৃদ্ধ। নীরার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন মূর্তির সামনে। বললেন, ঈশ্বরের কি বিচার দেখেছ মা ? আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে, মধুটা কোথায় চলে গিয়েছে।

নীরার বুকের কাছে টনটন করছে। কেবল স্মৃতির শোকে না। একটা মাংসল ব্যথাও বটে। ব্রজকিশোর সরে এসে দাঁড়াতে, আর. এন তাঁর আর এক হাতে, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। ডাকলেন, এস ব্রজকিশোর, আমরা সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে বসি।

মূর্তি উন্মোচনের পরে, সকলেই আবার আসন গ্রহণ করলেন। আর. এন. ব্রজকিশোরকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। নিয়মানুযায়ী ব্রজকিশোর সামান্যই বললেন। যেটুকু বললেন, সবই মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে।

তারপরেই আরম্ভ হল দ্বারোদ্ঘাটনের অনুষ্ঠান। এখন বিজিতের ব্যস্ততাই সব থেকে বেশি। আর. এন. বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, কারখানার পদস্থ অফিসার, এঞ্জিনীয়র, সবাইকে নিয়ে সে অপারেটিং রুমে গেল। একজন তরুণ এঞ্জিনীয়রকে সে আগেই বলে রেখেছিল, সে হুইসল্-এর সুইচ টিপবে। যথারীতি তাই হল। নতুন কারখানার বাঁশি বেজে উঠলো। তারপরেই আধুনিক যন্ত্রের যে বিশেষ বোতামটি টিপলে, সমস্ত মেশিন-শপগুলোতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, যন্ত্রের নির্ঘোষ শুরু হবে, যন্ত্র উৎপাদন শুরু করবে, সেই বিশেষ বোতামটি, আর. এন.-কে বিজিত দেখিয়ে দিয়ে বললো, স্যার, এই সুইচটা আপনি অন করলে জেনারেটারগুলো কাজ শুরু করবে।

আর. এন. মুগ্ধ বিস্ময়ে, আধুনিক যন্ত্র দেখছিলেন। বললেন, মানুষের কীর্তির কোন তুলনা নেই। অপূর্ব ! মানুষ কতো কী গড়ে, আবার ভাঙেও। মানুষের চেয়ে নতুন কিছু নেই, পুরনোও কিছু নেই। মানুষই সব।...

একজন আর. এন-এর কথাগুলো টেপ করছিল। সেখানে মাইকও ছিল। আর. এন. পাশে তাকিয়ে, নীরার দিকে চেয়ে বললেন, তা হলে মা চালিয়ে দিই ?

boiRboi.net

নীরার চোখে জল এসে পড়েছে। ঘাড় কাত করে বললো, হ্যাঁ দিন।

আর. এন. বোতাম টিপলেন। কারখানার যন্ত্র নির্ঘোষ শোনা গেল। বিজিত তাড়াতাড়ি মাইকের স্পীকার আর এন-এর সামনে এগিয়ে দিল। আর. এন বক্তৃতা শুরু করলেন। নীরা সকলের আড়ালে, এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে, অফিস বিল্ডিং-এ ওর নিজের কামরায় গিয়ে চেয়ারে বসে, টেবিলে মাথা লুটিয়ে দিল। একটা তীব্র গভীর কান্না ও কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। যদিও এই কান্নাটা কেবল শোকের না। এর মধ্যে আনন্দও আছে। এই নিরালা কামরায়, ও ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'বাবা, তুমি সুখী হয়েছ তো? শান্তি পাচ্ছ তো।'···

●

ডান দিকের বুকের, ডান দিক ঘেঁষে ব্যথাটা রোজই, প্রায় সব সময়ে অনুভব করছে। মাসখানেক আগে, মাঝে মধ্যে ব্যথাটা বোধ হতো। এখন রোজ এবং প্রায় সর্বদাই। আজ যেন ব্যথাটা আরো তীব্র। ডান স্তনের গায়ে হাত দিয়ে, ডান পাশে ও যেন শক্ত মতো কিছু একটা অনুভব করেছে। কবে থেকে এরকম শক্ত হয়েছে, ও জানে না। নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে, মনে হয়েছে, স্তনের সেই বিশেষ অংশটির রঙ যেন একটু রক্তিম। ব্যথার তীব্রতা আজ ওকে কাজ করতে দিচ্ছে না।

নীরা ব্রজকিশোরকে জানিয়ে বাড়ি চলে এল। পারিবারিক ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। ডক্টর ঘোষ এসে সব শুনলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কবে হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। ব্যথার ধরনটা কেমন, শুনলেন। তারপর বললেন, ভয়ের কিছু নেই, তবে একবার বায়োপ্সি করে দেখে নেওয়াই ভাল। আপাতত আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে যাও। আগামীকালই তোমাকে নিয়ে আমি একবার হাসপাতালে যাব।

নীরা ঠিক ভয় পেল না, একটু চিন্তিত হল। পরের দিন ডক্টর ঘোষ ওকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। বায়োপ্সি করিয়ে নিয়ে এলেন। নীরা জানাল, ওষুধটা খেয়ে ব্যথা একটু কম আছে। তবে তার জন্য ও অফিস কামাই করল না। এমন কি পঁচিশ মাইল দূরে নতুন কারখানায়ও ঘুরে এল।

পরের দিন বায়োপ্সি রিপোর্ট পাবার কথা। ডক্টর ঘোষ নিজেই নিয়ে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু সকালে বা সন্ধেয় এলেন না। সারাদিন কোন খবরও দেননি। নীরা সন্ধেবেলা ডাক্তারকে ফোন করল। শুনল, তিনি বাড়ি নেই। তার পরের দিন অফিসে যাবার পথে নীরা নিজেই হাসপাতালে গেল। সৌভাগ্যক্রমে যে ডাক্তার ওর বায়োপ্সি করিয়েছিলেন, তার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। নীরাকে দেখে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর মিস রায়?

নীরা বলল, খবর তো নেবার জন্যই এলাম আপনার কাছে। গতকাল আমার বায়োপ্সির রিপোর্টটা পাবার কথা ছিল পাইনি।

ডাক্তার একটু অবাক হয়ে বললেন, কেন ডক্টর ঘোষ তো রিপোর্ট নিয়ে গেছেন।

নীরা অবাক চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালো। ডাক্তার আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ডক্টর ঘোষ হয় তো কোন কাজে আটকে পড়েছেন, তাই আপনাকে জানাতে পারেননি। আজই হয় তো যাবেন।

boiRboi.net

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই নীরার চোখে ও মনে তীক্ষ্ন একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। এবং এক মুহূর্তের জন্য ওর সমস্ত অনুভূতি যেন ডান দিকের বুকের ডান পাশে কেন্দ্রীভূত হল। কিছু না বলে, ও ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তারের মুখও আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, আপনি আমার ঘরটা চেনেন তো। সেখানে গিয়ে দু'মিনিট বসুন, আমি আসছি।

নীরা ডাক্তারের ঘরে গিয়ে বসল। মৃত্যুভয়ের অনুভূতি কেমন, নীরা তা জানে না। তথাপি মনে হল, ওর সমস্ত স্নায়ু যেন কাঁপছে। নিশ্বাস থমকে আসছে বুকের কাছে। অথচ সমস্ত চেতনা যেন অবশ হয়ে আসছে। ওর চোখের সামনে বাবা, মীরার মুখ, সমস্ত বাড়িটা, অফিস, কারখানা, নতুন কারখানা ভাসছে। বিজিত এই সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে, একটা ইম্পোজ করা ছবির মতো ভেসে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ওর হাত, ডান দিকের স্তনে স্পর্শ করলো। ব্যথার জায়গা, যেখানে ছোট একটি টিউমার রয়েছে, সেখানে আলতো আঙুল ছোঁয়ালো। ব্যথা, তীব্র একটা ব্যথা এখানে। পুরুষের স্পর্শ মাত্রই যদি নারীর কুমারীত্ব চলে যায়, তবে নীরা কুমারী নয়। অন্যথায় এ বুক এখনো কুমারীর, এ বুকে এখনো অনেক মানবী-আশা।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে পিছন থেকে বলে উঠলেন, একটু দেরি হয়ে গেল।

নীরা সংবিত ফিরে পেল। বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এল, এবং নিজের চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মনকে শক্ত করল। যে কোন দুঃসংবাদ শোনবার জন্য ও নিজেকে প্রস্তুত করল।

ডাক্তার এসে ওর মুখোমুখি বসলেন। কিন্তু সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। যেন কী বলবেন, স্থির করতে পারছেন না। নীরা ডাক্তারের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, ডাক্তারবাবু, আপনি ফ্র্যাংকলি সব কথা বলতে পারেন। যদিও আমি খানিকটা অনুমান করতে পারছি। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমার মন দুর্বল নয়।

মধ্যবয়স্ক ডাক্তার করুণভাবে হেসে উঠে বললেন, মিস রায়, আপনি আমাকে বলছেন বয়সের কথা। মনে হয় আমার বড় মেয়েটি আপনার থেকে ছোট নয়। ও কথাটা আপনি বলবেন না।

নীরা বলল, ঠিক বয়সের কথা বলতে চাইনি। বলতে চাই, এই বয়সের মধ্যেই, অনেক মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে, তার নির্মম পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। আপনি আমাকে মন খুলে বলুন।

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে গম্ভীর মুখেই একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, আমি জানি মিস রয়। আপনি যথেষ্ট দায়িত্বের কাজ নিয়ে থাকেন। আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। আপনাকে আমি কোন কথা লুকোতে চাই না। আপনার জীবনে কি খুব বড় কাজ বাকী আছে?

নীরা জিজ্ঞেস করল, একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন! আমি কি আর বেশি দিন বাঁচব না?

ডাক্তার আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, যা করবার,

মাস আটেকের মধ্যে শেষ করুন।

চকিতের জন্য নীরার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল। নিশ্বাস নিতে পারল না। তাহলে সেই প্রাণঘাতী ব্যাধি ওর দেহে এসেছে, ক্যান্সার!

এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির নাম, নীরা কখনো উচ্চারণ করতে চায় নি। যখন থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করেছে, তখনো ওর মনে কোন কুটিল প্রশ্ন জাগেনি। ডক্টর ঘোষ ওদের পারিবারিক ডাক্তার। তিনি ওর আঁচল ঢাকা বুকে হাত দিয়ে দেখবার সময় যখন গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন, নীরার মনে কোন ভয়ংকর জিজ্ঞাসা দেখা দেয়নি। বরং একটা অপরিসীম লজ্জায়, মুখ লাল করে, চোখ বুজে ছিল। তারপরে ডক্টর ঘোষ যখন বললেন বায়োপ্সি করানোর কথা, সেই মুহূর্তে ওর বুকের মধ্যে ধবক্ করে উঠেছিল। ব্যাধিটির নাম উচ্চারণ করেনি, কিন্তু মনের মধ্যে জেগেছিল।

এখনো ডাক্তার উচ্চারণ করলেন না, নীরাও না। অথচ ওর বুকের স্পন্দনের তালে তালে বাজছে, ক্যান্সার, ক্যান্সার। যে-ব্যাধির কার্য কারণ আজ অবধি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি। নীরার চোখের সামনে যেন সব কালো হয়ে গেল। মনে হল, মৃত্যুর গাঢ় গভীর অন্ধকার বুকে ও শুয়ে আছে।

নীরা শুনতে পেল, যেন বহু দূর থেকে কেউ ডাকছেন, মিস্ রায়, মিস্ রায়।

নীরা সেই ডাক শুনে, আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকালো। যেন ফিরে এল বহু দূর থেকে, এবং সামনে ডাক্তারের মুখ দেখতে পেল। ডাক্তার বললেন, মিস রায়, আমার কথাগুলো বোধহয় ঠিকভাবে বলা হয়নি। আপনার মতো শক্তিমতী মেয়ে বলেই, আমি চরম এবং সম্ভাব্য পরিণতির কথাটা বলে ফেলেছি।

ডাক্তারের 'শক্তিমতী' কথাটা যেন নীরার অন্ধকার মনে এক ঝলক আলো ছড়িয়ে দিল। শক্তি চায় নীরা, শক্তি চায়, শক্তিমতী হতে চায়। মনে মনে বলল, শক্তি দাও হে ঈশ্বর। বাবা, আমাকে শক্তি দাও। মীরা, ভাই আমাকে শক্তি দে। বিজিত—।

বিজিতের নামটা মনে আসতেই ও একবার থমকে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে মনে বলল, হ্যাঁ বিজিত, তুমিও আমাকে শক্তি দাও। আর তোমাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কি আমার আছে। আমার এই প্রাণঘাতী ব্যাধি যেমন আমাকে না জানিয়েই মৃত্যুচক্র গড়ে তুলেছে, তেমনি কবে থেকে যেন আমাকে আমার নিজের হৃদয় জানতে না দিয়ে একটি তাজা ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে। দুই-ই না জানিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার পরাজয় মৃত্যুর কাছে না। আমার ভিতরে এখন ফুলের রঙ, এখন আমার জীবনে ফুল ফোটার সমারোহ। আমি শক্তিমতী, শক্তি আমার প্রাণ ভরা।

আস্তে আস্তে ওর মুখে রক্ত ফিরে এল। রক্তিম ঠোঁটে হাসি ফুটল। বলল, না ডাক্তারবাবু, আপনি কিছু ভুল বলেননি। তবু মানুষের মন, একটু যে বিচলিত হয়ে পড়িনি, তা বলতে পারব না। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাটা যেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর আমার সে ভয় নেই। আপনাকে তো বলেছি, অনেক মর্মান্তিক নিষ্ঠুর ঘটনার পরিণতি আমি ভোগ করেছি। আপনি যদি এতোটা সহজ সোজা ভাবে আমাকে না বলতেন, তা হলে আমি হয়তো মিথ্যা আশায়, আমার অনেক করণীয় কাজই করে যেতে পারতাম না।

ডাক্তার বললেন, তবু মিস রায়, এখন আমার অনুশোচনাই হচ্ছে। কথাটা ও

boirboi.net

ভাবে না বললেই বোধহয় ভালো করতাম।

নীরা মাথা নেড়ে বললো, না ডাক্তারবাবু, তা নয়। আপনি তো আমাকে শক্তিমতী বলেছেন।

এবার ডাক্তারের গলাটা যেন ধরে এল। বললেন, হ্যাঁ মা, আপনাকে আমি শক্তিমতী বলেই জানি।

নীরা ডাক্তারের স্নেহকরুণ চোখের দিকে দেখলো, বুকটা কেন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। বলল, সেইজন্য আপনার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। কৃতজ্ঞ থাকব, আপনি আমাকে সোজা সরল সত্যি কথা বলেছেন। আমি জানি, অনেকের কাছে আপনার কথা হয়তো নিষ্ঠুর মনে হবে। আমার তা কোনদিন হবে না।

ডাক্তার স্নেহাভিভূত চোখে এক মুহূর্ত নীরাকে দেখলেন। বললেন, কিন্তু মিস রায়, পৃথিবীতে বহু বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে, যখন দেখা যায়, বিজ্ঞানও যুক্তি দিয়ে তার বিচার করতে পারে না। ক্যান্সারের এমন রুগীও দেখেছি, আমরা যার মৃত্যু ঘোষণা করেছি, জানি তার আয়ু আর মাত্র এক মাস, সেই রুগীই বহাল তবিয়তে দশ বছর ধরে বেঁচে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে।

নীরা হেসে উঠলো। বলল, হয়তো তেমন অঘটন চিরদিনই কিছু কিছু ঘটে। কিন্তু সেই অঘটনের মুখ চেয়ে আপনি আমাকে থাকতে বলবেন না।

ডাক্তার বললেন, তা বলব না। কিন্তু প্রার্থনা করব, আপনার জীবনে যেন সেকরম অঘটন ঘটে।

নীরা হাসল, এ বিষয়ে কিছু বলল না। ও বললো, ডাক্তারবাবু, ব্যথাটা কমতে পারে। সেরকম কোন ওষুধ কি আছে?

ডাক্তার বললেন, আমি তো ডক্টর ঘোষকে প্রেসক্রাইব করে দিয়েছি। বিশেষ করে ব্যথাটা যাতে কম থাকে, তার জন্য একটা ওষুধ দিয়েছি। তা ছাড়া আপনাকে হসপিটালাইজ করার নির্দেশও ওতে দেওয়া আছে।

নীরা বলল, হাসপাতালে আর আসতে চাই না ডাক্তারবাবু। আমাকে এখানে এনে শুইয়ে রাখবেন না।

ডাক্তার বললেন, অবিশ্যি ইনজেকশনের নির্দেশ দেওয়া আছে। সেটা ডক্টর ঘোষই দেবেন। কিন্তু মাঝে মাঝে রেডিওথেরাপির দরকার আছে। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে না পড়লে, সেটা আপনি এসেও নিয়ে যেতে পারেন।

নীরা বলল, তাই করব। আমি তা হলে এখন চলি।

আসুন। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গে ঘরের বাইরে পর্যন্ত এলেন।

নীরা হাসপাতালের বাইরে এল। রৌদ্র উজ্জ্বল শহরটাকে যেন ওর নতুন লাগছে। কেমন করে যেন, ওর চোখে শহরটা বদলে গিয়েছে। ও গাড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই, ড্রাইভার তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল। এটাই বরাবরের নিয়ম। তবু আজ নীরা ড্রাইভারের নাম করে বলে উঠলো, থাক না বিষ্ণু, আমি নিজেই তো দরজা খুলে বসতে পারি। ড্রাইভার বিষ্ণু একটু অবাক হলেও, মুখে কিছু বলল না। নীরা ভিতরে বসবার পরে, দরজা বন্ধ করে, সামনে গিয়ে গাড়িতে বসল।

নীরা বলল, অফিসে চল।

●

নীরা সোজা অফিসে এল। সারাদিন কাজ করল। বিভিন্ন অফিসার কর্মচারীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলল, আলোচনা করল। তবু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, অথচ বিশেষ কিছু ভাবতে পারছে না। কেবল বিজিত ওর জন্য পথ চেয়ে থাকবে। সন্ধেবেলায় ও নতুন কারখানায় যাবে। বিজিত এখন সেখানেই আছে। নতুন কারখানার সে চীফ এঞ্জিনীয়র।

কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না। চারটের সময় নীরা টেলিফোন করল, ডাকল, বিজিত!

ওপার থেকে বিজিতের বিস্মিত গলা শোনা গেল, কে বলছেন?

নীরা কোনদিন এভাবে ঠিক 'বিজিত' বলে ডাকেনি। আজ ও মিস রায়ের বদলে বলল, আমি নীরা বলছি।

বিজিতের গলায় উপর্যুপরি বিস্ময় ফুটল, ওহ্, হ্যাঁ বলুন।

নীরা বলল, আমি আসছি।

বিজিত বলল, আসুন।

নীরা আবার বলল, আমি রূপনারায়ণের ধারে যাব।

বিজিত হঠাৎ কোন কথাই বলতে পারল না। একটু থেমে বলল, আসুন।

নীরা রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর কারোকে কিছু না বলে সোজা নিচে নেমে একেবারে গাড়িতে উঠে বসল। ড্রাইভারকে বলল, নতুন কারখানায় চল।

গাড়ি চলল। নীরা বাইরের দিকে ফিরে তাকাল। গাড়িঘোড়া, লোকজন, চলমান জীবনের স্রোত ওর চারপাশে। কত মানুষের কত ভাবনা, কত চিন্তা। সকলের জীবনেই কত ঘটনা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কথাটা এভাবে আর কখনো মনে হয়নি। আর পৃথিবীকে এত ভাল আর কখনো লাগেনি, এত সুন্দর বোধ হয়নি। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বৃথাই জীবনের জটিলতা, যত অসহজ ভাবনা-চিন্তা।

জীবন একদিকে চরম নিষ্ঠুর, আর এক দিকে পরম সহজ ও সুন্দর। এ দুয়ের মাঝে একটা গভীর লীলা যেন খেলা করছে। যবনিকা যখন নামে তখন সর্বাংশে নামে, এক দিকে নামে না। নীরা ভুল ভেবেছিল, এখন তার বিশেষ কোন একদিকে যবনিকা পড়েনি, সেখানে দৃশ্যের অবতারণা ঘটেই চলেছিল।

নীরা এসে যখন নতুন কারখানায় পেঁছুল, বিজিত ওর জন্য অফিসের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। নীরা জানে বিজিতের চোখে পরম কৌতূহলিত বিস্মিত জিজ্ঞাসা। এমন করে ও আর কোনদিন নীরার দিকে তাকায়নি। বিজিত প্রায় ছুটে এল ওর গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ধরল। নীরা নেমে এল। বিজিতের দিকে তাকাল। হেসে জিজ্ঞেস করল, গাড়ি কোথায়?

বিজিত জিজ্ঞেস করল, কার, আমার? পিছনে রয়েছে।

নীরা অনায়াসে বলল, নিয়ে এস, আমি তোমার গাড়িতে যাব।

বিজিতের চোখে বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। কোন ভূমিকা না করেই, এই প্রথম ও বিজিতকে 'তুমি' সম্বোধন করল। কিন্তু বিজিত ভাবাবেগে সহসা কিছু বলবার বা

boiRboi.net

করবার ছেলে না। পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখতে ও ভাবতে চায়। যদিও তার মুখের রঙ বদলে গিয়েছে। চকিতে একবার নীরার চোখের দিকে দেখে বলল, এখুনি নিয়ে আসছি।

নীরা জানে, কারখানার চারপাশে, অফিস বিল্ডিং থেকে অনেক অদৃশ্য চোখ ওকে দেখছে। সবাই কৌতূহলিত হয়ে অনেক কিছু ভাবছে। ও নিজের ড্রাইভারকে বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, আপনাকে পরে নিতে আসব?

নীরা বলল, না। আমি ইঞ্জিনীয়র সাহেবের গাড়িতে বাড়ি চলে যাব।

ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে চলে গেল। নীরা অফিস বিল্ডিং-এর সামনে, বাগানে মধুসূদনের আবক্ষ শ্বেত পাথরের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মনে হল, মধুসূদন যেন ওর দিকেই স্থির করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। নীরার ঠোঁট নড়ে উঠল, ফিস-ফিস করে বলল, 'বাবা, তুমি তো সবই জান, সবই দেখছ। আমাকে শক্তি দাও, আমার এখনো অনেক কাজ বাকী। আর···বাবা, আমি বিজিতের কাছে কী ভাবে ছুটে এলাম, তুমি দেখলে। তুমি আশীর্বাদ কর।'...

পিছনে বিজিতের গলা শোনা গেল, মিস রয়।

নীরার একবার ভুরু কুঁচকে উঠল বিজিতের সম্বোধন শুনে। কিন্তু কিছু বলল না। দেখল, বিজিতের চোখে মুখে এখনো কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। বিজিত বলল, গাড়ি এনেছি।

নীরা বিজিতের সঙ্গে গিয়ে, গাড়িতে উঠে বসল, বলল, বিজিত, চল রূপনারায়ণের ধারে যাই।

বিজিত আবার তাকিয়ে দেখল নীরার দিকে। তার চোখে সেই একই দৃষ্টি। নীরা আজ বিজিতের অনেকখানি কাছ ঘেঁষে বসেছে। বারে বারেই বিজিতের গায়ে স্পর্শ লাগছে। যে স্পর্শের কথা গতকালও নীরা ভাবতে পারতো না। ও বিজিতের দিকে মুখ তুলে বলল, এর চেয়ে স্পীডে গাড়ি চালাতে পারো না?

বিজিতের আজ বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। বেশি স্পীডে গাড়ি চালাবার জন্য, এই নীরাই তো বিরক্ত হয়েছিল। নীরারও সে কথা মনে আছে। বিজিত তাকালো। দেখলো নীরার ঠোঁটে হাসি, দৃষ্টিতে কৌতুকের ছটা।

বিজিত বলল, পারি, আমার ধারণা হয়েছিল, তাতে আপনার আপত্তি আছে।

নীরা বলল, আজ আর আমার কোন আপত্তি নেই, ভয় নেই। তুমি যতো খুশি জোরে চালাও, আমি দুর্বার।

বিজিত নীরার দিকে দেখল, বলল, কিন্তু আজ আমি স্পীড বাড়াতে পারছি না।

কেন বিজিত?

জানি না।

আমি জানি।

কেন? বিজিত আবার নীরার মুখের দিকে তাকাল।

নীরা বলল, গাড়ি চালানোর দিকে তোমার মন নেই।

boiRboi.net

বিজিত শুধু নীরাকে চেয়ে দেখল, কিছু বলল না। নীরা হাসল। কয়েকবারই বিজিত সামনের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরার দিকে দেখল। আর প্রত্যেকবারই নীরার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, নীরার মুখে সেই হাসি। তারপরে নীরা জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছ বিজিত?

বিজিত বলল, কিছু ভাবতে পারছি না। অথচ আমার মনে এত কৌতূহল, এত জিজ্ঞাসা, এত অবাক হচ্ছি, তবু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না।

কেন পারছ না?

নানা সংশয়ে।

তাতে খুব খারাপ লাগছে না তো?

না, কিন্তু কৌতূহল দমন করতেও পারছি না।

নীরা বলল, সংসারে সব কৌতূল কি মেটে বিজিত?

বিজিত বলল, কিন্তু আমি যে নিতান্ত বস্তুবাদী মানুষ, যন্ত্র আর বিজ্ঞান নিয়ে আমার কাজ। সব কিছুরই একটা জবাব খুঁজি আমি।

নীরা বলল, সব জবাব কি মেলে?

বিজিত নীরার দিকে ফিরে তাকাল। নীরাও তাকাচ্ছিল। হেসে, অনায়াসে বিজিতের কোলের কাছে একটা হাত রাখল। বলল, তুমি যে কথার জবাব চাও তা আমার সঠিক জানা নেই। শুধু মনে হল, সব কাজ ফেলে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি, তোমার সঙ্গে রূপনারায়ণের ধারে যাই। বিজিত তোমাকে দুঃখ দিচ্ছি না তো?

বিজিতের গাড়ির গতি হঠাৎ একবার কমে গেল, বলল, দুঃখ!

তার কোলের ওপর রাখা নীরার সুন্দর হাতটির দিকে তাকিয়ে বিজিত বলল, জীবনে কখনো কোনদিন এরকম একটা লগ্ন আসবে, এ যে আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

নীরা বলল, তোমার কী মনে হচ্ছে জানি না কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে পারো, তোমার প্রতি আমার এই আচরণ, আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়েই। নিতান্ত একটি মেয়ের মত তোমার কাছে এসেছি, আসব।

বিজিত অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল, সামান্য মেয়ে!

নীরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, সামান্য, অতি সামান্য মেয়ে, যে শুধু তোমার কোলের ওপর হাতটি এমনি করে রেখে বসে থাকতে চায়।

বিজিত বলল, আমি জানি আমার পাশে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং এবং মধুসূদন হেভি ইলেকট্রিকস্-এর প্রোপ্রাইটর বসে আছেন!

নীরা হেসে বলল, শুধু জানো না, সে একটি মেয়ে, যে বিজিত নামে একটি পুরুষের বুকের কাছে নিবিড় হয়ে থাকতে চায়।

গাড়ির গতি আবার কমে এল। বিজিত আজ এই মুহূর্তে স্টিয়ারিং ঠিক রাখতে পারছে না। নীরার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। নীরা আরো ঘন হয়ে এসেছে। ওর নিশ্বাস লাগছে বিজিতের ঘাড়ে গলায়। বিজিত কথা বলতে পারছে না। নীরা আবার বলল, বিজিত তুমি আমাকে আর প্রোপ্রাইটার ডিরেক্টর বলো না। আমাকে

boiRboi.net

তুমি নাম ধরে ডেকো। আমি তোমার কাছে শুধু নীরা।

বিজিত বলল, একটু আগেও এমন কথা কল্পনাও করতে পারিনি।

কিন্তু মনে মনে কি তুমি আমাকে কখনো নাম ধরে ডাকনি ?

বিজিত নীরাকে একবার দেখে, সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ডেকেছি।

এবার থেকে মুখে ডেকো। বিজিত, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

বল।

তুমি কি আমাকে ভালবেসেছ, ভালবাসো কি আমাকে ?

নীরার মুখ বিজিতের অনেক কাছে। বিজিতের মুখের কাছে নীরা মুখ তুলে এনেছে। বিজিত রাস্তার নিরালা ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, এই মুহূর্তে আমি গাড়ি চালাতে পারছি না। গাড়ি চালিয়ে জবাব দিতে পারছি না।

এবার বল।

কোনদিন মুখ ফুটে একথা বলতে পারব ভাবিনি।

আমিও মনে মনে তাই ভেবেছিলাম, তোমার মুখ থেকে একথা শোনা আমার জীবনে ঘটবে না। কিন্তু বিজিত, আজও ভাবছিলাম, কবে থেকে তোমার কাছে নিজেকে সঁপে বসে আছি, নিজেও জানি না। কাজে অকাজে এমন কি হঠাৎ ঘুম ভেঙেও তোমার কথা মনে হয়েছে। নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু নিজের কাছে নিজেই আমি অসহায়। নিরালায় যে ফুল ফোটে, তাকে কেউ দেখতে পায় না। আমার মধ্যে তেমনি ফুল ফুটেছে।

বিজিতের একটি শক্ত হাত নীরা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। বলল, বিজিত আজ মুখ ফুটে বল।

বিজিত বলল, মুখ ফুটে কি বলব নীরা, এই দিনটির কথা চিন্তা কখনো করিনি, কিন্তু সব সময়ে একটি নাম বুকের মধ্যে বেজেছে। বেজেছে ভয়ে ভয়ে, সম্ভ্রমের সঙ্গে। সেটা তুমি আমার ডিরেক্টর বলে নয়। আমি নিজে কাজ ভালবাসি, তোমার সেই কর্মী রূপকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তারই নাম আমার বুকে আর এক সুরে বাজে। সেই বেজে ওঠাটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি মনে মনে। সেই বেজে ওঠা ধ্বনির নাম যে "ভালবাসা" তা আমি উচ্চারণ করতে সাহস পাইনি। তোমার মতো আমিও কাজের সময় আনমনা হয়েছি। কতো দিন তোমাকে পিছন থেকে দেখে, মন টন টন করে উঠেছে। ইচ্ছা হয়েছে, তোমাকে কাছে টেনে একটু স্নেহ করি।

নীরা এবার বিজিতের বুকের ওপর একটি হাত তুলে দিয়ে বলল, আহ্, কেন করনি বিজিত, কেন করনি ?

বিজিত বলল, তুমি বুঝতে পারে নীরা, স্বাভাবিক কারণেই পারিনি।

নীরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, বুঝি। তখন যে আমি নিজেকেও চিনতাম না। কিন্তু বিজিত, তোমাকে দেখে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে, আমার বুকের মধ্যে চমকে উঠতো। তোমার চোখের মধ্যে আমি যেন কী দেখতে পেতাম।

বিজিত বলল, সেই বেজে ওঠাটাই দেখতে পেতে। যে কথা মুখ ফুটে বলতে বলছ, আমার চোখে কি এখন সেই কথা নেই ?

নীরা বিজিতের দিকে তাকাল। নিমেষে ওর মন আবেগে ভরে উঠল। বিজিতের

কাঁধের কাছে মাথা ঠেকিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, বিজিত, বিজিত।

একটু পরে নীরার আবেগ শান্ত হলে, আবার বলল, তোমার চোখের এই কথাটা পড়া ছিল বলেই, আজ এভাবে ছুটে আসতে পেরেছি। বিজিত, তুমি বাবার বড় প্রিয়, স্নেহের পাত্র ছিলে। তিনি তোমাকে ছেলের মতো দেখতেন। তুমি আমার কাছে অনেক বড়। বাবার স্বপ্নকে তুমি রূপ দিয়েছ।

আমি একলা নই।

তবু তুমিই অনেকখানি। আমার মনেও তুমি প্রিয় ছিলে, বলতে পারছিলাম না। পারব, তাও ভাবিনি। আজ পেরেছি, এটাই বড় কথা। বিজিত, তোমার কাছে আমার আর নিজের বলে কিছু রইল না। বিজিত, বিজিত!

নীরার গলা যেন চুপি চুপি শোনাল। ওর মুখ বিজিতের আরো কাছে। নীরা তেমনি ফিসফিস করে বলল, বিজিত আমি বড় কাঙাল, তোমার কাঙাল। আমাকে একটু আদর কর বিজিত।

বিজিত এক মুহূর্ত নীরার মুখের দিকে দেখল। তারপরে দু'হাতে ওর মুখ তুলে ধরে, আগে ওর কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালো, চোখে বোলালো, তারপরে দুই ঠোঁটে গভীর করে চুমো খেলো। নীরা বিজিতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, চুম্বনের প্রতিটি ঢেউয়ের প্রতিদান দিল। তারপরে বিজিতের বুকের ওপর মাথা রেখে চুপ করে রইল।

একটু পরে বিজিত ডাকল,

নীরা।

উঁ?

এবার চল, বেলা পড়ে আসছে।

চল।

বিজিত গাড়ি স্টার্ট দিল।

●

ওরা যখন রূপনারায়ণের সেতুতে পৌঁছুল, তখনো বেলা শেষের রাঙা রোদ নদীর বুকে ঝিকমিক করছে। বিজিত আজ গাড়ি নামিয়ে নিয়ে গেল নিচের রাস্তায়, নদীর ধারের কাছাকাছি। গাড়ি রেখে নদীর একেবারে ধারে চলে গেল। যতক্ষণ অন্ধকার না হল, ততক্ষণ নদীর ধারে রইল। নীরা একটু সময়ের জন্যও বিজিতের হাত ছাড়ল না। একবার বলল, বিজিত, এতদিন আমার জীবনটা যেন কোথায় আটকে পড়েছিল। আজ হঠাৎ মুক্তি পেয়েছে। আমি এই নদীর মত বইতে চাই, কিন্তু তোমার কূলে কূলে।

বিজিত জিজ্ঞেস করল, আজই হঠাৎ মুক্তি পেল কেমন করে, আমার জানতে ইচ্ছা করছে।

নীরা একটু চুপ করে রইল। তারপরে বলল, এ আমার নিয়তির নির্দেশ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।

বিজিত ওর শক্ত হাতে নীরার হাত ধরল।

রাত ন'টায় ওরা কলকাতায় ফিরে এল। নীরা বলল, তোমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে

boiRboi.net

করছে। চল তোমার মাকে দেখে আসি।

বিজিত অবাক, খুশি গলায় বলল, যাবে ?

কেন যাব না ?

বিজিত উত্তর কলকাতায় ওদের বাড়িতে এল নীরাকে নিয়ে। মায়ের সঙ্গে নীরার পরিচয় করিয়ে দিল। বিজিতের মা শশ্যব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, আসুন আমার কি ভাগ্য।

নীরা বলল, আসুন না, এস।

বলেই নীরা বিজিতের মাকে প্রণাম করল। বিজিতের মা আরো ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। দু'হাতে নীরাকে বুকের কাছে ধরে বললেন, আহা, ওকি।

নীরা বলল, মায়ের কাছে কিছুই নয়। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দিন।

ঠিক যেন ছোট্ট একটি মেয়ে। বিজিতের মা ওকে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করে দিলেন। নীরা ক্ষুধার্ত শিশুর মতো খেলো। আরো খানিকক্ষণ গল্প করল। তারপর আবার বিজিতের সঙ্গে গাড়িতে উঠল। বিজিত অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। নীরা জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ বিজিত ?

বলব ?

নিশ্চয়ই।

নীরা, আমি সত্যি সুখ বোধ করছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা উদ্বেগ হচ্ছে।

কেন বিজিত ?

তা জানি না।

নীরা বিজিতের কাঁধে হাত তুলে দিয়ে বলল, উদ্বেগের কোন কারণ নেই বিজিত, ওসব মনে এনো না।

নীরাকে নিয়ে বিজিত যখন ওদের বাড়িতে এল, তখন রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে। নীরা বলল, কাল সময় মত টেলিফোন করব। তোমাকে এখন আর আসতে হবে না, বাড়ি যাও।

বিজিত চলে গেল। নীরা বাড়ি ঢুকল। সকলেই জেগে আছে, অপেক্ষা করছে। ব্রজকিশোরকে দেখে নীরা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। বলল, বোসকাকা, আপনি বাড়ি যাননি ?

ব্রজকিশোরের চোখে মুখে উদ্বেগ। বললেন, অফিস থেকে বেরিয়ে তোমার সাথে দেখা করে যাব ভাবছিলাম। তুমি বিজিতের সঙ্গে বেরিয়েছ, এ খবরটা জানি বলেই একটু নিশ্চিন্ত ছিলাম। তুমি তো এত রাত কর না, তাই একটু চিন্তা হচ্ছিল।

নীরা বলল, তা হলে আর দেরি করবেন না, কাকীমা ভাবছেন।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই বুকের কাছে ব্যথাটা কেমন আছে ?

নীরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল, ব্রজকিশোরকে ডক্টর ঘোষ কিছু জানিয়েছেন। নীরা বলল, ওটা ওর নিজের মতই আছে। বোসকাকা, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

boiRboi.net

কী কথা বল ?

এখন না, পরে বলব।

বেশ, তাই বলো। আমি কাল সকালে আসব।

ব্রজকিশোর যাবার জন্য পা বাড়াতেই নীরা বলল, বোসকাকা এখন কারোকে কিছু বলার দরকার নেই।

ব্রজকিশোর থমকে দাঁড়ালেন। তারপরেই হঠাৎ সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ব্রজকিশোর কাঁদছেন।

নীরা ওঁর কাছে গেল, কাঁধে হাত রাখল, বলল, বোসকাকা আমার মনে তা হলে জোর থাকবে কেমন করে ?

ব্রজকিশোর শিশুর মত ভাঙাস্বরে বললেন, আমি যে মা একটুও জোর পাচ্ছি না, আমার চোখের সামনে যে সব অন্ধকার।

কিন্তু বোসকাকা, সত্য কঠিন আর ইনএভিটেবল্ বলে তাকে মেনে নিতেই হয়, এ তো দৈবাদেশ।

এ আমি কী দেখলাম, আমার সারাটা জীবনে ?

নীরা বলল, মধুসূদন রায়ের সব চিহ্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আমি যে ভাবতে পারি না।

নীরা আর কোন কথা বলতে পারল না। ব্রজকিশোর আর একটু বসে থেকে, অন্যমনস্কভাবে শূন্য চোখে তাকিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

●

নীরা পরদিন সময়মত অফিসে গেল। কিন্তু আজ নীরা সুন্দর করে সেজেছে, যা ও করে না। ডক্টর ঘোষ যা সব ওষুধ দিয়েছেন সেগুলো ঠিক মত খাচ্ছে। ডক্টর ঘোষ সকালবেলা ইনজেকশনও দিয়ে গিয়েছেন। ব্যথাটা কম না থাকলে, চলাফেরা করা মুশকিল। বেলা বারোটার সময় ও বিজিতকে টেলিফোন করল, বলল, বিজিত, আসবে ?

জবাব এল, যাচ্ছি।

সোয়া একটায় বিজিত এসে পেঁছুলো। ইতিমধ্যে ব্রজকিশোর কয়েকবারই এসেছেন। নীরাকে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। নীরা যায়নি। বিজিত আসতেই সে বলল, চল বিজিত, দুজনে কোথাও খেয়ে আসি।

বিজিতের চোখে সেই বিস্ময়ের ছায়াটা একেবারে কেটে যায়নি। বলল, বেশ তো, চল।

নীরা অফিসের মধ্যেই বিজিতের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বিজিত, তোমার ডিরেক্টরের হুকুম, সারাদিন তুমি আজ আমার সঙ্গে থাকবে।

বিজিত তবু বলল, কিন্তু নতুন কারখানার কাজ ?

নীরা জিজ্ঞেস করল, তুমি না গেলে কি খুব ক্ষতি হবে ?

তা নয়। তা হলে, এ্যাসিটান্ট চীফ ইঞ্জিনীয়রকে ফোনে কয়েকটা কথা বলতে হবে।

নীরা বলল, তাই বলে দাও।

বিজিত বলল, যো হুকুম মেমসাব।

নীরা তার গালে আলতো করে ঠোট ছুঁইয়ে দিল। বলল, মেমসাব কেন, ম্যাডাম বলবে।

boiRboi.net

বিজিত বলল, তা হলে বলি প্রাণেশ্বরী।

নীরা আর একবার বিজিতের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল। তারপরে নীরা গেল, ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে। বিজিত নতুন কারখানায় টেলিফোন করল এ্যাসিস্টাণ্ট চীফ ইঞ্জিনীয়রকে। তাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে দিল। নীরা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বিজিত বলল, বোসকাকাকে কিছু বলে যাবে?

কেন?

হয়তো খোঁজাখুঁজি করবেন।

নীরা বলল, উনি অফিসের লোকের মুখেই শুনবেন, আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি।

বিজিত হেসে বলল, তা বটে, অফিসের সকলের চক্ষু সদাজাগ্রত।

নীরা বলল, থাকতে দাও।

দু'জনে বেরিয়ে গেল। খেতে গেল চৌরাঙ্গির একটি বিশিষ্ট হোটেল-রেস্তোরাঁয়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা ঘরের আধো অন্ধকার এক কোণে গিয়ে ওরা বসল।

নীরা বলল, একটু ড্রিংক করবে বিজিত?

বিজিত বলল, অন্য কিছুতে অভ্যস্ত নই, একটু বীয়ার খেতে পারি।

নীরা বলল, আমি সাত বছর বাদে আজ একটু জিন খাব।

বেয়ারাকে অর্ডার দিতে, পানীয় এল। বিজিতের এক বোতল বিয়ারের সঙ্গে নীরা দু'পেগ জিন খেয়ে নিল। ওর চোখ একটু রক্তিম দেখাল, নিশ্বাসও একটু ঘন। বিজিতের ঘন সান্নিধ্যে বসে খাবার খেল। বলল, অনেকদিন মুভিতে যাইনি।

বিজিত বলল, যাবে?

না, তার চেয়ে চল কোথাও ঘুরে আসি, কলকাতার বাইরে কোথাও।

রূপনারায়ণ?

নীরা একটু ভেবে বলল, না অন্য কোথাও। চল, গঙ্গার মোহানায় যাই।

দু'জনে বেরিয়ে গেল।

●

এই ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল। নীরা বুঝতে পারছে চারদিকে সকলের মনে নানান প্রশ্ন জাগছে। মনে মনে বলে, ভাবুক। নীরা আর ওসব ভাবতে চায় না। ও ক্রমাগত যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। বুকের টিউমারটিকে দাবিয়ে রাখা যায়নি, ক্রমেই যেন আকারে একটু বড় হচ্ছে, ব্যথা বাড়ছে। ইতিমধ্যে কয়েকবার রেডিওথেরাপিও হয়েছে। ব্যথা বাড়ছে। তথাপি বিজিতকে এখনো কিছু বলেনি। এখন দিন ছেড়ে বিজিতের সঙ্গে রাত্রেও বেরিয়ে যায়। গান শুনতে যায়, নাচ দেখতে যায়। ক্যাবারের আসরে নিজেও বিজিতের সঙ্গে নাচে। অনেকবার মনে হয়েছে, বিজিতকে না বলাটা ঠিক হচ্ছে না। আবার মনে হয়েছে, বিজিতকে বললেই, সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। আর তো কয়েকটা মাস। নীরা এখন মনে মনে স্থির বুঝেছে, হাসপাতালের ডাক্তারের কথা অক্ষরে অক্ষরেই সত্যি হতে চলেছে।

চার মাস পার হয়ে যাবার পরে নীরা একদিন বলল, বিজিত, আমাদের বিয়েতে বাধা কি?

boiRboi.net

বিজিত বলল, কিছু না, কিন্তু তোমার শরীরটা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। আগে একটু ভাল হও, তারপরে হবে।

নীরা বলল, না, আর দেরি না বিজিত, তাড়াতাড়ি কর। আমাদের কোন অনুষ্ঠানের দরকার নেই, কারোকে জানানোর প্রয়োজন নেই, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে আসব। আমাদের বিয়ের সাক্ষী থাকবেন বোসকাকা, আর আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর ঘোষ। রাজী তো বিজিত?

বিজিত রাজী হল। বিয়ের নোটিশ দেওয়া হল। রেজিস্ট্রির দু'দিন আগে বিজিতের চোখের দৃষ্টি একেবারে বদলে গেল। সকালবেলা নীরার বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। নীরার ঘরে নীরাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, আগে বলনি কেন নীরা?

নীরা বিজিতের মুখ দেখে বুঝতে পারল, সে খবর পেয়েছে। বলল, আগে জানলে কী হত বিজিত? তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে না?

নিশ্চয়ই করতাম, কিন্তু জানতে পারলাম না কেন? তোমাকে যে হারাতে হবে, একথা তো বুঝিনি।

নীরা বলল, অনেক বার বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। কিন্তু তোমাকে কে বলেছে বিজিত?

ডক্টর ঘোষ।

ডক্টর ঘোষ?

হ্যাঁ। দিন দিন তোমার শরীর খারাপ হতে দেখে, আমি গিয়েছিলাম ডক্টর ঘোষের কাছে, তোমার সম্পর্কে বলতে। উনি ভেবেছিলেন আমি সব জানি। তাই প্রথমে অবাক হলেও পরে কিছু বলতে চান নি। কেবল বললেন, নীরার যদি কোন অসুখ করে, সে তোমাকে নিজেই বলবে। কিন্তু ডক্টর ঘোষের ভাব দেখে, কথা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হল, তখন ওঁকে আমি চেপে ধরলাম। অনেক বলবার পরে উনি বললেন, "আজ বাদে কাল তোমাদের বিয়ে। কিন্তু যে কোন কারণেই, এ বিয়ে থেকে কি তুমি নিরস্ত হতে পারো?" আমি অবাক হলেও, জোর দিয়ে বললাম, "কখনোই না। নীরাকে বিয়ে করা থেকে কিছুই আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।" তখন তিনি আমাকে সেই সর্বনাশের কথা বললেন।

নীরা বলল, কিন্তু সেজন্য তোমাকে আমি বলতে চাইনি, তা নয়। আমার জন্যে তুমি ভয়ে ব্যস্ততায় ছুটোছুটি করবে, সেটা চাইনি। আমার শেষ দিনের তো দেরি নেই। তুমি জানতেই পারবে।

বিজিত নীরাকে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে নিয়ে বলল, কিন্তু কেন আমায় আগে বললে না, তোমাকে আমি য়ুরোপের কোথাও চিকিৎসা করতে নিয়ে যেতাম।

নীরা বলল, ভুল বিজিত, নিয়তির নির্দেশ তাতে ঠেকানো যেত না।

বিজিত বলল, এখনো আমি তাই চাই নীরা, আমি হাল ছাড়ব না।

না না বিজিত, আমাকে নিয়ে টানা-পোড়েন কর না। তোমার বুকের কাছে থেকে এমনি করে আমাকে যেতে দাও। য়ুরোপের মানুষও এই ব্যাধিতে মরে। এ দেশ ছেড়ে গেলেই, আমি বাঁচব না। শুধু আমার কপালে সিঁথিতে যেন সিঁদুর থাকে। মধুসূদন রায়ের কোন সাধই পূর্ণ হয়নি, তুমি একটা সাধ পূর্ণ কর, তার

boiRboi.net

মেয়ে যেন সধবা হয়ে মরে।

বিজিত রুদ্ধ গলায় বলল, চুপ কর নীরা, চুপ কর।

নীরা বিজিতের বুক থেকে মুখ তুলল। বিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বিজিত, তোমার চোখে জল।

বিজিত তার ভেজা চোখ হাত দিয়ে মুছে বলল, কি নিয়ে থাকব নীরা।

নীরা চুপি-চুপি বলল, আমাকে নিয়ে। আমি থাকব বিজিত, তোমার কাছে কাছে থাকব, সব সময় আমাকে অনুভব করবে। আর কারোর কাছে আমার স্মৃতি থাকবে না।

বিজিত বলল, বেশ, নীরা, তোমার স্মৃতিই থাকবে, কিন্তু তোমার এই বিশাল বিত্ত-বৈভব, এ সবের ভার আমি বইব না, বইতে পারব না। আমার অনুরোধ এ সব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে যাবে।

নীরা একটু ভেবে বলল, আমি জানি, তুমি নির্লোভ, তুমি কর্মী, কর্মে বিশ্বাসী। তাই হবে বিজিত, আমার সর্বকিছু কোন জনহিতকর কাজে দান করে যাব। কিন্তু আমি একটা কিছু করে যেতে চাই।

কি করতে চাও?

বিজিত, আমি মনে মনে নিতান্ত সাধারণ মেয়ের মত স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর করতে চেয়েছি। হল না। স্বামী পেলাম, বাকীদের পেলাম না। আমি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইস্কুল আর পার্ক করে যেতে চাই, তার নাম হবে মধুসূদন বিদ্যালয়। তুমি ব্যবস্থা কর, আমি পরে সব বলব।

বিজিত বলল, বেশ, তাই হবে।

বিজিতের সঙ্গে নীরার বিয়ে হয়ে গেল। কোন উৎসব নয়, শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাড়িতে বসেই শপথ-পত্রে সই হল। ব্রজকিশোর এবং ডক্টর ঘোষ সাক্ষী রইলেন। নীরা নিজের হাতে সবাইকে মিষ্টি পরিবেশন করল। কণা ওর সঙ্গে। বিজিত প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন, কখন নীরা হঠাৎ পড়ে যাবে।

এই আসরেই নীরা ওর ইস্কুল আর পার্কের পরিকল্পনা সকলের কাছে ঘোষণা করল। পরদিন থেকেই তার রূপায়ণের কাজ শুরু হল। নীরা বিজিতকে একলা ছেড়ে দিল না। ও, বিজিত, ব্রজকিশোর, সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাজে ব্যস্ত রইলো। ওকে নিরস্ত করা গেল না। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। নীরা বুঝতে পারছে প্রতি পলে পলে ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর বিজিত যেন সেই মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করে দিন রাত্রি কাজ করে চলেছে।

আট মাস পূর্ণ করেও নীরা বেঁচে আছে। মনের জোরে বেঁচে আছে। বাড়িতে ওকে শুইয়ে রাখা যায় না। কাজের মাঝখানে একটি আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়ে সব দেখছে। মাঝে মাঝে উসকো-খুসকো চুল, মজুরের মত পোশাক নিয়ে বিজিত কাছে আসছে। নীরার চোখে আলো ফুটে ওঠে, অনাবিল অনির্বচনীয় হাসি ওর মুখে।

নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে বসে নীরা স্বপ্নকে সার্থক হতে দেখছে। যেন মৃত্যুকেই তিলে তিলে জয় করছে। জীবনের হাসি ওর মুখে।

---

boiRboi.net

গন্তব্য

boiRboi.net

সকালবেলা, সাতটা বাজতে সাত আট মিনিট বাকী। সরকারী পরিবহণের বাসটা দাঁড়িয়ে। পশ্চিমে, মনুমেণ্ট, এখন শহীদ মিনার বলা হয়, যার ছায়া পশ্চিমের মাঠে, ঘাসে—ঘাস উঠে যাওয়া ধুলামাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। চৌরঙ্গি সকালবেলার, এখনো তেমন ভিড়বহুল যানবাহনে সরব হয়ে ওঠেনি। অধিকাংশ দোকানপাটের দরজা বন্ধ। শো-কেসের আলো নেভানো, এখন অন্ধকার মতো, ঝলক দিচ্ছে না। বড় বড় হোটেলগুলোর সামনে ফাঁকা। স্থরেন বাঁড়ুজ্জে চৌরঙ্গীর মোড়ে, ট্রাফিক পুলিশ এখনো এসে তাদের জায়গা নেয়নি। গোয়ালারা বড় বড় স্থরাটি ভাগলপুরী গাভীর গলার দড়ি ধরে, ঘটি বালতি নিয়ে চলাচল করছে।

কলকাতা, এখনো ঠিক কলকাতা হয়ে ওঠেনি। উঠতে চলেছে। সকাল আটটার মধ্যেই, চেহারা বিলকুল পালটে যাবে। কোনো সন্দেহ নেই। দূরপাল্লার বাস যেখান থেকে ছাড়ে, তার চত্বর থেকে দীঘাগামী বাস ছেড়ে গিয়েছে দশ মিনিট দেরিতে, ছ'টা দশে। আর একটা বাস, বেশির ভাগই যাত্রী বোঝাই হয়ে গিয়েছে। তাদের নানারকম কথাবার্তায়, বাসের ভেতর কলরবমুখর। ছাড়বে সাতটায়। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো, ঝটপট দরজা খুলে, তড়ি ঘড়ি চারজন নামলো। একজন চল্লিশের কম পুরুষ, স্বাস্থ্যবান, লম্বা লম্বা চুল মাথায়। ট্রাউজারের ওপরে হাওয়াই শার্টের লোমশ বুক খোলা, ডান হাতে ঘড়ি, দাড়ি-না-কামানো মুখ। ব্যস্তভাবের মধ্যেও খুশি আর উৎসাহী। হাতে একটা অ্যাটাচি। ট্যাক্সি থেকে নেমেই, পিছনে যেতে যেতে বললো, 'অনু, তুমি ফুল্লরা আর বুবাইকে নিয়ে বাসে উঠে পড়ো, চোদ্দ পনরো ষোল সতরো—এই চারটে সীট আমাদের। আমি ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে, স্যুটকেশগুলো তোলবার ব্যবস্থা করে আসছি।'

অনু, ত্রিশের বেশি না, মাথার চুল খোলা, এখনো একটু ভেজা ভেজা, পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমান করে ছাঁটা। কপালে একটু সিঁদুর ছোঁয়ানো—দ্রুত হাতে ছোঁয়ানো, বোঝা যায়। তার হাতে একটি রঙচঙে পাশবালিশের মতো ব্যাগ। প্রথমে বাসের দিকেই যাচ্ছিল, নির্দেশ মতো, যাত্রীভরা বাসের দিকে, সাতটায় যেটা ছাড়বে। এখন আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

চৈত্র মাস। আকাশ পরিষ্কার, রোদ-ঝকঝকে সকাল। চৌরঙ্গির রাস্তায়, বড় বড় ইমারতের ছায়া এখনো পুব ঘেঁষে। পশ্চিমে সবুজের ঝলক। অনু হঠাৎ থেমে বললো, 'তুমি একলা তিনটে স্যুটকেশ তুলবে নাকি?'

কণ্ডাক্টর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, নেমে এলো। বললো, 'কতো বড় স্যুটকেশ, দেখি? ওপরে তুলতে হবে নাকি?'

ফুল্লরা—বছর পঁচিশ বয়স হতে পারে, অবিবাহিতা। মাথার চুল অনুর থেকে আর একটু খাটো, কাঁধের একটু নিচে, খোলা। ভেজা ভাব নেই। ওর কাঁধে একটা চটের বিনুনি করা ব্যাগ ঝোলানো। বললো, 'দিদি, তুমি বুবাইকে নিয়ে ওঠো, আমি কুমারদার সঙ্গে স্যুটকেশ নিয়ে উঠছি।'

boiRboi.net

কুমার আবার বলে উঠলো, 'চোদ্দ পনরো ষোল সতরো!'

কণ্ডাক্টর ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনারা উঠে পড়ুন না, বাস ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। আপনারাই লাস্ট প্যাসেঞ্জার।'

কুমার বললো, 'হ্যাঁ, উঠে পড়ো তোমরা, সাতটা বাজতে বেশি বাকী নেই।'

ট্যাকসি ড্রাইভার পিছনের কেরিয়ারের ঢাকনা খুললো। নিজের হাতেই চটপট তিনটি চামড়ার স্যুটকেশ নামালো। তিনটিই চামড়ার স্যুটকেশ না, একটা পলিথিনের, চেন দিয়ে মুখ আটকানো। কণ্ডাক্টর বললো, 'এসব ভেতরেই চলে যাবে।'

সে দুটো স্যুটকেশ নিয়ে ওপরে উঠে গেল। তার পিছনে অনু আর ফুল্লরা বুবাইকে নিয়ে উঠলো। কুমার ট্রাউজারের হিপ্ পকেট থেকে পার্স বের করতে করতে, ড্রাইভারকে বললো, মিটারটা দেখুন তো ভাই, কতো উঠেছে।'

বাসের ভিতরে, পাঁচ বছরের বুবাই, ওদের নির্দিষ্ট আসনের, জানালার ধারেরটি প্রথমেই দখল করে নিয়ে, খুদে খুদে দাঁতে, মা আর মাসীর দিকে তাকিয়ে হাসলো। অনু বললো, 'ফুলু, তুই বুবাইয়ের পাশে বোস, তবু জানালার কিছু কাছে হবে।'

ফুল্লরা নাক কোঁচকালো, ভুরু কোঁচকালো, বুবাইয়ের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠলো, বললো, 'কেন, আমাদের চারটে সীটের মধ্যে, একটা মাত্র জানালা পাওয়া গেছে?'

কুমার পলিথিনের স্যুটকেশটা আর অ্যাটাচি নিয়ে এগিয়ে এসে বললো, 'হ্যাঁ। একদিকে তিনটে, আর একদিকে একটা। তুমি তোমার দিদি আর বুবাই একদিকে বসো, আমি চৌদ্দ নম্বরে বসছি।'

কণ্ডাক্টর স্যুটকেশ দুটো যথাস্থানে রেখে, এগিয়ে এসে কুমারকে বলল, 'টিকেটগুলো দেখাবেন একবার।'

কুমারের হাতেই তখনো পার্স। সে পার্স খুলে, টিকেট বের করে দেখালো। কণ্ডাক্টর হাতে নিয়ে টিকেটগুলো দেখে, বুক পকেট থেকে পেন্সিল বের করে, প্রত্যেক টিকেটে একটা করে দাগ দিয়ে, আবার কুমারের হাতে ফিরিয়ে দিল। ফুল্লরা তখন বিরক্ত মুখে গোটা বাসটার ভিতরে এদিকে ওদিকে দেখছে। বিশেষ করে জানালাগুলোর দিকে। ওর ঠোঁট দুটোকে বিম্বোষ্ঠই বলা যায়, স্বাভাবিক রঙ যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবু, ঠোঁটে রঙ বুলিয়ে এসেছে। ডাগর চোখ দুটিতে কালো পেন্সিলও। গলায় কাঁধে এখনো পাউডার লেগে আছে। হাতকাটা জলপাই রঙ কাঁচুলিকাট ব্লাউজের সঙ্গে, শাড়িটাও মিলিয়ে পড়েছে, এমন কি গলার আর কানের কাঁচগুলোও।

বাসের একদিকে তিনটি আসন পাশাপাশি, আর একদিকে দুটি। মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। পিছনে, একপাশে লোহার জালের দেওয়ালের মধ্যে, বিবিধ রকমের ব্যাগ স্যুটকেশ। আর একপাশে লেভেটরি। ফুল্লরার নজরে পড়লো জানালার ধারে, একটি মাত্র আসনই খালি। আর সেটা চোদ্দর পাশে তেরো। রীতিমতো অন্যায় আর অযৌক্তিক, ফুল্লরার মনে হলো। বেজোড় সংখ্যার আসন কেন জানালার ধারে পড়বে? ওদিকে সতরো, এদিকে তেরো। বিরক্তিকর।

boiRboi.net

ও জেনে শ্‌নেই, কণ্ডাক্টরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কত নম্বর সীট ?'

কণ্ডাক্টর বললো, 'নাম্বার থারটিন।'

পিছন থেকে কেউ বলে উঠলো, 'আনলাকি নাম্বার।' তারপরে সমবেত হাসি।

ফুল্লরা পিছন ফিরে তাকালো। পাশাপাশি তিন য্‌বক, একসঙ্গেই যাচ্ছে বোধহয়। ওরা সবাই ফুল্লরাকেই দেখছে। ফুল্লরা ম্‌খ ফিরিয়ে নিল, তেরো নম্বর সীটের দিকে তাকালো, সেখান থেকে ম্‌খ ফিরিয়ে কুমারের দিকে। কুমার তখন পলিথিনের স্যুটকেশটা সীটের নিচে রাখছে। অন্‌ ডাকলো, 'শোন ফুল্‌। ব্‌বাই না হয় একটু পরে উঠে যাবে, তুই এখন এখানে এসে বোস না।'

ফুল্লরা কিছ্‌ বলার আগেই কণ্ডাক্টর তার হাতের ঘড়ি দেখে বললো, 'এই নাম্বার থারটিনই লেট করিয়ে দেবে দেখছি। সাতটা বাজলো এখনো পাত্তা নেই।'

ফুল্লরার চোখে একটা ঝিলিক হেনে গেল। কুমার বললো, 'ফুল্‌, এখন তুমি তেরো নম্বরেই বসো না। প্যাসেঞ্জার এলে, ছেড়ে দিও।'

সামনের চালকের আসনে ড্রাইভার উঠে বসলো, জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলো। ঘেরা জালের ওপার থেকে, রোগা রোগা ড্রাইভার, ভিতর দিকে তাকিয়ে, মোটা গমগমে স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'প্যাসেঞ্জার সব এসে গেছে ?'

সামনের দরজা থেকে, বিশ বাইশ বছর বয়সের একটা ছেলে—বোধহয়, সহিস বা ক্লিনার হবে, বললো, 'তেরো নম্বর আসেনি।'

কণ্ডাক্টর বললো, 'আমি আর পাঁচ মিনিট দেখবো, তারপরে ছেড়ে দেবো।'

বলতে বলতে সে পিছনের দরজার দিকে চলে গেল। ফুল্লরা তেরো নম্বর সীটে, জানালার ধারে বসলো, ওর পাশে চোদ্দ নম্বরে কুমার। ফুল্লরার দিকে ঝ্‌কে, স্বর নামিয়ে বললো, 'তেরো নম্বরের প্যাসেঞ্জারকে পটিয়ে-পাটিয়ে যদি চৌদ্দয় বসতে রাজী করাতে পারো, তা হলেই হলো।'

ফুল্লরা ভুর্‌ কোঁচকালো, কিন্তু ঠোঁটে হাসির আভাস, বললো, 'পটানো আবার কী ?'

কুমার এক চোখ ব্‌জে, ইঙ্গিত করলো। ফুল্লরা ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখের তারা ঘ্‌রিয়ে বললো, 'অসভ্য আপনি।'

কুমার বললো, 'হ্‌ঁ, আমি অসভ্য। পটানোটা তো আসলে তোমাদেরই কাজ। একটু চোখ ঘ্‌রিয়ে, ইয়ে করে, হাসি দিয়ে—'

তার কথার মাঝখানেই ফুল্লরা বলে উঠলো, 'আর প্যাসেঞ্জারটি যদি কোনো মেয়ে হয় ?'

কুমার যেন থতিয়ে গেল, হঠাৎ কোনো জবাব ম্‌খে এলো না। ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠলো। পিছন থেকে শোনা গেল, 'আনলাকি।' উদ্দিষ্ট কে এবং উদ্দেশ্য, ফুল্লরা ব্‌ঝতে পারলো, ম্‌খ ফেরালো না। কুমারের দিকে ঝ্‌কে ফিসফিস করে বললো, 'তখন আপনি পটাতে পারবেন তো ?'

কুমার তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ হয়ে উঠলো, 'মাথা খারাপ। বরং পাশে বসে যাবে, সেটাই তো ভালো।'

ফুল্লরা ঠোঁট বাঁকিয়ে, গ্রাম্য ভঙ্গিতে বললো, 'ম্‌রোদ।'

boiRboi.net

রোগা ড্রাইভারের মোটা গমগমে স্বর শোনা গেল, 'কী করবে ? সাতটা পাঁচ হয়ে গেল।' কণ্ডাক্টর পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, নিজের কব্জির ঘড়ি দেখলো, 'স্টার্ট করুন। এ তো আর প্রাইভেট গাড়ি না, কারোর জন্যে বসে থাকা যায় না।'

এঞ্জিন গর্জন করে উঠলো। গর্জন করতেই লাগলো, ছাড়লো না। ফুল্লরার বুক ঢিপঢিপ করছে, আর জানালার বাইরে প্রতিটি লোকের দিকে তাকাচ্ছে। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে আরম্ভ করেছে।

এঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে, ড্রাইভারের মোটা গলার চিৎকার শোনা গেল, 'কী হলো ?'

ফুল্লরা বলে উঠলো, 'ছাড়ছে না কেন ?'

কণ্ডাক্টর ঠুং ঠুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। বাসটা তৎক্ষণাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। যেন টগবগে ঘোড়াটা ছোটবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল। ঝাঁকুনি দিয়েই, বাস টারমিনাসের সীমানা থেকে রাস্তায় চলে গেল।

কুমার বলে উঠলো, 'ফুলু, তোমার ভাগ্যেরই জয় হলো, তেরো নম্বর এলো না।'

ফুল্লরার দৃষ্টি তখনো বাইরের দিকে, বললো, 'দাঁড়ান বাপু, আমার এখনো বুক ঢিপঢিপ করছে।'

গাড়ি বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, এগোল, এবং তারপরে আবার বাঁ দিকে। হাওয়ার একটা ঝাপটায়, ফুল্লরার কপালে চুল উড়ে পড়লো। বুবাই ডেকে উঠলো, 'ফুলু মাসী।'

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে তাকালো। বুবাই হাসছে। অনুও হাসছে। কুমার হাসছে। বাস পুরী চলেছে।

এ সময়ে একটা ট্যাক্সি বাসটাকে ওভারটেক করে, প্রায় বাসের সামনে আস্তে আস্তে ব্রেক কষলো। ট্যাক্সির ভিতর থেকে একটি হাত বাইরে বেরিয়ে এলো। হাতে একটি বাসের টিকেট, চিৎকার শোনা গেল, 'তেরো নম্বর। প্লিজ, এক মিনিট দাঁড়ান।'

বাস তখন দাঁড়িয়ে পড়ে গর্জাচ্ছে। কণ্ডাক্টর দরজা খুলে দিয়ে বলে উঠলো, 'কী যে করেন আপনারা। তাড়াতাড়ি আসুন।'

কুমার বললো, 'মানে, তেরো নম্বরের প্যাসেঞ্জার ?'

ফুল্লরার মুখের আলো নিষ্প্রভ হলো, বিরক্তির স্বরে বললো, 'তা ছাড়া আবার কী। ঠিক এসে গেছে।' বলে ও ওঠবার উদ্যোগ করলো। পিছন থেকে শোনা গেল, 'আনলাকি।' সমবেত হাসি।

কুমার বললো, 'যাচ্ছো কেন, বসো না, দেখা যাক।

তেরো নম্বর আসনের যাত্রী তখন বাসে উঠেছে। ট্যাক্সির পথরোধ অপসারিত। বাস গর্জন করে, ইডেন আর আকাশবাণীর মাঝখানের রাস্তা ধরে ছুটলো।

★

তেরো নম্বর আসনের যাত্রী দরজার কাছে। বাস ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটছে।

boirboi.net

আকাশবাণী ভবন পার, বাঁয়ে অ্যাসেম্বলি ভবন, ডাইনে লাটবাড়ির বাগান। কণ্ডাক্টর তেরো নম্বর যাত্রীর টিকিট দেখে, সামনের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'সামনে এগিয়ে যান, বাঁয়ে জানালার ধারে।'

কণ্ডাক্টরের কথা যেন ছিটকে এসে লাগলো ফুল্লরার মুখে, রঙ গেল বদলিয়ে, ভুরু উঠলো বেঁকে, কাজল আঁকা চোখের তারা কোণ থেকে হাসলো একবার কুমারের দিকে, তারপরে তেরোর দিকে। তার আগেই কণ্ডাক্টরের কথা শুনে ওর মেজাজটা চড়ে উঠলো। 'জানালার ধারে!' এতোটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে দেবার কী আছে? তেরো কী অন্ধ? যদিও তার চোখে আঁটা একটা ঢাউস ঠুলি, ফুল্লরা ওর নিজের হালকা আর স্বচ্ছ ঠুলির ভিতর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল। তেরোর ঠুলিটা একদম কালো, কিংবা বেগুনিও হতে পারে, মোটের ওপর, তার চোখ দেখবার কোনো উপায়ই নেই। এমন কি চোখের দুপাশও অস্বচ্ছ গাঢ় কাঁচে ঢাকা। যেমন গ্লেসিয়ার দেখতে গেলে লোকে ব্যবহার করে। বাসের মধ্যে এরকম গ্লাস এঁটে ওঠবার মানে কী? এখানে তো আর রোদ ঝলকানো বরফ নেই। কিন্তু তেরো দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কেন? ভাবটা যেন গোটা গাড়ির ভিতরটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিচ্ছে, প্রতিটি যাত্রীর মুখ যেন দেখছে। বিশেষ কারোকে খুঁজছে নাকি? তা না হলে অন্ততঃ মুখোসধারীর মতো, চোখের ঠুলিটা খুলুক!

এই রে! ফুল্লরা মনে মনে চমকে উঠে, প্রায় জিভ কামড়াতে যাচ্ছিল। এর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্তর্যামীর মতো, তেরো চোখের ঠুলিটা খুলে ফেললো। গর্জিত গাড়ি স্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে পড়লো, ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটলো হাওড়া ব্রীজের দিকে। এখানে ট্রাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। ভিড়ও চৌরঙ্গির তুলনায় বেশি। স্বাভাবিক, বড়বাজার সামনেই, এবং 'হাওড়া পুল'। রাস্তার ধারে উপছানো গঙ্গার জলে, স্নান শৌচাদি চলেছে। গাড়ির গতি মন্থর। অনুমান করা যায়, সামনে অনেক গাড়ি। বাসের ইঞ্জিন যেন অধৈর্য প্রতিবাদে গর্জাচ্ছে।

মোটা ভুরুর নিচে, তেরোর কালো চোখ দুটো বেশ বড়, কিন্তু দৃষ্টি যেন বাজপাখির মতো, তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসু। ডান ভুরুর ওপরেই চুল এলিয়ে পড়েছে। একমাথা রুক্ষ কালো চুল, মেয়েদের 'বয়'জ কাট' চুলের থেকেও অনেক বড়। গোটা মুখের আর ঘাড়ের পিছনে একটি চুলের চালচিত্র, আর কালো গোঁফদাড়ি। দাড়ির গুচ্ছ তেমন ঘন না, কিন্তু দেখে মনে হয় কাঁচি পড়েনি অনেকদিন, অবিন্যস্ত, পাকানো। চুলে কোনো সিঁথির ব্যাপার নেই। ওপরের ঠোঁট অনেকখানি গোঁফে ঢাকা পড়েছে। নিচের ঠোঁট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটু টেপা, যেন শক্ত হয়ে আছে। দাড়ির নিচেই গলার কিছু অংশ, তারপরেই বুক খোলা, প্রায় চটের মতো মোটা কাপড়ের, জামরঙের পাঞ্জাবি। বোতাম খোলা, ফাঁকে স্বল্প রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। কাঁধে গোল লম্বা একটা ব্যাগ। সিন্থেটিক কিছু, প্লাস্টিক বা পলিথিন না, অন্য কিছু, সাদা আর লাল রঙ! কিন্তু পাঞ্জাবির নিচে, নীল জিন কাপড়েরর ট্রাউজার। এমন কি ফুল্লরা তেরোর পায়ের রবার সোলের ফোমের

boiRboi.net

দাড়ি পাকানো স্যু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। মনে মনে, ও বিদ্রূপ করে হাসলো। বাঙালী হিপি নাকি? বাঙালী তো বটেই। ফুল্লরার মনে আছে, ট্যাকসি থেকে ভেসে আসা কথা, 'তেরো নম্বর। প্লিজ, এক মিনিট দাঁড়ান।'...

ফুল্লরা ঝটিতি ডান দিকে কুমারের গায়ের দিকে ঝুঁকে একটা চাপ দিল। তেরো এগিয়ে আসছে। চোখে আবার, সামনে পাশে ঢাকা ঠুলিটা এঁটেছে। গাড়ি হাওড়া ব্রীজের মুখে, গর্জন শুনলে মনে হয়, প্রকাণ্ড ঘোড়াটা পা দাপাচ্ছে, মুখ দিয়ে ফেনা ছিটকে বেরোচ্ছে।

কুমার নিচু স্বরে বললো, 'কী হলো, ঠেলছো কেন?'

'তেরো নম্বর আসছে, সরুন, উঠে পড়ি।' ফুল্লরা বললো।

পিছন থেকে শোনা গেল, 'সুসে আসিলো।' হাসি, এবং তারপরেই আর একটি স্বর 'আনলাকি।' সমবেত টলে পড়া হাসি।

কুমার বললো, 'বসো না, এতো নার্ভাস হচ্ছো কেন। আসতে দাও দেখি কি করে।'

তেরো এগিয়ে আসছে, ধীরে, প্রত্যেকটি আসন এবং যাত্রীকে দেখতে দেখতে, সীটের পিছন ধরে, শরীরের ভারসাম্য রেখে। গাড়ি ব্রীজের ওপর। ফুল্লরার গঙ্গা দেখা হচ্ছে না। বাতাসে চোখে মুখে চুল উড়ে পড়েছে, যদিও সামনের দিকে কিছু চুল ছোট করে কাটা আছে।

'ফুলু মাসী, গঙ্গা।' বুবাইয়ের চীৎকার শোনা গেল।

কে যেন বলে উঠলো, 'জয় মা গঙ্গা।'

বিদ্রূপপূর্ণ স্বর, 'ভালোয় ভালোয় পেঁছে দিস মা।' সমবেত হাসি।

কুমার নিচু স্বরে বললো, 'তেরো নম্বর মেয়ে নয়, এখন তোমারই রেসপনসিবিলিটি।'

'কিসের রেসপনসিবিলিটি?' ফুল্লরা অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ওর দৃষ্টি তেরো নম্বরের এগিয়ে আসা জুতোর দিকে। এই সামান্য ব্যাপারেই, ফুল্লরার বুক ঢিপঢিপ করছে, বাতাসের ঝাপটা সত্ত্বেও মুখে ঘাম জমছে।

কুমার বললো, 'ইয়ের—মানে, এমন একটা দারুণ হাসি আর লুক দেবে, আর—'

'থামুন।' ফুল্লরা কুমারের কথার মাঝখানেই বলে উঠলো, 'ও মেয়ে হবে কেন? দেখছেন না, যে ভাবে সবাইকে দেখছে, নিশ্চয়ই ওর কোনো বান্ধবীর থাকার কথা ছিল। বেচারি! এসে গেলে, উঠি।'

কুমার শান্ত ভাবে বললো, 'আরে বসো না, আমি ম্যানেজ করছি। ওর বান্ধবী আসেনি তো কী হয়েছে, আর একটা বান্ধবী পেয়ে যাবে। আমি ম্যানেজ করছি।'

'কুমারদা।' ফুল্লরা নিচু ধমকের স্বরে বলে উঠলো।

কিন্তু আর কিছু বলার সময় নেই, তেরো একেবারে কুমারের সামনে। গাড়ি গঙ্গা পার, রেল ব্রীজের দিকে এগোবার জন্য গর্জাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের সামনে থিকথিকে ভিড়। মানুষ এবং সবরকমের যানবাহনের। বাস লরি ট্রাম টেম্পো ঘোড়ার গাড়ি প্রাইভেট আর ট্যাকসি আর রিকশাও। ট্রাফিক পুলিশ যন্ত্রের

boiRboi.net

মতো নির্বিকার। হাত এদিকে দেখাচ্ছে, ওদিকে দেখাচ্ছে। কে কার ঘাড়ে পড়ছে, তা আর দেখবার নেই, কেবল নাম্বারটা টুকে রাখা। নিতান্ত বেগতিক দেখলে, বেদী থেকে অবতরণ করতে হয়।

কুমার উঠে দাঁড়ালো, তেরো নম্বরকে চোদ্দ নম্বর আসন দেখিয়ে বললো, 'বসুন।'

বলে সরে গিয়ে পনরো নম্বর সীট ধরে দাঁড়ালো। ফুল্লরা দেখলো, তেরো তৎক্ষণাৎ বসলো না, সীটের গায়ে নম্বর দেখছে। ফুল্লরার পক্ষে অতঃপর বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ওঠবার উদ্যোগ করে বললো, 'এটা তেরো নম্বর।'

'আহা-হা তুমি বসো না ফুলু।' কুমার বলে উঠলো, এবং তেরোকে চোদ্দ নম্বর সিট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে বসলে আপনার অসুবিধা হবে ?'

তেরোকে চোখের ঠুলির জন্য ছদ্মবেশী মনে হচ্ছে। এবং তার স্বরের বিস্ময়ের সঙ্গে, মুখের অভিব্যক্তির কোনো মিল দেখা গেল না, 'অসুবিধা কেন ?' ঠুলির ওপর দিয়ে, কপালে একটা রেখা পড়তে দেখা গেল, বোধহয় ভুরু কোঁচকালো, এবং তারপরে ঝকমকে সাদা দাঁতে একটু হাসলো, বললো, 'এটা চোদ্দ নম্বর বলে ? অসুবিধা হবে কেন ?'

তেরো নম্বর ঘাড় থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হাতে নিল। কুমার এবং অনু আর বুবাইয়ের দিকে একবার দেখলো। কুমারের মতো, অনু বুবাই তখন তেরোকে দেখছিল। তেরো চোদ্দ নম্বর আসনে বসলো। ফুল্লরা লজ্জা আর অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ও জানালার দিকে অনেকটা ঝুঁকে গেল, এবং মাথাটা পিছনে হেলিয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কুমারদা আমি ওখানে যাচ্ছি, আপনিই বরং এদিকে আসুন।'

কুমার ভুরু কুঁচকে, খানিকটা অবাক হবার মতো করে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন।' বলে আবার অনুর দিকে তাকালো, এবং সেদিক থেকে তেরোর দিকে।

ফুল্লরার দৃষ্টিও অনুর দিকে, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো। ফুল্লরার মুখে রঙের ছটা—লালচে।

তেরো তাকালো একবার কুমারের দিকে, তারপরে ফুল্লরার দিকে। এবং একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললো, 'আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

ফুল্লরার মুখের রঙ আর একটু গাঢ় হলো, ও তাকালো কুমারের দিকে। কুমার ঘাড় ঝুঁকিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসলো, এবং অনুর দিকে ফিরে তাকালো। অনু হাসলো, তাকালো ফুল্লরার দিকে। হাতের এবং ঘাড়ের ভঙ্গিতে ফুল্লরাকে বসতে বললো। বুবাই ওর সমস্ত দাঁতগুলো দেখিয়ে, এমন খুশিতে হেসে উঠলো, চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গেল। ফুল্লরা বাঁ দিকে, জানালার কাছে ঝুঁকে, যতোটা সম্ভব সরে বসবার চেষ্টা করে, বাইরের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখছে না।

'কপালে অনেক দুঃখ আছে, সেই আনলাকি নাম্বার।'

পিছন থেকে শোনা গেল, এবং সমবেত হাসি হঠাৎ থমকে গেল, কারণ ধমকের শব্দ শোনা গেল, 'কী হচ্ছে কী !'

boiRboi.net

'তুই চুপ কর, যা করছিস, তাই কর।'

অন্য স্বরে শোনা গেল, এবং সমবেত হাসি এবং নিশ্চিত ঢলাঢলি, হাসি শুনলেই বোঝা যায়, ফুল্লরার মনে হলো। ওর দৃষ্টি বাইরের দিকে। কিছুই দেখছে না, সবই অর্থহীন ছবির মতো চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। গাড়িটা চলছে গর্জন করে, যেন সবকিছু চুরমার করে দেবে। ফুল্লরার মুখে রঙ খেলা করছে। 'অসভ্য!' মনে মনে বলছে। ভ্রূকুটি করছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। কুমারদা কি এখনো হাসছেন? আর দিদি? আর বুবাইটা? কী বিচ্ছিরি করে হাসছিল বুবাইটা। ছি ছি! ফুল্লরার মন গাড়ির ভিতরে।

হঠাৎ তীক্ষ্ন আর্তনাদ করে গাড়িটা ব্রেক কষলো, যাত্রীরা সব ঝট্‌-ঝাঁকুনিতে বেসামাল হলো। পিছন থেকে কণ্ডাক্টরের চিৎকার শোনা গেল, 'এই, এই, কেয়া হোতা হ্যায়? রাস্তা মে দিল্লাগি হোতা হ্যায়?' বলেই সামনের দরজার বিশ বাইশ বছর বয়সের ছেলেটাকে চিৎকার করে ডাকলো, 'সে সুদরশনো।'

সামনের দরজার ছেলেটা আওয়াজ দিল, 'হুঁ।'

কণ্ডাক্টর ওড়িয়া ভাষায় কিছু বললো, যা ফুল্লরা বুঝতে পারলো না, কেবল 'প্রায়ভ্যাট' শব্দটি ছাড়া। ইতিমধ্যে ধুলা উড়ে এসেছে, স্পষ্টতঃই, এধুলোয় হাওড়ার গন্ধ, এবং দৃশ্য। অতি পরিচিত হাওড়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছোট রাস্তা, উপছানো মানুষ রাস্তার দু'পাশ জুড়ে গাড়ি, দোকানের সারি, নর্দমার ধারে নগ্ন শিশুদের মলমূত্র ত্যাগ, এবং পথচারীরা খুবই নির্বিকার আর মন্থর, ফুল্লরা এখন বাইরের দৃশ্য দেখছে। পিছনের কণ্ডাক্টরের কথা শেষ হতেই সামনের দরজা খুলে সুদর্শন যার নাম সে নামতে যাচ্ছিল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। তৎক্ষণাৎ ফুল্লরার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠলো, ভুরু কুঁচকে উঠলো এবং মুখটা জানালার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে এনে নত চোখের পাতায়, কোণ দিয়ে তাকালো! তেরো নম্বর তার ব্যাগের মধ্যে হাত গলিয়ে ঝুঁকে পড়ে কিছু খুঁজছে। গন্ধটা গাড়ির ভিতর থেকেই নাকে এসেছে, অবিশ্যি দু-এক ঝলক, কিন্তু স্পষ্টতঃই রাম-এর। ফুল্লরা গন্ধটা চেনে, বিশেষ করে রাম-এর গন্ধ। বরং হুইস্কি বা অন্য কোনো মদের গন্ধ ঠিক চিনতে পারে না। বীয়রটা একটু পারে। কুমার মাঝে মাঝে রাম পান করে। হুইস্কিই বেশি, দিনের বেলা কোনো কোনো দিন বীয়র। তবে খুব কম। দিনের বেলা ড্রিংকের পাট বিশেষ থাকে না, ছুটির দিন কখনো সখনো। রাত্রির দিকে প্রায়ই—রোজ না হলেও, প্রায় রোজ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, ওর বা দিদি অনুর যে কোন পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি, তা না। অবিশ্যি সেই সব দিনে, কুমারের বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের পত্নীরাও থাকে, এবং সব মেয়েদেরই কিছু কিঞ্চিৎ নিয়মভঙ্গ ঘটে। কুমারের কোনো কোনো বন্ধু-পত্নীর নিয়মভঙ্গটা, যাকে বলে, 'সত্যি হাই!'

কিন্তু বাসের মধ্যে কে বা কারা, এতো লোকজনের মধ্যে এই সাত সকালে পান শুরু করেছে? ফুল্লরার জিজ্ঞাসু মন, নত চোখের কৌতূহলিত দৃষ্টি, তেরোর ব্যাগ হাতড়ানোর দিকে। ব্যাগটার ভিতর থেকে গন্ধটা এলো নাকি? তেরো তার লম্বা ব্যাগের অনেক ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবং একটা কিছু টেনে

boiRboi.net

তুলতে গিয়ে, ব্যাগ থেকে যেটা বাইরে পড়ে গেল, সেটা একটা বই। ইংরাজী পকেট বই, ফ্রানজ কাফ্‌কার মেটামরফোসিস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ। তারপরেই তেরোর হাতে উঠে এলো, কোয়ার্টার পাউন্ডের একটা পাঁউরুটি। সে ব্যাগের মুখে, ডোরাকাটা কোনো জামা ঢাকা দিয়ে, দু-হাঁটুর মাঝখানে চেপে, বইটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

ফুল্লরা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বাইরের কিছুই দেখছে না। তেরোর ব্যাগে যদি রাম থাকতো, তাহলে আবার গন্ধ পাওয়া যেতো। কিন্তু ছেলেটা—ফুল্লরার ভাবনা থমকালো। এবং হঠাৎই ও একবার ডান দিকে ফিরে, তেরোর দিকে তাকালো, মনে মনে ভাবলো ঠিকই ভেবেছে। লোকটা না ছেলেটাই, যতোই গোঁফ দাড়ির জঙ্গল গজাক আর, মাথা ভরতি চুলের গোছা। চুলগুলোর দিকে দেখলেই অস্বস্তি লাগে, এতো ঘন আর বড়। উকুন নেই তো? কিন্তু, ফুল্লরা যা ভাবছিল, ছেলেটা কী এখন পাঁউরুটিটা খাবে নাকি? ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েই চোখ পড়ল কুমারের ওপর। কুমার ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে, এবং ফুল্লরার দিকেই তাকিয়ে দেখছে। ওর চোখের স্বচ্ছ গ্লাসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় মাত্রেই, কুমার অনুর দিকে ফিরলো। অনুও তাকালো, ঠোঁটে চাপা কৌতুকের হাসি।

ফুল্লরা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল, ওর মুখে রঙের ছটা লেগেছে। হঠাৎ গর্জিত বাসটা আবার তীক্ষ্ন আর্তনাদের শব্দে দাঁড়িয়ে পড়লো, চলন্ত এঞ্জিনের ঝংকারে কাঁপতে লাগলো। আর তৎক্ষণাৎ ওর কোলের ওপর কিছু পড়লো। ফুল্লরা চমকে তাকিয়ে দেখলো, মেটামরফোসিস এ্যান্ড আদার স্টোরিজ, আবছা সবুজ রঙের সেই বিদঘুটে ছবির মলাট। তেরো বলে উঠলো, 'সরি।' এবং ফুল্লরার কোলের ওপর হাত বাড়াতে গেল। তার এক হাতে কাগজের মোড়কে খোলা পাঁউরুটি।

ফুল্লরার নাসারন্ধ্র আবার স্ফীত হলো, আবার সেই এক ঝলক গন্ধ! ও তাড়াতাড়ি বইটা তুলে, দুজনের মাঝখানের হাতলের ওপর এগিয়ে দিল। পিছন থেকে ঢলঢলে মোটা স্বর শোনা গেল, 'এখন আমি গান করব।'

আর একজনের স্বর, 'কিন্তু সেই গানটা যেন গাসনে।'

তারপরেই নিচুস্বরে ফিসফাস, এবং সমবেত হাসি, এবং তার মধ্যেই উচ্চারিত হয়, 'এবার দেবে।' তৎক্ষণাৎ হুল্লোড়ে হাসি।

তেরো গোঁফদাড়ির মধ্যে পাঁউরুটি চেপে ধরলো। ফুল্লরার গা টা কেমন ঘুলিয়ে উঠলো।

প্রথমতঃ গোঁফদাড়ির মাঝখানে, হা-মুখে যেভাবে রুটিটা তেরো নশ্বর কামড়ে ধরলো, দৃশ্যতঃ সেটা বিদ্‌ঘুটে। ওর ওপর-পাটির দাঁতগুলো, পলকের জন্য একবার শানিয়ে উঠলো, তারপরেই একরাশ ঘন কালো গোঁফদাড়ির মধ্যে নরম রুটিটাকে দেখালো যেন হিংস্র গ্রাসের করুণ শিকার। ফুল্লরার, কেমন যেন গা ঘুলিয়ে ওঠার এটা একটা কারণ। তা ছাড়া এরকম কাঁচা পাঁউরুটি ও মোটে খেতে পারে না, ওর গা ঘুলায়। মিষ্টি কিসমিস দেওয়া বনরুটি যদি বা খাওয়া যায়, কাঁচা

boiRboi.net

পাঁউরুটি, তাও মাখন বা জেলি ছাড়া, অসম্ভব।

★

গাড়িটা গর্জাচ্ছে, এখনো দাঁড়িয়ে, কাঁপছে। ঠিক যেন রাগে কাঁপছে। সামনে রেলওয়ে সাইডিং, লেবেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ। ফুল্লরার বাঁ গালে রোদ। কিন্তু মাখন বা জেলির কথা, নিশ্চয়ই, তেরোর ভাববার অবকাশ নেই। খাওয়ার ভঙ্গিটা অতি ক্ষুধার্ত, বেশ দ্রুত। দেখলেই বোঝা যায়, ছেলেটা—ছেলেটা? হ্যাঁ ছেলেটাই তো! ফুল্লরা সেটা আগেই বুঝে নিয়েছে, তেরো একটা ছেলেই। ওর বয়সী হতে পারে—পঁচিশ! কিংবা আরো কম। মেয়েরা চোখে দেখে বয়স ধরতে পারে। ছেলেদের সে-চোখ নেই, অন্য চোখ আছে। ছেলেটা পাঁউরুটি খেতে এতোই মগ্ন, ফুল্লরা বুঝতে পারছে, স্থান কাল সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। রাম-এর গন্ধটা, ফুল্লরা এখন ধরতে পারলো, গাড়িটা দাঁড়ালেই নাকে এসে লাগছে। তার মানে কী? গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়লেই, পিছনের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে? কাঁচা পাঁউরুটি থেকেও, প্রায় এই জাতীয় গন্ধ আসতে পারে কিন্তু সেটা হতো অত্যন্ত হালকা। এরকম নির্ঘাৎ রাম-এর না। তবে গন্ধটা, প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল যখন, তেরো তখন ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়েছিল। তা হোক, রাম-এর সঙ্গে তেরোর কোনো সম্পর্ক নেই। তা হলে গন্ধটা অনেক বেশি তীব্র লাগতো। তা লাগছে না।

গেটের এপারে ওপারে, ইঞ্জিনগুলোর গর্জন, হর্নের চিৎকার হঠাৎ বেড়ে উঠলো। গেট খুলছে। এটাকেই বোধ হয় শালিমারের গেট বলে। তেরোর পাঁউরুটি শেষ। কাগজের মোড়কটা সে দলা পাকিয়ে হাত বাড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিল। এরকম করে মানুষ কখন খায়, কেন খায়, ফুল্লরা কিছু কিছু জানে। সময় নেই, উপায় নেই,। অত্যধিক ব্যস্ততা, এবং স্বভাবও কোনো কোনো সময় এর কারণ। এরকম স্বভাব ছিল বিমানের, ফুল্লরাদের সঙ্গে উনিভারসিটিতে পড়তো। বিমান কবি। তেরোর মতো না হলেও বিমান প্রায়ই গোঁফ দাড়ি কামাতো না। চুল ছাঁটতো না, পোশাক-আসাক ছিল অগোছালো। কেন, জিজ্ঞেস করলে একটু অবহেলার হাসি হাসত। এসবের কী গুরুত্ব আছে, এরকম একটা ভাব। কেন? গুরুত্ব থাকবে না-ই বা কেন? ভড়ং। বিমানের চুল গোঁফদাড়ি, অগোছালো পোশাক আর কবিতা, সব কিছুকেই ভড়ং বলে মনে হতো। চমক। অতিরিক্ত স্মার্টনেসের সঙ্গে, কবিতায় কিছু ভাল্‌গার কথাবার্তার ব্যবহার। তার সঙ্গে রেভ্যুলিউশন। অন্ততঃ চারজন জনপ্রিয় কবির জগাখিচুড়ি মিশেল। ফুল্লরা অনেকদিন বিমানকে বলেছে, 'এখন যে-রকম ভাবে কথা বলছো, ঠিক এইরকম কথার মতো কবিতা লিখতে পারো না?' কারণ, বিমানের প্রেমের ভাষা ছিল বেশ ঝকঝকে, একটা গভীরতার স্পর্শও থাকতো। নিবেদনের থেকে প্রার্থনার আকুতি, আর হৃদয়ের অনুভূতির সরল প্রকাশ, অকপট ছিল প্রাণের গ্লানির ভাষা। শুনলে, নিরালায় ওর গা ঘেঁষে বসতে ইচ্ছা করতো। আড়ালে, ওর মুখ, বুক থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করতো না। ও তা বুঝতো না। ভড়ং করেই গেল। আর ভড়ং, তা সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক, সব কিছুর কাল। বাড়ি থেকে খেয়ে না-আসা, দোকান

boiRboi.net

থেকে রুটি কিনে খাওয়া—রুটি কেন, অনেক কিছুই চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে খাওয়া, একধরনের স্বভাবজাত। কী প্রমাণ করার চেষ্টা থাকে এ সবের মধ্যে? সচ্ছল পরিবারের ছেলে, অর্থাভাব নেই, সময়াভাব নেই, নিজের পড়াশুনা ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই—কবিতা লেখা আর প্রেম করা বাদ দিলে। কিন্তু তার জন্য বাউণ্ডুলে হবার কোনো দরকার ছিল না। কে বোঝাবে ওকে সে-কথা? ফুল্লরা সেই বোঝাবার পরিশ্রম করতে চায় নি। সে-পরিশ্রমের একটাই অর্থ। একটাই তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে-অর্থ আর উদ্দেশ্য, ফুল্লরার ছিল না। ফুল্লরা বুঝতে পেরেছিল, বিমানকে সাময়িক ভাবে ভালো লাগাটা, বিমানের অদর্শনেও সারাদিন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো না। অনেক মুখ ওকে অন্যমনস্ক করতো। কেউ কেউ, বেশ কিছুদিন ওর মনকে বগলদাবা করে রাখতো। এরকম অবস্থায়, বিমানকে বোঝাবার পরিশ্রম করার কথাই আসে না।

পাঁচিলের ধারের বড় বড় গাছের ছায়া পেরিয়ে, খানিকটা গিয়েই গাড়ি একটু ডাইনে ঘুরলো। রোদ সরে গেল ফুল্লরার মুখের বাঁ দিক থেকে। শহর হাওড়ার সেই গন্ধ, ঠাসাঠাসি ভিড় এখন আর নেই। দৃশ্য গ্রামীণ হয়ে উঠছে, এবং গাড়ির শব্দ গর্জন আর তেমন তীব্র বোধ হচ্ছে না। আকাশ বড় হয়ে যাচ্ছে, মাঠ তাকে ছুঁই ছুঁই করছে, গাছপালার ভিড় বাড়ছে, আর এ সবই যেন গাড়ির গর্জনকে অনেকটা শান্ত প্রশমিত করছে।

মেটামরফোসিস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, গাড়ি মোড় নেবার সময়েই আবার ফুল্লরার ডান দিকের কোলের কাছে পড়লো। ফুল্লরা তেরোর দিকে তাকালো। তেরো তার ডানপাশে তাকিয়ে, কুমারদাদের দিকে। ফুল্লরার সঙ্গে কুমারের দৃষ্টি-বিনিময় হলো। তার হাতে একটা ইংরেজি পত্রিকা, সে ঠোঁট টিপে হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'ফুশু, কিছু খাবে?'

ফুল্লরা অবাক ভ্রূকুটি করে কিছু বলতে গিয়েও, বলতে পারলো না। সেই রক্তের ছটা, আবার লাগলো মুখে, মনে মনে বললো, 'কী অসভ্য!' কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে বললো, 'না।'

তেরো ঝাঁকড়াচুল মাথাটা ওর দিকে ফেরালো। তার চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মুখের মধ্যে কিছু একটা চুষছে মনে হয়। চোয়ালের দাড়ি সেই রকম নড়ছে। ফুল্লরা মুখটা ফিরিয়ে নেবার আগেই, বুবাই বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, খাও না ফুলুমাসী। তুমি একটা পেস্ট্রি খাও, আমিও একটা খাই।'

বুবাইটার সেই ছোট ছোট দাঁতে দুষ্টু আর আবদারের হাসি। মনে হলো, ছেলেটাও বাবার মতো, ফুল্লরার পিছনে লাগছে। অনু ততোক্ষণে, নিচু হয়ে, ছোট একটা ব্যাগ তুলে নিয়েছে। ওই ব্যাগের মধ্যেই কিছু শুকনো খাবার আছে। কিছু প্যাকেটে, কিছু একটা টিফিন বক্স-এ। ফুল্লরা বুবাইকে বললো, 'আমার খেতে ইচ্ছে নেই, তুমি খাও।' বলে ভ্রূকুটি চোখে কুমারের দিকে দেখলো। তেরো তখন আবার মুখ ফিরিয়ে, বোধ হয় বুবাইকে দেখছে বা তার ডান দিকে আর কারোকে, বা জানালা দিয়ে বাইরে।

কুমার বললো, 'খাও না ফুলু। মিষ্টি ইচ্ছে না করে, নোনতা একটা কিছু

খাও। সেই তো কোন্ ভোরে তাড়াহুড়োতে একটু চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছো।'

ফুল্লরার ভুরুতে যতো ধনুকের টংকার, রঙের ছটাও ততো বেশি লাগছে। তেরো আবার ওর দিকে তাকালো। আশ্চর্য, ছেলেটা কি ফুল্লরাদের কথাবার্তা শুনছে, আর তাকিয়ে দেখছে নাকি? হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধ ওর নাকে এলো, অনেকটা টফি বা চকোলেট জাতীয়। ফুল্লরা জানে, কুমারের হাসিটা মোটেই সরল না, এবং খাবার অনুরোধটিও নিতান্ত তা না। মোটা ভুরুর নিচে, কালো ঝকঝকে চোখ দুটোর দৃষ্টি আর টেপা ঠোঁটের হাসি ওর ভালোই চেনা আছে। বললো, 'আপনিই খান, আপনার খিদে পেয়েছে।'

কুমারের মুখ কিছুটা ওর বাঁয়ে, এদিকেই ঝোঁকানো। বললো, 'তুমি খেলে আমিও খেতাম।'

একটি রামচিমটি অথবা পিঠে একটি কিল মারা ছাড়া, এ-মুহূর্তে একথার কোনো জবাব হয় না। কিন্তু আপাততঃ তা সম্ভব না। আর আশ্চর্য, তেরো আবার ডান দিকে ফিরে তাকালো।

অনু বলে উঠলো, 'তা হলে খা ফুলু। একটা চিকেন প্যাটিজ নিবি?'

দিদির হাত থেকে তখন বুবাই রঙীন কাগজে মোড়া পেস্ট্রি নিচ্ছে। বুবাই ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে, ঘাড় দোলালো, চোখের তারা ঘোরালো, বললো, 'খাবে?'

দিদির হাসিতে আপাততঃ কোনো চাতুরি নেই। তা হলে, ফুল্লরার মনে হতো, ওরা সপরিবারে ওর পিছনে লেগেছে। অদ্ভুত ব্যাপার! তেরো ওর দিকে মুখ ফেরালো। ফুল্লরা মুখটা একটু পেছিয়ে নিয়ে, অনুকে বললো, 'আগেই তো কথা হয়েছিল, ফার্স্ট স্টপেজে গিয়ে খাবো। তুমি ভুলে গেলে?'

অনু বললো, 'তা বলেছিলি। ঠিক আছে।' কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি নেবে নাকি কিছু?'

কুমার বললো, 'থাক।' বলে ফুল্লরার দিকে তাকালো। ঠোঁটে সেই হাসি।

ফুল্লরা বাঁয়ে, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। মেটামরফোসিস অ্যান্ড··· ওর ডান দিকে কোলের কাছে পড়ে আছে। ওর খেয়াল ঠিক আছে, কিন্তু বইটা ও আগের মতো হাতে করে তুলে দিল না। কেন দেবে? বইটা বারে বারে পড়বে, বারে বারে ও তুলে দেবে নাকি? ছেলেটার খেয়াল নেই কেন? কিংবা খেয়াল আছে তবু তুলছে না? ফুল্লরা তুলে দেবে বলে? অবিশ্যি এর আগে, ছেলেটা নিজেই হাত বাড়িয়ে, ওর কোল থেকে তুলে নিতে উদ্যত হয়েছিল। ফুল্লরার তখন মেয়েলি অস্বস্তি বা শালীনতায় বেঁধেছিল, স্পর্শ-বিঘ্নতা যাকে বলে। তেরো এখন ওকে স্পর্শ না করেই বইটা তুলে নিতে পারে। কিন্তু ছেলেটা কেমন? বোকা নাকি। ওরকম করে দেখছিল কেন? যেন হঠাৎ ফুল্লরাদের বিষয়ে খুব সচেতন হয়ে উঠেছে!

'আচ্ছা, ফার্স্ট স্টপেজটা কোথায়?'

ইতিমধ্যেই আবার আকাশটা ছোট হয়ে আসছিল, ঘিঞ্জি রাস্তা বাড়ি ঘর আর ভিড়ের আড়ালে। গাড়ির গর্জনও রুদ্ধ শোনাচ্ছিল। ফুল্লরার চুলের ঝাপটা লাগা মুখে ভ্রূকুটি-জিজ্ঞেস জাগলো? সুরটা যেন চেনা চেনা—কোনো

boiRboi.net

শেকসপীয়রের নাটকের চরিত্রের মতো। কে জিজ্ঞেস করলো, এবং কাকে? ও খুব আস্তে আস্তে জানালা থেকে, তেরোর দিকে মুখ ফেরালো। তেরোর চোখের ঠুলিটা খোলা। তার কালো উজ্জ্বল চোখের শান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুল্লরার মুখের দিকে। মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নেই, শান্ত আর নিরাবেগ, যা ওর চোখের সঙ্গে মেলে না। গম্ভীর স্বগতোক্তির মতো জিজ্ঞেস করলো, 'ফার্স্ট স্টপেজটা কোথায় জানেন?'

ফুল্লরা তেরোর চোখের দিকে দেখলো, একটু অবাক হলো, বললো, 'শুনেছি, কোলাঘাট।'

তেরো কোনো জবাব না দিয়ে, বেশ দ্রুত ডান দিকে ঘাড় ফেরালো অনু তখন, হিণ্ডেলিয়ামের ওয়াটার বোটল থেকে, বুবাইয়ের জন্য গেলাসে জল ঢালছে। তেরো কুমারের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন বললো। ফুল্লরা অবাক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কুমার বলে উঠলো, 'আরো নিশ্চয় নিশ্চয়, এতে আর মনে করার কী আছে?' বলেই ডান দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনু, বুবাইয়ের জল খাওয়া হয়ে গেলে ওঁকে এক গেলাস জল দিও তো।'

অনুর হাতের গেলাস থেকে বুবাই তখন চুমুক দিয়ে জল পান করছে। সে তেরোর দিকে তাকালো। তেরোর মুখ থেকে ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরার দৃষ্টি তখন কুমারের দিকে, দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হলো। কুমারের ঠোঁটে সেই হাসি! অনু গেলাসের অবশিষ্ট জল বাইরে ফেলে, নিয়মরক্ষার্থে একটু ধুয়ে, এক গেলাস জল সাবধানে কুমারের দিকে এগিয়ে দিল। কিছু জল গায়ে আসনে পড়লোই, যা অনিবার্য চলমান গাড়িতে। কুমার তেরোর দিকে গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আসুন।'

তেরো গেলাসটা নিয়ে, প্রায় এক চুমুকেই যেন সব জল শুষে নিল। কুমার জিজ্ঞেস করলো, 'আর নেবেন?'

তেরো কুমারের দিকে ফিরে, অস্পস্ট কিছু বললো, আর ঝাঁকড়া চুল মাথাটা ঝাঁকালো। ফুল্লরা তেরোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কুমার শূন্য গেলাস অনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আর এক গেলাস দাও।'

ফুল্লরার কানে এলো, ঠিক ওর পেছনের আসনের পুরুষস্বর, 'সে আর আপনি কি বলবেন। আমি তো গোড়া থেকেই টের পেয়েছি।'

আর একটি স্বর শোনা গেল, 'দেশটা রসাতলে গেল। কিন্তু কিছু বলতে যান, আপনাকেই অপমান করে দেবে।'

আগের স্বর 'অপমান? ধরে পেটাবে মশাই।'

কী বলছে, কাদের কথা বলছে? তেরো দ্বিতীয় গেলাস শূন্য করলে, এবং কুমারকে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে, কিছু বললো। কুমার বললো, 'ওরকম হয়।'

তেরো সোজা হবার আগেই, ফুল্লরা সোজা হয়ে বসলো। তার আগেই, কুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পিছনে শোনা গেল সেই সমবেত হাসি, এবং কথা, 'তোর তাতে কী?'

অন্য স্বর, 'বুকখান জ্বইল্যা যাইতে আছে। আদারির গান শুনবি?'

ভিন্ন স্বর, 'প্যাঁদাবো সুকুমার।'

boiRboi.net

আবার সমবেত হাসি, এবং আর এক স্বর, দে ফ্লাস্কটা, এক চুমুক আমিও দিই।'

ফুল্লরার মনে হলো সবই যেন কেমন রহস্যময় লাগছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠলো, আর একরাশ ধোঁয়া ওর মুখের কাছে, জানালায় ছিটকে এলো। গন্ধ, সস্তা ভাজা তামাকের। ফুল্লরা তৎক্ষণাৎ মুখে আঁচল চাপা দিল। তেরো বলে উঠলো, 'ওহ্, সরি আমি—।' কথা শেষ না করে, ফুল্লরার মুখের সামনে বেগুনি রঙের পাঞ্জাবির হাত নাড়িয়ে ধোঁয়া ওড়ালো। ফুল্লরা বিস্মিত বিরক্তিতে মুখটা পেছিয়ে নিল। মেটামরফোসিস অ্যাণ্ড…পড়ে গেল আসনের নিচে।

★

পিছনের আসনের যাত্রী দুজন কাদের বিষয়ে কথা বলছিল? এই অনুসন্ধিৎসু চিন্তার সঙ্গেই, ফুল্লরা আসনের নিচে বইটার পড়ে যাওয়া দেখলো। লজ্জা পেলো, বিরক্ত হওয়ার জন্য। কারণ তেরো নম্বর আসলে, ভদ্রতাবশতই, শশব্যস্ত হয়ে, হাত নেড়ে ওর মুখের কাছ থেকে ধোঁয়া সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গাড়ির ভিতরে, সামনের দেওয়ালে তো বেশ বড় করেই ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, স্মোকিং স্টি্রক্টলি প্রহিবিটেড। তেরো নম্বর নিশ্চয় ইংরেজি পড়তে পারে? প্রশ্ন বাহুল্য, 'ওহ্ সরি'তেই বোঝা গিয়েছে, আর সঙ্গের মেটামরফোসিস…।' অবিশ্যি, ফুল্লরা ইতিপূর্বেই যেন দু-এক জনকে সিগারেট ধরিয়ে টানতে দেখেছে, নাকি কেবল গন্ধ পেয়েছে? কুমারকে একবারো বাসে ওঠার পর সিগারেট ঠোঁটে নিতে দেখা যায়নি। অথচ তার একটা সিগারেটের পর, আর একটা জ্বলতে বেশি দেরি হয় না, প্রায় চেন স্মোকার। ফুল্লরা কুমারের দিকে তাকালো। কুমার তখন পিছন ফিরে কিছু দেখছে, তার চোখে ভ্রূকুটি অনুসন্ধিৎসা। ফুল্লরাও কুমারের দৃষ্টির লক্ষ্যে পিছন ফিরে দেখতে গেল, আর তখনই ওর নাকে সিগারেটের ধোঁয়া লাগলো। ধোঁয়া তেরোর সিগারেটের ভেবে, আবার সামনে ফেরার আগেই ওর পিছনের আসনের একজনের হাতে, জ্বলন্ত সিগারেট দেখতে পেলো, এবং শুনতে পেলো, 'দেখুন দেখুন ব্যাপার দেখে বুঝতে পারছেন না?'

ফুল্লরা যাত্রীটির মুখ দেখতে পেল না, কেবল তার সাদা পাঞ্জাবির ঢোলা হাতার খানিকটা আর মোটা মোটা আর কালো আঙুলে চেপে ধরা সিগারেটটি ছাড়া। জবাবে, পাশের যাত্রীর স্বর শোনা গেল, 'ও আর দেখবো কি মশাই? সেই কি বলে না, পেটে ভাত নেই কিসেতে সিঁদুর? এ হচ্ছে সেই ব্যাপার।'

পিছনের অন্য যাত্রীটি কাসি জড়ানো স্বরে, বুকে খিল লাগার মতো হেসে উঠলো। ফুল্লরার মনে হলো হাসিটা কেমন যেন ভাল্গার। ও কুমারের দৃষ্টির লক্ষ্যে তাকালো, সেই তিন যাত্রী, যাদের নানারকম কথা আর হাসি, প্রায়ই উলসে বা উছলে উঠছে এবং যাদের 'আনলাকি' কথাটা একান্তই ফুল্লরার উদ্দেশে ইতিমধ্যে কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে। ওসবে ফুল্লরার কিছু যায় আসে না। ওরকম তিরছি নজর, হাসি আর ফুটকাটা জীবনে অনেক শুনেছে। একেবারে গায়ে লাগে না, তা বলা যায় না, কিন্তু লাগাটা জানতে দিলেই সর্বনাশ। আগুনে ঘিয়ের ছিটা। এসবকে ওরা বলে হিড়িক দেওয়া। কিন্তু তিনজনের মধ্যে দু'জন, বেশ

বড় মাপের মিলিটারি ওয়াটার বটল নিয়ে টানাটানি আর হাসাহাসি করছে কেন ? যে দু হাতে বোতলটা ধরে আছে, সে ঠোঁট টিপে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে, যে টানছে সে বিরক্ত, কিন্তু অনুনয় করে বলছে, 'দে-না মাইরি, এরকম করছিস কেন ?'

কুমার আবার সামনের দিকে মুখ ফেরালো, এবং ফেরাতে গিয়েই ফুল্লরার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা কেঁপে কুঁচকে একটি ইশারা করলো সে। তারপরেই হাসি। ফুল্লরা অপ্রস্তুত, আকস্মিক এই ইশারা আর হাসিতে এবং ও আশেপাশের যাত্রীদের বিষয়ে এতো বেশি সচেতন হয়ে ওঠে, ওর ভুরু কুঁচকে উঠলো। বিরক্ত হয়ে মুখ সামনের দিকে ফেরালো। বিরক্তিকর, সত্যি, কারণ কুমারদা কখনো অন্যান্যদের কথা মনে রাখে না। লোকে কতো কী ভাবতে পারে। একবার নামতে পারলে হয়, কয়েক ঘা মারতেই হবে।

ফুল্লরা সামনের দিকে তাকালো, বাঁয়ে মাথা কিছুটা হেলিয়ে। ওর চুল উড়ছে, গালে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃহৎ চোখ ঢাকা কাঁচের জন্য তাকাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে, মাথায় একটা রুমাল বাঁধতে পারলে ভালো হতো। নিদেন, ঘাড়ের কাছে মাঝামাঝি, রবারের বাঁধুনি। ও দু হাতে চুল টেনে পেছন দিকে টেনে দিল, দিয়ে একটা আলতো মোচড়ও দিল, যেন উড়ন্ত গোছা একটু স্থির থাকে। আঁচল সরে গেল বুক থেকে, এখন ওর গায়ে রোদ নেই। রোদ বুবাইদের জানালার দিকে। পিছন থেকে হাত এনে, আঁচল টেনে বুক ঢাকতে গিয়ে, নিজের বক্ষান্তরের দিকে ওর চোখ পড়লো। অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। আঁচলটা টানতে টানতেই ও ঝটিতি চোখের পাতা তুলে তেরোর দিকে একবার দেখলো। তেরোর চোখে এখন আবার সেই মুখোশের মতো কালো ঠুলি আঁটা, ওর চুল দাড়ি অল্প উড়ছে। ফুল্লরার মনে হলো, ছেলেটা যেন পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। আসনের পিছনে, হেলান দিয়ে বসা সত্ত্বেও যেন, ওর জায়গার অভাব, তাই বসে আছে সোজা আড়ষ্টভাবে, দু হাত দুই মোটা শক্ত উরুর ওপর। কিন্তু সিগারেটটা গেল কোথায় ? এর মধ্যেই একটা পুরো সিগারেট শেষ হবার কথা না। ফুল্লরা অবাক হয়ে, তেরোর মুখের দিকে তাকালো। না, ঠোঁটে নেই। ফেলে দিয়েছে নাকি ?

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ হলো। ফুল্লরা দেখলো, কয়েক সারি এগিয়ে, সামনের ডান দিকে, কাঠির জ্বলন্ত শিখায় সিগারেট স্পর্শ করছে। ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল, বাঁ দিকের সামনের দরজার কাছে। সহিস বা ক্লিনার, যাই হোক, অল্পবয়সী ছেলেটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, শরীরের খানিকটা অংশ ছাড়া। ধোঁয়া সেখান থেকেই উড়ছে। ধূমপান নিষেধের বছরটা ভালোই চলছে। কিন্তু তেরোর সিগারেট ? এখন আর লজ্জা না, তেরোকে বিরক্তি দেখাবার জন্য। মন খারাপ হচ্ছে। তেরো নিশ্চয়ই সিগারেটটা ফেলে দিয়েছে, আর তা ওর মুখ সরিয়ে বিরক্ত হওয়ার জন্যই। অবিশ্যি, ঠিকই, ভাজা তামাকের একরাশ ধোঁয়া হঠাৎ নিশ্বাসে ঢুকতেই, ওর খুব খারাপ লেগেছিল এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা ঘটবার, তা-ই ঘটেছিল, ফুল্লরা তো প্রস্তুত ছিল না। কুমারের সিগারেটের ধোঁয়াও যদি এরকম হঠাৎ নিশ্বাসের মধ্যে ঢুকতো, ফুল্লরা ওরকমই করতো। ব্যাপারটা মোটেই

boiRboi.net

ব্যক্তিকে পছন্দ অপছন্দের না।

ফুল্লরা নিজের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেও, ওর মনের রেকর্ড পাক খেতে আরম্ভ করেছে, আর অনিবার্য ভাবেই, বিঁধেছে কাঁটা। ফলে, মন খারাপ, অস্বস্তি তরঙ্গে তরঙ্গে। ওর মনে হচ্ছে, তেরো পাথরের মূর্তির মতো বসে, সামনে পিছনের ধূমপায়ীদের ধূমপান লক্ষ্য করেছে, আর চোখের কোণ দিয়ে ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসছে। অবিশ্যি ছেলেটার ঠুলি আঁটা, গোঁফ-দাড়ি ভরা মুখ দেখে, হাসির কথা ভাবাই যায় না এবং চোখের কোণে তাকানোও। বরং ও যেন রেগে গম্ভীর হয়ে আছে, আর এমন একটা উদাসীনতা ওর ভঙ্গিতে, যেন ও বিশেষ রকমেই স্বতন্ত্র। এ ভাবটা আরো খারাপ, কারণ ধূমপানের মতোই, ফুল্লরার আচরণকেও তুচ্ছ করে দেখছে।

ফুল্লরা তেরোর পায়ের দিকে একবার দেখার চেষ্টা করলো। না, তেরোর সেই ফোম পাকানো মোটা দড়ির মতো জুতো পরা পা দুটো দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবতঃ যার নিচে, সিগারেটটা চাপা পড়েছে। ওর কানের ভেতরে ঝাঁজিয়ে, পর্দা ক্যাটিয়ে দিতে চাইলো বাসের হর্নের হুংকার। যেমন এঞ্জিনের ক্ষ্যাপা গর্জন, তেমনই দৈত্যের হুংকার হর্নে। আর কী লম্বা হুংকার, যেন থামবে না। ফুল্লরা চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। একটা বড় ইংরেজি 'এস' অক্ষরে, দুটো বাঁক। বাসটা এ পাশে ও পাশে প্রায় টাল খেয়ে মোড় নিচ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় পেরিয়ে গেল পলকেই এবং একটা চিৎকারের অংশ বিশেষ, 'সালা মেল···।' তারপরেই একটা ছাগলছানা, যেন গাড়ির তলা থেকে বেরিয়েই ধারের দিকে ছুটে গেল। গাড়িটা ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা রাস্তা ধরলো। একটা লাল ঝলক চোখে মুখে, শরীরে ছুঁয়ে গেল। অতি-লাল রক্তের মতো, শিমুল বা কৃষ্ণচূড়ার থেকে গাঢ়, এতোবড় ফুল ঝাড়ালো মাদারের গাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। মন্দার—সংস্কৃত, মাদার তার আটপৌরে নাম। কিন্তু তা-ই কী? সংস্কৃত মাদারের শরীর কী কাঁটা ভরা?

আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ, ডাইনে। ফুল্লরা পিছনে হেলে ঘাড় ফেরালো। কুমার সিগারেট ধরাচ্ছে। ছি! সমস্ত ব্যাপারটা আরো খারাপ চেহারা নিল। বিদ্ধ কাঁটাটা এখন অস্বস্তির দ্রুত রেলায়। কুমার ওর নিজের লোক। সেও কি না শেষে সিগারেট ধরালো? তেরো নিশ্চয় ওর বিদঘুটে ঠুলির কোণ দিয়ে দেখছে, আর মনটা আরো শক্ত হয়ে উঠছে, আরো স্বতন্ত্রতরো ভাবছে নিজেকে। কুমার ঠোঁট ছুঁচলো করে, ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে ফুল্লরার দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই, সিগারেটের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করলো। অসহ্য! সিগারেটটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। ও সামনের দেওয়ালের দিকে ইচ্ছে করেই তাকালো, নিষেধের বোর্ডটার দিকে, তারপর আবার কুমারের দিকে। কুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো না, কিংবা ইচ্ছা করেই বুঝলো না, সামনের দিকে দেখলো না, সিগারেটটা তর্জনী মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বিশেষ ভঙ্গিতে ধরা, ঠোঁটে হাসি।

ফুল্লরা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখের পাতা কুঁচকে একটুও না হেসে, কুমারের দিকে

boiRboi.net

দেখলো। তারপরে দিদির দিকে তাকিয়ে দেখলো, রঙীন পাত্রিকাটা ও দেখছে, বুবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ভুরু পর্যন্ত কপাল উড়ন্ত চুলে ঢাকা।

তেরো অনায়াসেই সিগারেট টানতে পারতো। আসলে সে হাতটা মুখের কাছে তাড়াতাড়ি তুলে এনেছিল বলেই তো, ফুল্লরা বেশি বিরক্ত হয়ে, মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল। সামনের আসনের জানালার ধারের লোকটি ঘুমোচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাথা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ঢলে পড়ছে।···অথচ তেরো কুমারের কাছেই জল চেয়ে ফুল্লরার দিদির দেওয়া গেলাসে পান করেছে। সিগারেটের ব্যাপারে এতোটা সিরিয়স হয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না···কিন্তু যারা এরকম গাড়িতে যেতে যেতে ঘুমে ঢলে পড়ে, দেখা যায়, তারা সব সময়েই তার পাশের লোকটির গায়েই ঢলে পড়ে। যেন, ঠিক পাশের লোকটার গায়েই ঘুমের শয্যার চুম্বক লেগে থাকে। কেন? এখনো ঠিক সেই রকমই ঘটছে। পাশের ডান দিকের লোকটি মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। আর ঘুমে ঢুলুঢুলু মাথাটা তার ঘাড়ের ওপরেই বারে বারে গিয়ে পড়ছে। বাঁয়ে, জানালার ওপরেও পড়তে পারে। বাতাসে নিশ্চয়ই ধাক্কা দিয়ে ডাইনে সরিয়ে দিচ্ছে না। খবরের কাগজ পড়ুয়া যাত্রীটি কাঁধ উঁচু করে, যথেষ্ট ভদ্রতা বজায় রেখেই ঘুমন্তর মাথা সরিয়ে দিচ্ছে। তার বেশি কিছু না, একরকম যেন অভ্যাসবশতই। যথেষ্ট ধৈর্য আছে বলতে হবে। কিন্তু, মেটামরফোসিস···এর কী হবে? ওটা কি ফুল্লরার পায়ের কাছেই থাকবে নাকি?

ফুল্লরা কোমরের আঁচলটা কিছুকিঞ্চিৎ সাব্যস্ত করার চেষ্টাতেই যেন, নিজের কোলের দিকে তাকালো। ফলে, মেদহীন খোলা পেটের ওপর থেকে শাড়ি সরে গেল। ও তা লক্ষ্য করলো না, আসলে দেখবার চেষ্টা করলো বইটা, পায়ে ঠেকছে কী না? না ঠেকলেও প্রায় পায়ের কাছে। ও পাটা একটু সরিয়ে নিল।

হঠাৎ পুরুষের হোহো হাসির সঙ্গে, স্ত্রী-গলার হাসি, কিছুটা নিচু-ধাপে শোনা গেল। ফুল্লরার প্রথমে মনে হলো, দিদি আর কুমারদা। আসলে তা না, ডান দিকের কয়েক সারি এগিয়ে, একটি আসন থেকে তিনজনেই হাসছে। তাদের বসাটা বেশ কৌতূহলী করে। নিম্ন ত্রিশ, নাতিদীর্ঘ পুষ্ট শরীর, ছোট গলা, আঁট বাঁধাকপির মতো খোঁপা মহিলাটির দু'পাশে দুজন পুরুষ। একজনের ধুতি পাঞ্জাবী, ছোট ছোট ধূসর চুল, আর একজনের হাইনেক কলার শার্ট, কলারের ওপর দিয়ে বেয়ে পড়া লম্বা লম্বা কালো চুল, (অবিশ্যি তেরোর মতো না, তেরোর ঘাড়ের কাছে চুল আরো বেশি ঘন আর কোঁকড়ানো।) চওড়া শক্ত কাঁধ। হাসির ইতিমুহূর্তেই মহিলার স্বর শোনা গেল, 'এই চুপ! কী হচ্ছে!'

তৎক্ষণাৎ পুরুষ দুজনের হাসি থেমে গেল, মন্ত্রের মতো। কারোরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে, লম্বা চুল শার্ট গায়ে পুরুষের মুখ ডাইনে, একটু নিচে ঝোকানো, বেশ একটা নিবিড়তা আছে ভঙ্গিতে। বোঝা গেল, সে বলছে, 'কিন্তু যাই বলো, সতেরো নম্বরের নিচেরটায়—আমি তো—' কথাটা পুরো শোনা গেল না, মহিলার শরীরে যেন একটু বেশি ঝাঁকুনি লাগলো। লম্বা চুল শার্ট গায়ে, দুহাতে মুখ ঢাকলো। হাসছে বোধ হয়। কারণ, ধূসর চুল পাঞ্জাবি গায়ে, বাঁ

boiRboi.net

দিক ফিরে তার দিকে তাকিয়েই হাসছে। মহিলার মাথা অনেকটা পিছনে হেলানো। এমন না কী যে ফুল্লরা কখনো সিগারেট মুখে নেয়নি, তার স্বাদ ওর জানা নেই। অতি বিশ্রী স্বাদ। অতএব, ওর এমন কোনো তোলো মুখ মেমসাহেবি দাবি নেই, সামনে কেউ সিগারেট খেলে, অনুমতি চাওয়ার কেতা দেখাতে হবে। দেখালে ভালো, অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করা যায়। না চাইলেও ক্ষতি কী? কিন্তু—আচ্ছা, তেরো আসলে ঘুমোচ্ছে নাতো?

'আপনি আমাকে আর কী বলবেন, আমি জানি না?' পিছনের যাত্রীর স্বর। 'আমার সব দেখা আছে। কী মেয়ে, আর কী ছেলে। তা এ তো আবার সব আমোদ-সফরে বেরিয়েছে।'

অন্য জনের জবাব, 'তা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু গায়ে যে জ্বালা ধরে যায়। সামনে বসে যা খুশী তা-ই করবে? কিছু বলা যাবে না? আমরাও তো বেড়াতে বেরিয়েছি।'

'আপনি তো মশাই ওল্ড হ্যাগার্ড।' আর এক স্বর, 'আপনি আবার কী বলবেন, আমিই বা কি বলবো? আপনি তো পাড়ায় অনেক কিছু দেখেন, বলতে পারেন?'

অন্য স্বর, 'পাড়া? মশাই পাড়া তো দূরের কথা, ঘরেই কি মুখ খোলা যায়?'

কাসি জড়ানো হাসি, যেন অতি আক্ষেপজনিত এক ধরনের লহরা বিশেষ এবং তার মধ্যে কয়েকটি কথা ফাঁকে ফাঁকে শোনা গেল, 'বা-বাঘের ঘরে ঘো-ঘো-ঘো-গে-র বাসা।'

'ওঁম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!'···একটা গোঙানি, তারপরেই, 'আর একটু মাইরি—স্বপন।' তারপরেই, 'আহ্‌, ভারি খচ্চর আছিস তুই বানচ্যত্‌! গু খা শালা।'···

তারপরেই সমবেত হাসি। কথাগুলো ফুল্লরার কানে যেন বিঁধে গেল, খুব কৌতুহল হলেও ফিরে তাকাতে পারলো না কিছুতেই। তবু একবার চোখের কোণ দিয়ে কুমারের দিকে দেখলো। কুমার পিছন ফিরেই দেখছিল, মুখটা এইমাত্র ফিরিয়ে নিয়ে অনুর দিকে তাকালো। অনুও তাকিয়েছিল কুমারের দিকে। কুমার সম্ভবতঃ নিঃশব্দে কিছু ইশারা বা ইঙ্গিত করলো। অনু ভ্রুকুটি করে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, একটু নাক কুঁচকে, আবার কোলের ওপর রঙীন পত্রিকার দিকে চোখ দিল। বুবাই এখন তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে দেখছে, ওর ঘাড় থেকে বুক অবধি রোদ।

'আদরির কথা কই, শুন মন দিয়া / শুন মন দিয়া ওগো, যতেক আবিয়াতো মাইয়া!'···অনেকটা পাঁচালির সুরে, পিছন থেকে শোনা গেল।

বাধা দিল কেউ, 'ভালো হচ্ছে না সুকুমার, চুপ কর বলছি।'

সম্ভবতঃ সুকুমারই, সম্ভবতঃ, কারণ স্বরটা যেন নানান সুরে খেলছে, 'তোমাদের শালা জানি। এখন শকুন্তলার গান এমনি করেই গাইতাম, নয় তো বিদ্যাসুন্দরের গান, তা হলে খুব ভাল লাগতো। আর আদরির কাহিনী রিয়্যাল সয়েল থেকে এসেছে কি না, খুব খারাপ লাগছে।'

বাধার অন্য স্বর, 'তোমাকে আর সয়েল দেখাতে হবে না।'

boiRboi.net

তথাপি, নিশ্চয়ই সুকুমারের গলা শোনা গেল, 'হায় কি কমু রূপের কথা—হায় আদরির রূপের কথা / দিনে দিনে বাড়ে য্যান্ চান্দের ছটা।'···

'চুপ! সুকুমার।' এই স্বরের সঙ্গে সঙ্গেই, গানের মুখেই যে ঝাপটা পড়ে গেল। তারপরে গোঙানি এবং গোঙানির মধ্যেও, কথার মতো কিছু শোনা পেল, তারপরে সমবেত হাসি।

তেরো পাথরের মূর্তির মতো, অভঙ্গ বিভঙ্গ। ঘুমোচ্ছে? এরকম একটা অখণ্ড স্বতন্ত্রতা—একে কী বলে? রেকর্ড ঘুরতে থাকলে, আর কাঁটা তার বুকে বিঁধে গেলে কী হতে পারে, ফুল্লরা তার প্রমাণ, কিন্তু ফুল্লরা তা জানে না। ও মুহূর্তেই একটা সিদ্ধান্ত নিল, আর ডান দিকে ফিরে বললো, 'আপনার বইটা নিচে আমার পায়ের কাছে পড়ে গেছে।'

তেরো খুব অল্প বাঁ দিকে ঘাড় ফেরালো, যেন সূচিবিদ্ধ হয়েও বসেছিল, এমনই ঝটিতি জাগ্রত ওর ভঙ্গি! ওর স্বর শোনা গেল, অবিকল সেই শেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনেতার মতো, দূরাগত গম্ভীর কিন্তু নিচু, 'জানি। গাড়িটা যখন স্টপে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তুলে নেবো। এখন অসুবিধে হচ্ছে।'

তেরোর কথা শেষ হতেই, বুবাইয়ের চিৎকার শোনা গেল, 'ওই যে—ও—ই যে, রূপনারায়ণ!'···

ফুল্লরা জানালার দিকে তাকিয়ে, রূপনারায়ণের জলে রোদের রেখা দেখতে পেলো।

★

বাতাসের ঝাপটা যেন অতিমাত্রায় উতলা হলো, রূপনারায়ণের বাতাস, সারা গাড়িটার মধ্যে ঢুকে তোলপাড় করে দিল। উড়িয়ে নিল বুকের কাপড়, ফুল্লরার মতো অনেকের। কিন্তু আঁচলটা যে তেরোর মুখের কাছে উড়ে যেতে পারে, ফুল্লরার তা খেয়াল নেই, ও রূপনারায়ণ দেখছে। নদীর ওপারে, একটু দূরে, ওরই দিকে, কোলাঘাটের ইরিগেশনের বাংলোটা দেখাচ্ছে ছবির মতো, ওর ধারণা ওটা কারোর বাড়ি; মনে মনে বললো, 'ইস্! কী সুন্দর বাড়ি। সবুজ মখমলের মতো মাঠটা।'

তেরো যতটা সম্ভব ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, আঁচলটা ওর ঘাড়ে আর দাড়িতে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ফুল্লরার একটা অনুভূতি হলো, ব্রিজের ওপর দিয়ে, গাড়িটা যেন শূন্যে উড়ে চলেছে। হাওড়া থেকে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করছে গাড়ি, ফুল্লরা সেটাও জানে না। ব্রিজ পার হয়ে যেতেই, বাতাসটা ঝপ্ করে পড়ে গেল। বুবাইয়ের চিৎকার শোনা গেল, 'একি বাবা, গাড়িটা দাঁড়াচ্ছে না কেন?'

ফুল্লরা ডান দিকে ফিরে তাকালো। কুমার বললো, 'দাঁড়াবে, স্টপ আসুক।'

বুবাই তা মানতে রাজী না, অভিযোগর সুরে চিৎকার করে বললো, 'বারে, তুমি যে বলেছিলে, কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীর ধারে?'

কুমারের মুখে বিরক্তি আর অস্বস্তি মেশানো হাসি, যা সে বিনিময় করলো অনুর সঙ্গে।

ফুল্লরা স্পষ্ট দেখতে পেলো, দিদির মুখেও বুবাইয়ের জিজ্ঞাসাই, কিন্তু সেটা

boiRboi.net

দিদির মতোই, এবং ফুল্লরারও একই জিজ্ঞাসা। ওরও ধারণা ছিল, কোলাঘাটের স্টপেজ মানে, রূপনারায়ণের ধারে। অথচ বাসটা এখনও গর্জন করে, দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, নদী পড়ে রইলো অনেক পিছনে।

কুমার বললো, 'রূপনারায়ণের ধারে মানে কী? একেবারে নদীর ধারে তো দাঁড়াবে না। যেখানে বাসের স্টপেজ আছে, সেখানেই দাঁড়াবে।'

বুবাই রীতিমতো অভিমান করে, অবিকল ওর মায়ের মতো বললো, 'ধেত্, তুমি বড় বাজে কথা বলো। আমার একটুও ভালো লাগে না।'

ফুল্লরার দিকে কুমার তাকিয়ে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, চোখের পাতা বড়ো করে, বুবাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করলো। ফুল্লরা জোরে হেসে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিল। ওর বাঁ দিকের গাল চুলে অনেকখানি ঢাকা। কুমারের দৃষ্টি তখনো ওর দিকে। কোনো ইঙ্গিত নেই, যেন খুব অবাক হয়ে, ফুল্লরাকে দেখছে। ফুল্লরার ভুরু কুঁচকে উঠলো। কুমারের চোখের দিকে ভালো করে দেখলো, এবং তারপর নিজের বুকের দিকে। ওর মুখে ঝটিতি রঙের ছোপ লেগে গেল, তেরোর কোলের কাছে পড়ে থাকা আঁচলটা তাড়াতাড়ি টেনে বুকের ওপর ঢাকা দিল, দিতে দিতেই এক পলকে তেরোর দিকে দেখে নিল। কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেন যে লোকে এরকম বিশ্রী নিকষ কালো ঠুলি পরে? কী ধরনের লোকেরা এসব পরে? কিন্তু ও কুমারের দিকে তাকালো না, বরং মনে মনে বললো, 'পাজী!' এবং বাইরের দিকে তাকাতেই, বাসটা একটা দমকা দৈত্যের নিশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে থেমে গেল। পিছন থেকে ঘোষণার ভঙ্গিতে শোনা গেল, 'কোলাঘাট। দশ মিনিট থামবে।'

গাড়ির ভিতরে সবাই যেন একসঙ্গে উঠে হুড়মুড় করে দরজার দিকে ছুটলো। যদিও প্রকৃতই তা না। কেউ কেউ হুড়মুড় করে নামলো। একজন চিৎকার করলো, 'এই সুকুমার ওরকম ছুটছিস কেন?'

জবাব শোনা গেল, 'ওরে বাপ্‌রে, আমার ব্লাডার ফেটে যাবার যোগাড় হয়েছে।'

হাসি শোনা গেল, এবং সেই সঙ্গে, 'শালা ম্যাক্সিমাম্ টেনেছে। ব্লাডারের আর দোষ কী?'

ফুল্লরার কানে কথাটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হলো, ম্যাক্সিমাম্ টেনেছে। কথাটা কুমারদাদের ড্রিংক টেবিলের আসরেও শোনা যায়। তার মানে, তা হলে, রাম-এর গন্ধটা ওখান থেকেই আসছিল।

'গরম সিঙাড়া জিলিপি রসগোল্লা সন্দেশ আছে দিদিমণি, দেবো?' ফুল্লরার জানালার ঠিক নিচেই, একটি খালি পা, হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলে, ওর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করছে।

ফুল্লরা কুমারের দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে, হঠাৎই যেন একটা শূন্যতা বোধ করলো। তেরো নম্বর কখন নেমে গিয়েছে, খেয়ালই করে নি। ও জানতো, ওকে একটা বাধা ডিঙিয়ে ডান দিকের আসনের দিকে তাকাতে হবে। ও দেখলো, কুমার তেরো নম্বর আসনের হাতল ধরে, ওর দিকেই ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুবাই আর অনু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কুমারের চোখে সেই পাজীর হাসি,

boiRboi.net

গা জ্বালানো, বললো, 'দেখতে পেলে ?'

ফুল্লরা অবাক, ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে ?'

কুমার বললো, 'তোমার পাশের লোকটিকে ? এইমাত্র তো নেমে গেল।'

ফুল্লরা নিচু ধমকের স্বরে বললো, 'আমি মোটেই পাশের লোককে দেখছিলাম না।'

'তবে বাইরের দিকে তাকিয়ে এতো করে কী দেখছিলে ?' কুমার কপট বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা বললো, 'আমি মোটেই কারোকে দেখছিলাম না। আমি আপনার মতো না, সকলের সব কিছু দেখে বেড়াবো।

কুমারের ভুরু কুঁচকে উঠলো এবার, চোখে জিজ্ঞাসা, আবার পলকেই ঠোঁটে হাসি ফোটে।

ফুল্লরার মুখে রঙ। আসলে ও স্খলিত আঁচলের কথাটাই কুমারকে বলছিল। কুমার বললো, 'আমি বুঝি সব কিছু দেখে বেড়াই ? লোকের দিকে চোখ পড়লে আমি কি করবো ?'

ফুল্লরা মুঠি পাকিয়ে হাত তুললো। কুমার তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলো অনু, নিচে গিয়েই খেয়ে আসি। বুবাই এসো। এসো ফুল্লরা।'

অনু বললো, 'আমি তো নামবার জন্য দাঁড়িয়েই আছি। তুমি দেরি করছো।'

ফুল্লরা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'করবে না ? তা নইলে আমার পেছনে লাগা যাবে কেমন করে ?'

'পেছনে ?' বলেই ঠোঁটে ঠোঁট টিপে মুখ ফিরিয়ে একটু এগিয়ে গেল।

ফুল্লরা লাল মুখে অনুর দিকে তাকালো। অনু হেসে বললো, 'লোকটা ভারি অসভ্য।'

ফুল্লরা বললো. 'খুব মজা ! শাসন তো করতে পারো না। দাঁড়াও, পুরীতে একবার পেঁছুই, তারপরে মজা দেখাবো।'

কুমার পিছন ফিরে ডাকলো, 'কই বুবাই, এসো।' পরমুহূর্তেই তার গলার স্বরে বিস্ময়, 'একি, তুমি কাঁদছো নাকি বুবাই ? কেন ?'

সকলেই বুবাইয়ের দিকে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। দেখা গেল, সত্যি বুবাইয়ের চোখে জল, ঠোঁট ফোলানো। কান্না কান্না স্বরে ও বললো, 'আমি নামবো না। বিচ্ছিরি এ জায়গাটা, এখানে রূপনারায়ণ নদী কোথায় ?'

কুমার তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে এসে, বুবাইয়ের হাত ধরে বললো, 'ওহ্, তোমার সেইজন্য কান্না পাচ্ছে ? কিন্তু কি করবো বাবা বলো, গাড়িটা যে এখানেই এসে দাঁড়ায়। ঠিক আছে, আমি পরে তোমাকে একদিন রূপনারায়ণের ধারে আলাদা করে বেড়াতে নিয়ে আসবো।'

বুবাই বাবার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বোঝা গেল, এই মুহূর্তে সর্বোত্তম আনন্দ থেকে ও বঞ্চিত, রূপনারায়ণকে আর দেখা যাবে না। সকলের অনেক আনন্দ, ওর আনন্দ ছিল একটি পুষে রাখা কল্পনা, রূপনারায়ণের ধারে ও নামবে।

অনুর পিছনে ফুল্লরা যাবার আগে, পিছন ফিরে তাকালো। সেই তিনজনের

boiRboi.net

দলটি নেই। ওর ঠিক পিছনের আসনেই, দুইজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তি বসে আছেন। দুজনের হাতেই, দুটি অর্ধেক খোসা ছাড়ানো কলা, এবং দুজনেই ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুল্লরা মুখ ফিরিয়ে, সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেই আসনের তিনজনও এখন পর্যন্ত নামে নি। মাঝখানে বাঁধাকপির মতো খোঁপা বাঁধা মহিলা, দুপাশে অসমবয়সী দুই পুরুষ। সকলেই কিছু খাচ্ছে, এবং মহিলার গলায় শোনা গেল, 'উঁহু, ব্রিজের ওপারে, আসবার সময় ডানদিকে পড়েছে পানিত্রাস. আর পানিত্রাসের পাশেই হলো সামতাবেড়ে। শরৎচন্দ্রের বাড়িটা আছে এখনো, আর সেই মহিলা।'

ফুল্লরা কথাটা শুনতে শুনতে, দরজার কাছ থেকে, মহিলার দিকে একবার না তাকিয়ে পারলো না। বাহ্, মহিলার মুখটি ভারি সুন্দর তো। একটু গোলমতো, মাংস একটু বেশি, কিন্তু প্রায় একজন সিনেমা অভিনেত্রীর মতো অবিকল। সেই অভিনেত্রীই নয় তো? ফুল্লরা নেমে গেল। সামনে অনু বা কুমার, বুবাই, কারোকেই দেখতে পেলো না। এপাশে ওপাশে তাকালো, আর তখনই বুবাইয়ের ডাক শোনা গেল, 'ফুলিমাসী, এখানে!'

ফুল্লরা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, দোকানের ভিতরে একটা বেঞ্চিতে তিন জনেই বসেছে। দিদি টিফিন কেরিয়ার খুলছে। সামনের নড়বড়ে টেবিলের ওপরে ইতিমধ্যেই কিছু সিঙাড়া আর জিলিপি প্লেটে পরিবেশিত। বুবাই হাসছে, রূপনারায়ণের শোকটা এখন আর নেই, এই দু মিনিটের মধ্যেই। ফুল্লরার সঙ্গে কুমারের দৃষ্টিবিনিময় হলো। কুমার ঠোঁট উলটে, নৈরাশ্যের ভঙ্গি করলো, ডাকলো, 'এসো।'

কুমারকে মাঝখানে রেখে, অনু আর বুবাই দু পাশে! ফুল্লরা ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও, গম্ভীর হয়ে রইলো। কুমারের ইশারাটা বুঝতে ওর অসুবিধা হয় নি। তেরো নম্বরকে কুমার দেখতে পায় নি, ইঙ্গিতটা তারই। তাতে ফুল্লরার কি? ফুল্লরা কি তেরোকে খুঁজছে? তেরোর জন্য মরছে? ও দোকানের মধ্যে ঢুকে, অনুর পাশে বসলো। অনু বললো 'ফুলি, সিঙাড়া আর জিলিপিগুলো বেশ গরম আছে, খেতে আরম্ভ কর।'

বলে, দোকানের একটি ছেলেকে উদ্দেশ করে আবার বললো, 'এই যে, শুনছো ভাই, একটা খালি প্লেট দাও তো।'

ফুল্লরা লক্ষ্য করলো, ছেলেটা দোকানের মালিকের দিকে একবার তাকালো। মালিকও ব্যস্ততার মধ্যে ছেলেটার দিকে একবার তাকালো, এবং বললো, 'দে দে। মায়েদের মিষ্টি-টিষ্টি কি চাই, দ্যাখ। চা ক' কাপ দিতে হবে, জিজ্ঞেস কর।'

ফুল্লরা বুঝতে পারছে, খাবারের দোকানে বসে, টিফিন কেরিয়ারের খাবার বের করে খাওয়াটা, দোকানদারের মোটেই মনঃপূত না। স্বাভাবিক। তা হলে আর খাবারের দোকানটা আছে কী করতে? ব্যাপারটা কুমারও লক্ষ্য করেছে, সে বলে উঠলো, 'দাদা, কিছু রসগোল্লা এদিকে দিন। আর আপনাদের যা চায়ের কাপ দেখছি, এক কাপে কিছু হবে না। আমাদের আট কাপ চা দিন, কিন্তু চা-টা একটু—।'

boiRboi.net

‘ইস্‌পেশাল !’ মূল দোকানী, যে টাকা পয়সা হিসাব করে নিচ্ছে, সে চেঁচিয়ে বললো, ‘আট কাপ ইস্‌পেশাল চা ভেতরে।’

অনু বলে উঠলো, ‘তা বলে আট কাপ ? এতো খাবে কে ?’

কুমার কললো, ‘আমার একলার জন্যই চার কাপ। তোমার দুকাপ ফুল্লরার দু কাপ !’

‘আর আমার ?’ বুবাই বলে উঠলো।

কুমার বললো, ‘তুমি আমার চার কাপের এক কাপ পাবে।’

বুবাই পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে, চোখে ঝিলিক দিয়ে হাসলো।

কুমার তাকালো ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললো, ‘বাপকা বেটা। চা খাওয়া চাই।’

বলে ও মুখ ফিরিয়ে নিল। ফিরিয়ে নেওয়ার ভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলো, ও এখন কুমারের ওপর চটে আছে।

কুমার বলে উঠলো, ‘ফুলু, ওই ছেলে তিনটের কথাবার্তা সব শুনছিলি তো ?’

ফুল্লরা ভ্রূকুটি-অবাক চোখে, কুমারের দিকে তাকালো। কুমার মুখে একটি সিঙাড়া পুরে দিল। অনু বলে উঠলো, ‘যাচ্ছেতাই। ছেলেগুলো এসপ্লানেড থেকেই ড্রিংক করতে করতে আসছে। আর কী সব আজেবাজে কথা বলছিল। আমার মনে হচ্ছিল ফুলুকে নিয়েও ওরা কিছু বলছিল।’

কুমার মুখে চর্বিত সিঙ্গাড়া নিয়ে বলল, ‘মনে হচ্ছিল মানে ? রেগুলার বলছিল। বেচারিদের খুব গায়ে লেগেছে, ফুলুর পাশে ওরা বসতে পায় নি। সেইজন্যই বারে বারে আনলাকি থারটিন বলছিল।’

ফুল্লরাও সেটা বিলক্ষণ অনুমান করেছিল। কিন্তু ঠিক ওরাই যে মদ্যপান—রাম খাচ্ছিল তা যথার্থ ধরতে পারে নি। ও একটা জিলিপি হাতে তুলে নিয়ে বললো, ‘ওরা রাম খাচ্ছিল, না ?’

কুমার বললো, ‘হ্যাঁ। আমার মনে হয়, মিলিটারি ওয়াটার বোটলে পুরো এক বোতল রাম ঢেলে, জল মিশিয়ে নিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, আমিও ওরকম নিয়ে এলে পারতাম।

ফুল্লরার সঙ্গে অনুর দৃষ্টিবিনিময় হলো। অনু বললো, ‘হ্যাঁ, তা না হলে সুবিধে হতো কেমন করে ? তুমি মাতাল হয়ে, যা-তা আরম্ভ করতে, আমাদের দু বোনকে সামলাতে হতো।’

ফুল্লরা বললো, ‘আমার বয়ে গেছে। একগাড়ি প্যাসেঞ্জারের সামনে আমি মোটেই মাতাল সামলাতে যেতাম না।’

কুমার চোখ মুখ পাকিয়ে শক্ত করে বললো, ‘মাতাল মানে ? আমি কখনো মাতাল হই ?’

ফুল্লরা আর অনু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, হেসে উঠলো। অনু হঠাৎ চমকে বলে উঠলো, ‘এ কি করছিস বুবাই, তুই একলা চারটে সিঙাড়া খেয়ে ফেললি ? এই প্যাটিজ কে খাবে ?’

কুমার উঠে এসে, ফুল্লরার পাশে বসলো। ফুল্লরা ভুরু কুঁচকে, সন্দিগ্ধ চোখে

boiRboi.net

তাকালো, নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠলো। আসলে, রাগের থেকে, ওর ভয়ই বেশি। কুমার যে কী বলতে পারে, আর না পারে সবই অনুমানের বাইরে। ও বললো, 'কী হলো, এখানে এসে বসলেন কেন ?'

কুমার বললো, 'দুদিক থেকে তাপ পাওয়া যাবে। একদিকে তুমি, আর একদিকে অনু।'

ফুল্লরা জিলিপি চিবোতে চিবোতে বললো, 'কেন বউ আর ছেলের তাপে চলছিল না ?'

'দাঁড়াও, আর একটু বুড়ো হতে দাও, তারপরে তো ছেলের তাতে তাতবো।' কুমার বললো।

ফুল্লরা বললো, 'যযাতি।'

অনু হেসে উঠে, একটি চিকেন প্যাটিজ কুমারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এখন এটা খেয়ে নিজেকে তাতিয়ে নাও তো।'

ফুল্লরা শব্দ করে হাসলো। কুমার চোখের ভঙ্গি করে বললো, 'খুব যে অ্যাঁ ? আচ্ছা, এর জবাব পরে হবে। এখন বলো তো, তোমার পেছনের সীটের বুড়ো দুটোর কথাবার্তা শুনছিলে ?'

ফুল্লরা উৎসুক আর অনুসন্ধিৎসু হলো, জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু কিছু। কাদের নিয়ে কথা বলছিল লোক দুটো ? মনে হচ্ছিল, খুব রেগে গেছে ?'

কুমার বললো, 'কাদের নিয়ে আবার ? ওই শ্রীমানদের নিয়েই, যারা ওয়াটার বোটল থেকে রাম্ টানছিল। তাও তো তুমি লোক দুটোর চোখ মুখের ভঙ্গি দেখনি। ক্ষমতা থাকলে ওরা বোধহয় ছেলে তিনটিকে বাস থেকে নামিয়ে দিতো।'

অনু একটি প্যাটিজ ফুল্লরাকে দিয়ে বললো, 'সত্যি, ছেলেগুলো ভারি অসভ্যতা করছিল।'

'আমার কিন্তু খুব মজা লাগছিল।' কুমার বললো, 'সুকুমার না কি নাম একজনের, যে আহ্লাদীর গান করতে চাইছিল, ওর বন্ধুরা গাইতে দিচ্ছিল না। আমার কিন্তু খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল।'

ফুল্লরা ঠোঁটের রঙ বাঁচিয়ে, প্যাটিজে কামড় বসাচ্ছিল। কিন্তু না বসিয়ে, হেসে উঠে বললো, 'আহ্লাদী আবার কোথায় শুনলেন। ও তো আদুরির গান করতে যাচ্ছিল।'

অনু বললো, 'আদুরিও না, আদরি। পুরো বাঙাল উচ্চারণ।'

'আর নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভাল্‌গার।' ফুল্লরা বলে উঠলো, 'একগাড়ি প্যাসেঞ্জারের মধ্যে ওসব গাওয়া উচিত না।'

কুমার ফুল্লরার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললো, 'পেছনের বুড়ো দুটো কিন্তু তোমাকে—মানে, তোমাদের দুজনকেও খুব লক্ষ্য করছিল।'

ফুল্লরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে ? আমাকে—আমাদের আবার কী লক্ষ্য করছিল ?'

কুমার কোনো জবাব না দিয়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে, প্যাটিজ চিবোতে লাগলো। ফুল্লরা ঝেঁজে উঠে বললো, 'কুমারদা ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

boiRboi.net

আমি কী করেছি যে আমাকে লক্ষ্য করবে ?'

কুমার ঢোঁক গিলে প্যাটিজ গলাধঃকরণ করে বললো, 'তোমাকে না তোমাদের। লক্ষ্য আর কী করবে ? এই বইটা পড়ে যাওয়া, আঁচলটা ইয়ে হয়ে যাওয়া—।'

অনু বলে উঠলো, 'বেচারি! বুঝলি ফুলু, তোর কুমারদার হিংসে হচ্ছে। ওই চুলদাড়িওয়ালা ছেলেটাকে, তোর কুমারদার জায়গায় বসিয়ে দিস, আর কুমারদা—'

কুমার বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'অনু, তুমি আমার দল থেকে চলে যাচ্ছো ? আচ্ছা, তোমার বোনকেই জিজ্ঞেস করো, এদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল কী না ?'

ফুল্লরা বললো, 'কেন হবে না ? হয়েছিল। ও আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলো, ফার্স্ট স্টপেজটা কোথায় ? আর আমার পায়ের কাছে ওর একটা বই পড়েছিল—এখনো নিশ্চয় পড়ে আছে, কাফ্‌কার মেটামরফসিস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ, আমি বলেছিলাম, আপনার বইটা পড়ে আছে। ও বললো, পরে তুলে নেবো, এখন অসুবিধে হবে।'

এই সময়ে দোকানের ছেলেটা চা দিয়ে গেল। অনু জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, অসুবিধে কেন ?'

ফুল্লরা বললো, 'তাহলে ওকে আমার কোলের ওপর পড়ে বইটা তুলতে হতো, এটাই অসুবিধে।'

বুবাই যে ওদের কথা শুনছিল, কারোর খেয়াল ছিল না। ও বলে উঠলো, 'ফুলুমাসী, তোমার পাশের লোকটা ডাকাত, না ?'

ফুল্লরা হেসে উঠলো। কুমার বললো, 'ওরে সে যে কী ডাকাত! ডাকাতিয়া বাঁশি!'

এবার অনু আর কুমারও জোরে হেসে উঠলো। ফুল্লরা ঘুষি তুললো, আর সেই মুহূর্তেই বাসের হর্নটা যেন ক্ষ্যাপা চিৎকারে ঘন ঘন বেজে উঠলো। তৎক্ষণাৎ একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। কুমার বললো, 'যাহ, দশ মিনিট হয়ে গেল ? নাও নাও, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও।'

একে চা পান করা ঠিক বলা যায় না। কোনোরকমে প্লেটে ঢেলে, অল্পবিস্তর চুমুক দিয়ে সবাই বাসে গিয়ে উঠলো। শুধু ফুল্লরাদের দলটাই না, বেবাক যাত্রীদের একই অবস্থা। ড্রাইভার ইতিমধ্যে এঞ্জিন স্টার্ট করে দিয়েছে। ফুল্লরা দেখলো, তেরো ওর আসনে আগেই বসে গিয়েছে। ফুল্লরা এগিয়ে আসতে তেরো উঠে দাঁড়িয়ে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিল। গাড়িটা সেই মুহূর্তেই ঝাঁকুনি দিয়ে, চলতে আরম্ভ করলো। ফুল্লরা আর একটু হলেই পড়ে যেতো, সামনের আসনের পেছন ধরে সামলিয়ে নিল।

বাতাস এখন গরম হয়ে উঠছে। তবু ভালো লাগে। বাইরে রোদের চেহারা যেন আস্তে আস্তে রেগে ওঠার মতো দেখাচ্ছে, তবু ভালো লাগে। দুপাশে সবুজ মাঠ, গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে দোলাদুলি ঝাঁকাঝাঁকি।

'এখন আর ভুল হচ্ছে না, ফুল্লরা ঘোষ তো ?'

শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনেতার মতো সেই ভারি আর মোটা গলায়,

boiRboi.net

জিজ্ঞাসাটা শুনে ফুল্লরা হতবাক চোখে, তেরোর দিকে তাকালো। তেরোর চোখের ঠুলি খোলা, ও হাসছে। যেন খুবই চেনাশোনা পরিচিত, এমনভাবে হাসছে।

★

তেরোর মুখ গোঁফদাড়িতে ঢাকা থাকলেও, তার হঠাৎ অনায়াস জিজ্ঞাসা এবং ভুরু আর চোখ জোড়া, আর নাক আর ঝকঝকে দাঁতগুলো, কেমন চেনা চেনা ঠেকলো। ফুল্লরার চোখে ভ্রূকুটি-বিস্ময় যদিও, চোখের অনুসন্ধিৎসা বেশ তীব্র। ও চিনতে চাইছে। তবু একটা অবিশ্বাস, একটা সংশয়, ছুঁয়ে থাকছে।

'চিনতে পারা যাচ্ছে না তো? তা হলে আমাকেই বলতে হয়। হঠাৎ চিনে নামটা বলে উঠলে, বিপদে পড়ে যাবো।' তেরো আবার বলে উঠলো মুখে সেই হাসি। আর সেই স্বর, সেই অভিনেতার মতো, কিন্তু আরো নিচু। ফুল্লরার যে-স্বরকে মনে হয় ক্লাসিক চরিত্রের উপযোগী, ওথেলো অথবা ম্যাকবেথ, এ-ধরনের স্বর ছাড়া মানায় না।

কার এই স্বর? কার? ফুল্লরার পরিচিতদের মধ্যে? এই জিজ্ঞাসাটা তীব্র হতেই, ওর মস্তিষ্কের অন্ধকার ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো। ওর চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে গেল, মুখ তুলে, ঠোঁট খোলবার উদ্যোগ করতেই, তেরো নিজের মুখের কাছে হাত তুলে 'প্রায় চুপিচুপি, বলে উঠলো, 'বলো না বলো না, বুঝেছি চিনতে পেরেছো। নামটা মনে মনেই রাখো।'

ফুল্লরা তবু না বলে পারলো না, আর এত অবাক যে গলা প্রায় রুদ্ধ, 'তুমি! আশ্চর্য! তুমি তো—।'

'কিছুই না।' তেরো হাসতে হাসতে উচ্চারণ করলো, এবং নিচু স্বরে বললো, 'আমার কথা কিছু আলোচনা না করাই ভালো। এতক্ষণ নিশ্চয়ই আমার চোখের ঠুলিটাকে খুব অসভ্য লাগছিল। এখন অনুমতি করো তো আবার পরে ফেলি। খোলা চোখে বড় অস্বস্তি বোধ করছি।'

ফুল্লরা বুঝতে পারলো, কমল—এতক্ষণ যে তেরো ছিল, ওর কথায় বাধা দিল। দিয়ে ঠিকই করেছে, কারণ ও যা বলতে যাচ্ছিল, কেউ শুনতে পেলে, কমলের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হতে পারতো। ও বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি তো অনেককাল ধরে অ্যাবস্কণ্ড করে আছো।' ও বললো, 'হ্যাঁ অস্বস্তি হলে নিশ্চয়ই ওটা পরবে। দরকারও বোধ হয়।'

'সত্যি খুব দরকার।' কমল বলতে বলতে চোখের ঠুলি আঁটলো, ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ফুল্লরার বিস্ময় কিছুতেই কাটতে চায় না, বললো, 'সত্যি, আমি যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার পাশে তুমি বসে রয়েছো। তুমিই বসেছিলে এতক্ষণ! আর তুমিই যে তেরো—।'

কমল মোটা গলায় শব্দ করে হেসে উঠলো। এবার আর আস্তে না, সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললো, 'আমিই যে তেরো, এ নামটাও খারাপ না—তেরো। কিন্তু আনলাকি, পিছনের ফিটারসুরা তো তোমাকে অনেকবার শুনিয়েছে।'

boiRboi.net

ফুল্লরা হেসে উঠে বললো, 'সেটা ঠিক খেয়াল রেখেছ তো? কিন্তু ফিটারস্ মানে?' ও ভুরু কোঁচকালো।

কমল হাসলো, ওর কোলের ওপরে রাখা বাঁ হাতের একটা ভঙ্গি করে বললো, 'এমনি বললাম আর কি, ওরা বেশ ফিট করে রেখেছে নিজেদের। ফিট যাকে বলে।' আবার একটু হেসে বললো, 'মেকানিকালি কথাটা ধরো না। আসলে কিন্তু তুমিই তেরো, তাই না?'

ফুল্লরা লজ্জা পেলো, মুখে ছটা লাগলো, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তার মানে আমি আনলাকি।'

'না, লাকি।' কমল বললো, 'জানালার ধারটা তুমি চেয়েছিলে পেয়েছো। এর পরে আর আনলাকি বলা যায় না।'

ফুল্লরা জানে, কুমারদা, দিদি, এমনকি বুবাইটাও এদিকেই অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কেবল তাকিয়েই নেই, নিজেদের সঙ্গে অবাক দৃষ্টি বিনিময়ও করছে। কেবল কি দৃষ্টিবিনিময়? ইংরেজিতে যাকে বলে, ডায়িং, কৌতূহলে আর বিস্ময়ে মরে যাচ্ছে। বিশেষ করে কুমারদা। মনে মনে বোধ হয় রেগেও যাচ্ছে। ফুল্লরা একবার তাকিয়েও দেখছে না, অথচ চোখে কালো ঠুলি পরা, গোঁফ দাড়িওয়ালা সেই রহস্যময় তেরোর সঙ্গে এখন দিব্যি হেসে কথা বলে চলেছে। দুজনের 'তুমি' সম্বোধনও নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে, আর কথাবার্তার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি। অতঃপর নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা যায়, ফুল্লরা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবে, হাসবে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত দেবে।

ফুল্লরা কিছুই করবে না। মনে মনে বললো, কেন, আরো লাগো আমার পছনে! ও কমলকে বললো, 'তা সেদিক থেকে লাকিই বলতে পারো। জানালার ধারটা পাবার জন্য যে কী ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছিলাম! ময়দান থেকে বাসটা ছাড়ার সময়েও তুমি যখন এলে না, আমার কী একসাইটমেণ্ট! মনে মনে ভগবানকে পর্যন্ত ডেকে ফেললাম, তুমি যেন না আসো।'

কমল হা হা করে হেসে উঠলো, বললো, 'ওহ্! হোয়াট এ ইউণ্ডো! এ উইণ্ডো ফর এ কিংডম-এর মতোই! বা এ কুইন কনসরট্।'

ফুল্লরাও প্রায় খিলখিল করে হেসে উঠলো, কিন্তু ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বললো, 'তা যাই বলো, এই লঙ্ জার্নিতে একটা জানালা পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

'আর ভাগ্যিস আমিই উঠেছিলাম!' কমল বললো।

ফুল্লরা উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, 'সেটা তো আরো ভয়। তোমাকে মাঝ পথ থেকে বাস দাঁড় করিয়ে উঠতে দেখে তো ভাবলাম, জানালাটা গেল।'

'কিন্তু আমি তোমাকে জানালাটা ছেড়েই দিতাম।' কমল বললো, 'আর যাই করি না কেন, অচেনা হলেও একটি ইয়ং মেয়েকে আমি জানালা-ছাড়া করতাম না।'

ফুল্লরা হেসে উঠতে গিয়ে থমকে গেল, কারণ হঠাৎ পিছন থেকে ছড়া কাটার সুরে শোনা গেল, 'হায় আদরি—আদরি লো এই কি দেখি চক্ষের মাথা খাইয়া/ মনমোহন চ্যাংড়া মরে তোর দেখা পাইয়া।'...

ছড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসি, এবং একজনের প্রতিবাদ, 'শালা, তোর তাতে কী।

স্টপ অল্ ইওর আদারি ননইসেন্স !'

তৎক্ষণাৎ আবার ছড়ার সুরে, 'অই আদারি হায় আদারি, কাইল আছিলি ক্যাংঠা ল্যাংটা ছেমড়ি—।'

মুহূর্তেই আবার বাধা, 'স্টপ সুকুমার, ঝাড় খাবি বলছি।'

জবাব শোনা গেল 'তবে আর যাই বলিস আনলাকি বলিস না। তোদের রবিঠাকুরের সেই গানটার পঞ্চদশীকে এখন থেকে ত্রয়োদশী বলিস !'

সমবেত হাসি। ফুল্লরা কমলের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল, আর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। যথার্থ রাগ না, অস্বস্তি, বিরক্তি আর এক ধরনের ঠাট্টা উপভোগের মতো, কিন্তু শেষের কথায় ও কমলের দিকে ফিরে বললো, 'কী অসভ্য দেখেছো ?'

কমলের দাড়ি গোঁফের ভাঁজে হাসি ফুটলো, খুব নিচু স্বরে বললো, 'মন্দ কী! পূর্ণিমাতে অবসান, ত্রয়োদশীই তো ভালো।'

ফুল্লরা ভ্রুকুটি করলো। কমল হেসে, মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। এবার ফুল্লরার চোখ পড়লো কুমারের দিকে। কুমারের হাতে রঙীন একটা ম্যাগাজিন, কিন্তু সে এদিকেই তাকিয়ে ছিল।

ফুল্লরার চোখে চোখ পড়তেই, চোখ নামিয়ে নিল ম্যাগাজিনের দিকে। অনু অবিশ্যি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ছিল, এবং বুবাইও। ফুল্লরা হাসলো, অর্থপূর্ণ। বোঝাতে চাইলো, পরে জানাবে।

কিন্তু বুবাই ওকে জিভ ভেংচে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অনু হাসলো ! ফুল্লরা অনুকে চোখের ইশারায় কুমারকে দেখালো ! অনুর হাসি বিস্তৃত হলো, এবং ও বাঁ কনুই দিয়ে কুমারকে আলগা খোঁচা দিল। কুমার ভুরু কুঁচকে অনুর দিকে তাকালো। অনু চোখের ইশারায় ফুল্লরাকে দেখলো। কুমার ফুল্লরার দিকে তাকালো। ফুল্লরা হাসলো ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখের পাতা নাচালো। কুমার ভুরু কুঁচকেই ফুল্লরাকে দেখলো, এবং হঠাৎ যেন কিছু বলবে, এইভাবে মুখ খুলতে গিয়েও একটু ঘাড় ঝাঁকালো, তারপর পিছন ফিরে একবার দেখলো, ইচ্ছা করেই, ফুল্লরাকে দেখিয়ে। ফুল্লরার বুঝতে অসুবিধা হলো না, কুমার ওকে ছড়ার কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে।

কমল সিগারেট ধরালো। ফুল্লরার নাকে ভাজা তামাকের একরাশ ধোঁয়া ঢুকতেই, ও ভ্রূকুটি করে, মুখ সরিয়ে নিল জানালার দিকে, বললো 'ওম্ হ ! স্মোকিং প্রোহিবিটেড না ?'

কমল বললো, 'প্রহিবিটেড ! কিন্তু লঙ্ জারনিতে, একটা জানালার মতোই স্মোকিং ইজ ভেরি মাচ্ নেসেসিটি।'

কমলের কালো গোঁফের নিচে স্বাভাবিক লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফুটলো।

ফুল্লরা নাক কুঁচকে হাসলো। কমল আবার বললো, 'অবিশ্যি আমার ব্র্যাণ্ডটা সস্তার, গন্ধটাও বেশ কড়া'।

boiRboi.net

'কড়া না, কটু।' ফুল্লরা বললো, এবং হাসলো, আবার বললো, 'আচ্ছা জেড্—।'

কমল তৎক্ষণাৎ দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করলো। একটু কাত হয়ে, মুখ নামিয়ে বললো, 'নামটামগুলো মনে মনেই রাখো না। আর যদি ডাকতেই হয়, তেরো ইজ বেস্ট!'

ফুল্লরা থতিয়ে উঠেছিল। কমলের কথা শুনে হাসলো, বললো, 'তেরো বলে ডাকবো?'

'ক্ষতি কী?' কমল বললো, 'আমার নামধাম আসল পরিচয়টা আপাতত ভুলে যাও।'

ফুল্লরা বললো, 'তা কী করে সম্ভব? তোমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, আমি কথা বলছি কী করে?'

'ওই পর্যন্তই, পরিচয় একটা আছে।' কমল বললো, 'কিন্তু আমি কে, সেটা মনে মনেই রাখো। তুমি আমার অবস্থা নিশ্চয়ই কিছুটা অনুমান করতে পারছ?'

ফুল্লরা বললো, 'পারছি তুমি এখন—।'

'হুম্! আমি এখন পুরী যাচ্ছি।' কমল বাধা দিয়ে বলে উঠলো, এবং হাসলো।

ফুল্লরার মনে হলো, কমলের চোখের ঠুলিতে যেন একটা ইশারা খেলে গেল। মনে হওয়া ছাড়া আর কিছু না, দেখতে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। ও স্বর নিচু করে বললো, 'আমি ভাবতেই পারিনি তোমাকে কলকাতায় দেখবো, তাও আবার এই বাসে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি—।'

'কোনো জঙ্গলে।' কমল হেসে বললো।

ফুল্লরা বললো, 'না, হয়তো কোনো জেলে।'

'ও শব্দটা উচ্চারণ করো না।' কমল বললো, 'কথাবার্তায় ওদিকেই যেও না।' কমল গলার স্বর আরো খাদে নামালো, 'অ্যাবস্‌কণ্ড, জেল, এসব শব্দ একদম অ্যাভয়েড করবে। আমি এখন কোথায় চাকরি করছি, বিয়ে করেছি কী না, বউ দেখতে কেমন, ক'টি ছেলেমেয়ে, এসব জিজ্ঞেস করতে পারো না?'

ফুল্লরা কথাগুলো শুনতে শুনতে এতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল. আপনা থেকেই ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, চোখের বিস্ময়ে রীতিমতো বিভ্রান্তি। কমল বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই সামনের দিকে ফিরে তাকালো। সামনের আসনগুলোর কেউ কেউ ওর এবং ফুল্লরার দিকে ফিরে তাকালো। চোখে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা। পিছন থেকে ছড়া শোনা গেল 'অই আদরির ডাগ্‌রি ছেমড়ি কী মন্ত্র তোর চক্ষে…।'

'চুপ! নো আদরির অ্যাফেয়ার।' সঙ্গে সঙ্গে বাধা, এবং প্রকৃতই ছড়ার স্বর চুপ হয়ে যায়।

ফুল্লরা অবাক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো. 'তার মানে? সত্যি নাকি?'

'সত্য মিথ্যে তো পরের কথা।' কমল বললো, 'তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। পুরনো একজন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে, এরকম জিজ্ঞেস করাই তো স্বাভাবিক, তাই না? তোমাকেও আমি জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কিন্তু তোমাকে

boiRboi.net

দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার বিয়ে হয়নি।'

ফুল্লরার চোখে হাসি চিকচিক করে উঠলো, এবং ঠোঁটেও। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি করেছো নাকি।'

'না।'

'কারোর সঙ্গে—।'

'নতুন করে কিছু ঘটেনি।' কমল ফুল্লরার জিজ্ঞাসার মধ্যেই বলে উঠলো।

ফুল্লরা ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে জিজ্ঞেস করলো, 'পুরনো কিছু আছে নাকি?'

কমল সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'হয়তো ছিল, কিংবা ছিল না। ঠিক কিছু জানি না।'

ফুল্লরার স্থির দৃষ্টি কমলের চোখের নিকষ কালো কাঁচের ওপরে। ওর ইচ্ছা হলো, কমলের চোখ দুটো দেখবে। কালো কাঁচের ওপর, কমলের চোখ দুটো ও কল্পনা করার চেষ্টা করলো। মোটা ভুরুর নিচে, কালো টানা উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু হঠাৎ ওর কানে বেজে উঠলো, 'কেমন করে ভালোবাসতে হয়, আমি জানি না। ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।' এবং কমলের কালো কাঁচের বুকে একটি ছবি ভেসে উঠলো; প্রায় একটি কিশোরের মুখ, যার ওপর-ঠোঁটের ওপর সবে মাত্র গোঁফের সবুজ রেখা দেখা দিয়েছে।

ফুল্লরা বললো, 'কিছু জানো না বলছো, মেনে নিচ্ছি। কিছু বুঝতে পেরেছো তো?'

'মানে?'

'মানে, কিছু কিছু বিষয় জানার থেকেই বুঝতে হয় বেশি।'

'তা হলে বুঝেছি।'

'কী?'

কমল তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে, দুই আঙুলে টিপ করে, জানালা দিয়ে সিগারেটের শেষাংশ ছুঁড়ে ফেললো। ফুল্লরার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি কমলের কালো ঠুলির ওপরে। কমল বললো, 'বলতে পারছি না, কী বুঝেছি।'

ফুল্লরা তথাপি তাকিয়ে রইলো। কমল সামনের দিকে তাকালো, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে ফুল্লরার দিকে দেখলো, এবং হেসে বললো, 'আসলে আমি জানিই না।'

ফুল্লরার দৃষ্টি আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো।

☆

ছ মাস মানেই এক বছর, ফুল্লরা মনে মনে হিসাব কষে দেখলো। এম. এ ফাইনাল পরীক্ষা দিতে তিন বছর লেগেছিল। ওর একলার না, ওদের বছরের সকলের। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না হওয়া আর বারে বারে পেছিয়ে যাওয়ার প্রথম দিকের ভিক্‌টিম্‌ ছিল ফুল্লরারা। এদিকে তিন, ওদিকে অনার্সের সঙ্গে ডিগ্রী কোর্সের তিন, ছ বছর। তার সঙ্গে আরো সতেরো মাস। বাঙলা হিসাবে সতেরো মাসকে দেড় বছর বোঝায়, কিংবা বলা যায়, দু বছর চলছে। তার মানে, সাত বছর পাঁচ মাস। ঠিক দিনের দিন হিসাব করে কি কমলের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল?

boiRboi.net

মোটেই না। কমলকে সেইভাবে মনে রাখবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি, কারণও অতএব নেই। অবিশ্যি চোখে না পড়ার মতো ছেলে কমল ছিল না। অনেকগুলো কারণ ছিল তার পিছনে। এখন ওর এই ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফ-দাড়িতে যা ঢাকা পড়ে রয়েছে,-ওর এই চোখ মুখ তখন দেখাতো কাটা কাটা। অনেকেরই যেমন সব মিলিয়ে একটি মুখ, তা সুন্দর বা মন্দ যা-ই হোক, কমলের যেন ঠিক সেই রকম ছিল না। যেমন ওর মোটা ভুরু দুটো। প্রায় আট বছর আগের সেই প্রায় কিশোরের একটি মুখে, অনেকটা বেমানান লেগেছিল। কারণ সেই তুলনায়, চোখ দুটো ছিল কালো আর কিছুটা টানা। নাকটা মেয়েদের মতো টিকলো। কেবল টিকলো বললে ঠিক বলা হয় না। কেমন একটা তীক্ষ্নতা, অথচ খুব উঁচু না। ঠোঁট দুটিও সেইরকম। যেন আঁকা রেখায় লাল। চিবুকের ঠিক মাঝখানে একটি গভীর রেখা, যা এখন পুরোপুরি দাড়িতে ঢাকা। এখন ও মোটা না, কিন্তু দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মেদবর্জিত পেশল শরীরকে সুগঠিত আর স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। তখন ছিল একহারা, রোগা রোগা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। বোঝা যেতো, সে সময়ে, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র যখন, ও দাড়ি কামাতো, কিন্তু গোঁফ কামাতো না। গোঁফের পাতলা সবুজ রেখা দেখলেই বোঝা যেতো। কিছুদিন না কামানোর জন্যই, ওর সারা গালে আর চিবুকেও হালকা সবুজ রঙ দেখা দিত। ফরসা ও বরাবরই, টকটকে না, বাঙালী ফরসা যাকে বলে। এরকম রঙকেই বোধহয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে। অবিশ্যি, ফুল্লরার ধারণা, আজ পর্যন্ত যতগুলো রঙ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ওরিজিন আর মিকস্‌ড্ কালার, সবগুলোই বোধ হয় বাঙালীদের শরীরের রঙ ফোটাবার জন্য দরকার হয়।

কমল তখন কিশোর না, তরুণও না। দুয়ের মাঝামাঝি। অথচ, ওকে যে এক কথায় মিষ্টি ছেলে মনে হতো, তা মোটেই না। ওর পোশাক-আশাক ছিল সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মডার্ন। স্মার্ট অবিশ্যিই। ঠিক অহংকারী নয়, একটু লোক দেখানো কায়দাকানুন ছিল। আলাপ হবার পরে, ফুল্লরা ওর মুখে যখন প্রায়ই 'পার্সোনালিটি'-এর কথা শুনতো, বুঝতে পারতো, কায়দাকানুনের ভাবভঙ্গিগুলো ছিল ওর পার্সোনালিটির অভিব্যক্তি। কমল মুখে তা বলতো না। কিন্তু পার্সোনালিটি একটা মানুষের বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কমল এ কথা বলতো। হাস্যকর। ফুল্লরার মনে হতো। ব্যক্তিত্বের জন্য কোনো ভঙ্গির দরকার হয় না। ওটা ভিতরের ব্যাপার। কমলের মন যে তখনো কাঁচা, বোঝা যেতো।

কমল একটা গাড়িতে কলেজে আসতো। কখনো কখনো নিজেই ড্রাইভ করে আসতো। ও সম্পন্ন পরিবারের ছেলে, ওর বাবা একজন ব্যারিস্টার। ওর ঠাকুর্দাও ছিলেন ব্যারিস্টার। কমল নিজেই বলতো, আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ইংরেজদের খয়ের খাঁ। আর আমার বাবা এখনকার সরকারের খয়ের খাঁ। আমি পছন্দ করি না।' ওর পছন্দ অপছন্দে, পরিবারের কিছু আসতো যেতো বলে আদৌ মনে হতো না। হয়তো বাহাদুরি নেবার জন্যই বলতো। কিন্তু বলতো খুব স্বাভাবিকভাবে। দারুণ ভাবভঙ্গি করে না।

boiRboi.net

কমলের একটা দল ছিল। ছেলে আর মেয়েদের একটা দল। তাদের কারোকে কারোকে ও গাড়িতে করে কলেজে নিয়ে আসতো। খরচ করতো প্রচুর। কেবলমাত্র কফির কাপ সামনে নিয়ে, জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে, টেবল ঘিরে আড্ডা দিত না। রকমারি খাবারের ডিশ্-এর অর্ডার হতো। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গি পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত ওদের আড্ডার জায়গা বিস্তৃত ছিল। আর সবটাই ছিল কমলকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু কমল ছাত্র হিসাবে ছিল ভালো। আর অনার্স ছিল কেমিস্ট্রীতে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে ওর যা রেজাল্ট ছিল, চালাকি করে সে রকম রেজাল্ট করা যায় না।

ফুল্লরার সঙ্গে পরিচয়ের আগে, কমলকে ও যা মনে করতো, তার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ হলো, চালাক, অহংকারী, চালবাজ, বড়লোকি দেখানো। যতো রকমের খারাপ হতে পারে। ফুল্লরার মনে করবার কতকগুলো কারণ ছিলো। উত্তরবঙ্গের যে-শহর থেকে ও কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল, সে-শহরে ওদের পরিবারের পরিচয়টা বিরাট। ওর বাবা ব্যারিস্টার নন বটে, ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার হিসাবে কয়েকটি জেলাব্যাপী নামডাক। বংশপরম্পরা পেশা ও পশার আইন ব্যবসায়। ফুল্লরার বাবার সম্পর্কে লোকে বলে ফাঁসির আসামীর গলার দড়ি খুলে, ফিরিয়ে আনতে পারেন। উত্তরবঙ্গে ওদের সম্পত্তি বা বাড়ির কথা আলাদা। কলকাতায় বিশেষ করে গাড়ির অভাবটা ফুল্লরা খুব বেশি অনুভব করতো। ওদের জেলা শহরে, ওকে কখনো গাড়ি ছাড়া বের হতে হতো না। কলকাতায় বাসে ঝুলে ওকে কলেজে আসতে হতো। বাড়ির গাড়িতে কারোকে কলেজে আসতে দেখলে, প্রথমেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতো ওদের নিজেদের গাড়িগুলো। একটা তো না, তিনটে গাড়ি। অবিশ্যিই একান্নবর্তী পরিবারের। সেটা ফুল্লরাদের পারিবারিক খ্যাতির আর একটা কারণ। একসঙ্গে এতবড় পরিবার, বিশাল বাড়ি, অতিথিশালা, মন্দির, আর পুজাপার্বণ, রীতিমতো জাঁকজমকের ব্যাপার।

ফুল্লরার চোখে, অতএব কমলের আচার আচরণ, ভালো লাগবার কারণ ছিল না। দেমাকী আর চালাক মনে করতো। কিন্তু কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতে হলে ওকে যে কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে, সেটা আগেই জানা ছিল। কলকাতায় ওদের কিছুই নেই। কালীঘাটের কোথায় একটি বাড়ি আছে, ফুল্লরা যা কখনো চোখে দেখেনি। শুনেছে পূর্বপুরুষদের তীর্থবাস বা শ্রাদ্ধাদি কাজের জন্য বা গঙ্গাস্নানের জন্য বাড়িটি কেনা হয়েছিল। এখন দূরসম্পর্কের কোনো আত্মীয় পরিবার বাস করে। বাস করতে দেবার একমাত্র চুক্তি, প্রয়োজনে কেউ কখনো এলে, তাকে থাকবার জন্য ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ফুল্লরা জ্ঞানত কখনো ওদের বাড়ির কারোকে কালীঘাটের সেই বাড়িতে যেতে দেখেনি।

প্রশ্ন উঠেছিল ফুল্লরা কলকাতায় কোথায় থেকে পড়বে। হস্টেলে, সেটাই স্বাভাবিক। বাবা কাকা জ্যাঠা, সবাই আপত্তি করেছিলেন। আত্মীয়-বাড়ি ছিল কিছু। জ্যাঠামশাইয়ের মামার বাড়ির কথাই তার মধ্যে বিশেষ করে উঠেছিল। অনু— ফুল্লরার দিদির বাড়ির কথা ওঠেনি, তা না। কিন্তু জামাইয়ের বাড়িতে থেকে

boiRboi.net

মেয়ে পড়বে সেটা কারোরই মনঃপূত ছিল না।

যে-কোনো আত্মীয় থেকে, ফুল্লরার কাছে কুমার ছিল অনেক বেশি আপন। দিদিকে নিয়ে তো কোনো কথাই নেই। কৃচ্ছ্রসাধনে ওর আপত্তি ছিল না, স্বাধীনতার দাম ছিল তার থেকে অনেক বেশি। কুমারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক প্রীতি আর বন্ধুত্বপূর্ণ, তার সঙ্গে দিদির স্নেহ ভালোবাসা। ফুল্লরা কলকাতায় বাস করবে, অথচ এদের সান্নিধ্য পাবে না, ভাবতেই পারতো না। ওর জয় সেখানে, বাড়িকে রাজী করাতে পেরেছিল। অবিশ্যি তার আগে, দিদি আর কুমারদাকে চিঠি লিখে রাস্তা তৈরি করেই রেখেছিল।

'খুব চিন্তিত হয়ে পড়লে মনে হচ্ছে?' কমল গম্ভীর আর ভাঙা ভাঙা স্বরে বললো।

ফুল্লরা চমকিয়ে উঠে শব্দ করলো 'অ্যাঁ?' তারপরেই লজ্জা পেয়ে হাসলো, বললো 'চিন্তিত না, মনে পড়ছিল কয়েকটা কথা।'

কমল কিছু না জিজ্ঞেস করে, ফুল্লরার দিকে ফিরে রইলো। চোখে ঠুলি ঢাকা থাকলেও, ও যে ফুল্লরাকেই দেখছে, বোঝা যাচ্ছে।

ফুল্লরার মুখে রঙ বদলিয়ে গেল, লজ্জাটা বেশি অনুভব করলো। বললো, 'পুরনো দিনের কথা।'

কমলের গোঁফদাড়ির ভাঁজের উজ্জ্বলতা কিঞ্চিৎ মলিন হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তেই আবার হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ কথা বলো তো? আমার কোনো ছেলেমানুষির কথা?'

ফুল্লরা দেখলো, কমলের মোটা ভুরু ঠুলি ছাপিয়ে কপালের দিকে বেঁকে উঠেছে। হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, 'তোমার না আমার ছেলেমানুষির।'

ফুল্লরার কথা শুনেও কমল তখনই মুখ ফিরিয়ে নিল না। ঠোঁটের হাসির সঙ্গে ভুরু তেমনি চোখের ঠুলি ছাপিয়ে বেঁকেই আছে। ফুল্লরা যেন আবার নতুন করে লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ ফেরাতে গিয়ে, ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে উঠলো। কমল ওর সেই বিশিষ্ট নিচু স্বরে বললো, 'তোমার ছেলেমানুষি? আমি বোধ হয় অনুমান করতে পারছি।'

এবার ভুরু কুঁচকে উঠলো ফুল্লরার। কমলের বেঁকে ওঠা ভুরুর কোণ ঠুলির আড়ালে হারিয়ে গেল। হাসিটা ছড়িয়ে পড়লো ওর ঘন কালো গোঁফদাড়ির ভাঁজে। ফুলরা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, কালো ঠুলির ভিতরে কমলের কৌতুকের ছটায় হাসি-উজ্জ্বল চোখ দুটো। ফুল্লরা লজ্জার সঙ্গে একটু অস্বস্তিও বোধ করলো। কি অনুমান করতে পারছে কমল? ফুল্লরা যে ওকে কলেজে প্রথম দিকে চালাক আর অহংকারী ভাবতো, সেটাই অনুমান করছে নাকি? কিন্তু ফুল্লরা ওর সে-মনোভাবের কথা কোনোদিনই কমলকে বলেনি। সে-মনোভাব ওর ততো দিন ছিল, যতোদিন কমলের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। পরিচয়ের পরে ওর মনোভাব বদলিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী অনুমান করতে পারছো, শুনি?'

কমলের দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল। গোঁফ দাড়ি থাকা সত্ত্বেও ওর পুরানো মুখটা মনে পড়ছে। সেই দুষ্টু মতলবী হাসি। কমল বললো, 'বোধ হয় কবির

boiRboi.net

কথা মনে পড়েছিল।'

'কে কবি ?' ফুল্লরার ভ্রূকুটি চোখের অন্যমনস্কতায় দ্রুত স্মৃতি হাতড়ানোর আলো-ছায়ার ধন্দ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওর দু চোখ ঝলকিয়ে উঠলো এবং অবাক লজ্জায় হেসে উঠে বললো, 'যাহ্ ! কী বলছো ?'

কমল শব্দ করে হা-হা স্বরে হেসে উঠলো, আবার তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলিয়ে নিল। কিন্তু সামনের আসনগুলো থেকে কেউ কেউ ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো। সেই আসনের তিন জনেই, দু দিকে দুই অল্পবয়সী পুরুষ, মাঝখানে বিরাট খোঁপার মহিলা। পিছন থেকে তখনই শোনা গেল, ছড়া কাটার সুরে, 'দিনে দিনে বাড়ে আদরি বাপ মায়ের আদরে/চান্দের জোছনা য্যান্ উছ্‌লায় গাঙেরে/ভরা গাঙের ঢেউ যেমন অথৈ অধরা/আ'লো ওই আদরি তুই পীন পয়োধরা।'···

'নো, নো মোর আদরি ফোকস্।' অন্য স্বর বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'স্টপ সুকুমার।'

সম্ভবত সুকুমারের গলাই শোনা যায়, 'হোয়াই স্টপ্। আমি কি খারাপ কিছু বলেছি। দিস্ ইজ্ সিমপ্লি ফোক লোর অব্—।'

'নো দিস ফোক লোর।' অন্য স্বর বলে উঠলো।

সম্ভবত সুকুমারের গলাই শোনা গেল, 'তা হলে ওয়াটার বোটলটা আমাকে একবার দাও। কোলাঘাট থেকে নতুন জল ভরা হয়েছে, খড়্গপুর পার হতে চলেছে, আমাকে আর একবারও দেওয়া হয়নি।'

অন্য স্বর, 'দেওয়া হবে। তুমি অনেক জল টেনেছ, বেশি খেলে উঠে যাবে।'

আর এক অন্য স্বরে হাসির সঙ্গে, 'হ্যাঁ, বাচ্চাদের দেখিস না, দুধ হজম না হলে মুখ দিয়ে দই ওঠে ?'

'আমার ইয়ে ওঠে বাইনচোত্। শালা তো—।'

তো পর্যন্তই সুকুমারের মুখেই সম্ভবত শক্ত হাত চাপা পড়লো। ওদিকে চাপা পড়তেই, ফুল্লরা ঠিক ওর পিছনেই নিচু স্বর শুনতে পেলো 'কী অডাসিটি দেখেছেন ? খোঁজ নিয়ে দেখুন, এরাই হয়তো পাঁচ দশটা পাশ করা শিক্ষিত যুবক।'

অন্য নিচু স্বর, 'এদের পাশ করাকে আপনি শিক্ষা বলেন ? এরা শিক্ষিত ? করলেও সব টুকে মেরেছে। আমি এদের শিক্ষিত বলি না, এরা হচ্ছে কলির পাঁঠা।'

'কিন্তু কলিকালে তো মশাই বলি উঠে যায়নি।' প্রথম নিচু স্বর, 'এদের আপনি বলি দিতে পারবেন না, তা হলে মানুষ খুনের দায়ে পড়বেন।'

অন্য নিচু স্বর, 'এসব সহ্য করার থেকে খুনের দায়ে পড়ে ফাঁসি যাওয়াও ভালো, তবু এসব আর সহ্য করা যায় না।'

প্রথম নিচু স্বর, 'না মশাই, আমি আবার এতোটা বলতে চাই না। এদের এই সব বাঁদরামির থেকে, এদেশে আরো অনেক অসহ্য ব্যাপার ঘটছে। বলি দিয়ে ফাঁসিই যদি যেতে হয়, তা হলে আগে আরো অনেককে বলি দিতে হয়। আরে মশাই, আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন নাকি ? কী মুশকিল শুনুন—।'

☆

আর কিছুই শোনা গেল না। ফুল্লরার ভীষণ কৌতুহল হলো, পিছন ফিরে

boiRboi.net

তাকিয়ে, এই মুহূর্তে এবার দুই ভদ্রলোককে দেখে নেয়। কিন্তু লজ্জা করলো। তা ছাড়া পিছনে 'আদার ফোকলোর'-এর গ্রুপটাও আছে। ওদের কথায় স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে, ওয়াটার বোটলে কোলাঘাট থেকে নতুন করে মদ ঢালা হয়েছে। ফুল্লরা একবার, কুমারের দিকে তাকালো। কুমার মুখ নিচু করে বই পড়ছে। ফুল্লরার সম্পর্কে সে রীতিমতো উদাসীন। এই হচ্ছে ছেলেদের চরিত্র। ওদের যেন বয়স হয় না। যে-মুহূর্তে দেখলো, বিষয়টি নিজের অগম্য, অস্পষ্ট, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি ছেলে, অমনি চেহারা বদলিয়ে যাবে। অথচ বলবার সময়ে বলবে, মেয়েরা ঈর্ষাকাতর। কুমারদার উদাসীনতা, আর গভীর মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিন পড়া দেখে, ফুল্লরা মনে মনে আর এক চোট হেসে নিল। ও দেখলো একবার দিদির দিকে। অনুও ওর দিকেই একবার তাকালো, তারপরে কমলের দিকে। বুবাই এখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কুমারদার ভাবনা থেকেই, ফুল্লরার মনে হলো, একই মনোভাব থেকে কমল কবির কথা হয়তো বলছে।

'আমার হাসিটা বরাবরই বিচ্ছিরি।' কমল বললো, 'কিছু মনে করো না।'

ফুল্লরা বললো, 'তোমার হাসিটা আমার কখনো বিচ্ছিরি মনে হয়নি। লোকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে আর কী করার আছে? কিন্তু আমার ছেলেমানুষি ভাবনা যে কবিকে মনে করে, তা অনুমান করলে কেমন করে?'

কমল ফুল্লরার দিকে তাকালো। কমলের মুখের হাসিটা এখন কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। ওর ঠুলির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। বললো, 'তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হতো, ব্যাপারটা তোমার কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল।'

ফুল্লরা ঠোঁট টিপে হাসলো, বললো, 'তখন যা মনে করেছিলে, তা হয়তো না-ও হতে পারে।'

কমল তাড়াতাড়ি বললো, 'ওহ্, নিশ্চয়! না-ও হতে পারে। তা হলেও আমার অনুমানই যে সত্যি নয়, তা বলতে পারো না। হয়তো তুমি বিমানের কথাই ভাবছিলে।'

ফুল্লরার মনে মনে খুব হাসি পেলো। কিন্তু ও হাসলো না। কিছুক্ষণ আগে বিমানের কথা ওর মনে পড়েছিল, বাসে উঠে, প্রথম দিকে। তখন সত্যি সত্যি পুরনো দিনের কথা মনে পড়েছিল, কলেজ আর ইউনিভারসিটির দিনগুলোর কথা!

ফুল্লরাকে চুপ করে থাকতে দেখে কমল ওর দিকে তাকিয়েছিল। ফুল্লরা একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ও কমলের দিকে ফিরে তাকালো। কমলও তখনই মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। কিন্তু ফুল্লরার মনে হলো, ঠুলির আড়ালে কমল চোখের কোণ দিয়ে যেন ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। যদিও কমলকে এরকম ভাবতে অসুবিধা হয়। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখবার ছেলে ও কখনোই ছিল না। তবু কেন হলো? কমল মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য? কমল কী একটু গম্ভীর হয়ে গেল?

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মন খারাপ করলে নাকি?'

boiRboi.net

কমল ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। আবার ওর বাঁকা ভুরু খোঁচার মতো জেগে উঠলো ঠুলির বাইরে। অবাক স্বরে বললো, 'মন খারাপ?' তারপরেই একটু যেন বিষণ্ণ হেসে বললো, 'তা বলতে পারো। আমার চোখের সামনে সেই দিনগুলো ভেসে উঠছে, যে দিনগুলো আর কখনই ফিরে আসবে না। তাই না? আমরা যাই করি না কেন, যে-পথেই চলি, পুরনো দিনগুলোকে ভোলা যায় না বিশেষ করে সেই সব দিনগুলো, দায়দায়িত্বহীন, খেলে, গল্প করে, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো। অনেকটা আলবেয়ার কামুর সেই কথার মতো, স্রোতস্বিনী জলের ধারায় স্নান এবং স্বেদসিক্ত রমণীর সান্নিধ্য।' কমল একটু হাসলো, বললো, 'সে হিসাবে বলতে পারো, মনটা কেমন কেমন করছে।'

কমল এমনভাবে বললো, ফুল্লরার হাসি পেয়ে গেল। বললো, 'বেশ বললে, মনটা কেমন কেমন করছে। কিন্তু সত্যি বলছি, বিমানের কথা আমার মনে পড়ছিল না। আগে অনেক ছেলেমানুষিই তো করেছি। সে সব কথাও মনে পড়ছিল।'

কমলের ভুরু তেমনি ঠুলির ওপরে জেগে আছে। ওর চোখে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। বললো, 'তবু, বিমানের কথা ভোলবার না।'

'ভুলিনি তো।' ফুল্লরা বললো, 'ভুলবো কেন? কবির সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। কিন্তু ও যে আদৌ কবি ছিল না, সেটাই আমার দুঃখ। কারণ ও আসলে—আসলে—।' কথা শেষ না করে ফুল্লরা হেসে উঠলো।

কমল তেমনি ঠুলির বাইরে ভুরু জাগিয়ে তাকিয়ে রইলো।

'ওসব তো কামুর বয়স হয়ে যাওয়ার দুঃখের কথা।' ফুল্লরা হেসে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই সেই সাইলেণ্ট মানুষ নয়?'

ঠুলির আড়ালে, কমলের চোখ দেখা যায় না। কিন্তু ঘন কালো গোঁফ দাড়ির মধ্যে ওর হাসিটা যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বললো, 'দ্য সাইলেণ্ট ম্যান! না, সে হিসাবে বয়স বেড়ে যাবার দুঃখে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু পুরনো দিনগুলো কি ভোলা যায়? আমি তো পারি না। সে সব দিন যে আর ফিরে আসবে না, কোনো সন্দেহ নেই, তাই না? মনটা একটু খারাপ হয় বই কি। তোমার হয় না? কিন্তু ভালোও লাগে।'

ফুল্লরার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো, এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক দেখালো ওকে। একটু বা অবাকও। কমলের কাছ থেকে যেন এরকম কথা আশা করেনি। পুরনো দিনের জন্য মন খারাপ, আর যারই হোক, কমলের কেন হবে? কমলের বর্তমান ব্যাকগ্রাউণ্ড তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওর সব কিছুই হলো পজেটিভ্। অন্তত হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে, ফুল্লরার সংকোচ হলো। ওর ভাবনাটা যথার্থ নাও হতে পারে। তা ছাড়া, এখনকার এই কমল ওর কাছে কিছুটা রহস্যময়, অচেনা, আবছা, এবং একটা অস্পষ্ট ভয়ও আছে। ও হেসে বললো, 'আমার এমনিতে খারাপ লাগে না—পুরনো দিনের কথা মনে হলে, তবে ভালো লাগে, তুমি যা বললে। কিন্তু তুমি কি কামুর লেখা এখনো পড়ো নাকি?' ফুল্লরার চোখে কৌতুকের ছটা।

কমল মাথা নাড়িয়ে, সামনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, যা পড়বার তা আগেই পড়েছি।'

'কিন্তু স্রোতস্বিনী জলের ধারায় স্নান আর স্বেদসিক্ত রমণীদের কথা বোধহয় লেখা ছিল না।' ফুল্লরা হাসতে গিয়ে, ঠোঁটের ওপর আলতো করে বাঁ হাত তুলে চাপা দিল, এবং ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের তারায় ঝিলিক হেনে আবার বললো, 'স্নান আর স্বেদসিক্ত রমণীর সান্নিধ্য! দারুণ! কামুর নামে, কথাগুলো তোমার নিজের মনে হচ্ছে।

কমল চুল দাড়িতে ঝাপটা দিয়ে, বাঁ দিকে ফিরে তাকালো। ঠুলির বাইরে ওর মোটা ভুরু আবার খোঁচা হয়ে উঠলো। ওর সেই বিশিষ্ট স্বরে অবাক হয়ে বললো, 'তাই নাকি? আশ্চর্যই তো! তা হলে কথাগুলো আমার মনে কোথা থেকে এলো?'

'বোধ হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে?' ফুল্লরার চোখে মুখে রুদ্ধ হাসির দ্যুতি।

কমলের কালো গোঁফ দাড়িও যেন লাল হয়ে উঠলো, বললো, 'অ্যাবসার্ড।' বলেই অন্যমনস্ক আর চিন্তিত হয়ে উঠলো। মুখ তুলে সামনের দিকে তাকালো, আবার বাঁ দিকে ফিরে বললো, 'বোধহয় অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি, কারোর কবিতা-টবিতার সঙ্গে।'

ফুল্লরার মনে পড়লো পুরনো দিনেরই কথা, কমলের সেই কয়েক বছর আগের মুখ। কোনো কারণে বিব্রত বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেই, ওর মুখ লাল হয়ে উঠতো। আর তা কাটাবার জন্য ওর লজ্জিত চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে যেত। এখন যেমন পড়ে যাচ্ছে। কমলের অনেক দিনের অদর্শন, আবছা অচেনা ছায়াটা যেন, অনেকখানি কেটে গেল। সেই চেনা কমলকে দেখা যাচ্ছে। যে-কারণে ফুল্লরার ইচ্ছা হলো, কমলকে আরো একটু চেপে ধরতে। ও বললো, 'গুলিয়ে যাবার কী আছে। অ্যাবসার্ডই বা কেন বলছো? নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই স্রোতের জলে স্নান আর স্বেদসিক্ত রমণীদের কথা মনে এলে, ক্ষতি কী?'

কমল কয়েক মুহূর্ত ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে রইলো। আস্তে আস্তে ওর চোখের ঠুলির কাচে যেন কৌতুকের ঝিলিক লাগলো, আর মুখে ছড়িয়ে পড়লো হাসি। বললো, 'না, কোনো ক্ষতি নেই।'

বলে সামনের দিকে তাকালো। ফুল্লরার চোখের অনুসন্ধিৎসা তীব্র হলো। কমলের এই ছোট জবাবে, কিছুই বোঝা গেল না। ও কী বলতে চাইলো? ফুল্লরা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, কমল আস্তে আস্তে আবার ওর দিকে ফিরে তাকালো। মুখের হাসিটা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, বললো, 'অভিজ্ঞতা একেবারে নেই, তা বলা যায় না। বারাসতের সেই পুকুরের জলে স্নান করতে গিয়ে অরুণা একবার ডুবতে বসেছিল। পুকুরের জল স্রোতস্বিনী নয় বটে, তবে সকালের রোদে বেশ চিকচিক করছিল। আর তুমি তখন সাঁতার কেটে অনেক দূরের জলে চলে গেছলে।'

কমলের কথা শেষ হবার আগেই, ফুল্লরার ভ্রূকুটি চোখে হাসি চলকিয়ে উঠলো, এবং শেষ পর্যন্ত খিলখিল করে হেসে উঠলো। বলে উঠলো, 'ওহ্ কম—।'

boiRboi.net

'হরিপদ।' কমল বেশ শব্দ করে বলে উঠলো। যেন ফুল্লরার স্বর ডুবে যায়।

ফুল্লরা তৎক্ষণাৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে, উদ্বিগ্ন চোখে সামনে ডাইনে তাকালো, বললো, 'সরি, একটুও মনে ছিল না হরি—ইয়ে তেরো তেরো।'.

বলেই আবার ওর হাসি পেয়ে গেল, আবার মুখে হাত চাপা দিল। আর নিজের অপ্রতিরোধ্য উদ্দাম হাসি গোপন করার জন্য বাঁ দিকে জানালার ওপর ঝুঁকে পড়লো। ইতিমধ্যেই যাত্রীরা কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কমলের মুখে হাসি। সে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুল্লরার চোখে মুখে বাতাসের ঝাপটায় চুল ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভাবলো এই হচ্ছে আসল কমল। শান্ত মুখে মিটিমিটি হেসে একটা সীরিয়স ব্যাপারকে এক মুহূর্তে হাস্যকর করে তোলা।

★

ফুল্লরার চোখের সামনে সাঁতারের সেই ছবি ভেসে উঠলো। কমলের উৎসাহেই প্ল্যান করে বারাসতে সাঁতার কাটতে যাওয়া হয়েছিল। বারাসতে হিমাদ্রিদের একটা বাগানবাড়ি ছিল। অনেক ফলের গাছ আর কিছু চাষআবাদ। একটা ছোট পুকুর আর একটা বড়। বড় পুকুরটাকে একটা দীঘিই বলা যায়।

হিমাদ্রি কমলের কনটেমপোরারি, ফুল্লরার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। কমল তার আগে, হিমাদ্রিদের বারাসতের বাগানে কয়েকবার গিয়েছিল। একবার দল বেঁধে! ভোরবেলা কলকাতা থেকে বারাসতে গিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটার প্ল্যানটা কমলেরই ছিল। কমল সাঁতার শিখেছিল সুইমিং ক্লাবে। ছেলেবেলায় এক সময়ে নাকি ওর সাঁতারু হবার ঝোঁক হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে, ফুল্লরা অনেকবারই ঠোঁট উল্টিয়ে বলেছে, 'লেকের জলে আর হেদোর পুকুরে সাঁতার শেখা আবার সাঁতার শেখা নাকি? সাঁতার কেটে গঙ্গা পেরোতে পারো?'

কমল বলতো, 'অনায়াসে, তবে একটু সাহায্য দরকার হতে পারে—মানে সঙ্গে একজন থাকলে সুবিধে হয়।' ফুল্লরা হাসতো। অবিশ্যি এক কথায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে, কলকাতার গঙ্গা ওর পক্ষে পার হওয়াও হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওর সাঁতার শেখা নদীতেই। স্রোতস্বিনী নদী যাকে বলে, উত্তরবঙ্গের প্রবল ধারায় যে নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে সমুদ্রের মতো বিশাল সায়রেও সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা ওর ছিল। অতএব ওর কাছে কলকাতার লেক পুকুর আর সুইমিং পুল, সবই একটা অকিঞ্চিৎকর মনে হতো। ওখানে সাঁতার কেটে যে সাঁতার শেখা যায়, আদৌ ওর বিশ্বাস হতো না। সাঁতার শেখার একটা বিলাস মনে হতো।

হিমাদ্রিদের বারাসতের বাগানে যাবার উৎসাহটা কমলের সেইজন্যই বিশেষ ভাবে ছিল। 'তোমার সাঁতার একদিন দেখতে হবে।' কমল প্রায়ই বলতো।

'কিন্তু তোমাদের ওইসব সুইমিং পুলে আমি সাঁতার কাটবো না,' ফুল্লরা বলতো।

'কেটো না, তোমাকে নিয়ে যাবো মস্তবড় একটা নির্জন পুকুরে, পাড়াগাঁয়ে।' কমলের এই কথার জবাবে ফুল্লরা বলেছিল, 'তাহলে রাজী।' হিমাদ্রিও তৈরি ছিল। অরুণা—অরুণা ঘোষ তখন কমলকে ভীষণ ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। আর

boiRboi.net

অরুণাকে হিমাদ্রি। অরুণার ছিল ইতিহাসে অনার্স। অরুণার প্রসঙ্গ হিমাদ্রিই তুলেছিল। অরুণা প্রায়ই সাঁতারের কথা বলতো। সময়টা তখন বসন্তের শুরু, সকালের দিকে একটু শীত শীত ভাব। অরুণা সুইমিং কস্ট্যুম নিয়ে গিয়েছিল। ফুল্লরার ছিল না। ও কোমরে শাড়ি জড়িয়েই জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। ওরকম ভাবে সাঁতার কাটাতেই ও অভ্যস্ত ছিল। মাথার চুলে অবিশ্যি শক্ত করে পাতলা গামছা বেঁধে নিতে হয়েছিল। ওর মাথার চুল তখন বেশ বড় ছিল। নিরিবিলি বাগানে, রোদ্দ ঝলকানো দীঘির মতো পুকুরটা দেখে, ফুল্লরা খুশি হয়েছিল। কিন্তু অরুণা সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছিল।

কমল ফুল্লরাকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু হিমাদ্রি কমলের থেকে ভালো সাঁতার জানতো। ও ফুল্লরাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। ফুল্লরা হিমাদ্রির কাছে হেরে গিয়েছিল। ফুল্লরা যেটা ওর নিজের সম্পর্কে খেয়াল করেনি, তা ওর শরীরের ওজন, ওজন আর অনভ্যাসে ফুরিয়ে যাওয়া দম। দেশ থেকে কলকাতায় এসে, প্রথমদিকে কিছুটা রোগা হলেও, পরে ওজন কিছু বাড়তে আরম্ভ করেছিল। সেটাকে মোটা বলা চলে না। সম্ভবত তারুণ্যের ধারের সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ ভারও বাড়ে। সাঁতার কাটা অভ্যাস ছিল না অনেক দিন। আর সাঁতার কাটা এমন একটা খেলা, চর্চা না থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়।

পিছন থেকে একটা আর্তনাদের পরেই, কমলের চিৎকার প্রথম শোনা গিয়েছিল. 'অরুণা! অরুণা ডুবে যাচ্ছে।' ফুল্লরা আর হিমাদ্রি দু'জনেই ঘাটের দিকে ফিরেছিল। অরুণা ঘাট থেকে বেশিদূরে আসেনি, সম্ভবত ওর পায়ের তলার সিঁড়ি হারিয়ে গিয়েছিল। সাঁতার জানলে সেখানে ডুবে যাবার কোনো কারণ ছিল না। ফুল্লরা আর হিমাদ্রি তৎক্ষণাৎ ঘাটের দিকে সাঁতার দিয়েছিল। কিন্তু দু'জনেই তখন কিছুটা ক্লান্ত। সেই তুলনায় কমল বেশিদূরে আসেনি, সেও ঘাটের দিকেই ফিরতে আরম্ভ করেছিল। অরুণা তখন রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছিল। ফুল্লরার মনে আছে, বিদ্যুচ্চকিতে ওর মস্তিষ্কে একটা আতঙ্কিত চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, কমল যদি অরুণার কাছে যায়। আর অরুণা কোনো রকমে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে, তা হলে একটা বিশ্রী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তারাশঙ্করের তারিণী মাঝি গল্পটা তখন ওর মনে পড়েছিল। একমাত্র রক্ষে, কমলের সাঁতারে তেমন গতি ছিল না, ও পা দাপাচ্ছিল অনেক বেশি। সেই তুলনায় হিমাদ্রি ছিল অনেক বেশি দ্রুতগামী। কিন্তু সেই বিপদের মুহূর্তে ফুল্লরা কোথা থেকে শক্তি পেয়েছিল, কে জানে? ও হিমাদ্রিকে অতিক্রম করে, তীরের বেগে অরুণার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। অরুণার টুপি জড়ানো মাথাটা তখন একটু একটু দেখা যাচ্ছিল, আর ক্লান্ত ছুঁড়ে দেওয়া হাত। কমল অরুণাকে ধরবার আগেই, ফুল্লরা রুদ্ধস্বরে বলে উঠেছিল, 'ছেড়ে দাও, তুমি সিঁড়িতে ওঠো!' বলেই অরুণার একটি হাত পিছন থেকে টেনে ধরে আপ্রাণ শক্তিতে ঘাটের দিকে টেনে নিয়েছিল। ফুল্লরা জানতো, সামনে থেকে ধরলে, অরুণা ওকে জড়িয়ে ধরবে। ইতিমধ্যে হিমাদ্রি এসে পড়েছিল। ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি ওকে ঠিক ধরেছি, তুমি আমার হাত ধরে, ঘাটের সিঁড়িতে টেনে নাও।'

boiRboi.net

ব্যাপারটা একদিক থেকে ঘটেছিল হরিষে বিষাদ। অরুণাকে জল থেকে তুলে আনার পরে, হিমাদ্রি ডাক্তার ডেকে এনেছিল। পেটে কিছু জল যাওয়া ছাড়া লাংসে কিছু হয়নি। অচৈতন্য হয়েছিল খুব সামান্য সময়ের জন্য। অরুণা যে একেবারেই সাঁতার জানতো না, তা না। কিন্তু দীঘির কালো জল, পিছল সিঁড়ি ওর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর জলের নিচে সিঁড়িতে পা পিছলে মাটির নাগাল না পেয়ে, ভয় পেয়েই ও ডুবতে বসেছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী বারাসতের বাগানবাড়িতে দুপুরে খেয়ে ওরা ফিরেছিল। হিমাদ্রি প্রায় সব সময়েই অরুণার কাছে বসেছিল। হরিষে বিষাদটা পরে বিষাদে হরিষ হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই, অরুণা হিমাদ্রির টানটা সঠিক অনুভব করেছিল।

ফুল্লরার স্মৃতি থেকে হাসিটা আবার উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইলো। ও জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে তাকালো। কমলের মুখ সামনের দিকে ছিল। ফুল্লরা মুখ ফেরাতেই সে ফিরে তাকালো। ফুল্লরা বললো, 'অদ্ভুত তুমি। কোন্ কথা থেকে কোথায় চলে গেলে?'

'কী করবো বলো।' কমল নিচু স্বরে বললো, 'রমণীর স্নান বলতে সেই দৃশ্যই আমার অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার পরের ব্যাপারটা—!' কমল থেমে গেল।

ফুল্লরা ভুরু কোঁচকালো। কমল একটু হেসে বললো, 'কিন্তু স্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতা—বিশ্বাস করো, বই ছাড়া আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

'মিথ্যে কথা।' ফুল্লরা ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বলে উঠলো, 'কমল, সত্যি নয়।'

কমলের কালো ঠুলির ওপরে আবার ভুরু খোঁচা দিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই হেসে উঠলো। বাঁ দিকে ঈষৎ ঝুঁকে খুবই নিচু স্বরে বললো, 'তাহলে রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পারি।'

কমল কথাটা উচ্চারণ মাত্র, ফুল্লরার মুখে লাল ঝলক লেগে গেল। মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়েও ওর গলায় কোনো কথা ফুটলো না। কমলের ঝকঝকে কালো ঠুলির দিক থেকে ওর মুখ ফিরিয়ে নিল।

★

একটা চিৎকার শোনা গেল, 'বাহারাগোরা।' মাঝখানে পিচ বাঁধানো অনেকখানি খোলা জায়গা প্রায় গোলাকার। তাকে ঘিরে বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, গর্জন থামালো।

'পুরীর রাস্তা।' পিছন থেকে কেউ বললো, ফুল্লরা শুনতে পেলো।

ইতিমধ্যে খড়্গপুর চকে বাস একবার দাঁড়িয়েছিল। ফুল্লরা কমলের সঙ্গে কথার ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ্য করেছিল। ও নামেনি, কমলও না। দিদি বুবাই নামে নি। কুমারদা নেমেছিল, খেয়াল ছিল, কখন উঠেছিল, দেখেনি। কমল হঠাৎ রূপাদের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলতেই ওর মনটা চলে গিয়েছিল, একদিন এক আলো-ঝলমলে হুল্লোড়ের রাত্রে। আলো-ঝলমলে ঠিক বলা যায় না, বরং স্বপ্নালোকে। আলো-ছায়ার এক শৈল্পিক পরিবেশ। রূপার—রূপা রায়ের জন্মদিনের উৎসব ছিল। রূপা ছিল ফুল্লরার সম-শ্রেণীর। এবং ইংরেজিতে ওরও অনার্স ছিল। গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়াতেই, ফুল্লরার চোখ পড়লো বাহারাগোরার প্রান্তরে,

boiRboi.net

ঘন থেকে আবছা হয়ে গেল রূপাদের বাড়ির সেই রাত। বাঁ চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে, ও ডান দিকে তাকালো।

অনু বুবাইয়ের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। কুমারও উঠে দাঁড়ালো। অনুর সঙ্গে ফুল্লরার দৃষ্টি বিনিময় হলো। অনুর চোখে অনুসন্ধিৎসা, সে কমলের দিকে চোখ ফেরালো। তার চোখের জিজ্ঞাসাটা স্পষ্ট পড়া যায়। স্বাভাবিক, কমলের পরিচয় জানার ঔৎসুক্য বা কৌতূহল দিদির মনে জাগতেই পারে। প্রথামতে, দিদি আর কুমারদার সঙ্গে কমলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু উপায় আছে কী? ও জিজ্ঞেস করলো, 'দিদি, তুমি নামছো?'

অনু বললো, 'হ্যাঁ, বুবাইয়ের বাথরুম পেয়েছে।'

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে দেখলো। বুবাই রুষ্ট মুখে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা তুলে, ফুল্লরাকে কয়েকবার দেখিয়ে দিল, তারপরে মায়ের হাত ছাড়িয়ে, ওর বাবার পাশ দিয়ে জোর করে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ফুল্লরার মস্তিষ্কে তখনো রূপাদের বাড়ির ঝাপসা ছবি, যেখান থেকে ও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। বুবাইয়ের রুষ্ট মুখে কড়ে আঙুল দেখানোর আকস্মিকতায় ও চমকিয়ে উঠলো, এবং হেসে উঠে, পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেনরে বুবাই, আড়ি দিচ্ছিস কেন?'

বুবাই তখন অদৃশ্য, ফুল্লরার চোখ পড়লো সেই তিন জনের ওপর, যাদের মধ্যে একজন আদরির ফোক্ সঙের গায়ক। তিনজনেরই চোখ লাল, তিন জনেই পিছনের দরজার দিকে যেতে গিয়ে, ফুল্লরার কথা শুনে, পেছন ফিরে তাকালো। একজন বললো, 'তাড়াতাড়ি আয়, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।'

ফুল্লরা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, ওর পিছনের জোড়া আসনের জোড়া মুখ দু'টির সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। দু'জনের বয়স ষাটের কাছাকাছি, দু'জনেই ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিলেন। উভয়ের চোখমুখের ভাবই বুবাইয়ের মতো রুষ্ট, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক, তথাপি ওর মনে চকিতের জন্যই জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো, কেন? তখন পিছনে দরজার কাছ থেকে স্বর ভেসে এলো, 'জোছনা করেছে আড়ি।'

অনুর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। কুমারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে ফুল্লরাকে বললো, 'নামবি নাকি? আয় না।' বলেই পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ফুল্লরা নামার কথা ভাবেনি, ও জিজ্ঞাসু চোখে কমলের দিকে তাকালো। কমল ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সে ঝুঁকে পড়ে নিচু স্বরে বললো, 'আমি এখানে আর নামবো না, বরং গাড়ির ভেতরটা একবার স্ক্রুটিনি করে দেখে নিই।'

ফুল্লরা ঠিক এই কারণে কমলের দিকে তাকায়নি। ও যে-কারণে জিজ্ঞাসু, সেটা একান্তই ওর মনের জিজ্ঞাসা। দিদির ডাক এতোই সহজ আর সরল, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। নিচে নামলেই দিদি কমলের পরিচয় জানতে চাইবে। অবিশ্যি তার জবাবটা কমলের কাছ থেকে জানবার কোনো দরকার নেই। ফুল্লরা নিজের মনেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কমল তৎক্ষণাৎ

উঠে, সরে গিয়ে ওকে বেরোবার রাস্তা দিল। ফুল্লরা দেখলো, কুমার তখন দাঁড়িয়ে। ও সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কুমার গেল পিছনের দরজার দিকে ।

বাস থেকে নামতেই ফুল্লরার মনে হলো, রোদ যেন অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করছে। রূপাদের বাড়ির সেই রাত।···মস্তিষ্কের দূর সীমায়, অস্পষ্ট সাঙ্কেতিক শব্দের মতো কথাটা এখনো বাজছে। বাতাসটা কী সাংঘাতিক গরম! আগুনের হল্‌কার মতো। একেই বোধহয় লু বলে। এ জায়গাটা ঠিক কোনো শহর বা জনপদ নয়। একদিকের রাস্তায় অনেকগুলো ভারী আর ভরতি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। পাশে রাস্তার ধারে একটা বড় ঝোপড়ি, সেখান থেকে উনোনের ধোঁয়া উঠছে। পুরীর বাসটা যেখানে দাঁড়ালো, তার ধারে কয়েকটা ছোট চা জলখাবারের দোকান, এখানেও সেই গরম সিঙাড়ার চিৎকার, গরম চায়ের ডাক। সবই গরম, আকাশটাও জ্বলছে।

অনু ফুল্লরার কাছে এগিয়ে এসেই, প্রথমে জিজ্ঞেস করলো, 'ফুলি, ওই লোকটা তোর চেনা নাকি? কী করে আলাপ হলো?'

ফুল্লরা হেসে উঠলো। ওর পিছনের ছায়াটা যে কুমারদের, তা টের পেলো। বললো, 'লোকটা কী বলছো দিদি? কলেজে আর ইউনিভার্সিটিতে ও আমার থেকে এক বছরের সীনিয়র ছিল। আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

'ওমা, তাই নাকি?' অনু সরল বিস্ময়ে হেসে বললো, ফুল্লরার পিছন দিকে কুমারের দিকে তাকালো! ফুল্লরা এবার পিছন ফিরে কুমারের দিকে দেখলো। কুমারের মুখ গম্ভীর, সে সিগারেট টানছে। বললো, 'তা হলে গোঁফ-দাড়িওয়ালাকে দেখে, প্রথম থেকেই ওরকম চমকাবার ভণিতা করছিলে কেন? যেন চেন না, খুবই ভয় পেয়ে গ্যাছো! আমাকে বললেই পারতে, তা হলে আর আমি তোমার বন্ধুকে তেরো নম্বরটা তোমাকে ছেড়ে দেবার কথা বলতাম না।'

ফুল্লরা ভুরু কুঁচকে, চোখ থেকে সান-গ্লাস খুলে, অবাক হয়ে বললো, 'এ কি বলছেন কুমারদা? আমি ওকে চিনতে পারলে আপনাকে বলতাম না?'

অনু অবাক হয়ে গিয়ে হেসে বললো, 'তোর কুমারদার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

কুমার রীতিমতো অবুঝ ক্ষুব্ধ বালকের মতো মুখ করে বললো, 'হ্যাঁ, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে আর তোমাদের দুই বোনের মাথা খুব ভালো আছে।' বলে সরে যাবার উদ্যোগ করে, এক পা গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, যাকে তুমি চিনতে পারোনি, তার সঙ্গেই হঠাৎ ভাব জমে গেল!'

'ওহ্ কুমারদা, সত্যি বলছি ওর দাড়ি-গোঁফের জন্য আমি ওকে একদম চিনতে পারিনি।' ফুল্লরা প্রায় অসহায় বিস্ময়ে বললো, 'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

কুমারের চোখে দ্বিধা আর বিস্ময় ফুটে উঠলো, ঈষৎ বিব্রত হয়ে বললো, 'অবিশ্বাস কেন করবো!'

'কিন্তু তুমি তাই তো করছো।' অনু বললো, 'ফুলিকে তুমি ওরকম বলছো কেন? কথাটা শুনতে দাও না। আমিও তো এতক্ষণ ধরে ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম,

boiRboi.net

আর মনে মনে ভাবছিলাম, তোমার কথাই সত্যি হয়ে গেল নাকি? ফুলির সঙ্গে পাশাপাশি বসে লোকটার ভাব হয়ে গেল?' অনু হাসলো।

ফুল্লরা বললো, 'ও নিজে থেকে না বললে, আমি ওকে কিছুতেই চিনতে পারতাম না। দু'বছরের ওপর ওকে আমি চোখেই দেখিনি, তার ওপরে ওইরকম চুল দাড়ি-গোঁফের বোঝা। ওর বাড়ির লোকেরা দেখলেও বোধ হয় ওকে চিনতে পারবে না।'

কুমারের মুখে একটু বিব্রত হাসি ফুটলো, বললো, 'তবে আমাকেও খুব দোষ দিতে পারো না। কিছুই জানি না, হঠাৎ দেখলাম, তোমরা দু'জনে আচমকা বন্ধুর মতো কথা বলতে আরম্ভ করে দিলে, আর খুব হাসাহাসি শুরু করে দিলে। আর তোমরা বেশ চাপা গলায় কথা বলছিলে, একটা কথাও প্রায় শোনা যাচ্ছিল না।'

ফুল্লরা হেসে বললো, 'কেন, খুব তো আমার পেছনে লাগছিলেন। আমার সঙ্গে যদি কোনো ছেলের ভাবই হয়, তাতে আপনার কী?'

কুমারের হাসিটা বিস্তৃত হলো, কিন্তু বিব্রতও। অনু চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'বাহ্, শালী বলে কথা! তায় আবার অভিভাবক। গায়ে লাগবে না? ছেলেরা সবাই এক?'

ফুল্লরা জোরে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিল। চোখে চাপালো সান-গ্লাস। বুবাই ওর হাফ-প্যান্টের নিচটা টেনে নামাতে নামাতে এগিয়ে এসে বললো, 'ফুলিমাসী, হাসো আর যাই করো, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।'

'কেন রে বুবাই?' ফুল্লরা বুবাইয়ের চিবুক ধরতে গেল।

বুবাই মুখ সরিয়ে বললো, 'তুমি আর এখন আমাদের কেউ নও, তুমি ওই দাড়িওয়ালা লোকটার!'

ফুল্লরার সঙ্গে অনুও শব্দ করে হেসে উঠলো। অনু বললো, 'দেখলি তো, ছেলেরা সবাই এক?'

'সত্যি।' ফুল্লরা হাসি সামলাবার চেষ্টা করলো।

বুবাই জুতো ঘষটে দু'পা সরে গিয়ে, তর্জনী নেড়ে নেড়ে বললো, 'তা হোকগে ফুলিমাসী, আমি খুব রেগে গেছি। আমি বাবা, আমরা তোমার সঙ্গে মিশবো না, ওই দাড়িওয়ালাটা—।'

'আহ্ বুবাই, আস্তে।' কুমার বলে উঠলো, এবং একবার বাসের দিকে ফিরে দেখে নিয়ে আবার বললো, 'বাজে কথা বলো না। কিন্তু ফুলি—।' সে ফুল্লরার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তোমার বন্ধুর নাম কিছুই তো বললে না?'

অনু বললো, 'তুই ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলি না তো ফুলি? ও কি তোর সঙ্গে কখনো আমাদের বাড়ি গেছে?'

ফুল্লরার মুখে বিব্রত আর অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো, 'না, ও কখনো আমাদের বাড়ি যায়নি।' বলে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, চোখের কোণে একবার বাসের দিকে তাকালো, তারপরে বললো, 'দিদি, পুরী গিয়ে, আমি তোমাদের বলবো, এখন ওর নাম-পরিচয়টা বলা যাবে না—মানে ইয়ে, একটু অন্য ব্যাপার আছে। আমি তোমাদের বলবো, পরে। পুরী গিয়ে।'

অনু আর কুমার নিজেদের মধ্যে অবাক দৃষ্টিবিনিময় করলো, চোখ ফিরিয়ে তাকালো

boiRboi.net

ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরার অস্বস্তি বেড়ে উঠলো, বললো, 'ও নিজেই ওর নাম ধরে ডাকতে আমাকেও বারণ করেছে। ওর নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো অসুবিধা আছে। তোমাদের বলতে আমার কোনো অসুবিধে নেই, আমি নিজেও ওর সব কথা জানি না, এত দিন কোথায় ছিল, কী করছিল। ওর কথা থেকে বুঝলাম, ও জানাতেও চায় না।'

কুমার অপলক সন্দিগ্ধ চোখে ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার দিকে ফুল্লরার চোখে চোখ পড়তেই, ও কেমন অস্বস্তি বোধ করলো, আর অপ্রস্তুতভাবে হাসলো। কুমার বললো 'আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি।'

ফুল্লরা আর অনুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো। কুমার ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'বোধহয় ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু সে আমি এখন বলতে চাই না।' সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো।

অনুর চোখে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা তেমনই জেগে রইলো। ফুল্লরা খানিকটা নিস্পৃহভাবে বললো, 'মোটের ওপর আমি বলতে পারি, আমরা একসঙ্গে পড়েছি, ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল—মানে, বন্ধুত্ব। আমি নিশ্চয় কখনো কখনো বাড়িতে ওর নাম করেছি, কিন্তু তোমরা ওকে কখনো দেখনি বলে চিনতে পারবে না।'

'তা না পারলেও ক্ষতি নেই।' কুমার বললো, 'তুমি ওর পাশে বসে গল্প করছো করো, কিন্তু তোমাকে বা তোমার সঙ্গে আমাদেরও, কোনো বিপদে পড়তে হবে না তো? সেরকম কোনো ভয় নেই তো?'

ফুল্লরা চোখ থেকে গ্লাস নামালো, ওর চোখে চকিতের জন্য একটা উদ্বেগের ছায়া নামলো, ও খানিকটা যেন আপন মনেই অস্ফুট উচ্চারণ করলো, 'বিপদ…ভয়…!'…

অনুর জিজ্ঞাসু চোখেও এবার একটা অবুঝ উদ্বেগের ছায়া ফুটলো। সে একবার কুমারের দিকে তাকিয়ে ফুল্লল্লরাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বিপদ? কিসের বিপদ, কিসের ভয়?'

'কিছু না, কিছু না।' ফুল্লরা যেন ভয় পেয়েই, প্রায় চুপিচুপি স্বরে বলে উঠলো, এবং আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু ওর নিজের ভরসা বা বিশ্বাস যে তেমন নেই, সেটা ও নিজেই বুঝতে পারলো। এই প্রথম ওর মনে হলো, কমলের সঙ্গে একটু পরিষ্কার কথা বলে নেওয়া উচিত। যদিও অপরিষ্কার তেমন কিছু নেই। ও কমলের কথা কিছু কিছু অন্য বন্ধুদের মুখে শুনেছে আর কমল নিজেও তার আত্মপরিচয় গোপন রাখার কথা বলেছে। নিজের নামটা সে উচ্চারণ করতে দিতে চায়নি। তা না দিক, কিন্তু কুমারদার কথাটা ফেলে দেবার মতো না। কমলের সঙ্গে মেশা বা যোগাযোগ থাকার মধ্যে, বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। তথাপি, এ তো ভাবাই যায় না, যেহেতু কমলের সঙ্গে পরিচয় থাকা বা কথা বলার বিপদ আছে, সেই হেতু, এখন থেকে তার সঙ্গে আর কথা বলা চলবে না। অসম্ভব! বিশ্রী! এখন আর তা ভাবাই যায় না। ফুল্লরা তা ভাবতেই পারে না, এমন কি, সত্যি ওর নিজের যদি কোনো বিপদও হয়। কমল

তো শত হলেও সেই কমল, যার দ্বারা কখনো কোনো অন্যায় করাই অসম্ভব। কমল তো আসলে সেই কমল, বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিখুশি, উদার আর ঠাট্টাপরায়ণ, নিখাদ প্রাণের ছেলে। কিন্তু ফুল্লরার মনে হঠাৎ আর একটা খটকা লাগলো। কুমারদা একথা বললো কেন? সে কী বুঝতে পেরেছে, আর সেই জন্যই বিপদ আর ভয়ের কথাটা তুললো?

ফুল্লরা কুমারের দিকে ফিরে কিছু জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হতেই, বাসের আকাশ মাঠ আর কান ফাটানো তীক্ষ্ন হর্ন বেজে উঠলো। যারা বাইরে ছিল, তারা হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বাসের দিকে ছুটে গেল। কুমার অবাক হয়ে বললো, 'আরে বুবাইটা কোথায় গেল?'

তিন জনেই ব্যাকুল হয়ে আশেপাশে তাকালো। ফুল্লরার প্রথমে চোখ পড়লো, একটা গাছতলার ছায়ায়, ওয়াটার-বটল হাতে, সেই তিন জনের সঙ্গে বুবাই কথা বলছে। কুমারের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, চিৎকার করে ডাকলো, 'বুবাই, ওখানে কী করছো? শীগ্‌গির এসো।' বলে নিজেই সেদিকে এগিয়ে গেল।

বাসের এঞ্জিন গর্জে উঠলো। বুবাই বাবার দিকে ছুটে এলো। অনু ডাকলো, 'চল্‌ ফুলি, উঠি।'

ফুল্লরার চোখেমুখে অন্যমনস্কতা। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বললো, 'চলো।' ও বাসের দিকে এগিয়ে গেল, আর তখনই ওর চোখে পড়লো, একটা জীপ গাড়ি বাসের দিকে, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। ও একবার কুমারের দিকে তাকালো। কুমারও তাকালো ওর দিকে। কুমারের চোখে উদ্বেগের ছায়া। ফুল্লরা আবার জীপ গাড়িটার দিকে দেখলো। দেখা গেল না, বাসের পিছনে সেটা আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

★

বাসের পিছনে জীপটার কথা কি কমলকে জানানো দরকার? খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, পুলিশের জীপ বলেই মনে হলো। ফুল্লরার যদি ভুল হয়েও থাকে, কুমারদার নিশ্চয়ই হয়নি। জীপটার দিকে চোখ পড়তে, কুমারদার দৃষ্টিও কেমন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ যেন একটা অলৌকিক ঘটনার মতো জীপটার আবির্ভাব। যখন কুমারদা ভয় আর বিপদের কথা বলেছিল, ঠিক তখনই জীপটাকে দেখা গেল। কমলকে নিয়ে, কী অনুমানে কুমারদা বিপদের কথা বলেছিল? কথা শুনে মনে হলো, তার অনুমানটা যেন নির্ঘাৎ।

কমল উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। ফুল্লরা বললো, 'এবার তোমাকেই জানালার ধারটা ছেড়ে দিচ্ছি, আমি বরং এই সীটে বসি।'

কমলের কালো ঠুলিতে অবাক ঝিলিক, ঝিলিক সাদা দাঁতের হাসিতে, জিজ্ঞেস করলো, 'হঠাৎ?'

ফুল্লরার হাসিটা তেমন স্ফুরিত না, একটু আড়ষ্টই। কমলের দিকে ঠেলে সরে এলো, আর কমলকে তেরো নম্বর সীটের কাছে সরে যেতেই হলো। ও কমলের জায়গায় বসে বললো, 'বসো না, আমি তো অনেকক্ষণ জানালার ধারে বসেছি।'

কমলের হাতে 'মেটামরফোসিস...।' জানালার ধারে বসে, ফুল্লরার দিকে

boiRboi.net

তাকিয়ে বললো, 'বসে তো ছিলেই। হঠাৎ সাবালিকা হয়ে উঠলে কেন, আর উদার ?'

ফুল্লরার চিন্তাগ্রস্ত অন্যমনস্কতার মধ্যেও, ভুরু কুঁচকে উঠলো, বললো 'সাবালিকা ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' কমল বললো, 'ছোট্ট মেয়েটি জানালার ধারে বসবার জন্য তো পাগল হয়েছিল, তাই।' সে কথা শেষ করলো না।

ফুল্লরা হেসে উঠলো। কিন্তু হাসিটা উচ্ছ্বসিত না। বললো, 'ওহ্। তখন তো তোমাকে চিনতাম না। এখন তোমাকে একটু ভাগ দিতে না পারলে খারাপ লাগবে।'

কমল হেসে উঠলো, স্বর নামিয়ে বললো, 'বন্ধুর জন্য।'

'একটা কথা।' ফুল্লরা ওর রঙীন স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর থেকে, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। ওর স্বর নিচু আর উদ্বিগ্ন, 'একটা জীপ বাসের পেছনে পেছনে আসছে। মনে হলো পুলিশের জীপ।'

কমলের চোখের কালো ঠুলি থেকে শুরু করে, কুচকুচে কালো গোঁফ দাড়ি আর ঘাড় বেয়ে পড়া চুলে, চকিতেই যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ঠিক চমক লাগা যাকে বলে, তা না। একটা উজ্জ্বল ফটোগ্রাফ যেন মুহূর্তেই নেগেটিভে পরিণত হলো। কমল প্রথমে সামনের দিকে তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে। বাঁ কোমরে কাছে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলো। নিচু স্বরে বললো, 'শুনতে পাচ্ছি।' এবং মুহূর্তের জন্য পরিবর্তনটা ওর সারা অবয়বের মধ্যেই ফুটে উঠে, আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ওকে দেখালো যেন আগের থেকেও ঝকঝকে।

ফুল্লরা কমলের এই পরিবর্তনটা স্পষ্ট বুঝতে পারলো না, কেবল মনে হলো, কমলের ভিতরে বাইরে যেন একটা কী ঘটে গেল। ও অবাক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী শুনতে পাচ্ছো ?'

'পেছনে একটা জীপের শব্দ।' কমল তেমনই নিচু স্বরে বললো। বাঁ কোমরের কাছে ওর চওড়া হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠলো।

ফুল্লরা উৎকর্ণ হলো, পিছনে জীপের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু বাসের এঞ্জিনের আর চলমান বডির ঝমঝমে শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পেলো না। ও ওর স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে অবাক চোখে কমলের দিকে তাকালো। কমলের দৃষ্টি এখন সামনে, ডাইনে বাসের ড্রাইভারের দিকে। ফুল্লরাও সেদিকে তাকালো, আবার কমলের দিকে। কমলের মুখ ড্রাইভারের দিকে। ফুল্লরা কিছু বুঝতে পারছে না। কমল কি ড্রাইভারকে কিছু সন্দেহ করেছে ? কমল ওর মাথা উঁচু করে ঘাড় তুলে, আর একটু ডান দিকে ঝুঁকলো। ও কি পিছনফেরা ড্রাইভারের মুখ দেখবার চেষ্টা করছে ? সে তো অসম্ভব ! ফুল্লরা কুমারের দিকে দেখলো। সে কোলের ওপর ম্যাগাজিন খুলে রেখে, ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চোখে মুখে অস্বস্তি। ফুল্লরার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, সে কমলের দিকে দেখলো। অনুর আর বুবাইয়ের দৃষ্টি এদিকে নেই, দুজনেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে।

'দেখা যাচ্ছে না' কমল বললো।

boiRboi.net

ফুল্লরার বিস্ময় বাড়ছে। জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখা যাচ্ছে না?'

কমল বললো, 'জীপটা। কিন্তু শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পেছনে পেছনে আসছে।'

ফুল্লরা অবাক চোখে পিছন ফিরে তাকালো। দূরের রাস্তার ধূ ধূ রেখা ধুলোয় হারিয়ে যাচ্ছে।

কমল বললো, 'এখান থেকে পেছনে তাকিয়ে দেখা যাবে না। সামনের রিয়ার ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

রিয়ার ভিউ-ফাইণ্ডারের কথা ফুল্লরার মনেই আসেনি। কমলের কথা শুনে ও ড্রাইভারের ডানদিকের জানালার বাইরে তাকালো। ফাইণ্ডারের কাঁচটা ও দেখতে পেলো না। ড্রাইভারের আড়াল পড়েছে, তা ছাড়া ওর উচ্চতার অসুবিধাও আছে। ডানদিকে বুবাইয়ের জায়গায় বসলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতো। জীপটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কমল তার শব্দ শুনতে পাচ্ছে, পিছনে পিছনেই আসছে। ফুল্লরা বারে বারে কমলের মুখের দিকে দেখতে লাগলো। কমল মাথা উঁচু করে, আগের মতোই ডানদিকে দেখছে। রিয়ার ভিউ-ফাউণ্ডার। কিন্তু কমলের চোখমুখের চেহারা কেমন দাঁড়িয়েছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফুল্লরা বুঝতে চাইছে, জানতে চাইছে কমলের উদ্বেগ কতোখানি। ও ভয় পেয়েছে কী না। চোখের পাশ অবধি ঢাকা ঠুলিটা খুললেই, ওর চোখ দেখলেই মুখের অবস্থা বোঝা যেতো। কিন্তু কমল কি ভয় পাবার ছেলে? দু'এক বছরের মধ্যেই ওর সম্পর্কে এমন সব কথা শোনা গিয়েছে, দুর্ধর্ষ আর দুঃসাহসিক বলতে যা বোঝায় ভয়ের কথা ভাবাই যায় না।

ফুল্লরার নিজের ভয় বাড়ছে। এ ভয়টা ঠিক নিজের জন্য না। কমলকে কেন্দ্র করে, সাম্ভাব্য বিপদের চেহারাটা কী দাঁড়াতে পারে, সেই আশঙ্কায় ওর ভয় বাড়ছে। তা ছাড়া কমলকে এরকম উদ্‌গ্রীব আর উৎকর্ণ হয়ে থাকতে দেখলে, নিশ্চিন্ত হওয়া দূরের কথা, সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেক বেশি। অথচ বাস-ভরতি লোকগুলো আপন মনে আগের মতোই গল্প করছে, হাসাহাসি করছে। এমন কি পিছনের তিনজনের মধ্যে, সম্ভবত সেই সুকুমারই একবার বলে উঠেছে, 'মালা বদলের বদলে জায়গা বদল!' তারপরেই আবার আদরির গান ধরতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছে।

ফুল্লরা নিচু সুরে বললো, 'তুমি কী ভাবছো? কোনো বিপদ-আপদ ঘটতে পারে?'

'কিছুই অসম্ভব নয়।' কমল মুখ নামিয়ে বললো, 'বরং খুবই সম্ভব।'

ফুল্লরার বুকের মধ্যে নতুন করে ভয়ের চমক লাগল, জিজ্ঞেস করলো, 'কী হতে পারে? ওরা পরের স্টপেজে বাসের মধ্যে এসে উঠবে?'

'তা কেন?' কমল বললো, 'ওরা মাঝপথেই বাসটা দাঁড় করাতে পারে।'

ফুল্লরার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। কমল আবার বললো, 'সে সম্ভাবনাটাই বেশি। অবিশ্যি যদি ওদের কাছে খবর থাকে। ওরা এখনো পেছনে পেছনে আসছে, আমি ঠিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

আশ্চর্য! ফুল্লরার এই উদ্বেগ, ব্যাকুলতার মধ্যে মনে হলো, জীপের শব্দটা ও কিছুতেই আলাদা করে শুনতে পাচ্ছে না। ও বললো, 'কুমারদাই প্রথম বিপদ-

boiRboi.net

আপদের কথা বলছিল।'

'কে কুমারদা?' কমল যেন আকস্মিক উত্তেজনায়, সন্দিগ্ধ আর উৎসুক হয়ে উঠলো।

ফুল্লরা বললো, 'আমার দিদির বর, এই যে আমাদের ডান পাশে—।'

'উনি কেন বিপদ-আপদের কথা বলেছেন?' কমল ফুল্লরার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো, 'বিপদ-আপদের কথা উনি কি করে জানলেন? কী করেন উনি? আমি তোমাকে এসব কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।'

ফুল্লরা অবাক চোখে কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কালো ঠুলিটার দিকে দেখেই বুঝতে পারলো, কমলের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। কমল একবার মুখ ফিরিয়ে চকিতে কুমারের দিকে দেখেও নিল কিন্তু কুমারদার সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞসার কারণ কী? কুমারদা কী করে, কমলের সেটাও জানা দরকার? আর সেটা জিজ্ঞেস করেনি বলে, ওর স্বরে উত্তেজিত হতাশা, অথচ কেমন কঠিন। কমল কেমন বদলিয়ে যাচ্ছে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই। ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে ফুল্লরার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠলো। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছে, অথচ ও কোনো দোষ করেনি। বললো, 'কুমারদা একটা বেসরকারী ফার্মে কাজ করে। কেন? তুমি জিজ্ঞেস করলে আমি নিশ্চয়ই বলতাম।'

'আমাকে ভুল বুঝো না।' কমল নিচু দ্রুত স্বরে বললো, 'উনি কেন বিপদ-আপদের কথা বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

ফুল্লরা বললো, 'আগের স্টপেজে যখন নেমেছিলাম, তখন তোমার কথা ওরা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তোমার কোনো পরিচয় দিইনি, বলেছি আমার পুরনো বন্ধু।'

'ওঁরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছেন, বন্ধুর নামধাম না বলায়?' কমল জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা বিব্রত হয়ে বললো, 'তা হয়েছে।'

'আর তুমি নিশ্চয়ই বলেছ, বন্ধুর নামধাম বলার অসুবিধা আছে, তাই না?' কমল তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা অবাক চোখে কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কমল হঠাৎ একটু হেসে উঠলো, 'বুঝেছি।'

কমলকে হাসতে দেখে, ফুল্লরার অপরাধ বোধটা বেড়ে গেল। বললো, 'আমি অন্যায় করেছি, না?'

'না, ভুল।' কমল বললো, 'মানে একটু বোকামি, কিছু মনে করো না। একটা যে-কোনো নাম, একটা যে-কোনো পরিচয় দিয়ে দিলেই হতো। কিছুই না বলার থেকে, কিছু বলা ভালো, তাই না? তোমার কুমারদা খুব সচেতন মানুষ। প্রায় ঠিক ব্যাপারটাই আঁচ করেছেন। কিন্তু—।' কমল হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো, ঘাড় উঁচু করে, সামনে ডান দিকে তাকালো, প্রায় ফিসফিস স্বরে বললো, 'জীপ হর্ন দিচ্ছে।'

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গেই, বাসের ভিতরে দুবার বেল বেজে উঠলো! মৃদু ব্রেক

boirboi.net

কষার একটা ঝাঁকুনি লাগলো, এবং বাস রাস্তার বাঁ দিকে একটু সরে গেল। জীপের তীক্ষ্ন হর্ন ঘন ঘন বাজছে, পিছন থেকে ক্রমেই সামনে এগিয়ে আসছে, ফুল্লরা শুনতে পাচ্ছে। ও দেখলো, কমল সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। এখন ওর ডান হাত বাঁ কোমরের কাছে, বাঁ হাত দিয়ে সামনের সীটের রড মুঠি করে ধরা।

বাস আর একটু বাঁয়ে চাপলো, গতি আরো কিঞ্চিৎ মন্থর হলো। জীপের হর্ন এখন একেবারে বাসের গায়ে গায়ে, জীপটাকে দেখা যাচ্ছে।

★

অদৃশ্য অথচ গর্জিত জীপটা, বাসের পাশ দিয়ে ছুটে হঠাৎ রাস্তার ওপর ভেসে উঠলো। তীরবেগে ছুটে চলেছে। জীপের পিছনে নিশানের মতো উড়ছে একটা নীল রঙের রেশমী শাড়ির আঁচল। ভেসে এলো ছেলেমেয়েদের সমবেত গানের কলি, 'আজ জ্যোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।'...তার মধ্যেই একটি ছেলের চিৎকার শোনা গেল, 'টা টা, গুডবাই!'...বাসটা রাস্তার মাঝখানে সরে এসে গতি বাড়ালো। দ্রুতগতি জীপটার পিছনে, ভিতর দিকে ঠাসাঠাসি একটা ভিড়। বাসের ভিতরে কয়েকবার ক্লিয়ারেন্স ঘণ্টা বেজে উঠলো।

ফুল্লরার চিবুকে ঠোঁটের ওপরে, নাকের ডগায়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখনো নিশ্বাস পড়তে চাইছে না, বুকটা ফুলে উঠেছে। ডান হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে ডান দিকের হাতল। চোয়াল দুটো এখনো শক্ত। দূরে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া জীপ থেকে চোখ ফিরিয়ে, কমলের দিকে তাকালো।

কমলের কপালে আর চোখের কোলে, কালো ঠুলির নিচেই, ঘামের চিকচিকে বিন্দু। নাকটা টকটকে লাল। কালো ঠুলি দুটো গভীর অন্ধকার। বাতাসের ঝাপটায় বাঁ দিকের চুল দাড়ি কাঁপছে, তথাপি ঘাম শুকায়নি। ও আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ফুল্লরার দিকে তাকালো, আর আস্তে আস্তে ঠুলির অন্ধকারে আলোর রেখা জাগলো।

ফুল্লরা কমলের মনের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছে না। কালো ঠুলির ভিতর থেকে ও এখন ফুল্লরাকেই দেখছে, এটা স্পষ্ট। ওর দাড়ি ভরা গালটা এখন অনেক চওড়া দেখাচ্ছে। বাঁ কোমরের কাছ থেকে হাতটা তুলে, জানালার ধারে রাখলো, এবং আস্তে আস্তে একটু পিছনে হেলে বাঁ দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ফুল্লরা তাকালো কুমারের দিকে। কুমারের চোখ কমলের দিকে ছিল, এখন ফুল্লরার দিকে তাকালো। কুমারের গোটা মুখ ঘামে ভেজা। হঠাৎ-ই যেন তার মুখে অনেকগুলো রেখা জেগে উঠেছে, আর খুব অবসন্ন দেখাচ্ছে। এখনো তার চোখে উদ্বেগের ছায়া। অবাক দৃষ্টি ফুল্লরার চোখের ওপরে রাখা, এবং হুস্ করে একটা নিশ্বাস ফেললো। আর চকিতে একবার কমলের দিকে দেখে, খুব আস্তে মাথা ঝাঁকালো। অনু বুবাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বুবাই চলে যাওয়া জীপ আর তার আরোহীদের সম্পর্কেই মাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। ওরা কারা, কেন গান করছিল, কেন টা-টা গুডবাই করলো, এবং ওরাও পুরী যাবে কীনা? অনু সাধ্যমতো জবাব দেবার চেষ্টা করছে।

কুমার হিপ্ পকেট থেকে দোমড়ানো রুমাল বের করে মুখ ঘাড় গলা মুছতে

boiRboi.net

আরম্ভ করলো। ফুল্লরাও যেন হঠাৎ অনুভব করলো, ও ঘেমেছে। কোমরে গুঁজে রাখা রুমালটা টেনে নিয়ে চিবুকের কাছে চেপে ধরেই, ও কমলের দিকে তাকালো। কমলও তো ঘেমেছে, ও ঘাম মুছবে না? নিজের ঘাম মুছতে গিয়ে এ কথাটাই ওর প্রথম মনে এলো। কিন্তু ও তা জিজ্ঞেস করলো না, এবং ওর মনে একটা ইচ্ছা জাগলো, আর ইচ্ছাটাকে একটা উদ্গত নিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করলো। কমলের ঠুলিতে এখন অন্ধকার। ওর চুল উড়ছে। মাথাটা এখন অনেকখানি বাঁ দিকে হেলানো।

ফুল্লরা চিবুক আর গলার কাছে চেপে চেপে ঘাম মুছলো। কিন্তু ঘাম এখন অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে। ওর নিজেকে খুব ক্লান্ত আর দুর্বল লাগলো। ও সামনের দিকে এগিয়ে, দু পা ছড়িয়ে দিয়ে, যতোটা সম্ভব সমস্ত শরীরটাকে পিছনে এলিয়ে দিল, কিন্তু বুকজোড়া নিজের চোখেই বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তাই ডান দিক থেকে আঁচল টেনে বুক ঢেকে বাঁ দিকের জামায় গুঁজে দিল। চোখ বুজলো, আর বাসের ভিতরে যাত্রীদের ছোটখাটো কথা কানে ভেসে আসতে লাগলো, যা কিছুটা অর্থহীন শব্দের মতো। কমল যেন তখন কী বলছিল? স্বেদসিক্ত রমণী···রুপোদের বাড়ি।···ওহ্, জীপটা যদি সত্যি পুলিশের হতো, আর যা সন্দেহ করা গিয়েছিল, তাই যদি ঘটতো? এখন সমস্ত ব্যাপারটা তিন জনের মধ্যে আছে। কমল, ওর আর কুমারের মধ্যে। একটা ভয়ের সম্ভাবনা এখন সব সময়ের জন্যই জেগে রইলো। নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট কোনো কথাবার্তা না বলেও, একটা সম্ভাবনা এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠলে, যে-কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো জায়গায়, পথের মাঝখানে বা কোনো স্টপেজে, এবং সমুদ্রের ধারে পৌঁছুনো পর্যন্ত। এ রকম একটা যাত্রায়, কমলের সঙ্গে কেন দেখা হলো? কমল চেনা না দিলেই বা ক্ষতি কী ছিল? ফুল্লরা কখনোই চিনতে পারতো না, কারণ অচেনা চুল-দাড়িওয়ালা তেরো নম্বরের দিকে ভালো করে ও কখনো তাকিয়ে দেখতো না, এবং একবারও চেনা চেনা মনে হয়নি, যে কারণে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবার দরকার ছিল না। তেরো নম্বর, তেরো নম্বরই থেকে যেতো, আর তার মেটামরফোসিস···।

ফুল্লরার মন এখন একটা অদ্ভুত আলাদা পথে ভেসে চললো। অভিমানে ভরে উঠছে ওর মন, এটা আশ্চর্য! ওর বাঁ কনুই কমলের কোমরের কাছে ছুঁয়ে আছে। একটা দুঃখ আর ক্ষোভ ওর মনে জেগে উঠছে। অথচ একটা লজ্জা। মনের মধ্যে কত রকমের অনুভূতি একসঙ্গেই জোট পাকিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ধারার মতো, সবগুলো মিলেমিশে একটা প্রবাহেই ছুটে চলে। হ্যাঁ, ও তো কমলকে ভুলেই গিয়েছিল। ঠিক মনে রাখা বলতে যা বোঝায়, সেরকম করে কখনোই আর মনে রাখেনি। মনে করে রাখাটা কি কারোর ইচ্ছা মতো ঘটে? ইচ্ছা করলেই মনে রাখা যায় না। কিংবা ইচ্ছাটাই হয়তো তখন তার আদল বদলিয়ে নেয়, আর মন থেকে অনেক কিছু সরে যায়। হারিয়ে যায়। কমল ওর কাছে আস্তে আস্তে অবাস্তব হয়ে উঠেছিল। অবিশ্যি সান্নিধ্যের মধ্যে না। অদর্শনে, জীবনের ভিন্নতায় কমল অবাস্তব হয়ে উঠেছিল, মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। আট মাসের কমল। হিসাবটা তো সেই রকমই।

কমল কেন হঠাৎ ওরকম করে রুপোদের বাড়ির কথা বললো? স্বেদসিক্ত

boiRboi.net

রমণী…রুপাদের বাড়ি। এটা কি ব্যঙ্গ না বিদ্রূপ? 'তা হলে রুপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পারি।' কেমন একটা চ্যালেঞ্জের মতো শোনাচ্ছিল না ওর স্বর? তার আগে অবিশ্যি ফুল্লরাও জোর দিয়ে বলেছিল, কমল মিথ্যা কথা বলছে। বলেনি কী?

হ্যাঁ, ফুল্লরা স্বেদসিক্ত ছিল। রুপোর জন্মদিনের সেই রাতের সময়টা তো গ্রীষ্মকালই ছিল। রুপোর বাবা মা অভিভাবকদের কাছ থেকে ওরা কিছুটা সময় নিজেদের জন্য আলাদা করে নিয়েছিল। সেই কিছুটা সময় ওদের কেটেছিল দোতলায় আর ছাদে। আলিপুরের সরকারি বাড়িটা ছিল বিরাট। অভিভাবক আর বয়স্ক অতিথি অভ্যাগতরা সবাই একতলায় ছিলেন। ফুল্লরা জানতো না, কিন্তু নিশ্চয় রুপো বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে, কয়েক বোতল বীয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। অথবা কমল, বা হিমাদ্রি বা শ্যামল, ওরা কেউ লুকিয়ে এনেছিল। বিমানের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। টাকা তো ওর কাছে কখনোই থাকতো না, ওর সেরকম সাহসও ছিল না।

একটা ছেলেমানুষি ফুর্তি। নিজেদের দুঃসাহসী বেপরোয়া ভাববার খানিকটা আনন্দ। অনেকগুলো আলোই নেভানো ছিল। চুরি করে বেপরোয়া হওয়া ছাড়া তো কিছু না? রুপাদের বাড়িতে জানাজানি হলেও হয়তো ব্যাপারটাকে তেমন একটা অপরাধজনক ব্যভিচার বা ওদের ডিজেনারেটেড বলা হতো না। গেলাস আনা হয়নি। কে কে যেন দাঁত দিয়েই বীয়ারের বোতলের ছিপি খুলেছিল। ফেনিলোচ্ছ্বাসের একটা ঢেউ। কাড়াকাড়ি করে খাওয়া, অথবা কারোকে জোর করে খাওয়ানো। আর ছেলেমেয়ে, সকলের হাতে ঠোঁটেই একটা করে জ্বলন্ত সিগারেট।

কে ফুল্লরার মুখে প্রথম বোতল থেকে ঢেলে দিয়েছিল? ওর বুকের শাড়িতে কিছুটা চলকিয়ে পড়েছিল। বিশ্রী তেতো। হিমাদ্রি? শ্যামল? কমল? বিমান সব সময়ে ওর পেছনে লেপ্টে দাঁড়িয়েছিল। বিমান আর ওকে নিয়ে, তখন সবাই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বিমান যদি সত্যি—সত্যিকারের একজন কবি হতো, তা হলে বন্ধুদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল হতো না। ফুল্লরার মনের কথাটা কেউ জানতো না। ঠিক, ও খুব বেশি বিমানের সঙ্গে মিশেছিল। বিমান কবিতা লিখতো। একজন কবি ওর কাছে পরম বিস্ময়, নিবিড় মুগ্ধতা যা আদৌ বিমান ছিল না। ফুল্লরা আশা করতো। বিমান আসলে মনের দিক থেকে কবি ছিল না। এমনকি ওর হাতের স্পর্শে ঠোঁটের স্পর্শেও ও কোথাও কবি ছিল না। ওর কোনো ক্ষুধাই ছিল না, অথচ ও ছিল অভুক্ত আর অসুস্থ। এ কথা ফুল্লরা কারোকে বলতে পারেনি, বলতে চায়নি, মনে মনে জেগে উঠেছিল অস্বীকার। এখন বিমান কী করে? একজন প্রগতিশীল ফিল্ম্ ডাইরেক্টরের এ্যাসিসটান্ট আর চিত্রনাট্যও নাকি লেখে। আর এখনো কালেভদ্রে ভুল বানানের কবিতা বেরোয় নামকরা একটা সাপ্তাহিকে।

ফুল্লরার হাতেও জ্বলন্ত সিগারেট ছিল, আর, ও ফুঁক ফুঁক করে টেনেছিল। কে ওর মুখে তারপরে বীয়ারের বোতল চেপে ধরেছিল? কমল? ও কয়েক ঢোঁক

গিলে ফেলেছিল। তেতো, বিশ্রী, ওর উদ্‌গার উঠেছিল, আর পেটের মধ্যে কলকলিয়ে উঠেছিল, আর গলগল করে ঘেমেছিল। হাসাহাসি, ছুটোছুটি কাড়াকাড়ি, জোর করে গলায় ঢেলে দেওয়া, এবং কাদের সঙ্গে কখন ফুল্লরা ছাদে গিয়েছিল? এবং কখন এক সময় ও হঠাৎ দেখেছিল, ছাদে আর কেউ নেই, ও আর বিমান ছাড়া? একেবারে ভুলে যাবার কোনো কারণ নেই, ও তো মাতাল হয়ে যায়নি। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য, সবাইকেই একটা পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল। শ্যামল দক্ষিণের বারান্দায় রূপাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল। আকাশে একটা ছোট চাঁদ ছিল, কলেবর যার বাড়বার দিকে। তার মানে রূপার জন্ম শুক্লপক্ষে। আবছা আর বাঁকা জ্যোছ্‌না ছিল দক্ষিণের বারান্দায়। তখন কে বলে উঠেছিল, 'রূপা, তোকে সবাই আজ আমরা একটা করে চুমো খাবো।'

না, কোনো ছেলে বলেনি, মেয়েদের মধ্যে কেউ বলে উঠেছিল। না, ফুল্লরা ভুলে যায়নি, কেন ও আর বিমান ছাড়া ছাদে, সেই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না। ছোট চাঁদের আবছা আলো। কৃষ্ণচূড়ার ছায়াটা বেশ বড় হয়ে ছাদের বুকে ছড়িয়ে ছিল। সেই এক ভুল, ওরা ফুল্লরা আর বিমানকে একটু সুযোগ দিয়ে গিয়েছিল। বিমান কখন কী ভাবে হঠাৎ ফুল্লরার দুই উরত প্রাণপণ শক্তিতে ঘন আবন্ধে চেপে ধরেছিল, আর ও নিচু হয়ে বিমানের হাতটা এক হাতে চেপে ধরেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'না। বিমান ছাড়ো।'

বিমান তখন নরম কাদার বুকে, জংলী গাছের মূলে আগ্রাসী লোভে মুখ বাড়িয়ে দেওয়া শুয়োরের মতো। ও যে কোন্ মুহূর্তে ওরকম একটা এ্যাটেমপ্ট নিয়েছিল যা আর কখনো করেনি, ফুল্লরা একটুও টের পায়নি। ও রীতিমতো ক্ষ্যাপা আর বলশালী হয়ে উঠেছিল, আর গোঙানো স্বরে একটা আকুতির শব্দ করেছিল। ওর হাত তখন অনেকখানি ভিতরে চলে গিয়েছিল; যেতে পেরেছিল, কারণ ও নিচু হয়ে কাণ্ডটা করেছিল একেবারে আচমকা। ফুল্লরা ওর পরস্পর আবদ্ধ শক্ত উরতে, বিমানের নখের আঘাত অনুভব করেছিল। শায়া আর শাড়ির ওপর দিয়ে ওর হাতটা ফুল্লরা প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। এক হাতে অসম্ভব বুঝে দু'হাতে চেপে ধরেছিল, আর নিচু হয়ে পড়ার দরুন বুকের আঁচল বিমানের পিঠের ওপরেই ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং গলার স্বর কিছুটা তুলে বলেছিল, 'ছাড়ো বলছি, ছাড়ো। আমি চিৎকার করবো।'

বিমান ছাড়েনি, কথা শোনেনি, বরং আর একটু দীর্ঘ শব্দে গুঙিয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফুল্লরা মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এমন অসুবিধাজনক ভাবে ওকে বিমানের হাতটা চেপে ধরতে হয়েছিল, কোমর থেকে শাড়ির বাঁধন একটু একটু করে খসে পড়ছিল। বিমানের হাত ক্রমাগত ওর উরু সঙ্গমের দিকে তিল তিল করে এগিয়ে যাচ্ছিল! ফুল্লরা খানিকটা নিরুপায় হয়ে, হঠাৎ খানিকটা ঝুঁকে, বিমানের মাথার সঙ্গে মাথা ঠুকিয়ে ওর হাত দুটো সহ ঝুলে পড়েছিল। ওর শরীরের একটা ভার আছে, সেই ভারটা বিমানের ওপর কিছুটা চেপে বসতেই, হাত দুটোও কিছুটা নেমে এসেছিল। ফুল্লরা বেশ জোরে ফুঁসে ওঠা স্বরে ডেকে উঠেছিল, 'বিমান ছাড়ো!'

বিমানের অন্য হাতটা তখনই ফুল্লরার বুকে স্পর্শ করেছিল। সেটা নতুন কিছু

না, কিন্তু ফুল্লরার কাছে তখন সেই চেনা স্পর্শও অসহ্য বোধ হয়েছিল। ও হঠাৎ খানিকটা পিছনে ছিটকে যেতে পেরেছিল, আর, প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'না, আর না, ছাড়ো।'

ফুল্লরার শাড়ি তখন অনেকখানিই ছাদে লুটোচ্ছিল। বিমান জানু পাতা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবং ফুল্লরার ছড়ানো আঁচল ধরে টানতে টানতে ওর দিকে এগিয়েছিল। বিমান তখন স্থান কাল পাত্র হিতাহিত সবই ভুলে গিয়েছিল। ফুল্লরাকে আর একবার হাত বাড়িয়ে ধরার মুহূর্তে কমল নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিল। ও খুব আস্তে আস্তে এসেছিল, নিশ্চয় অনেক দ্বিধা আর বিস্ময় নিয়ে। ওকে দেখতে পেয়েই, ফুল্লরা প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলে উঠেছিল, 'কমল, সেভ্ মী প্লিজ! এর হাত থেকে আমাকে ছাড়াও। ও যে কী জঘন্য!'

কমল তথাপি দ্বিধা করেছিল, কারণ ব্যাপারটা ছিল ফুল্লরা আর বিমানের।

ফুল্লরা আবার ডেকে উঠেছিল, 'কমল!'

কমল এগিয়ে এসে বিমানের একটা হাত চেপে ধরেছিল, নিচু স্বরে বলেছিল, 'এই বিমান এই। ফুল্লরা কী বলছে শোন্।'

বিমান শুনতে চায়নি, কমলের হাত থেকে এক ঝাপটায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, আর সেটাই সপাটে গিয়ে লেগেছিল ফুল্লরার কাঁধের কাছে। ফুল্লরা একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠেছিল, 'ওর মাথায় কিছু নেই, একটা দাঁতাল হয়ে উঠেছে।'

কমল তখন দ্বিধা-মুক্ত হয়েছিল, আর বিমানের ওরকম ভাবে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ায়, ওর জেদও নিশ্চয় ঝলকিয়ে উঠেছিল। ফুল্লরার গায়ে ওরকম আঘাত লাগতে দেখে, ও রেগে উঠেছিল। ও দ্রুত হাত বাড়িয়ে, বিমানের একটা হাত চেপে ধরেছিল, আর বেশ জোরে মোচড় দিয়ে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিমান ব্যথায় কয়েকবার শব্দ করে উঠেছিল, 'উহ্! উহ্!'…কিন্তু কমল আর থামেনি, বিমানকে টানতে টানতে একেবারে সিঁড়ির দরজার কাছে নিয়ে, নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারপর ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিল।

ফুল্লরা তখনই যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, আলসের কাছে সরে গিয়ে, পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আঁচলটা গায়ে টেনে তুলে দিতেও পারছিল না। কমল দরজার কাছ থেকেই, নিচু স্বরে বলেছিল, 'ফুল্লরা, ও নিচে নেমে গেছে, তুমি এসো।'

ফুল্লরা তখন নড়তে পারছিল না, তার মনের যতো রাগ আর অপমান, সব গলার কাছ থেকে চাপা হু-হু শব্দে বেরিয়ে আসছিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়ে, জলে ভরে উঠছিল। কমল নিশ্চয় চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, আর তাই ফুল্লরার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। কিছুটা অবাক আর উদ্বিগ্ন স্বরে ডেকেছিল, 'ফুল্লরা।'

ওভাবে তখন নাম ধরে যে-কেউ ডাকতে পারতো। যেন একটা ডাকেরই অপেক্ষা ছিল, ফুল্লরার গলায় কান্নার স্বর ফুটছিল। কমল ওর একটা হাত ধরে বলেছিল, 'ফুল্লরা, তোমার কি কোথাও লেগেছে?'

ফুল্লরা কমলের হাতটা নিজের দুই ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে, কান্নার শব্দ চাপা

amarboi.net

দেবার চেষ্টা করেছিল, আর একজন বন্ধুর কাঁধে ও একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, ফুল্লরা কমলের কাঁধে একটা হাত তুলে দিয়েছিল, যে হাতটা কমল নিজেও চেপে ধরেছিল। আর সেইজন্য কি কমল ওই ভাবে কথাটা বললো, যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুরে, 'তা হলে রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পারি।'

কোন্ সূত্রে? স্বেদাসিক্ত রমণী—রূপাদের বাড়ি, রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা! কমলের হাসিতে কি বিদ্রূপ? ব্যঙ্গ? কী ভাবে কী ভেবে ও কথাটা বললো?

বাসে একটা ঝাঁকুনি লাগলো, ফুল্লরার কানে এলো একটা শব্দ, 'লোধাশুলি।'

★

কমলের সম্পর্কে এরকম ভাবতে খারাপ লাগে। বিবেক বা সেই রকম কিছু ফুল্লরার মধ্যে জেগে ওঠে কী না, ও তা বুঝতে পারে না, কমল সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে, মনের মধ্যে আপনা থেকেই কেমন একটা দ্বিধার ছায়া পড়ে। কমল যদি সত্যি চ্যালেঞ্জ করে কথাটা বলে থাকে, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করে থাকে, সেটা তো একরকমের নীচতা বলতে হবে। এই কমল এখন এক আলাদা জগতের মানুষ, যদিও ওর কথাবার্তা শুনে, ওর হাসি দেখে, হঠাৎ, হঠাৎ কিছু বোঝা যায় না। বরং ওর বর্তমানকে ঘিরে যে-সব বিভীষিকা জড়ানো—ফুল্লরার এইরকম ধারণা তারপরেও এইরকম হেসে কথাবার্তা বলাটা কেমন একটু অপ্রত্যাশিত। ওর বাঁ দিকের কোমরের কাছে কী লুকানো আছে, ফুল্লরা তা অনুমান করতে পারে। ও কেন কিছুক্ষণ আগে কোমরের কাছে শক্ত হাতে চেপে ধরেছিল, ফুল্লরা তাও আন্দাজ করতে পারে। ওকে ঘিরে ত্রাসাচ্ছাদিত ভয়ংকর কিছু ছাড়া ভাবা যায় না, অবিশ্যি, আর এসবের মধ্যেই ওকে শ্রদ্ধেয় আর মহৎ মনে হয়, আর ফুল্লরার সঙ্গে ওর ব্যবধানটাও সেইখানেই। সেইজন্যই ওকে আগের মতো হেসে কথা বলতে শুনলে আশ্চর্য লাগে।

তথাপি, সংশয় কি কাটে? কাটে না। ফুল্লরার মনের ধোঁয়া সরে যেতে থাকে, আর আগুন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জ্বলুনি বাড়তে থাকে, অপমানের জ্বালা, কারণ রূপাদের বাড়ির ঘটনার পর, আট মাসের জীবনটা এখন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই সময়টা ভুলে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, ফুল্লরা ভুলেও গিয়েছিল, যদিও সত্যি সববিছু ভোলা যায় না। তাহলে এখন এরকম স্পষ্ট হয়ে উঠতো না। সেই আট মাস তো এখন একটা ভবিষ্যতের নিশ্চিত ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল। প্রায় একটা সিদ্ধান্তের মতো।

ফুল্লরা সরাসরি মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে তাকালো না। ঘাড় ঈষৎ বাঁকিয়ে, চোখের কোণে দেখলো। কমল বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও জানালার পাশে, বাতাসে ওর চুল উড়ছে, দাড়ি কাঁপছে। ও কি চোখ বুজে আছে? একটা উৎকট সন্দেহের উত্তেজনার অবসানে ও কি এখন চোখ বুজে আলস্যে কাটাচ্ছে? মনে হয় না। ও এখনো সোজা হয়ে বসে আছে, আর মনে হচ্ছে, কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ও এখন পুরীগামী বাসের মধ্যে নেই, অন্য কোথাও রয়েছে, ফুল্লরার ঠিক এইরকম মনে হলো। রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা যে ও বলেছিল, এখন

boiRboi.net

সেসব নিশ্চয়ই মনে নেই, ভাবছেও না। এরকম ভাবেই ও প্রায় দু বছর আগে, অন্য এক জীবনে চলে গিয়েছিল। কষ্ট? খুবই কষ্ট হয়েছিল ফুল্লরার। কিন্তু নালিশ করার কথা মনে আসেনি। মনে কোনো নালিশই জাগেনি।

এখন জাগছে। কারণ এখন প্রশ্নটা স্বতন্ত্র। এখন কমলের কথার ব্যাখ্যার দরকার আছে। কোনো কোনো সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু তা নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার থাকতে পারে না।

ফুল্লরার ঠোঁটের দুই কোণ শক্ত হয়ে উঠলো, আর ঠোঁটের ডগায় জিজ্ঞাসা উদ্যত হলো। তবুও একবার কুমারের দিকে ফিরে তাকালো। কুমারদার হাতে খোলা ম্যাগাজিন, তার চোখও সেইদিকে ছিল। কিন্তু ফুল্লরা তার দিকে তাকানো মাত্রই, সে চোখ তুললো। তার দুই চোখে জিজ্ঞাসা। বুবাই ওর মায়ের বুকের কাছে মাথা এলিয়ে দিয়েছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। অনুর দৃষ্টিও বাইরের দিকে। কুমারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। ফুল্লরা কমলের দিকে মুখ ফেরালো।

'এর পরে পর পর দুটো চেক পোস্ট পড়বে।' কমল ফুল্লরার দিকে ফিরে নিচু স্বরে বললো, 'চিচ্‌রা আর দারিশোল। তারপরে জামছোলা, সুবর্ণরেখা ব্রিজ, তাই না?'

ফুল্লরার চোখের স্বচ্ছ সানগ্লাসে কোনো কৌতূহল নেই, বললো, 'জানি না।'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।' কমল বললো, 'আমি জানি, আমার সব মুখস্থ আছে। তবু তোমাকে তখন নেকস্ট স্টপেজের কথা ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। যদি তুমি আমাকে চিনতে পারো।' ও হাসলো, আবার বললো, 'সুবর্ণরেখা পার হলে আমরা উড়িষ্যায় পড়বো। তার আগে, চেক পোস্ট দুটো—।' ও কথা শেষ করলো না, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরালো।

ও ওর নিজের ভাবনায় আছে, ফুল্লরা বুঝতে পারছে। পর পর দুটো চেকপোস্ট ওর মাথায় ঘুরছে। বোধ হয় সেখানে বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ করছে। উড়িষ্যায় পেঁছিলে কি ওর বিপদ কেটে যাবে? তা যা-ই হোক, এসব সম্ভাবনা নিয়ে, আপাততঃ ফুল্লরার মনে কোনো কৌতূহল বা উত্তেজনা জাগছে না। ওর বাঁ কনুইটা এখনো হাতলের ওপরে, কমলের কোমরের কাছে ছুঁয়ে আছে। ও কনুই দিয়ে আলতোভাবে কমলের কোমরে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'তখন তুমি ও কথা বলছিলে কেন?'

'কোন্ কথা?' কমল মুখ ফেরালো, ওর কালো ঠুলিতে জিজ্ঞাসা।

ফুল্লরা বললো, 'রূপাদের বাড়ির সেই রাত্রের কথা?'

'তোমার কথা শুনে মনে পড়ে গেল।' কমল হাসলো, ঈষৎ ঝুঁকে বললো, 'তুমি যে স্বেদসিক্ত রমনীর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলে, তাই।'

ফুল্লরার মুখে রক্তের ছটা লেগে গেল, দু চোখ ঝলকিয়ে উঠলো, গম্ভীর আর তীক্ষ্ণ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী তোমার অভিজ্ঞতা?'

কমল কোনো জবাব না দিয়ে, কেবল হাসলো। ওর ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল। হেসে, জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবার উদ্যোগ করতেই, ফুল্লরা দ্রুত ধারালো

boiRboi.net

স্বরে বলে উঠলো, 'বলো, তোমার বলা উচিত, কী তোমার অভিজ্ঞতা !'

কমল ফিরে তাকালো, ওর চোখের ঠুলির ভিতর থেকে, কপালে একটা রেখা বেঁকে উঠলো। তারপরে চোখ থেকে ঠুলিটা আস্তে আস্তে খুলে, চকিতেই একবার আশেপাশে দেখে নিয়ে, ফুল্লরার দিকে তাকালো। মোটা ভুরুর নিচে, ওর দু চোখে বিভ্রান্ত বিস্ময়। ফুল্লরাও ওর চোখের দিকে তাকালো। ফুল্লরার মুখে রক্তাভা এখন আরো গাঢ়, নাকের পাটা কাঁপছে। কমল অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি রেগে গ্যাছো নাকি ?'

ফুল্লরা তার কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'আমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।'

কমলের হাসিটা হয়ে উঠলো কেমন আড়ষ্ট, অবাক চোখে মুখে নেমে এলো একটা ম্লানতার ছায়া। হাতের ঠুলিটা সহ, একবার গালে স্পর্শ করলো, তারপরে বললো, 'তুমি খুব ঘেমেছিলে, তাই না ? রুপাদের ছাদের কথা বলছি। আমার ঘাড়ে আর গালে তোমার ঘাম লেগেছিল, এখনো স্পস্ট টের পাই। এখন বলছি, আর এখনো সেই স্পর্শ শিরশির করছে, এই আমার অভিজ্ঞতা।'

ফুল্লরার চোখ কমলের চেখের ওপর। কমলের অবাক ম্লান চোখে অনুসন্ধিৎসা। ফুল্লরার মনে হলো, ওর বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে আসছে। এখন ওর মন চকিতেই উজানে ফিরেছে, আর তার একটা তীব্র টান ওর পাঁজরে লাগছে। ভ্রান্তি আর অপরাধবোধ আর স্মৃতি একসঙ্গে ওকে উজানে ঠেলে দিয়েছে। ও ঠোঁটে ঠোঁট টিপলো, বুঝতে পারছে, ওর চোখে জল আসছে।

'কেন রাগ করলে ?' কমলের স্বরে এখনো আহত বিস্ময়।

ফুল্লরা আর তাকিয়ে থাকতে পারলো না, কমলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে, মুখ নামালো। দৃষ্টি দ্রুত ঝাপসা হয়ে উঠছে। কমলের কোমরের কাছে স্পর্শিত ওর হাত নেমে গেল, কমলের কোলের কাছে জামার অংশ মুঠি পাকিয়ে ধরলো।

কমল ফুল্লরার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। ওর ঝকঝকে চোখের ওপর দিয়ে, কয়েকটা পর্দা যেন নিমেষে সরে যেতে লাগলো। সহজ হয়ে উঠলো আড়ষ্ট হাসি, ম্লান ছায়া কেটে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ওর জামা মুঠি করে ধরা ফুল্লরার হাত। পর মুহূর্তেই ও কেমন সচেতন হয়ে উঠলো, সোজা তাকালো কুমারের দিকে। কুমার তার অপলক দৃষ্টি ফেরাবার সময় পেলো না, খুব অপ্রস্তুত হয়ে উঠলো। কমল দু পাশ ঢাকা ঠুলিটা এঁটে নিল চোখে। কিছু না বলে, ওর ঠুলি চোখ ফুল্লরাকে আর একবার দেখে, আবার ফিরলো জামাধরা মুঠির দিকে। ওর হাত একবারের জন্য ফুল্লরার মুঠির দিকে নেমে আসতে গিয়ে থমকিয়ে গেল, সামনের আসনের পিছনের রডে রাখলো।

সময় বয়ে যেতে লাগলো। দু পাশের মাঠে, দূরের আবছা বনে গর্জন ছড়িয়ে দিয়ে, বাস ছুটছে। কোনে কোনো আসনে নানা কথার টুকরো। ফুল্লরার সান গ্লাসের ফ্রেমে জলের ফোঁটা ঠেকে আছে, এখনো মুখ তুলতে পারছে না। বিস্মৃতির পর্দা কমলের কথার ছুরিতে ফালা ফালা। অথচ ও মনে করেছিল, স্বাভাবিক

boiRboi.net

ভাবেই কমলকে ভুলে গিয়েছিল। কমলের অস্তিত্ব অবাস্তব হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা ধারণা আর বিশ্বাস, সামান্য কথাতেই কী রকম ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়। ওর মনে, অপরাধবোধ এখন একটা বিরাট লজ্জা হয়ে উঠছে আর কমলের মতোই ওর সারা গায়ে শিরশির করছে, আর সমস্ত মনটা আবেগে থরথর করছে। কমলকে এখন ও কী বলবে ?

'দু-এক মাস আগেও, এসব কথা এভাবে বলা আমার নিজের কাছেও খুব নিন্দনীয় ছিল।' কমল ওর সেই বিশিষ্ট নিচু স্বরে বললো, 'আসলে আমি জীবনের অনেক কিছুকেই মূল্যহীন বলে ধরে নিতে শিখেছিলাম। ইভ্যানজেলের মতো, পবিত্র সব বাণী। এরকম প্রটেস্টাণ্ট হবার কোনো অর্থ নেই। যতটা সম্ভব পুরোপুরি একটা মানুষ, কোনো বড় কাজ-টাজ করতে পারে, রক্ষা করা, হত্যা করা, সব কিছু বোধ হয় তারাই করতে পারে। আনকমন হবো বলে কেউ তা হতে পারে না, তাই না ? কমনসেন্স হচ্ছে গ্রেটার সেন্স, তাই তো, না কী ?'

ফুল্লরা কমলকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। কমল কথা বলছে। কেন বলছে, কী বলছে, ও কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না। ও ঠিক আগের মতো কথা বলছে। আগে ওর ভাবনা-চিন্তার কথা যেরকম বলতো, আর সব কথাতেই একটা জিজ্ঞাসা, অন্যের মতামতকে জানতে চাওয়া। ফুল্লরা ওর দিকে ফিরে তাকালো। কমল হাসছে, আর ওর চোখের কালো ঠুলিতে কেমন একটা কৌতুকের ঝিলিক। বললো, 'তোমার সানগ্লাস মোছ।'

ফুল্লরার মুখে আবার লজ্জার ছটা লেগে গেল। কমলের জামা মুঠি করে ধরা হাতটা তুলে, তাড়াতাড়ি সানগ্লাস খুললো। মুখ নামিয়ে, আঁচল দিয়ে চেপে চেপে চোখ মুছলো, আর চোখের কোল। কমল আসলে ওকে চোখ মুছতেই বলেছে, উচ্চারণ করেছে সানগ্লাস। তবু ও সানগ্লাসটাও মুছলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ তুলে, সহজভাবে তাকাতে পারলো না।

কমল আবার বললো, 'এসব কথা থাক। আসলে আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম জানো ?'

ফুল্লরা মুখ তুলে তাকালো। কমল হেসে বললো, 'তুমি যে তখন বলছিলে, আমি আমার অভিজ্ঞতার বিষয়ে মিথ্যা কথা বলছি, সেটা ঠিকই বলেছ। স্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতা আমার বেশ ভালোই আছে।'

ফুল্লরার ভুরু জোড়া অবাক জিজ্ঞাসায় একবার কেঁপে উঠলো। কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কমল বললো, 'শান্তিনিকেতনে বেলুদিদের বাড়িতে—'

ফুল্লরার মুখে গাঢ়-রক্তাভা ছড়িয়ে পড়লো। ও ভুল করে, প্রায় কমলের নাম ধরে ডেকে উঠতে যাচ্ছিল। কোনোরকমে উচ্চারণ করলো, 'যাহ্!' তারপরে মুখ নামিয়ে নিল। আর মনে হলো, ওর স্বেদাক্ত খোলা বুকে, কমলের তপ্ত গাল চেপে রাখা রয়েছে। ওর সারা গায়ে একটা শিহরণের তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগলো। এমন কী আশ্চর্য ব্যাপার, আর অবিশ্বাস্য। কমল এখনো সেই সব কথা মনে রেখেছে। ফুল্লরার ধারণা ছিল, ও নিজেই সব ভুলে গিয়েছে। অথচ উচ্চারণের অপেক্ষা মাত্র, সবই কেমন তীব্র বাস্তবতায় ওকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। ওর নিজের

boiRboi.net

কাছেও, জীবনের সেটা একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কিন্তু এসব কথা মনে রেখে ও বলেনি, কমল মিথ্যা কথা বলছে। কিংবা এসবই হয়তো ওর অবচেতনে ছিল, আর তা-ই খুব জোরের সঙ্গে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, কমল মিথ্যা কথা বলছে।

গাড়িটার গতি কি মন্থর হয়ে আসছে? তবু ফুল্লরা কোনো দিকে তাকিয়ে দেখলো না। শান্তিনিকেতনে, বেলুদির বাড়ির সেই আশ্চর্য অলৌকিক দুপুরের কথা, ওর সমস্ত স্মৃতি উদ্ভাসিত করে ভেসে উঠলো। রুপার জন্মদিনের এক মাস পরের ঘটনা সেটা। ছাদের সেই ঘটনার পরে, মাত্র কয়েকটা দিনই একটু হালকা হাসি ঠাট্টায় কেটেছিল। ফুল্লরা বিমান সম্পর্কে ওর মনোভাবের কথা কমলকে বলেছিল, খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছি, বিমানকে ও যা মনে করেছিল, তার কিছুই ওর মধ্যে ছিল না। ও জোর করে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, বিমানের মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ওর মনে যখন পূর্ণ মাত্রায় অবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, তখনো ও নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছে। কারণ, বিমানের ব্যর্থতা, অনেকটা যেন ওর নিজের পরাজয় বলে মনে হয়েছিল। ও যখন অনুভব করেছিল, বিমানকে ও ভালবাসে না, তখনো বিমানের সমস্ত ইচ্ছাকে ও মেটাতে দিয়েছে।'

কমল প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, পরিষ্কার হেসে বলেছিল, 'তোমার মুখ থেকে একথা শুনে, স্রেফ একটা স্টাণ্টের মতো লাগছে।'

'কিন্তু যা সত্যি, তাই তোমাকে বললাম।' ফুল্লরা বলেছিল, 'স্টাণ্ট তোমাকে না, আমি আমার নিজেকেই এতদিন স্টাণ্ট দিয়ে এসেছি। আসলে সবটাই ছিল আমার মনগড়া। ব্যাপারটা সব আমারই। এক ধরনের সেল্ফ-হিপনোটিজম্ বলতে পারো। বিমানের তাতে কোনো কিছুই ছিল না। ওর যা নেবার, ও তা নিচ্ছিল, বোধ হয় ভাবছিল, ও অনেক কিছু আমার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। আমরা মেয়েরাও তো তাই ভাবি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে গেলে, আর সেটাকে যদি প্রেম মনে করি। তার জন্য একটা ছেলেকে যা দিতে হয়, সেটাকে তো অনেক কিছু দেওয়াই বলে। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আর কিছুতেই মিথ্যাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। আর সেটাই তো ঘটলো রুপাদের ছাদে।'

কমল অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'অথচ, আমরা দোতলায় সবাই তোমাদের দুজনকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমাদের দুজনকে আমরা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। নেহাত রুপার মা দোতলায় এসে পড়েছিলেন বলে, আমি তোমাদের ডাকতে গিয়েছিলাম। রুপাই আমাকে চুপিচুপি তোমাদের ডেকে আনতে বলেছিল।'

'আর তুমি যদি তখন না যেতে, তাহলে একটা যাচ্ছেতাই ঘটনা ঘটে যেতো।' ফুল্লরা বলেছিল, 'বিমান ওর নিজের ভুল বুঝতে পারতো না, ভাবতো আমি লজ্জা পেয়েছি, আর ওর রাইট আছে ভেবে, একটা বিশ্রী কাণ্ড করতো।'

কমল কেমন উৎসুক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিশ্রী কাণ্ড কী ঘটতো?'

'কী ঘটতো না?' ফুল্লরা বলেছিল, 'ওকে আমার কামড়ে খিমচে দিতে হতো, আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে লুটোপুটি যেতো, আর আমার চিৎকারে রুপাদের

বাড়ির সবাই এসে পড়তো।'

কমল বলেছিল, 'অথচ আমি নিজেই কতোদিন দেখেছি, বিমানকে পেলে, তুমি আর কোনো দিকে ফিরে তাকাতে না। তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমরা সবাই এক কথা বলতাম, আর ভাবতাম, তোমাদের বিয়ে হবে। আর সেইজন্য তোমাকে আমরা সব সময় আলাদা চোখে দেখতাম।'

'তোমাদের কোনো দোষ ছিল না।' ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি নিজেকেই যে সেরকম ভাবতাম, তোমাদের আর কী উপায় ছিল।'

কমল হেসে বলেছিল, 'আশ্চর্য, তোমাদের সত্যি মিথ্যা কিছু বোঝবার উপায় নেই। এটা তো ভারি মুশকিলের কথা।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন ?'

'কেন নয় ?' কমল বলেছিল, 'অনেকদিন ধরে জানলাম, একটা মেয়ে আমাকে ভালবাসে, তারপরে হঠাৎ একদিন সে দাঁত বসিয়ে কামড়ে দিল।'

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'তা সেই মেয়েটাকে যদি তুমি বুঝতে না পারো, আগাগোড়াই ভুল করে যাও, হঠাৎ এরকম ঘটতে পারে। বিমানের তো ওসব বোঝাবুঝির কোনো দায়ই ছিল না।'

'তুমিও বুঝতে দাওনি।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'আর কী ভাবে বুঝতে দেওয়া যায় ? একটা মেয়ে আর কী ভাবে বুঝতে দিতে পারে ?'

'কিন্তু সেলফ-হিপনোটিজম ব্যাপারটা একটু এ্যাবনরমাল নয় কী ?' কমল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হতে পারে। কিন্তু সব সময়েই অবিশ্বাস ঠিক না। নিজেকে বোঝাবার দরকার হয়, আমি হয়তো ভুল করছি। আমি হয়তো বুঝতে পারছি না।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি খুব বোকা বনে গেছি।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে ?'

'তার মানে, ঠকে গেছি, তাই না ?' কমল ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'আমরা কেউ তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করিনি।'

ফুল্লরা হেসে উঠে বলেছিল, 'এখন থেকে করবে নাকি ?'

'তা একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী ?' কমল গম্ভীর স্বরে বলেছিল।

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠে, হাত তুলেছিল। কমল তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল। তখন তো সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই একটু প্রেম প্রেম খেলা ছিল। যদিও সে-সব সীরিয়াস কিছু না। কিন্তু খেলা, হাসি সব কিছু ছাড়িয়ে, কমলের অবস্থান বদলিয়ে গিয়েছিল। ফুল্লরা সম্যক কিছু বুঝে ওঠার আগেই, কমল খুব নিবিড় করে এগিয়ে আসছিল, আর ফুল্লরা তা প্রথম বুঝতে পেরেছিল, ওর প্রতি কমলের নিবিড় অনুসন্ধিৎসা থেকে। শান্তিনিকেতনে পূর্ব পল্লীতে বেলুদির বাড়ির এক অলৌকিক দুপুরে, এক নির্বাক নৈঃশব্দ্যে সেই অনুসন্ধিৎসা ফুটে উঠেছিল।

★

boiRboi.net

বেলুদি শ্যামলের দিদি। শ্যামল ফুল্লরাদের বন্ধু। ফুল্লরা যখন কমলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেলুদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল, তার মাত্র মাস ছয়েক আগে বেলুদি বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে চলে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা ফুল্লরাদের কাছে ছিল কিছুটা অবাক–চমক লাগানো। বেলুদি আর শিবতোষদা—বেলুদির স্বামী, দুজনে কলকাতার একই কো-এডুকেশান কলেজে পড়াতেন। বেলুদির একমাত্র সন্তান, একটি মেয়ে তখনো ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়তো। শ্যামলও বেলুদির প্রায় সন্তানের মতোই। বেলুদির দুই দাদা থাকতেও, পিতৃমাতৃহীন ভাইটির দায়িত্ব ছেলেবেলা থেকে তিনিই নিয়েছিলেন।

বেলুদির সঙ্গে ফুল্লরা আর ওদের গ্রুপের সব ছেলে ও মেয়ে বন্ধুদের যোগসূত্র শ্যামল। বেলুদির বাড়িতে শ্যামলের বন্ধুদের সকলেরই অবাধ গতি ছিল। সঙ্গে শ্যামল না থাকলেও, যাতায়াতের কোনো অসুবিধা ছিল না। ফুল্লরাদের মনে হতো, যে-কোনো সময়ই বেলুদি যেন ওদের পথ চেয়ে বসে আছেন। আসলে বেলুদি তাঁর অবকাশের যে-কোনো সময়েই ফুল্লরাদের সঙ্গে গান করে, গল্প করে কাটিয়ে দিতে ভালবাসতেন। শিবতোষদাও বাদ যেতেন না। বেলুদির মেয়ে চন্দনা তো নয়-ই। তবে হাসি হাসি মুখ, ভারি চেহারার শিবতোষদা কথাবার্তা কম বলতেন। অথচ মাঝে মাঝে এমন হাসির গল্প বলতেন, ভাবাই যেতো না, শিবতোষদার মতো লোকের ভিতরে এতো হাসি-উচ্ছল সরসতা আছে।

তুলনায় বেলুদি প্রচুর কথা বলতেন, অজস্র হাসতেন, তার মধ্যেই ছুটে ছুটে কাজও করতেন, কিন্তু এক এক সময় তাঁর হাসির মধ্যেই, কোথায় একটা গাম্ভীর্যের সুর ফুটে উঠতো, আর খুব সীরিয়াস কথা, খুব সহজভাবে বলতেন। তাঁর কিছু কিছু কথা এখনো ফুল্লরার কানে লেগে আছে। "তোমরা যে-যাই ইজম্ টিজম্ নিয়ে থাকো, আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু কোনো বিষয়েই এ্যাভারেজ না হওয়ার চেষ্টা করো। তা সে রাজনীতি করো, গান করো, কবিতা লেখ বা মাঠে ময়দানে খেলতে যাও। জীবনটা অনায়াসে বয়ে যাবে, এরকম ভাবাটাই ভুল।"…"যার বিশ্বাস নেই, তার কিছুই নেই। ঈশ্বরে হোক, অথবা নিরীশ্বর বস্তুবাদী হও, হিংসা-অহিংসা, যাই বলো, বিশ্বাস একটা থাকা চাই।" …"উদ্দেশ্যহীন লেখাপড়া করার থেকে না-করা অনেক ভালো। আর উদ্দেশ্য যদি কেবল শিক্ষা না হয়ে চাকরির জন্য হয়, তা হলে চুরি না করে উপায় নেই। ওটা একটা ঘৃণ্য ব্যাপার। নামেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ানো, আসলে অশিক্ষিত সাধারণ অদক্ষ মজুর ছাড়া ওরা কিছুই নয়।"…"রাজনীতি করা আর মানব-দরদী হওয়া এক কথা নয়।"

বেলুদি নানা কথাপ্রসঙ্গেই এই ধরনের কথা বলতেন। বিশেষ ভাবে ভেবে চিন্তা করে কিছু বলতেন না। কথাগুলো ফুল্লরার মনে থাকার কি কারণ? বেলুদির কোনো কথাই কি ওর জীবনে কাজে লেগেছে? বুঝতে পারে না! কিন্তু একটা বিষয় ও বুঝতে পারতো। বেলুদি ছিলেন ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী, আর একেবারে বিপরীত ছিল শ্যামল। ওর কোনো রকম ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। ফলে, বেলুদির সঙ্গে সব থেকে বেশি তর্ক লাগতো শ্যামলেরই। শিবতোষদাকে ঠিক

মতো বোঝা যেতো না। কারণ তিনি কখনো তর্কে যোগ দিতেন না।

বেলুদি পড়াশোনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ছুটি-ছাটায় প্রায়ই বেলুদি আর শিবতোষদা, চন্দনাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যেতেন। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের বিশেষ কয়েকটি উৎসবে তো যেতেনই। ব্যতিক্রম ছিল শ্যামল। ওর শান্তিনিকেতনের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। অথচ ফুল্লরা ছাড়া, ওদের বন্ধুরা সকলেই কোনো না কোনো উপলক্ষে, দু একবার অন্ততঃ বেলুদির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছে। শ্যামলের মতো কোনো বিরাগ ওর ছিল না। নিতান্তই কোনো না কোনো কারণে বাধা পড়েছে, যাওয়া হয়নি, আর বন্ধুদের কাছে শান্তিনিকেতনের গল্প শুনে, ওর মন খুব খারাপ হয়ে যেতো।

বেলুদির বাবা শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে একটি বাড়ি করেছিলেন। বিশ্বভারতীর কাজকর্মের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিপত্নীক ভদ্রলোক রবীন্দ্র-প্রেমিক ছিলেন, শান্তিনিকেতনকে ভালবাসতেন। সরকারি পদস্থ চাকরি থেকে অবসরের পর, শান্তিনিকেতনে বাড়ি করে, বাকি জীবনটা কাটিয়েছিলেন। নিজেদের বাড়ি থাকাতেই বেলুদিদের যখন তখন যাওয়ার সুবিধা ছিল। বাড়িটা কখনো ভাড়া দেওয়া হয়নি।

কিন্তু কলকাতা কলেজের চাকরি ছেড়ে, বেলুদির শান্তিনিকেতনের চাকরির চেষ্টা বা সিদ্ধান্ত কবে কী ভাবে নেওয়া হয়েছিল, ফুল্লরারা কিছুই জানতে পারে নি। শ্যামলও ওদের কিছু বলেনি। কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। কারণ শিবতোষদা শ্যামলকে নিয়ে থাকবেন কলকাতায়, আর বেলুদি চন্দনাকে নিয়ে থাকবেন শান্তিনিকেতনে। ভেবেই ফুল্লরার মনে অস্বস্তি হয়েছিল। অস্বস্তি হয়েছিল, ওদের সব বন্ধুদেরই। গোলমালের সন্দেহটা বাড়িয়ে দিয়েছিল শ্যামলই, বন্ধুদের কাছে বিষয়টি নিয়ে একটি কথাও না বলে। শ্যামল এমন একটা ভাব করেছিল, যেন ও কিছুই জানে না। বলবার মতো ঘটেনি কিছুই। যেন খুবই একটা সহজ ব্যাপার।

বেলুদিও অবিশ্যি সেইরকম ভাবই দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মতো হেসে বলেছিলেন, 'পাথরপুরী কলকাতা ছেড়ে এবার শান্তিনিকেতনে। সেখানে তোমাদের রোজ নিমন্ত্রণ। যেদিন খুশি, যখন খুশি, যতোজন খুশি। ঠিক কলকাতার মতোই। চোখের বাইরে চলে গেলেই যেন, বেলুদি তোমাদের মনের বাইরে না চলে যায়।' শেষের কথাটা বলার সময় কি বেলুদির গলা একটু ধরে এসেছিল? বোধহয়। কিংবা ফুল্লরার নিজেরই গলার কাছে কিছু ঠেকে গিয়েছিল। আশ্চর্য, শিবতোষদাও তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তোমাদের শিবতোষদাকে যেন তা বলে একেবারে নির্বাসন দিও না। তোমাদের দেবার মতো আমার ভাণ্ডারেও কিছু আছে।'

বেলুদি খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'সত্যি, আমি একটু একচোখোমি করে ফেললাম। এ বাড়িটাই তো আদি। অবিশ্যি শ্যামল থাকছে কলকাতায়, ওর সঙ্গে তো তোমরা এ বাড়িতে আসবেই। আমি একটু দূরে চলে যাচ্ছি বলেই বললাম।'

শ্যামল সামনে থেকেও, দিদি ভগ্নিপতির কথায় কোনোরকম মন্তব্য করেনি।

boiRboi.net

বেলুদি আর শিবতোষদার হাসি, কথাবার্তায় বোঝা-ই যায়নি, দুজনের মধ্যে কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। অবিশ্যি লোক-দেখানো প্রেমে ডগমগ দম্পতি তাঁরা কোনোকালেই ছিলেন না। কিন্তু একজনের কম কথা, আর একজনের অনেক, একজনের স্বল্প হাসি, আর একজনের কম কলকলানো, একজনের দৃষ্টি অচঞ্চল গভীর, আর একজনের বিদ্যুৎবিচ্ছুরিত চঞ্চল, যদিও অগভীর বলা যাবে না কোনো মতেই, তাঁদের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল – যাকে বলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, সেটা পরিষ্কার বোঝা যেতো। তাঁদের ছাড়া-ছাড়ির দিনেও বিপরীত কিছু বোঝা যায়নি। ফুল্লরার কাছে সেটাই এক অবাক-জিজ্ঞাসা।

সেই থেকেই, ফুল্লরাদের কখনো দল বেঁধে, কখনো জোড়ায় বা একা শান্তিনিকেতনে বেলুদির বাড়ি যাওয়ার শুরু। ফুল্লরা কখনো দলের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেনি। একবারই গিয়েছিল, কমলের সঙ্গে। গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে, কমল হঠাৎ প্রস্তাবটা তুলেছিল, 'চলো ফুল্লরা, বেলুদির ওখানে দুটো দেন ঘুরে আসি। সকলেরই কয়েক দফা করে যাওয়া-আসা হয়ে গেল, তোমার আর আমারই হয়নি।'

ফুল্লরা এক কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল। ও জানতো, গ্রীষ্মের ছুটিতে ওকে দেশের বাড়িতে যেতে হবে। অবিশ্যি, দিদি আর কুমারদার অনুমতির দরকার ছিল। দিদির থেকে কুমারদা-ই একটু বেশি সাবধানী। তবু অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। ওদের দুজনকে দেখে, বেলুদিও খুব খুশি হয়েছিলেন। চন্দনা এক পাক নেচে নিয়েছিল।

বেলুদি আর চন্দনা ছাড়া, বাড়িতে ছিল এক সাঁওতাল দম্পতি। বাড়ির পিছন দিকে তাদের দেড়খানি মাটির ঘরের সংসার ছিল। তারাই বেলুদির বাড়ি, এমনকি ঘরকন্নাও দেখাশোনা করতো। বেলুদি একবার সকালে, আর একবার ঘোর দুপুরে পড়াতে যেতেন। চন্দনার এগারোটায় ছুটি হয়ে যেতো। বেলুদি বিকালে ফিরে এলেই আসর জমতো। গল্পের আসর, বেড়াতে যাবার উন্মাদনা। দুটো দিন কেটেছিল, নতুন প্রকৃতির দুরস্পর্শী গভীরতায়, ঝর্নার মতো কলকল বেগে।

ফুল্লরা আর কমল দুদিন ছিল। তৃতীয় দিন ভোরের ট্রেনে ফিরে এসেছিল। কলকাতায়। কমলের নিবিড় করে এগিয়ে আসাটা অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, ফিরে আসার দিন দুপুরে। ইংরেজী মতে সেটা হয়তো অপরাহ্ণ। কিন্তু আসলে পূর্বপল্লীর বৈশাখের বেলা তখন তিনটা। সবুজ আর রক্তাভ রঙের সেই সময়টাকেই বোধহয় নিদাঘ দুপুর বলা যায়।

সেই নিদাঘ দুপুরের কি কোনো মায়া আছে? বন্ধ দরজাজানালার ওপর মোটা পর্দা, প্রায় অন্ধকার ঘরের মাথার ওপরে দুরন্ত বেগে ঘুরছিল সিলিং ফ্যানটা। খাটের বিছানায় ফুল্লরার পাশে শুয়ে চন্দনা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। পাখা জোরেই ঘুরছিল, তবু চন্দনার গলায় আর চিবুকে ঘাম চিকচিক করছিল। ঘামছিল ফুল্লরাও। ঘরের ভিতর বাতাসেও উত্তাপ ছিল। বাইরেও একটা ঝোড়ো বাতাসের দাপাদাপি চলছিল। বন্ধ জানালায় মাঝে মাঝে তার ঝাপটা লাগছিল। যেন

boiRboi.net

দুপুরের রাঢ়ের পাগলা বাতাস ঘরে ঢুকতে চাইছিল। পাশের ঘরে কমল কি করছে? ফুল্লরার মনে কেমন অকারণেই প্রশ্নটা জেগেছিল। আগের দিন দুপুরেও কমল, একই ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর পেতে পাখার নিচে শুয়েছিল। কমলকে সেই প্রথম ফুল্লরা খালি গায়ে দেখেছিল। রাঢ়ের শুষ্ক উত্তাপেও আর্দ্রতা ছিল। কমলও ঘেমেছিল, আর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেই ঘামের স্রোত যেন কলকলিয়ে বহে।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন কমল এক ঘরে ছিল না। পাশের ঘরে ছিল। কেন, কী করেছিল কমল? ঘুমন্ত ঘর্মাক্ত চন্দনার পাশে নিজের ঘর্মাক্ত অথচ জাগ্রত অবস্থায় জিজ্ঞাসাটা মনে এসেছিল। কমল কি কিছু পড়াশুনা করছিল? দারুণ দুপুরে, ও কি পাশের ঘরের জানালাগুলো খুলে ঘুমোচ্ছিল? কেনই বা জিজ্ঞাসাটা মনে এসেছিল? একান্তই একাকীত্বের জন্য, না কি কমলের অভাববোধ? অথবা নিতান্তই রাঢ়ের সেই দারুণ তাপদগ্ধ ঝটিকা-প্রমত্ত দুপুরের মায়া।

মনে জিজ্ঞাসার মুহূর্তেই, পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গিয়েছিল। সামান্য শব্দেই ফুল্লরা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। আবছা অন্ধকারে, দরজার মাঝখানে, পায়জামা পরা খালি গা কমলকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। ফুল্লরা মাথাটা তুলেছিল। কমলের নিচু স্বর শোনা গিয়েছিল, 'ঘুমোচ্ছিলে নাকি?'

ফুল্লরা উঠে বসেছিল। বুকের এলানো আঁচলটা টেনে দিয়ে, একবার ঘুমন্ত চন্দনাকে দেখে বলেছিল, 'না'। কিছু বলছো?'

'চন্দনা ঘুমোচ্ছো?' কমল জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হ্যাঁ। কিছু বলছো?'

কমল যেন ভেবে পাচ্ছিল না, কি জবাব দেবে! কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, অস্ফুট উচ্চারণে বলেছিল, 'না।' বলেই পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

ফুল্লরা বসে থাকতে পারেনি। কমল 'না' অথবা 'হ্যাঁ' কি বলেছিল, বুঝতে পারেনি, অথবা কি একটা অমোঘ শক্তি যেন ওকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য! পাশের ঘরে ঠিক মাঝখানে, কমল ভূতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়েছিল। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। সেই আবছা অন্ধকারেও কমলের সারা গা ঘামে চকচক করছিল। ওর চুল লুটিয়ে পড়েছিল কপালে। মাথার ওপরে ঘুরন্ত পাখার বাতাসেও মাথার চুলগুলো উড়ছিল। ঘামে চকচকে শরীরের মতোই, ওর চোখ দুটোও যেন চকচক করছিল, অবাক অপ্রস্তুত চোখে ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'উঠে এলে?'

ফুল্লরা জবাব দিয়েছিল, 'তুমি কী বলে এলে, বুঝতে পারলাম না।'

'দেখতে গেছলাম, তুমি ঘুমোচ্ছ কী না।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, 'বললাম তো ঘুমোইনি। তুমি আজ ও ঘরে গেলে না কেন? কি করছিলে এ ঘরে, একলা-একলা?'

'কি আবার করবো?' কমল হেসে উঠেছিল। 'আমিও ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম।'

ফুল্লরার মনে হয়েছিল, কমল যেন স্বাভাবিক নেই। ওর কি জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল? ফুল্লরা ওর গায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি কল্‌কল্‌

boiRboi.net

করে ঘামছো।'

'তোমার মুখেও ঘাম।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের গলা আর মুখ মুছতে মুছতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঘামছি তো। এত জোরে পাখা চালিয়েও ঘামছি। আমি ভেবেছিলাম এখানকার গরমে ঘাম হয় না। তুমি তো যেন চান করে উঠেছো। তোমাকে মুছিয়ে দেবো?'

'মুছিয়ে দেবে?' কমল এমনভাবে বলেছিল, যেন জিজ্ঞাসা না, স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

কমলের গায়ের দিকে তাকিয়ে ফুল্লরা যেন নিজের ভিতরে কেমন একটা অস্থির-ব্যগ্রতা অনুভব করছিল, বলেছিল, 'হ্যাঁ মুছিয়ে দিই।' বলে ও আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'দেবো, আমার আঁচল দিয়ে?'

কমল কিছু না বলে, ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ফুল্লরা কমলের গায়ে আঁচল চেপে চেপে ঘাম মুছিয়ে দিয়েছিল, আর কমল যেন এলিয়ে পড়ছিল। ফুল্লরা বলেছিল, 'আরে, শক্ত হয়ে দাঁড়াও না।'

কমল তখন ফুল্লরার কাঁধে হাত দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফুল্লরাও তখন কমলের ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলেছিল, আমারই ভুল। ধরে না মোছালে, মোছানো যায় না। উহ, তোমার নিশ্বাস কী গরম!'

'তোমারও।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'কিন্তু তোমার গা-টা ভারি ঠাণ্ডা।'

'তোমারও।' কমল আবার বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। কমলের চোখে যেন হাজারটা অবাক জিজ্ঞাসা। ফুল্লরা বলেছিল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

'আমার?' কমল ঢোঁক গিলে, বোকার মতো হেসেছিল, বলেছিল, 'এ ঘরে একলা থাকতে থাকতে, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

হঠাৎ ঢেউয়ের মতো, ফুল্লরার বুকের পাড়ে যেন একটা ঝাপটা লেগেছিল। চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বিভ্রান্তি ওর মনে। বন্ধ ঘরের মধ্যেও বাইরের ঝোড়ো বাতাসের শব্দ ভেসে আসছিল। কমল আবার বলে উঠেছিল, যেন একটা ঘোরের মধ্যেই, 'আমি ভাবছিলাম, রূপাদের বাড়ির ছাদে বিমান তোমাকে কী করতে চেয়েছিল?'

ফুল্লরার বাঁ হাতটা কমলের ঘাড় থেকে খসে পড়েছিল, সন্দিগ্ধ স্খলিত স্বরে বলেছিল, 'কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছো? বিমান তো খুব জঘন্য। নোংরামি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি—।'

কমল তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারেনি। ফুল্লরা দু'পা সরে গিয়েছিল। আর ওর কাঁধ থেকে কমলের হাতটাও খসে পড়েছিল। ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন তুমি একথা জিজ্ঞেস করছো?'

'জানি নে।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি বোঝ না, বিমান কী করতে চেয়েছিল?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, একরকম বুঝতে পারি।' কমল ওর সেই ঘোর লাগা স্বরেই বলেছিল।

ফুল্লরা যেন সন্দেহ আর বিস্ময়ে মরে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবু জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'কী জানি। কমল অকপট আবেগের স্বরে বলেছিল, 'ঘটনাটা আমার মনে পড়েছিল। আর তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেই ঘটনা মনে পড়েছিল বলে, আমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়াও দেখতে ইচ্ছে করছিল।' কমল মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল, সরে গিয়েছিল বিপরীত দিকে, বুক সেল্‌ফের কাছে, আর মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমার দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছো। তুমি কি আমাকে বিমানের মতো ভাবছো নাকি?'

ফুল্লরার বুকের পাড়ে আবার একটা ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা লেগেছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিস্ময়কর, কমলকে ভীষণ দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। মনে মনে কেমন একটা অন্যায়বোধও জেগে উঠেছিল, বলেছিল, 'না না, তোমাকে বিমানের মতো ভাববো কেন?'

কমল কোনো জবাব দেয়নি। ফুল্লরা আস্তে আস্তে কমলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমল তাকিয়েছিল ওর চোখের দিকে। অভিমানী আর ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছিল কমলকে। ছেলেমানুষ! ফুল্লরা নিজে কি খুব একটা বড় মানুষ ছিল নাকি? এখন ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু মেয়েরা কোনো কোনো বিষয়ে, ছেলেদের থেকে সব সময়েই বেশি অভিজ্ঞ। তথাপি কমলকে সেই সময়ে, পূর্বপল্লীর সেই দুপুরে দুর্বোধ্য লেগেছিল। বলেছিল, 'তোমাকে—তোমার কথা বুঝতে পারছি না। সেটা কি আমার দোষ?'

'আমিও বুঝতে পারছি না।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাকে? আমাকে?'

কমল মাথা নেড়ে হেসে বলেছিল, 'না, আমাকে।'

ফুল্লরা আরও অবাক হয়েছিল। কমলের হাসি, কথা, সবই যেন ঠাট্টার মতো শুনিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, তার মানে কি?'

'আমিও জানি না, বিশ্বাস কর।' কমলের স্বরে যেন কাতরতা ফুটে উঠেছিল, 'আমিও জানি না, কেন আমার ওরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি সত্যি বলছি।'

ফুল্লরার চোখে গভীর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। ও তাকিয়েছিল কমলের চোখের দিকে। কমল তখন অদ্ভুতভাবে মাথা নেড়ে হাসছিল, আর বারে বারে বলছিল, 'সত্যি, কী আশ্চর্য, কেন আমার ওরকম মনে হচ্ছিল. আমি বুঝতে পারছি না।'

ফুল্লরা কমলকে চিনতো, আর ও যে অকপট সরলভাবে কথাগুলো বলছিল, কোনো সন্দেহ নেই। ফুল্লরারও হাসি পেয়েছিল, বলেছিল 'কমল, তোমাকে পাগলের মতো লাগছে।'

কমল হোহো করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'আমার নিজেরও তাই মনে

boiRboi.net

হচ্ছে। আমি পাগল, পাগল ছাড়া কিছুই নই।'

ফুল্লরা দেখেছিল, কমল আবার ঘামছে। ও নিজেও ঘামছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর এখনো কি আমাকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে তো।' কমল অকপট আবেগে বলেছিল, 'এ ঘরে একলা একলা তোমার কথাই খালি আমার মনে পড়ছিল। তারপরে হঠাৎ সেই ছাদের কথা মনে পড়ে গেল, আর ভাবলাম, বিমান তোমাকে কি করতে চেয়েছিল? যেই মনে পড়লো, অমনি তোমাকে যেন আর না দেখে থাকতে পারলাম না। আমি জানি না ফুল্লরা, সত্যি আমি জানি না, কেন আমার এরকম মনে হলো।'

ফুল্লরা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেনি, কমলের চোখের দিকেই তাকিয়েছিল, আর ওর বুকের পাড়ে যেন কমলের কথার সঙ্গে সঙ্গে বারে বারেই ঢেউয়ের ঝাপটা ছপাৎ ছপাৎ করে আছড়ে পড়ছিল। ওর রমণী চৈতন্যের কোন্ এক সুদূর অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎ ঝলক খেলে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ নিষ্পাপ পুরুষের আবেগ, আগ্রহ, কৌতূহলও আত্মপ্রকাশের এক আশ্চর্য বিপরীত রূপকে যেন ও কমলের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখেছিল, আর ও যেন লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

'ফুল্লরা!' কমল ডেকেছিল।

ফুল্লরা চোখ তুলে কমলের দিকে তাকিয়েছিল। লজ্জা আর আবেগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল ওর মনে। বলেছিল, 'তুমি খুব ঘামছো আবার, এসো মুছিয়ে দিই।'

'না, আমি তোমাকে মুছিয়ে দিই।' কমল ফুল্লরার আঁচলটা টেনে নিয়ে বলেছিল, 'তুমি আমার থেকে বেশি ঘামছো।' ও ফুল্লরার গলায় আর চিবুকে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল।

ফুল্লরা হেসে উঠেছিল, আঁচলটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, 'না না, আমাকে মোছাতে হবে না। আমি তোমাকে মুছিয়ে দিই।' ও কমলের গায়ে আঁচল চেপে ধরেছিল।

কমল আবার আঁচলটা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ফুল্লরা আঁচলটা তৎক্ষণাৎ কেড়ে নিয়েছিল। তারপর কেবলই আঁচল কাড়াকাড়ি আর হাসাহাসি, এবং হঠাৎ ফুল্লরা থেমে গিয়ে ডেকে উঠেছিল, 'কমল!'

কমল তাকিয়েছিল ফুল্লরার মুখের দিকে, চোখ রেখেছিল চোখে। কী ছিল ফুল্লরার চোখে? কমল হঠাৎ নিচু হয়ে, ফুল্লরার গালে ঠোঁট দিয়ে একবার হাল্কা স্পর্শ করেই, ছুটে গিয়েছিল দরজার কাছে। দ্রুত হাতে ছিটকিনি খুলতেই, যেন এক ঝলক চোখ-ধাঁধানো আগুন, দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কমল ছিটকে বাইরে গিয়ে, দৌড়ে চলে গিয়েছিল। ফুল্লরা স্থির থাকতে পারে নি। ও ছুটে দরজার কাছে গিয়েছিল। বাইরে চোখ ঝলসানো রোদ আর বাতাসের ঝাপটায় বাগানের গাছপালাগুলো যেন পাগলের মতো মাতামাতি করছিল। ফুল্লরার মনে হয়েছিল, বাতাসের তপ্ত হলকায় গা পুড়ে যাবে। ও ডেকেছিল, 'কমল'।

কমলকে দেখা যাচ্ছিল না। ফুল্লরা গেটের দিকে তাকিয়েছিল। গেট বন্ধ ছিল। ফুল্লরা মাথা ঢাকা বারান্দার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে, বাগানের চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে, ঝাড়ালো কামিনী গাছের আড়ালে, কমলের পায়জামার অংশ দেখা গিয়েছিল। ফুল্লরা ছুটে গিয়েছিল সেখানে। কমল চমকিয়ে

boiRboi.net

তাকিয়েছিল। ফুল্লরার চোখে তখন উদ্বেগ, ও নিজের মাথায় ঘোমটা ঢাকা দিয়ে বলেছিল, 'বেলুদির কথা ভুলে গেলে ? এ হাওয়াটা একদম গায়ে লাগাতে নেই।'

'হ্যাঁ, এ বাতাসকে লু বলে।' কমল বলেছিল, 'একটুখানি লাগলে কী হবে ?'

ফুল্লরা বলেছিল, 'একটুও না। শীগ্গির ঘরে চলো।'

'তুমি তো রাগ করেছো।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হ্যাঁ করেছি। এখন ঘরে চলো।'

'না, তুমি রাগ করলে ঘরে যাবো কেমন করে ?' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের চুলের ঝুঁটি মুঠি করে ধরেছিল, টানতে টানতে বলেছিল, 'এমনি করে।'

'উহ্ লাগছে', ফুল্লরার সঙ্গে চলতে চলতে কমল বলেছিল।

ফুল্লরা না থেমে, কমলের চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, 'লাগুক।' একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ফুল্লরা কমলের চুলের মুঠি ছেড়েছিল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করেছিল। তারপরেই কমলের দিকে ফিরে হাত তুলে মারতে উদ্যত হয়েছিল।

কমল চকিতে ফুল্লরার হাতটা ধরে ফেলে বলেছিল, 'আরে, আর মেরো না। এখনো চুলে ব্যথা করছে।'

'করুক, তবু মারবো।' ফুল্লরা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলেছিল।

কমল ফুল্লরার হাত ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বলেছিল, 'মারো তবে।'

'মারবোই তো।' ফুল্লরা কমলের ঘাড় চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, 'কেন কেন কেন ?'

কমল পাগলের মতো হেসে বলেছিল, 'একে মার বলে নাকি ?'

ফুল্লরা কমলের ঘাড় থেকে হাত তুলে, ওর গালে আস্তে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিল, 'হয়েছে তো ?'

'এইটুকু ?' কমল বলেছিল, এবং আর একটি গাল পেতে দিয়েছিল।

ফুল্লরা মারবার জন্য হাত তুলেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল, 'তুমি ভারি পাজী।' ওর স্বেদাক্ত বোতাম খোলা বুকে কমলের মুখটা চেপে ধরেছিল।

দরজার বাইরে খট্ খট্ শব্দ শোনা গিয়েছিল, আর বেলুদির স্বর, 'দরজা খোল্‌রে, বাইরে আর দাঁড়াতে পারছি না।'

ফুল্লরা ছিটকে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।…

সেই থেকে আট মাস, কমলের সঙ্গে জীবনটা প্রতিদিনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বিমানের সঙ্গে মেলামেশার পুনরাবৃত্তি না। কমলের কোনো ছদ্মবেশ ছিল না। কেবল কিছু আদায় করে নেবার দাবী ছিল না কমলের। কমল কি ওর প্রেমিক ছিল ? প্রেমিকের সংজ্ঞা কী ? ফুল্লরা জানে না। কমল ছিল প্রিয়তম সখা, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

★

'আমরা দুটো স্টেট পার হয়ে এসেছি।' কমলের সেই অদ্ভুত নিচু স্বরে ফুল্লরা

boiRboi.net

চমকিয়ে উঠলো। কমল আবার বললো, 'আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বিহার ক্রস করে উড়িষ্যায় পড়েছি। তুমি সুবর্ণরেখার ব্রিজ দেখলে না। বারিপদা ছাড়িয়ে আমরা এখন বালেশ্বরের পথে।'

ফুল্লরা যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠে বললো, 'আশ্চর্য, কিছু খেয়াল করিনি তো।'

'সেটাই লক্ষ্য করছিলাম।' কমলের কালো ঠুলিতে কৌতুকের ঝিলিক, 'দু একবার চেষ্টা করে দেখেছি, তোমার ধ্যান ভাঙাতে পারিনি।'

'ধ্যান ?'

'নয় ? তোমাকে তোমার দিদির ছেলেও দু'একবার ডেকেছিল।'

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে তাকালো। বুবাই এখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে। দিদিও। ফুল্লরা মুখ ফেরাতেই কুমারদার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো। কুমারদার ঠোঁটের কোণে কি হাসি ? ও ডান দিকে একটু ঝুঁকে কুমারকে জিজ্ঞেস করলো, 'স্টপেজগুলোতে নামেননি ?'

কুমার বললো, 'না। বালেশ্বরে নেমে খাবো। তোমার নামবার ইচ্ছে ছিল নাকি ?'

ওদের কথা শুনে অনু ফিরে তাকালো, মুখে জিজ্ঞাসু হাসি। কুমারদার কথায় ঠাট্টার বক্রতা। ফুল্লরা বললো, 'না, আমার নামবার দরকার ছিল না।' ফিরে তাকালো কমলের দিকে, 'তোমার জন্যই এরকম হলো।'

'কী রকম ?' কমলের স্বরে বিস্ময়।

ফুল্লরা বললো, 'কী সব বাজে বাজে কথা বলছিলে, আর সে-সব মনে পড়ছিল।'

কমলের কালো ঠুলিতে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাসি ওর গোঁফ দাড়ির ভাঁজেও। বললো, 'সেই স্বেদাক্ত রমণীর —।'

'চুপ করো।' ফুল্লরা ঠোঁটে চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিয়েই যেন প্রায় নিচু স্বরে ধমকিয়ে উঠলো।

'তুমি সবটাই ভুল বলেছো। আমার মনে হয়, তুমি কামু-র "দ্য সাইলেণ্ট ম্যান" থেকে কিছু বলতে চেয়েছিলে, তাই না ?'

কমলের ঠুলির বাইরে, কপালের বাঁ দিকে মোটা ভুরু খোঁচা হয়ে উঠলো। হঠাৎ কিছু বলতো না। কয়েক মুহূর্ত পরেই হেসে বললো, 'আশ্চর্য, ঠিক বলেছো তো।'

'কিন্তু সোয়েট ওম্যানের কথা কোথাও লেখা আছে বলে আমার মনে পড়ছে না।' ফুল্লরা বললো, 'ওটা বোধ হয় তোমার মনগড়া।'

কমল সহজেই মেনে নিল, 'তা হতে পারে। কোন্ জায়গাটার কথা বলছি, তুমি বুঝতে পারছো ?'

'বোধহয়।' ফুল্লরা বলতো, 'যেখানে অতীতের স্বপ্ন, "গভীর স্বচ্ছ জল, উজ্জ্বল উষ্ণ রোদ, সুন্দরী যুবতী মেয়ে, সতত কর্মচাঞ্চল্য, এ ছাড়া সুখ বলতে কিছু আর ছিল না দেশে।"...কিন্তু এ তো সেই ডস্টয়েভস্কির প্রতিধ্বনি, যৌবন চল্লিশেই শেষ, তারপরে যারা বেঁচে থাকতে চায়, তারা মূর্খ আর অপদার্থ। তুমি কি

boiRboi.net

হতাশায় ভুগছো ?'

'কেন বলো তো ?'

'এসব কথা তোমার মনে আসছে কেন ?'

'কারণ আমাদের সমস্ত জীবনটাই অস্বাভাবিক।'

'আদৌ নয়। কামু নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু ডস্টয়েভস্কি জানতেন না, আধুনিক বিজ্ঞান, মানুষকে দীর্ঘজীবী করবে, অতএব তাদের যৌবনও দীর্ঘস্থায়ী হবে।'

কমলের কালো ঠুলিতে আর দাড়ি গোঁফের ভাঁজে হাসির ঝিলিক ফুটলো, বললো, 'আধুনিককালের সঙ্গে এখানেই আমার গোলমাল লেগে যাচ্ছে। তোমাদের এই বিজ্ঞান আর টেকনোলজি, সবই আমার কাছে কানাগলি ছাড়া কিছু নয়।'

ফুল্লরা ঘাড় কাত করে, ওর স্বচ্ছ রঙীন কাঁচের ভিতরে চোখ জোড়া নিবিড় করে, প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'তোমার কথায় যেন রিঅ্যাকশনারির সুর শুনতে পাচ্ছি।'

'কারণ রিঅ্যাকশনারিদের সম্পর্কে তোমার কোনো বাস্তব ধারণা নেই।' কমল বললো, 'সেইজন্যই ওরকম শুনতে পাচ্ছো। ধনতন্ত্রই বলো, আর সমাজতন্ত্রই বলো, সবখানে জেরণ্টোক্রাসির দৌরাত্ম্যে তো আর টেকা যাচ্ছে না।'

'জেরণ্টোক্রাসি মানে ? বৃদ্ধতন্ত্র ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আজকাল নতুন করে ভাবছো দেখছি। কিন্তু সমাজতন্ত্রেও জেরণ্টোক্রাসির দৌরাত্ম্য ?'

'আমি তো তাই দেখছি, সব সমাজেই বিজ্ঞান আর টেকনোলজির দাসত্ব। আর আমাদের দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ছাঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দসিকে। গোলামের গোলাম। সমাজ চেতনার চেহারাটা কতো তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে, সেটা আমরা ধরতেই পারছি না। এই বিজ্ঞান আর টেকনোলজির দাসত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।' কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ যেন কমল সচকিত হয়ে ওর আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু ওর মুখে এখন আর সেই কৌতুকের হাসি নেই। অথচ ও না থেমে আবার বললো, 'যে-কোনো অস্বাভাবিকতাই আজ আমাদের পথের অন্তরায়। সেইজন্যই কামু বা ডস্টয়েভস্কিকে আমার মোটেই অতীত স্বপ্নবিলাসী মনে হয় না।'

ফুল্লরা মনে মনে ভীষণ অবাক হচ্ছিল। মাথা ঝুঁকিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মত বদলেছো ?'

'কখনোই না।'

'পথ ?'

'একটা নির্দিষ্ট মত থাকলে, পথ সব সময়েই বদলাতে পারে। কিন্তু বৈপ্লবিক শঠতারও একটা সীমা আছে।'

কমলের কথা শেষ হবার আগেই, ফুল্লরা ওর হাঁটুর ওপরে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল, 'আস্তে, অনেক কথা বলে ফেলছো।'

ঠিক এ সময়েই বাসের গতি কমে এলো, আর কণ্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, 'বালেশ্বর। পৌনে এক ঘণ্টা স্টপেজ।'

boiRboi.net

বাসের ভিতরে নানা স্বরে নানা কথা শোনা গেল। যাত্রীরা সকলেই যেন কণ্ডাক্টরের এই ঘোষণাটির অপেক্ষা করছিল। কুমার বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'ফুলু, এবার বাঙালী মতে লাঞ্চটা সেরে নিতে হবে।'

বাস দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই, যাত্রীরা অনেকে উঠে দাঁড়ালো। তাদের নামবার ব্যস্ততার সঙ্গেই, বাইরে নানান স্বরে চিৎকার ভেসে এলো, 'গরম ভাত ডাল ভাজা তরকারি মুড়িঘণ্ট মাছের ঝোল।' কষা মাংস রুটি ভাত তরকারির চিৎকারও শোনা গেল।

'খুব খিদে পেয়েছে।' কমল বললো, 'পেট ভরে ভাত খেতে হবে।'

ফুল্লরার হাসি পেল, কিন্তু মনের কোথায় একটা কণ্টও বিঁধে গেল। সকাল বেলা কমলের কাঁচা পাঁউরুটি খাওয়ার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বললো, 'মনে হচ্ছে, অনেকদিন খাওনি।'

কমল হাসলো, 'খেয়েছি। অনেকটা তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো বলতে পারো। যখন সময় সুযোগ পাওয়া গেছে। অবিশ্যি সময় সুযোগের সঙ্গে খাবারটাও।' এ কথাগুলো নিচু গলায় বললো।

'ফুলু, আয়।' অনুর ডাক শোনা গেল।

ফুল্লরা ফিরে তাকাবার আগেই সেই গান শোনা গেল, 'হায় এই কি দেখি, এই কি দেখি, আলো আদ্দির/প্যান্ট য্যান্ ওর উঁচা দেখি, দুধ জোড়া ভারি।'···

'ফের সুকুমার।' ধমক শোনা গেল পিছনে, 'নো মোর ডেসক্রিপসান অফ্ আদ্দির। এখন পেটেয় ছুঁচোয় ডন মারছে। চল্ নাম তাড়াতাড়ি।'

ফুল্লরা পিছন ফিরে তাকালো। তিন জোড়া লাল করমচা চোখ। যেন ধস্তাধস্তি করে বাস থেকে নেমে গেল। তার মধ্যেই বোধহয় সুকুমারের গলা শোনা গেল, 'তের চৌদ্দর ব্যাপারটাতো তোরা···।'

'চুপ্!' স্পষ্টতই সুকুমারের মুখে হাত চাপা পড়ল।

কুমার বললো,' ফুলু, সবাই নেমে গেছে, চলো তাড়াতাড়ি। ভালো হোটেলে আর জায়গা পাবো না।'

ফুল্লরা ব্যস্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আশেপাশে দেখলো। বাসের মধ্যে দু' একজন ছাড়া যাত্রী নেই। এই অবসরেই ফুল্লরা বলে উঠলো, 'দিদি শোনো, এই যে কুমারদা, এ আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়েছি।' কমলকে দেখিয়ে বললো 'আমার দিদি আর ভগ্নিপতি। ওর নাম বুবাই।'

বুবাইয়ের অভিমান এতক্ষণে কাটলো। কমলের দিকে তাকিয়ে পোকা খাওয়া দাঁত দেখিয়ে হাসলো। কমল আর দিদিও কুমারের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলো। কুমার তাড়া দিল, 'চলো নামি।'

কুমারের পিছনে পিছনেই সবাই নামলো। হোটেলগুলো থেকে এখনো ডাকাডাকি চলছে। ফুল্লরা লক্ষ্য করলো কমলকে। চোখের কালো ঠুলি না খুললেও, ও যে চারদিকে সাবধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশের চেহারা ও লোকজনকে দেখে নিচ্ছে, তা বোঝা যায়। কমলকে লক্ষ্য করতে করতেও, ফুল্লরা কুমার আর অনুর সঙ্গে যেতে যেতে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কারণ কমল এক

boirboi.net

জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। ফুল্লরাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে, কমল ওদের দিকে এগিয়ে এলো, বললো, 'তোমরা কোথাও খেতে বসে যাও, আমি একটু ঘুরে-ফিরে, অন্য কোনো হোটেলে বসে খেয়ে নিচ্ছি।'

'কেন তুমি তো আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে পারো।' ফুল্লরার মুখ থেকে উৎসুক ব্যাকুলতায় কথাটা বেরিয়ে এলেও, তৎক্ষণাৎ ও কুমারের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো।

কুমার বলল, 'হ্যাঁ, অসুবিধের কী আছে?'

'একটু আছে।' কমল হেসে বললো, 'অকারণ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করার কোনো মানে হয় না। মানে, আমার দিক থেকেই বলছি।'

কমলের শেষের কথাটা যে নিতান্তই সান্ত্বনা দেবার জন্য, ফুল্লরার বুঝতে অসুবিধে হলো না। আসলে অস্বস্তিটা ওর না, ফুল্লরাদের। ফুল্লরা ওর ব্যাগটা কাঁধের কাছে টেনে তুলে, কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তা হলে আমি আর ও একসঙ্গে অন্য কোথাও বসে খেয়ে নিচ্ছি। তোমরা একটা হোটেলে খেয়ে নাও।'

কুমার তাকালো অনুর দিকে। অনু কিছু বলবার আগেই, কমল বললো, 'কী দরকার? তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি ঠিক খেয়ে নেবো।'

'তা জানি!' ফুল্লরা হাসলো, 'একলা একলা খাবে কেন? দেখা যখন হয়েই গেল, চলো দুজনে একসঙ্গে খাই। অবিশ্যি তোমার যদি সত্যি সেরকম কোনো অসুবিধে না থাকে।'

কমল মুখ ফিরিয়ে, চোখের কালো ঠুলি থেকে বোধ হয় একবার কুমার আর অনুর দিকে দেখলো, হাসলো, বললো, 'অসুবিধে আমার কিছু নেই।'

অনু কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'যাক না।'

'আমি কি আপত্তি করেছি নাকি?' কুমার যেন খানিকটা অস্বস্তিতে হেসে উঠলো।

ফুল্লরা জানে, কুমারদার কাছে ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তিদায়ক না। ও কুমারকে কিছুটা চেনে। দিদি অবিশ্যি কিছু না ভেবে, ওর মতো করেই কথাটা বলেছে। কিন্তু ফুল্লরা নিজেকেই বোধ হয় সব থেকে কম জানে। সকালের কলকাতার ফুল্লরা এখন আর নেই। একটি মেয়ের মধ্যে কত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, ও তারই একটা মস্ত উদাহরণ। ও নিজেও জানে না, এখন কমলকে নিয়ে ও কতো ব্যস্ত, উৎসুক, ব্যাকুল, এবং নিজের দিদি ভগ্নিপতি আর তাদের ছেলের কাছ থেকে কতোটা সরে গিয়েছে। ওর ছুটি আর বেড়ানোর সমস্ত খুশি আর উত্তেজনা এখন একটি মাত্র মানুষে কেন্দ্রীভূত। এখন জানালার ধারে বসার খুনসুটি করার মন নেই। ও খুব অনায়াসেই কমলের সঙ্গে পা বাড়িয়ে, সকলের দিকে হাত তুলে বললো, 'তা হলে তোমরা এক জায়গায় বসে পড়, আমিও খেয়ে আসছি।'

বুবাই ঠিক তখনই, ওর ঠোঁট ফুলিয়ে, ফুল্লরাকে কড়ে আঙুল দেখালো। অর্থাৎ আবার আড়ি।

★

কমল একটা সিগারেট ধরালো। ও যে পরিতৃপ্তি করে খেয়েছে, ফুল্লরা তা দেখেই

boiRboi.net

বুঝতে পেরেছে। বাস স্টপের ঘিঞ্জি পরিবেশটা ছাড়িয়ে, কমল বেছে নিয়েছিল, বাস-লরি-ট্রাক চালকদের প্রকৃত পান্থশালা বলতে যা বোঝায়, সে-রকম একটি খাবার জায়গা। বালেশ্বরের মতো জায়গায়, বড় রাস্তার ওপরে নির্জনতা বলতে কোথাও কিছু নেই। তবু লরিচালকদের লম্বা খড়ের চালের ঘর অনেকগুলো খাটিয়া, আর রুটি-তরকা-মাংসের গন্ধে পরিবেশটা অনেক ভালো।

ফুল্লরা প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ করলেও, কাটিয়ে উঠেছিল। খাবে কী না, ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু ভাতের বদলে, কমলকে রুটি পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা আর তরকা দিয়ে খেতে দেখে, ওর খিদেও যেন রসনা আপ্লুত করে জেগে উঠেছিল। খাবার পাত্র আর জলের গেলাস দেখে যে-টুকু বিঘ্ন লেগেছিল, ধোয়া পদ্মপাতা আর মাটির ভাঁড় দেখে সেটাও কেটে গিয়েছিল। কমল ভাত খাবে বলেছিল, কিন্তু পেট ভরে খেয়ে নিল রুটি।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, 'ভাত খাবে না?'

'না, রুটিতেই পেট ভরে গেছে।' কমল বললো, 'আধ-ডজন রুটির পরে আর ভাত চলে না। তুমি তো এখনো খাবার নিলেই না।'

ফুল্লরা হেসে বললো, 'তোমার খাওয়াটা দেখলাম। এবার আমি খাবো। তবে আমিও রুটিই খাবো।'

'এরকম তরকা মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না।' কমল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'এবার এক গেলাস চা খেতে হবে।'

ফুল্লরা অবাক হেসে বললো, 'এই গরমে আর দুপুরে?'

'গরমে, গরমই তো ভালো।' কমলের চোখে তৃপ্তির হাসি। এখন ওর চোখে সেই মুখোশের মতো ঠুলিটা নেই। বললো, 'তোমার জন্য কী খাবার দিতে বলবো?'

ফুল্লরা বললো, 'আমি বলছি।'

বড় ঘরটায় এলোমেলো খাটিয়ায় বসে আরো দু' তিনজন ড্রাইভার ক্লিনার খাচ্ছিল। মুরগী আর বেড়াল পাশাপাশিই ঘুরে বেড়াচ্ছে খাটিয়ার নিচে। ঘরের একপাশে, উঁচু আর চওড়া উনুনের ধারে রান্নায় রত একজন মাঝবয়সী লোকের দিকে তাকিয়ে ফুল্লরা ডাকালা, 'এই যে ভাই, এখানে একটা রুটি আর মাংস দিন। কাঁচা পেঁয়াজ আর লংকা দেবেন।'

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আভি লে আঁতে।'

কমল ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'একদিক থেকে, তুমি সঙ্গে থাকায় ভালোই হলো।'

'কী রকম?' ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো।

কমল বললো, 'ছদ্মবেশটা ভালোই হলো। একটি ছেলে আর মেয়ে জোড় বেঁধে ঘুরলে এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই। কিন্তু আমাকে যারা খুঁজছে, তাদের দৃষ্টি হঠাৎ আমাদের ওপর পড়বে না। বিশেষ করে তোমার মতো একজন শহুরে রূপসী আধুনিকা—।'

'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।' ফুল্লরা বাধা দিয়ে বললো।

boiRboi.net

'মোটেই নয়।' কমল বললো, 'ধরো আমি যদি বাসের সেই ছেলেগুলোর বন্ধু হতাম, তা হলে তোমাকে দেখে নির্ঘাৎ আওয়াজ দিতাম।'

ফুল্লরা পুরনো দিনের মতোই কমলকে মারবার জন্য হাত তুললো। কমল তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে হেসে উঠলো। বললো, 'সত্যি, ভেবো না যে এ ক'বছরে চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি দেখতে আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছো। অবিশ্যি তুমি বরাবরই তাই ছিলে, তবু যেন—।'

'তোমার মাথা।' ফুল্লরা বললো, 'আমি এখন বুড়িয়ে যাচ্ছি। জানো না, মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি? অবিশ্যি তোমারই কথা, পুরুষেরা চল্লিশে মুর্খ আর অপদার্থ।'

কমল বললো, 'আমি বলেছি চল্লিশের পরেও যদি পুরুষরা নিজেদের যুবক মনে করতে চায়, তবে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়, তথাকথিত বিজ্ঞানের কল্যাণে অবিশ্যি এখন বাবারাও ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে চাইছে—চেহারায় পোষাকে বৃত্তিতে উপার্জনে, এই যুগের যা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ। ধ্বংসেরই সংকেত এসব। এই সব বিজ্ঞান, টেকনোলজি—।'

ফুল্লরার সামনে একটি ছেলে ধোয়া পদ্মপাতা পেতে দিল, আর এক ভাঁড় জল। সেই মাঝবয়সী লোকটি রুটি আর মাংস বেড়ে দিল। একপাশে দিল দুটি কাঁচা লংকা আর একটি আস্ত পেঁয়াজ। ফুল্লরা বললো, 'তা হলেও মেয়ে হিসেবে আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার পঁচিশ হলো '

কমল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখা গেল একটা জীপ আস্তে আস্তে ঝোপড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। পুলিসের জীপ। ডাইনে বসে একজন উনিফর্ম পরা ইনস্পেক্টর। ইনস্পেক্টরের কোমরে রিভলভার। চোখে সান গ্লাস। বাঁয়ে উনিফর্ম পরা ড্রাইভার।

ফুল্লরা খাবারে হাত দিতে গিয়ে, চমকিয়ে কমলের দিকে তাকালো।

কলমের চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টি, কিন্তু ও মুখটা পাশ ফেরালো। সিগারেটটা ফেলে দিল নিচে, বাঁ হাত নামিয়ে নিল পাঞ্জাবির তলায়। প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'খাও, খেতে থাকো।'

ফুল্লরার মনে হলো, অসম্ভব। তবু ও রুটিতে হাত দিল। জীপের ড্রাইভার নেমে এগিয়ে এসে, এদিক ওদিক দেখে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, 'দিবাকর মিস্ত্রির কোথায়?'

মাঝবয়সী সেই লোকটিই জবাব দিল, 'এদিকে আসেনি।'

ড্রাইভার বললো, 'গ্যারেজ থেকে বললো, এখানে খেতে এসেছে?'

মাঝবয়সী লোকটি হেসে বললো, 'দেখুন গিয়ে, সরাব খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।'

ফুল্লরার মনে হলো, জীপে বসে ইনস্পেক্টর কমলকেই দেখছে। ও আড়চোখে কমলকে দেখলো। কমলের মুখ শক্ত, ডান হাতে ওর নিজের চোখের ঠুলিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ড্রাইভার কমল আর ফুল্লরাকে একবার দেখে, পিছন ফিরে ইনস্পেক্টরের দিকে তাকালো। তারপর বাকিদের দিকে, যারা খাটিয়ায় বসে, কোলে

boiRboi.net

এনামেলের থালা নিয়ে খাচ্ছিল।

ইনস্পেক্টর নেমে এলো। কালো বেঁটেখাটো শক্ত চেহরা, দর্পিত ভঙ্গিতে ঝোপড়ির সামনে এগিয়ে এসে, মাঝবয়সী লোকটির দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'দিবাকরকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে ?'

ফুল্লরার বুকে দামামা বাজছিলই। একটা ঢাউস পুলিস ভ্যান জীপের পিছনে এসে দাঁড়াতেই, ওর হাত আপনা থেকেই এমন নড়ে উঠলো, জলের ভাঁড়টা বেঞ্চির মতো সরু টেবিল থেকে নিচে পড়ে গেল। সেদিকে ওর খেয়ালই নেই. ভাঁড়ের জল চলকে পড়লো ওর হাঁটুর কাছে শাড়িতে। ও কমলের দিকে তাকালো, মুখ রক্ত শূন্য।

কমল তাড়াতাড়ি ওর দিকে ফিরে নিচু স্বরে বললো, 'এত আপসেট হচ্ছো কেন ? খেতে থাকো না ?' ও নিজেই নিচু হয়ে ফুল্লরার শাড়ির জল ঝেড়ে দিল।

ফুল্লরা কমলের বাঁ দিকে কট্ করে একটা শব্দ শুনতে পেল। কমল মুখ তুলে স্বাভাবিক ভাবে হাসলো। অন্তত চেষ্টা করলো।

মাঝবয়সী লোকটি রাস্তার ধারে এগিয়ে গিয়ে ইনস্পেক্টরকে বললো, 'দিবাকরের কোনো ঠিক নেই সার। একবার সরাব খেলে, ও কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কেউ বলতে পারে না।'

ভ্যানের ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে, ইনস্পেক্টরের উদ্দেশ্যে বললো, 'দিবাকরের দেখা পেলেন স্যার ?'

ইনস্পেক্টর পিছন ফিরে বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, 'না।'

জীপের ড্রাইভার বলে উঠলো, 'সব ভালো মোটর মিস্তিরিগুলোই মাতাল।'

ভ্যানের ড্রাইভার বললো, 'জীপটা কি একেবারেই চলছে না ?'

জীপের ড্রাইভার জবাব দিল, 'চলছে। তবে মনে হচ্ছে, এ. সি. পাম্পে কোনো গোলমাল হচ্ছে, গাড়ি টানছে না। তার মানে তেল আসছে না, আর বারে বারে ব্যাক ফায়ার আওয়াজ দিচ্ছে।'

ইনস্পেক্টর ঝোপড়ির ভিতরে সকলের মুখের দিকেই চোখ বুলিয়ে দেখলো। কমল আর ফুল্লরাকেও দেখলো। মাঝবয়সী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার এখানে যারা রয়েছে, তাদের কেউ মেকানিক আছে ? একবার দেখতে পারবে ?'

মাঝবয়সী লোকটি কমল আর ফুল্লরা ছাড়া বাকী কয়েকজনকে দেখে নিয়ে বললো, 'এরা সব ভিনদেশী ড্রাইভার আছে। খাওয়া হলেই গাড়ি নিয়ে চলে যাবে।'

ভ্যানের ড্রাইভার ইনস্পেক্টরকে বললো, 'সামনের পেট্রোল পাম্পে আসুন স্যার, আমি দেখছি।'

ভ্যানটা তার এঞ্জিনের স্টার্ট থামায়নি। দু' এক মিটার ব্যাক করে সোজা সামনে এগিয়ে গেল। ইনস্পেক্টর বেশ রোখা স্বরে মাঝবয়সী লোকটিকে বললো, 'দিবাকর তোমার এখানে এলেই থানায় যেতে বলবে।'

'বলবো স্যার।' লোকটি জবাব দিল।

ইনস্পেক্টর এবার যেন স্পষ্টতই তার সান-গ্লাসের ভিতর থেকে ফুল্লরাকে লক্ষ্য

করে, পিছন ফিরে চলে গেল। উঠলো গিয়ে জীপে। ড্রাইভার ঘুরে বাঁ দিকে উঠে, এঞ্জিন স্টার্ট করলো। জীপটা যেন খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েক মিটার গিয়ে, একটা ব্যাক ফায়ারের শব্দ করলো, তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

'এবার দয়া করে খাও।' কমল বললো, 'তুমি প্রায় একটা সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছিলে।'

ঝোপড়ির অন্যান্য লোকগুলো তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পুলিসের আচরণের বিরুদ্ধেই খানিকটা হাসি ঠাট্টা মেশানো কথাবার্তা। ফুল্লরা রুটি ছিঁড়ে মুখে দিতে গিয়ে বললো, 'ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলাম।'

'ভয় পেয়ে লাভ কী?' কমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে বললো, 'বিপদ তো যখন তখনই আসতে পারে। তবে এ ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়, আসলে ওরা মিস্ত্রিকে খুঁজতেই এসেছিল।'

ফুল্লরা অন্যান্যদের একবার দেখে, মুখের খাবার গিলে বললো, 'তুমি ভয় পাওনি?'

'না। তবে আমি যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই প্রস্তুত আছি।' কমল ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধরে বললো, 'ভয় পেলে আর প্রস্তুত হওয়া যায় না। তবে আমার একটাই ভরসা। ওয়েস্টবেঙ্গল আর বিহার পেরিয়ে এসেছি। বিপদের সম্ভাবনা ওদিকেই বেশি ছিল।' ও দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো।

ফুল্লরার মুখে আস্তে আস্তে ওর স্বাভাবিক রঙ ফিরে এলো। মুখের ভিতর রুটি আর মাংসের স্বাদটাও বেশ উপভোগ করছে। নিচু স্বরে বললো, 'তোমার পাঞ্জাবি ঢাকা ট্রাউজারের বাঁ দিকের পকেটে কিছু আছে না?'

'ও-সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।' কমল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঈষৎ হেসে বললো, 'অনুমান যখন করতে পেরেছো, তখন ঠিকই আছে।'

ফুল্লরা বললো, 'তুমি আমার হাঁটুর কাছে জল মুছিয়ে দেবার সময় একটা কট্ করে শব্দ হয়েছিল।'

'তা হয়েছিল। ওটা লক্ করা ছিল, জল মোছার ফাঁকে আনলক করে নিয়েছিলাম।' কমল বললো, আশেপাশে একবার তাকিয়ে দেখলো, 'যদি হঠাৎ দরকারে লেগে যায়।'

ফুল্লরার চোখে একটা উদ্বিগ্ন অবাক অনুসন্ধিৎসা, 'যদি কোথাও কিছু ঘটেই যায়, একলা একটা অস্ত্র দিয়ে, অনেকের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে কেমন করে?'

'এরকম ক্ষেত্রে ডিফেন্স আর স্কেপটাই আসল কথা।' কমল বললে, 'আমি তো আর লড়াই করতে বেরোইনি। আসলে আমি তো আবার ওয়েস্টবেঙ্গলেই ফিরবো।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তার জন্য পুরী ঘুরে?'

'হ্যাঁ। কলকাতা থেকে ওয়েস্টবেঙ্গলের কোনো গ্রামে যেতে হলে সোজাসুজি যাবার রাস্তা আমার নেই।' কমল হাসলো, 'তুমি আর একটা রুটি খাও।'

মাঝবয়সী লোকটি একটা মস্ত বড় কাঁচের গেলাসের গলা ভরতি ধূমায়িত দুধেল চা কমলের সামনে রাখলো।

boiRboi.net

ফুল্লরা বললো, 'রক্ষে করো, একটা রুটিতেই আমার পেট ভরে গেছে।'

মাঝবয়সী লোকটা বোধহয় ফুল্লরার বাঙলা কথা বুঝতে পারলো, হিন্দীতে বললো, 'তো গরম ভাত নিন না দিদিমণি। মাছের ঝোল আছে।'

ফুল্লরা মাথা নেড়ে বললো, 'না না, আমি আর কিছু খাবো না।'

মাঝবয়সী লোকটা সরে যেতে, কমল বললো, 'ভয়েই তোমার পেট ভরে গেছে। দিদি জামাইবাবুর কাছে থাকলে, পেট ভরে খেতে পারতে।'

'ভুল।' ফুল্লরা জোর দিয়ে বললো, 'দিদিদের সঙ্গে খেতে বসে, পুলিসের ওই জীপ আর ভ্যান দেখলে, আমি খেতেই পারতাম না। কেবলই মনে হতো, তোমার একটা কিছু বিপদ ঘটতে চলেছে।'

কমল ওর সেই ঝকঝকে চোখ তুলে ফুল্লরার মুখের দিকে তাকালো। ওর বাঁ ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছে, চোখে জিজ্ঞাসা। ফুল্লরার মুখে ছ'টা লাগলো, বললো, 'জানি, তুমি কী ভাবছো। ভাবছো, এতকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, তুমি মরে গেছ কী বেঁচে আছো, তার জন্য কিছু যায় আসেনি, আর হঠাৎ আজ পথে দেখা হয়ে যেতেই এতোটা এ্যাংজাইটি—বেশ একটু বাড়াবাড়ি লাগছে, তাই না?'

কমল হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না, ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠলো। ফুল্লরা যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'জানি জানি, বুঝিও। অবিশ্যি এরকম ভাবাই স্বাভাবিক, আর সত্যিই, আমি তো আমার জীবন থেকে তোমাকে একরকম বাদ দিয়েই রেখেছিলাম। তুমি এমনভাবেই সরে গেছলে - যেন আমি বা আমরা অনেকেই তোমার জীবনে আদৌ কোনোকালে ছিলামই না।'

'সেটা তো অস্বীকার করছি না—।' কমল শান্তভাবে কথাটা বলতে গেল।

ফুল্লরা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'না না, ভেবো না, তার জন্য তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটা কথা হয়তো বুঝবে না কমল—।'

'সুসুসু—।' কমল শব্দ করে উঠলো।

ফুল্লরাও মুহূর্তেই ঠোঁট টিপলো। কিন্তু ওর মুখে রক্তের ছটা, চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। বললো, 'সরি খেয়াল ছিল না। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারবো না,—আমি একটা সামান্য মেয়ে, কয়েক বছর পরে তোমাকে আচমকা পেয়ে—মানে দেখা পেয়ে, আমি যেন সব ভুলে গেছি।'

ফুল্লরার কথার মাঝখানেই, কমলের একটা হাত ফুল্লরার টেবিলে রাখা বাঁ হাতের ওপর এসে পড়লো, একটু চাপ দিল, বললো, 'ফুল্লরা তোমার মনের কথা হয়তো খানিকটা বুঝতে পারছি। তোমার দেখা পেয়ে, আমার মনেও কী কিছু হয়নি ভেবেছো? আমি তো অমানুষ হয়ে যাইনি, বরং মানুষ হিসাবে পারফেকশনের কথাই সব সময় মনে হয়, যদিও জানি না, বুঝে উঠতে পারি না, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এ পারফেক্ট ম্যান।'

ফুল্লরা তাকালো কমলের চোখের দিকে। ওর চোখের হাসিতে বিষণ্ণতার ম্লানতা। কিন্তু ফুল্লরার চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠেছে। গালে বেয়ে পড়বার মুহূর্তেই ও যেন টের পেল, আর তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে, চোখের দুই কোণ চেপে মুছে নিল। স্খলিত স্বরে বললো, 'সরি।'

boirboi.net

'এভাবে সরি বলো না।' কমল বললো, 'ও সব সরি-টরি শুনতে আমার ভালো লাগে না। ভেবো না, আমি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছি, যাদের বুক টাটায় না, চোখে জল আসে না, মন বলে কোনো পদার্থ নেই। আমার ধারণায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে কাজ হয়েছে, তার অনেকখানিই পন্ড হয়েছে হৃদয়হীনতার জন্য। আমার কষ্ট হলে, আমি সরি-টরি বলতে পারি না।'

ফুল্লরার দুই চোখে যেন অপরিসীম বিস্ময় ও মুগ্ধতা, প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'আমি যেন তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আর সেই জন্যই তখন বাসে জিজ্ঞেস করছিলে, আমি মত বদলেছি কী না ?' কমল হাসলো 'তোমার মনের একটা ছকে আমি বাঁধা পড়ে আছি। দোষ দেবো না তোমাকে, কিন্তু সত্যি বলছি ছকটা বড় খারাপ ব্যাপার। ছক থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। যে-নিজেকে মুক্ত ভাবতে পারে না, সে অন্যদের মুক্ত করবে কী করে ? কোনো কিছুতেই ছকের থেকে খারাপ কিছু নেই, তা যদি বিপ্লবও হয়। আর বিপ্লবই বা কী ? তার কোনো শেষ নেই, অতএব কোনো ছকও নেই। আমাদের সঙ্গে যদি তুমি মিশতে, দেখতে আমরা রেভ্যলুশনারি থেকে রিবেলিয়ানই বেশি। বিদ্রোহ যুগে যুগে—মানে, বিপ্লব। কোনো ইজমেই বোধহয় এর কোনো পরিসমাপ্তি নেই। একমাত্র জেরণ্টোক্রাসিই নিজেদের ক্ষমতায় তৃপ্ত থাকতে চায়। বিপ্লবীদের মধ্যেও বৃদ্ধতান্ত্রিকের তো অভাব নেই। আমাদের দেশে তো নেই-ই। ফলে, আমাদের দলের অধিকাংশ শহরের ছেলেরাই অনেকটা ড্রিফটারের মতো। তাদের গতি আছে, অথচ যেন সঠিক গন্তব্য নেই, কারোর প্রভুত্ব মানতে পারে না, বর্তমান সমাজের নীতি মানের কোনো মূল্য তো আদৌ নেই তাদের কাছে। হয়তো এটা বিশেষ করে আমাদের বেলায় এমন করে ঘটতো না, যদি না আমাদের একটা বিরাট অংশের মার্কসিজম্ থেকে বিচ্ছেদ ঘটতো। সব তাত্ত্বিকেরা মিলে মার্কসিজমকে এমন একটা তরল পদার্থের মতো করে তুলেছে, যার কোনো ল্যাজা মাথা নেই। এখন পৃথিবী জুড়ে মার্কসীয় তত্ত্বেরই সংকটের কাল চলেছে, ফলে আমরা এলোমেলো ছুটে মরছি। অথচ আমাদের কাছে দাবী করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাহীন ত্যাগ আর উৎসর্গ আর খতম—।'

'ফুলু।' রাস্তার ওপর থেকে কুমারের ডাক ভেসে এলো।

ফুল্লরা আর কমল, দুজনেই মুখ তুলে দেখলো, কুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তার চোখে মুখে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। সে আবার বললো, 'বাস ছেড়ে দিচ্ছে। আমি তো তোমাদের খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। তাড়াতাড়ি এসো।'

কমল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো, 'আমাদের কতো হয়েছে ভাই।'

ফুল্লরা কমলের কথার তত্ত্ব তথ্য কিছুই সম্যক বুঝে উঠতে পারছিল না, তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছিল। কমলকে পকেটে হাত দিয়ে দামের কথা জিজ্ঞেস করতেই ও তাড়াতাড়ি ব্যাগের মুখ খুলে বললো, 'উঁহু, তুমি নয়, ওটা আমি দেবো। আজ তুমি আমার গেস্ট।' বলে ব্যাগ থেকে একটি দশ টাকার নোট টেনে বের করলো।

boiRboi.net

কমল হেসে বললো, 'আপত্তি করবো না। আমার থেকে তুমি এখন সলভেণ্ট।'

কুমার বললো, 'তোমরা এসো, আমি বাসটাকে দাঁড়াতে বলছি।' বলে সে চলে গেল।

মাঝবয়সী লোকটি ফুল্লরার হাত থেকে দশ টাকার নোট নিয়ে, ব্যস্তভাবে খুচরো মিটিয়ে দিল। ঝোপড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে, ফুল্লরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'শ্যামল আর শিবতোষদা এখন কোথায় ?'

'আস্তে !' কমল নিচু স্বরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো, 'এত সহজে নামগুলো বলছো কী করে ?'

ফুল্লরার মুখে বিব্রত অপরাধের হাসি ফুটলো, 'ওহ্ সরি।'

'সরি।' কমল যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে হাসলো, বাইরে বেরিয়ে এলো, 'চলো, বাসে বসে বলবো। তবে এটুকু জেনে রাখো, শিবতোষদা এখন জেলে। শ্যামল কলকাতায় আছে, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, অবিশ্যি আমাদের মত আর পথ নিয়েই।'

বাসের ড্রাইভার তখন এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে, পাগলা ঘোড়ার মতো হর্ন বাজিয়ে চলেছে।

★

কমল আর ফুল্লরা বাসে উঠতেই, বিরক্ত কণ্ডাক্টর জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে দিল। বাস একটা ঝাঁকুনি দিয়ে খ্যাপা ঘোড়ার মতোই ছুটলো। আর তখনই সেই গান আবার ভেসে এলো, 'আবিয়াতো ছেমড়ি তুই আলো আদরি পোয়াতি মাগীর !'—

'নো, নো মোর আদরি ভালগার ফোক্ সঙ্।' কেউ নিশ্চয় সুকুমারের মুখে হাত চাপা দিল। অনেকেই পিছনের দিকে তাকালো। ফুল্লরা একবার কুমারের গম্ভীর মুখে ম্যাগাজিন পড়া দেখলো। দিদির সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাসি বিনিময়। আর বুবাইয়ের সেই কড়ে আঙুল দেখানো। বাপ্-কা-বেটা। কিন্তু ফুল্লরার স্মৃতি জুড়ে তখন কয়েক বছর আগের ঘটনাগুলো ছবির মতো ভেসে যাচ্ছে।

বেলুদি আর শিবতোষদার রহস্যময় ছাড়াছাড়ির কথা প্রথমে ফুল্লরা বুঝতে পারেনি। ওকে জানিয়েছিল কমল। শিবতোষদা যথার্থভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হলেও, বরাবরই কমিউনিস্ট মাইণ্ডেড ছিলেন। মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক হিসাবে, তিনি প্রায় একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বেলুদির গভীর ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে শিবতোষদার মার্কসীয় তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের কখনো অসুখী দম্পতি মনে হয়নি। নকশাল আন্দোলনই প্রথম, দুজনের মধ্যে চিন্তাগত প্রভেদটাকে এতোই দুস্তর করে তুলেছিল, তাঁদের একসঙ্গে বাস করাও আর সম্ভব ছিল না। শিবতোষদা যখন থেকে নকশালদের সঙ্গে হাত মেলালেন, তখন থেকেই বেলুদির শান্তিনিকেতনে চাকরির আয়োজন। দুজনের ছাড়াছাড়ি পাকাপাকি হতে দেরি হয়নি।

শিবতোষদার সঙ্গে শ্যামলের থেকে যাওয়ার রহস্যও ছিল সেখানেই। সে ছিল মনেপ্রাণে শিবতোষদাপন্থি, ঘোরতর বিরোধ ছিল দিদির সঙ্গে। সেই কারণেই ও কলকাতায় শিবতোষদার সঙ্গে থেকে গিয়েছিল, আর চন্দনাকে নিয়ে বেলুদি চলে

boiRboi.net

গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। ফুল্লরা এসব জেনেছিল কমলের কাছ থেকে, কিন্তু বুঝতে পারেনি, কমলও আস্তে আস্তে শিবতোষদার কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা নিচ্ছিল। তবে কমলের মধ্যে একটা পরিবর্তন যে ঘটছিল, সেটা ওর চোখ এড়ায়নি। ফুল্লরা প্রথমে ধরে নিয়েছিল, কমল ওর কাছ থেকে সরে যেতে চায়। পরে ভেবেছিল, কমলের সঙ্গে বাড়ির কোনো গোলমাল চলছে। তারপরে কমল নিজেই বলেছিল, জীবনকে দেখার চোখ ওর বদলিয়ে গিয়েছে। নিজের জীবনযাপন ওর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, স্ব-বিরোধিতায় ভুগছিল, যার থেকে একমাত্র মুক্তির পথ ছিল, সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন করা। ফুল্লরার কাছ থেকে ও খুব সহজেই বিদায় নিয়েছিল, তবু একবার জানতে চেয়েছিল, ফুল্লরা ব্যাপারটাকে কী ভাবে নিচ্ছে ?

ফুল্লরার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল আকস্মিক এবং অতি নাটকীয়, আর একটা আবছা অপরিচয়ের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা। উত্তরবঙ্গে ওদের পরিবারে রাজনীতির কোনো ছোঁয়া ছিল না, তা বলা যায় না। কিন্তু তা ছিল গান্ধীবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ও নিজে কখনো রাজনীতি করার কথা ভাবেনি। ভাবেনি, কমলও কখনো হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলে দীক্ষা নিতে পারে। ও কমলকে জবাব দিয়েছিল, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই ভাবিনি। তা ছাড়া, তুমি তো তোমার কথা কখনো আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বলোনি।'

'বললে কি তুমি আমাদের দলে আসতে ?' কমল স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা কিছুটা চিন্তিতভাবে মাথা নেড়েছিল, কারণ কমলকে মিথ্যা বলা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না, 'না, তা বলতে পারি না।'

'তুমি কি আমার আদর্শে বিশ্বাস কর ?' কমল জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি তোমার আদর্শের মূলটাই জানি না।'

'আদর্শ সর্বহারার বিপ্লব। আপাতত সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব, ক্ষমতা দখল। এখন আমার কাছে, ফ্যামিলি, সোসাইটি, স্টেট, আর সব পলিটিক্যাল পার্টিগুলো মূল্যহীন—সব মিথ্যা। এসবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। অর্থহীন প্রয়োজনে বেঁচে থাকার থেকে মরাও ভালো। এখন যে সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা হচ্ছে, এটা একটা সোনার পাথর বাটির মতো।'

ফুল্লরা বলেছিল, 'যা আমি বুঝি না, তা নিয়ে তোমাকে কিছু বলতেও পারি না। তবে তোমার জন্য আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।'

কমল হেসেছিল, আর সেই হাসির পরেই বিদায়। ও কোথায় গিয়েছিল, এতকাল কী করছিল, ফুল্লরা কিছুই জানে না। কমলের কথা ভাবলেই নানান অশুভ কল্পনা ওর মনে জেগে উঠতো। জেল-খুন-খতম, শহরে বা গ্রামে, যার কোনোটাই ও সহজে মেনে নেওয়ার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অশুভ ভাবনার সঙ্গে কোথায় একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ জড়িয়ে থাকে। কমলের সর্বত্যাগী দুঃসাহসের সঙ্গে একটা গৌরববোধও ওর মনে ছিল। আজ অকস্মাৎ এই সাক্ষাৎ কেবল ওকে চমকেই দেয়নি, মনে হচ্ছে, সেই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তের কমলের সঙ্গে আজকের কমলের কোথায় যেন অমিল দেখা যাচ্ছে। লরি ড্রাইভারদের ঝোপড়িতে

বসে ওর কথাগুলো যেন ঠিক আগের কথার প্রতিধ্বনি না। আর কিছু, আরও কিছু।

ঝোপড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে বসতে গিয়ে, দেখা গেল, সেই কাফ্‌কা-এর বইটা তেরো নম্বর আসনে পড়ে আছে। ফুল্লরা জানালার ধারে বসবার জন্য বইটা হাতে তুলে নিল। কমলের চোখে এখন সেই মুখোশ ধরনের ঠুলি। ফুল্লরা বইটা দেখিয়ে বললো, 'তুমি চলে যাবার পরে, তোমাদের তত্ত্ব নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনার চেষ্টা করেছিলাম। সেই হিসাবে তোমার কাছে কাফ্‌কার বই দেখে একটু অবাক লাগছে।'

'কেন বলো তো ?' কমলের কালো ঠুলিতে জিজ্ঞাসার ঝিলিক।

ফুল্লরা বললো, 'মার্কসিস্টের হাতে কাফ্‌কা, কোথায় যেন একটা সিনিসিজমের গন্ধ লাগছে।'

'প্রচলিত অর্থে সৈনিকদের বিশ্বনিন্দুক আর ব্যর্থই বলা হয় বটে।' কমল বললো, 'কিন্তু মনে রেখো, সিনিকরাই প্রথম সাম্যবাদী দার্শনিক। আর এ গোত্রের জনক ছিলেন এনটিস্থিনিস নামে এক ব্যক্তি, প্লেটোর সমসাময়িক। নিরাজ সমাজের যাঁরা কল্পনা করেছেন, তাঁদেরই নৈরাজ্যবাদী বলা হয়েছে। অথচ, এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী একটা গালাগাল। যদিও গালাগালটার প্রথম উচ্চারণ করেছিল, গ্রীসের নগরবাসী শাসকরা, তাদের অনুচর দার্শনিকেরা। আমার ধারণা নিরাজ সমাজবাদের উৎস থেকেই বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের জন্ম, যার সঙ্গে এমন কি গান্ধীবাদেরও কোথায় মিল আছে।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে কমল হেসে উঠলো, 'সামান্য কথা থেকে অনেক কথা বলতে আরম্ভ করেছি। আসলে কী জানো, আমার চিন্তা-ভাবনায় নানারকম গোলমাল দেখা দিয়েছে। গোলমাল মানে, মূলকে জানা। তুমি সিনিক শব্দটা যতো সহজে বললে, যতো সহজে অনেকেই নৈরাজ্যবাদী বলে গালাগাল দেয়, আমি তারই প্রতিবাদ করতে চাইছিলাম। কাফ্‌কা আমার একজন প্রিয় লেখক।'

'বরাবরই ছিলেন ?' ফুল্লরার চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

কমল বললো, 'না, কিছুকাল ধরে। আর এই সব কারণেই, শ্যামলদের সঙ্গে আমার বিরোধ লাগছে। তোমাকে আগেই বলেছি, বিপ্লবী সরকারে আমার বিশ্বাস নেই, তারা কোনো লোকায়ত্ত রাষ্ট্রও গঠন করতে পারবে না। সেইজন্যই মার্কসবাদকে আমি আর ঠিক আগের চোখে দেখছি না। মনে হচ্ছে, যথার্থ না জেনেই, আমি একজন রাইফেলধারী হয়ে গেছি। মার্কসবাদের সঙ্গে আমাদের মূলতঃ কোথায় বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেটা খুঁজে বের করা দরকার। এই কথাটা বলেই আমি দলের একটা অংশের শত্রু হয়ে গেছি। ফলে, দলের আর পুলিসের বন্দুক, দুই-ই আমার পিছনে ঘুরছে।' ও হাসলো।

ফুল্লরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো, 'দল আর পুলিস দুইয়ের বন্দুক ?'

'হুঁ।' কমল একবার আশেপাশে তাকালো, 'দলে বিশ্বাসঘাতকদের স্থান তো নেই-ই। বেঁচে থাকার অধিকারও নেই। আর পুলিস তো বন্দুক উঁচিয়েই আছে। তোমাকে এসব বলাটা ঠিক হচ্ছে না অবিশ্যি।' ও হাসলো।

boiRboi.net

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ? এটা নিষেধ ?'

'একরকম তো তাই।' কমল বললো, 'তা ছাড়া তোমার ভালোই বা লাগবে কেন ?'

ফুল্লরা ব্যগ্র স্বরে বললো, 'কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে। শ্যামলের সঙ্গে তোমার বিরোধ মানে, আমার কাছে মোটেই পরিষ্কার লাগছে না। শিবতোষদা ? তাঁর সঙ্গেও তোমার বিরোধ ?'

'নামগুলো উচ্চারণ করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।' কমল বললো, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও আমাদের কিছু কিছু বন্ধুর মতবিরোধ হচ্ছে। গত দু মাস শহরে থেকে মতবিরোধ অনেক বেড়েছে। গ্রাম থেকে এখন শহরেই খতম অভিযান বেড়েছে। শ্যমলও এখন কলকাতায়। হয়তো আমাদের খুঁজছে।'

ফুল্লরা কয়েক মহূর্ত চুপ করে রইলো। দলীয় জটিলতা, বিবাদের কথা ওর তেমন জানা ছিল না। ও যেন ঠিক ভাবতে পারছিল না, শ্যামল শিবতোষদার সঙ্গে কমলের কোনো বিরোধ হতে পারে। আর সেই বিরোধও প্রাণের বিনিময়ে মেটাতে হবে! ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো, 'তুমি তো তাহলে শাঁখের করাতের তলায় ?'

'বরাবরই ছিলাম।' কমল হাসলো, 'শহরে সশস্ত্র পুলিস, সাদা পোশাকের গোয়েন্দা, গ্রামে সশস্ত্র জোতদার আর তাদের পোষা গুণ্ডা।'

'কিন্তু পার্টির মধ্যে বিরোধ ?'

'এটা একটা অন্য উপসর্গ। মারবেই এমন কোনো কথা নেই, তবে পুলিসের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছে।'

'সেটা কী ভাবে ?'

'পুলিসকে আমার আণ্ডারগ্রাউণ্ড ডেন জানিয়ে দিয়ে। আপাতত সেইজন্যই আমাকে ঘুর পথের ঠিকানায়, আবার দেশে ফিরে যেতে হবে।'

'কিন্তু বিরোধটা কিসের ?'

'পথের। মতেরও কিছুটা বলতে পারো।'

'যথা ?'

'আমাদের আসল তত্ত্ব থেকে বিচ্ছেদের কথাটা কেউ কেউ মানতে চাইছে না। অথচ, শহরের ট্রেড ইউনিয়ন, যাকে আমরা বলেছি, লেবর অ্যারিস্টোক্র্যাসি, দরকষাকষির আন্দোলন, যার সঙ্গে বিপ্লব বিদ্রোহের কোনো যোগাযোগই নেই, এসব ছেড়ে আমরা গ্রামে চলে গেছলাম। আজকের শ্রমিক যন্ত্রেরই একটা অংশ, সে তার উৎপন্ন বস্তু হাতে করে ঘাঁটে না, তার কোনো মাথা ব্যথাও নেই। বলতে পারো সে এই যন্ত্রযুগের একটি উপযন্ত্র। মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের মিথ্যা বেড়াজাল থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু গ্রামের কেবল ভূমিহীন কৃষক না, একজন দরিদ্র ভিক্ষুকও মাটি ঘাঁটতে ভালোবাসে। বঞ্চিত হয়েও একজন কৃষক তার ফলানো ফসল হাতে তুলে গন্ধ শোঁকে আর ক্ষুধায় হাহাকার করে। তারা কোনোকালেই নিতান্ত চাষের হাল বলদ লাঙ্গল হতে পারবে না, তাদের ফলানো ফসলের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর, অনেক বেশি মাটির প্রতি টান, অথচ সে সব সময়

boiRboi.net

নিজের হাতে ফলানো ফসল থেকে বঞ্চিত। সেইজন্যই আমাদের পার্টি গোড়া থেকেই গ্রামকে বেছে নিয়েছিল, শহরকে নয়। কিন্তু কী রেজাল্ট হলো, বল।' কমলের দাড়ি গোঁফের ভাঁজে ব্যর্থ হাসির বিষণ্ণতা।

ফুল্লরা বললো, 'তোমাদের মতো আমাকে গ্রামে গিয়ে কৃষক দেখতে হয়নি বটে, কিন্তু তোমার কথা শুনে, তাদের যেন আমি নতুন করে দেখছি। রেজাল্ট কী হলো, আমাকে বল।'

'সে তো তুমি কাগজেও নিশ্চয় পড়েছ।' কমল বললো, 'সঠিক ভাবে বলতে গেলে, আমাদের কোনো প্রস্তুতিই ছিল না, অথচ তার জন্য আমরা অপেক্ষা করতেও রাজী ছিলাম না। আমাদের সেই ধৈর্য কোথায় ছিল? আমরা কেবল ঝাঁপিয়ে পড়তেই চেয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি, সেই থেকেই মূল তত্ত্ব থেকে আমাদের বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল। কৃষকদের যৌথ চেতনাকে আমরা জাগাতে পারিনি, আর এটাও বুঝতে পারিনি, দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। ফলে অতিবিপ্লববাদের কল্পনাবিলাস আমাদের পেয়ে বসলো, আমরা রোমাণ্টিকতার নামে হয়ে উঠলাম হৃদয়হীন। পুলিসের কাছে না, নিজেদের বন্ধু শ্রেণীর প্রতিই আমরা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম, আমাদের ডগমা এত বড় হয়ে উঠলো, আমরা জোর করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাইলাম। তার ফলেই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। আসলে গ্রাম আমাদের ছাড়ানো হয়েছে। অথচ শহরে এসে আমরা একটা মন্ত্রীকে মারতে পারিনি, পুলিসের আইজি বা কোনো কমিশনারকেও না। এমন কি কোনো ছদ্মবেশী নিখুঁত শত্রু শয়তানকেও না। মাঝখান থেকে শাসকদলের কতগুলো গুণ্ডা মস্তান এখন আমাদেরই দল ভাঙিয়ে খাচ্ছে, আমাদেরই মারছে, পুলিসের অনুচর ছাড়া তারা কিছুই নয়।' ও চুপ করলো, তাকালো আশেপাশে।

ফুল্লরার দৃষ্টি কোনো দিকেই নেই। ইতিমধ্যে বাইরে রোদ পশ্চিমে ঢল খেয়ে গিয়েছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে, ওর চুল ঝাপটা খেয়ে গালে পড়ছে। বললো, 'তারপর? আমাকে বলো, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'আর কী বলবো বলো?' কমল হাসলো, 'জীবনকে তুচ্ছ করতে পারি, কিন্তু কার্যকারণের কোনো কিছুই জিজ্ঞাসার অতীত হতে পারে না। আমরা যদি সুশৃংখল সেনাবাহিনীও গঠন করি, তবে তা বুর্জোয়াদের বিবেকহীন সামরিকবাহিনী হবে না। আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, জাগেনি শুধু তাদের, যারা কেবল তত্ত্ব থেকে না, জীবন আর জগৎ থেকেই যার আত্মবিচ্ছেদ ঘটে গেছে। প্রশ্ন জেগেছিল বলেই, আমি দু মাস কলকাতায় শুধু পড়াশোনা করেছি। তার ফল হয়েছে এই, আমার মতামত আরও শক্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের পথ ভুল হয়েছে। ভুল কোথায়, সেটা আলোচনার বিষয়। আমরা নিজেরাই তা ঠিক করবো। তবে বিপ্লবী সরকার নয়। লোকায়ত্ত রাষ্ট্র চাই। পৃথিবীতে নিরাজসমাজবাদীরাই তার রূপরেখা ঠিক করে দিয়ে গেছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের চিন্তা তাঁরাই প্রথম করেছিলেন। আমি পেছন ফিরে তাকাবার কথা বলছি না। কিন্তু গোড়া থেকে ভাবাই ঠিক। বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদকে জানতে হলেও, তার গোড়াও

জানা দরকার।'

ফুল্লরা বললো, 'আমি এই নিরাজসমাজবাদের কথা তোমার কাছেই প্রথম শুনছি।'

'অথচ সাম্যের প্রাচীনতম স্বপ্ন এঁরাই দেখেছিলেন।' কমল বললো, 'কনফুসিয়াসের মন্ত্র ছিল শাসক আর নেতাদের মেনে নাও। কিন্তু তাঁরই সমসাময়িক লাওৎসেকে প্রকৃতিবাদী বললেও, আমি তাঁকে নিরাজ সমাজবাদীই বলবো, যা আমাদের শেষ লক্ষ্য। লাওৎসে তাঁর কথা কবিতায় বা ছড়া কেটে বলতেন। যেমন একটা তোমাকে শোনাই, "যতই বিধিনিষেধ বাড়বে, ততোই মানুষ হবে গরীব/যতো ধারালো হাতিয়ার বানাবে / রাজ্যে ততো বাড়বে বিশৃঙ্খলা/যতো কলাকৌশল ফাঁদবে / ততো বেরোবে তাকে এড়াবার ফন্দি / যে দেশে যতো আইনকানুন / সে-দেশে ততো চোর-ডাকাতের মেলা।" যীশু জন্মের অন্তত ছ'শো বছর আগে এসব কথা বলা হয়েছে।'

ফুল্লরা অবাক মুগ্ধস্বরে বলে উঠলো, 'আশ্চর্য, ঠিক যেন বর্তমানের কোনো হৃদয়বান দূরদর্শী কবির কবিতার মতো শোনাচ্ছে।'

'পুরীতে চলো, সমুদ্রের ধারে বসে তোমাকে এরকম অনেক আশ্চর্য কবিতা শোনাবো।' কমল হাসলো।

ফুল্লরা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'আহ, এবারের পুরী যাওয়াটা আমার সার্থক। কিন্তু একটা কথা খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।'

'কী?'

'দু'মাস যে কলকাতায় ছিলে, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ির কোনো যোগাযোগ হয়নি?'

কমল আশেপাশে একবার দেখে বললো, 'যোগাযোগ হয়েছিল, কিন্তু বাড়ি যাইনি। সেখানে সবসময় নজর রাখা হয়। বাবা মা'র সঙ্গে আলাদা এক জায়গায় দেখা হয়েছিল।'

ফুল্লরা ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বললেন তাঁরা?'

'কী আর বলবেন? ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরতে বললেন। কমল হাসলো, 'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও বাবার আছে।'

'গেলে না?'

'কেন যাবো, কেমন করে যাবো? ঘরে ফেরার জন্য তো আমি বেরোইনি।'

'কিন্তু আমি জানি, অনেকে ঘরে ফিরছে।'

'আমি তাদের দলে নেই।' কমলের মুখে হাসি কিন্তু শক্ত অভিব্যক্তি, 'বাবা মা অবিশ্যি বলেছিলেন, ইউ. কে. বা স্টেটস্-এ কোথাও চলে যেতে। ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। এমন কি বিয়ের কথাও বলেছিলেন। একেবারে নিশ্চিন্ত সুখের জীবন, কী বলো?'

ফুল্লরা কিছু বললো না, বরং ওর চোখে মুখে যেন একটা স্বপ্নের মুগ্ধতা। কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?'

ফুল্লরা যেন চমকিয়ে উঠে বললো, 'না। মানে, তারা মন্দই বা কী বলেছেন। অনেক তো হলো, একটু না হয় নতুন করে দেখতে?'

boiRboi.net

'অনেক আবার কী হলো ?' কমল অবাক হেসে বললো, 'হয়নি তো কিছুই। নতুন করে দেখার জায়গা তো আমাদের একটাই। সেখান থেকে আমি কোথাও যেতে পারি না।'

ফুল্লরা যেন ঘুমঘোরের বিস্ময়ে, কমলের চোখের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে রইলো।

★

'তোমার মুখে লাল আভা পড়েছে।' কমল বললো।

ফুল্লরা অবাক হলো, বাইরে তাকালো, হেসে বললো, 'বিকেলের আলো। তোমার মুখেও পড়েছে।'

দুজনের কথার মাঝখানেই, বাসের ভিতরে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল। কয়েক-জনের মুখে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, 'ভুবনেশ্বর এসে গেছে।'

কমল ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। দূরে আকাশের গায়ে একটি মন্দির চূড়া, আর শহরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের ব্যস্ততা আর মাল তোলা-পাড়া করতে দেখে বোঝা গেল, কেউ কেউ ভুবনেশ্বরেই নামবে।

'মনে হয়, পুরী পেঁছিতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।' ফুল্লরা বললো।

কমল তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে ভুবনেশ্বর শহরের চেহারা যতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ও হঠাৎ দ্রুত বললো, 'আমি ভুবনেশ্বরেই নেমে যাই। কিছুই বলা যায় না, পুরীতে হয়তো জাল পাতা আছে। অবিশ্যি থাকবেই, এমন কোনো কথা নেই। তবু সাবধানের মার নেই। কাল সকালের কোনো বাসে পুরী চলে যাবো, সমুদ্রের ধারে দেখা হবে।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে বললো, 'হঠাৎ একেবারে ডিসিশন নিয়ে নিলে ?'

'হ্যাঁ।' কমল নিচু হয়ে ওর বালিশের খোলের মতো লম্বা ব্যাগটার ভিতরে হাত দিয়ে চেপে, চেন টেনে বন্ধ করে দিল।

কণ্ডাক্টর তখন ঘণ্টা বাজিয়ে চিৎকার করছে, 'ভুবনেশ্বর এসে গেছে।'

গাড়ি আস্তে আস্তে দাঁড়ালো। কমল বাইরের দিকে দেখলো। ফুল্লরার দৃষ্টি কমলের দিকে। ভুবনেশ্বরের যাত্রীরা নামতে আরম্ভ করেছে। কমল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কুমার আর অনুর দিকে ফিরে হাসলো, বললো, 'চলি।'

ফুল্লরা ঝটিতি কমলের পাঞ্জাবি টেনে ধরলো। কমল ফিরে তাকালো। ফুল্লরার মুখ রক্তশূন্য, চোখের ইশারায় বাইরের দিকে দেখালো। সেকেণ্ডের মধ্যেই, দেখা গেল, বাসের দুই দরজায়, সশস্ত্র পুলিস, রিভলভার হাতে দুজন অফিসার। প্রত্যেকটি যাত্রীর মুখের দিকে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তীক্ষ্ন চোখে খুঁটিয়ে দেখছে। কণ্ডাক্টর আর সহিস আগেই নেমে গিয়েছে। একজন সশস্ত্র পুলিশ ড্রাইভারকে নেমে যেতে বললো। ড্রাইভার নেমে গেল। যাত্রীদের চোখে মুখে একটা সন্দেহ আর ভয়ের ছায়া। তারা পুলিস এবং পরস্পরকে দেখছে।

কমল আস্তে আস্তে বসে পড়লো। ওর হাত এখন বাঁ দিকে পাঞ্জাবির নিচে। ফুল্লরার সঙ্গে চকিতে একবার কুমার আর অনুর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিবিনিময় হলো। ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরের যাত্রীরা সবাই নেমে গিয়েছে। দুজন সশস্ত্র পুলিশকে নিয়ে,

রিভলভার হাতে একজন অফিসার সামনের দরজা দিয়ে বাসের ভিতরে ঢুকলো। বুটের শব্দ বাসের পিছনের দরজায়ও। ফুল্লরা পিছন ফিরে দেখলো, একই সঙ্গে পিছন দিকেও সশস্ত্র পুলিস আর অফিসার উঠে এসেছে।

ফুল্লরা দরদর করে ঘামছে, বুকে দামামা বাজছে। পুলিস দু দিক থেকে ওদের সামনে পিছনে এসে দাঁড়ালো। কমলের কালো ঠুলি পরা মূর্তি পাথরের।

'কমলবাবু। উঠুন।' ঠিক পিছনের সীট থেকেই, সেই সমালোচক বয়স্কদের একজন বলে উঠলো।

ফুল্লরার বুকে যেন ছুরি বিঁধে গেল। লোক দুটোই গোয়েন্দা? কলকাতা থেকেই অনুসরণ করছে। কমল পিছন ফিরে দেখলো, কিছু বললো না। সামনের অফিসার রিভলভার তুলে, পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'নেমে আসুন।'

কমল উঠে দাঁড়ালো। কারো দিকে তাকালো না। এমন কি ফুল্লরার দিকেও না। ফুল্লরা কিছু বলে উঠতে যাচ্ছিল, কুমার ডেকে উঠলো, 'ফুলু, তুমি এদিকে চলে এসো।'

কমল সামনের দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। ওর বাঁ হাত এখন পাঞ্জাবির বাইরে ঝুলছে। ডান কাঁধে ব্যাগ। ফুল্লরা কুমারের কথা শুনতে পেলো, কিন্তু কমলের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। পিছনের আসনের লোক দুটোও উঠলো। সমস্ত বাস স্তব্ধ।

ফুল্লরা দেখছে, কমল বাস থেকে নামলো। ফুল্লরার ঠোঁট কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না, গলার কাছে যেন শক্ত কিছু ঠেকে আছে। ঠিক এই মুহূর্তেই চকিতে ঘটনাটা ঘটলো। কমল ওর কাঁধের ব্যাগটা চোখের পলকে অফিসারের রিভলভার ধরা হাতের ওপর ছুঁড়ে মারলো। শুধু অফিসারের রিভলভারটা পড়ে গেল না, লোকটা বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে সরে গেল। একজন সশস্ত্র পুলিশ কাছে থেকে রাইফেল বাগাবার আগেই, কমলের হাতে রিভলভার ঝলকিয়ে উঠলো। একটা গুলি ছুঁড়েই লাফ দিয়ে, বাসের ডানদিকে মোড় নিয়ে ছুটলো। স্পষ্টতই কমল কারোকে মারবার জন্য গুলি ছোড়েনি। একটা চমক লাগিয়ে, পরিস্থিতিটা ওলট-পালট করে দিয়ে, পালানোটাই যেন ওর উদ্দেশ্য ছিল।

ফুল্লরা সব কিছু ভুলে গিয়ে, ডান দিকের জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাইরে তখন পুলিসের চিৎকার। বুটের ছুটোছুটির শব্দ। ফুল্লরা দেখতে পেল, কমল বাসের পিছন দিকে দৌড়োচ্ছে। হঠাৎ পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ, ফুল্লরা চিৎকার করে উঠলো, 'না না···।'

কমল তখন রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়েছে। ওর সামনে একটা গর্জমান জীপ। চারপাশে সশস্ত্র পুলিশের বেষ্টনীতে কমলকে আর দেখা যাচ্ছে না। ফুল্লরার মাথা ঠুকে গেল বাসের জানালায়, ও একবার চিৎকার করতে গেল। অনু ওকে নিজের বুকে টেনে নিল।

আবার একদল সশস্ত্র পুলিস ছুটে এসে বাসের মধ্যে ঢুকলো। এক দরজা দিয়ে ঢুকে, আর এক দরজা দিয়ে নেমে যাবার আগে, সকলের মুখের দিকে দেখলো। অফিসার একবার অনুদের আসনের সামনে দাঁড়ালো, দেখলো ফুল্লরাকে, বললো,

boiRboi.net

'শক্ড ?' কোনো জবাবের প্রত্যাশা না করেই নেমে গেল।

ড্রাইভার গাড়িতে উঠে এঞ্জিনে স্টার্ট দিল। কণ্ডাক্টর আর সহিস উঠে দু'দিক থেকে দরজা বন্ধ করলো। বাইরে থেকে হুকুম শোনা গেল, 'ছোড়।'

বাস গর্জন করে ছুটলো। ভিতরে তখনো স্তব্ধতা। কেবল কণ্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, 'একদম ঝাঁজরা করে দিয়েছে।' তার দৃষ্টি ফুল্লরার দিকে।

ফুল্লরার কানে বাজছে, 'সমুদ্রের ধারে দেখা হবে। সমুদ্রের ধারে……।'

'ফুলু।' কুমার ডাকলো।

ফুল্লরা উঠে দাঁড়ালো। সকলের দৃষ্টিই এখন ওর দিকে। পিছনের আসনে সেই লোক দুটো নেই। ফুল্লরা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে। না, ও কাঁদতে পারছে না। ও তেরো নম্বর আসনে গিয়ে বসলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে ও শহর দেখছে না। ও দেখছে, সমুদ্রের ধার দিয়ে কমল হেঁটে চলেছে, উজ্জ্বল চোখে হাসির দ্যুতি। হাজার হাজার বছর আগের নিরাজবাদী সমাজের কবিতা বলছে, আর হাসছে। ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, বাণী বোঝা যাচ্ছে না।

সমুদ্র প্রচণ্ড হয়ে তীরে আছড়ে পড়ছে, আর ফেনপুঞ্জ হাসিতে খলখল করছে।

---

boiRboi.net

বিষের স্বাদ

boiRboi.net

মুখের সাবানটুকু ধুয়ে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তপতীর মনে হল, জীবনে ও এতবড় পারিবারিক ডিজাস্টার দেখেছে, অথচ নিজে কোনদিন ডিজাস্টারস হতে পারল না। পারলে বোধহয় ভাল হত, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। ভাবতে ভাবতে ওর হাসি পেল, আয়নার দিকে তাকিয়ে, নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, 'সাতটা বাজতে আর মিনিট কয়েক বাকী, মিসেস তরফদার এখুনি এসে পড়বেন। এখনো কি এসব ভাববার সময় আছে তোমার?'

চটপট মাথার সামনে একটু চিরুনি চালিয়ে, পিছনের গোজামিলটা ঠিক রেখে বড় একটা খোঁপা জড়িয়ে নেয়। প্রায় মেশিনের মতই দ্রুত হাতে, এক ডজন কাঁটা কিলিপ গুঁজে দেয়। বেসিনের সামনে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে, ব্যাগ থেকে ছোট আয়না নিয়ে, ঝটিতি ঘাড়ের পিছন দিকটা দেখে নিতে ভোলে না। তারপরেই পাউডারের পাফের চাপ পড়ে মুখে, আর মনে মনে বলে, নিতাইটা যে কখন আসবে, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

পাউডারের পাফ বোলানোর পরেই, কালো পেনসিলে ভুরুর টান, চোখের পাতায় সরু রেখা। এমন সময় নিতাইয়ের ডাক, 'দিদিমণি, এনেছি।'

তপতী তাড়াতাড়ি বলে, 'এখানেই নিয়ে এস।'

বাথ, টয়লেট সবই পাশাপাশি। এ ঘরটার এক কোণে ছোট একটা নিচু টেবিল, একটি বেতের মোড়া। তপতী টেবিল দেখিয়ে বলল, 'ওখানে রাখ, চা-টা একটু তাড়াতাড়ি দাও ভাই নিতাই। মিসেস তরফদারের গাড়ি আসতে দেখলে নাকি?'

'আজ্ঞে না। চা আমি এখুনি নিয়ে আসছি।'

নিতাই একটা ঠোঙা রেখে চলে গেল। তপতী ছোঁ মেরে ঠোঙাটা তুলে, ভিতর থেকে গরম ফুলুরি আর বেগুনি বের করে মুখে দিল। উহ্, বড্ড গরম। তা হোক, একটু সময় নেই। ঠিক সাতটার মধ্যেই ওকে তৈরী হতে হবে। তা ছাড়া খিদে, অসহ্য খিদে পেয়েছে যে! বেলা তিনটের সময় থেকেই খিদে পায়। তারপর মনে হতে থাকে, চোখের কোলগুলো ভিতর দিকে টানছে, শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কিন্তু তখনো ওকে, মুখে হাসি ফুটিয়ে, মধুর সুরে বলতে হয়, 'মর্ণিঙ্ ম্যায়াম্, হোয়াট ইজ্ য়ুর চয়েস্?' অথবা ইংরেজি সুরটাকে বজায় রেখে, 'নমস্কার। কী চাইছিলেন, কী দেখাব বলুন?'···কারণ এটা ওর চাকরি। একটি বিশাল বিপণির একটি বিভাগ ওকে দেখতে হয়। সবাইকে সম্মানভাবে অভ্যর্থনা, জিনিসপত্র দেখানো, যতক্ষণ পর্যন্ত পছন্দ না হয়, একের পর এক দেখিয়ে যেতে হয়, এবং তারপরে পছন্দ না হলে, ধরে নিতে হবে, সেটা ওরই ডিসকোয়ালিফিকেশন, আর সেটাও ওকে খুবই মধুর বিষণ্ণ সুরে বলতে হবে, তপতীর অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, ম্যায়াম্‌কে ও কোন কিছু দিয়েই সন্তুষ্ট করতে পারল না। ম্যায়াম্ যদি মনে করেন, তা হলে ও আর একবার ও সব কিছু দেখাতে পারে। ম্যায়ামের কি সেটুকু সময় এবং ধৈর্য আছে! যদিও

মনে মনে বলে 'বিদায় হও মা, বুঝেছি তোমার দৌড় বেশি দূর না, আমার খাটুনিই সার।'...

বেশ বড় বড় সাইজের ফুলুরি আর চারটে বেগুনি প্রায় গপ গপ করে খেয়ে নিল। হাতটা চট করে ধুয়ে নিতে নিতেই, প্লাস্টিকের গেলাসে চা নিয়ে এল নিতাই। তপতী বলে উঠল, 'গুড। মিসেস তরফদার কি এসে পড়েছেন?'

নিতাই এই বিভাগীয় বিপণির সাধারণ ভৃত্যদের একজন, ডাকা হয় বেয়ারা বলে। তপতীর বিভাগের বেয়ারা সে। বলল, 'এখনো আসে নি।'

তপতী মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে, চায়ের গেলাসে চুমুক দিল। আহ্, এতক্ষণে গায়ে একটু জোর পাওয়া গেল। আয়নার দিকে ফিরে তাকাল, ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসল, একটু চোখ ঘোরাল, মনে মনে বলল, প্যাটিস্ না, স্যাণ্ডউইচ না, নাম করা দোকানের কোন স্ন্যাকস্‌ও না, ভ্যাজাল তেল দিয়ে, বিশুদ্ধ তেলেভাজা, খাঁটি টিফিন। তোমরা তো আমার পেটে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছ না কী খেয়েছি। শো কাউন্টারে গিয়ে যখন দাঁড়াব, নয়তো রাস্তায়, তখন তেলেভাজার কল্পনাও কেউ করতে পারবে না তপতী মজুমদারকে দেখে। তাই কি কখনো হয়, এমন ফিস্টিকেশনের সঙ্গে তেলেভাজার মিল কোথায়।

হেসে আবার গরম চায়ে চুমুক দিল, আর আয়নার ছায়াকে জিভ ভেংচে বলে উঠল, 'তাও মিল আছে মেমসাহিব, পেটের সঙ্গে মিল আছে। আর মিল আছে আপনার পয়সার ব্যাগের সঙ্গে। রক্ষে যে সেখানে কেউ উঁকি মেরে দেখতে আসে না। ব্যস্!'

চা শেষ করে, গেলাসটা নামিয়ে রেখেই ঠোঁট মুছে নিল। লিপস্টিক বের করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, হাঁ করল, সাবধানে লেপে দিল, ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল একটু। ভাল করে আয়নায় একবার দেখল। সরে এসে, ঘাড় ফিরিয়ে, চোখের কোণ দিয়ে আবার দেখল, মুখ তুলে, যেন ঠোঁট দুটো কারোর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, এমনি একটা ভঙ্গি করল, ঘাড় নেড়ে বলল, 'ছি!'

আরো সরে এসে, আবার নিজেকে দেখল, ছায়াকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বয়স কত মাদ্‌মজয়েল? ছাব্বিশ? তার মানে, রাবিশ। জানেন না, বাঙালী মেয়ে কুড়িতেই বুড়ি? অতএব ছাব্বিশ কখনো রাবিশের থেকে বেশি কিছু হতে পারে না। আপনি একটি রাবিশ।'

মিসেস তরফদারের গাড়ি, পিছনের গেট দিয়ে ঢুকছে।

তপতী চমকে উঠেছিল প্রায়। বলল, 'ও. কে. নিতাই। আমারও শেষ। লতিকাদি কাউণ্টারে আছেন তো?'

'আছেন।'

নিতাই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তপতী ভেবে নিল, এখনো দু মিনিট। গাড়ি থেকে নেমে মিসেস তরফদার আগে দেখবেন, গাছপালা, টবের চারা, নতুন ক্যাকটাস, তারপরে আস্তে আস্তে হলের মধ্যে প্রবেশ। চারদিকে তাকাতে তাকাতে নিজের কাঁচ-ঘরে প্রবেশ। একে একে ডাক, কথা, আটটায় বন্ধ হবার পরে ক্যাশ মেলানো। তার আগেই, শৈলবালা দেবীর রিপোর্ট, যিনি সব বিভাগেই সুপারভাইজ করেন,

boiRboi.net

এবং সকলের আচার আচরণ কাজকর্ম সম্পর্কে লক্ষ্য রাখেন। তাঁর রিপোর্টের ওপরেই নির্ভর করে, কে প্রশংসিত হবে, নিন্দিত হবে, অথবা ভর্ৎসিত হবে।

কিন্তু সে সব এখন যাক, আর একবার, বেরোবার আগে শেষবার, তপতী নিজেকে দেখে নিল। ঘাড় কাত করে ছায়াকে বলল,

'দেখতে তুমি নয়কো ভাল,
রঙটি যদিও নয়কো কালো
তা বলে নও মেমসাহেবি ধলো।'

বললতে বলতে হেসে উঠল, বলল. 'এ্যাবসার্ড', কবিতা হয়ে গেল যে, মরণ?'

আসলে নিজেকে ও যা-ই বলুক, রূপসীদের গোত্রে ফেলা যায় ওকে। একহারা বলতে যদি স্লিম বোঝায়, তবে ও তা না। দোহারা বলতে যদি বাল্‌কি বোঝায়, তাও না। ওর পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার সঙ্গে শরীরের একটা মাপসই সামঞ্জস্য আছে। রঙটা প্রায় ফরসা, কৃষ্ণ কালো তারার আধার চোখ দুটো ডাগর বটে, টানা টানা ভাবের। তাতে ও যতটা হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে রাখতে চায়, দূরের একটা উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ ছায়া তবু যেন নড়তে চায় না। নাকটা টিকলো, কিন্তু চোখা বলতে যা বোঝায়, তা না। আর শরীরের গঠনে, এ কথা মানতেই হবে, সময় কিছু ঠেক খেয়ে রয়েছে। ছাব্বিশে রাবিশের লক্ষণ কিছুমাত্র নেই, কম করে চারটে বছর গায়েব করে বসে আছে ওর নিভাঁজ চামড়া, মুখের ছাপ, বুকের মাপ, কটির ক্ষীণত্ব, নিতম্বের সুঠাম ছাঁদ।

তপতী মনে মনে বলে থাকে, ভাল করে খেতে না পেয়ে শরীরটা বাড়তে পায় নি। কথাটা ওর নিজেকে চোখ ঠারার মত। কারণ, ওর চেহারায় কোথাও ডাঁসা বলে পোকায় ধরবার মত নয়, যাকে বলে খেঁচুরি মার্কা চেহারা। সারের আর মাটির রসে বাড়তে না পাওয়া গাছের চেহারা যেমন হয়। সে হিসাবে, ওকে এখনো কচি আর নধরই বলতে হবে।

শেষবার জিভ ভেংচে, গম্ভীর মুখে ও যখন বেরিয়ে এল, মিসেস তরফদার সেইমাত্র পিছনের দরজা দিয়ে হলে ঢুকলেন। প্রত্যেক বিভাগে বিভাগেই মহিলা কাস্টমারদের এখনো ভিড় রয়েছে। খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও অনেকে মিসেস তরফদারকে, 'গুড ইভিনিং' জানাচ্ছিল। শৈলবালা দেবী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। মিসেস জয়াবতী তরফদার, এই বিভাগীয় বিপণির মালিকান। বয়স ষাটের কাছাকাছি, কাঁচা পাকা চুলে বয়েজ কাট। চোখে চশমা থাকলেও কোলে পাউচ্ লক্ষণীয়। বাঁধানো দাঁতে শাদা হাসি, ঠোঁটে এখনো রঙ লাগান। তবে, যাকে বলে আভিজাত্য, সব মিলিয়ে সেটা বর্তমান। লতিকাদি বললেন, 'তোমার ডিপার্টমেণ্ট সব থেকে বাজে তপতী। ইলাস্টিক আর হোসিয়ারি গুডস্ দিয়ে কি সকলেরই ক্লিওপেট্রার ফিগার করে দেওয়া যায়?'

লতিকাদির কথার জাবাব দেবার আগেই, মিসেস তরফদার কাছে এসে পড়েন। দুজনে এক সঙ্গেই প্রায় বলে ওঠে, 'গুড ইভিনিং মিসেস তরফদার।'

মিসেস তরফদার দাঁড়িয়ে কব্‌জিতে ঘড়ি দেখলেন। তপতীকে বললেন 'তোমার তো যাবার সময় হল।'

boiRboi.net

তপতী সম্ভ্রমের সুরে বলল, 'এবার যাব।'

শৈলবালা তখনই বলে উঠলেন, 'তপতী আগেই তো কাউণ্টারের বাইরে চলে গেছল। আপনি ঢোকবার আগেই ও এল।'

একেই বলে শৈলবালা দেবী সুপারভাইজার। বলবার সময়, অভিযোগের সুর নেই, একটি মিহি ভদ্রতার হাসি লেগে থাকে। তপতীর মুখে একটু রঙের ঝলক লাগে, বলে, 'একটু লেভেটরিতে গেছলাম।'

মিসেস তরফদার বললেন, 'এমনিতেই তো তোমাকে এক ঘণ্টা আগে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেটা ভুলে যেও না।'

তপতী যেন কাস্টমারকে বলছে, এমনিভাবে বলে উঠল, 'ইনডিড ম্যায়াম, আই এ্যাম সো গ্রেটফুল!'

ও জানে, এমনি করে বললে মিসেস তরফদার খুশি হন। তিনি বেশ প্রসন্ন মুখেই নিজের কাঁচ-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন, পিছনে শৈলবালা দেবী। লতিকাদি বলে উঠল, 'শৈলবালা যেন অনাথ আশ্রমের মেয়েদের খবরদারণী, কী রকম পাজী দেখেছ।'

তপতী বলল, 'যার যেমন স্বভাব।'

লতিকাদি বলল, 'কিন্তু তোমার সবটাই মিষ্টি। দুটো মুখই মিষ্টি, দেখতে এবং শুনতে।'

'বেশি বলবেন না লতিকাদি, অহংকার হয়ে যাবে।'

'সেটা হলে তোমার অনেক আগেই হত। সত্যি, আমাদের সবাই বলে, তুমি মুভি টুভিতে চলে গেলে পারতে। কোন প্রডিউসার ডিরেকটরের চোখে তুমি আজও পড়লে না কেন?'

'ব্যাডলাক লতিকাদি।'

বলেই চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু টুভিটা কী?'

লতিকাদি হেসে বলল, 'একটা কথার কথা।'

তপতী বলল, 'আমি শুনেছি, মুভির সঙ্গে টুভি বলেও নাকি একটা জগৎ আছে, মারাত্মক!'

দুজনেই হেসে উঠল। তপতী বলল, 'চলি লতিকাদি, আর সময় নেই। কিন্তু এই কাউণ্টার এত ফাঁকা কেন?'

বলতে বলতেই, তিনটি অবাঙালী যুবতী এগিয়ে এল। তপতী লতিকাদির সঙ্গে চোখাচোখি করে হেসে বাইরে চলে গেল। যাবার সময়, দুপাশে যাদের সঙ্গে চোখাচোখি হল, তাদের সঙ্গে একটু হাসি বিনিময় হয়ে গেল। কব্জির ঘড়িতে দেখল, সাতটা বেজে সাত মিনিট। সাড়ে সাতটায় এটেনডেন্স। তারপরেই নতুন কাজের শুরু। রাত্রি নটা হলে, তাড়াতাড়ি বলতে হবে। সাড়ে নটাও হয়ে যায়। তখন শরীর হয়ে পড়ে আরো ক্লান্ত, তার সঙ্গে মনটা নানান কারণে বিরক্ত হয়ে থাকে। বিরক্তটা সবদিন হয় না, এক একদিন। আবার কোন কোনদিন হাসিও পেতে থাকে। কাজের রকমটাই তা-ই। মনের ওপর কিছুটা ক্রিয়া হবেই। একেবারে নিরেট পাথর হয়ে থাকা যায় না। সেই তুলনায় মিসেস তরফদারের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের কাজে কিছু ঝকমারি থাকলেও, ঝামেলা নেই। প্রথমতঃ স্টোরস্‌টা কেবলমাত্র মেয়েদের।

পুরুষদের সেখানে স্থান নেই। যে সব কাস্টমার পুরুষদের সঙ্গে আসে, সেক্ষেত্রে পুরুষদের একটা বসবার জায়গা আছে। সেখানেই তাদের সীমানা। কিন্তু তলপেটের এ্যাবডমিনাল বাইণ্ডিং থেকে শুরু করে, কোমরের প্যাড আর বুকের ব্রা পারিয়ে, কতজনকে সে আর শরীরের মাপ ঠিক করে দিয়ে বলবে, 'জাস্ট ফিটিং, নাইস !'

তার ওপরে আবার বায়নাক্কা আছে। সেজন্য সব মহিলা কাস্টমারের সঙ্গে ট্রায়ালরুমে ঢুকতে তপতীর ভয়। মহিলাদের আচরণ যদি পুরুষ সুলভ হয়, কী বিশ্রী। কেউ হয়তো তপতীরই বুকে হাত দিয়ে লাঞ্ছনা করে, বলে, 'তোমার মত শরীর হলে, আর কিছুই চাইতাম না।' এদেরই বোধহয় লেসবিয়ান বলে। ঘৃণা আর বিরক্তি জাগে, কিন্তু হেসে বলতে হয়, 'আমি বিবাহিতা।'

তাতেও, অনেক সময় বিকারকে সামলানো যায় না। বিবাহিতা বলার যে উদ্দেশ্য, সেটা তারা শুনেও বোঝে না যে, ও স্বাদের অনুভূতিটা ওর জানা আছে। যদিও, সেটা আদপে মিথ্যা। কিন্তু নিরুপায় হয়ে বলতেই হয়। অনেকে আবার আছে, একেবারে সরাসরি চুম্বন। কী জঘন্য ! আর অস্বস্তি তাদের নিয়ে, যারা ওর সামনে, ট্রায়াল চেম্বারে এ্যাবডমিনাল বাইণ্ডিংটা একেবারে সরাসরি তলা দিয়ে গলিয়ে তোলে, অথচ শাড়িটা কোমরের নিচে থেকে নামাবার কোন চেষ্টা করে না। এ ধরনের মহিলারা নিজেদের বোধহয় নগ্ন দেখতে ভালবাসে।

তা বাসুক, অনেকেই নিজেকে নগ্ন দেখতে হয়তো ভালবাসে, কিন্তু সেটা তপতীকে দেখিয়ে কেন। নিজের ঘরে আয়নার সামনে যতক্ষণ খুশি নগ্ন হয়ে নিজেকে দেখলেই হয়। আসলে বোধহয়, নিজে দেখার চেয়ে আর একজনকে দেখাতেই ভালবাসে। তপতী যদি অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে ফিরে থাকে তা হলে ডেকে বলে, 'দেখুন তো ফিট করেছে ? লুজ হয়নি তো, নাকি আর এক সাইজ ছোট দেবেন ?'

শুধু কি তাই নাকি ? এমন মহিলাও তপতী দেখেছে, যে জামা কাপড় সব খুলে একেবারে ন্যুড হয়ে গিয়েছে। অথচ তার কোন দরকারই হয় না। যদিও, ওর ডিপার্টমেণ্টটাই এমন যেখানে মহিলাদের শরীরের যেকোন অংশ কমানো বা বাড়ানোর জিনিস পাওয়া যায়, বিশেষ করে, বুক পেট কোমর। কিন্তু এমনটা প্রায় দেখাই যায় না একজন মহিলার সব জিনিসই দরকার, অতএব তাকে একেবারে সব জামাকাপড় খুলে ফেলতে হবে। যার কোমরের প্যাড দরকার হয়, তার হয়তো বুকের ফলস্ প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এ্যাবডমিনাল বাইণ্ডিং-এর দরকার করে না। কারণ সে বাড়াতেই আসে, কমাতে আসে না।

যে সব মহিলা কেবল আয়না-ঘরে, তপতীর চোখের সামনে নিজেকে নগ্ন করে খুশি থাকে, তারা তবু একরকম। কিন্তু যারা তপতীর গায়ে হাত দিতে চায়, তাদের ওপরই ওর রাগ বেশি। তারা যে কেবল বুকে হাত দিয়ে খুশি তা না। শরীরের ওপরে নিচে বিবিধ অংশে হাত দিতে পারলে তারা খুশি। দু একবার এমন ঘটনা যে ঘটে নি, তা না। একেবারে আচমকা, ওর শায়াসুদ্ধ কোমরে তুলে দিয়েছে, ও রেগে বেরিয়ে এসেছে। চুমোর তো কথাই নেই। যেন ফিটিংসের খুশিতেই চুমো। কিন্তু তপতীর তো একটা ঘেন্না পিত্তি বলে' কথা আছে। মুশকিল হচ্ছে, এসব কথা মিসেস

boiRboi.net

তরফদারকে বলা যায় না। নিজেদের মধ্যেই ওরা আলোচনা করে, হাসাহাসি, রাগারাগি, সবই নিজেদের মধ্যে।

অবিশ্যি ওদের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরেও এ রোগ কারো কারো আছে। যেমন স্টেশনারির মীরা আর স্ল্যাকস্-এর ললনা। ওদের নিয়ে অন্যান্য মেয়েরা প্রায়ই হাসাহাসি করে, আলোচনা করে। মীরা-ললনার নাকি গভীর প্রেম। ওরা নাকি স্বামী-স্ত্রীর মত। তপতীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার ও চিন্তা করতেই পারে না। কিন্তু স্টোরের সবাইকে অবিশ্বাস করা যায় না, আর নিজের চোখকেও তপতী একেবারে অবিশ্বাস করতে পারে না। মীরা ললনা এক সঙ্গে আসে, এক সঙ্গে ফিরে যায়, এ তো সবাই দেখতে পায়, অথচ ওরা এক বাড়িতে থাকে না, এবং ললনা বিবাহিতা মেয়ে। ললনার বয়স বছর পঁচিশ, কোন ছেলেমেয়ে নেই, থাকলে অবিশ্যি মিসেস তরফদার ওকে চাকরি দিতেন না। ছেলেপিলের মা হলে, তার পক্ষে যে চাকরি পোষায় না, বিশেষতঃ এইসব কাজ, যে কাজের মাইনে থেকে একজন মেয়ে, বাচ্চা পোষবার আয়া বা ঝি পুষতে পারবে না। আর স্টোরের চাকরি অফিস আদালতের মত দশটা পাঁচটাও না।

মীরার বয়স বছর তিরিশ হবে। ও এখানকার পুরনো মেয়ে। এখনো বিয়ে হয় নি বা করে নি। সবাই বলে, ইচ্ছা করেই করে নি। ললনাকে এখানে চাকরিতে নিয়ে এসেছে মীরা-ই। ওদের নাকি অনেক পুরনো বন্ধুত্ব। সবাই শুনেছে, ললনার সঙ্গে তার স্বামীর তেমন বনিবনা হয় নি, লোকটা নাকি খারাপ, ললনাকে দেখাশোনা করে না, যে কারণে ওকে চাকরি করতে আসতে হয়েছে। ললনার চেহারা বেশ ঢলঢলে, মাংসলো হাত পায়ের গোছা, স্বাস্থ্যও ভাল। ফরসা রঙ, চোখ মুখ খারাপ না, একটু খাটো বলা যায়। সেই তুলনায় মীরা রোগা লম্বা, প্রায় কালো। একটু কাঠ কাঠ, শক্ত ভাবের, যেন লালিত্য নেই, যেটা ললনার শরীরে অনেকখানি আছে।

নিজের রূপ বা যৌবন সম্পর্কে তপতীর কোন গুমোর নেই, কিন্তু, মীরার মত মেয়ের সঙ্গে বাহু জড়িয়ে আলিঙ্গন দূরের কথা, এক বিছানায় পাশাপাশি শোয়ার কথা ও চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু ও নিজের চোখে দেখেছে, মীরা আর ললনা, দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে, যাকে বলে আগ্রাসী চুম্বন, তা-ই করছে। প্রথম দর্শনে, তপতী ব্যাপারটা বুঝতেই পারে নি। ভেবেছিল, দুটি মেয়ে পরস্পরের খুব কাছাকাছি হয়ে, মুখের কাছে মুখ এনে বুঝি কিছু বলাবলি করছে। তারপরই···।

আসলে কিছুকাল আগে, হঠাৎ যেন কে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি মারা গেলেন। খবরটা জানা মাত্র অফিস আদালত সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ এরকম ক্ষেত্রে, কোন দোকানপাট বন্ধ হয় না। কিন্তু মিসেস তরফদার তাঁর ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরকে মোটেই 'দোকান-পাট' বলে ভাবতে চান না। টেলিফোন করে, শৈলবালা দেবীকে অর্ডার করেছিলেন, স্টোর বন্ধ করে দাও, আজ শোকের দিন। অতএব স্টোর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আকাশে তখন প্রবল মেঘের ঘনঘটা। যে যত তাড়াতাড়ি পেরেছিল, নিজেদের ডিপার্টমেণ্ট সামলে, বাড়িতে বা যার যেখানে খুশি উধাও হয়ে গিয়েছিল। যত জ্বালা তপতীর। ওদিকে চাকর বেয়ারারা শো-কেশগুলো বড় বড় শাটার টেনে বন্ধ করে দিচ্ছিল। এদিকে ওর ডিপার্টমেণ্টে তখনো জনা দুয়েক না-ছোড়বান্দা

boiRboi.net

মহিলা। তাঁরা ব্যাকডোর দিয়ে বেরিয়ে যাবেন, তবু হাতের সামনে টুকিটাকি জিনিস কয়েকটা নিয়েই যাবেন। তপতী সেই কাস্টমারদের ভাগিয়ে দিতে পারত, কিন্তু মহামান্যা শৈলবালা দেবী চোখের সামনে ব্যবসায়ের এরকম একটা ক্ষতি চেয়ে দেখেন কী করে। তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'সামনের দিক দিয়ে তো বন্ধই হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওঁদের জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। বিল লিখে ক্যাশ জমা দেবার জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

অগত্যা। তা না হলে, আবার মিসেস তরফদারকে সাতকাহন করে লাগাবেন। অবিশ্যি, বাড়ি যাওয়া ছাড়া তপতীর তখন কিছু করবারও ছিল না, এবং বাড়ি যাবার জন্য মনটা বেশ খুশি ব্যাকুলও হয়ে উঠেছিল। বেলা বারোটায় এসে দেড়টাতেই যদি ছুটি মিলে যায় (যথেষ্ট শোক প্রকাশের অবকাশ রেখেও) কে না খুশি হয়। তা ছাড়া বাড়িতে যারা ওর অপেক্ষায় রয়েছে, যারা জানে ওকে পেতে হলে সেই রাত্রি সাড়ে নটায়, এবং ও তখন ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুধার্ত, তারা যদি হঠাৎ বেলা দুটোয় ওকে পেয়ে যায়, তবে নিশ্চয় খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠবে। এর ওপরে ছিল আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কা। চোখের সামনে সবাই যখন পালাচ্ছিল, ওকে তখন আয়না-ঘরে মহিলাদের ট্রায়াল দেওয়াতে হচ্ছিল। রক্ষে এই, তারা কেউ-ই সেরকম বাতিকগ্রস্ত নন অবিশ্যি, ওরকম বিকারগ্রস্ত মহিলার সংখ্যা শতেকে একও নয় প্রায়।

কিন্তু কপালটা তো তপতীর। দুই ভদ্রমহিলাকে বিদায় করতে না করতেই, বাইরে বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রস্তুতি হিসাবে একটি প্ল্যাস্টিকের রঙিন ফুল ছাপা বর্ষাতি ওর ছিল। বৃষ্টির তোড় দেখে বোঝা যাচ্ছিল বর্ষাতি অতি তুচ্ছ। অতএব, বৃষ্টির বেগ না কমা পর্যন্ত ওকে থাকতেই হয়েছিল। ও ধীরে সুস্থে তৈরী হবার মনস্থ করে দুই কাস্টমারের মুণ্ডপাত করছিল মনে মনে। স্টোরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। শৈলবালা দেবী আর ক্যাশিয়ার মিঃ দত্ত, (মাত্র এই একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, ক্যাশ আর এ্যাকাউন্টের ব্যাপারে, মিসেস তরফদার মেয়েদের রাখেন নি।) তখন হিসাব নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। তপতী ধীরে সুস্থে ওর ডিপার্টমেণ্ট গুছিয়ে নিরিবিলি ছোট ল্যাভেটরিতে গিয়ে ঢুকেছিল। তখনই ঘটনাটা ওর চোখে পড়েছিল! প্রথম চমকটা কেটে যাবার পরেই ও দেখেছিল ল্যাভেটরির ভিতরে, এক ধারে মীরা ললনা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। মেয়ে পুরুষের আলিঙ্গনটা সিনেমা বা ছবিতে দেখা ছাড়া সঠিক কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তপতীর। তবু সেই দৃশ্য দেখে ওর গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠেছিল। ও দেখেছিল, মীরা ললনার পিঠে ওর কোমরে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমো খাচ্ছে। ললনাও মীরার গলা আর কাঁধ জড়িয়ে ধরে গ্রহণ এবং দান দিচ্ছে। মীরার চুল ববড্ না, প্রায় বয়েজ কাট। সেই চুল তার নিজের কপালে, ললনার গালে এসে পড়েছিল, আর ললনার শিথিল বেণী, পিঠের দিকে মীরার হাত চাপা পড়েছিল।

তখনো দরজার হাতলটা ওর হাতে ধরা, দরজাটা পুরোপুরি খোলে নি। দৃশ্যটা দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, আর এটাও ভাবতে পারছিল না দরজাটা ভিতর থেকে লক না করেই কোন সাহসে ওরা ওরকম করছিল। বোধহয় পনের সেকেণ্ড দেখেছিল, তারপরই যে ভাবেই হোক মীরার চোখ পড়েছিল দরজার দিকে। সে

ললনার মুখ থেকে মুখ তোলবার আগেই তপতী ঝটিতি দরজাটা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল ওর ডিপার্টমেণ্টে।

না, কোন বিকৃত সুখেরই অনুভূতি ও বোধ করে নি। ওর গায়ের মধ্যে কী রকম ঘিনঘিন করছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। তপতীর তখন ললনা মীরা সম্পর্কে, অন্যান্য মেয়েদের কথা মনে পড়েছিল, আর এ কথাও মনে হয়েছিল, এর চেয়ে ললনা বা মীরাকে যদি স্টোরের কোনো দরোয়ান বেয়ারার সঙ্গেও ওভাবে দেখত, তাহলে এত খারাপ লাগত না। প্রথমে গা ঘিনঘিন ঘৃণা, তারপরে ওর রাগ হয়েছিল। ইচ্ছা করছিল দুটোরই চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে আছড়ানো উচিত। হঠাৎ ছুটি পাওয়ার খুশিটা যেন ওর নিভে গিয়েছিল।

তপতী প্রায় আধঘণ্টা পরে টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি গায়ে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে মনটা একটু সুস্থির হয়েছিল ওর। ভেবেছিল, ওর ঘৃণায় বা রাগে কী আসে যায়। কাদের জীবনে কোথা থেকে কী ঘটে, কেউ কী বলতে পারে? মানুষের জীবন সম্পর্কে ও কতটুকু জানে? দেখতে খারাপ লাগে, ভাবতে ততোধিক, তাই মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহ কি, এটা একটা বিকার। মীরা ললনা বিকারের শিকার, ওদের চিকিৎসার দরকার। কিংবা কে জানে, ওরা হয়তো এখন চিকিৎসার বাইরে। মীরা অবিবাহিতা, বয়সও হয়েছে, তার হয়তো আর কোন গতি নেই। ললনা তো স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারত। সে দৃশ্য দেখার পরে তপতীর আর কোন সন্দেহ ছিল না। ললনার প্রতি স্বামীর অত্যাচার, তাই চাকরি নেওয়া, সবটাই মিথ্যা। আসলে, মীরা ললনা সুখের সংসার পেতেছে। সুখ! এর নাম? মীরা ললনার কাছে নিশ্চয়ই। যাদের মধ্যে ওইরকম আবেগ, অমন নিবিড় প্রেম, তাদের বোধহয় আর উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে, তপতী এসে বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিল আর দেখছিল, এক সুদর্শন যুবক, চাপা প্যাণ্ট আর আঁটসাট জামায় স্বাস্থ্য ফুটিয়ে, প্রায় পেখম ধরা ময়ূরের মত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। তখন ওর মনে মনে ভীষণ হাসি পেয়েছিল। আর মনে মনে বলেছিল, 'হায় পুরুষ। তোমাদের এত বল আর অস্ত্র থাকতেও কী না, মেয়েরা তোমাদের কাঁচকলা দেখিয়ে দিচ্ছে। ললনার মত একটি সুন্দরী মেয়েকে তোমরা আর কোন অস্ত্র দিয়েই জয় করতে পারবে না……'

সেই মুহূর্তে, পুরুষদের বিষয়ও কয়েকটি কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেটা ওর কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা না, নিতান্ত বিদেশী সাহিত্য পড়াতেই যেটুকু জেনেছে। পুরুষে পুরুষে ভালবাসাবাসি। তাতেও ওর গা ঘিনঘিন করেছিল, কিন্তু একটা ক্ষেত্রেই ওর বিস্মিত প্রশ্নের কোন জবাব মেলে নি এবং সেটা কোন গল্প উপন্যাসের ব্যাপারেও না। এক ইতিহাস-বিখ্যাত শিল্পী, এমনকি যাকে বৈজ্ঞানিকের সম্মানও দেওয়া হয়েছে, সেই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। মোনালিসা, লুক্রেজিয়া যাঁর সৃষ্টি। তিনি কেমন করে কিশোর প্রেমের শিকার হয়েছিলেন, যে কারণে ওঁকে ফ্লোরেন্সের আদালতে জরিমানা দিয়ে রেহাই পেতে হয়েছিল। এ কি নিতান্ত পারভারটেড জীনিয়স, না কি দ্য ভিঞ্চির মত একদল শিল্পীর একটা আকস্মিক চিন্তা থেকে, অপার কৌতূহলের নিরসন মাত্র।

boiRboi.net

অনেক সময় ওর মনে হয়েছিল, কিছু স্থির করতে পারে নি। পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে ওর ভাল লাগে নি। বিশ্বসাহিত্যে তা যত বড়ই হোক, একজন মেয়ে হিসাবে কোন যুক্তিতেই ওসব মেনে নিতে পারে না। তারপরে ও নিজের মনে হেসেছিল। ওর এত ভাববার দরকারই বা কী। মীরা ললনা ওর কেউ না, ওদের জীবনের কোন কিছুর দায় ওর নেই। দৃশ্যটা ভুলতেও চেষ্টা করাই উচিত। আসলে, সেই সময় ওর কিছু কিছু মহিলা কাস্টমারের কথা মনে পড়েছিল এবং এখনো পড়ছে।

তপতী তা বলে জগৎ সংসারটাকে অসুস্থ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় না। সুস্থতা আছে বলেই অসুস্থতা বেশি করে চোখে পড়ে এবং ভাবিয়ে তোলে।

নতুন প্রায় একটা ম্যানসনতুল্য বাড়ির, গাড়ি পার্কের মাঝখানের উঠোন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, আর একবার কবজি তুলে ঘড়ি দেখল তপতী। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা তিরিশ। তার মানে, ওর সন্ধ্যেরাত্রের এই নতুন চাকরির এ্যাটেনডেন্সে প্রায় এক মিনিট লেট হয়ে যাবে। প্রায় দৌড়েই সামনের গাড়ি বারান্দায় উঠে, ভিতরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠল। বারান্দা দিয়ে দক্ষিণের একেবারে শেষ ঘরটার দরজায় গিয়ে পৌঁছুল। তখনই ওর কানে এল, ওর একটা প্রিয় গানের রেকর্ড বাজছে, 'য়ু গো অন এ্যাহেড।'······

মোটা ভারী পর্দাটা সরিয়ে তপতী ঘরের মধ্যে ঢুকল। প্রায় একসঙ্গেই সকলের চোখ পড়ল ওর দিকে। জনা পাঁচেক মহিলা পুরুষ ওর পরিচিত, বাকী কয়েকজনকে চেনে না। বড় ঘরের মেঝেতে তিন জোড়া নেচে চলেছে গানের সঙ্গে। তার মধ্যে এক জোড়া মহিলা এবং পুরুষ, বাকী দুটি জোড়া পুরুষ পুরুষ। তাদের সঙ্গেও তপতীর দৃষ্টি বিনিময় হল, হাসি এবং ঈষৎ মাথা দোলানো। বাকী পরিচিতদের দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। জবাবে শুনল, 'গুড ইভনিং মিস······।'

হলঘর না হলেও বেশ বড় ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে একপাশে একটি রেডিওগ্রাম। তার পাশে একটি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে কিছু ফাইলপত্র, কলম, কাগজ কাটা, টুকিটাকি জিনিস, দুটো রেকর্ড কেস। টেবিলের দুপাশে দুটো গদী আঁটা চেয়ার, বাদবাকী গোটা ঘরটার দেয়াল ঘেঁষে স্টীলের চেয়ার পাতা, ফাঁকে ফাঁকে এ্যাসট্রে স্ট্যাণ্ড। দেওয়ালে একটি মাত্র ফ্রেম আঁটা নকল পেণ্টিং। পুরনো দিনের কোন বিদেশী শিল্পীর আঁকা মহিলা পুরুষদের নাচের ছবি।

এটিও একটি নাচ শেখার স্কুল, বলাবাহুল্য বিদেশী নাচ, এবং তপতী এখানে নাচের শিক্ষিকা না, শিক্ষানবীশদের পার্টনার হিসাবে ওর চাকরি। এতে মাসে আরো একশো টাকা আয় বাড়াতে পেরেছে ওর অশেষ ভাগ্য। সপ্তাহে চারদিন আসতে হয়, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে নটা। মঙ্গল, বুধ, শনি, রবি। তিনটে দিন সম্পর্কে ওর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই নতুন চাকরিতে, রবিবারে নিরঙ্কুশ ছুটিটা ওর মার গিয়েছে। সারাদিন ছুটির পরে সেই আবার সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে ওকে এখানে আসতে হয়।

boiRboi.net

তপতী জানে নাচ শেখাতে শেখাতেও শ্রীযুক্ত ড্যান্নি তার ডান হাতের কবজিতে ঘড়িটা দেখে নিয়েছে, তপতীর হাজিরা দিতে কত দেরী হল। ড্যান্নি এই ইস্কুলের পরিচালক, এবং প্রতিষ্ঠাতাও বটে, তা-ই এর নাম ড্যান্নিজ ড্যান্স্ স্কুল। যারা এখানে নাচ শিখতে আসে, কিছুদিন আসার পরে, তারা বলে, 'ডি, ডি'-তে যাচ্ছি।

ড্যান্নির বয়স পঞ্চাশের কম না, মাথার চুলে পাক ধরে গিয়েছে। হাড়-পুষ্ট কালো লম্বা শরীর, শরীরে একফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। আসল নাম ধনগোপাল শর্মা, আদি নিবাস চট্টগ্রাম, তপতী শুনেছে। যার দয়ায় ওর এখানে চাকরি, সেই শ্রীমতী মণিকা চৌধুরীর মুখেই, ধনগোপাল শর্মা সম্পর্কে শুনেছে। ধনগোপাল চট্টগ্রাম শহরের বৈদ্য পরিবারের এক বখে যাওয়া ছেলে। ছেলেবেলাতেই অর্থাৎ আঠারো উনিশ বছর বয়সেই, জাহাজের কাজ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর নাবিকের কাজ করে, পৃথিবীর নানা বন্দরের জল খেয়েছে। শুধু জল খায় নি, মার্কিন আর ইংরেজ মুল্লুকে দু দুবার দুটি সংসার পেতেও বসেছিল। ধলা গিন্নীদের কোলে তার কালা ছেলে না থাক, তামাটে সন্তানেরা নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু থাকতে পারে নি আর মেমসাহেবদের নিয়ে, বাংলা দেশে এসে রোজগারপাতি করে সংসার-পালনের সাহসও হয় নি। অতএব পলাতক।

নিজের বাপ মা পরিজনের কোন খোঁজ জানে না ধনগোপাল। মণিকা চৌধুরীর স্বামী একজন স্টিভেডোর। ওঁদের বংশগত ব্যবসা, প্রায় তিন পুরুষের। ধনগোপাল, চৌধুরীদের কাছে কাজ করে তাই জাহাজ সম্পর্কে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, চৌধুরীদের কাছে নিজেকে সে যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন বলে প্রমাণিত করেছে। অতএব, সেখানে তার কাজ পাকা। উপরন্তু চৌধুরী পরিবার তাকে নানান কারণে পছন্দ করে, কারণ সে নিজের কাজ ছাড়াও চৌধুরী পরিবারের বিশেষ উপকারী লোক, যখন যা দরকার সবই করে দেয়। বিশেষতঃ মণিকা চৌধুরীর সে অত্যন্ত বশংবদ। তাঁর কৃপাতেই ধনগোপাল এই নাচের স্কুল খুলেছে। স্বয়ং মিঃ চৌধুরী কয়েক বছর আগে এই স্কুলের উদ্বোধন করেছিলেন। কারণ তাঁরা ধনগোপালের নাচের প্রতিভার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। ধনগোপাল, চৌধুরী পরিবারের অনেককে নাচ শিখিয়েছে।

শ্রীমতী মণিকা চৌধুরী কখনো সখনো এই নাচের স্কুলে দেখা দিয়ে থাকেন। ইচ্ছা করলে ড্যান্নির সঙ্গে একটু নেচেও যান। আবার কখনো সখনো, ড্যান্নিকে লিফট্ দিয়ে বাড়িও পৌঁছে দেন। মন্দ লোকেদের চোখে কুট সন্দেহ, কুটিল প্রশ্ন। এমন কি, কিছু কিছু কটু কথাও আড়ালে শোনা যায়। তা যাক গিয়ে। মন্দ লোকদের ধারাই ওরকম। শ্রীমতী চৌধুরীকে সর্বগুণান্বিতা বলে মনে করে তপতী।

বয়সের তুলনায় মিসেস চৌধুরীকে অল্প বয়স দেখায়। দেখতেও তিনি সুন্দরী, সুন্দর করে নিজেকে সাজাতেও পারেন, অথচ অহংকারী নন। তিনি উদার এবং পরোপকারী, একই সঙ্গে জেদী। বয়ফ্রেন্ড তাঁর কম নেই। তার মধ্যে, এই প্রৌঢ় বয়সের যুবক ড্যান্নি সম্ভবত সব থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড। ড্যান্নির চুলে পাক ধরেছে বটে, কিন্তু সে বেশ শক্ত পোক্ত লম্বা জোয়ান। বিদেশে থেকে আর যাই করুক, নাচটা সত্যি ভাল শিখে এসেছে। এমনি অন্যান্য নাচ ছাড়াও ব্যালে আর টুইস্টও সে ভাল

boiRboi.net

জানে। এক সময়ে ব্যালে শেখার ইচ্ছা তপতীরও খুব ছিল। কিন্তু হয়ে ওঠে নি।

কথাটা মনে হতেই তপতীর একটা নিশ্বাস পড়ল। রেকর্ড শেষ হল, নাচ থামল। ড্যান্নি যাকে নাচ শেখাচ্ছিল নিজে পার্টনার হয়ে, সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বয়স বোধহয় বছর ষাটের কাছাকাছি। চৌকো মোটা শরীর। বোধহয় রিটায়ার্ড লোক। ভগবান জানেন এমন লোক বুড়ো বয়সে হঠাৎ নাচ শিখতে এসেছে কেন। গোড়ালি তুলে পা ফেলতেই যার কষ্ট হয়, তালের সঙ্গে চলাফেরাই যার পক্ষে মুশকিল, সে লোক নাচ শিখবেই বা কেমন করে কে জানে। কিন্তু ড্যান্নি সে কথা চিন্তা করতে চায় না। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে, শিখতে পারবে বা না পারবে তার দায়িত্ব নেই। মাসে মাসে টাকাটা এলেই হল। সখের মূল্য বাবদ ওটা দিয়ে গেলেই হল।

তথাপি, ড্যান্নি নাচ শেষ করেই বেশ রোখা স্বরে, ইংরাজিতে ভদ্রলোককে বলল, 'আপনি একজন শিশু নন, এই কমনসেন্স আপনার থাকা দরকার, যার সঙ্গে আপনি নাচছেন তার শরীরের ওপর আপনার শরীরের ভার ছেড়ে দেবেন, ইমপসিবল্! আমি না হয় আপনার শরীরের ভার রাখতে পারি, কোন মহিলা হলে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবেন।'

তপতীর ভিতরে হাসি কলকলিয়ে উঠল। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে ও বসে রইল। বুড়ো ভদ্রলোক বিব্রত লজ্জায় বলল, 'ঠিক ঠিক, খুবই দুঃখিত।'

ড্যান্নি যে বেশ চটে গেছে বোঝা গেল। সে আবার বলল, 'নিজের শরীরের ভারটা আপনি রাখতে পারেন না? আশ্চর্য! তা হলে আপনি নাচ শিখবেন কেমন করে। মনে রাখবেন, বরং মেন পার্টনার আপনার শরীরের ওপর তার ভার রাখতে পারে হয়তো কোন সময়, আপনি পারেন না।'

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, 'ঠিক, ঠিক বলেছেন। নাচতে গেলেই আমার তাল হারিয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু ওটা বললে চলবে না স্যার।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা, আমি কি একলা শিখতে পারি না? আপনি যদি দেখিয়ে দেন?'

ড্যান্নি হেসে ফেলল, মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না স্যার, এসব নাচের ব্যাপারে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়, আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা যুগল নাচ। তবে হ্যাঁ, আপনি একলা একলা পা ফেলাটা প্র্যাকটিস্ করতে পারেন।'

বলে ড্যান্নি পায়ের স্টেপ গুণে গুণে ফেলে দেখাল। বলল, 'বসুন এখন, পরে আর একবার নাচবেন।'

তপতীর দিকে ফিরে বলল, 'হেলো।'

তপতী হাত তুলে নমস্কার করল। আর একজন মহিলা, তপতীর মতই সে পার্টনার হিসাবে আছে, তার নাম পূরবী সেন। তপতীর থেকে বয়স কিছু বেশী, দেখতে শুনতে বেশ ভালই। তবে গুমোর একটু বেশী। তপতীর প্রতি একটু বিরাগ আছে। কেন, তপতী তা বুঝতে পারে না। পূরবী তার সঙ্গে কখনই ভাল করে কথা বলে না। নিতান্ত মুখোমুখি চোখাচোখি হলে ঠোঁটের একটা ভঙ্গী করে,

এটাকে ঠিক হাসিও বলা চলে না। তাই যথেষ্ট। তপতী চারিদিক থেকেই বড় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। কার যে কখন কী মনে আসে বলা যায় না। ওর মনের কোথাও কোথাও ভাঙন আছে। কাউকেই প্রায় প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে সাহস পায় না।

পূরবী সেন সিনেমায় ছোটখাট অভিনয়ও করে। এখনো তার আশা, ভবিষ্যতে সে হিরোইন হবে। তপতীর মনে একটু সন্দেহ হয়, সে বয়সটা আর পূরবীর আছে কী না। নাচের স্কুল থেকে বেরোবার সময় প্রায় রোজই কেউ না কেউ গাড়ি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে। তারা কারা, তপতী জানে না। তারা বিভিন্ন লোক, অতএব, পূরবীর তারা আত্মীয় বা বন্ধু হতে পারে।

আর একজন পুরুষ পার্টনার আছে, দীপক। বয়স পঁয়ত্রিশের মত। খুব ফাজিল. খুব হাসাতে পারে সবাইকে। সে-ই পূরবী সম্পর্কে তপতীকে অনেক খবর দিয়েছে। পূরবী যে নাচের স্কুলে যাবে, তার বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে বিভিন্ন বারে বা ক্লাবে যায়, পান করে থাকে, সেসব দীপকের মুখ থেকেই শুনেছে। দীপকের সব কথা বিশ্বাস করতে আবার কষ্ট হয় তপতীর। দীপক এসব কথাও বলে, রাত্রের বন্ধুদের সঙ্গে পূরবী সেনের বেড়ানোটা নাকি 'সোর্স অব বিজনেস।'

তপতী প্রথমে কথাটা বুঝতে পারে নি। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সোর্স অব বিজনেস মানে?'

দীপক বলেছিল, 'বিজনেস মানে বিজনেস। টাকা রোজগার করে।'

তবু তপতী দীপকের মুখের দিকে অবুঝ চোখে তাকিয়েছিল। পরমুহূর্তেই লজ্জায় আর ভয়ে ওর মুখের রঙ বদলে গিয়েছিল, বলেছিল, 'যাঃ, কী যে বলেন!'

দীপক বলেছিল, 'অন গড বলছি। পূরবী সেন যাদের সঙ্গে ঘোরে, তাদের দু' একজন আমারও বন্ধু। আমি সব জানি। দেখতে চান তো আপনাকে দেখাতে পারি।'

তপতী অবাক হয়ে বলেছিল, 'কেন, আমি দেখতে যাব কেন?'

'তা হলে বিশ্বাস করতে পারতেন।'

'দরকার নেই বাবা আমার। পূরবী সেন কি করছে না করছে তা দেখে আমি কি করব।'

দীপক খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'সেই সুযোগে আপনাকে নিয়ে আমার একটু বেড়ানো হত।'

'মানে?'

'মানে, আপনার সঙ্গে তা হলে প্রেম করার চেষ্টা করা যেত।'

তপতী ভুরু কুঁচকে দীপকের দিকে চাইতে গিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। দীপক কিন্তু গম্ভীর মুখেই বলেছিল, 'কেন আমি দেখতে খারাপ আর কম মাইনের চাকরি করি বলে প্রেম করার চেষ্টাও করা যাবে না?'

তপতীর বেশ ভাল লাগে দীপককে। ড্যান্সির স্কুলের মধ্যে দুজন মেয়ে, তপতীর হাসি আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, বলেছিল 'নিশ্চয়ই।'

'আর সেই চেষ্টাটা কি আপনার সঙ্গে করা যায় না?'

boiRboi.net

হাসির মধ্যেই তবু তপতীর ভুরু (আবার একটু) কুঁচকে উঠেছিল। 'আমার সঙ্গে কেন মশাই, আরো তো অনেক মেয়ে রয়েছে।'

'তাদের যদি আমার পছন্দ না হয়?'

'আপনাকেই বা আমার পছন্দ হবে কেন?'

দীপক আরো গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'সেটাই বলুন, আমার মত একটি ভোঁদরকে আপনার পছন্দ নয়।'

বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তপতী আবার জোরে হেসে উঠেছিল। দীপকের চরিত্রটা এই রকম। আসলে, ও মজা করে বলে বলেই, ওর সঙ্গে কথা বলা যায়। প্রেমে পড়ার কথা কেউ ওভাবে বলতে পারে না। অনেক ঘাটের জল খাওয়া ছেলে। কোথায় একটা বিলাতি কোম্পানীতে চাকরি করে। এক সময়ে ওয়েস্টার্ন নাচ গান নিয়ে খুব মাতামাতি করত। সে সময় সে অনেক অলীক স্বপ্ন দেখত। কলকাতা বসে নয়, একেবারে হলিউডে গিয়ে মুভির হিরো হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব অনেককাল মাথা থেকে বিদায় নিয়েছে। বিয়ে থা কিছু করেনি। একলা একটা এক ঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। বাবা মা ভাই বোনেরা কৃষ্ণনগরে দেশের বাড়িতে। সেখানে কিছু টাকাও প্রতি মাসে পাঠাতে হয়। ড্যান্নির নাচের স্কুলের প্রায় গোড়া থেকেই পার্টনার হয়ে ঢুকেছে। সীনিয়র পার্টনার হিসাবে। ওর মাইনেও কিছু বেশি। যেসব মেয়েরা নাচ শিখতে আসে দীপক তাদের পার্টনার, অবিশ্যি শেখাতেও পারে।

তাছাড়া দীপক একলা পুরুষ নয়। ড্যান্নিকে নিয়ে চারজন। তপতী দেখেছে দীপকের বন্ধুর সংখ্যা অনেক, এবং তা নানাজাতীয়, নানাধরনের। সকলের সঙ্গেই ওর খাতির। পুরবী সম্পর্কে ও যা বলে, হয়তো সবই সত্যি। কিন্তু বলার ধরনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

নতুন রেকর্ড বেজে ওঠে। তার আগেই পুরবী, দীপক আর তপতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রস্তুত। দীপকের সঙ্গে শিক্ষার্থিনী মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশ, যাকে বলে গ্রেস্‌ফুল মেয়েটি তা-ই। তবে মাথার চুলগুলো সে ঘাড়ের ওপর অবধি ছেঁটে দিয়েছে। কোঁকড়ান চুলের গোছা এলোমেলো, মাথার ওপর দিকে ঠেলে তোলা, যেন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আকাশে উঠতে চাইছে। মডার্ণ ফ্যাশানের এটাও একটা ধরন। অসমীয়া মেয়ে, রেবেকা শর্মা নাম। কলকাতাতে কিছুদিন থাকার জন্য এসেছে। শীঘ্রই আমেরিকা যাবে, ওর প্রেমিকার কাছে। তার আগে ড্যান্নির স্কুল থেকে একটু প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে, যাতে সেখানে গিয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে না থাকতে হয়।

পুরবীর সঙ্গে শিক্ষার্থীটি একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেট যুবক। দেখতেও সুন্দর, বোধহয় নাচ শেখার পেছনে কোন এ্যাম্বিশন আছে। তা না হলে, অর্থ দপ্তরের আয়কর বিভাগের সঙ্গে যাকে যুদ্ধ করতে হবে সারাজীবন, সে কেন পশ্চিমী নাচের প্রতি আকৃষ্ট হবে? কারণ অনেক কিছুই থাকতে পারে। হয়তো এখনো বিয়ে করে নি, এবং যাকে বিয়ে করবে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য আগেই নাচ শিখে রাখছে। অথবা বিদেশিনী প্রেমিকাও থাকতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু তপতীর এই পার্টনার শিক্ষার্থী, প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সের ব্যারিস্টার

সাহেবটি কেন নাচ শিখতে এসেছে, ও বলতে পারে না। বিলাতে যার এতদিন কেটেছে, সে এখনো নাচের স্টেপ দূরের কথা, প্রায় ষাট বছরের পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির মতই তার অবস্থা। শরীরে ইতিমধ্যেই মেদ জমেছে। চোখে চশমা, পোশাকে বিলাতিয়ানার ঢলঢলে ভাবটাই বেশি, আমেরিকান আঁটসাট ভাব না। মুখের ভাব অতি গোবেচারা। মনে মনে নাচ শেখার শখ আছে অথচ এমন আড়ষ্ট, প্রায় হাত পা কেঁপে যাবার মত অবস্থা। তপতীর হাতটা পর্যন্ত ভাল করে ধরতে পারে না, কোমরের ওপরে হাতটা তো ছোঁয়াতেই সঙ্কোচ। ব্যারিস্টারের আঙুলের কাঁপুনি পর্যন্ত টের পাওয়া যায়।

দীপকের সকলের সঙ্গেই বেশ ভাব। ব্যারিস্টার সাহেব বিবাহিত, সে কথা তপতী শুনেছে। স্ত্রী নাচ জানে না, বাঙালীরা গৃহস্থবধূ বলতে যেরকম বোঝে, সেইরকম। বিলাতে থাকতে ভদ্রলোক নাচ শেখে নি, কোন শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম করে নি, ভালভাবে পাশ করে, দেশে ফিরে এসে দিব্বি একটি সুন্দরী বালিকাকে বিয়ে করেছে, এখন হঠাৎ নাচ শেখবার ইচ্ছা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, তপতী বোঝে না পশ্চিমী নাচ শিখতে মহিলা পুরুষেরা আসেই বা কেন? বাঙালী সমাজের কোথাও এটা প্রয়োজনীয় না। অথচ হিসাব করলে দেখা যাবে স্বাধীনতার পরেই পশ্চিমী নাচের স্কুল অনেক বেড়েছে, অনেক বেশি লোক শিখছে। সম্ভবতঃ এতদিন পরে ভারতের মানুষেরা পশ্চিমী নাচ শেখার একটা গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে। সাহেবি আমলে কেউ পাত্তা পেত না। মেমসাহেবরা হয়তো কালো নেটিভদের সঙ্গে নাচতে চাইত না। তারপরেই তপতী মনে মনে জিভ কাটে, বলে, 'না না, যত খুশি মানুষ নাচ শিখতে আসুক। তবু কিছু আয় বাড়ানো যায়।'

কিন্তু তপতী এই নাচ শিখেছে কেন? কোথা থেকে শিখল?

কথাটা মনে হতেই, বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা নিশ্বাস সব ভারী করে তোলে। সেই সব দিনের কথা ও আর মনে করতে চায় না, সেইসব দিন—ওর শৈশব, কৈশোর, এমন কি দু বছর আগের জীবনটাও।

ড্যান্নি হঠাৎ রেকর্ডের পিন আবার তুলে নিল, নাচ শুরু হবার মুখেই। শিক্ষার্থীদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে তপতীর ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলল। ড্যান্নি যতই বিদেশে কাটিয়ে আসুক, নাচ শিখে আসুক, মেমসাহেব নিয়ে দুটো সংসার করে আসুখ মুল্লুকে, কথায় এখনো সেই চট্টগ্রামের টান। বিশেষতঃ যখন সে বাঙলা বলে তখন তো কথাই নেই। কথা শুনলে মনে হয় সে যেন প্রত্যেক শব্দের ওপর জোর দিয়ে, রেগে কথা বলছে। সে বলল, 'বারে বারে একটা কথা আপনাদের বলছি, আবার বলি। সবাই মনে রাখবেন, খুব সহজে শরীরকে চালনা করবেন। ফ্রিলি চলবেন এমন ভাবে যেন গানের তালের সঙ্গে আপনা আপনিই আপনারা দুলে দুলে নাচছেন। তাতে কিছু ভুল হয় হোক, সে ভুলটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। নিজেরাই আপনারা সজাগ হয়ে যাবেন, আপনার স্টেপের কোথায় গোলমাল হচ্ছে। স্টেপ ঠিক মত না পড়লে, অটোমেটিকেলি আপনার পার্টনারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বা ধাক্কা লেগে যাবে। কিন্তু টেক ইট ইজি, ভেরি ইজি, এ্যাণ্ড ভেরী স্মার্টলি, এটা সব সময় মনে রাখবেন। ও. কে. স্টার্ট।'

boiRboi.net

রেকর্ড চালিয়ে দিল সে। আর নাচ শুরু হতে না হতেই কী ঘটল, বোঝা গেল না। তপতীর হাত ছাড়িয়ে ব্যারিস্টার একেবারে পপাত ধরণীতল। বেচারি! তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, চশমা খুলে রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁচ মুছতে লাগল। রেবেকা শর্মা হেসে উঠল।

ড্যান্নি সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে উঠল, 'নো মিস্ শর্মা, প্লীজ, ডোণ্ট লাফ, ইট ইজ নট এ ফান।' তপতীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে, ভাবছে ও কোনরকম ভুল করে ফেলেছে কী না। কিন্তু ও তো কিছু বুঝতেই পারে নি, ঘটনাটা ঘটে গেল একেবারে চোখের পলকে। তাও ড্যান্নির বক্তৃতার পরমুহূর্তেই! ড্যান্নি ব্যারিস্টারের কাছে এসে বলল, 'হোয়াটস্ দ্য ট্রাবল উইথ য়ু স্যার। লেগেছে নাকি?'

ব্যারিস্টারের মুখও লাল। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, লাগে নি, মানে মানে—।'

সে পা তুলে, জুতোর তলাটা কয়েকবার দেখল, বলল, 'কী যে হল ঠিক বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ পড়ে গেলাম।'

ওদিকে পূরবী আর দীপক শিক্ষার্থীদের নিয়ে নেচে চলেছে। দীপকের সঙ্গে তপতীর চোখাচোখি হল। দীপক, ভুরু তুলে, চোখ বুজল মুহূর্তের জন্য। তপতীর ভিতরে হাসি কলকলিয়ে উঠল কিন্তু মুখ নিচু করে, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ভগবানকে ডাকতে লাগল, হে ভগবান, হাসি পায় না যেন।

ড্যান্নি চিন্তিতভাবে বলল, 'হুঁ, আপনার জুতোয় কিসের সোল্, রাবার?'

ব্যারিস্টার মাথা নেড়ে বলল, 'না তো।'

'তা হলে বোধহয় স্টেপ করতে গিয়ে কোনরকম আটকে গেছে। দেখি আসুন তো, আমার সঙ্গে নাচুন।'

বলে সে, ব্যারিস্টারের হাত ধরে আর একটা হাত তার কোমরের ওপর ধরিয়ে দিল। বলল, 'জোরে ধরবেন না, খুব আলগোছে ধরবেন।'

বলে সে একটু দাঁড়িয়ে, নিজেই গানটা একটু গুন গুন করতে লাগল, ব্যারিস্টারের দিকে চেয়ে, 'ওহ নো, নেভার টেল এ লাই···'

তারপরেই হাত ধরে টেনে স্টেপ করল। বলল, 'গানের মধ্যে ঢুকে যান, মেতে যান, খুশি হয়ে নাচতে থাকুন।'

ব্যারিস্টারের আড়ষ্টতা যেন অনেকখানি কমে গেল। পদক্ষেপ ভুল হলেও, সে ড্যান্নির সঙ্গে সঙ্গে সামনে পিছনে ঘুরে ঘুরে চলতে লাগল। তপতী একপাশে দাঁড়িয়ে রইল, দেখতে লাগল, আর মাঝে মাঝে অন্যদের নাচের দিকেও চোখ দিতে লাগল। রেবেকা আর দীপক মোটামুটি ভাল। রেবেকা মেয়েটি বেশ ফ্রি। স্টেপ-এ ভুল হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা বুঝতে পারছে, হেসে দীপকের কাছে ক্ষমা চাইছে, আবার ঠিক করছে, মাঝে মধ্যে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করে জেনেও নিচ্ছে।

দীপক একটিও কথা না বলে কখন কতটুকু ঘাড় ফেরানো দরকার, কখন কতটুকু মুখ তোলা দরকার, দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই তুলনায় পূরবী সেনের পার্টনার আবার একটু বেশি স্মার্ট হবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকটি স্টেপই ভুল করছে, অথচ যেন সহজ ভাবেই নাচবার চেষ্টায় এমন অঙ্গভঙ্গি করছে, হাসি পাবার মত। পূরবী সেনকে যেন

boiRboi.net

সেটাই বেশ উৎসাহিত করছে, হাসছে মিটি মিটি এ্যাকাউণ্টেণ্টের দিকে চেয়ে, মাঝে মাঝে মুখ তুলে নিয়ে আসছে মুখের কাছে, আবার সরিয়ে নিচ্ছে।

রেকর্ড থামতেই ড্যান্নি ব্যারিস্টারকে ছেড়ে দিল। তপতীকে ইশারা করল আবার নাচতে। ড্যান্নি রেকর্ড চালাল, 'আই উইল সেইল টু দ্য ইনফিনিট···।' তপতী ব্যারিস্টারকে নিয়ে স্টেপ করল। ব্যারিস্টার খুব সাবধানে ওর সঙ্গে আগে পিছনে করতে লাগল, যদিও কখনো দূরে সরে যাচ্ছে, কখনো হঠাৎ কাছে এসে পড়ত গিয়ে তপতীর পিঠের কাছে জোরে হাতের চাপ পড়ে যাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'সরি' বলে উঠছে। তপতী হেসে বলল, 'তাতে কী হয়েছে আপনি হালকা ভাবে চলা ফেরা করুন, তা হলেই হবে। এখন তো বেশ ভাল হচ্ছে।'

ব্যারিস্টারের মুখে সাফল্যের খুশি দেখা দিল। তপতী আরো পাঁচ ছয় দিন লোকটির সঙ্গে নেচেছে। কোনদিন কথা বলে নি। নাচা মানেই শেখানো। আজ ওর মনে হল লোকটা ভীষণ সরল, ব্যারিস্টার হিসাবে নিতান্তই ভাল মানুষ। পড়ে যাবার ঘটনাটা নিতান্ত করুণ। তপতীর মনে হল, একটু কথা বললে বোধ হয় ভাল হয়। আসলে, তপতীর হাত ধরলেই ব্যারিস্টার কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, আড়ষ্টতা আসে। বোধ হয় গোঁড়া পরিবারের মানুষ, মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা নেই। স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়ের হাত ধরাটাই যাদের কাছে ভীষণ খারাপ। ড্যান্নির সঙ্গে যতটা সহজে ব্যারিস্টার চলে ফেরে পা ফ্যালে, তপতীর সঙ্গে তা পারে না। এবং কথা বলার পরে দেখা গেল ব্যারিস্টার সহজ হয়ে উঠছে, একটু যেন আত্ম-বিশ্বাস আসছে।

তপতীর সঙ্গে চকিতে একবার ড্যান্নির দৃষ্টি বিনিময় হল। ড্যান্নি ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাকে উৎসাহিত করল। তারপরেই রেকর্ড শেষ হয়ে যাবার পরে প্রথম চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টেণ্টের দিকে ফিরে ড্যান্নি বলল, 'নাচের সময় মেয়ে পার্টনারকে অত জোরে জড়িয়ে ধরবেন না, সব ব্যাপারটাই হবে খুব আল্‌গোছে।'

মিনিট খানেক বিরতি। ড্যান্নি কথাটা এ্যাকাউণ্টেণ্ট ছাত্রের দিকে চেয়ে বলল বটে, ব্যাপারটা আসলে পূরবী সেনেরই তাকে বলা উচিত ছিল। নাচের মধ্যে শালীনতা একটা সৌন্দর্য, বিশেষ করে যে নাচটা এখন হল। লোকটি যদি ভুল করেই পূরবী সেনকে ওভাবে ধরে থাকে, তা হলে পূরবীরই উচিত ছিল তার ভুল শুধরে দেওয়া। কিন্তু সে তা দেয় নি, ববং বেশ খুশির সঙ্গেই রাজী ছিল যেন। ড্যান্নির চোখের দিকে তাকিয়েই তপতী বুঝতে পারল, পূরবীকে ড্যান্নি ছাড়বে না। ছাত্রছাত্রীরা চলে যাবার পরে নিশ্চয়ই কিছু বলবে। পূরবী যেন লোকটিকে কী বলছিল নাচের সময়। কী বলছিল কে জানে।

তপতী দীপকের দিকে তাকাল। দীপক এমন ভাবে ভুরু তুলে চোখ আধবোজা করে একবার পূরবী সেনকে দেখে আবার তপতীর দিকে তাকিয়ে হাই তুলল, হাসি দমন করা মুশকিল। কিন্তু হাসা চলবে না। অবিশ্যি রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকবার কথা না। স্টাফের সবাই যাতে বেশ গম্ভীর হয়ে থাকে, কম কথা বলে, ড্যান্নি সেটা চায়। কথা বলতে হয়, হাসতে হয়, এক কোণে সরে গিয়ে কর, কেউ কিছু বলবে না। এমন কিছু করা চলবে না যাতে নাচের স্কুল সম্পর্কে কেউ কোন বাজে কথা বলতে

পারে। সেটা অবিশ্যি ঠিকই, এসব জায়গায় একটু বাচালতা প্রকাশ পেলে, রটনা অনেক বড় হয়ে ওঠে! তিলকে তাল করার সুবিধা। পশ্চিমী নাচের স্কুল যে!

আবার রেকর্ড বেজে উঠল। আবার নাচ শুরু হল। এবার একজন যুবক এগিয়ে এল তপতীর দিকে। এর আগে একদিন মাত্র ছেলেটিকে দেখেছে ও। ছেলেটিই বলতে হবে, কারণ বাইশ তেইশের বেশি বয়স না। তপতীর থেকে ছোটই হবে। ওর সঙ্গে আজ একটি মেয়েও এসেছে, বোধ হয় বান্ধবী। বয়স উনিশ কুড়ি। তপতীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার মেয়েটির দিকে ফিরে তাকাল ছেলেটি। দুজনে হাসল। তপতী তার দিকে হাত বাড়িয়ে হাসল। ছেলেটি প্রথমে ভুল হাত তুলল। তপতী শুধরে দিয়ে বলল, 'আমার বাঁ হাত আপনার ডান হাত দিয়ে ধরুন।'

ছেলেটি তাড়াতাড়ি শিখবে, সন্দেহ নাই। মনোযোগ আছে, শরীর হালকা, তবে সবই একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলে। তালের আগে তার পা চলে আসে, যখন যেভাবে পা ফেলা উচিত অনেক আগেই সেখানে পা পড়ে যায়। তপতী বলল, 'একটু স্লো চলুন, মিউজিকের দিকে লক্ষ্য রাখুন।'

ছেলেটির দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলল ও। নাচের সময় কারোর দিকেই ও তাকায় না। তাকাতে ভাল লাগে না, কারণ কেউই ওর পরিচিত না। শুধু পরিচিত হলেই মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখের ওপর চোখ রেখে থাকা যায় না। সেটা পারা যায় বোধহয় শুধু একজনের সঙ্গেই।

কথাটা মনে হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়। বুকের কাছেই নিশবাস আটকে রাখে। অনেকদিন আগের ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পুরনো ছবির মতই সেগুলো এখন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যায় না, যখন ভেসে ওঠে, তখন মনে হয়, সবই যেন বড় ঝকঝক করছে। এই তো সেদিনের ছবি যেন। এই ছেলেটির সঙ্গে নাচতে গেলে কথাটা আরো বেশি করে মনে পড়ে। বেশি করে চোখে ভাসে। এরকম বাইশ তেইশ বছরের একটি তরুণ.... ।

ছেলেটির স্টেপ সম্পর্কে তপতী আবার সচেতন হয়ে ওঠে। ভুল করছে বারে বারে।...ওর চোখ পড়ে ড্যান্নির দিকে। চোখাচোখি হয়ে যায়। ড্যান্নি ওর অন্যমনস্কতা টের পেয়েছে, তাই তাকিয়ে দেখছে।

মিউজিক শেষ হল। আবার নতুন রেকর্ড। ড্যান্নি সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তপতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ড্যান্নি প্রায় রোজই এরকম করে। একবার সবাইকে দেখাবার জন্য, হয় পূরবী বা তপতীকে নিয়ে সে নাচে। যাতে সবাই বুঝতে পারে নাচের ভঙ্গিগুলো কেমন হওয়া উচিত। কোন কোনদিন দীপককেও সে এই কাজটা দেয়। পূরবী বা তপতীর সঙ্গে নাচতে বলে।

তপতী দীপকের দিকে চেয়ে দেখল সে নাচ দেখছে আর ঠোঁট নেড়ে গানটা গাইছে। চোখাচোখি হতে হাসল। এমন সময় দুজন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। একজনকে একটু চেনা মনে হল তপতীর। বোধহয় এখানেই দেখেছে। আর একজন অপরিচিত, নতুন। টেরিনের কোটটা হাতে ঝোলানো, লম্বা সুদর্শন ব্যক্তি। বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশ হতে পারে। কাঁচা জলপাই রঙ প্যান্ট, কোটটাও সেই রঙেরই। গাঢ় ক্রীম

boiRboi.net

রঙের সার্টের গলায় নীল বেগুনিতে মেশানো অস্পষ্ট ফুল ছাপের টাই। ড্যান্নি আর তপতীর নাচের দিকে তাকাল।

এ মানুষকে দেখলেই মনে হয়, নাচের জগতের লোক না। মুখের ভাব গম্ভীর, কিছুটা বা চিন্তিত, চলাফেরা মন্থর। নাচের প্রতি কোন কৌতূহল নেই। নিতান্ত একবার চোখ তুলে দেখা। হয়তো ড্যান্নির পরিচিত, কোন কারণে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু চেনা মুখ লোকটির দিকে তাকিয়েই ড্যান্নি ঘাড় নেড়ে বসতে বলল। দুজনেই গিয়ে চেয়ারে বসল। ইতিমধ্যে ন'টা প্রায় বাজে। ছুটির সময় হল। ড্যান্নি ঠিক সময় দেখেই রেকর্ড লাগিয়ে নিজে নেচে দেখাল। আজকের মত শেষ।

নাচ শেষ হতেই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তপতী একবার ল্যাভেটরিতে গেল। আয়নায় মুখটা দেখে বেরিয়ে এল। ড্যান্নিকে বলল, 'যাচ্ছি।'

ড্যান্নি তখন নবাগত দুজনের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। তপতী শুধু এইটুকু শুনতে পেল, ড্যান্নি তখন বলছে, 'হোয়াই নট ? আই সী নো ডিফেক্ট অব য়ু। এজ ইজ নাথিং—।'

বলতে বলতে ড্যান্নি তপতীর দিকে ফিরে বলল, 'গুন্নাইট।'

তপতী বেরিয়ে আসবার আগে একবার চারদিকে দেখল। দীপক নেই। বোধহয় বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুরবী সেন বসে আছে চুপ করে। যা ভেবেছিল তাই হয়েছে, ড্যান্নি নিশ্চয় তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। তখনো ঘর থেকে সবাই বেরোচ্ছে। তপতী সকলের পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। সিঁড়ির নিচের আলোয় ঘড়ি দেখল, নটা বেজে পাঁচ। এই মুহূর্তে ওর মনটা ছটফট করে উঠল বাড়ির জন্য। চোখের সামনে দুটি মুখ ভাসতে লাগল। তপতী না যাওয়া পর্যন্ত হয়তো কেউ শুতে যাবে না।

উঠনে পা দিতে না দিতেই, দীপক কোথা থেকে এসে হাজির হল। বলল, 'চলুন, একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

তপতী এখন আর কোথাও যাবে না জেনেও দীপকের এটা একটু পিছনে লাগা। দীপক বলল, 'নাঃ, আপনাকে নিয়ে পারা যাবে না মিস্ রায়। এতদিন ধরে বিয়ে থা করলেন না, একজন যুবকের সঙ্গে যে একটু বেড়াতে যাবেন, তাও যাবেন না। অথচ আপনি ওয়েস্টার্ন ড্যান্স আর মিউজিক নিয়ে থাকেন।'

'থাকি আপনাকে কে বলল ? টাকা পাই, তাই নাচতে আসি।'

'ওই হল। লোকের চোখে আপনি হলেন মেমসাহেব। আর আমার সাথে একটু বেড়াতে যেতে পারেন না ?'

তপতী হেসে বলল, 'যাব একদিন।'

গেট থেকে বেরিয়ে দীপক বলল, 'ওই দেখুন তো, প্রেমিকটি কী রকম গাড়ি নিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে বসে আছে। প্রেমিকা এলেই হাওয়া খেতে চলে যাবে।'

তপতী তাকিয়ে দেখল। অবাক হয়ে বলল, 'কী যা তা বলছেন। উনি তো আমাদের নাচের স্কুলের ছাত্র, সেই এ্যাকাউন্টেণ্ট ভদ্রলোক।'

'ছাত্র হলে বুঝি প্রেম করতে নেই ?'

'এখানে ওঁর প্রেমিকা আসবেন কোথা থেকে ?'

boiRboi.net

'ড্যান্নির স্কুল থেকে।'

তপতী দীপকের চোখের দিকে তাকাল। দীপকও তাকিয়ে ছিল। তপতী যেন ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল, তাই সহজে আর দীপককে ঘাঁটাতে সাহস পেল না। কী বলবে কে জানে।

কিন্তু দীপক ছাড়বার পাত্র না। বলল, 'পূরবী সেন এতক্ষণ ছিল ভদ্রলোকের নাচের পার্টনার আর শিক্ষিকা, এখন হয়ে যাবে প্রেমিকা।'

তপতী আপত্তি করে বলল, 'যাঃ, এর মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে পূরবী সেনের সেরকম আলাপই বা হল কোথায়, প্রেমের অবকাশই বা পেল কোথায়?'

দীপক আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তাই তো মিস্ রায়, প্রেমের আপনি কিছুই জানেন না, দেখলেনও না, একেই বলে প্রেম, চোখে চোখে চেয়েই সব ঠিক হয়ে যায়, মন জানাজানি হয়ে যায়। বিশ্বাস না হয় দাঁড়িয়ে দেখে যান, পূরবী সেন এসে এ গাড়িতে উঠবে, মানে পূরবীকে লিফট্ দেবে আর কী।'

শেষের দিকে এমন সুর করে বলল, তপতী হেসে উঠল। বলল, 'আপনার যত বাজে কথা।'

'বেশ, বাজে কথা পরখ হয়ে যাক।'

তপতী বলল, 'না মশায়, মাপ করবেন। কে কার সঙ্গে কোথায় যাবে, সে সব দাঁড়িয়ে দেখার সময় নেই আমার।'

দীপক বলল, 'আমি আর কী করব বলুন, আমাকে রাত্রি বারোটা অবধি এখন প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখে বেড়াতে হবে। আপনাকে বললাম, আপনি রাজী নন।'

তপতী প্রায় ওর বাস স্টপে এসে পড়ল। বলল, 'দাঁড়ান, আর একটু ভাব জমুক, তারপর যাব।'

দীপক বলে উঠল, 'তা হলে দাঁড়ান, একটু বাদাম খাইয়ে দিই। বাসে যেতে যেতে খাবেন।'

তপতী আপত্তি করল, দীপক শুনল না। বাদাম কিনে নিয়ে এসে তপতীকে দিল। নিজে খেতে খেতে বলল, 'যাক, পূরবী সেনের আবার একটি নতুন খদ্দের জুটল।'

তপতী ধমক দিয়ে বলল, 'খদ্দের আবার কী, এই তো বললেন প্রেমিক।'

'ওই হল, প্রেমিকও যা খদ্দেরও তাই। পূরবী সেনের প্রেম তো, বেশ দামী প্রেম।'

তপতী একবার দেখল রাস্তায় উঁকি দিয়ে। বাস দেখা যাচ্ছে না। বলল, 'আপনার খুব আফশোস মনে হচ্ছে?'

'হবেই তো। পুরুষ মানুষ হয়েছি, অথচ টাকা নেই। মেয়েও নই যে কেউ এগিয়ে আসবে। সেইজন্যই তো বলছিলাম।'

তপতী বাদাম খেতে খেতে দীপকের মুখের দিকে দেখল। দীপক অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছে, বাদাম খাচ্ছে। ও জানে, দীপক ওকে সত্যি যেতে বলছে না সঙ্গে। তপতীর দায়দায়িত্বের কথা তার মোটামুটি জানা আছে। কিন্তু কয়েক মাস মেলামেশার ফলে এটা তপতী বুঝতে পেরেছে, দীপক অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। কৃষ্ণনগরে বাড়ির লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা নেই। কথা শুনলে মনে হয়, বাড়ির লোকদের

boiRboi.net

সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ নেই। বন্ধুবান্ধব সম্পর্কেও নিরাসক্ত। সে যে পাড়ায় থাকে, সেখানে তথাকথিত বাঙালী গৃহস্থ প্রায় নেই। আজকাল যদিও বা থাকে, এককালে বাঙালীরা সে সব পাড়ায় যাতায়াতই করত না। একটা মেলানো মেশানো এলাকা, গরীব মুসলমান, খ্রীষ্টান, চায়নিজ আর নানান মিশ্রিত মানুষদের বাস। ও নিজেকে সর্বাংশেই বাঙালীদের চেনা পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

তপতী জানে, ও যেতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত দীপক হেসে হাত জোড় করবে। বলবে, 'দোহাই, রাজী হবেন না। আমার এখন অনেক কাজ।'

আসলে, দীপক এখন কোথাও ওর চেনা আড্ডায় গিয়ে সস্তার মদ খাবে। দীপকের মুখ থেকেই একথা শুনেছে তপতী। প্রথমদিন শুনে ব্যাপারটা মোটেই ওর ভাল লাগে নি। দীপক এই ভাবে বলেছিল, 'এখন কোথাও যাব। একেবারে খাঁটি দিশি তরল পদার্থ নিয়ে বসে খাব। তারপরে পেটে কিছু দিয়ে বিছানা নেব।'

তপতী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কোন কথা বলে নি। দীপক সেটা বুঝতে পেরে বলেছিল, 'দোহাই মিস্ রায় সত্যি কথাটা বলে ফেলেছি, বাহাদুরি নেবার জন্য না। দুঃখের কথা একটা বললাম, এই আর কী।'

পরে তপতী বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটা সত্যি দুঃখের। একটা নির্জলা দুঃখজনক সত্যি কথা বলেছিল দীপক, বিশ্বাস করেছিল, তপতীকে কথাটা বলা যায়। মদ খাওয়া না খাওয়া নিয়ে কোন তর্কে যায় নি তপতী, দীপকের জন্য মনে মনে ওর একটু কষ্টই হয়েছিল। এই সমস্ত কারণে, কল্পনা করতে ইচ্ছা করে, দীপকের জীবনের পিছনে হয়তো কোন বড় দুঃখের ঘটনা আছে যা ওকে নিঃসঙ্গ আর হতাশ করে তুলেছে। যদিও সে সব কথা কোনদিন জানতে চায় নি তপতী। ভাবে, জানাজানির কী-ই বা থাকতে পারে। মানুষের জীবনে দুঃখটা অনিবার্য। এক একজনের কাছে সে এক এক বেশে আসে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোধ হয়, তপতী দীপকের প্রতি খানিকটা বন্ধু ভাবাপন্ন।

বাস এসে পড়ল। দীপকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, তপতী বাসে উঠল। ওর নিজের ঘর দুটো চোখের সামনে ভেসে উঠল, আর দুটি মুখ। একলা হলেই আর কিছু মনে আসে না। একটা উদ্বেগ ব্যাকুলতায় ভাবতে থাকে কখন গিয়ে বাড়ি পেঁছবে।

ভবানীপুরের ট্রামরাস্তার ওপর বাস থেকে নেমে একটা গলির মধ্যে ঢুকল ও। সেখান থেকে আরো সরু অন্ধকার একটা গলির মধ্যে ঢুকল। একটা পুরনো দোতলা বাড়ি, পুরনো দরজার কড়া ধরে নাড়া দিল। তপতীর বেশবাস, যেখান থেকে ও এল, সে সবের সঙ্গে যেন এ পরিবেশটাকে ঠিক মেলান যায় না। ওর পোশাক আসাক্ হয়তো দামী না, কিন্তু সব মিলিয়ে ওকে মনে হয়, সজ্জা পটীয়সী নাগরিকা। ওর চুলের ফ্যাসান, জামার কাট, ঠোঁটের রঙ, চোখের কাজলে ওকে যেন অন্য পরিবেশের মানুষ বলে মনে হয়। তার সঙ্গে ওর চেহারাটাও আছে। ওর চলাফেরা ভাবভঙ্গিও আছে। এখানে যেন ওকে সব বেমানান লাগছে, এই প্রায় এঁদো গলির অন্ধকারে, পুরনো একটা বাড়ির দরজায়।

boiRboi.net

তপতী আবার কড়া নাড়বার আগেই দরজা খুলে গেল। সামনে বারান্দার ছাদে আলো জ্বলছে। দরজায় একজন দাঁড়িয়ে, বছর পঁয়ত্রিশ চল্লিশের একটি স্ত্রীলোক। সে তপতীর ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে চুপ করবার ইশারা করে সরে দাঁড়াল। তপতী ঢুকতে ঢুকতে চুপিচুপি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমিয়েছে?'

স্ত্রীলোকটিও তেমনি ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, এই মাত্তর। আপনি এসেছেন জানলে লাফ দিয়ে উঠে পড়বে।'

তপতীর মুখে একটু করুণ স্নেহের হাসি দেখা দিল। ও বারান্দার ওপর দিয়ে একটা ঘর পেরিয়ে, আর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরটা মোটামুটি বড়ই। সস্তা ধরনের বড় একটা খাট। বিছানার ওপর দুজনে শুয়ে আছে। একটি বছর ছয়েকের ছেলে, আর একটি বছর চারেকের মেয়ে। মেয়েটি কাত হয়ে শুয়ে আছে, ছেলেটি প্রায় উপুড়। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, মেয়েটির মাথায় থোকা চুল, মুখখানি মিষ্ট, রোগা রোগা। এখন ঘুমন্ত অবস্থায় অসহায় আর করুণ দেখাচ্ছে। দুজনের মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে।

ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। যা কিছু আছে, সবই অল্প দামের। কিন্তু সবই সাজানো গোছানো, ঝকঝকে। পাশে আর একটি ঘরের দরজার ওপরে পর্দা ঢাকা। সে ঘরটি অন্ধকার। তপতী আস্তে আস্তে খাটের সামনে গেল। আগে মেয়েটির বুকের ওপরে আস্তে হাত রাখল। তারপর আস্তে আস্তে একটু বুলিয়ে দিল। ঘুমন্ত মেয়েটির একটি বড় নিশ্বাস পড়ল।

তপতীর যেন নিশ্বাস আটকে গেল, বুকের কাছ থেকে কিছু একটা উঠে যেন গলার কাছে আটকে রইল। ও মেয়েটির মাথায় হাত দিল। মেয়েটির একটি হাত নড়ে উঠল। তপতী হাত সরিয়ে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে ছেলেটির মাথার কাছে ঝুঁকল। সবে তার পিঠে হাত দিতে যাবে, হঠাৎ ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে তপতীকে জিভ ভেংচে দিয়েই আবার মুখ ঢেকে ফেলল। তপতী চমকে উঠে চোখ বড় করল। তারপরে নিঃশব্দে হেসে উঠে আল্‌তো করে ছেলেটির চুলে হাত দিল। তৎক্ষণাৎ সে উঠে বসল। বলে উঠল, 'চারু দিদি ভেবেছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।'

কথা শেষ হবার আগেই, তপতী হাত দিয়ে তার মুখ চাপা দিল, চুপিচুপি গলায় বলল, 'চুপ টুকু, ভিমি উঠে যাবে না?'

টুকু তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে, ফিসফিসিয়ে বলল, 'তা হলে চল, পাশের ঘরে যাই।'

বলে টুকু নিজেই পর্দা তুলে পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিল। তপতী হাসতে হাসতে পিছনে চারুর দিকে ফিরে তাকাল। চারু নিচু স্বরে বলল, 'একটুও বুঝতে পারিনি দিদিমণি, এমন মটকা মেরে পড়ে আছে সেই কখন থেকে!'

তপতী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হাতের ব্যাগটা র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গেল। দেখলেই বোঝা যায়, এ ঘরটি বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মেঝের ওপর একটি মাদুর আর বালিশ প্রমাণ করছে চারু রাত্রে এ ঘরে শোয়। তপতী ঘরে ঢুকতেই টুকু বলল, 'চারুদিদিকে খুব ভোগা দিয়েছি।'

তপতী বলল, 'বেশ হয়েছে, ভোগা টোগা বলতে হবে না। ঘুমোওনি কেন এখনো?'

boiRboi.net

টুকু পরিষ্কার জবাব দিল, 'ঘুম না এলে কী করব?'

'তাই চারুদিকে ঠকানো হচ্ছিল?'

'কী করব, চারুদি খালি বলে, "ঘুমোও টুকু, ঘুমিয়ে পড়, না হলে মানি এসে রাগ করবে।" তুমি রাগ করছ?'

তপতী বলল, 'রাগ করছি না। কিন্তু বেশি রাত্রি অবধি জেগে থাকলে, তোমার শরীর খারাপ হবে, ভোরবেলা উঠতে পারবে না।'

টুকু বলল, 'কিন্তু তুমি বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না।'

তপতী হাত বাড়িয়ে টুকুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

টুকু বলল, 'কী জানি। ভাল লাগে না।'

তপতী একটু তাকিয়ে রইল টুকুর মুখের দিকে। ওর স্নিগ্ধ হাসি মুখে আবার একটা ছায়া নেমে এল যেন। আবার একটা নিশ্বাস উঠে আসতে চাইল। তপতী জানে, কেন টুকু ঘুমোতে পারে না। কেন ওর ভাল লাগে না। সে কথা মনে হতেই, টুকুকে আরো নিবিড় করে কোলের কাছে টেনে ধরল। বলল, 'কিন্তু, টুকু তোর ভয়ের তো কিছু নেই, আমি তো বাড়ি আসবই।'

টুকু বলল, 'তা হোক্‌গে আমার ঘুম আসে না।'

তপতী বলল, 'বেশ, এখন যেয়ে ঘুমো।'

টুকু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে আদর কেড়ে বলল, 'না, আমি তোমার সঙ্গে শুতে যাব।'

তপতী বলল, 'আমি তো এখন চান করতে যাব।'

'ততক্ষণ আমি জেগে জেগে বই পড়ব।'

'তারপরে আমি খাব না?'

'তখন তোমার সঙ্গে আমি গল্প করব।'

তপতী টুকুর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'ছুঁচো।'

চারু এসে এ ঘরে ঢুকল, বলল, 'দিদিমণি, তোমার জামাকাপড় নাইবার ঘরে দিয়ে দিয়েছি।'

টুকুর দিকে ফিরে বলল, 'টুকু, তুমি এস শুয়ে পড়বে।'

টুকু কাঁচকলা দেখিয়ে বলল, 'আমি মনির সঙ্গে শুতে যাব, কথা হয়ে গেছে।'

তপতী বলল, 'সেটা ঠিক আছে, তা বলে তুমি চারুকে কাঁচকলা দেখাবে কেন?'

টুকু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করল, 'সরি চারুদি।'

চারু কপট ঝংকার দিল, 'রাত দুপুরে যা খুশি তাই করোগে।'

চারু তপতীর খাবার গরম করতে গেল। তপতী চলে গেল বাথরুমে। চারুর প্রতি তপতী বিশেষ নির্ভরশীল। ওর অবর্তমানে, সারাদিন এই বাড়ি আর শিশু দুটির সমস্ত দায়িত্ব তার ওপর। তা ছাড়া রান্নাবান্নার কাজ আছে। সঙ্গে সাহায্য করে একজন ঠিকা ঝি। চারু সে সব কাজ যথাসম্ভব ভাল ভাবেই করে। তার ওপর নির্ভর করা যায়।

শোবার ঘরের এক পাশে বাথরুম, আর এক পাশে খুপরি রান্নাঘর। বারান্দার একটা জায়গা ঘিরে, মাথায় এ্যাসবেস্টসের ঢাকনার নিচে খাবার টেবিল পাতা। রান্নাঘর দিয়েই যাতায়াত করা যায়। একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত, শুধু এইটুকু, এ অংশ

boiRboi.net

ভিন্ন অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি নেই। মাঝখানে পাঁচিল তোলা। ও পাশে অন্য ভাড়াটে।

তপতী গা ধুয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে, টুকুকে নিয়ে খেতে বসল। একবার টুকুর মুখের দিকে দেখল, জিজ্ঞেস করল, 'একটু খাবি নাকি ?'

টুকু মাথা নেড়ে বলল, 'না, চারুদি খালি বেশি করে খাইয়ে দেয়।'

তা না হলে মনির সঙ্গেও খাবার ইচ্ছে টুকুর হয়। খেতে খেতেই ঠিকা ঝি সম্পর্কে কিছু অভিযোগ চারুর মুখ থেকে শোনা গেল, পরের দিন কী বাজার হবে সেসবও ঠিক হয়ে গেল। টুকুর নানান কথাও শুনতে হল, ইস্কুলে কী কী ঘটেছে, কার সঙ্গে ঝগড়া, কার ভাব, কোন টিচার কী বলেছে, রাস্তায় আসতে আসতে কী কী দেখেছে, তার বহুবিধ বর্ণনা।

খেয়ে উঠে টুকুকে নিয়ে শোবার মুহূর্তেই টুকুর আসল রহস্যটা জানা গেল। তপতী আলোর সুইচ্ অফ্ করে, বেডসুইচ অন্ করে শুতে না শুতেই টুকুর প্রথম কথা শোনা গেল, 'মানি, একটা গল্প বল না।'

তপতী যে কথাটা একেবারেই অনুমান করতে পারে নি, তা না। বলল, 'ও, এই জন্য তুমি জেগে আছ।'

টুকু প্রতিবাদ করে বলল, 'তা কেন। তুমি আসনি বলেই জেগেছিলাম।'

'কিন্তু টুকু, এখন যে আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'তুমি তো এখন জেগে জেগে বই পড়বে।'

সেটাই তপতীর অভ্যাস। পুরনো অভ্যাস, কয়েক বছরের। যখন থেকে জীবনটা কেবল বেঁচে থাকার জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এক সময়ে কাজ না করেও চোখ জুড়ে ঘুম আসত। মনে কোন চিন্তা ছিল না, এখন সারাদিন কাজের পরেও ঘুম আসতে চায় না। বাতি নিভিয়ে দিলে, অন্ধকারটা যেন থাবা বাড়িয়ে গিলতে আসে, নির্মম অসহায় দুশ্চিন্তার বেগে।

তপতীর মনে হয়, ওর মত টুকুর মনটাও বোধ হয় তৈরী হয়ে উঠেছে। জেগে থাকা অবস্থায় অন্ধকার বোধ হয় ওর ছোট প্রাণটাকে গ্রাস করতে আসে। তাই গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোয়। তপতী দু এক মিনিটের মধ্যেই ঠিক করে নেয়, কী গল্প বলবে। ওর বালিশের পাশে যে ইংরাজী পকেট বুক, তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সারাদিনে ওর কোন যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু রাত্রের নিদ্রার জন্য মিস্ট্রী আর হরর ওর ভাল ওষুধের কাজ করে।

রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ে গল্প'-এর আখ্যান, একটু ছড়িয়ে বিস্তৃত করে বলে। গল্প শেষ হয়ে আসে, টুকুও তখন ছোট্ট, ইস্কুলে-পড়া ছেলে, নায়ক আর যুবতী রাজকন্যা বৌয়ের জগতে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। গল্প শেষ হয়, টুকুর চোখে ঘুম নেমে আসে। তবু একবার শেষ জিজ্ঞেস করে, 'মানি, আজ ড্যান্সির ইস্কুলে গেছলে, না ?'

'হ্যাঁ।'

'কী নাচ শেখালে ? ট্যাংগো শিখিয়েছ ?'

'হুঁ।'

boiRboi.net

'তোমার সঙ্গে রবিবারে আমি স্প্যানিশ ওয়ালজ্ নাচব, উঁ?'

'হুঁ।'

টুকু আর কোন কথা বলল না। তপতী বইয়ের পাতা খুলে তুলে নিয়ে এল না চোখের সামনে। ঘুরন্ত পাখার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। দু তিন মিনিট পরেই টুকুর ঘুমন্ত নিশ্বাস শোনা গেল। আর তপতী ভাবল, ট্যাংগো, স্প্যানিশ ওয়লজ্, ওয়ালজ্, কুইক স্টেপ, ফকস্ ট্রট্…আরো কত, রাম্বা, সাম্বা. চা চা, গো গো শেক, ট্যাপ, চার্লসটন…। চোখের সামনে নাচের ছবিগুলো ভেসে উঠতে থাকে। একটি বিশ বছরের মেয়ে নাচছে। নাচছে আরো কত পুরুষ সঙ্গী। এক একটা নাচের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। মেয়েটির নিজের যুবক বন্ধু, পরিবারের অতিথি পুরুষেরা, বাবার বন্ধুরা পর্যন্ত। নীরদদার (জামাইবাবু) বন্ধুরাও আছে।

ছবিগুলো যেন স্পষ্ট হয়ে এখনো ভেসে ওঠে। স্মৃতি একটা শত্রু। সেই সব ছবির সঙ্গে, এই এঁদো গলির একতলা বাড়ির, এই ঘরে, এই আসবাবপত্র, এই তপতীর কী সম্পর্ক আর আছে! মিলই বা কতটুকু। তপতীর একটা বড় নিশ্বাস পড়ে। তবু সময়কে শত কোটি প্রণাম। একদা যা সামাজিক, পারিবারিক কালচারের, ম্যানার্সের এবং আনন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আজ তা জীবিকা হয়ে উঠতে বাধা হয় নি। পশ্চিমী নাচের স্কুলে সপ্তাহে ছ ঘণ্টা করে, আজ অন্ততঃ একশোটা টাকাও পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে, কলকাতায় এও সম্ভব। ওর ছেলেবেলায়, আজকের কলকাতার মত কয়েকটি পশ্চিমী নাচের ইস্কুল ভাবা যেত না। এখন হয়েছে। সেইজন্য পিয়ের আর রুজের কথাও মনে পড়ে যায়। যারা এসে ওকে আর দিদিকে নাচ শেখাত। পিয়ের আর রুজের নাচের তুলনা হয় না। কলকাতায় অমন সুন্দর করে আর কাউকে ও নাচতে দেখে নি।

হঠাৎ মেয়েটি ওর দিকে পাশ ফিরে গায়ের ওপর একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল।

তপতী শিশুটির দিকে ফিরে তাকাল। ছোট হাতটি ওর এক দিকের বুকের ওপর। পাতলা একটি জামা, তপতীর বুকের অর্ধেকের ওপর খোলা রয়েছে। ওর উন্নত বুক এখন চিৎ হয়ে থাকার জন্য আরো উন্নত আর উদ্ধত দেখাচ্ছে। সেখানে মাতৃত্বের কোন ছাপ পড়ে নি, দাগ লাগে নি। তা বলে এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের জীবনে এই বুকে কোন স্পর্শ লাগে নি, তা বলা যাবে না। কিন্তু তার এই ধরিত্রী শরীরে কোন দীর্ঘ ধারালো ফলার লাঙল বিদ্ধ হয়ে ফালা ফালা করে নি, ফসল ফলে নি। তবু দুটি শিশু ওর বুকের দুপাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

তপতী ঠোঁটে ঠোঁট টেপে। একবারু চোখ ফিরিয়ে শিশু দুটিকে দেখল। বুকের ওপর ছোট হাতের ওপর নিজের একটি হাত রাখে। আর এক হাত দিয়ে বেড সুইচ অফ্ করে দেয়। অন্ধকার মুহূর্তে জমাট বাঁধে। আর তার ওপরে ভেসে উঠতে থাকে ছবির পর ছবি।

boiRboi.net

যখন ভূমিকম্প হয়, তখন একটা গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আজকাল পৃথিবীতে সমরবিদ বিজ্ঞানীরা যে সব বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী করেছে, তাতে সমস্ত

পৃথিবী আর মানবজাতিই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধ প্রাকৃতিক ব্যাপার না, মানুষের তৈরী। ভূমিকম্প একান্ত ভাবেই প্রাকৃতিক। তবু সেই সব ধ্বংসের মধ্যে মানুষের মনে বোধ হয় একটা সান্ত্বনা থাকতে পারে। সকলের সঙ্গেই সবাইকে মৃত্যু ভাগ করে নিতে হয়।

কিন্তু চোখের সামনে সবাই যখন হাসছে খেলছে, স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে, তখন একজনের ওপর সহসা মৃত্যু নেমে আসে বলেই তার দুঃখটা মর্মান্তিক, শোক গভীর হয়। তপতীদের পরিবারটা সেই ভাবেই যেন হঠাৎ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এটা একটা পারিবারিক ভূমিকম্পের মত। না, ভূমিকম্পের মত একটা প্রাকৃতিক ব্যাপারই শুধু এটাকে বলা চলে না। সমরবিদদের ষড়যন্ত্রের মত ঘটনাও এর মধ্যে ছিল।

তিন পুরুষের বিলাতফেরত বংশধর ছিলেন তপতীর বাবা। সকলেই ছিলেন বড় সরকারী চাকুরে। বাড়িতে বিলাতিয়ানার ঝোঁকটা বরাবরই ছিল। একমাত্র তপতীর বাবাই প্রথম জীবনে কিছুকাল চাকরি করলেও, ব্যবসাতেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। ঠাকুর্দাকে তপতী কোনদিন চোখে দেখে নি। শুনেছে উনি একটু অমিতাচারী ছিলেন। বংশমর্যাদার সঙ্গে, মর্যাদা রক্ষার জন্য যেটা বিশেষ প্রয়োজন, সেই অর্থ বিশেষ রেখে যেতে পারেন নি। সেই হিসাবে, বনেদীয়ানা সত্ত্বেও, যাকে বলে সেলফ্‌ মেড ম্যান, বাবা ছিলেন তা-ই।

দুই মেয়ে, বাসন্তী আর তপতী, ছ' বছরের ছোট বড়। দুই মেয়ে, স্ত্রী ওদের নিয়ে বাবা সুখী সংসার গড়ে তুলেছিলেন। বিত্ত করেও, বাবার সমস্ত আনন্দ উৎসবই ছিল, পরিবারকে কেন্দ্র করে। বাবা ও মাকে ছেলেবেলা থেকে ও সুখী দেখে এসেছিল। মায়ের মনে হয়তো তপতীদের পাশে পাশে একটি ভাই খেলা করে বেড়াবে, এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সেটা কোন মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে নি। মায়ের সেই আকাঙ্ক্ষাটা বোঝা যেত ছোট ছেলে কাউকে পেলে, তাকে আদর যত্ন করে খাওয়ানো, খেলানো, খেলনা কিনে দেওয়া এসব থেকে। ছোট ছোট সুন্দর ছেলের কচি মুখের ছবি দেখতেও মা ভালবাসত। অথচ বাবাকে দেখে বোঝা যেত, ছেলের অভাবটা যেন কখনই ভোগ করে নি। মেয়েদের দিয়েই তিনি ছেলের সাধ মিটিয়ে নিতে চাইতেন।

দিদির গোটা ইস্কুল জীবনটা শান্তিনিকেতনে কেটেছে। তারপর কলকাতার কলেজে। তপতী বরাবর কলকাতাতেই পড়েছে। কলকাতার ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়েছে। কিন্তু কলেজের বেলায় আর সেটা হয় নি।

বাড়িতে রোজই কিছু না কিছু লেগে থাকত। তপতীর সব থেকে ভাল লাগত, ওয়েস্টার্ন নাচ আর গান। কিছু কিছু রবীন্দ্রসংগীতও ওর জানা ছিল। কেউ অনুরোধ করলে, পিয়ানোতে বসে রবীন্দ্রসংগীত শোনাতে পারত। তবে রবীন্দ্রসংগীতের দরকার হলেই দিদি বাসন্তীর ডাক পড়ত আগে। ভারতীয় নাচও কিছু কিছু শিখেছিল ও। পশ্চিমী নাচও যে শেখে নি, তা না। রুজ পিয়েরের কাছে, দুজনেই নাচ শিখেছে।

দশ বছর বয়স থেকে তপতী যখন নাচ শিখত, তখন মনে করত রুজের মত নাচতে শিখবে ও। তারপরে রুজ-ই একদিন ওকে বলেছিল, 'তোমার সমস্ত শরীরটা ভরে নাচ আছে। তোমাকে একটা এইমাত্র ফুটে ওঠা ফুলের মত দেখায়।'

boiRboi.net

তপতী লজ্জা পেয়েছিল। ওরকম ভাবে রুজকেই ওর বলতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মনের কথা বুঝিয়ে বলার মত কথা খুঁজে পেত না। রুজ যখন পিয়েরের সঙ্গে স্প্যানিশ ওয়ালজ্ নাচত, পিয়েরের হাত ধরে তার বুকের কাছে পাক খেয়ে যখন মুহূর্তের জন্য তার মুখ পিয়েরের মুখের কাছে তুলে ধরত, তখন তপতীর বুকের মধ্যেই যেন ধক্‌ধক্ করত। সেটা যে খারাপ কিছু, তা না। একটা মুগ্ধতা বোধের উত্তেজনা, আর একই সঙ্গে এত সুন্দর মনে হত। ওর বারো বছর বয়সেও মনে হত, পিয়েরের ঠোঁটের সঙ্গে রুজের ঠোঁট ছুঁয়ে গেলেই যেন ভাল হয়। এমন সংযত ভঙ্গি, অথচ এমন একটা অন্তরঙ্গ আবেগ দুজনকে ঘিরে থাকত, চোখে চোখে তারা এমন করে তাকাত, তপতীর দেখে দেখে ওই রকম মনে হত।

অবিশ্যি, কোনদিনই রুজের ঠোঁটের সঙ্গে পিয়েরের ঠোঁট ছুঁয়ে যায় নি। নাচের ওটা নিয়ম না। তথাপি পিয়েরের আবেগ ভরা অথচ গম্ভীর মুখ দেখলে তাকে যেন অকরুণ মনে হত। বারে বারে, তাকে ঘিরে রুজ যখন নাচত, বনলতার মতই যেন বারে বারে এক পায়ে আঙুলের ভর করে দাঁড়িয়ে, আর এক পা পিছনে শূন্যে তুলে পিয়েরের বুকের কাছে ঝুঁকে আসত, পিয়ের তখনই চকিতে কবজি ঘুরিয়ে রুজকে টেনে আর একদিকে নিয়ে যেত।

সেটা যে নিতান্ত নাচেরই নিয়ম, এ কথা তখন তপতীর মনে থাকত না। ও ভুলে যেত, পিয়ের একজন চৌরঙ্গীর বিখ্যাত নাচের ইস্কুলের মাস্টার। রুজ একজন শিক্ষার্থী-দের পার্টনার মাত্র। তাদের মধ্যে প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন আজ তপতী আর ধনগোপাল শর্মা ওরফে ড্যানি। কিন্তু তখন সেই নাচ দেখলে মনে হত, দুজনের মধ্যে খুব ভাব ভালবাসা না থাকলে অমন করে নাচা যায় না।

কখনো রুজকে ওর মনে হত, এক একটা দোলায় প্রতিবারে সে একটা নতুন ফুলের মত যেন ফুটে উঠছে। আর পিয়েরকে মনে হত, সে-ই যেন কী এক জাদু মন্ত্রে ফুল ফুটিয়ে তুলছে। আবার কখনো মনে হত, ওরা যেন দুটো পায়রার মত ঘুরে ঘুরে নাচছে।

পরে অবিশ্যি, তপতীও বুঝতে পেরেছিল নাচ একটা আর্ট। তার জন্য নাচের পার্টনারের সঙ্গে প্রেমের দরকার হয় না। ভাল পার্টনার হলে তার সঙ্গে সুন্দর করে, আবেগের সঙ্গে নাচা যায়। আর, যদি প্রেমিক কেউ সত্যি থাকে, যদি সে নাচতে পারে, তাহলে নাচ অপরূপ হয়ে উঠতে পারে।

বাবারও একটু আধটু নাচ জানা ছিল। সকলের সামনে, তপতীর সঙ্গে নাচতে গিয়ে বাবা বাকীদের হাস্যোদ্রেক করেছেন, নিজেও মজা পেয়েছেন। বলতেন, 'না, তপুর সঙ্গে আর কেউ পারবে না। ও একেবারে খাঁটি ওয়েস্টার্ন আর্টিস্ট হয়ে গেছে।'

দুই মেয়েকে নিয়ে বাবার খুব গর্ব ছিল। বাবার কথা শুনে মনে হত, তাঁর কন্যাদের মত কন্যা আর কোন বাবারই হয় না, এমনকি পৃথিবীতে বিরল। তাই বাড়িতে উৎসব আয়োজনের ব্যাপার হলেই দুই কন্যাই সর্বকিছু। কারণে অকারণে উৎসব তো লেগেই ছিল। বাবার বন্ধুরা আসতেন, বন্ধুর ছেলে মেয়েরা আসতো। তপতীরা তাঁদের সকলের সঙ্গে হেসে, নেচে, গেয়ে, আনন্দ করত। বাবার অল্পসল্প ড্রিংকের অভ্যাস ছিল, যদিও মাত্রাতিরিক্ত কিছু করতেন না। বছরে দু একটা উৎসবে

হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। শুধু একটা ব্যাপার বাবাকে করতে দেখা যেত না। বন্ধুর সাবালক পুত্রদের ড্রিংক অফার করতেন না। বাবার কোন কোন বন্ধু, তাঁর সাবালক বন্ধুপুত্র এবং নিজের পুত্রকেও ড্রিংক অফার করতেন। বাবা বলতেন, 'অতটা আমি পারব না।'

বাবা তাঁর বন্ধুপুত্রদের বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করতেন, মায়ের জন্য। মায়ের যাকে যাকে ভাল লাগত, তাদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন। একটাই শুধু আশ্চর্য লাগত, বাবার ব্যবসার যে একমাত্র সরিক, সেই চ্যাটার্জির ছেলে কখনো, তপতীদের বাড়ি আসত না। চ্যাটার্জি স্বয়ং খুব কমই আসতেন ওদের বাড়িতে। ছেলেকে নিয়ে আসতে বললেও কখনো নিয়ে আসতেন না।

বাবার এবং চ্যাটার্জির কোম্পানির নাম ছিল, 'রয় ডিকাম্বার মেসিনারিজ'। আসলে ডিকাম্বার নামেই কোম্পানি ছিল। তারা বিক্রী করে দেয়। চ্যাটার্জি পুরোটা কিনতে গিয়ে সামলাতে না পেরে, একজন পার্টনার নিয়েছিলেন। সেই পার্টনার তপতীর বাবা। তপতী শুনেছিল, চ্যাটার্জিরা অত্যন্ত গোঁড়া আর রক্ষণশীল। রায় পরিবারের সঙ্গে মেলামেশাটা তাদের মোটে পছন্দ ছিল না। সম্পর্কটা নিতান্ত ব্যবসায়িক, এবং সেটা দপ্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র চ্যাটার্জিই মাঝে মাঝে আসতেন, তাও বিকেলের দিকে। গলাবন্ধ কোট আর ঢল-ঢলে প্যাণ্ট পরে মোটা ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে আসতেন। অনেকটা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মত। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেই উঠতেন। বলতেন, 'যাই, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হয়ে এল। আমার আবার দু বেলাই গৃহদেবতার পুজোটি নিজের হাতে না করলে ভাল লাগে না।'

তপতীর খুব ইচ্ছা হত, তাঁদের বাড়ি গিয়ে একদিন তাঁকে পুজো আহ্নিক করতে দেখবে। কিন্তু স্পষ্ট খোলাখুলি নিমন্ত্রণ কোনদিনই আসে নি। তপতী বুঝতে পারত, উনি খুবই সাত্ত্বিক লোক, ওঁদের পরিবারও তা-ই। কিন্তু সাত্ত্বিক ধার্মিক পরিবারেও যে তপতীর যাতায়াত ছিল না, তা না। ওদের বাড়িতে হয়তো পুজো আর্চা তেমন ছিল না কিন্তু বছরে কয়েকটি উপোস মা করতেন। রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে, কৃষ্ণ আর লক্ষ্মীর পটের সামনে মা বেশ খানিকক্ষণ করজোড়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মা তখন মনে মনে কী বলতেন তপতী জানে না। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ওর মনেও একটা ঈশ্বর বিশ্বাসের অনুভূতি ছিল। পুজো প্রার্থনা না থাকলেও ঈশ্বর বলে যে কেউ আছেন, সে বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ ওর একুশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনে সেরকম কোন সন্দেহ দেখা যায় নি।

কলেজে পড়া, পশ্চিমী নাচ গান সব থাকা সত্ত্বেও, ওর মনের মধ্যে কোথায় একটা ভক্তির ভাবও ছিল। তাই ওর ইচ্ছা করত, যেখানে নিবিড় ভাবে কেউ পুজো করছে, আহ্নিক করছে, সেই রকম কোন পরিবেশে যাবে। তার মানে এই না, ঢাক বাজিয়ে নৃত্যকৃত্য করে যেসব তুলকালামকাণ্ড পুজো হয়, সে সবের প্রতি ওর কোন টানছিল।

লোকে শুনলে ওকে কী বলবে কে জানে। স্প্যানিশ ওয়াল্‌জের সময় রুজকেও ওর ভক্তিমতী বলে মনে হত। মনে হত রুজের মধ্যে যেন একটা ঐশ্বরিক শক্তি ভর করেছে। ঠিক একই কথা ওর মনে হয়েছে কোন কোন বিখ্যাত ব্যালেরিনার নাচ

boiRboi.net

দেখে। নাচের সময় তাদের সারা শরীরের ভঙ্গিতে, মুখের ভাবে, যেন এক পবিত্র সুষমা নেমে আসে।

একুশ বছর জীবন পর্যন্ত দুঃখটাকে প্রায় জানাই যায় নি। কোন প্রস্তুতিও মনের মধ্যে ছিল না। বরং শেষের দিকে জীবনে কিছু নতুন ঘটনা, নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল। নীরদদার সঙ্গে দিদির প্রেমের ব্যাপারটা প্রথম ওকে একটা বিষয়ে সচকিত করে তুলেছিল। একদিকে সমস্ত ব্যাপারটা যেমন ওর কাছে একটা উত্তেজনাকর গোপন সুখের ব্যাপার, আর অন্যদিকে তেমনি ওর নিজের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল। নিজের মনের দিকে, আর ওর আশেপাশে। দিদির যখন আঠারো, তখন ও সন্ধিক্ষণের দ্বাদশী। দু বছর পরেই দিদির বিয়ে হয়েছিল, অর্থাৎ কুড়িতে পড়ে। তপতী তখন চতুর্দশীর চাঁদের মতই, যুবতীর লক্ষণ সারা শরীরে। আসলে মনে মনে একটি ছোট মেয়ে হলেও, বাইরে গম্ভীর হবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা। সবাই বোধ হয় অমনি করে বড় হতে চায়। তখন, পিয়েরের ভাষায়, নাচে ওর একশোতে একশো নম্বর পাওয়া। পিয়েরের সঙ্গে স্প্যানিশ ওয়ালজ্ নাচতে দেখে সবাই মুগ্ধ।

যখন ওর সতের বছর বয়স, তখন এসেছিল বিমান। ইংরেজিতে তখন সে এম. এ. পড়ে। নাচটা ছিল ওর ভাল রকমের আয়ত্তে। বাবার এক বন্ধুপুত্র সে। বাড়ির যে কোন অনুষ্ঠান ছাড়াও সময়ে অসময়ে সে আসত। কলেজে গিয়ে তপতীর সঙ্গে দেখা করত। কলেজ পালাবার পরামর্শ দিত, আর কলেজ পালিয়ে গঙ্গার ধারে, ভিক্টোরিয়ায় চরে বেড়াতো। সেই বয়সেই অসম্ভব পাকা ছিল। এয়ার কণ্ডিশনড্ বার রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঠাণ্ডা বীয়ার খেত। তপতীদের বাড়িতে অসময়ে এসে প্রায়ই তো বাবার সেলার খুলে টুকটাক হুইস্কি গিলে ফেলত। তপতী ছাড়া কেউ টের পেত না। তপতী ধমক দিলে নাচ শুরু করে দিত।

বিমানের অনেক দোষ। আবার অনেক দোষই ক্ষমার যোগ্য ছিল। কারণ ও ছাত্র হিসাবে ছিল ব্রিলিয়াণ্ট, আর নাচতে পারত সুন্দর। বল্রুম নাচের মধ্যে সব-গুলোতেই ছিল সে শালীন, সংযত। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকান হলেই বিমান একেবারে ক্ষ্যাপা। রাম্বা বা সাম্বা নাচে তপতী ওর সঙ্গে হাঁপিয়ে উঠত। টুইস্টের তো কথাই নেই। ওর ঋজু ধারালো শরীরে কিছুই আটকাতো না। দেখতেও ভাল লাগত। আবার মাঝে মাঝে নেচে খুব হাসাতেও পারত।

তপতীর যেটা সব থেকে ভাল লাগত, বিমানের স্প্যানিশ ওয়ালজ্। নাচটা ও মন দিয়ে শিখেছিল। পিয়েরের কথা মনে পড়ে যেত। তপতী প্রথমে বিশ্বাস করে নি বিমান স্প্যানিশ ওয়ালজ্ জানে। বলেছিল, 'এমন গম্ভীর রোমাণ্টিক নাচ তোমার জানার কথা না।'

বিমান মুখে কোন জবাব দেয় নি। কেবল রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে হাত তুলে, স্টেপ করে, ঘরের মেঝের মাঝখানে এগিয়ে গিয়েছিল, আর জুতোর টো-এর ওপর দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তপতীকে ডেকেছিল। সেই মুহূর্তেই রুজ আর পিয়েরের কথা ওর মনে পড়ে গিয়েছিল। বিমানকে যেন আরো সুন্দর লাগছিল। তপতী নিজেও মুহূর্তের মধ্যে ডানা মেলা পরীর মত হাত তুলে বিমানের কাছে চলে গিয়েছিল।

boiRboi.net

বিমান ওকে প্রতিটি মুহূর্তে মুগ্ধ করছিল। ও যখন বিমানের দিকে ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছিল, বিমানকেও তখন পিয়েরের মত, একই সঙ্গে আবেগাচ্ছন্ন অথচ নিরাসক্ত মনে হচ্ছিল।

নাচ শেষ হবার পরে বিমান তপতীর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলেছিল, 'অপূর্ব, ওয়াণ্ডারফুল নেচেছ তুমি। কোন বাঙালী মেয়ের কাছ থেকে আমি এতটা আশা করি নি।'

তপতীর মধ্যে নাচের রেশ এবং আবেগটা তখনো ছিল। বলেছিল, 'আমিও বিশ্বাস করতে পারি নি, তুমি এত আশ্চর্য নাচতে পার।'

তৎক্ষণাৎ বিমান ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'তবে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলে কেন?'

তপতী লজ্জা পেয়ে হেসে বলেছিল, 'বুঝতে পারিনি, সত্যি।'

বিমান বলেছিল, 'এখন কী দেবে তা দাও।'

তপতী অবাক হয়ে বলেছিল, 'কী আবার দেব?'

'তা আমি জানি না, চ্যালেঞ্জ করেছিলে কেন। চ্যালেঞ্জ করলেই কিছু না কিছু দিতে হয়।'

তপতী হেসে বলেছিল, 'বাবার সেলার থেকে একটু হুইস্কি তো?'

'সেজন্য তোমাকে দিতে হবে কেন, ওটা তো আমি নিজেই চুরি করে খেতে পারি। তোমার কি দেবার আছে, তা-ই দাও।'

তপতী কিছু বুঝতে পারছিল না। বিমানের মুখে গাম্ভীর্যের বদলে একটা হাসি হাসি ভাব থাকলেও, ওর ঝলকানো চোখের দৃষ্টিতে যেন আরো কিছু ছিল। ও যেন তপতীর মুখের প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে দেখছিল। আর সেই দৃষ্টির একটা অদৃশ্য স্পর্শ যেন তপতীর বুকের কাছে হঠাৎ একটা রুদ্ধ স্রোতের মত, কিছু থমকিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'কী দেব?'

বিমান বলেছিল, 'আমিই নিচ্ছি।'

বলে ও একবার তপতীদের সেই বিশাল হল ঘরের মত ড্রয়িংরুমের চারদিকে দেখে, তপতীর হাত টেনে ধরেছিল। তারপর প্রায় নাচের ভঙ্গিতেই ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পাশের খালি ঘরে। মুহূর্তের মধ্যে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে, আগ্রাসী চুম্বনে, তপতীর দুটি ঠোঁট শুষে নিয়েছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় তপতী এমনিই চমকে গিয়েছিল, জীবনের প্রথম একটা ঘটনায় এমনিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বিমানকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে অস্ফুটে, প্রায় আর্তস্বরে ডেকে উঠেছিল, 'বিমান, বিমান।'

বলেই ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিয়েছিল। বিমান এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। নিচু রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'রাগ করেছ?'

বিমানের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে হঠাৎ কেমন লজ্জা করে উঠেছিল তপতীর। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, 'না।' মুখটা নিচু করেছিল। বিমান আস্তে আস্তে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'দুঃখিত?'

তপতী আবার ঘাড় নেড়েছিল। নিচু স্বরে বলেছিল, 'ভয় পেয়ে গেছলাম।'

boiRboi.net

'কেন ?'

'জানি না ভীষণ চমকে গেছলাম।'

'কেন ?'

আবার মাথা নেড়ে তপতী বলেছিল, 'জানি না।'

বলে, মুখ তুলে একবার বিমানের দিকে তাকিয়েই আবার নিচু করেছিল। বিমান তপতীর কাঁধে হাত রেখেছিল, আস্তে আস্তে কাছে টেনে নিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে ওর মুখ তুলে ধরেছিল। তপতী বিমানের চোখের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল, তাকিয়ে থাকতে পারে নি। বিমানের চোখে যেন কী ছিল, এমন কিছু যে, চোখে চোখ রাখা সম্ভব ছিল না। তপতীর চোখের পাতা প্রায় বুজে এসেছিল, আর শরীরের মধ্যে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। যেন শরীরের কোন একটা কেন্দ্রবিন্দুতে কিছু একটা ঘটেছিল, আর সমস্ত শরীরে সেটা তরঙ্গায়িত হচ্ছিল।

বিমানের মুখের দিকে না তাকিয়েও তপতী ওর দৃষ্টি নিজের মুখের ওপর অনুভব করছিল। গরম নিশ্বাসের হলকা লাগছিল যেন। বিমান ডেকেছিল, 'তপতী।'

তপতী শব্দ করেছিল, 'উঁ ?'

বিমানের ঠোঁট আবার ওর ঠোঁটের ওপর ছুঁয়েছিল। বুকের কাছে আরো নিবিড় করে নিয়েছিল। আরো গভীর ভাবে ওকে চুমো খেয়েছিল। তপতীর হাত আপনা থেকেই বিমানের কাঁধের ওপর উঠে গিয়েছিল। একুশ বছরেই বিমান অনেক কিছু জেনে গিয়েছিল। ওর নিজের ঠোঁট তপতীর ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ওর গরম জিভ দিয়ে তপতীর জিভ স্পর্শ করেছিল। তপতীর সারা গায়ের মধ্যে শিহরণ লাগছিল। ইচ্ছা করছিল, বিমানকে দু হাত দিয়ে আরো জোরে আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু লজ্জায় নাকি কে জানে, তপতীর হাতে শক্তি ছিল না।

জীবনের একটা দরজা বিমান খুলে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও আরো দরজা ছিল। বিমানকে ছাড়া তপতী তখন আর কিছু চিন্তা করতে পারত না। বিমান একটু অস্থির ধরনের ছেলে ছিল, আর অদ্ভুত ধরনের। বিমান তপতীকে জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা দান করেছে।' বিমানের বন্ধুরাও সব অদ্ভুত। একুশ বছর বয়সেই বিমান দেশী মদ খেত। ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেশী মদের লুকনো জায়গায় তপতীও গিয়েছে। ওর বন্ধুরা সবাই তো ওর মত পাগলাটে ছিল না, বা লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট ছিল না। কিন্তু তারা সকলেই, সেই বয়সেই চিন্তা ভাবনায় বিশিষ্ট। কিন্তু তাদের জীবনের মূল্যবোধগুলো তপতীর সঙ্গে মিলত না। তাদের কেউ কেউ বেশ্যালয়ে গিয়েছিল, এবং অবলীলায় সে সব কথা বলাবলি করত।

বিমান তপতীকে নিয়ে হোটেলে ক্যাবারেতে যেত। সে সব জায়গায় অনেকবার ওরা নেচেছে। ওদের নাচ দেখে সকলেই খুশিতে মেতে উঠত। এক হোটেলের ককটেল লাউঞ্জে, একদিন শুধু তপতী আর বিমান নেচে সবাইকে দেখিয়েছিল।

বিমান, বিমান, বিমান ! জীবনটা তখন বিমানময়। বিমান বিশ্বসংসারের বিচিত্র বার্তা নিয়ে আসত ওর কাছে। বিচিত্র মানুষ আর সমাজের সংবাদ নিয়ে আসত। বিমান যে-দরজার মুখটা প্রথম ওর ঠোঁটের কপাট ভেদ করে খুলে দিয়েছিল, সেই

boiRboi.net

দরজার সদরের ভিতরের মুখটাও একদিন খুলে দিয়েছিল। তপতীর তাই জীবনের কুমারীত্বের দাবী নেই।

তপতী তখন আঠারোয় পড়েছে। সকলের চোখে চোখেই জানাজানি, বিমান-তপতীর মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। বিমানের ফাইনাল এম. এ. পরীক্ষার আর মাত্র তিন দিন বাকী। তপতী ভেবেছিল বিমান আসবে না ওদের বাড়িতে। তপতীরও দেখা করতে যাওয়া উচিত না। বাড়িতেও সেদিন কেউ ছিল না। কেউ বলতে মা। দিদির তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে নীরদদার সঙ্গে। বাবা তাঁর দপ্তরে। মা গিয়েছিলেন তাঁর এক পুরনো বান্ধবীর বাড়িতে। দুপুরবেলাটা নিঝুম, খাঁ খাঁ করছিল। তপতীর কলেজ ছিল না। একবার পিয়ানোতে বসছিল, আবার ম্যাগাজিন নিয়ে বসছিল। রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে কল্পনায় বিমানকে জড়িয়ে ধরে নাচছিল। সেই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠেছিল।

কে আসতে পারে এখন ? মা ? পোস্টম্যান টেলিগ্রাম সহ কোন রেজিস্ট্রি চিঠি ? ঘরে বসে মনে মনে ভেবেছিল তপতী। অমন দুপুরে নিশ্চয় অতিথি অভ্যাগত আসে নি। তপতীর ঘরের পর্দাটা দুলে উঠেছিল, সরে গিয়েছিল বিমান।

তপতী বলেছিল, 'একি, এমন সময়ে ?'

বিমানের জবাব, 'ভাল লাগল না, বই খুলে পড়তে ঘেন্না করছে। তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা করল।'

পায়জামা পাঞ্জাবি পরা বিমান। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল বিছানা থেকে উঠে চলে এসেছে। চুলেও চিরুনি লাগায় নি। ও যেন কেমন করে তাকিয়ে দেখছিল তপতীর দিকে।

তপতী বলেছিল, 'একটু আগেই তোমাকে মনে মনে ভেবে একটু নাচছিলাম।'

বিমান তপতীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'এখন আমি নাচব না তপতী।'

'তা তো বটেই, তুমি পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শ্লিপার পায়ে এসেছ।'

'তাতেও আমি নাচতে পারি, কিন্তু এখন আমি নাচব না।'

তপতীকে চুমো খেয়েছিল বিমান। তপতী তখন রীতিমত প্রতিদানে অভ্যস্ত। ওর রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাড়া পড়ে যায়। ঠোঁটের চুমো চুইয়ে চলে যায় রক্তের মধ্যে, কী এক দুরন্ত সংবাদ যেন বহন করে। সংবাদটা যে কিসের তপতীর জানা ছিল না।

বিমান জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার মা কোথায় ?'

তপতী বলেছিল, 'বাড়ি নেই।'

বিমান বলে উঠেছিল, 'সেটা নিয়তির অভিপ্রেত। তপতী, পরীক্ষার জন্য আমি কোনদিন চিন্তা করিনি, কিন্তু একটা একসাইটমেণ্ট আমার মধ্যে রয়েছে। আমি তোমার কাছে শোব।'

তপতী চমকে বিমানের দিকে তাকিয়েছিল। রক্তের দরজা থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিল। বিমান গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এসেছিল। তপতীর কাছে এসে ওর গায়ের আঁচলাটা নামিয়ে দিয়েছিল। তপতী ভয় মেশান সুরে বলেছিল, 'কী করছ ?'

বিমান বলেছিল, 'তোমার সব কেড়ে নেব। আমাকে আজ বাধা দিও না।'

boiRboi.net

তপতী বলে উঠেছিল, না না বিমান, সে আমি পারব না, বড় লজ্জা করবে।

'একবার সব কেড়ে নিতে দাও, তারপরে আর লজ্জা করবে না।' তপতী বিমানকেই জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'না বিমান, না।'

'হ্যাঁ তপতী, হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে আমার সব কিছু গায়ের থেকে আগেই ফেলে দেওয়া উচিত। কিন্তু ছেলেদের সবই বাইরে, তোমাদের ভিতরে। চোখে লাগতে পারে।'

বলতে বলতে তপতীর জামা খুলে নিয়েছিল, ব্রা-র ফাঁস খুলে দিয়েছিল। তপতী তবু বলেছিল, 'বিমান, বড় আলো ঘরের মধ্যে।'

'আলোই ভাল।'

গায়ের থেকে সব কিছু খুলে নিয়ে মেঝের চারদিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল বিমান। তপতী নিজেকে ঢেকে রাখবার জন্য তবু বিমানকেই জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, 'উহ, বড় আয়নাটা কী নির্লজ্জ।'

বিমান নিজের গা থেকে সব খুলে ফেলেছিল, 'এখানে এখন লজ্জার কোন অবকাশ নেই তপতী।'

তপতী চকিতেই একবার বিমানের ঋজু ধারালো নগ্ন শরীরটা দেখেছিল। দেখতে লজ্জা করছিল, কিন্তু মুগ্ধতার আবেশে মন ভরে উঠেছিল। রক্তে ওর দাপাদাপি শুরু হয়েছিল। বলেছিল, 'যদি কিছু হয় ?'

'হবে। আমি সাবালক '।

বলে, মিউজিক ছাড়াই বিমান নাচের ভঙ্গিতে ওকে নিয়ে ঘরের এদিকে ওদিকে চলাফেরা করছিল। তপতীর সমস্ত শরীরের সবখানে ওর স্পর্শ লাগছিল। ও যেন সাপের মত দংশন করছিল, কিন্তু বিষের স্বাদ মধুর মত লাগছিল। বলেছিল, 'কী সব প্রিকশন্ আছে, সেরকম কিছু করলে হত।'

'না তপতী, কোন প্রিকশন্ নয়।'

বিমান অবলীলাক্রমে তপতীকে বুকের ওপর তুলে নিয়েছিল, ওকে খাটের ওপর নিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল। তাকিয়ে দেখেছিল তপতীকে।

'অমন করে দেখো না বিমান।'

বিমান চুমো আর স্পর্শের কোন লজ্জাই রাখে নি।

'বিমান ভয় করছে আমার।'

'এটা ভয়ের বিষয় নয় তপতী।'

'বিমান, বিমান আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট।'

'হ্যাঁ, বিমান ভালও।'

'তপতী।'

'বিমান।'

আর কথা বলতে পারছিল না দুজনে। তপতীর মনে হচ্ছিল, পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

কোথায় গেল আজ সেই বিমান। সেই বিমান এখন ফরাসী বৌ নিয়ে আমেরিকায় আছে। পরীক্ষার পরেও বিমান এক বছর কলকাতায় ছিল। একটা বছর তপতীর

boiRboi.net

আর কোন অবকাশই ছিল না, বিমান ছাড়া। তারপরে বিমান ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল সেখান থেকে ফ্রান্স, এখন পাকাপাকি ভাবে আমেরিকায়।

না, তপতীর এখন আর কোন রাগ নেই, অভিযোগ নেই বিমানের ওপর। প্রথমে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। বিমানের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, শুধু সেই কথা ভেবে না। রক্তের মধ্যে বিষের জ্বালা দিয়ে গিয়েছে, বিমান। যে-জ্বালা আর কোথাও জুড়োবার না। কিন্তু এখন সেই জ্বালা গিয়েছে, এখন আর কষ্ট হয় না। জ্বালা জুড়োবার জন্য কোথাও যেতে হয় নি, তা আপনি শান্ত হয়েছে। তপতী বুঝতে শিখেছে, বিমান যদি ওকে বিয়ে করত তবে দুঃখের কারণ অনেক ঘটতে পারত। হয়তো বিয়ে করেও বিমান আজকের এই জীবনই যাপন করত। তার চেয়ে এই ভাল।

কিন্তু কোথায় গেল তপতীদের সেই ছোট সুখী সংসার। কোথায় বাবা মা। সাত্ত্বিক ধার্মিক চ্যাটার্জির খেলায় প্রায় রাতারাতি, ভূমিকম্পের মত সমস্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রয় এ্যাণ্ড ডিকাম্বার কোম্পানির তলে তলে অনেক দূর সর্বনাশের পর বাবা সব জানতে পেরেছিলেন। কোর্টে মামলা দাখিল করেও তখন আর শেষ রক্ষার উপায় ছিল না। উপরন্তু, তের লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বাবা তাঁর মাথাটাই এফোঁড় ওফোঁড় করেছিলেন রিভলবারের গুলিতে। মায়ের পক্ষে সেই ভয়ংকর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় নি। কয়েক মাসের মধ্যে মানসিক কষ্টে ভুগে ভুগেই মারা গিয়েছিলেন।

তারপরে তপতীর তখন একমাত্র আশ্রয় দিদি আর নীরদদা। কিন্তু দিদির টুকু আর খুকু আজ তপতীর দু'পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তপতীদের নিজেদের জীবনে দুর্ঘটনার মাত্র এক বছর পরে নীরদদা দিদি, একসঙ্গে মোটর এ্যাকসিডেণ্টে মারা গিয়েছে। নীরদদা গাড়ি চালাচ্ছিল। দিদি ছিল পাশে। রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, খেয়ে দেয়ে ফেরার পথে ভয়াবহ এ্যাকসিডেণ্ট করেছিল, একেবারে ফেট্যাল। দিদি মারা গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, নীরদদা হাসপাতালে দুদিন পরে।

এখন তপতীর আশ্রয় তপতী নিজে। সকলেই এক এক ভাবে চলে গিয়েছে। তপতী রয়ে গিয়েছে, টুকু খুকু রয়ে গিয়েছে। তপতীকে বেঁচে থাকতেই হবে। মা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, নিজের জন্য বেঁচে থাকতে হবে।

নীরদদা দিদিকে বিয়ে করেছিল বলে তার বাবা দাদারা খুশি হয় নি। এই শিশু দুটির তাই সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তবে শিশু দুটিকে নীরদদা নিতান্তই নিঃসম্বল রেখে যান নি। চল্লিশ হাজার টাকা ওদের নামে ফিকসড্ ডিপজিট আছে। বড় হলে দুজনে সমান অংশ পাবে। প্রয়োজন হলে, এখনো ওদের মানুষ করবার জন্য সেই টাকা থেকে খরচ করা যেতে পারে। তপতীর আপ্রাণ চেষ্টা যেন সেই খরচের প্রয়োজন কোনদিন না হয়।

খুকুর ঘুমন্ত হাত নেড়ে উঠল তপতীর বুকের ওপরে। বুকের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে, জামার ভিতরে খুকু ওর হাত গলিয়ে দিল। তপতীর স্তনাগ্র মুঠো করে ধরল। তপতীর চোখের কোল ভেজা, জলে ভেসে গিয়েছে। মনে মনে বলল, 'হাত রাখ্ খুকু, যেমন করে খুশি রাখ্। যদি মুখ দিতে ইচ্ছা করে, দিস। পেট থেকে বের করিনি, কিন্তু আমিই তোদের মা।'

boiRboi.net

আঁচল দিয়ে চোখ মুছল তপতী। আলো জ্বেলে বালিশের পাশ থেকে তুলে ঘড়ি দেখল। রাত্রি তিনটে। ঘুম আর আসবে না। তবু আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চোখ বুজল। ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে। কাল কাজ আছে। হতাশা আর তিক্ততায় ডুবে যেতে চায় না তপতী। তবু জীবন তো যন্ত্র নয়, সব সময় মনকে অবিচল রাখতে পারে না। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হতে থাকে। নিজের অজান্তেই, চোখ ভেসে যায়।

অনেকদিন পরে আজ বিমানের কথা মনে পড়ল। তপতী নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারে না, বিমানের কথা মনে হলে, ওর রক্তের মধ্যে অনেক দূরে যেন কার চলাফেরা টের পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা ওকে আর এখন কষ্ট দেয় না। কেবল এইটুকু ওকে বুঝতে হয়, রক্তে এখনো অনুভূতি আছে, যায় নি।

বিমানের পরেও, ওর পাণিপ্রার্থী কেউ কেউ ছিল। বাবার দুরবস্থা আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, তাদের মধ্যে অনেকেই সরে গিয়েছিল। তারপরেও কেউ ছিল না, তা নয়। টুকু খুকু না এসে পড়লে, কি হত কে জানে। এখন আর ওসব চিন্তা তপতীকে ভাবায় না।

*

সকালে ঘুম থেকে উঠে, তপতীর প্রধান কাজ একটু খেয়ে নিয়ে, টুকু খুকুকে নিয়ে পড়াতে বসানো। দশটায়, চারুর সঙ্গে টুকুকে ইস্কুলে পাঠানো। তারপরে ওর নিজের বেরোবার প্রস্তুতি। বারটায় ওকে কাজে যেতে হয়। নাচের ইস্কুলের চাকরিটা, ওর একঘেয়েমিকে খানিকটা কাটিয়েছে। যদিও মনে কোন উৎসাহ নেই।

আজ ড্যান্নির ইস্কুলে এসেই গতকালের সেই নতুন লোকটিকে তপতী দেখতে পেল। সেই লম্বা ফর্সা ঋজু চেহারার বছর পঁয়ত্রিশের ভদ্রলোক। যাকে দেখে কাল ওর মনে হয়েছিল, নাচের ইস্কুলে নাচ শেখবার মত লোক এ নয়। কিন্তু ভদ্রলোককে ড্যান্নি নাচ শেখাচ্ছে। তার মানে, আর একটি নতুন ছাত্রের আবির্ভাব হল।

দীপকের সঙ্গে চোখাচোখি হল তপতীর। দীপক হাসল, ভুরু নাচাল। দীপক একটি মধ্য বয়স্কা পাঞ্জাবী মহিলাকে নিয়ে নাচছে। পূরবী সেনের কপালটাও আজ খারাপ। গতকালের সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক আজও এসেছে। পূরবী সেনকে সামলাতে হচ্ছে। পূরবীর মোটেই ইচ্ছা নেই, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার মুখ রীতিমত গম্ভীর। নিতান্ত পা ফেলতে হচ্ছে, তাই ফেলছে। তাতে ব্যারিস্টারের কিছুই শেখা হচ্ছে না, বেচারি! বোধ হয় ড্যান্নি ইচ্ছা করেই এই কাণ্ডটা করেছে। গতকাল পূরবীকে সে কী বলেছে, কে জানে।

নতুন লোকটিকে ড্যান্নি বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'একে বলে বলরুম ড্যান্সিং। চারটে করে স্টেপ, সামনে এভাবে চার, আবার এভাবে, আমার পায়ের দিকে দেখুন, চার স্টেপ পেছিয়ে যেতে গিয়ে, বাঁ পা সরিয়ে, ডান পা সোজা করে আনতে হবে। তাতে, আপনা থেকেই সরে সরে যাওয়া যাবে। একজায়গাতে স্ট্যাগনেন্ট হতে হবে না।'

ভদ্রলোক দেখছেন, শুনছেন, মুখে হাসি। এক একজন যেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, ইনি সেরকম নন। তবে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তবে, হাসিটা যেন একটু লজ্জিত, একটু কুণ্ঠার ভাব মুখে।

boiRboi.net

কেন, লজ্জা বা কুণ্ঠার কারণ কী। নাচ শিখতেই যখন এসেছেন, তখন আর লজ্জা করে কী হবে।

ড্যান্নি বলল, 'আসুন, আপনি আমার সঙ্গে স্টেপ করুন, হ্যাঁ এভাবে আমাকে ধরুন। এর নাম হচ্ছে ফকস্ ট্রট, বল্ নাচেরই একটা অঙ্গ। এগুলো সবই চার চার।'

তপতী দেখল, ভদ্রলোক একটু আধটু বেধে গেলেও, মোটামুটি প্রথম হিসাবে বেশ ভালই পা ফেলছেন। তালের সঙ্গে ফেলতে পারছেন না, সেটা কয়েকদিন না গেলে হবে না। তবে দেখে মনে হচ্ছে, বেশ তাড়াতাড়ি শিখে যাবেন।

রেকর্ড শেষ হল। ভদ্রলোককে নিয়ে ড্যান্নি সরে এল। তপতী শুনতে পেল, ড্যান্নি ভদ্রলোককে বিশেষ সমীহ করে কথা বলছে, 'ক্ষতি কিছু নেই স্যার, একটা জিনিষ শেখা হয়ে তো থাকবে।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হয়তো থাকবে, তবে কোন প্রয়োজনেই কোনদিন লাগবে না। অজিতের যত পাগলামি, টেনে ধরে নিয়ে এল আপনার কাছে।'

ড্যান্নি বলল, 'খুব ভাল করেছে অজিত, এটা আমি বলব স্যার। কাজের মানুষ আপনি, সারাদিন কাজ করে, সন্ধ্যাবেলায় না হয় একটু এসব নিয়েই থাকলেন, একটু রিলাকসেসান।'

ভদ্রলোক হাসলেন, কথা বাড়ালেন না। যেন ড্যান্নিকে কিছু বোঝাবার নেই আর। চেয়ারের পিছন থেকে উনি কোটটা তুলতে গেলেন, ড্যান্নি বলে উঠল, 'দাঁড়ান স্যার, এখন কোট পরবেন না, আর একটু থাকুন।'

ড্যান্নি চোখ তুলে তপতীর দিকে তাকাল, ঘাড় ঝাঁকিয়ে ওকে কাছে ডাকল। তপতী সামনে এল। ড্যান্নি আলাপ করিয়ে দিল, 'মিস রয়, ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাদের এখানে নাচ শিখবেন। আপনি একটু কোচ করুন ওঁকে। তপতী হাত তুলে নমস্কার করল। মিস্টার চ্যাটার্জিও নমস্কার করলেন, মুখে গম্ভীর হাসি। ড্যান্নি নতুন রেকর্ড চালিয়ে দিল। তপতী এগিয়ে গেল। এখন ওর মনে পড়ছে, গতকাল চ্যাটার্জি যার সঙ্গে এসেছিলেন, যার মুখটা চেনা চেনা লাগছিল, তার নাম অজিতবাবু। পদবী জানা নেই, তবে অজিতবাবু ড্যান্নির বন্ধু, এখানে দু একবার এসেছেন। অজিতবাবু নাচতেও পারেন। নিশ্চয় সেই অজিতবাবুই জোর করে চ্যাটার্জিকে ধরে নিয়ে এসেছেন এখানে, নাচ শেখবার জন্য। চ্যাটার্জির কথা থেকে মনে হচ্ছে, নাচ শেখবার তেমন ইচ্ছা নেই, কারণ এটা একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

চ্যাটার্জি এগিয়ে এলেন। তপতী বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল। চ্যাটার্জি হেসে বললেন, 'নতুন শিক্ষার্থী, বুঝতেই পারছেন, পদে পদে গোলমাল।'

তপতী বলল, 'আমি দেখছিলাম এর আগে আপনার পা তো বেশ ভালই চলছিল। আমার পিঠের এখানে হাত রাখুন। টেক ইট ইজি, দেখবেন সব ঠিক আছে।'

চ্যাটার্জির মুখে সেই লজ্জা আর কুণ্ঠার হাসি। ভাবটা যেন, কী একটা ছেলেমানুষি করছেন। তপতী, চ্যাটার্জির কাঁধে হাত দিল। লোকটি বেশ লম্বা। তপতী বলল, 'এখনই মিউজিকের তালে তালে হয়তো পা ফেলতে পারবেন না, চেষ্টাও করবেন না। আসুন, স্টেপ করুন।'

boiRboi.net

চ্যাটার্জি স্টেপ করলেন, তপতী দেখল, ভদ্রলোক স্টেপগুলো ঠিক মনে রেখেছেন। যদিও একটু দ্বিধা রয়েছে, কিন্তু পা ফেলতে একটুও ভুল হচ্ছে না। মিউজিকের তালে তালে পা পড়ছে না, এত তাড়াতাড়ি সেটা সম্ভব না। দীপকের সঙ্গে তপতীর চোখাচোখি হল। দীপক ঘাড় নেড়ে, ভুরু কাঁপাল। তপতী বুঝতে পারল, দীপক কী বলছে। দীপক, চ্যাটার্জির কথাই বলছে, এ লোকটির হবে। পূরবী এখন নাচছে, সেই ষাট বছরের পাঞ্জাবী লোকটিকে নিয়ে। দু একবার পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। আর দু দিন এরকম হলে, পূরবী সেন বোধহয় এখান থেকে পালিয়ে যাবে। এ ধরনের ছাত্র নিয়ে, ড্যান্নি সাধারণতঃ নিজেই নাচে এবং শেখায়।

রেকর্ড শেষ হয়ে যাবার পরে ড্যান্নি চ্যাটার্জিকে বলল, 'স্যার এনি থিং কোল্ড অর হট ড্রিংক ?'

চ্যাটার্জি হেসে বললেন, 'নো, থ্যাংকু।'

ড্যান্নি বলল, 'তা হলে বসুন, আমরা একটু নাচি, আপনারা দেখুন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'সেই ভাল।'

ড্যান্নি দীপক আর পূরবীকে বলল, 'আপনারা দুজনে আসুন, আমি মিস রয়কে নিচ্ছি। রেকর্ড চালু হল। ওয়ালজ্ শুরু হল। ড্যান্নি পর পর রেকর্ড দিয়েই রেখেছিল। ওয়ালজের পরেই, কুইক স্টেপ-এর মিউজিক বাজল। তারপরেই, তৃতীয় রেকর্ডের সময় ল্যাটিন, আমেরিকান, রাম্‌বা নাচ। শেষের দিকে ড্যান্নি বলল, 'মিস রয়, লেট আস্ টুইস্ট।'

শেষের দিকে এক মিনিট টুইস্ট দেখানো হল। নাচ শেষ হলে, ড্যান্নি নাচের বিবরণগুলো সবাইকে বলল, কোনটা কী নাচ। তার মধ্যে ওয়ালজ্ একমাত্র তিন তিন স্টেপ। তপতী লক্ষ্য করে দেখছিল, চ্যাটার্জি খুব মনোযোগ দিয়ে নাচ নিরীক্ষণ করছে। ওটা দেখার চোখ না, শেখার চোখ। কিন্তু চ্যাটার্জি তপতীকে অমন করে দেখছিলেন কেন। নাচতে নাচতে যতবার তপতী চোখ তুলেছে ওঁর দিকে, ততবারই প্রায় চোখাচোখি হয়ে গিয়েছে। হয়তো, নিতান্ত নাচই দেখছিলেন, তবু কেবল তো তপতীই নাচছিল না। আসলে চ্যাটার্জি বোধ হয়, ড্যান্নি আর ওর নাচটাই বেশ নিরীক্ষণ করছিলেন, সেইজন্যই চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু চ্যাটার্জি প্রশংসাসূচক হাসছিলেন।

নাচের শেষে, চেয়ারে বসতে যাবার সময় চ্যাটার্জি তপতীকে বললেন, 'খুব সুন্দর নেচেছেন।'

তপতী একটু লজ্জা পেল, বলল, 'ধন্যবাদ।'

চ্যাটার্জি তপতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখলেন। তপতী মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ারে গিয়ে বসল। ভদ্রলোকের দেখাটা যেন কেমন। একটু যেন অভিভূত ভাব। তপতী মনে মনে বলল, 'দেখো বাবা, দশ মিনিটেই প্রেমে পড়ে যেও না।'

*

নাচের ইস্কুল থেকে বেরিয়ে, বাস স্টপে যেতে যেতে দীপক বলল, 'অজিতবাবুর কাছে দুপুরে আজ মজার গল্প শুনলাম।'

তপতী জিজ্ঞেস করল, 'কী গল্প ?'

boirboi.net

'ওই যে দেখলেন চ্যাটার্জি, মানে অভিজিৎ চ্যাটার্জি, উনি খুব বড়লোক।'

তপতী হেসে বলল, 'এতে মজার গল্পের কী আছে। পৃথিবীতে অনেক বড়লোক আছে।'

দীপক হাত তুলে তপতীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে শুনুন না মশাই, একটা গল্প কি আর সোজাসুজি বলা যায়. গল্পের চরিত্রের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চাই তো। সেই জন্যই বললাম, অভিজিৎ চ্যাটার্জি মস্ত বড়লোক, অজিতবাবুর বন্ধুলোক, ডি. ডি-তে নাচ শেখাতে নিয়ে এসেছেন।'

'এতেও মজার কিছু দেখছি না।'

'সেটাই বলছি। কিন্তু কেন নাচ শেখাতে এনেছেন অজিতবাবু?'

'বন্ধুকে নাচ শেখাবেন বলে?'

'না, সেখানেই গল্পের শুরু। অভিজিৎ চ্যাটারজি ভীষণ সীরিয়স ধরনের লোক, পণ্ডিত ব্যক্তি, দু দুবার বিশ্বভ্রমণ করে এসেছেন—ভ্রমণ মানে কাজের ব্যাপারেই। নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে। চার বছর লণ্ডনে পড়াশোনা করেছেন—।'

তপতী বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'এখনো চরিত্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, গল্পের দেখা নেই, আমার বাস বোধ হয় আসছে।'

দীপক দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, বাস আসছে না, বাস এত বেরসিক নয় যে গল্পটা শেষ হবার আগেই গোঁ গোঁ করে এসে পড়বে।'

তপতী হেসে উঠল। দীপক বলে চলল, 'এই অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বিবাহিত, কিন্তু তার মানে প্রেম করে বিয়ে নয়। লেখাপড়ায় বরাবর ব্রিলিয়াণ্ট ছিলেন, রিয়্যাল ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায়, তাই। কাজকর্ম নিয়ে থাকতে ভালবাসেন, কিন্তু গোলমাল লাগল দাম্পত্য জীবনে।'

তপতী বলল, 'পরের দাম্পত্য জীবনের গল্প শুনে লাভ?'

'আপনি তো ভারি বেরসিক। কেন, আপনি গল্প উপন্যাস পড়েন না? তাতে দাম্পত্য জীবনের কথা থাকে না? নিজের দাম্পত্য জীবন ছাড়া, আর কারোরটা জানতে নেই?'

'আমার কোনো দাম্পত্য জীবন নেই।'

'মিটে গেল, এখন অপরেরটা আপাততঃ শুনুন, খালি লাভ লোকসান খুঁজবেন না। এখন মুশকিল হয়েছে, অভিজিৎ চ্যাটার্জি জীবনকে এক চোখে দেখেন, তাঁর স্ত্রী আর এক চোখে। বিয়ের বছর দুয়েক পরে, সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। অভিজিৎ ভাবতেন, কাজকর্ম করব, নতুন নতুন কাজ উদ্ভাবন করব, বাড়িতে আসব, স্ত্রীর সেবা যত্ন ভোগ করব, পরস্পরকে নিয়ে একটি নিবিড় জীবন যাপন করব। কিন্তু অভিজিৎ-গিন্নি সেদিকে নেই। তিনি একান্তভাবেই মেমসাহেব, সো কল্ড এ্যারিস্টো-ক্র্যাট। তিনি ওয়েস্টার্ন নাচ গান না হলে থাকতে পারেন না। পান ভোজনের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি। ধূমপান ভালবাসেন, অনেক রাত্রি পর্যন্ত হোটেলে ক্যাবারে করে বেড়াতে ভালবাসেন, এবং স্বামীকে ঠাট্টা করে বলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।'

তপতী হাসল, বলল, 'বাস বোধ হয় আসছে।'

দীপক বলল, 'না আসছে না। গল্পটা কেমন লাগছে?'

boiRboi.net

'মামুলি।'

'বেশ তারপরে শুনুন, শেষবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে অভিজিৎ গিন্নি নাকি, প্যারি, লণ্ডন, নুয়র্কে মেলাই কেচ্ছা করেছেন। সকলের সামনেই স্বামীকে বিদ্রূপ করেছেন, কর্তা নাচতে পারেন না বলে। যা মুখে এসেছে তাই বলেছেন। এমন কি আমেরিকায় উনি স্বামীকে ছেড়েই যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু—।'

তপতী বলল, 'দয়া করে ঘাড় থেকে নামেন নি।'

'ওরকম ভাবে বলবেন না, মিসেস তো আর পেত্নী নন। সুন্দরী রূপসী। বড়লোকের মেয়ে, অবিশ্যি স্বামীও বড়লোক, কিন্তু বোগাস্, ওয়েস্টার্ন স্টাইল অব্ লিভিং কিছুই বোঝেন না। তাই বর্তমানে মিসেস চ্যাটার্জি পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন, বহু বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে রাত বিরেতে হেথা হোথা, অর্থাৎ চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট পাড়া চরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কোন পক্ষ থেকেই ডিভোর্সের কথা উঠছে না।' তপতী অবাক হয়ে বলল, 'আর তারপরেও কী না অভিজিৎ চ্যাটার্জি ওয়েস্টার্ন নাচ শিখতে এসেছেন?'

'আইগ্‌গা হ, গল্পের টুইস্ট এখানেই।'

'কী রকম?'

অজিতবাবু বললেন, অভিজিৎ নাকি ওঁকে দু একদিন এ রকম বলেছেন, "আচ্ছা বলতে পার অজিত, এইসব নাচ, গান, পান, ভোজন হুল্লোড়ের মধ্যে কী আছে? কী আনন্দ, কী সুখ? আমার একটু পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা করে।" অজিতবাবু বলেছেন, "নেমে পড়ে, নিজের অভিজ্ঞতাতেই সব দেখে নাও।" অজিতের বক্তব্য, চরম ভাবে একবার ও পথের সব দেখে নিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করলেও অভিজিতের মনের মধ্যে অনেক বাধা। সেই বাধা কাটিয়ে অজিতবাবু প্রায় জোর করেই টেনে এনেছেন।'

তপতী বলল, 'মানে নতুন পালা শুরু? নাচ, গান, পান, ভোজন হুল্লোড়ের প্রস্তুতি। একে কী বলে? বিষে বিষক্ষয়?'

দীপক বলল, 'তা জানি না। হয়তো হুল্লোড়ের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর একদিন নূতন করে মিলন হবে।'

তপতী বলল, 'অথবা অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও হুল্লোড়েই ফিনিশ। আমার বাস আসছে।'

'হ্যাঁ, এবার সত্যি আসছে।'

'আপনার গল্পের কি এখানেই ইতি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ধারণা, আসল গল্পটা এইবার শুরু হল।' বলতে বলতেই বাস এসে পড়ল। দীপক ঘাড় নেড়ে হেসে হাত তুলে বলল, 'কারেক্ট। ও. কে. গুডনাইট।'

তপতী উঠতেই বাস ছেড়ে দিল।

অভিজিৎ সত্যি এলেমদার মানুষ। সপ্তাহে দুদিন নাচ শিখতে এসে তিন মাসের মধ্যে বেশ পটু হয়ে উঠেছে। ওয়ালজ্, ফকসট্রট, কুইক স্টেপ, ট্যাংগো ভালই শিখেছে। এখন রাম্‌বা সাম্‌বার দিকেও ঝোঁক এসেছে। এটা আরো সহজ, স্টেপ না মিললেও চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ড্যান্নি সেই যে প্রথম দিন থেকে তপতীকে

boiRboi.net

অভিজিতের কাছে ঠেকিয়ে দিয়েছে, সেই ঠেকানোই রয়েছে। অভিজিৎ পূরবী সেনের সঙ্গে একদিনও নাচে না। নাচতে হলেই তপতীর দিকে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্য কারোর এ রকম হলে ড্যান্নি হয়তো তা দিত না। অভিজিতের বেলায় সে উদার।

অভিজিৎ লোকটিকে তপতীর খারাপ লাগে না। লোকটি ভদ্র, অমায়িক। তপতীর সঙ্গে যে তার নাচতে ভাল লাগে, এটা সে গোপন করে না। মুখ ফুটে পরিষ্কার বলে, 'আপনার সঙ্গে ছাড়া আমার নাচতে ইচ্ছা করে না। বলতে গেলে আমি তো আপনার কাছেই শিখছি।'

তপতী বলে, 'আমি শেখাই না, আপনার শেখার জন্য পার্টনার মাত্র।'

অভিজিৎ বলে, 'তা আপনি যা-ই বলুন, আমার ধারণা এই স্কুলে আপনি বেস্ট।'

তপতী লজ্জা পায়, বলে, 'না না।'

কিন্তু এই সব প্রশংসার মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি নেই, সেটা বোঝা যায়। অন্যান্য কথাবার্তাও এখন একটু আধটু হয়। যেমন একদিন অভিজিৎ বলেছিল, 'আপনার মত যারা নাচতে পারে, আমার ধারণা ছিল, তারা একটু অন্য ধরনের মহিলা হয়।'

তপতী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী রকম ?'

'এই ধরুন তারা হয়তো একটু ফাস্ট লাইফ লীড করে, গ্ল্যামার পছন্দ করে, একটু হয়তো লাউড।'

তপতী হেসেছিল। বুঝতে পারছিল অভিজিৎ আসলে কার কথা ভেবে ওসব বলছে। তার স্ত্রীর কথা ভেবেই নিশ্চয়। আবার বলেছিল, 'আপনার মত নিতান্ত খেটে খাওয়া মহিলা, আর এত শান্ত, তিনিও যে এমন নাচ জানেন, আমার ধারণা ছিল না।'

ক্বচিৎ কখনো একটু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলবার চেষ্টাও করেছে অভিজিৎ। কিন্তু তার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় নি। সম্পর্কটাকে সহজ করারই একটা চেষ্টা, একটু যা অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা। যেমন কোথা থেকে তপতী আসে এবং ওকে দেখে নাকি অভিজিতের মনে হয়েছে, ওর একটা সুইট পার্সোনালিটি আছে। একদিন বলেছিল, 'আচ্ছা মিস রয়, একটা কৌতূহল প্রকাশ করব ?'

'কী ?'

'আপনি তো মিস রয়, অথচ সেদিন দীপকবাবুকে বলেছিলেন, আপনি বাড়ি না গেলে বাচ্চারা ঘুমাবে না।'

তপতী একটু বিষণ্ণ হেসে, আসল কথাটা বলেছিল, এবং প্রসঙ্গক্রমেই ওদের পারিবারিক দুর্ঘটনা, আর ওর বাবার নামটা উঠে পড়েছিল। অভিজিৎ হঠাৎ যেন কী রকম একটু চমকে উঠেছিল। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই আবার অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। তবে এটা এখন তপতী পরিষ্কার বুঝতে পারে, যে কোন কারণেই হোক তপতীর প্রতি অভিজিৎ যেন বিশেষ প্রসন্ন। তপতীর দিকে তাকালে তার চোখের দৃষ্টি একটু বদলে যায়।

তার জন্য কী করবার আছে। তপতীর প্রতি একজন যদি প্রসন্ন হয়, হতে পারে। নাচের স্কুলেই সেটা সীমাবদ্ধ। লোকটি খারাপ না। তার জীবনের একটা ব্যাপার তপতী জানে। যদিও সে কথা তপতী কোনদিন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নি।

boiRboi.net

অভিজিতও কোনদিন সে প্রসঙ্গ তোলে নি, তোলার কোন কারণও নেই, অবকাশও নেই। তপতী জানে না, দীপকের মুখে ও অভিজিৎ সম্পর্কে যে কথা শুনেছিল, অভিজিৎ সেই নাচ, গান, পান ভোজন হুল্লোড়ের চরম পথে, ইতিমধ্যে কতখানি এগিয়েছে। তবে লোকটির মনে যে শান্তি নেই, সে যা করছে এসব যে তার ভাল লাগে না, সেটা কথাবার্তায় ভাব ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। বেশ বোঝা যায় অভিজিৎ যখন ড্যান্নির নাচের স্কুলে আসে, সে তখন তার আসল রূপটাকে ফেলে দিয়ে একটা ছদ্মবেশ নিয়ে আসে। ড্যান্নির স্কুলের লোক সে না, এটা প্রথম দিন থেকেই তপতীর মনে হয়েছিল। ড্যান্নি এবং তপতী ছাড়া কারোর সঙ্গে সে কথা বলে না, তার থেকেই বোঝা যায় এখানে কোন কারণেই তার মন বসে নেই।

অভিজিৎ কতখানি গোঁড়া বা রক্ষণশীল, ঠিক জানে না। শিক্ষা-দীক্ষার অভাব তার নেই। পৃথিবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞও না। কিন্তু নেচে গেয়ে খেয়ে জীবন কাটাবার লোক সে নয়। কেন যে তার স্ত্রী তাকে নিয়ে মোটামুটি একটা শান্তির সংসার গড়ে তুলতে পারে না, তপতী বুঝতে পারে না।

কথাটা মনে হতেই তপতী নিজেকে ভ্রূকুটি করে ধমক দিয়েছে। একথা ভাবার ওর কী প্রয়োজন, ভাবনাটা মনে আসেই বা কেন। হয়তো অভিজিতের দাম্পত্য জীবনের ঘটনাটা ও জানে, অভিজিতকেও খানিকটা বুঝতে পারে। তথাপি, একজন বিবাহিত ব্যক্তি সম্পর্কে তপতীর মনে মনেও কোন মন্তব্য করা উচিত না। দীপক যা মুখফোঁড় ফাজিল, ইতিমধ্যেই ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে। অবিশ্যি, ওর ঠাট্টার মধ্যে কোন বিষ নেই, সেটাই রক্ষে। দীপকের কথা থেকে বোঝা যায়, অভিজিতকে নিয়ে তপতীকে সে যে ঠাট্টাই করুক, অভিজিৎ দীপকের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে না, তবু লোকটি সম্পর্কে তার কোন খারাপ ধারণা নেই। বরং অভিজিতের ওপরে তার একটা অন্য রকম ধারণা। মাঝে মাঝে দীপক বলে, 'অভিজিৎ চাটুজ্যের থেকে অনেক কম টাকাওয়ালা বাজে লোককে আমি অনেক বেশি অহংকার করতে দেখেছি। আসলে লোকটা ভদ্রলোক আর শিক্ষিত। লোকটা একটা কাজ যেন জীবনে কোনদিন না করে, এই আমি চাই।'

তপতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'সেটি আবার কী?'

'ভদ্রলোক যেন কোনদিন স্ত্রীর কাছে সাবমিট না করে। তার চেয়ে সারা জীবন যা খুশি তাই করে বেড়াক, সেও ভাল। তবু ও রকম একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চলে না।'

তপতী আপত্তি করেছে, বলেছে, 'এ কথা বলা আপনার সাজে না।'

'কেন?'

'আপনি এক পক্ষের কথা শুনে বলছেন। হয়তো মিসেস চ্যাটার্জিরও কিছু বলার আছে।'

'নিশ্চয়ই আছে। তিনি চান, স্বামী হোটেলে ক্যাবারেতে মদ খেয়ে নেচে বেড়াবেন, অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবেন, উনিও অন্য পুরুষদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবেন, কাজকর্ম চুলোয় যাবে, টাকা পয়সা জলের মত খরচ হয়ে যাবে, এই বলার আছে মিসেস চ্যাটার্জির।

boiRboi.net

'এটাও আপনার শোনা কথা।'

'কিন্তু সবাই তাই বলে। আরে অভিজিৎ চ্যাটার্জিকেও তো আমি দেখছি। যাকেই জিজ্ঞেস করবেন, তার সম্পর্কে কেউ আপনাকে একটিও বাজে কথা বলতে পারবে না।'

তপতী বলেছে, 'তার আর কোন দরকার নেই আমার। এসব নিতান্তই কথার কথা।'

দীপক বলেছে, 'তা জানি, আমিও আপনাকে নিতান্ত কথা প্রসঙ্গেই বলছি। লোকটা সোজা মানুষ, লড়ে যাক।'

তপতী বুঝতে পারে, অভিজিতের স্ত্রীর সঙ্গে লড়ে যাবার মধ্যে, দীপকের মনেও কোথাও বোধ হয় একটা আত্মসন্তুষ্টির ব্যাপার আছে। মানুষের মনে, কার কোথায় যে কী কষ্ট আর যাতনা লুকিয়ে আছে, বলা যায় না। দীপকের এই মনোভাবটা জানে বলেই, অভিজিৎ সম্পর্কে সে তপতীকে যা ঠাট্টাই করুক, সেটা নিতান্ত ঠাট্টাই। কোথাও আর মালিন্য নেই।

আজকাল দীপক নাচের স্কুল থেকে বেরিয়ে বলে, 'অভিজিৎ চ্যাটার্জি কী বলল আজ মিস রয়?'

তপতী বলে, 'কই, সেরকম কিছু বলেছে বলে তো মনে করতে পারছি না।'

দীপক চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'সে রকম না হোক, অন্যরকম কিছুও তো বলতে পারে, ঘরে ঢুকেই চারদিকে তাকিয়ে, যেভাবে আপনাকে খুঁজতে থাকে—'

'আমাকেই খোঁজে, সে কথা আপনাকে কে বলেছে?'

'ওটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বয়ং পুরবী সেনকে জিজ্ঞেস করবেন।'

তপতীর হাসি পেয়ে যায়, তবু হাসে না, বলে, 'এতে আবার পুরবী সেন আসছে কী করে?'

দীপক হাই তোলার ভান করে বলে, 'এই বললাম আর কী। অভিজিৎ চাটুজ্যে, আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না তো, তাই বলছি। একমাত্র আপনার সঙ্গেই যা একটু কথা বলেন।'

তপতী বলে, 'মোটেই না, ড্যান্নির সঙ্গে—।'

দীপক বলে ওঠে, 'আরে সে তো বলতেই হবে, আফটার অল্, ড্যান্নি হল ওনার এ্যান্ড টিচার।'

তপতী মাঝে মাঝে ভাবে, অভিজিৎ চ্যাটার্জির এটাও এক ধরনের অহংকার বোধ হয়। কেনই বা সে আর কারোর সঙ্গে কথা বলে না। এখানে যখন নাচ শিখতে এসেছে সে, তখন কেবল নাচ শেখার প্রয়োজন যে-দুটি মানুষের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে ছাড়া কারোর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, এটা ঠিক না। তবে, তাতে তপতীরই বা কী যায় আসে। অভিজিৎ যা ভাল বোঝে, তাই করবে।

হঠাৎ একটা বুধবারে, স্টোর থেকে ছুটি পাওয়া গেল। তপতী দিনটাকে কোনরকমেই নষ্ট করল না। বর্ষার দিন। ঠিকা ঝিকে বাড়িতে রেখে, সকালবেলা চারুকে নিয়ে নিজেই বাজারে গেল। উদ্দেশ্য ইলিশ মাছ কেনা। টুকু খুকুকে ও আজ নিজের হাতে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়াবে। প্রতিজ্ঞাটা বেশ কিছুদিনের।

boiRboi.net

ইলিশ মাছ পাওয়াও গেল বটে, তবে ওর অন্যান্য বাজারের হিসাবে যা পয়সা ছিল, সবটা দিয়ে একটি গোটা ইলিশ কিনতে হল। সত্যি, বাংলা দেশের বাজারে আর ঢোকা যায় না। মনে হয়, আগুনে হাত দেবার মত ব্যাপার। তবু সান্ত্বনা মাছ একটা কেনা গেল। চারু কাটাকুটি করল। খিচুড়িও রান্না হল, মাছও ভাজা হল, কিন্তু বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে, আকাশ ফাটিয়ে চড়চড় করে রোদ উঠল। তপতীর মনে হল, খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়াটাই মাটি হয়ে গেল। খুকু তো কেঁদেই ফেলল, 'কেন রোদ উঠল, কেন জল হচ্ছে না।'

রোদ যখন উঠলই, বিকেল চারটে নাগাদ তপতী একবার বেরোল। স্টোরের লতিকাদি অনেকদিন ধরে তাঁর বাড়িতে একবার যাবার জন্য বলেছেন। সেটাই সেরে আসতে গেল। কোনদিন যায় নি, তাই টুকু খুকুকে নিয়ে গেল না। কিন্তু সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয়, লতিকাদির বাড়ি পেঁছুতে না পেঁছুতেই বৃষ্টি। তপতীর মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। বৃষ্টি, সেও একটু মানিয়ে নিতে চায় না। সকালে এসে সকালেই বিদায় নিল, আবার বিকাল হতে না হতেই নামল। আর নামার বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লয়টা বেশ দীর্ঘয়িত। অতএব সাড়ে ছ'টার মধ্যেই লতিকাদির বাড়ি থেকে উঠে পড়ল। লতিকাদির একটি ছাতা নিয়ে বাস স্টপে এল। কিন্তু এ বৃষ্টি ছাতায় রক্ষা হল না। হাওয়ার ঝাপটা, তার সঙ্গে ইলশেগুঁড়ি ছাট।

বাস স্টপে মাত্র দুজন লোক। ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে। ছুটির দিনে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে আগেই। কিংবা বিকালে আকাশের চেহারা দেখে বেরোয় নি। বাসযাত্রী তিন জনের ওপরে আলো ফেলে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল স্টপে। কিন্তু বাস নয়, বড় একটা বিদেশী মডেলের গাড়ি। আলোটা নিভে গেল, তারপরে বাঁ দিকের কাঁচটা নেমে গেল। তপতী অবাক হয়ে শুনল ওর নাম ধরেই কেউ গাড়ি থেকে ডাকছে, 'মিস রয়, এদিকে শুনুন।'

গলার স্বরটা চেনা। অভিজিৎ। হঠাৎ অভিজিৎ এখানে! তপতী ছাতাটা খুলে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার, আপনি এখানে?'

অভিজিৎ বলল, 'যাচ্ছিলাম এই রাস্তা দিয়ে। হেডলাইটের আলোয় মনে হল আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। বুড়ো হলেও দেখছি নজরটা ঠিকই আছে। আপনাকে কি আমি একটা লিফ্‌ট দেব?'

তপতী লজ্জিত ব্যস্ততায় বলে উঠল, 'না না, বাস এলেই আমি চলে যাব'।

অভিজিৎ একটু হাসল, বলল, 'সেটা তো খুব সোজা কথা মিস রয়, বাস এলে আপনি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকবেন না। আমি কোন কাজে বেরোই নি। বৃষ্টি বাদলার দিন, আপনাকে দেখতে পেলাম, আমার সঙ্গে একটা গাড়ি, স্বভাবতই আপনাকে আপনার জায়গায় পেঁছে দিতে পারলে আমি খুশি হব।'

তপতী হঠাৎ যেন এর পরে আর কোন কথা খুঁজে পেল না। এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব, তারপর বলল, 'আপনার কষ্ট হবে।'

অভিজিৎ দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'সেটাই হতে দিন।'

বলে সে সরে গিয়ে, স্টিয়ারিং-এ বসল। তপতী উঠে দরজাটা বন্ধ করল, কাঁচ তুলে দিল। অভিজিৎ গাড়ি স্টার্ট করে বলল, 'ঠিকানাটা বলুন।'

boiRboi.net

তপতী ঠিকানা বলল, অভিজিৎ গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?'

'এক বন্ধুর বাড়িতে।

'আর আপনার দিদির বাচ্চারা ? তারা কার কাছে ?'

'ওদের দেখার জন্য একজন আছে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তপতীর অস্বস্তি ভাবটা ইতিমধ্যে অনেকখানি কেটে যায়। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাড়িও তো এদিকে নয় জানতাম ?'

অভিজিৎ বলল, 'না, আমিও আপনার মত আমার এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে একটু দেখা করতে এসেছিলাম। আগে ছুটির দিনগুলোতেও কাজ করতাম, আজকাল আর ভাল লাগে না।'

অভিজিতের স্বরে একটা বিষণ্ণতার সুর বাজে যেন। তপতী চুপ করে রইল। অভিজিৎ হঠাৎ বলল, 'মিস রয়, নাচ তো শিখলাম, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না।'

তপতী বললে, 'কেন ?'

'কাউকে দেখাতেই পারছি না।'

তপতী কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারল না। অভিজিতের দিকে তাকাল।

অভিজিৎ বলল, 'মানে পাবলিকলি নাচা হচ্ছে না এখনো, এই যেমন ধরুন ক্লাবে বা অন্য কোথাও।'

তপতী বলল, 'ও, তা গেলেই তো পারেন। এখন তো আপনি বেশ ভালই শিখে গেছেন।'

অভিজিৎ যেন খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'তা পারি—।' কথাটা যেন শেষ করলো না। একটু পরে আবার বলল, 'একটা অনুরোধ করব মিস রয় ?'

তপতী বলল, 'বলুন।'

অভিজিৎ বলল, 'আসলে আপনি আমাকে একটি কূপমণ্ডূক বলতে পারেন। নিজের কুয়ো থেকে বেশি দূরে নজর যায় না এমনভাবে মানুষ হয়েছি আর মনের গঠনটাও এমন, নাচের আসরে গিয়ে যে কোন মহিলাকে ডাকতে পারব, মনে হয় না'।

তপতী বলল, 'কেন, ওটা তো একটা কমন কার্টসি।'

'তা জানি, তার সঙ্গে শিভালরি থাকলে আরো ভাল হয়। কিন্তু আমি নিজেকে তো চিনি তাই বলছি। আপনি একদিন আমার নিমন্ত্রণ রাখুন না।'

তপতী অবাক হয়ে বলল, 'আমি ?'

'হ্যাঁ। আপনার কাছে হাতেখড়ি, আপনার কাছে সহজ হতে পারি।'

তপতী বলল, 'না, তা নয়।'

'তাই, আমার ধারণা, আমি আপনার কাছেই শিখেছি। আপনার আপত্তি আছে আমার নিমন্ত্রণ নিতে ?'

তপতী চুপ করে রইল। কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। অভিজিৎ যে কোন-রকম অসদুদ্দেশ্যে কথাটা বলছে না, সেটাই ওর অনুমান। তবু সম্মতি দিতে আটকাচ্ছে। ব্যাপারটাও এমন কিছু গুরুতর না। স্কুলে নাচতে পারে, আর অন্য আসরে গিয়ে নাচতেই বা কী হয়েছে। লোকের মুখে দুর্নামের আশঙ্কা আছে। তা

boiRboi.net

ছাড়া আর কী ক্ষতি হতে পারে। তবু ওর আটকাচ্ছে। ও কেবল বলল, 'আপত্তির কী থাকতে পারে।'

অভিজিৎ চুপ করে রইল। একটু পরেই তপতী বলল, 'এখানেই দাঁড়ান, আমি নেমে যাচ্ছি।'

'এ রাস্তার ওপরেই আপনি থাকেন?'

'না ডান দিকের রাস্তায় যাব।'

'চলুন দিয়ে আসি।' অভিজিৎ গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল।

তপতী বলল, 'এটুকু হেঁটেই চলে যেতাম। কেননা এই বড় গলিটার পরেও অন্য গলি আছে, যেখানে আপনার গাড়ি ঢুকবে না। এবার দাঁড়ান।'

অভিজিৎ গাড়ি দাঁড় করাল একটা অন্ধকার সরু গলির মুখে। তার মুখটা হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তপতী বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, যাচ্ছি। নমস্কার।'

অভিজিৎ কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। তপতী নেমে গেল, এগিয়ে গেল অন্ধকার গলির মধ্যে। খুকু টুকু কী করছে কে জানে। অভিজিতের নিমন্ত্রণের কথাটা মাথায় যেন কেমন বিঁধে রইল।

কুড়ি দিনের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটল। দীপকের সঙ্গে কথাটা আলোচনা করে অভিজিতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল তপতী। আজ সেই দিন। আজ তপতীর সব দিক থেকেই ছুটির দিন। টুকু খুকুর সঙ্গে সারাদিন থেকেছে। সন্ধ্যাবেলা একটু বেশি করেই সেজে ফেলল।

এমন কিছু সাজ না। হেয়ার ড্রেসারের কাছে না গিয়ে, নিজেই একটু সময় নিয়ে চুলটা তৈরী করল। একটু সাট মিলিয়ে শাড়ী ব্লাউজ পরল। ব্লাউজের ছাঁটটা একটু বেশি আধুনিক, সবদিকের বহরই সংক্ষিপ্ততম। কাজল আর ঠোঁটের রঙ একটু গাঢ় করল। মনটা থেকে থেকে খারাপ হচ্ছিল, দীর্ঘশ্বাস পড়েছে কয়েকবার। অনেকদিন পরে আবার বাইরে ডিনার আর ড্যান্সিং-এ চলেছে তপতী।

বেরোবার আগে টুকু খুকুর সঙ্গে অনেক কথা হল। তপতী হাততালি দিয়ে গান করল, 'প্রমিস্, আই অ্যাম দ্য লাস্ট পারসন টু গো।'...

টুকু খুকু হাত ধরাধরি করে নাচল। তপতী ঘড়ি দেখল সাড়ে ছ'টা। গলির মোড়ে গাড়ির হর্ণ শোনা গেল। তপতী দুজনকে আদর করে চারুকে বলে বেরিয়ে গেল। গলির মোড়ে এসে দেখল অভিজিৎ লাউঞ্জ স্যুট পরে স্টিয়ারিং-এ বসে আছে। তপতী যেতে অন্যদিকের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

তপতী দরজা বন্ধ করল। গাড়ি স্টার্ট করল অভিজিৎ। বলল, 'কিছু মনে করবেন না মিস্ রয়, আপনাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তপতীর লজ্জা করে উঠল, কিছু বলল না। অভিজিৎ আবার বলল, 'আপনি আমাকে নাচের সময় বলতেন, টেক ইট ইজি। আমিও আপনাকে আজ বলছি, টেক এভ্রিথিং ইজ, একসেফট্ ইওর প্রেস্টিজ। আপনি কি ড্রিংক করেন?'

তপতী বলল, 'না।'

'কখনো করেছেন ?'

'সেটা খুব দায়ে পড়ে এক আধবার, অনেক অনেক কাল আগে।'

'আমি যদি জীবনে আজ প্রথম স্পর্শ করি আপনার সামনে, আপনি কিছু মনে করবেন ?'

ছেলেদের মদ খাওয়ার ব্যাপারটা তপতীর কাছে মারাত্মক কিছু না। ছেলেবেলা থেকে বাবাকে খেতে দেখেছে। ঠাকুর্দাও খেতেন। ওদের বাড়িতে এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। তবু বলল, 'ওটা না হয় এ জীবনে আর না-ই স্পর্শ করলেন।'

অভিজিৎ বলল, 'জীবনে কখনো প্রতিজ্ঞা করিনি খাব না বলে। তবে ইচ্ছা হয় নি কখনো। এখন মনে হয়, সব কিছু জানা বোঝাটা ভাল।'

তপতী জানে অভিজিৎ কেন একথা বলছে। তপতী বলল, 'সব কিছুর মধ্যে এটা একটা এমন কিছু ব্যাপার না। মানে এটা না হলেও চলে।'

'সে তো অনেক কিছুই চলে যায়। আমার কাছে ব্যাপারটা অনেকখানি, অবিশ্যি মন্দের দিকে।'

'সেই মন্দটাই করবেন ?'

অভিজিৎ একটু চুপ করে রইল, তারপরে বলল, 'ভাল কিছু জীবনে করেছি, এ বলতে কেন যেন আমার লজ্জা করছে। বিশেষতঃ আপনার সামনে।'

'কেন ?'

'বোধহয় ভাল কখনো কিছু করিনি, অন্ততঃ আমার চারপাশে মন্দের ছায়া অনেক বেশি। কিন্তু সে কথা যাক, এখন আমি তথাকথিত মন্দগুলো একটু দেখতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো ?'

অভিজিতের শেষের দিকে কথাগুলো একটু হেঁয়ালির মত লাগল। তপতী হেসে বলল, 'জীবনে প্রথম এরকম একটা কাজ, আমার সামনেই করবেন ?'

অভিজিৎ হেসে বলল, 'তার জন্য আপনার কোন দায় থাকবে না।'

'না, তা নিশ্চয় না। বেশ তো, ইচ্ছে হলে একটু খাবেন।'

বিরাট হোটেল বাড়ির ভিতরে গাড়ি পার্ক করল। দারোয়ান ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। দু'জন লিফটে উঠল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ককটেইল লাউঞ্জে গিয়ে ঢুকল দুজনে। তখন ফকস্ ট্রট নাচছে অনেকেই। ওরা গিয়ে এক কোণে বসল। বেয়ারা এল। অভিজিৎ অর্ডার দিল, তপতীর জন্য কোল্ড ড্রিংক, নিজের জন্য হুইস্কি।

একটু পরেই মিউজিক শেষ হতেই নাচও শেষ। হাততালি। একজন সুগৌরী মত্ত মহিলাও নাচছিলেন। যুবতী বলা যায়। তিনিও জোরে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন, তারপর পুরুষ সঙ্গীর হাত ধরে টেবিলে গিয়ে বসলেন। তপতী দেখল অভিজিতের ফরসা মুখ কেমন যেন লাল হয়ে উঠেছে। তার দৃষ্টি সেই মহিলার ওপরে। মহিলা তখন সিগারেট ধরাচ্ছেন। চেনা নাকি অভিজিতের? ও জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'চেনেন নাকি মহিলাকে ?'

অভিজিৎ চমকে উঠে বলল, 'কাকে ? না না না, আমার চেনা নয়।'

বেয়ারা ড্রিংকস নিয়ে এল। অভিজিৎ সিগারেট আর দেশলাই আনবার জন্য

boiRboi.net

টাকা দিল বেয়ারাকে। তপতী মনে মনে অবাক হল। অভিজিতকে ও কোনদিন সিগারেট খেতে দেখেনি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি সিগারেট খান?'

অভিজিৎ হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'নিয়মিত না, মাঝে মাঝে। চিয়ার্স'!'

অভিজিৎ সোডাপূর্ণ হুইস্কির গেলাসতুলে নিল। তপতীও কোকোকোলার গেলাস তুলে নিল। ও অভিজিতের দিকে তাকাল। অভিজিৎ গেলাস মুখে তোলবার আগে গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইল। তপতীর দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে গেলাস মুখে তুলল, আগে একটুখানি পান করল, আর তার মুখটা একটু বিকৃত দেখাল। তপতীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বেয়ারা সিগারেট নিয়ে এল। অভিজিৎ সিগারেট ধরাল, তারপরে হঠাৎ তপতীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি স্মোক করবেন?'

তপতী হেসে বলল, 'না।'

ওর হাসবার কারণটা অন্য। অভিজিতের আনাড়ি ভাবে সিগারেট খাওয়া, ঠোঁটের কাছ থেকেই ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া দেখে ওর হাসি পেল। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'হাসছেন কেন?'

আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে।'

অভিজিত আবার গেলাসে চুমুক দিল। একটি শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী এল মিউজিক কর্নারে। মিউজিসিয়ানদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলল। সকলেই যে যার যন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হল। যুবতী মাইকের সামনে এসে উচ্চারণ করল, 'গুড ইভনিং লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন। আই উইল সিঙ্ জাস্ট দিস লেটেস্ট, "ওহ্ ওহ্ রিমেন ফর এ্যান এণ্ডলেস কিস্....।"

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হাততালি। তপতী অভিজিতের মুখের দিকে দেখছিল। অভিজিৎ গেলাসে ঘনঘন চুমুক দিচ্ছে। মুখটা বিকৃত এবং সেই মহিলার দিকে কয়েক-বারই তাকিয়ে দেখল। সিগারেটের ধোঁয়ায় তার মুখটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। গান শুরু হল। সেই মহিলা তার পুরুষ সঙ্গীর হাত ধরে নাচতে এল। অভিজিৎ তাকাল তপতীর দিকে। তপতী বলল, 'চলুন, নাচবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

আরো কয়েক জোড়া নাচতে শুরু করেছে। তপতী অভিজিতের সঙ্গে এগোতে এগোতে নিচু স্বরে বলল, 'ট্যাংগো।'

ওদের দুজনের দিকে অনেকের নজর পড়ল। বিশেষ করে তপতীর ওপর। তা ছাড়া এখানে ওরা একেবারেই নতুন মুখ। যারা এখানে নিয়মিত আসে, তারা কোন-দিনই দেখে নি। অভিজিৎ কোনদিকে না তাকিয়ে কেবল তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নাচতে লাগল। এমনভাবে কখনো সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে না। তপতী বুঝতে পারছে অভিজিৎ অন্য কোনদিকে তাকাতে চাইছে না। তপতী অন্য-দিকে তাকিয়ে নাচতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ কী ঘটে গেল, হঠাৎ একটা মেয়েলি গলা শোনা গেল, 'হেই, আচ্ছা, চমৎকার।'

তারপরেই নাচ আর গানের মাঝখানে হাততালি বেজে উঠল। তপতী অবাক হয়ে দেখল, সেই মহিলা নাচ থামিয়ে ওদের দুজনের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে

boiRboi.net

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে। হেসে মূর্ছা রুগীর মত কাঁপানো গলায় বলে উঠল, 'মিঃ চ্যাটার্জি যে। ভূত দেখছি নাতো!'

সমস্ত ঘরটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। যারা নাচছিল, এবং অন্যান্যেরা সকলেই অভিজিৎ আর তপতীর দিকে তাকাল, যদিও নাচ বন্ধ করল না কেউ। গানও চলতে লাগল। তপতী অভিজিতের মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখে বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা। অভিজিতের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। লাল মুখ, শক্ত আর কঠিন। চোখ তার তপতীর দিকেই, কিন্তু সে এখন ঠিক তপতীকে দেখছে না। তপতী অভিজিতকে নিয়ে নাচতে নাচতেই খানিকটা সরে গেল। 'তাহলে কথাটা মিথ্যে শুনিনি। অভিজিৎ চ্যাটার্জি আজকাল নাচ টাচ শিখেছেন, চমৎকার!'

বলেই খিলখিল করে হেসে, টলমল শরীরে আবার হাততালি দিয়ে উঠল। মহিলার পুরুষ সঙ্গীটি দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। তপতীর মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, এই মহিলা অভিজিতের সেই স্ত্রী। প্রথম দর্শনেই অভিজিতের মুখের পরিবর্তন দেখে একটা ক্ষীণ সন্দেহ ওর মনে উপস্থিত হয়েছিল। এখন সন্দেহ দৃঢ় হল এবং একটা তীব্র অস্বস্তি ওর মনে চেপে এল। মহিলাকে ওর সুস্থ মনে হচ্ছে না। ঘটনাটার আকস্মিকতায় এমন একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, সমস্ত লোক তিনজনকেই দেখছে। একটা বিশ্রী ঘটনার আশংকা হচ্ছে তপতীর। সকলেই বোধহয় সেইরকম একটা কিছুর অপেক্ষা করছে।

তপতীর দিকে মহিলা এমনভাবে দেখছে, পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত। ওর সারা গায়ের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছে। ও অভিজিতকে নিয়ে অন্য দিকে সরে গেল আবার। মহিলাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। অভিজিতের মুখ তেমনি লাল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। তার খেয়াল নেই, তপতীর হাতটা সে কত জোরে ধরেছে। পিঠের ওপরে হাতটা কতখানি জোরে চেপে বসেছে। কিন্তু তপতী জানে অভিজিতের কোন দোষ নেই। ভিতরের উত্তেজনায় তার এরকম হচ্ছে। মহিলাটি আবার বলল, 'তা যে জিনিষকে আপনার এত ঘৃণা, তাই আবার নিজে করছেন মিঃ চ্যাটার্জি। হঠাৎ আপনার এমন মতিগতি হল কেন? এই মহিলাটির পাল্লায় পড়ে নাকি?'

অভিজিৎ মহিলার দিকে না তাকিয়ে চাপা গর্জনের স্বরে বলল, 'দিস ইজ নট দ্য প্রপার প্লেস টু ডিস্কাস অল দীজ থিংস্।'

মহিলা ঘাড় কাৎ করে হেসে বলল, 'কেন কেন, এটাই তো প্রপার প্লেস টু ডিসকাস্। আমার যে জানতে ইচ্ছে করছে মশাই।'

অভিজিৎ সে কথার কোন জাবব দিল না। পরিস্থিতি দেখে গায়িকা গানটা একটু তাড়াতাড়িই শেষ করল। খাপছাড়া ভাবে হাততালি বাজল। অভিজিৎ আর তপতী নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসল। মহিলাও ওদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। অভিজিৎ গেলাসে চুমুক দিল। মহিলা আবার হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'বাহ্ বাহ্, মদ খেতেও শিখেছ। কোথায় যাব? তা আমাকে একটু খাওয়াবে না?'

তপতী কাঠ হয়ে বসে। সকলেই এখনো ওদের দিকে তাকিয়ে। এমন একটা মজার ঘটনা সকলেই উপভোগ করছে। পরিবেশ এবং লোকজনদের দেখে বোঝা যাচ্ছে

boiRboi.net

অভিজিৎ চ্যাটার্জি এবং মহিলাকে অনেকেই চেনে। নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফিসফিস করছে, হাসছে।

অভিজিৎ গম্ভীর স্বরে বলল, 'তুমি তোমার জায়গায় যাও জয়া, আমাকে একটু শান্তিতে বসতে দাও।'

তপতী মনে মনে অভিজিতের প্রশংসা করল। তার কাছ থেকে এতটা সংযত কথা ও যেন আশা করতে পারে নি। অথচ অভিজিতের মুখ রাগে শক্ত এবং লাল। কিন্তু জয়া নামে মহিলা সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, 'এত সহজে কি যেতে পারি, তোমাকে এমন নতুন ভাবে দেখে? আমাকে বসতে বল, তোমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও, আমাকে ড্রিংক অফার কর।'

অভিজিৎ বলল, 'কিছুই করব না, সরে যাও তুমি এখান থেকে।'

জয়া প্রচণ্ড জোরে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারল, সমস্ত ঘরটা কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলল, 'যাব না, কী করতে পার তুমি, যু লোফার।'

স্টুয়ার্ড দৌড়ে এল, বলল, 'এক্সকিউজ মী ম্যাডাম, দিস ইস এ পাবলিক প্লেস...।'

জয়া তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না। পাগলের মত চিৎকার করে বলে উঠল, 'হু আর যু? গেট আউট ফ্রম মাই সাইট।'

স্টুয়ার্ড জয়ার পুরুষ সঙ্গীটির দিকে ফিরে তাকাল। ইতিমধ্যে সে এসে পড়েছিল। জয়ার হাত ধরে বলল, 'প্লিজ, মিসেস চ্যাটার্জি কী করছেন আপনি, আসুন, চলুন।'

জয়া চিৎকার করে উঠল, 'নো নো. আই উইল সী দিস্ অভিজিৎ চ্যাটার্জি। রিয়্যাল কালচারের বদলে, আজ ও মদ মেয়েমানুষ করতে পারছে, তা হলে আমি কী দোষ করেছি।'

তপতী দেখল অভিজিতের হাত মুঠি পাকিয়ে উঠেছে। সে জয়ার সঙ্গের লোকটির দিকে বাঘের মত একবার তাকাল।

স্টুয়ার্ড লোকটিকে বলল, 'প্লিজ টেক হার।'

জয়ার সঙ্গী এবার তাকে জোর করে হাত ধরে নিয়ে চলল। অনুরোধের স্বরে বলল, 'কাম ডাউন মিসেস চ্যাটার্জি, প্লিজ...।'

জয়া চিৎকার করতে লাগল, 'নো নো নো...।'

জয়া ঘরের বাইরে চলে যাবার পর সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। স্টুয়ার্ড সরে গেল অন্য দিকে। এখনো সকলের দৃষ্টি তপতীদের টেবিলের দিকে। মাইকে গায়িকার একটু ছোট্ট কাশি শোনা গেল, বলল, 'লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন, আই থিংক উই এভ্রিবডি ইজ সরি ফর দ্য ইনসিডেন্ট। লেট আস ব্যাক ইন আওয়ার মুড, বী হ্যাপি।'

বলে সে গান আরম্ভ করল। তপতী বুঝতে পারছে অভিজিতের কোন দোষ নেই। এ ঘরে ওকে আর কে চেনে। বরং অভিজিৎ বড়লোক মানুষ, নিশ্চয়ই শহরের অনেকে তাকে চেনে। অপমানটা তারই বেশি। অপমানে দুঃখে ওর বুকটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মুখ তুলতে পারছে না। ওর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

boiRboi.net

অভিজিৎ বলল 'প্লিজ মিস রয়, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে কী বলব বুঝতে পারছি না।'

তপতী নিচু ভাঙ্গা স্বরে বলল, 'এখানে বসে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে অভিজিতবাবু। আমি উঠতে চাইছি।'

অভিজিৎ বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই।'

বোঝা গেল অভিজিৎ নিজেও ওঠবার জন্য ব্যস্ত। সে হাত তুলে বেয়ারাকে ডাকল, বলল, 'বিল্।'

বিল না আসা পর্যন্ত দুজনেরই মুখে কথা নেই। কেবল অভিজিৎ একবার বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন আপনি।'

তপতী সকলের চোখ বাঁচিয়ে নিজের চোখ মুছবার চেষ্টা করল। বিল্ এল, টাকা আর টিপ্‌স মিটিয়ে দিয়ে দুজনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ভিতরে তখন গান চলছে। লিফটে নেমে গাড়িতে উঠল দুজনেই। রাস্তায় এসে অভিজিৎ বলল, 'একটু গঙ্গার ধারে যাবেন মিস রয়?'

তপতী আপত্তি করল না। এই মুহূর্তেই ও টুকু খুকুর সামনে যেতে চায় না। ম্লানির মুখ দেখে ওদের কিছু সন্দেহ হতে পারে! বলল, 'চলুন।'

অভিজিৎ গাড়ি চালিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গঙ্গার ধারে এল। একটু নিরালায় রাস্তার ধারেই গাড়ি দাঁড় করাল। জায়গাটা একটু নিরালা অন্ধকার। অভিজিৎ তার দিকের দরজাটা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে গিয়ে বসবেন, না গাড়িতেই থাকবেন?'

তপতী বলল, 'গাড়িতেই থাকি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ, কেউ কোন কথা বলছে না। তপতী বুঝতে পারছে অভিজিৎ আশা করছে তপতীই কথা বলবে। তপতী নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'উনি আপনার স্ত্রী, না?'

অভিজিতের চমকাবার কিছু নেই। ছোট করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।' একটু থেমে আবার বলল, 'মিস রয়, আমার ওপর রাগ করবেন না, আমি জেনেশুনে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাই নি, এটা বিশ্বাস করবেন।'

তপতী বলল, 'সেটা আমি বিশ্বাস করছি আপনার কিছু করবার ছিল না।'

অভিজিৎ বলল, 'আপনি জানেন আপনাকে নিয়ে কেন আমি ওখানে গিয়েছিলাম। আমার একটা সাধ, আর এই প্রথম আমার জীবনে।'

তপতী তা জানে। অভিজিতের প্রতি ওর সমবেদনা জাগছে। অভিজিৎ জানে না, কিন্তু ঘটনার পশ্চাদ্‌পট অনেকখানিই তো তপতীর জানা। ও অন্ধকারে অভিজিতের মুখের দিকে তাকাল। অভিজিৎ তার নিজের জীবনের ঘটনা বলবার থেকেও, তপতী তাকে যাতে ভুল না বোঝে সেটাই বেশি ভাবছে। কিন্তু ও সমস্ত ঘটনাটা জানে বলে এটাকে এখন অনিবার্য বলে মনে করেছে। অভিজিতকে এজন্য দায়ী করতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যেত। তপতী তা পারছে না। তবে ওয়া চ্যাটার্জি যে এত লোকের সামনে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারে, এটা ভাবতেও

boiRboi.net

পারছে না। এটা ওর পক্ষে মেনে নেওয়াও সম্ভব না। অভিজিৎ সামনের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, বলল, 'কিন্তু প্রথম দিনটাই দেখছি বিঘ্ন।'

তপতী বলল, 'হয়তো সেটা আপনার দিক থেকে ভালই হল।'

অভিজিৎ বলল, 'না মিস রয়, আপনি সব জানেন না বলেই এ রকম বলছেন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি বলেই কথাটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। তবু বলব এসব আমার জীবনের অঙ্গ নয়, এ জীবনে আসবার ইচ্ছেও আমার নেই, ছিলও না। কিন্তু এখন আমি নিরুপায়, আমার নিজেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের শিকার আমি। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনার মত একজন সম্মানীয়া মহিলাকে আমি এ রকম বিপদে ফেলব না, তবে আজ একটা ঘটনার শুরু, যার পরিণতি আমি জানি না। আমার মনে যদিও বা একটু দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল, আজ একটু আগে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর আমার কোন বাধা নেই।'

অভিজিতের কথাগুলো শোনাল স্পষ্ট গম্ভীর আর দৃঢ়। তপতীর মনের মধ্যে কেমন একটা অশুভ ছায়াপাত ঘটল। যদিও সেটা ঘটবার কোন কারণই নেই। অভিজিৎ চ্যাটার্জি নামক একজন ব্যক্তির জীবনে কী ঘটবে তার জন্য ওর মনে অশুভ আশঙ্কার কিছু থাকতে পারে না। তথাপি ও যেন চমকে উঠল অভিজিতের কথা শুনে। মনে মনে বলল, 'না না, সেটা না হওয়াই ভাল।' কিন্তু পরিস্থিতি এবং ঘটনার স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করার জন্য অনেকখানি পশ্চাদ্‌পট জেনেও ওকে না জানার ভান করতে হল। কারণ অভিজিৎ যে কথা বলল, তারপরে যেটা স্বাভাবিক প্রশ্ন হওয়া উচিত সে বিষয়ে নীরব থাকা চলে না। তাই ও জিজ্ঞেস করল, 'কিসের দ্বিধা সঙ্কোচের কথা বলছেন?'

অভিজিৎ বলল, 'মিস রয়, আন্তরিকভাবে আপনাকে সে কথা বলতে চাই। কিন্তু লজ্জা পাব না, অন্ততঃ সেটুকু আশ্বাস আপনি আমাকে দিন।'

'লজ্জার কথা কেন বলছেন!'

'এইজন্য যে, খোঁড়াকে খোঁড়া ভেবে আপনি বিদ্রূপ করবেন না, এইটুকু প্রীতি—।'

এই পর্যন্ত বলে অভিজিৎ হঠাৎ থামল। তপতী তার দিকে ফিরে তাকাল। অভিজিতও তাকাল। বলল, 'আপনাকে বন্ধু মনে করতে চাই, যাতে সব কথা বলতে পারি।'

তপতী একটু দ্বিধা করে বলল, 'তেমন গোপন কথা হলে থাক্ না অভিজিতবাবু।'

অভিজিৎ বলল, 'গোপনীয়তার থেকেও বেশি লজ্জার। এমন একটা ঘটনা আপনার সামনে ঘটল, যার পরে চুপ করে থাকতে নিজেরই খারাপ লাগছে। আপনি শুনতে না চাইলে মনে হবে বন্ধুত্বের দাবীটা নাকচ করছেন।'

তপতী একটু চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল অভিজিৎ একটু বেশি মাত্রায় ভদ্রলোক, অথবা একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল। তপতী তার বন্ধু হতে না চাইলেও আগে থেকে যতটুকু জানা আছে তা না থাকলেও কিছুক্ষণ আগেই যে ঘটনা ঘটেছে, সেটাই অনেকখানি লজ্জার বিষয়। তার জন্য এখনো পর্যন্ত অভিজিতের প্রতি সহানুভূতির কোন অভাব হয় নি তপতীর। বরং তার প্রতি সমবেদনাই জেগেছে। অভিজিৎ সে কথা বুঝতে পারে নি। বলতে গেলে কোন প্রশ্ন না করেই তপতী তার

নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। ওর মনে কোথাও একটা প্রীতির ভাব না জন্মালে এটা সম্ভব হত না। শুধু তাই না, আজকের ঘটনায় অভিজিতের প্রতি ওর মনে সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছে বলেই তারপরেও এখানে এসেছে।

কিন্তু পুরুষদের অনেক কথাই এভাবে বোঝানো যায় না। তাদের বুঝতে একটু সময় লাগে। ও বলল, 'বলুন'।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কখনো আমার বিষয়ে কারোর কাছে কিছু শুনেছেন ?'

আচমকা এরকম একটা প্রশ্নের জন্য তপতী প্রস্তুত ছিল না, কী বলবে ভেবে না পেয়ে একটু সময় নেবার জন্য প্রশ্ন করল, 'কী বিষয়ে বলুন তো ?'

অভিজিৎ কয়েক সেকেণ্ড চুপ, কথাটা বলতে যেন চেষ্টা করতে হল। তারপরে বলল, 'এই আমার আর জয়ার বিষয়ে ?'

তপতী মনস্থির করে নিল, তবে খুব স্পষ্ট না হলেও অস্পষ্টভাবে বলল, 'একটা কথা শুনেছিলাম, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর সদ্ভাব নেই, এই পর্যন্তই।'

অভিজিৎ যেন একটু হাসল, বলল, 'এই পর্যন্ত কলকাতার সমস্ত পরিচিত লোকেরাই জানে।'

তপতী বলল, 'কিন্তু অপরের দাম্পত্য জীবনের বিষয়ে কারোর কিছু জেনে লাভটাই বা কী ?'

'নিশ্চয়ই, সেটা আপনার কথা। সব মানুষের তা নয়। আমি এই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। এমন কি, আজকের নিমন্ত্রণে আসা নিয়েও জিজ্ঞেস করেন নি আমি বিবাহিত কী না, হলে আমার স্ত্রী উপস্থিত থাকবেন কী না।'

'জেনে শুনে সে কথা জিজ্ঞেস করে আর একজনকে বিব্রত করা। সেরকম হলে আপনি নিজেই নিশ্চয় বলতেন।'

'ঠিক ঠিক, খুব ঠিক বলেছেন।'

কথাটা বলতে বলতে অভিজিৎ প্রায় একটুখানি ঝুঁকেই এল। আবার বলল, 'সেজন্য আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল, হয়তো আপনি আমার বিষয় কিছু শুনেছেন।'

এক মুহূর্তের জন্য অভিজিতের নিশ্বাসে সামান্য একটু গন্ধ পাওয়া গেল। বহুদিনের পুরনো চেনা গন্ধ। চকিতের জন্য একবার বিমানের মুখটা ওর মনে পড়ে গেল। তপতী বুঝতে চেষ্টা করল এক পেগ্ মাত্র হুইস্কি খেয়ে অভিজিৎ কোন রকম অস্বাভাবিক হয়েছে কী না। কিংবা, অভিজিৎ একটা সস্তা প্রেমের খেলা খেলতে চায় কি না।

ওর এসব কথা ভাববার অবকাশেই অভিজিৎ সোজা হয়ে বসল। সামনের অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে নিচু স্বরে বলল, 'জয়া আমার স্ত্রী, আমাদের বিয়ে হয়েছে বছর ছয়েক। আমাদের পরিবারের তুলনায় আমার বিয়েটা একটু বেশি বয়সেই হয়েছে, প্রায় তিরিশে। আমার বাবা ঠাকুর্দার ধারণা, চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স থেকে প্রশস্ত। ওটা আমিই ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, আর অবিবাহিত অবস্থায়

boiRboi.net

বিলেতে থেকে পড়াশোনা করার জন্য ভীষণ লড়তে হয়েছিল। বাবার বরাবরের ধারণা ছিল, অবিবাহিত ছেলেকে বিলেতে পাঠালে সে শ্বেতকুহকিনীর মায়ায় পড়বেই।'

বলতে বলতে অভিজিতের যেন হাসি পেল। সেইরকম একটা শব্দ করল সে। তারপর বলল, 'শ্বেতাঙ্গিনীরা কুহকিনী, এটা আমি মোটেই মনে করি না, কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী সম্পর্কে আমার তথাকথিত ভারতীয় কোন মোহ ছিল না। ভারতীয় মোহ বলতে কী বোঝাতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, যে-মোহটা শুধু শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েদের সম্পর্কেই না, সাগরপারের সবকিছুতেই তো আমাদের মোহ। কিন্তু নিজের স্ত্রী বলতে আমি বরাবরই একটি নিছক শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ের কথা ভেবেছি। রূপে রুচিতে একটু মিলমিশ থাকলেই হল, একটি সহৃদয় মন, একটু—।'

অভিজিৎ থামল, কথাটা শেষ করল না। তপতী দেখল সে স্টিয়ারিং হুইলের ওপরে দুটো হাতই এমনভাবে বোলাচ্ছে, যেন গাড়ি চালাচ্ছে। অন্ধকারে অভিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কী না। অভিজিৎ আবার বলল, 'আমার বাবার বরাবরের অহংকার তিনি অত্যন্ত সমঝদার—না, শুধু তাই বা কেন বলি, তিনি নিজেকে বিশেষ কূটবুদ্ধিপরায়ণ ভেবেও গর্ব বোধ করতেন। পৌরুষের ওটাই নাকি একটা লক্ষণ। কিন্তু যাঁকে তিনি তাঁর পুত্রবধূ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সমস্ত অহংকার চূর্ণ করেছেন। বলতে গেলে, ভদ্রলোক সেই শোকেই মারা যান। কিন্তু সে সব কথা যাক। আমার কথা বলি। জয়াকে আপনি আজ দেখলেন। আমি জানি না আপনি আমাকে গোঁড়া বা রক্ষণশীল ভাববেন কী না, কিন্তু আমার স্ত্রী ড্রিংক করবেন, স্মোক করবেন, সকলের সঙ্গে নেচে বেড়াবেন—।'

অভিজিৎ যেন নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠে তপতীর দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি বলল, 'প্লিজ মিস রয়, আমাকে বুঝতে ভুল করবেন না। নেচে বেড়ানো বলতে আমি এই বোঝাচ্ছি, বাড়িতে নিজেদের অনুষ্ঠানে নিজেদের মধ্যে যদি একটু আধটু কোন কারণে হয়, তেমন আপত্তিকর মনে করি না। আপনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা—।'

তপতী বলল, 'আমার কথা বাদ দিন অভিজিতবাবু।'

'প্রসঙ্গক্রমে আপনার কথা একটু বলতে দিন। ড্যান্সির ইস্কুলে আপনি কেন, আমি তা জানি, আর এও জানি নাচটা আপনার কাছে কী। ওটা আপনার কাছে আর্ট, একটা শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু একজন পাবলিক মহিলার মত বারে ক্যাবারেতে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ান না আপনি। আমি সেই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এসব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। পৃথিবীতে ঘুরে আমি কিছু কিছু দেখেছি, আমি জানি একটা অসুখের ভোগ, আর অতৃপ্তির আগুনে যারা পুড়ছে, তারা কেমন ভাবে ছুটছে...।'

এর পরে দীপকের মুখে যা শুনেছিল সেই কথাই অভিজিৎ বলে গেল। বিরোধ, বিদ্বেষ, ছাড়াছাড়ি, তারপরে এই জেদ।

অভিজিৎ যখন থামল তপতী জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন অভিজিতবাবু, আপনি তো এর পরিণাম ভালই জানেন।'

boiRboi.net

অভিজিৎ বলল, 'জানি। মিস রয়, আপনাকে হয়তো সব কথা এখুনি বলতে পারব না। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, একটা ঘোরতর পাপ আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। আমি নিজে কোন পাপ করি নি, কিন্তু পাপের মধ্যেই আমার বাস। এ কথাটা আমি ভুলতে চেয়েছি, যদিও আমার চিরদিনের জানা বোঝা দেখা, সততার মূল্যবোধের প্রতি কোন রকম বিশ্বাস নেই। একটা প্রকাণ্ড অন্তঃসার শূন্যতার মধ্যে থেকেও নিজে তো কোন অপরাধ করি নি, এই ভেবে আমার চারপাশের পাপকে ভুলতে চেয়েছি। কিন্তু তা পারা গেল না। সেইজন্যই বোধ হয় আমার জীবনে জয়া। আমার মনে এই নতুন ইচ্ছা, সর্বাংশে না পুড়লে, এর শেষ হবে না।'

তপতী যেন খানিকটা ভয়ে বিস্ময়ে অভিজিতের কথাগুলো শুনল। তার কথার মধ্যে একটা কোন গভীর অর্থ আছে, যা স্পষ্ট দেখা যায় না। কোথাও একটা পাপের কারণে অভিজিতের জীবনে জয়ার আবির্ভাব, এবং তার নিজের ধ্বংসকে অনিবার্য ভাবছে। একটা অশুভ ভাবনাই আবার তপতীর মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। আর সেই সঙ্গে একটা কথা ওর মনে এল। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব অভিজিতবাবু ?'

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রীকে কি আপনি ভালবেসেছেন ?'

'কথাটা যে কোনদিন ভাবি নি, তা না। কিন্তু এর কোন সদুত্তর আমি জানি না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, ভালবাসা কী, তা হলে আমি তা বলতে পারব না। কী তার স্বাদ, কী তার অনুভূতি, আমি কিছুই বুঝি না। আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, জয়ার সঙ্গে বিরোধ আমার প্রথম থেকেই। যাকে বলে হরিষে বিষাদ, তাই। বিয়ের আগে আমি ওকে কখনো দেখি নি, শুনেছি সে রূপসী বিদুষী। কিন্তু বিয়ের রাত্রি থেকেই আমার বুকের মধ্যে কেমন কেঁপে উঠেছিল, আমার জীবনে এ ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিক হল না। তারপরেও আমি কয়েক বছর চেষ্টা করেছি, জয়াকে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরেছি বলতে পারেন, কিছু হয় নি।'

তপতী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি সব বুঝি, তা বলতে পারি না। তবে মনে হয় ভালবাসা থাকলে অনেক কিছুর নিরসন হয়ে যায়, অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অনেক সংশয়ের।'

'এক্ষেত্রে আমি সেরকম কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না।'

'মিসেস চ্যাটার্জি হয়তো আপনাকে এখনো ভালবাসেন।'

'আমি সঠিক জানি না, তিনি কবে আমাকে ভালবেসেছিলেন।'

'এটা অনেক সময় হয়তো না জানার মধ্য দিয়েই ঘটে।'

'তেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখবার অবকাশ আমার জীবনে ঘটে নি।'

তপতী চুপ করল। নিজের কথাবার্তায় কেমন একটু লজ্জা করল। অভিজিতকে অনভিজ্ঞ বা অনুভূতিহীন ভাবা চলে না। বয়সে সে অনেক বড়, জীবনে দেখাও কম না। তপতীর এত কথা হয়তো তার কাছে লেকচারের মত লাগছে। এত কথা এই জন্য তপতীর বলতে ইচ্ছে করছে, অভিজিৎ যেন নিজের ভাল মন্দ বুঝতে ভুল না করে। তপতী নিজের কাছে অস্বীকার করে না, অভিজিৎ যদি তার জীবনটাকে একটা

boiRboi.net

জেদের বশে আর খেয়ালের বশে নষ্ট করে, তা হলেও কষ্ট পাবে। এবং এক্ষেত্রে কষ্ট পাওয়া ছাড়া কিছুই করবার বা বলবার নেই। তপতী বলল, 'এসব কথা বললাম বলে কিছু মনে করবেন না যেন।'

'আপনি জিজ্ঞেস করলেন বলে মুখ ফুটে জবাব দিতে পারলাম। ভালবাসা!'

কথাটা উচ্চারণ করল যেন একটা শব্দকে, বিস্ময়ের সুরে। তপতী দেখল অভিজিৎ নিজের মনে আস্তে মাথা নাড়ছে। তারপরে আবার বলল, 'কথাটা অনেক শুনেছি। সেটা কেমনতরো ব্যাপার, তা হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু মন বলে, ভালবাসা বলে একটা কিছু আছে, যা বোধ হয় মানুষকে শান্তি দেয়। আর শান্তিটা আসে সম্ভবতঃ পরস্পরকে বোঝার মধ্য দিয়ে। এই বোঝাটাকে এ্যাডজাস্টমেন্ট বলে কী না জানি না। কিন্তু কিছুই তো একতরফা হয় না।'

তপতী জিজ্ঞেস করবে না ভেবেও, না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'আপনার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি তো?'

'সেটা কেমন করে বলব মিস রয়। নিজের চিন্তা ভাবনার দ্বারা যতটা সম্ভব করেছি। তবে আমি কী চাই, কেমন ভাবে চাই, সেটাও আপনাকে বলেছি। পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির চেষ্টা মানে এই না, এক পক্ষকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।'

'না, তা না।'

'তা হলে বলব, আমার দিক থেকে যা করণীয়, করেছি। জয়াকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, নিজেকেও। শেষ পর্যন্ত পারি নি। তবে আমার নিজের ধারণা, ভালবাসা ব্যাপারটা বোধহয় আলাদা। কোন কিছুর ভাগাভাগি দিয়েই সেটা পাওয়া যায় না। ভালবাসার কাছে মানুষের যুক্তি তর্ক সব শেষ হয়ে যায়। যদিও আমি জানি না, সে ভালবাসা কেমন।'

তপতীর যেন হঠাৎ-ই বাড়ির কথাটা মনে পড়ে গেল। ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। বলল, 'এবার ফিরে যাওয়া যাক।'

অভিজিৎ ওর ঘড়ি দেখে বলল, 'নটা বেজে গেল, চলুন যাই। কিন্তু মিস রয়, কোথাও থেকে একটু কিছু খেয়ে যেতে হবে।'

তপতী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, আমার একেবারেই খিদে নেই।'

অভিজিৎ বলল, 'জানি, ওরকম একটা ঘটনার পরে, কিছু অসুখী সংবাদের পরে খাওয়ার কথা আর মনে থাকে না। কিন্তু একটু না খেলে চলবে না। এখনো গোটা রাত্রি পড়ে আছে। খেতেই আমরা এসেছিলাম। আমারও একটু খাবার দরকার। অন্ততঃ আজকের এই যাত্রায় পৃথক ফল হলে চলে না।'

তপতী এর পরে বিশেষ কিছু বলতে পারল না। অভিজিৎ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। চৌরিঙ্গি আর পার্ক স্ট্রীট এড়িয়ে, কাছাকাছি একটি ছোটখাট রেস্তোরাঁয় ওরা গেল। তপতী অনেকটা অভিজিতকে সঙ্গ দান করার জন্যই একটু খেল। অভিজিতও সামান্য খেল, তারপরে তপতীকে পৌঁছে দিল সে। তপতীর বাসার কাছে পৌঁছুবার আগে অভিজিৎ বলল, 'একটা অনুরোধ রাখবেন মিস রয়?'

তপতী বলল, 'বলুন।'

'ড্যানির স্কুলে আমার আর কতদিন যেতে হবে জানি না। কিন্তু আপনি যেন এখানেই ইতি করে দেবেন না।'

তপতী যেন এ রকম কিছু শুনবে বলেই অনুমান করেছিল। ও বলল, 'অভিজিত-বাবু, আপনি আমার সবই জানেন। আমার সময় কত কম। ঘরে দুটি শিশু। সব মিলিয়ে আমার গতিবিধি খুবই সীমিত।'

অভিজিৎ বলল, 'জানি। সেজন্য আপনাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে।'

তপতী লজ্জা পেয়ে বলল, 'না না, অতটা বলবেন না।'

'বিশ্বাস করুন, একটুও বাড়িয়ে বলিনি মিস রয়। প্রথমে আপনার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওয়েস্টার্ণ নাচে যে একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আর শালীনতা আছে, এদেশে আপনাকে না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতে পারতাম না। তারপরে আপনার কথা অনেকটাই যখন শুনলাম, তখন সত্যি অবাক হয়েছি। আই রেসপেক্ট্ য়ু।'

এতটা প্রশংসা শুনতে শুনতে তপতীর কান যেন লাল হয়ে উঠছিল। বড় লজ্জা করছিল। সেই মুহূর্তে, জবাবে ও কিছু বলতে পারল না।

অভিজিৎ আবার বলল, 'তা ছাড়া আর একটা কথা বলব মিস রয়। আমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করি। সত্যি আমি তো আর একটা যন্ত্র নই যে কেবল কাজ নিয়ে থাকব। লোকে তাই ভাবে, আমি সারা দিন রাত কাজ নিয়ে থাকতে ভালবাসি। কথাটা বাড়াবাড়ি। কাজ আমি সত্যি ভালবাসি। একজন মানুষ হিসাবে, যন্ত্র হিসাবে নয়। কিন্তু মেশবার মানুষ খুঁজে পাই না!'

তপতী অভিজিতের মুখের দিকে তাকাল। স্পীডোমিটারের আলোয় অভিজিতের মুখের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। অভিজিতও একবার তাকাল, তারপরে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'কথাটা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারলেন না। আমার চারপাশের পরিবেশে অনেক মানুষ আছে সত্যি, কিন্তু আমি দেখতে পাই না। আমাকে বন্ধু খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়। ছেলেবেলার পুরনো বন্ধু যারা খেটে খায়, কেরানী বা ইস্কুল কলেজের মাস্টার তাদের আমার সব থেকে ভাল লাগে। সেদিন বর্ষায়, যেদিন আপনাকে দেখলাম বাস স্টপে, আমি ওরকম একজন বন্ধুর কাছ থেকেই ফিরছিলাম। মুশকিল হয় কী জানেন, ওরাও আর আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না। আড়ষ্ট হয়ে যায় কিংবা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

বলতে বলতে অভিজিতের একটা নিশ্বাস পড়ে। আবার বলল, মেয়েদের সঙ্গে কোনদিনই ভাল করে মিশতে পারি না, কথা বলতে পারি না। আর যারা সব আমার চারপাশে আছে, তাদের সঙ্গে ইচ্ছা করলেও মিশতে পারি না। সেদিক থেকে আমি ডিসকোয়ালীফায়েড, র‍্যাদার আনকালচার্ড বলতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে আমার অসুবিধে হয় নি। সেটা আপনার সহৃদয়তা কী না জানি না। আমি অনেক সহজ বোধ করছি।'

আজ অভিজিতকে রাস্তা চিনিয়ে দিতে হল না। সে ঠিক তপতীর সরু গলিটার মোড়ে এসে গাড়ি দাঁড় করাল। তপতীর দিকে ফিরে তাকাল। তপতী যেন তখনো ভাবছিল। এবং হঠাৎ-ই ওর খেয়াল হল, গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ও অভিজিতের দিকে ফিরে তাকাল। অভিজিতের চোখে একটা বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, একটা ব্যগ্র অনুরোধ।

boiRboi.net

তপতী বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'কাজ আর সংসারের বাইরে আমারও কোন বন্ধু নেই।'

অভিজিত যেন কিছু বলতে চাইল, পারল না। কিন্তু চোখ ফেরাতে পারল না। তপতী আবার তাকাল অভিজিতের দিকে। ঘাড় কাত করে বলল, 'চলি।'

ওর দিকে দরজায় খট্ করে শব্দ হল। দরজা খুলে গেল। তপতী নামল। ওর গলির মোড় অবধি গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। অভিজিৎ হাত তুলল। তপতী আস্তে আস্তে হাত তুলল। রাস্তার আলোয় ওর মুখে স্নিগ্ধ হাসি দেখা গেল। তারপরে পিছনে ফিরল, ও বুঝতে পারল এখনো অভিজিৎ দাঁড়িয়ে আছে। তপতী গলির মধ্যে ঢুকে গেল। যখন দরজায় কড়া নাড়ল তখনো অভিজিতের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া গেল না। চারু দরজা খুলে দিল। তপতী বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বলল, 'বড় অসুখী মানুষ।'....

পরদিনই ড্যান্সির নাচের স্কুলে অভিজিতের সঙ্গে তপতীর দেখা হল। আজ অভিজিতকে তপতী স্প্যানিশ ওয়ালজ্ শেখাবার চেষ্টা করল। এক সময়ে অভিজিৎ প্রস্তাব করল, 'আমি কি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব?'

অভিজিতের চোখে যেন করুণ প্রার্থনা। তবু তপতী বলল, 'না থাক, এজায়গাটা আমি এ্যাভয়েড করতে চাই।'

অভিজিৎ আর কিছু বলল না। কেবল চেয়ে রইল। নাচের শেষে বাড়ি যাবার সময় দীপক আজ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মিস রয় আপনার পার্টনার সম্পর্কে দারুণ খবর আছে।'

'কে পার্টনার?'

'আই মিন নাচের, অভিজিৎ চ্যাটার্জির বিষয়ে। উনি নেমে পড়েছেন।'

'মানে?'

'মানে স্ত্রীর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য। পান ভোজন নাচে মেতে উঠেছেন আর সেটা পাবলিক প্লেসেই।'

তপতী দীপকের মুখের দিকে একবার তাকাল। বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, গতকাল দারুণ ঘটনা ঘটে গেছে। এক নাম করা হোটেলের কক্‌টেল লাউঞ্জে উনি ওঁর এক বান্ধবীকে নিয়ে গেসলেন নাচতে, আর সেখানে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। মিসেস চ্যাটার্জি তখন মাতাল, সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। কলকাতায় একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে।'

'সে কি, গোটা কলকাতায় এ ঘটনা নিয়ে ঢি ঢি পড়ে গেল?'

'মানে তাঁদের সোসাইটিতে, ওপর মহলে যাকে বলে।'

'সেটা আপনি জানলেন কী করে?'

'মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধু অজিতবাবুর কাছ থেকে।'

'অজিতবাবু যদি ওঁর বন্ধুই হন, তাহলে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছেন কী করে?'

দীপক ওর নিজের তালেই আছে। হাত নেড়ে বলল, 'আরে ধুর, আপনিও যেমন,

boiRboi.net

বন্ধু না ছাই। চ্যাটার্জির মনোরঞ্জন করার মোসাহেবের দল। আর পেছনে এইসব কেচ্ছা নিয়ে মজা করে। এদের আমি খুব ভালই চিনি।'

তপতী বলল, 'তা হলে বলতে হবে ভদ্রলোকের সত্যি দুর্ভাগ্য। বিশ্বাস করবার মত একজন বন্ধুও নেই।'

'বড়লোকেদের কোন বন্ধু থাকে না। ওরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু।'

তপতী চুপ করে রইল। দীপক বলল, 'আপনি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।'

তপতী হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'না গম্ভীর না, ব্যাপারটা খুব বাজে।'

'নিশ্চয়ই। এখন সবাই কী চেষ্টা করবে জানেন তো? এখন সবখানে মিঃ এ্যাণ্ড মিসেসকে নাচিয়ে দিয়ে মজা দেখব। কিন্তু সকলের এখন ভাবনা হচ্ছে, অভিজিৎ চ্যাটার্জি কাকে সঙ্গে নিয়ে গেসলেন কাল। তাকে কেউ ট্রেস্ করতে পারছে না।'

তপতীর মুখ খুলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু হঠাৎ পারল না। দীপককে সে পছন্দ করে, জানে, তপতীকে গল্প শোনাবার জন্যেই এসব বলছে। এসব নিয়ে, সে অন্য কোথাও ঘোঁট করতে যাবে না। তবু এই মুহূর্তেই ওকে বলতে ইচ্ছা করল না। মানুষের মন, দীপক কী ভাবে কথাটা নেবে কে জানে। বলল, 'নিশ্চয়ই অভিজিতবাবুর কোন বান্ধবী।'

'তা হতে পারে। অজিতবাবু বললেন, মেয়েটি নাকি দেখতে সুন্দরী, সকলের চোখে পড়ার মত, এবং মিসেস চ্যাটার্জির থেকে বয়সেও অনেক ছোট।'

তপতী হেসে উঠে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জির ব্যাপারে আপনাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?'

দীপক বলল, 'লোকটা ভাল বলেই আমি উত্তেজিত। আমি চাই ভদ্রলোক লড়ে যান। হয়ে যাক একটা হেস্তনেস্ত।'

তপতী জোরে হেসে উঠল। ওর বাস এসে পড়ল।

কয়েকদিন পরে, সোমবার তপতীর নাচের স্কুল ছিল না। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর থেকে বেরিয়ে ও চমকে অবাক হয়ে দেখল, অন্যদিকের ফুটপাতের ধারে অভিজিৎ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তপতী যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। নিজের আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, ওর সঙ্গে কেউ বেরোয় নি। অভিজিৎ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ও খুব তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে চলে গেল।

অভিজিৎ বলে উঠল, 'এসে কোন অন্যায় করি নি তো মিস্ রয়?'

তপতী গাড়ির অন্যদিকে গিয়ে বলল, 'জানতাম না তো আসবেন। আর মেয়েদের স্টোর। গল্প শুরু হলে আর রক্ষে নেই। কতদূর যে গড়াবে বলা যায় না।'

অভিজিৎ বলল, 'উঠে আসুন না।'

তা ছাড়া, তপতীর আর উপায় ছিল না। উঠে পড়ে, এখান থেকে সরে না গেলেই বরং সকলের চোখে পড়তে হবে। ও উঠতেই অভিজিৎ গাড়ি ছেড়ে দিল। বলল, 'কিছুতেই বসে থাকতে পারলাম না। আদেখলে বলে একটা কথা আছে, জানেন নিশ্চয়?'

'জানি।'

'আপনাকে পেয়ে আমার হয়েছে সেই অবস্থা। দরিদ্র আর বঞ্চিতেরাই বোধ হয় আদেখলে হয়।'

তপতী হেসে উঠে বলল, 'নিজেকে ছোট করবেন না তা বলে।'

অভিজিৎ বলল, 'মোটেই তা করছি না। বেশি সত্যি বললে আপনি পাছে রুষ্ট হন, তাই আরো কিছু বলতে পারছি না।'

'সেটা আবার কী ?'

'কাজ যখন ভাল লাগে না তখন মনে হয়, তপতী রায়ের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।'

অভিজিৎ তাকাল তপতীর দিকে। তপতী হেসে বলল, 'তা হলে তো আমি আপনার ক্ষতির কারণ হয়ে যাচ্ছি, কাজের মানুষকে অকাজের করে ফেলছি।'

অভিজিৎ গাড়ি চালাতে চালাতেই একবার হাত জোড় করল, বলল, 'বেঁচে যাই মিস্ রয়, আপনি আমাকে একটু অকাজের মানুষ করে দিন। এমন অকাজের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে, তবু জীবনটাকে দেখি, বাঁচাটাকে দেখি।'

অভিজিতের হাসির মধ্যে একটা ব্যাকুলতা ফুটল। তপতী যেন লজ্জা পেল, তবু করুণ মনে হল। কিছু বলল না। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে তপতী বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'আপনাকে বাড়ি পেঁছুতে ?'

তপতী তাকাল অভিজিতের দিকে। শুধু পথটুকু পেঁছে দেবার জন্যই অভিজিৎ স্টোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ? হয়তো মনের ইচ্ছা তা না। তপতীর অসুবিধা করে কিছু করতে চায় না।

অভিজিৎ আবার বলল, 'আপনাকে একটা বাজে খবর দেব ?'

'কী ?'

'জয়া ওর বন্ধুদের দিয়ে সমস্ত হোটেলে. ক্যাবারে বারে, আমাকে আর আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ম্যাডনেস্ ছাড়া কিছুই না। কেননা জীবনে আমি আর ওদিকে কোনদিনই যাব না।'

তপতী তাকাল অভিজিতের দিকে। বলল, 'কেন, আপনি তো তাই চেয়েছিলেন ?'

'চেয়েছিলাম, পারছি না। এটাও আবার নিজের সঙ্গে একটা লড়াই।'

'চেষ্টা করে দেখুন না, মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এ আসতে পারেন কী না। আমি তো মনে করি, সেটাই সব থেকে ভাল।'

অভিজিৎ বলল, 'মিস্ রয়, সব ভাল কি জীবনে ঘটে ? আপনাকে তো আমি সবই বলেছি।'

তপতী বলল, 'আমি এজন্য বলছি, হয়তো আপনিই ওঁকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন।'

'কোথায় ফেরাব বলুন তো ?'

তপতী তাকাল অভিজিতের দিকে। অভিজিতের চোখ সামনের দিকে। আবার বলল, 'আমার বাড়িটাকে যদি একটা জায়গা মনে করেন, সেখানে ফেরানোটাই কি বড়

boiRboi.net

কথা ?' তা ছাড়া আর জয়ার ফেরার জায়গা কোথায় ? জয়াকে ফিরিয়ে আনার আর কোন জায়গা আমার নেই।'

তপতী বুঝতে পারল কথাটা। কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। অভিজিৎ নিজেই আবার বলল, 'তা ছাড়া, ফেরাবার চেষ্টা কি আমি করি নি ?'

তপতী বলল, 'এখন পরিস্থিতি বদলেছে !'

'আমি নাচ শিখেছি, পান ভোজনের ইচ্ছা জেগেছে, রাত্রে মেতে বেড়াবার ঝোঁক এসেছে, এই বদলের কথা বলছেন ?'

তপতী আবার তাকাল অভিজিতের দিকে। অভিজিৎ বলল, 'সে কথা তো আপনাকে একটু আগেই বললাম, পারছি না। পারব না। আমার চারপাশের পাপের কথা আপনাকে বলেছিলাম। সব কিছু পুড়িয়ে ধ্বংস করেই যে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে, তাও মনে হয় না। পাপ অন্যভাবেও প্রতিশোধ নিতে পারে।'

গাড়ি এসে দাঁড়াল তপতীর গলির সামনে। তপতী বলল, 'সত্যি বাড়িতেই এলেন ?'

অভিজিৎ অবাক হয়ে বলল, 'আর কোথায় যাব ? আপনার যে উপায় নেই।'

'আপনি এখন কোথায় যাবেন ? হোটেলে ক্যাবারে বারে ?'

অভিজিৎ হেসে উঠল। বলল, 'আপনার উপায় থাকলে নিয়ে যেতাম, দেখতাম কোথায় যাব।'

'শুনি একটু ?'

'মাঠেঘাটে যেখানে হোক কোথাও নিরিবিলিতে অথবা লোকজনের মিছিলের সামনে চুপ করে দেখব। ভাল না লাগলে বাড়ি যাব, বইপত্র নাড়াচাড়া করব।'

তপতী চুপ করে শুনল, একটু ভাবল, তারপরে বলল, 'আমার বাড়িতে ডাকতে আমার নিজের লজ্জা করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনারই লজ্জা করবে কী না. আমি বুঝতে পারছি না।'

অভিজিৎ যেন একটা তীব্র কষাঘাতে চমকে উঠল। তার মুখটা কালো হয়ে উঠল। নিচু রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এ কথা কেন বলছেন ?'

কথাটা বলে তপতী নিজেও অত্যন্ত লজ্জায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অভিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কষ্টও হল। তাড়াতাড়ি শুধরে নেবার জন্য বলল, 'না মানে, অভিজিতবাবু আমি শুধু আমার দৈন্যের কথাটাই বলতে চাইছিলাম। যদি আপনার কষ্ট হয়।'

অভিজিৎ মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরে বলল, 'নিজে মুখ ফুটে বলতে পারি নি, কিন্তু এমন একটা সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারি নি। কষ্ট যদি পেয়ে থাকি, আপনার কথায়।'

তপতী হাত জোড় করল, বলল, 'সেজন্য মার্জনা চাইছি।'

তৃষ্ণার্তের মত অভিজিৎ তপতীর হাত দুটোর দিকে দেখল। তপতী বলল, 'আসুন।'

'চলুন।'

তপতী নেমে দাঁড়াল। অভিজিৎ গাড়ির কাঁচ বন্ধ করে দরজা লক্ করে ওর সঙ্গে

boiRboi.net

এগিয়ে গেল। তপতী দরজার কড়া নাড়ল। চারু দরজা খুলে দিল। একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে চারু মস্ত একটা ঘোমটা টেনে দিল। টুকু খুকু দুজনেই তপতীকে এসে জড়িয়ে ধরল। তপতী অভিজিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। টুকু আর খুকু প্রথমে লক্ষ্য না করলেও পরমুহূর্তেই একজন অপরিচিতকে দেখে থমকে গেল। অভিজিতের দিকে তাকাল। তপতী দুজনকেই বলল, 'শোন টুকু, খুকু তুমিও শোন, ইনি আমাদের বন্ধু। ওঁর নাম অভিজিতবাবু।'

টুকু হ্যাণ্ডসেকের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল। খুকু দিতে গিয়েও লজ্জা পেল। অভিজিত সাগ্রহে দুজনের হাতই নিজের দু হাতে নিল। কাছে টেনে নিয়ে বুভুক্ষু চোখে, শিশু দুটির দিকে তাকিয়ে দেখল। নিচু হয়ে দুজনের গালেই গাল ঠেকিয়ে আদর করল।

দৃশ্যটা তপতীর ভাল লাগল। কেমন যেন একটু কৃতজ্ঞ বোধ করল। বহুদিন এই শিশু দুটিকে অভিজিতের মত একজন বলিষ্ঠ পুরুষ এমন করে আদর করে নি। ও অভিজিতকে ডাকল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

শোবার ঘরের পাশেই সামান্য বসবার ঘরে অভিজিৎ ঢুকল। তপতী অভিজিতের চোখের দিকে তাকাল। অভিজিতের চোখ দুটি খুশিতে চিকচিক করছে। তপতী বলল, 'বসুন।'

টুকু তখনো অভিজিতের হাত ধরে আছে। খুকু শত হলেও মেয়ে। শিশু হলেও তার লজ্জা আর ভয়টা বেশি। সে তার মানির পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। তপতী বলল, 'বসুন আসছি। কী খাবেন বলুন, চা না কফি?'

অভিজিত বলল, 'চা।'

তপতী বলল, 'টুকু তুমি ওঁর সঙ্গে গল্প কর, আমি আসছি।'

টুকু ঘাড় কাত করল। খুকুকে নিয়ে তপতী পাশের ঘরে গেল। সেখান থেকে শুনতে পেল টুকু বলছে, 'তোমাকে কী বলে ডাকব?'

তপতী এ ঘর থেকেই বলে উঠল, 'টুকু, তুমি না, আপনি করে বল।'

অভিজিতের গলা শোনা গেল, 'টুকু, তুমি আমাকে তুমি করেই বল, আমার খুব ভাল লাগবে।'

'মানি রাগ করবে যে?'

'আমি মানিকে রাগ করতে বারণ করব।'

এ ঘরে তপতী হাসল। খুকু মানিকে হাত দিয়ে ডেকে মাথা নিচু করিয়ে কানে কানে বলল, 'ও কে মানি?'

তপতীও চুপি চুপি গলায় বলল, 'বললাম যে, বন্ধু।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ। তোমার খাওয়া হয়েছে?'

'না, এখন তো খাব।'

'আচ্ছা, এগুলো রেখে দাও।'

তপতী ব্যাগ থেকে টফি বের করে দিল। সাগ্রহে সেগুলো নিয়ে ছোট টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, বলল, 'দাদা জানতে পারলেই নিয়ে নেবে।'

boiRboi.net

'নেবে না।'

তপতী চারুকে ডেকে চায়ের জল বসাতে বলল, 'চায়ের জল হয়ে গেলেই টুকু আর খুকুকে তুমি খাইয়ে দাও।'

খুকুকে বলল, 'তুমিও গিয়ে ওঘরে গল্প কর, আমি চট্ করে বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

চার বছরের খুকু ঠোঁট কুঁচকে বলল, 'লজ্জা করে।'

তপতী ওর সশব্দ হাসিটাকে আঁচল চাপা দিয়ে ঢাকল। বলল, 'তা হলে তুমি এখানেই বস, আমি আসছি।'

বলে ও কাপড়-চোপড় নিয়ে সারাদিনের জামাকাপড়গুলো ছাড়তে গেল। ও ঘরে টুকুর সঙ্গে তখন অভিজিতের বেশ ভাব জমে গিয়েছে মনে হল।

*

তপতী বাথরুম থেকে ফিরে দেখল চা প্রস্তুত। একটু কেক ছাড়া কিছুই নেই। অতিথির জন্য তাই দিল, আর বিস্কুট। নিজের হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে তপতী ঢুকল। ও নিজেও চা খাবে। অভিজিৎ উঠে তাড়াতাড়ি নিজের হাতে ট্রে-টা নিতে গেল। তপতী বলল, 'থাক না।'

সে কথা শুনল না অভিজিৎ। ট্রে নিয়ে সে টেবিলের ওপরে রাখল।

তপতী টুকুকে বলল, 'তোমাদের গল্প হয়েছে তো?'

অভিজিৎ জবাব দিল, 'বেশ ভালই। আমি আংকল পাতিয়ে নিয়েছি। টুকু এমনকি আমাকে ট্যাপ্ নাচের নমুনাও দেখিয়ে দিয়েছে।'

তপতী চোখ বড় করে হেসে বলল, 'একেবারে ট্যাপ্?'

'হ্যাঁ, রীতিমত টো আর হিলের ওপরে।'

তপতী স্নিগ্ধ স্নেহে টুকুর দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'টুকু, এবার যাও, আমরা কথা বলি। চারুদিদি তোমাদের খাইয়ে দেবে।'

টুকু অভিজিতকে বলল, 'যাচ্ছি।'

অভিজিৎ হেসে ঘাড় নাড়ল। টুকু চলে গেল। তপতী চা ঢালতে লাগল। অভিজিৎ তা দেখতে লাগল, কিন্তু তার ঠোঁটে হাসি, চোখে অন্যমনস্কতা। তপতী যখন চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চা খান।' অভিজিৎ যেন চমকে উঠল, তপতী বলল, 'কী ভাবছিলেন?'

'ভাবছিলাম আপনার বাড়ির কথা, বাচ্চা দুটির কথা।'

তপতী অভিজিতের দিকে তাকাল। অভিজিৎ আবার বলল, 'জীবনে ওরা যা হারিয়েছে তার থেকে বেশি আর কোন শিশু হারাতে পারে না। কিন্তু যা পেয়েছে, তার থেকে বেশি আর কিছু পাওয়া যায় না।'

তপতী বলল, 'আমি ওদেরই অবলম্বন করে আছি।'

অভিজিৎ বলে উঠল, 'আমারও যদি এমন অবলম্বন থাকত!'

কথাটা বলতে বলতেই তার নিশ্বাস পড়ল। তপতী অভিজিতের চোখের দিকে তাকাল। অভিজিৎ বিষণ্ণ হেসে চায়ের কাপে চুমুক দিল। পরমুহূর্তেই অভিজিৎ কিছু বলবার জন্য মুখ তুলেও থমকে গেল। তপতী বলল, 'কী?'

boiRboi.net

অভিজিৎ বলল, 'অবিশ্যি আপনার দিকটাও ভাববার।'

তপতী অভিজিতের চোখের দিকে তাকাল, বুঝতে চাইল কথাটা। অভিজিৎ নিজেই পরিষ্কার করল, 'আপনার নিজের দিকটাও আছে।'

তপতী নিজেই বলল, 'আমার বিয়ের কথা বলছেন তো ?'

'হ্যাঁ, আপনার স্বামী এবং সন্তান—।'

কথাটা শেষ করল না অভিজিৎ। তপতীর মুখ একবারের জন্য একটু লাল হল। বলল, 'এ জীবনে সে জটিলতা আর বাড়াতে চাই না। ওদের আমি ছাড়তে পারব না।'

অভিজিৎ বলল, 'হয়তো, এদের মেনে নিয়েই সেটা সমাধা হতে পারে।'

তপতী ঘাড় নেড়ে বলল, 'কোন পুরুষের পক্ষেই সম্ভব না আমি জানি।'

অভিজিৎ কোন জবাব দিল না। একটু পরে বলল, 'এ বিষয়ে অবিশ্যি কিছুই বলতে পারি না। তা এটা বলতে পারি, অনেক দুর্গতির মধ্যেও, আপনি সবটুকু নিয়ে ভাল আছেন।'

তপতী কিছু বলল না। চায়ের পাট মিটে গেলে বলল, 'জানি না, সত্যি আপনার ভাল লাগছে কী না।'

অভিজিৎ বলল, 'যদি অনুমতি করেন তবে রোজই আসতে পারি।'

তপতী হেসে উঠে বলল, 'ওরে বাবা !'

'ভয় পেলেন ?'

'আপনি পারবেন কেন ?'

'প্রমাণ দেব।'

দুজনেই হেসে উঠল।

*

মাস তিনেক যেতেই তপতী বুঝতে পারল, ওর জীবন-নদী একটা অচেনা বাঁকে মোড় নিচ্ছে। সেটা অভিজিতকে কেন্দ্র করেই। একটা ধংসের পরে, ও ভেবেছিল জীবনটা সোজাই চলবে। সোজাই চলছিল। এমন কি অভিজিতের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার পরেও মোড় ফেরার কথাটা ওর মনে আসে নি। এখন মনে হচ্ছে, কারণ তপতী বুঝতে পারছে ওর নিজের বুকের ভিতরে ফাঁদ। সেই ফাঁদ ওকে ঘিরে ধরছে। সেই ফাঁদ তিলে তিলে তৈরী করেছে অভিজিৎ। অভিজিতের নিঃসঙ্গতা, দাম্পত্য জীবনের দুর্বিপাক, তার সততা, টুকু খুকুকে ভালবাসা, সর্বোপরি, তপতীর প্রতি অভিজিতের গভীর আকর্ষণ। তপতী এ কথা বিশ্বাস করে, ওর মধ্যে অভিজিৎ তার একটা পূর্ণতাকে খুঁজে পেয়েছে।

তপতী অভিজিতকে কোন দিক দিয়েই অবিশ্বাস করতে পারছে না। ছলনা করবার লোক সে না। অভিজিৎ দুঃখকে ভয় পাবার মানুষ নয়। জীবনে তার দাবীটা খুব বেশি না, জটিল না। অভিজিতের ঋজু শরীরের মতই চরিত্রেও একটা ঋজুতা আছে। মনে শক্তি আছে।

সব কিছু মিলিয়ে অভিজিৎ ফাঁদ পেতেছে, তপতী সেই ফাঁদে আস্তে আস্তে ধরা দিয়েছে। এখন অভিজিৎ ওকে তুমি বলে সম্বোধন করে। টুকু খুকু এখন ছুটির

BoiRboi.net

দিন হলেই, আগে তাদের আংকল-এর খোঁজ করে। ছুটির দিন হলেই তপতী আর টুকু খুকুকে নিয়ে অভিজিৎ বেরিয়ে পড়ে।

রাঢ় বঙ্গের যে কোন সীমানায় হোক, সমুদ্রের ধারে, মোহানার কূলে, নদী পাহাড়ের সীমানায়। তাদের সঙ্গে রেকর্ড চেঞ্জার যায়। তারা নিজেরাই খায়, গল্প করে, নাচে। খুকু এখন অভিজিতের সব থেকে আদুরে।

তপতী বলে, 'সব নিয়ে নিচ্ছো ?'

অভিজিতের ঘর বদলেছে, দৃষ্টি বদলেছে। সে একটা নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। বলে, 'সব নেব, সব সব সব। তোমার বলে আর কিছু রাখতে দিতে চাই না। নিজের বলে কোনদিন কিছু চাইনি। এবার যখন চেয়েছি, তখন আর ছাড়ছি না।'

অভিজিতের মুখে গান লেগেই আছে, 'লেট মী ইন, লেট মী ইন মারিনা, ইন য়োর আনড্যামেজড হার্ট।'……

মাঝে মাঝে কাজের শেষে, গঙ্গার ধারে বা ভিক্টোরিয়াতেও যাওয়া হয়। একটু দূরের পাল্লা না হলে টুকু খুকু যায় না। ওদের পড়া আছে, সময়মত খাওয়া আছে। তপতীর একটা মস্ত সান্ত্বনা টুকু খুকু অভিজিতকে মন থেকে নিয়েছে। অভিজিতকে ওরা ভালবাসে।

কিন্তু যে কারণে অভিজিৎ ওকে একদিন কক্‌টেল লাউঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল ; সেখানে আর কোনদিনই যাওয়া হয় নি। সেখানে আর একজন আজ আর হন্যে হয়ে, হিংস্র রাগে, হোটেল, বারে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু সেই সব জায়গাতেই সে আছে। তিন মাসের পর ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও, তপতীকে নিয়ে অভিজিৎ কখনো কোন ক্লাবেও যেতে চায় নি। অভিজিতের জীবনে একটা দিন ছাড়া পান করাটাও আর হয়ে ওঠে নি। তবে, অভিজিতকে এখন দেখলেই মনে হয় সে যেন নেশায় মাতাল। তার সে মাতাল চেহারাটা দেখতে তপতীর ভাল লাগে। তপতীরও যেন চোখে রঙ লেগে যায় অভিজিতের সেই মূর্তির দিকে চেয়ে।

কিন্তু জয়ার কথা মনে হলেই তপতীর মনে ছায়া ঘিরে আসে। অভিজিৎ তার কোন কিছু না পাওয়া শূন্যতাকে নিয়ে দু হাত বাড়িয়ে এল। অথচ তার পিছনে রেখে এল একটা অধিকারহীন অধিকারকে। অভিজিৎ এখন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপস্থিত, জয়াকে সে ডাইভোর্স করবে। অভিজিতের দিক থেকে এটাকে অন্যায় মনে হয় না। কিন্তু তপতীর মনের মধ্যে যেন কেমন খচ্‌ খচ্‌ করে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে ওর নিজেরও যেন একটা দায় থেকে যাচ্ছে।

অভিজিৎ বলেছে, 'দায় তোমার না তপতী, আমার। আর সে দায়টা অন্যায় ভেবে না, ন্যায় ভেবে, আমার বাঁচবার অধিকারের দায়ে।'

'কিন্তু সমাজ ?'

'রাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী কাজ করব।'

'তবুও সমাজ থাকে।'

'যে সমাজের গোটা মুখটা জুড়ে কেবল কেচ্ছা আর পরনিন্দা ? ভয় করি না।'

'আর বিচ্ছেদেই কি জয়া-চ্যাপটার শেষ হবে ?'

boiRboi.net

'কেন নয় ?'

'অভিজিৎ, জয়াও যে একটা মেয়ে।'

'ওর তো কোন অভাব নেই।'

'টাকা পয়সাটাই বড় কথা না, আরো কিছু মেয়েদের থাকে।'

'সে তো তা পায়ে পিষে দলেছে। তবু, যদি তোমার মনের শক্তি থাকে, জয়াকে সারা জীবন দেখব।'

তপতী হেসেছে। বলেছে, 'তা হবে না। যে সর্বনাশের নেশায় জয়া মেতে রয়েছে, তাতেই তার শেষ হবে।'

'তপতী, তার জন্যে কি আমার নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে ?'

তপতী চুপ করে থেকেছে। অভিজিৎ বলেছে, 'তার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আর না, আর আমি তা পারব না। তপতী, দ্বিধা রাখো, আমাকে ভাসিয়ে দিও না।'

অভিজিৎ প্রায় ছেলেমানুষের মত ওর কোলের কাছে মাথা পেতে দিয়েছে। তপতীর মনে হয়েছে, অর্থবান প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী একজন যুবকও টুকুর মতই অসহায় যেন। ওর বুকটা টনটনিয়ে উঠেছে। স্নেহের চোখে তাকিয়ে অভিজিতের মাথার চুলে বিলি কেটে দিয়েছে।

*

তপতীর জীবনের এই পর্বে কয়েক মাস যদি এক মধুর স্বাদে কেটে থাকে, তবে তারপরেও ছিল আর একটা বাঁক, আর একটা মোড়। বিমান ওকে মধুর সঙ্গে বিষের স্বাদ দিয়ে গিয়েছিল। সে বিষ ও নীলকণ্ঠের মতই গলধঃকরণ করেছিল। পারিবারিক জীবনের পতন ওকে বড় রকমের প্রহার করেছিল। বেঁচে থাকবে, সেটাও ভাবে নি। তারপরে এই নতুন বাঁকের মোড়ে।

কিন্তু আরো বাঁক, আরো মোড় ছিল। মধুর পরে বিষ, বিষের পরে মধু আবার মধুর পরে বিষ।

তপতীর তখনো সেটা জানা ছিল না।

ড্যান্নি সমস্ত খবর পেয়ে কেমন যেন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে অভিজিৎ নাচের ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। দীপকও খুশি হতে পারে নি অভিজিৎ-তপতী সংবাদে। শেষ পর্যন্ত চাকরিটা গেল। তপতী যেখানে যায়, সেখানেই ওর আর অভিজিতের কথা। সব থেকে আশ্চর্য, মিসেস তরফদার এ বিষয়ে কোনদিন কিছু বলেন নি। কেবল মিসেস মনিকা চৌধুরী যিনি ওকে নাচের ইস্কুলে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'জয়া একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, কিন্তু তার অভিশাপও তো তোমাকে একদিন লাগবে।',

তপতীর মনের মধ্যে এ খঁচখচানিটা ছিলই। কিন্তু অভিজিতের মুখের দিকে চেয়ে এ বিষয়টার সঙ্গে অষ্টপ্রহর লড়েছে, কাটিয়ে উঠতে চেয়েছে। অথচ আসল কথাটা তপতী কোনদিন জানতে পারে নি। সেটা জানল একেবারে আকস্মিকভাবে।

ডিভোর্সের জন্য জয়াকে অভিজিতের সলিসিটর প্রথম যে নোটিসটা দিয়েছে, তার কপিটা নিয়েই অভিজিৎ রাত্রি সাড়ে আটটায় তপতীর কাছে এল। এই নোটিসের

boiRboi.net

ব্যাপারে তপতীর মনটা ঠিক ভাল ছিল না। ও কপিটা দেখতে চাইল। অভিজিৎ ওকে কপিটা দেখাল।

তপতী সেটা পড়তে পড়তে সহসা যেন সাপের ছোবলে নীল হয়ে গেল। চকিত বিস্ময়ে, যন্ত্রণাকাতর চোখে, অভিজিতের দিকে তাকাল। কাগজটা ওর হাত থেকে পড়ে গেল।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তপতী।'

তপতী নিচু রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি, লিকুইডেটেড কোম্পানী, রয় ডিকাম্বারের সেই অবিনাশ চ্যাটার্জির ছেলে?'

অভিজিৎ চমকে উঠল, ওর দৃষ্টি চকিত সাবধানে ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে সে কথা—'

'ওহ্ নো নো, য়ু অল্ কিলারস্।'

প্রায় চিৎকার করে একথা বলতে বলতে তপতী দু হাতে মুখ ঢেকে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওর সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

অভিজিৎ ওর কাছে গিয়ে ডাকল, 'তপতী, শোন—'

তপতী ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'না না না, চলে যাও অভিজিৎ। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও। তুমি আমার পিতৃহন্তার ছেলে। তুমি আমার মাতৃহন্তার ছেলে। উহ্, কী ভীষণ পাপ।'

অভিজিৎ তবু তপতীর হাত ধরল। তপতী যেন শিউরে উঠে অভিজিতের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদিকে ছিটকে গেল। অভিজিৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। টুকু আর খুকু এসে পড়ল ঘরের মধ্যে! শিশু দুটির চোখে বিস্ময় আর অবুঝ আতঙ্ক। টুকু তাকাল অভিজিতের দিকে। খুকু গিয়ে জড়িয়ে ধরল তপতীকে। ডাকল, 'মানি।'

টুকু আর খুকু কাছে আসতে, তপতী যেন একটু সামলে নিতে পারল; শান্ত হল। তপতী খুকুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যাঁ মানি, তুমি ও ঘরে যাও। খাওয়া হয়েছে তোমাদের?'

খুকু বলল, 'হ্যাঁ।'

তপতী বলল, 'তা হলে তুমি দাদার সঙ্গে গিয়ে শোও, আমি যাচ্ছি।'

তপতীর চোখে তখন জল। মুখে উত্তেজনা, তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। শান্ত হয়ে, চেষ্টা করেও, ছেলেমেয়ে দুটির সামনে মুখের অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে পারছে না। টুকু এসে খুকুর হাত ধরল, মানির মুখের দিকে তাকাল। তারপরে ডাকল, 'আয় খুকু।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুকু গেল। তপতী দরজাটা টেনে দিল। তপতী চোখের জল মুছতে মুছতে অত্যন্ত দ্রুত নিচু তীব্রস্বরে বলল, 'যাও যাও, অভিজিৎ। দয়া করে তুমি যাও, আমার ব্যবহারের জন্য কোনদিন ক্ষমা করতে পার করো, নয় তো দরকার নেই। তুমি যাও।'

অভিজিৎ তবু স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্তেই যেন ওর চোখের সমস্ত আলো নিভে গিয়েছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, মুখটা রক্তশূন্য। ওর ঋজু শরীরটা যেন ভেঙে পড়ার আগে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। তপতীর মুখের দিকে ওর অন্ধকার চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি। যেন অনেক দূর থেকে ডাকল, 'তপতী—'

boiRboi.net

'আমার নাম ধরে ডেকো না অভিজিৎ।'

'কিন্তু আমার কোন কথাই কি তুমি শুনবে না ?'

তপতী যেন স্থির বিদ্যুৎ শিখার মত জ্বলে উঠল, বলল, 'কী কথা, তোমার কী কথা শোনার আছে আমার ? তোমাকে আমি সত্যবাদী বলে জানতাম। তুমি কেন বল নি, সেই হিংস্র নিষ্ঠুর নীচ অবনাশ চাটুয্যের ছেলে তুমি ?'

তপতীর আয়ত চোখের কালো তারা দুটো দুই খণ্ড অঙ্গারের মত যেন অভিজিতের গায়ে লাগছে। অভিজিৎ অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মৃত অবনীশ চাটার্জিকে এভাবে বলতে পার তুমি।'

তপতী তেমনি তীব্রস্বরে বলল, 'সে মৃত কি জীবিত, তাও আমার জানতে ইচ্ছা করে না। কেননা তার ঠাঁই স্বর্গে নরকে কোথাও হতে পারে না। তার চেয়েও খারাপ কোথাও যেতে হবে। আমার একথা বলতে সংকোচ হচ্ছে না, সে পিশাচ, নরাধম, জ্বালিয়াত। সে আমার বাবাকে মেরেছে, মাকে মেরেছে, আমাকে পথের ভিখারী করেছে, তুমি তার ছেলে অভিজিৎ চ্যাটার্জি, আমার—আমার উহ্, এই ঘরে তুমি দাঁড়িয়ে ? কেন ভূমিকম্প হচ্ছে না, কেন আগুন জ্বলছে না এ ঘরে ?'

ফুঁসে ওঠা রাগে, আক্রোশে, দ্রুত নিশ্বাসে, তপতী যেন লেলিহান শিখার মত জ্বলছে। ওর বুক দ্রুত ওঠানামা করছে, নাকের পাটা কেঁপে উঠছে। অভিজিৎ যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। একটা সোজা গাছ যেমন শুকিয়ে কালো হয়ে যায়, ও যেন তেমনি হয়ে যাচ্ছে। অবর্ণনীয় ওর মুখের অবস্থা। কথা বলতে পারছে না, কাঁদতে পারছে না, রাগ করতে পারছে না। একটা দুঃসহ অপমানে আর যাতনায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তপতী তেমনি ফুঁসে ওঠা তীক্ষ্ম নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানতে না, আমি কার মেয়ে ?'

অভিজিতের গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'জানতাম।'

'কবে থেকে, কবে থেকে জানতে ?'

'যেদিন প্রথম তুমি তোমার কথা বলেছিলে। তুমি হয়তো লক্ষ্য কর নি, তোমার বাবার নাম শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম।'

'উঠলেও আমি তা বুঝি নি। আমি তোমার মত এত ছলনা জানি না।'

'তপতী—।'

'চুপ কর, চুপ। জেনেও তুমি বল নি কেন, সরে যাও নি কেন আমার কাছ থেকে ? সব জেনে শুনেও, তুমি আমার সঙ্গে—আমাকে আমাকে—।'

রাগে দুঃখে উত্তেজনায় তপতীর কথা হারিয়ে গেল। অভিজিৎ কিছু বলবার জন্য মুখ তুলতেই তপতী আবার ফুঁসে উঠল, 'আমার বাবা মাকে খেয়ে হয় নি, এবার তুমি এসেছ আমাকে খেতে ? কেন, কেন, তোমাদের কাছে আমাদের বংশের কী ঋণ ছিল ? তোমাদের এত ক্ষুধা কিসের ?'

তপতীর আরক্ত চোখ ফেটে জল পড়ছে, তা বোধ হয় ও নিজেই জানে না। অভিজিতের নিচু স্বর ভাঙা ভাঙা, ভেজা ভেজা। বলল, 'তপতী, আমি বলতে চেয়েছিলাম, পারি নি।'

boiRboi.net

'মিথ্যে কথা, তুমি মিথ্যুক।'

'বিশ্বাস কর তপতী।'

'করব না, কখনো না। তোমাকে বিশ্বাস করলে আমার বাবার অভিশাপ লাগবে না? আমার মায়ের অভিশাপ লাগবে না আমার ওপর? তোমাদের আমি কখনো বিশ্বাস করব?'

'তুমি সব না শুনলে—।'

'শোনার কিছু নেই। থাকতে পারে না। আমার এখন মনে হচ্ছে তুমি জয়ার সঙ্গে অন্য কোন রকম মিথ্যাচার করেছ, তাই আজ তার এই পরিণতি। তোমরা, অভিজিৎ চ্যাটার্জিরা সব পার, সব রকম অন্যায় করতে পার, তোমাদের হাতে রক্তের দাগ আছে।'

অভিজিৎ মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তপতী ঘরের আর একদিকে যেতে যেতে নিজের মনেই ফিসফিস করে বলল, 'অভিশাপ অভিশাপ। মিসেস চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন, জয়ার অভিশাপ লাগবে আমার। উহ্ কী ভীষণ পাপ।'

অভিজিৎ মুখ তুলে আবার ডাকল, 'তপতী।'

তপতী জবাব দিল না। অভিজিৎ বলল, 'আমি তোমাকে অনেকদিন বলেছি, আমি একটা পাপের মধ্যে বাস করছি, আমার চারপাশে পাপ। তোমাকে দেখে, তোমাকে চিনে, সেই কথাটা আমার আরো বেশি করে মনে হয়েছে।'

তপতী ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে বলল, 'তাই পাপের কথা ভেবে আমাকে বুঝি করুণা করতে চেয়েছিলে? প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলে? জয়াকে ডুবিয়ে আমাকে চাটুয্যে বাড়ির ঘরনী করে?'

অভিজিৎ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। ওর অন্ধকার চোখ দুটো শুকনো, কিন্তু লাল দেখাচ্ছে। বলল, 'না, তোমাকে করুণা করবার সাহস আমার নেই তপতী, তোমারই করুণা চেয়েছি বারে বারে। তুমি পৃথ্বীশ রায়ের মেয়ে বলে না, তুমি, তুমিই। তপতী, আমি তোমার কাছে আমার সব কিছু খুঁজে পেয়েছি।'

'মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে, সব মিথ্যে। আমি যে-তপতীই হই, আমি পৃথ্বীশ রায়ের মেয়ে, তোমার কাছে আরো বিশেষ করে আমি পৃথ্বীশ রায়ের মেয়ে। অবনীশ চ্যাটার্জির ছেলের কাছে আমার আর অন্য কোন পরিচয় থাকতে পারে না।'

অভিজিৎ বলল, 'তাই যদি বল, সে কথাও সত্যি আমার মনে হয়েছে। বাবার এই ব্যবসা বিত্ত, যা কিছু আমি ভোগ করছি, তোমার কাছে সব কিছু সঁপে দিয়ে যদি একটুও প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, এ কথাও আমার মনে হয়েছে।'

তপতী মাথা নেড়ে বলল, 'না, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তুমি এবার যাও, আমাকে একলা থাকতে দাও।'

বলতে বলতে তপতী যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুহাতে মুখ ঢাকল আবার। ওর শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। এখন ওর বুকে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, একটা কষ্টে যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

অভিজিৎ চুপ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে নিচু হয়ে সলিসিটরের নোটিসটা মেঝে থেকে তুলে নিল। একবার দেখল, পকেটে রাখল। তপতীর দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো ঘষা কাঁচের মত দেখাচ্ছে। কথা বলতে

boiRboi.net

গিয়ে বলতে পারছে না। কেবল ঢোঁক গিলতে লাগল। তারপর রুদ্ধ স্বরে বলল, 'একেবারে এমন করে বিদায় দিলে ?'

তপতী সে কথার কোন জবাব দিল না। ও তখন ফিসফিস করে, আপন মনে বলছিল, 'উহ্‌ আমার সেই সরল আনন্দময় বাবা মা···।'

অভিজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে ফিরে বলল, 'টুকু খুকুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

তপতী ঘাড় নেড়ে ফিসফিস করে বলল, 'না না না।'

'আমি মিথ্যাচারের জন্য মিথ্যা কথা বলি নি। এটুকু বিশ্বাস করো।' এই কথা বলে অভিজিৎ বেরিয়ে গেল।

তপতী চেয়ারের ওপর বসে, টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল। ওর এই কান্না দেখে বোঝা যায়, বাবা মায়ের সেই দুঃসহ স্মৃতির ব্যথায় শুধু না ; এই কান্নার মধ্যে জীবনের সব হারানোর হাহাকারটাও যেন ফুটে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে তপতী হঠাৎ অনুভব করল, গায়ের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে দেখল ওর একপাশে খুকু আর একপাশে টুকু। দুজনের চোখেই জল, দৃষ্টিতে অসহায় ভয়। তপতী তাড়াতাড়ি দুজনকে দুহাতে বুকে টেনে নিল। রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'তোরা ভয় পাস নে, ভয় পাস নে, তোদের মানি আছে। আমার একটা কষ্ট হয়েছিল, তাই কেঁদেছি। কিন্তু তোরা যে আমার সব, আমার সম্বল।'

মানির বুকে শিশু দুটি মুখ গুঁজে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে মানির সঙ্গে কাঁদতে লাগল।

*

এক মাস পার হয়ে গিয়েছে।

ড্যানির স্কুলে আর তপতী যায় না। চাকরিটা আগে থেকেই গিয়েছে। অবিশ্যি থাকলেও আর বোধ হয় নাচের ইস্কুলে পার্টনারের চাকরি ও করতে পারত না। আগে যেমন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে কাজে যেত তেমনি যায়। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে টুকু খুকুকে নিয়ে থাকে। ছুটির দিনে ওদের নিয়ে এদিকে সেদিকে, কাছাকাছি একটু বেড়াতে যায়। তপতী প্রথম দিকে কয়েকদিন যেমন ভেঙে পড়েছিল, এখন সেই তুলনায় অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। টুকু খুকুর সঙ্গে একটু ছুটোছুটি, হাসাহাসি, নাচানাচিও করে। মজার মজার গল্প বলে যাতে ওরা খুব আনন্দ পায়, হাসে। মানির সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বেশ তাজা আর উৎফুল্ল হয়ে উঠতে থাকে। কয়েকটা দিন ওরাও কেমন যেন মুষড়ে ছিল। মাঝে মাঝে ওরা জিজ্ঞেস করে, 'মানি, আংকল্‌ আর আসে না কেন ?'

তপতী নানারকম ওজর দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছে, 'আংকল্‌ অনেকদিনের জন্য বিদেশে চলে গেছেন, এখন আসতে পারবেন না।'

ওদের মন খারাপ হয়ে যায়। কথাটা বলতে গিয়ে তপতীরও বুকের ভিতরটা নিশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ে দুটো কাছে না থাকলেই অভিজিতের মূর্তি এসে সামনে দাঁড়ায়। অভিজিতের শেষ দিনের শেষ কথাগুলো মনে পড়ে। কয়েক-দিনে উত্তেজনাটা কেটে যাবার পরে, বারে বারেই অভিজিতের সেই মাথা নিচু চেহারাটা

boiRboi.net

মনে পড়ে। অপমানিত লাঞ্ছিত অভিজিৎ। শেষের কথাগুলো ভাবলে কেমন যেন কষ্ট লাগে। অভিজিতের আর কী বলার ছিল। করবারই বা কী ছিল। ওর বাবা যা করেছেন, তার জন্য ওকে ওভাবে দায়ী করে কী হবে। ওর চারপাশের পাপের কথাটাও মিথ্যে বলে নি। সেটা ওর প্রকৃত অনুভূতি। কিন্তু যে পথে ও প্রায়শ্চিত্ত চেয়েছিল, সেটা সম্ভব না।

সম্ভব না হওয়ার কারণ, তপতীর নিজের মন। পরিণত বয়সে অনেক দুঃখের মধ্যে ও অভিজিতকে পেয়েছিল। ও জানে, অভিজিতের কাছে ও কী। অভিজিতের চোখে নেমে আসা অন্ধকার, তপতী ভোলে নি। তপতীর নিজের চোখেও কি অন্ধকার নেমে আসে নি। অভিজিৎ কি ওর চোখেরও আলো নয়। কিন্তু নিজের চোখ থেকে সেই আলো নিজের হাতে না উপড়ে তোলা ছাড়া তপতীর উপায় নেই। সে কেবল চোখের আলো ওপড়ানো না, তার সঙ্গে বুক থেকেও কিছু উপড়ে তুলে ফেলা।

সব জেনে, সব বুঝেও তপতীর এই সিদ্ধান্ত, অভিজিতের সঙ্গে জীবনযাপনের সুখ ওর সইবে না। অভিজিতের সুখ ওর নিজের সুখ, এই দুইয়ের মধ্যে কেন যেন একটা গ্লানির ছায়া সরতে চায় না। সংসারে সব পাওয়া যায় না, সম্ভবও না। কিন্তু অভিজিতের সেই চেহারাটা মনে হলে বুকের মধ্যে বড় মোচড়ায়।

*

রবিবার ছুটির দিন। ফাল্গুন মাস। কলকাতাতে বসন্ত এসেছে। তার সঙ্গে উত্তাপও ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছে। আস্তে করে পাখা না চালালে ঘরের মধ্যে থাকা যায় না যেন।

তপতী নিজে আজ বাজারে যায় নি। সকালবেলা টুকু খুকুকে খাইয়ে নিজে একটু খেয়ে ও বাইরের ঘরে বসেছিল। চারু বাজার থেকে কী জীবন্ত মাছ এনেছে, টুকু খুকু তাই নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। তাদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। ঠিকে ঝি'টা কাজ করছে এখনো।

এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কে আসতে পারে। লতিকাদি নাকি? মাসের প্রথম রবিবার, গোয়ালাটাও হতে পারে। ঠিকা ঝি দরজা খুলে দিতে গেল। একটু পরে বাইরের ঘরের পর্দাটা সরে গেল। তপতী তাকিয়ে দেখল, অভিজিৎ। ও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল। বলে উঠল, 'অভিজিৎ, এসো!'

অভিজিৎ যেন একটু অবাক হল। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। তপতী চমকে উঠল অভিজিতের দিকে তাকিয়ে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা অভিজিৎ, পায়ে স্লিপার। কিন্তু ভীষণ কৃশ হয়ে গিয়েছে। চোখের কোল বসা, কালো। মুখখানি ছোট দেখাচ্ছে। সকালের উজ্জ্বল আলোয় কপাল আর কানের রগের পাশে, কয়েকটা সাদা চুল দেখা যাচ্ছে।

তপতী নিচু স্বরে বলল, 'বস অভিজিৎ। এতদিনে মনে পড়ল?'

অভিজিতের মুখে বিস্ময় দেখা দিল, তারপরে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'পালটা মার দিচ্ছ?'

তপতী বলল, 'বিশ্বাস কর, কয়েকদিনই ভেবেছি, তোমাকে টেলিফোন করি।

boiRboi.net

পারি নি। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এই একটা দায়। কিন্তু চেহারাটা এমন করেছ কী করে।'

অভিজিৎ বসতে বসতে বলল, 'ও কিছু না।'

এমন সময় টুকু আর খুকু এসে পড়ল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুজনেই অভিজিতের দিকে তাকিয়ে রইল। অভিজিৎ ওদের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে দিল। দুজনেই ছুটে এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনকেই বুকে নিয়ে সে চোখ বুজল।

তপতীর বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কষ্টে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ও মাথা নিচু করে রইল। টুকুর গলা শোনা গেল, 'এতদিন আস নি কেন?'

অভিজিৎ বলল, 'কাজ ছিল।'

খুকু জিজ্ঞেস করল, 'এত কাজ কেন?'

অভিজিৎ বলল, 'কাজ যে কথা শোনে না।'

তপতী ঘর থেকে উঠে চলে গেল। যাবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'চা না কফি খাবে?'

অভিজিৎ বলল, 'চা।'

তপতী শোবার ঘরে গিয়ে একটা কোণে মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়াল। চোখ দুটো ও কিছুতেই শুকনো রাখতে পারছে না। বুকের শির ছিঁড়ে যেন চোখের কোলে ভেসে আসছে।

খানিকক্ষণ পর নিজেকে সামলে, নিজের হাতে চা তৈরি করল। চা নিয়ে এসে দেখল অভিজিৎ তাদের বিলাতের গল্প বলছে। তপতী বলল, 'টুকু খুকু, তোমরা এবার যাও, আমরা একটু কথা বলি, কেমন?'

দুজনেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। তপতী চা রাখল। দুজন দুজনের দিকে তাকাল। অভিজিৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

'ভাল। তুমি?'

'ভালই। অনেকদিনই আসব আসব করছি, ভরসা পাই নি।'

তপতী কোন কথা বলল না। অভিজিৎ চায়ে চুমুক দিল। তপতী জিজ্ঞেস করল, 'জয়া কেমন আছে, কোথায় আছে?'

অভিজিৎ বলল, 'যেমন ছিল, যেখানে ছিল।'

'কোন পরিবর্তন নেই?'

'বরং আরো বাড়াবাড়ি করছে।'

'তুমি কিছু করতে পারছ না?'

'আর ক্ষমতায় কুলোয় না। তা ছাড়া, সবই কি মানুষ করতে পারে নাকি?'

তপতী কিছু বলল না। অভিজিতও চুপ করে রইল। দুজনেরই মাথা নিচু। বেশ খানিকক্ষণ পরে তপতী বলল, 'অভিজিৎ, আমাকে ক্ষমা করো।'

অভিজিৎ চমকে মুখ তুলে বলল, 'ক্ষমার কথা কেন? ক্ষমা তুমিই আমাকে করবে।'

'না, অভিজিৎ সেদিন তোমাকে ওরকম ভাবে বলে বড় কষ্ট পেয়েছি, বড় লজ্জা পেয়েছি আমি। জানি তুমি আমার কাছে কোন মিথ্যাচার করো নি।'

boiRboi.net

অভিজিৎ তপতীর চোখের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখে বিস্ময় নেই, কিন্তু একটা গভীর ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

তপতী চোখ নামিয়ে নিল।

অভিজিৎ বলল, 'কিন্তু সে কথার জন্য তো তোমাকে আমি দোষ দিই নি।'

তপতী নিচুস্বরে বলল, 'তা ছাড়াও তোমার কাছে ক্ষমা চাই।' বলে মুখটা নামিয়ে নিল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, তপতী যেন ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা কিছু চাপা দিতে চাইল।

এই দ্বিতীয়বারের ক্ষমা চাওয়ার কথাটা শুনে, অভিজিৎ চমকে উঠল। একটা তীব্র ব্যথা আর হতাশা ওর চোখে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, তপতী না এই ক্ষমাটা তুমি চেয়ো না।'

তপতীর চোখে জল এসে পড়ল, বলল, 'চাইব অভিজিৎ, চাইব, তাছাড়া আমার উপায় নেই।'

অভিজিৎ চেয়ার থেকে উঠে এসে, তপতীর সামনে জানু পেতে বসল। তপতী বলে উঠল, 'নিচে নয়, উঠে বস।'

অভিজিৎ বলল, 'এখানে বসতে দাও। কিন্তু কেন তপতী?'

তপতী বলল, 'পারব না অভিজিৎ, এ জন্মে আর হল না, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'জন্মান্তর? তুমি কি বিশ্বাস কর?'

'জীবনে দুঃখ যাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের কোন অহংকার নেই, তাই বিশ্বাস করি। অভিজিৎ, তা ছাড়া, মনকে কী বলে সান্ত্বনা দেব? সব যে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে বুকের ভেতর থেকে, কী করে তোমাকে বোঝাব।'

অভিজিৎ চোখ বুজল। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করল নিজেকে। তপতী আবার বলল, 'নিজের জিনিস বুকে নিয়ে, চিরদিন যদি তা খচ্‌খচ্‌ করে তা হলে বাঁচব কেমন করে? কিন্তু তুমি—মেয়ে হয়ে মিথ্যে কেমন করে বলি, তুমি আমার কী।'

বলতে বলতেই নিচু হয়ে মাটিতে নেমে অভিজিতের পা দুটো আঁকড়ে ধরল। নিজের মুখ চেপে ধরল, বুক চেপে ধরল অভিজিতের পায়ে।

অভিজিৎ অস্ফুটে একবার আর্তনাদ করে উঠল, 'আহ্‌?'

তপতীকে ওঠাতে চাইল। তপতী উঠল না। অভিজিৎ ওর পিঠে আর মাথায় হাত রাখল, কিন্তু চোখ খুলতে পারল না।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল দুজনের কারোরই খেয়াল রইল না। অনেকক্ষণ পরে তপতীকে টেনে তুলল অভিজিৎ। অভিজিৎ এখন শান্ত। তপতী চোখ মুছল। অভিজিতের দিকে তাকাতে গিয়ে যেন একটু লজ্জা পেল, হাসল। অভিজিৎ ওর মাথায় গালে হাত দিল। তার বিষণ্ণ চোখে একটা বিস্ময় আর আবেগের ঝিকিমিকি। খুব আস্তে আস্তে বলল, 'বুঝেছি, দুহাত ভরে কী নিলে?'

তপতী বলল, 'অমৃত।'

অভিজিৎ বলল, 'তাই যেন হয়। আমিও তাই নিয়ে গেলাম।'

তারপরে বলল, 'আজ্ব তাহালে উঠি।'

boiRboi.net

'ব্যস্ত কেন?'

'এখনই ঠিক করলাম, কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে যাব।'

তপতীর চোখে একটু অন্ধকার নামল। আবার একটু হেসে বলল, 'যখন ইচ্ছে হবে, একটু সংবাদ দিও, দেখা দিও।'

অভিজিৎ বলল, 'ওদের একটু ডাকো।'

তপতী ডাকল, 'টুকু খুকু।'

ওরা যেন তৈরিই ছিল। ছুটে এল। অভিজিৎ হাত বাড়িয়ে দিতে দুজনেই ঝাঁপিয়ে এল। অভিজিৎ ক্ষুধিতের মত আদরে আদরে, ওদের মুখে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। বলল, 'শোন, আজ আমি যাচ্ছি, অনেক দূরে যাব। আসতে অনেক-দিন দেরী হবে। তোমার মানির কাছে আমার খবর পাবে। আমি তোমাদের চিঠি দেব।'

কিন্তু শিশু দুটি কী বুঝেছে, কে জানে। ওরা অভিজিতের কথা ঠিক শুনছিল না। ওদের চোখে জল।

তপতী বুঝতে পারছিল, অভিজিৎ শেষ বিদায় নিচ্ছে, সে আর কোনদিনই ফিরবে না।

অভিজিৎ ওদের ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পরিষ্কার গলায় বলল, 'মনে রেখো, তোমাদের জন্যে সব সময়েই আছি। বিশেষ করে আমার এই ছেলে মেয়ে দুটির জন্য।'

বলে সে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তপতী দুহাত বাড়িয়ে টুকু খুকুকে বুকের কাছে টেনে নিল। অভিজিতের শরীরের গন্ধ, উত্তাপ তখনো শিশু দুটির শরীরে লেগে রয়েছে। তপতী তারই মধ্যে ডুবে যেতে লাগল।

boiRboi.net

অগ্নিবিন্দু

boiRboi.net

boiRboi.net

শুভেন্দুনারায়ণ তাঁর ক্যাসল্ সদৃশ প্রাসাদের ঘরে ঘরে, অলিন্দে অলিন্দে, অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

মাঝখানের বড় হলঘরে একটি ছোট দেয়ালবাতি জ্বলছিল, যে ঘরে একদা ঝাড়লণ্ঠনের আলোয়, আলোময় হয়ে থাকতো। এখন অন্ধকার। সমস্ত প্রাসাদটাই যেন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, কোথাও কোন শব্দ পর্যন্ত নেই।

একেবারে অন্ধকার ঠিক বলা যাবে না। দোতলার প্রকাণ্ড হলঘরে যেমন একটি মাত্র ছোট দেয়ালবাতি জ্বলছে, তেমনি তার চেয়েও ছোট, ক্ষীণ আলোর একটা বাতি সামনের প্রশস্ত বারান্দায়। যেখানে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে, সেখানে দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। যদি কোন কারণে, তিনি নিচে যেতে চান, সেজন্যেই সামান্য আলোটুকুর ব্যবস্থা। তারপরে নিচের থামওয়ালা বারান্দার যেদিকে, চত্বর পেরিয়ে বাইরে যাবার সদর দরজা রয়েছে, সেদিকে, সদর দরজার পাশে একটি ক্ষীণ আলো কেবল এইটুকু নির্দেশ করার জন্যেই রয়েছে, ওখানে সদর দরজা।

এ প্রাসাদ, সেকালের কোন জমিদার বাড়ির মত নয়, যেখানে মহলের পর মহল থাকে, অন্তঃপুরের পর অন্তঃপুর থাকে। প্রাসাদ অনেকটাই ক্যাস্লের মত, বিদেশী ধনীর প্রাসাদের মত, এবং এ প্রাসাদ যিনি তৈরী করিয়েছিলেন এককালে, তিনি বিদেশীই ছিলেন। ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী দিনেমার। শোনা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষে এসেছিলেন হীরার ব্যবসা করতে, এবং ব্যবসা যে তাঁর কোন এক সময়ে বেশ ভালই জমে উঠেছিল, বোঝা যায়, বাঙলা দেশ ও সাঁওতাল পরগনার সীমানায় এই বিরাট প্রাসাদ, আর তার সঙ্গে বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে তাঁর জমিদারি দেখে। কিন্তু কেন এমন জায়গায় এসে সেই হীরা ব্যবসায়ী দিনেমার আস্তানা নিয়েছিলেন, সে কথা কেউ বলতে পারে না। সাধারণভাবে এটাই মনে হয়, তাঁর উচিত ছিল রাজধানী কলকাতা বা দিল্লী বা অন্য কোন বড় শহরের কাছাকাছি থাকা। অথচ এই নিরালায় এসে তিনি ছিলেন, এবং এই প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন।

শোনা যায়, সেই দিনেমার শেষবার যখন এখানে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন, যে-স্ত্রীকে তিনি নাকি গোয়া থেকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলেন। তখন নাকি তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, অন্তত বিয়ের বয়স হিসাবে বেশীই হয়েছিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন একটি ফর্সা গোয়ানীজ যুবতী। স্ত্রীকে নিয়ে যখন এসেছিলেন, তখন প্রায় একটানা ছ'মাস ছিলেন।

তারপরে একদিন সবাই জানতে পারল, তাঁর স্ত্রী বাপেরবাড়ির দেশে চলে গিয়েছেন। কবে গিয়েছেন, কী ভাবে গেলেন কার সঙ্গে, তা কিছুই জানা যায় নি। দিনেমার নিজেই তা ঘোষণা করেছিলেন, বাকী সকলে তা শুনেছিল। যদিও, এখানে শোনবার বা বলবার লোক আর কোথায়ই বা ছিল। প্রায় একশো বছর আগে, কিংবা তারো বেশী হতে পারে, এ জায়গা আরো জনমানবহীন ছিল। এখন অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বছর পঞ্চাশের মধ্যে কয়েকটি গ্রামের পত্তন হয়েছে আশেপাশে। রেল

boiRboi.net

স্টেশনের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। সেখানে আধা শহরের পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ছেলে এবং মেয়েদের স্কুল তো আছেই, এমন কি একটি কলেজও আছে। সকালের কলেজ মেয়েদের, ছেলেদের দুপুরে। স্টেশন অঞ্চল বীরভূমের মধ্যে। এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই বীরভূমের সীমা, আর এই প্রাসাদ সাঁওতাল পরগনার মধ্যে।

বোঝা যায়, দিনেমার আমলে, চারদিকে উঁচুনিচু রক্তিম তেপান্তর ধূ-ধূ করতো। চারদিকেই শাল মহুয়া এবং তাল গাছের ছড়াছড়ি। দূরে দূরে ছিল সাঁওতালদের বস্তি, যেখান থেকে তাদের বাঁশি মাদলের শব্দ ভেসে আসতো, কোন উৎসবের সময় হয়তো মেয়ে পুরুষদের হাঁড়িয়ার পানীয় পানের শব্দ ভেসে আসতো। দিনেমারের জমি তারাই চাষ-আবাদ করতো, সঙ্গে হয়তো কিছু বীরভূম থেকে ভূমিহীন চাষীও এসেছিল, যাদের নিয়ে, কাছেই গ্রাম গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, দিনেমারের কাছারির কাজকর্ম, আদায় উশুল, ইত্যাদির জন্যে যে সব কর্মচারী ছিল, তাদেরও কয়েকটি ভদ্রাসন, কুঠির পিছনে তৈরী হয়েছিল, যে ভদ্রাসন কয়েকটি ঘিরে, এখনও ছোটখাটো মধ্যবিত্ত পাড়া গড়ে উঠেছে।

সেই সব মানুষ, দিনেমারকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি, তাঁর গোয়ানীজ স্ত্রীটি কোথায় কার সঙ্গে গেলেন। তিনি যা বলেছিলেন, সবাই তাই মেনে নিয়েছিল, যদিও সকলের মনের মধ্যেই একটা খচখচানি ছিল, মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। কারণ, তখন পথ ছিল দুর্গম, বিপদসঙ্কুল। পায়ে হাঁটা এবং যানের মধ্যে গরুর গাড়ি। অবস্থাপন্নদের ঘোড়া। দিনেমারের কয়েকটি ঘোড়া, এবং সেই সময়ের ডাকবাহী গাড়ির মত একটি গাড়ি ছিল তাঁর, যে গাড়িতে করে তিনি দুমকা দিয়ে, বিহার ও উত্তর প্রদেশ বা আরো দূরান্তে যাতায়াত করতেন। একবার বেরুলে, বছর ঘুরে যেত ফিরে আসতে। এমন জায়গা থেকে, তাঁর স্ত্রী রাতারাতি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, কী করে গিয়েছিলেন, এমন কি একটি লোকের চোখেও পড়ে নি, তাতেই সকলের মন খচখচ করেছিল।

দিনেমারেরও সেই শেষবার। কয়েকদিন পরেই তিনি এখান থেকে অগস্ত্য-যাত্রাই করেছিলেন, আর কখনো ফিরে আসেন নি। চাকরবাকরদের ঘর, চাকরবাকরদের অধিকারেই রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা কুঠি, এবং তার পাঁচিলঘেরা সীমানার গেট তালাবন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবিশ্যি, বাইরে যেতে হলে, বরাবরই তাই যেতেন। তিনি ফিরে এলে আবার কুঠি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হত।

এবার গিয়ে তিনি আর ফেরেন নি, শুধু তাই নয়। বছর খানেকের মধ্যেই খবর এসেছিল, কলকাতার কোন এক ধনী পরিবারকে তিনি এখানকার সমস্ত কিছুই বিক্রী করে দিয়ে, স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। কলকাতার যে ধনী এটা কিনেছিলেন, তাঁর নাম নবেন্দুনারায়ণ, শুভেন্দুনারায়ণের পিতামহ।

* * *

শুভেন্দুনারায়ণ প্রায় অন্ধকারেই, অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড় হলঘরের পাশে পাশে যে সব ঘর রয়েছে, প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গেই আর একটি ঘরে যাবার দরজা রয়েছে, এবং প্রত্যেক ঘরের সঙ্গেই একটি করে রেলিংঘেরা ব্যালকনি, মাথাঢাকা অলিন্দ যেগুলোকে বলা যায়। তিনি প্রত্যেকটি ঘরেই যাচ্ছেন, প্রত্যেকটি ব্যালকনিতেই গিয়ে

boirboi.net

এক মুহূর্ত দাঁড়াচ্ছেন, আর দূরের অন্ধকারের দিকে দেখছেন। যদিও সেই দেখার মধ্যে বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই। দাঁড়াচ্ছেন, দেখছেন, আবার ফিরে আসছেন, এবং ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছেন। হলঘরের সামান্য আলোই এই গভীর অন্ধকারে, নিজেকে সবখানে ছড়িয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করছে। যেখানে পারছে, সেখানেই একটি রেখায় বিঁধে রয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরেই সামান্য একটু আলো। কাঁচের চিমনিতে ঘেরা, ছোট দেয়াল-বাতি, ঘরের অস্তিত্বকে জানাবার জন্যেই যেন কোনরকমে টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে। ঘর থেকে ঘরে যাবার সময়ে, সেই আলো শুভেন্দুনারায়ণের গায়ে পড়ছে, তাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে, তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পায়ে রবার সোলের ভারী জুতো। চলার কোন শব্দ নেই, কেবল তাঁর ভারী পদক্ষেপের কম্পন অনুভব করা যায়।

শুভেন্দুনারায়ণ বাঁ হাত দিয়ে, ডান হাতের মণিবন্ধের কবজিটা জোর করে চেপে ধরে, একটু নুয়ে নুয়ে চলছেন। অনেকটা যেন, একটি আহত পশু, আর্ত অসহায় অবস্থায় কোন একটা নিবিড় কোণ খুঁজছে, যেখানে সে আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবে, নির্ভয় শান্তিতে আশ্রয় নেবে, ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করবে। অথচ, কোথাও সে রকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। শুভেন্দুনারায়ণ যেন অনেকটা সেরকম ভাবেই অস্থির পায়ে ঘুরছেন। যদিও তাঁর চোখ মুখ কোন কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবু তাঁর দীর্ঘ শরীরে পায়জামা পাঞ্জাবি টের পাওয়া যায়। অস্পষ্ট অবয়বের মধ্যে, তাঁর চুল রুক্ষ, তা বোঝা যায়। এবং ঈষৎ মদের গন্ধও বাতাসে টের পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি এখন কুঠির যে অংশে রয়েছেন, সেটা দক্ষিণ দিক। এদিকটায়, নিচে চত্বরের পর পাঁচিলের গায়ে গেট, সদর দরজা। তার বাইরে, বাঁ দিকে অনেকগুলো একতলা ঘর, কর্মচারী চাকরবাকরদের থাকবার। বোঝা যায়, দিনেমার এমনভাবে এই ক্যাস্‌ল কুঠি তৈরী করিয়েছিলেন, যার সঙ্গে, কর্মচারী চাকরবাকরদের ভিতর দিয়ে চলা ফেরার কোন অবারিত দ্বার ছিল না। পাঁচিলের পাশে যে একতলা ঘরগুলো রয়েছে, তার কোন দরজাই কুঠির ভিতর দিকে নয়, বাইরের দিকে। যে কারণে, কাউকে আসতে হলে সদর গেট দিয়েই আসতে হত।

গেটের বাইরে, অনেকখানি সমতল সবুজ মাঠ, তারপরে যে কালো ঝুপসি ঝাড়ের মত কয়েক বিঘা অংশ দেখা যাচ্ছে, ওটা আমবাগান। বাইরে খোলা তেপান্তরের বুকে, অন্ধকার হাল্‌কা দেখাচ্ছে। তার বুকে আমবাগানটা আর এক প্রস্থ জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও তার একটু ফাঁক নেই। সেখানে জোনাকিদের ভিড় দেখা যায়, জ্বলছে নিবছে, নিবছে জ্বলছে। প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের ভাষায়, ওটা নারীপুরুষ জোনাকিদের প্রেমের খেলা। পরস্পরকে ডাক দেবার সংকেত।

কুঠির পূর্ব দিকে, পাঁচিল ঘেঁষে দুটি বড় বড় দেবদারু, মাঝখানে বড় গেট। সেই গেটের কাছে কোন আলো নেই। কারণ সে দরজায় অনেক কাল শিকল জড়ানো তালা লাগানো আছে। এখন জঙ্‌ ধরে গিয়েছে। দেবদারু দুটি যেন দুই ঋজু প্রহরী। তাও দুটি, এই কুঠির, আকাশবিদ্ধ চূড়া পর্যন্ত উঠতে পারেনি। গীর্জার সূচীবিদ্ধ চূড়ার মতই কুঠির মাথা উঠে গিয়েছে। জমিটাও অনেকখানি উঁচু। কয়েক মাইলের মধ্যে তাই, এই কুঠির চূড়ার থেকে উঁচু কিছুই নেই। পূর্বদিকে, কুঠির বাইরে, জমি

ক্রমে নিম্নমুখী, নিচের দিকে নামতে নামতে, দূর সবুজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। যদিও এই অন্ধকারে এখন সবুজের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর দিকের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে কুঠি সংলগ্ন বাগান। বাগানে বড় বড় উক্যালিপটাস আর ঝাউ গাছ রয়েছে। যাদের বড় বড় ছায়ার মধ্যে, রডোডেনড্রন থেকে শুরু করে ম্যাগনোলিয়া, সব রকমই গাছ রয়েছে, এবং এই রাত্রির যা কিছু শব্দ, সব ওদিকেই। ওখানেই ঘুম ভেঙে যাওয়া ভয়ার্ত পাখীর পাখা ঝাপটার শব্দ, অথবা ছানাদের ভীরু কচি গলায় মাকে ডাকার আচমকা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। সাপ কিংবা অতিকায় গিরগিটি হয়তো আক্রমণ করছে, বা পাখীর বাচ্চাখেকো, রাতচড়া বড় পাখী হানা দিচ্ছে।

পশ্চিম দিকটাকে কুঠির পিছন দিক বলা যায়, যেদিকে কুঠির একফালি জমির পরেই সীমানার পাঁচিল উঠেছে। পাঁচিলের পিছনে, কিছুটা বিরতি দিয়ে, কয়েক ঘরের একটি পাড়া। যারা এই কুঠিরই কর্তার কর্মচারী হিসাবে বাসস্থানের জমি পেয়েছিল।

* * *

দূর তেপান্তর থেকে প্রথমে একটি শেয়াল ডেকে উঠল, তারপরে অনেকগুলো এক সঙ্গে। পশ্চিম দিক থেকে কয়েকটা কুকুর ডাকতে ডাকতে, কুঠির পাঁচিলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে, বোঝা যায়। রাত্রের মধ্য প্রহরের ঘোষণা হয়ে গেল। শেয়ালের ডাক থেমে যাবার পরেও, কুকুরের বিক্ষুব্ধ চীৎকার সহজে থামে না। এমন কি দূরে দূরান্তেও, সাঁওতালদের বস্তি এবং পাশের গ্রামের কুকুরগুলি অনেকক্ষণ ধরে ডাকতে থাকে। তারপরে একসময়ে তারা থেমে যায়। স্তব্ধতা আবার নিবিড় হয়ে আসে।

শুভেন্দুনারায়ণ দক্ষিণের ঘরগুলো পেরিয়ে, পুবের বারান্দায় এসে পড়লেন। একবার সিঁড়ির মুখে, থামের গায়ে ক্ষীণ আলোর দিকে তাকান। তারপরেই এমনভাবে হলঘরের দিকে ফিরে দেখেন, যেন হঠাৎ কাউকে সেখানে দেখতে পেয়েছেন বা কেউ তাঁকে ডেকেছে। তিনি বারান্দা থেকে হলঘরেই যান। গোটা হলঘরটার মেঝেই কাঠের পাটাতনে তৈরী, তার ওপরে গালিচা পাতা আছে। হলঘরে পা দিতেই, তাঁর পায়ের শব্দ অনেকটা ধুপ্ ধুপ্ শব্দে বাজতে লাগলো। কয়েক পা চলে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। যেন, যাকে দেখতে পেয়েছিলেন, তাকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, বা, যার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন, এখন আর ঠিক করতে পারছেন না, কোন্ দিক থেকে ডাকটা ভেসে এসেছিল।

সেই অবস্থায় তিনি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের মণিবন্ধের কবজিটা তেমনি চেপে ধরা, এবং তেমনি ঝুঁকে পড়া অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন তিনি আহত হয়েছেন, একটু আরাম খুঁজছেন, সেই রকম একটা ব্যথা বা যন্ত্রণার ছাপ তাঁর মুখে। অথচ, লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তাঁর সারা মুখে, চোখে, কোথাও একটা সম্মোহিতের নিশি-পাওয়া ভাবও রয়েছে। আহত এবং পলাতক মানুষকে এই রকমই মনে হয়। বিশেষ করে, ক্ষতের যন্ত্রণাটা যদি তীব্র হয়, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে হয়, অথচ পালাবার জন্যেও অস্থিরতা থাকে, তবে তাকে বোধ হয় এরকমই দেখায়।

শুভেন্দুনারায়ণ এবার ওপরের দিকে তাকান। সেখানে কারুকাজ করা, সাদা

boiRboi.net

রঙ মাখা বড় বড় কড়িকাঠ। সেখানে যে তিনি কী দেখেন, নিজেও জানেন না, কারণ তাঁর মাথায় আত্মহত্যার চিন্তা ঠিক নেই যে, তিনি কড়িবরগার উচ্চতা দৃষ্টি দিয়ে মেপে দেখবেন। মাথা নামিয়ে, তিনি এবার উত্তরের ঘরগুলোর দিকে তাকান, তারপরে সেদিকে এগিয়ে যান।

উত্তরের ঘরেও হলঘরের আলোর ছিটেফোঁটা টের পাওয়া যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই, বাগান, যেখানে অন্ধকার যেন, বিচিত্র সব মূর্তি নিয়ে এক রহস্য-জগৎ ছড়িয়ে বসে আছে। বাতাস তেমন বেশী নেই, শুধু পাতায় পাতায় একটা শব্দ উঠছে, আর ঝাউগাছ থেকে অনেকটা নিশ্বাসের মত শব্দ আসছে। অন্যান্য গাছের তুলনায়, ঝাউগাছগুলোই বেশী দুলছে, এবং তাদের পাতলা অবয়বের ভিতর দিয়ে, তারা ভরা আকাশকে দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য গাছগুলো অনেক নিরেট জমাট, অন্ধকারকে আরো ভারী করে তুলেছে। ফুলের গন্ধ টের পাওয়া যায়, যদিও তা বিশেষ কোন ফুলের নয়। একটা পাঁচমিশালী গন্ধ, সম্ভবতঃ যার মধ্যে এই আরণ্যক প্রকৃতির গন্ধ মিশে রয়েছে।

শুভেন্দুনারায়ণ সে সব কিছুই দেখছেন না। তিনি একইভাবে ঘর থেকে ঘরে, ব্যালকনিতে ঘুরে চলেছেন। এবার পুবের বারান্দার দিকে নয়, এখন পশ্চিমের, কুঠির অন্তঃপুর বলতে যে অংশকে বোঝায়, সেদিকে চলেছেন। চলতে চলতে, এই সারিবন্ধ ঘরের শেষে, একটি পর্দার সামনে এলেন। এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন, তারপরেই পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন।

একটি ঘর, একটি ছোট আলো জ্বলছে, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ঘরে তেমন কোন আসবাবপত্র নেই। বাঁ দিকে আর একটি দরজা দেখা গেল। এবার তিনি না দাঁড়িয়ে বাঁ দিকের ঘরে ঢুকলেন। সেখানেও একটি আলো রয়েছে। ঘরটি বড়, অনেকটা বসবার ঘরের মত। কিন্তু সে বসাটা নিশ্চয় দশজনের সঙ্গে কাজকর্মে বসবার মত নয়। অনেকটা অবসর বিনোদনের মতই তার চেহারা। অনেক শোফা, ডিভান, নিচু নিচু টেবল, যাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এসব পুরনো দিনের নয়। যদিও, কিছু কিছু সেইরকম আসবাবপত্রও রয়েছে। যেমন এক পাশে, মেঝের ওপর উঁচু গদী, তাকিয়া ইত্যাদি রয়েছে, কিংবা গদী-আঁটা, বড় বড় চেয়ার, যাদের কারুকাজগুলো প্রমাণ করে, ওগুলো সম্ভবতঃ গত শতকের। দুটি বড় বড় আয়নাও রয়েছে, অনেকটা ড্রেসিং টেবলের মতই, তবে টেবল আর আয়না দুটি আলাদা। টেবলগুলোও শূন্য, সেখানে কোন প্রসাধনের বস্তুই নেই। কেবল মাত্র, একটি টেবলের ওপর ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট স্কচ হুইস্কির বোতল। কিছুটা খেয়ে নেওয়া, জল মেশানো হুইস্কির গ্লাস, আর একটি কাঁচের জল ভরা সাদা জার।

শুভেন্দুনারায়ণ সেই টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, আর আস্তে আস্তে বাঁ হাতটা ডান হাতের মণিবন্ধ থেকে খুলতে থাকেন। যেমন করে কোন ক্ষতের ওপর থেকে, সাবধানে ব্যাণ্ডেজ খোলে, পাছে কোনরকম কাঁচা ঘায়ে লাগে। কিন্তু মণিবন্ধের দিকে তিনি তাকান না। বাঁ হাতটা আস্তে আস্তে খোলার পর, তিনি যেন একটা যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। চোখ বুজে থাকেন। বাঁ হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নেন। কিন্তু তখুনি মুখে দেন না। আয়নায় তাঁর

boiRboi.net

ছায়া পড়েছে, তিনি তাকিয়ে দেখেন না। অথচ আশ্চর্য, তাঁর হাতে কোন ক্ষতচিহ্নই নেই। কোনরকম আঘাত বা ফোলা, কিছুই নয়। যেমন স্বাভাবিক থাকা উচিত সেরকমই আছে।

শুভেন্দুনারায়ণের চেহারা দেখে, তাঁর বয়স বোঝবার উপায় নেই। অনেকটা, লম্বা আর দোহারা গঠনের মানুষই তাঁকে বলতে হবে। যদিও দেখলেই বোঝা যায়, তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে একটা প্রচণ্ড ভাঙনের লীলা চলেছে। যে-ভাঙনের লীলা তাঁর গোটা শরীরের কৃশতায়, রঙের বিবর্ণতায়। স্নায়বিক যুদ্ধের তাড়নায় যে রকম রেখা আঁকা পড়ে, সেইরকম রেখা তাঁর সারা মুখে। চুলে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পাক ধরেছে। তাঁর মুখে যে এককালে পৌরুষ ও কমনীয়তা ছিল, যাকে সুন্দর বলা যায়, এখনো তার আভাসগুলো রয়েছে। তাঁর বড় বড় চোখের দৃষ্টি এখন আগের মত স্বাভাবিক নেই, যে চোখের দিকে তাকিয়ে সম্ভবতঃ একটি স্বাধীনচেতা, দৃঢ় অথচ প্রেমিক-প্রাণ পুরুষের খোঁজ পাওয়া যেত। এখন বিভ্রান্ত, অনেকটা যন্ত্রণাকাতর, মদের ঘোরে রক্তাভ। এখন এই চোখে, একমাত্র হৃদয়ের অন্ধকারের সঙ্গে মনের লড়াইয়ের ছায়া। দেখে যেন সেইরকমই মনে হয়।

অথচ দু বছরও হয়নি, এ অঞ্চলে, সবাই দেখেছে, তিনি এক সুপুরুষ যুবক, প্রাণবন্ত উচ্ছল, কাজে কর্মে, কথায় বার্তায়, ঘোড়া চড়ায়, শিকারে যাওয়ায়, সব কিছুতে একটি সুখী প্রাণের প্রতিমূর্তি। অথচ লোকের কাছে, তার জন্যে তাঁকে কখনো অত্যাচারী আখ্যা পেতে হয় নি, বা কৃষি প্রজাদের অভিশাপ কুড়োতে হয়নি। কারণ তাঁর বিবেচনাবোধের প্রতি সকলের আস্থা ছিল। কিন্তু দু'বছরেই যেন তাঁকে পনেরো বছর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে, তাঁর যৌবনকে প্রৌঢ়ত্ব গ্রাস করতে বসেছে।

শুভেন্দুনারায়ণ কয়েক মুহূর্ত গ্লাস ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে গ্লাস মুখের কাছে তুলে হঠাৎ তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে, ডান হাতের মণিবন্ধটা আবার চেপে ধরলেন। তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, এবং আগের মতই, আবার ঘুরে চলতে আরম্ভ করলেন, আর অস্ফুটে বারে বারে বলতে লাগলেন, 'না না, আর না, আর না।'···

* * *

এবার তিনি অন্য দরজা দিয়ে বেরোন। সেখানে একটা লম্বা কড়িডর। কিন্তু অন্ধকার, ঠিক অন্ধকার নয়, কারণ একটু দূরে, একটি ঘরের খোলা দরজা দিয়ে, করিডরের মেঝেয় আলো এসে পড়েছে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে ওই সামান্য আলোটুকুই যেন অনেকখানি বলে মনে হচ্ছে।

শুভেন্দুনারায়ণ সেই আলোর রেখাটির দিকে তাকান, তারপর আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে যান। এবার লক্ষ্য পড়ে, আলোর রেশটা স্থির নেই, মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। যেন কেউ ঘরের ভিতরে, দরজার কাছে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে।

শুভেন্দুনারায়ণ দরজার কাছে দাঁড়ান। পর্দাটা একটু সরানো, ফাঁক দিয়ে আলো পড়ছে, এবং পর্দাটা মাঝে মাঝে দুলে উঠছে, বলেই, মনে হচ্ছিল কেউ যেন সরে সরে যাচ্ছে।

পর্দা সরিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকেন। দেখলেই বোঝা যায়, ঘরটি শয়ন ঘর, এবং সম্ভবতঃ কোন দম্পতির ঘর। কারণ সাবেকী যুগের উঁচু খাটের ওপর মোটা গদী,

boiRboi.net

তার ওপরে শিয়রের দিকে দুই জোড়া বালিশ পাশাপাশি ছোঁয়াছুঁয়ি করে রয়েছে। একটি মাত্র পাশ বালিশ, ডান দিকের পাশে রয়েছে। বেডকভার গোটানো। ক্রীম রঙের লিনেনের চাদর পাতা। দেখলেই বোঝা যায়, এ বিছানা অনেকদিন ধরে পাতা নেই, নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। অথচ এতই ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, যেন মনে হয়, এ শয্যা অব্যবহৃত। হয়তো আজ সন্ধ্যাতেই গুছিয়ে রাখবার জন্যে এরকম মনে হচ্ছে।

ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, ছোট ছোট ঝাড় বাতি। কিন্তু বাতি একটিই জ্বলছে। খাটের পাশে টেবলের ওপর, একটি কাঠের পাত্রের ওপর বাতিটি বসানো। এক পাশে দুটি আলমারি বন্ধ। এ ঘরেও ড্রেসিং টেবল রয়েছে, কিন্তু টেবল শূন্য, কোথাও কিছু নেই।

শুভেন্দুনারায়ণের ছায়া পড়ে ঘরের মেঝেটা অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। তিনি খাটের দিকে তাকান। দেখতে দেখতে, তাঁর দৃষ্টি বদলে আসে, যেন তিনি খাটের ওপর কাউকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠেন, এবং ঘুরে খাটের বাঁ পাশের দিকে যান। সে সময়ে তার প্রকাণ্ড ছায়াটা বিছানার ওপরে পড়তেই তিনি চমকে ওঠেন, দাঁড়িয়ে পড়েন, অস্ফুট উচ্চারণ করেন, 'কে ?'

পরমুহূর্তেই আরো নত হয়ে পড়েন, ছায়াটা সরে যায় বিছানা থেকে, এবং সে ভাবেই তিনি খাটের কাছে এগিয়ে যান। তাঁর চোখে একটি হাসির আবেগ ফুটে ওঠে, দু চোখে খুশির আবেগ দেখা যায়। তিনি যেন টেরই পান না, হাত খুলে ফেলেছেন। দু হাতই তিনি বিছানার দিকে বাড়িয়ে দেন। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, যেন ঘুমন্ত কাউকে আদর করে ডাকছেন, 'দীপা, দীপালিকা !···'

অস্ফুট গলায়, নাম ধরে ডাকতেই, যেন তিনি অন্য আর কিছু, অন্য আর কাউকে দেখতে পেলেন, এবং তাঁর মুখে প্রথমেই একটা ভয়ের চমক দেখা দিল। পরমুহূর্তেই তাঁর মুখ তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল, তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'না না, না না !'

বলতে বলতে তিনি খাটের কাছ থেকে সরে এলেন। ডান হাতটা একবার তুলে দেখেই, বাঁ হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি ডান হাতের মণিবন্ধ চেপে ধরলেন। আবার আর্তনাদ করে উঠলেন, 'উঃ ! না না, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।'

এই আর্তনাদ করে, অসহ্য যন্ত্রণায় যেমন মানুষ তার হাতের ক্ষতটা কোথাও একটু রাখতে চায়, বুকের কাছে বা গালের কাছে, কিংবা কোলের মাঝখানে, তেমনি সবখানে চেপে ধরতে লাগলেন, আর ঘরের মধ্যে ছটফট করে ঘুরতে লাগলেন। অথচ বোঝা গেল, তিনি বিন্দুমাত্র শান্তি বা আরাম পাচ্ছেন না, বরং যন্ত্রণা তাঁর বাড়তে লাগল। এই অবস্থায় তিনি ড্রেসিং টেবলটার কাছে এসে পড়লেন, এবং আয়নার দিকে নজর পড়তে, যেন তিনি নিজেকে চিনতে পারলেন না, তাই অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদের মতই, চোখ বড় বড় করে, নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে উঠলেন, 'কে ? কে ?'

তারপর যেন আস্তে আস্তে নিজেকে চিনতে পারেন, ড্রেসিং টেবলের আরো কাছে এগিয়ে যান। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে, দৃষ্টি নত করেন, এবং হঠাৎ ড্রেসিং টেবলের একটা ড্রয়ার, যে-ড্রয়ারের মুখে বড় একটা ডায়মণ্ডকাট কাঁচের হাতল লাগানো

রয়েছে, সেখানে তাঁর দৃষ্টি আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর মুখে সেই ভয়ের চমক এবং যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। তিনি এবার বেশ জোরে চীৎকার করে ওঠেন, 'না, না।'

এই বলেই তিনি হঠাৎ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। করিডর দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই কয়েকটা অন্ধকার ঘর তিনি অনায়াসে পার হয়ে যান। তিনি হলঘরের মধ্যে এসে পড়েন। সেখানকার আলোয় দেখা যায়, তাঁর সমস্ত মুখ আগের তুলনায় অনেক বেশি যন্ত্রণাকাতর, অপ্রকৃতিস্থ, যেন একটা নিশি-পাওয়া ঘোর। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের মণিবন্ধের মুঠি তেমনি চেপে ধরা, এবং বেশ জোরেই চেপে ধরা, যে কারণে মনে হচ্ছিল, তাঁর বাঁ হাতের পেশী ও শিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

শুভেন্দুনারায়ণ এবার আর হলঘরে দাঁড়ান না, প্রায় একইভাবে ছুটতে ছুটতে তিনি হলের বাইরে বারান্দায় যান। বারান্দা থেকে সিঁড়িতে নামতে আরম্ভ করেন।

সিঁড়িগুলো কাঠের, তার ওপরে ম্যাটস্ পাতা আছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনলে মনে হয় যেন, একটা অতিকায় জীব সিঁড়ি ভেঙে ধপ্ ধপ্ করে নামছে। তিনি নামছেন, আর কেবলই অস্ফুট আর্তনাদ করছেন, 'উঃ, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।'

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই, চত্বরের দিকে ছুটে যান। গেটের পশ্চিম দিকের পাঁচিল ঘেঁষে আস্তাবলের ভেজানো দরজার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। অন্ধকারের মধ্যে দুটি চোখ চকচকিয়ে ওঠে। সজোর নিশ্বাসে টের পাওয়া যায়, একটা অতিকায় ঘোড়া সেখানে রয়েছে। শুভেন্দুনারায়ণের প্রিয় অশ্বিনী। আদর করে যার নাম রাখা হয়েছে মহারাণী। বছর কয়েক আগে, হরিহরছত্রের মেলা থেকে, এই ঘোড়া তিনি কিনেছিলেন। এত রাত্রে কোন গৃহস্থের অশ্বকেই লাগাম ও রেকাবসহ গদী পরিয়ে সাজিয়ে রাখবার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল, মহারাণী পুরোপুরি সজ্জিত। মহারাণীও যেন এই অসময়ে মনিব দেখে চমকে ওঠে না। বরং তার মৃদু পা ঠোকায় বোঝা যায়, সে বাইরে বেরুতে প্রস্তুত।

শুভেন্দুনারায়ণ লাগাম ধরে, রেকাবে পা দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসেন, এবং মহারাণী তৎক্ষণাৎ চলতে আরম্ভ করে।

মহারাণীর পায়ের শব্দ, গভীর রাত্রের নিঝুম চত্বরে যেন এক অলৌকিক শব্দে বেজে উঠল। কুঠি বাড়িতে সেই শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল। শব্দ উঠতেই, গেট খুলে গেল। দেখা গেল, একজন সারারাত্রের দ্বারী সেখানে আছে। গেটের সামনে যে ক্ষীণ একটি আলো রয়েছে, তাতে দেখা গেল, পাল্লা দুটো সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে সে সরে দাঁড়ালো। দু চোখে ভয় ও বিস্ময় নিয়ে সে শুভেন্দুনারায়ণের দিকে তাকালো। অথচ, সে এমন ভাবে দরজা খুলে দিল, যেন এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল। তবু তার চোখে ভয় আর বিস্ময়। শুভেন্দুনারায়ণ যখন দেউড়ি পার হয়ে যাচ্ছেন, তখন একবার মনে হল, দ্বারী কিছু বলতে চায় যেন। সে যেন ব্যাকুল ভাবে কিছু অনুরোধ করতে চায়, সেই ভাবেই মুখ তুলে তাকায়। অথচ সাহসে কুলায় না।

ইতিমধ্যে, শুভেন্দুনারায়ণকে নিয়ে মহারাণী ছুটে বেরিয়ে যায়। দূরের অন্ধকারে তার পায়ের শব্দ হারিয়ে যেতে থাকে।

তখন পাঁচিলের পাশের অন্ধকার থেকে, আর একটি মূর্তি দ্বারীর দিকে এগিয়ে

boiRboi.net

আসে। তার চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায়, সে একজন ভৃত্য। বলল, 'বেরিয়ে গেলেন, না বেচন সিং ?'

দ্বারী বেচন সিং জবাব দিল, 'হ্যাঁ। কিছু বলে ফেরাতে ইচ্ছা করল, সাহস পেলাম না।'

'আমিও অনেক দিন চেষ্টা করেছি, কিছু বলব ! বলতে পারি না।'

বেচন সিং অন্ধকারের দিকে চোখ রেখেই বললো, 'আচ্ছা, সাঁজবেলা হলেই ওঁর কী হয় ? কেন এরকম করেন বলতে পার দয়াল ভাই ?'

ভৃত্য দয়াল সনিশ্বাসে জবাব দেয়, 'তাই যদি জানতে পারব, তবে আর ভাবনা কী ছিল। ব্যামো জানলে তবে তো তুমি ওষুধও দিতে পার।'

বেচন আপন মনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলে, 'তা ঠিক। কিন্তু আমি তো ভেবে কিছুই পাই না। আজকাল একটা রাতও ওঁকে আমি ঘুমোতে দেখি না।'

দয়াল বলে, 'ওঁয়ার যেন কী একটা যন্ত্রণা হয়। খালি দেখি, একটা হাত ধরে ছুটতে থাকেন। মনে করি, জিজ্ঞেস করব, "হুজুর, আপনার কী কষ্ট, আমাকে বলুন।" কিন্তু সাহস পাই না। মাঝে মাঝে কী সব বলেন, এক এক সময় চীৎকার করে ওঠেন। আমার ভীষণ ভয় লাগে। অথচ এই লোক কত ফুর্তিবাজ ছিলেন। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। কখনো কোন বেচাল ছিল না।'

'সে তো সবাই জানে।'

'আজকাল, জান, কত্তা মদ খাওয়াও ধরেছেন।'

'সেটা আর তুমি কী বলবে, আমি জানি না। আমার নাকে বাস পেয়েছি। কিন্তু কেন এরকম হল ? তুমি তো সারারাত হুজুরকে চোখে চোখে রাখ। কিছু বুঝতে পার না ?'

'না বুঝতে পারি না। লক্ষ্য রাখি, কী করেন কোথায় যান।'

বেচন সিং, দূরে অন্ধকারে, যেদিক থেকে তখনো ঘোড়ার খুরের ক্ষীণ শব্দ আসছিল, সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় আর যাবেন, সেইখানেই বোধ হয় গেলেন, শহরের যেখানে প্রায়ই ছুটে চলে যান।'

'ভয় পাই, কোন দিন না একটা দুর্ঘটনা ঘটে।'

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে বেচন সিং হঠাৎ বলে ওঠে, 'এই কুঠিটাকে আমার ভাল লাগে না। মনে হয়, কুঠিটার কোন দোষ আছে।'

দয়াল বলে, 'অনেকে অনেক কথা বলে এই কুঠি নিয়ে। তবে, আজ পর্যন্ত আমি কিছুই দেখতে পাইনি।'

'আমি দেখিনি, তবে শুনেছি। সবাই বলে, এখানে নাকি একটা মেমসাহেবের আত্মা আছে···।'

ঠিক এ সময়েই উত্তরের বাগান থেকে কোন পাখীর পাখা ঝাপটাবার শব্দ শোনা যায়। বেচন সিং চুপ করে। একটু পরে দয়াল বলে, 'কিন্তু আমাদের হুজুর তো কারুর কোন ক্ষতি করেন নি।'

বেচন সিং সে কথার কোন জবাব দেয় না।

তারা দুজনেই খানিকটা অসহায়ের মত, চুপ করে, দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

boiRboi.net

থাকে, যদিও কিছুই দেখা যায় না। কেবল তখনো ক্রমেই মিলিয়ে যাওয়া ঘোড়ার পায়ের শব্দ তেপান্তর থেকে ভেসে আসে।

* * *

মহারাণী ছুটে চলেছে। শুভেন্দুনারায়ণের বাঁ হাতে তখন লাগাম, ডান হাতের মণিবন্ধটা উল্টো করে বাঁ গালে চেপে ধরা, যে কারণে তার মাথা যেন অনেকটা গোঁজ করা রয়েছে। যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত একলা সৈনিক ছুটে চলেছে। উঁচুনিচু যে মেঠো পথ দিয়ে মহারাণী চলেছে, তা যেন তার চেনা, কারণ শুভেন্দুনারায়ণ কোনভাবেই তাকে চালিত করছিলেন না। সে নিজের থেকেই ছুটছিল।

বাইরে এ তেপান্তরের মাঝে, অন্ধকার হালকা। এতই হালকা যে, দূরের তারা ভরা আকাশের গায়ে, রাজমহল পাহাড়ের কালো রেখা পর্যন্ত যেন গাঢ় হয়ে ফুটে উঠেছে। মহারাণীর পায়ের শব্দ মাঠের ওপর দিয়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তার পায়ের শব্দে, সহসা এই রাত্রির প্রকৃতি চমকে উঠে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁর ডাকে আচমকা বিরতি পড়ছে। রাতজাগা পাখী সহসা শব্দে অশুভ আশঙ্কায় ডাক থামিয়ে থমকে যাচ্ছে। কেবল, বহু দূরান্তে, যেখানে শব্দ পৌঁছুচ্ছে, সেখানকার বস্তি থেকে কুকুরগুলো ডেকে উঠছে।

দেখতে দেখতে, আকাশের বুকে শহরের ছবি ফুটে উঠল। রাস্তার টিমটিমে আলোগুলো দেখা দিল। দূর থেকে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক রূপকথার নিদ্রিত রহস্যপুরীতে তিনি ঢুকছেন। তখনো তাঁর মুখে সেই অস্ফুট আর্তনাদ লেগেছিল, 'উঃ! দুঃসহ, অসহ্য, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।'...

যতই বলছিলেন, ততই ডান হাতের মণিবন্ধ বাঁ গালে জোরে চেপে ধরছিলেন।

মহারাণী শহরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো না। শহরের প্রান্তেই, একটি নতুন দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। বাড়িটার সামনেই খোলা মাঠ আছে যদিও, তবু গোটাকয়েক বড় বড় দেবদারু ও বট গাছ একটা ঝুপসি ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। বাড়িটা স্তব্ধ, নিঝুম ও নিদ্রিত। চারদিকেই অন্ধকার, কেবল দোতলায় ব্যালকনিতে একটা অতি ক্ষীণ আলো জ্বলছে। সম্ভবতঃ বাড়িটা যে আছে, অন্ধকারে তার অস্তিত্ব জানাবার জন্যেই রয়েছে।

শুভেন্দুনারায়ণ সেই বাড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নেমে, দরজায় প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চৌকাঠের মাথায়, কলিং বেলের বোতামটা খুঁজে পেতে দেরী হল না। তিনি যেন প্রাণপণ শক্তিতে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে বোতামটা টিপে ধরলেন, এবং গোটা নিদ্রিত বাড়িটার ভিতরে কলিং বেলের শব্দটা একটা তীব্র আর্তনাদের মত বাজতে লাগলো।

প্রায় মিনিটখানেক বাজবার পর, শুভেন্দুনারায়ণের মাথার ওপরেই দপ্ করে একটা আলো জ্বলে উঠলো। দরজার মাথার ওপরেই একটা আলো ছিল, সেটা জ্বলে উঠতে বোঝা গেল, ভিতরের লোক জেগে উঠেছে। আলোটা জ্বলতেই, তিনি বোতাম থেকে আঙুল সরিয়ে নিলেন। আলো জ্বলতে দেখা গেল, দরজার গায়ে একটি লেখা ফলক রয়েছে—'ডঃ পি. এন. রায়।'

দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, ঘুম-ভাঙা বিরক্ত মুখ, পায়জামা পরা গেঞ্জি গায়ে

boiRboi.net

ডাক্তার প্রেমনাথ রায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও, সে তা প্রকাশ না করে বলে, 'ও আপনি। আপনাকে তো আমি বলেছি যে—।'

শুভেন্দুনারায়ণ তার কথা শেষ করতে না দিয়েই, অস্থিরভাবে ঢুকে পড়েন। এবং যন্ত্রণা ও ক্লান্তিতে, রুদ্ধশ্বাস গলায় বলেন, 'ডোণ্ট টক ন্যুইসেন্স ডক্টর। আই অ্যাম নট এ ঘোস্ট। আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলতে আসিনি।'

ডাক্তার প্রেমনাথের বিরক্তির ওপরে একটা চিন্তা ও কৌতূহলের ছায়া পড়ে। অনেকটা অসহায় ভাবেই সে এগিয়ে গিয়ে তার রোগী-সেবার ঘরটা খুলে দেয়। শুভেন্দুনারায়ণ সেখানে ঢুকে, একটা চেয়ারে ঝুঁকে পড়ে বসে পড়েন।

ডাক্তারের গলায় এবার একটু সমবেদনা এবং শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে, বলে, 'কিন্তু আমি খুব ভাল করেই দেখেছি, আপনার রিস্টে কিছুই হয় নি। আমি তো ক'রাত্রি ধরেই দেখছি ওখানে আপনার কিছুই হয় নি। ফোলে নি, কাটে নি, একেবারেই স্বাভাবিক।'

শুভেন্দুনারায়ণ বাঁ হাত দিয়ে তখন ডান হাতের মণিবন্ধটা চেপে ধরেছিলেন। ডাক্তারের কথা শুনে ধমকে উঠলেন, 'তা হলে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি আপনাকে, কী বলতে চান আপনি? আমার কী শখ আছে মশাই যে, আপনার কাছে এত রাত্রে আমার বাড়ি থেকে আমি এভাবে ছুটে আসব? আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না আমার রিস্টের ওখানটা জ্বলে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা!'

ডাক্তার অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে এবং শুভেন্দুনারায়ণের কাছে এসে বসে। বলে, 'দেখুন, আমি যতরকম ভাবে দেখা উচিত, তাই দেখছি। এখন বাকী আছে এক্স-রে, কিন্তু এখানে তো তার উপায় নেই, তা হলে আপনাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসতে হয়। তবে এটা নিশ্চয় আপনি বোঝেন, আপনার মত ব্যক্তিকে আমি কখনো অবহেলা করে বা মিথ্যে কথা বলে বিদায় করে দিতে পারি না। আর কেনই বা তা করব।'

শুভেন্দুনারায়ণ তেমনিভাবেই বললেন, 'তা আমি জানি না ডাক্তার। বাট ই প্লীজ বিলীভ মী, আই অ্যাম ডাইয়িং। আমার কবজির এই জায়গাটা জ্বলে যাচ্ছে। দেখুন ডাক্তারবাবু, দয়া করে একটু ভাল করে দেখুন। আমার অসহ্য কষ্ট হচ্ছে, ম্যাসি ডাক্তার একটু ম্যাসি।'

শুভেন্দুনারায়ণ এমনভাবে চীৎকার করে ওঠেন, যেন তিনি যন্ত্রণায় এই মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে যাবেন। সামনের টেবলের ওপরে হাত দুটো এলিয়ে দিয়ে, মাথা গুঁজে ভেঙে পড়েন। সত্যি তখন তাঁকে আহত মুমূর্ষুর মতই দেখাচ্ছিল।

কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত এ ঘটনা ঘটতে থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারের চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে ওঠে! সে ক'দিনের মতই, আবার শুভেন্দুনারায়ণের ডান হাতটা তুলে নিয়ে কব্জির ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল। স্পর্শ করে, টিপে টিপে, নানারকমভাবে।

শুভেন্দুনারায়ণ তখনও বলতে থাকেন, 'যত দিন যাচ্ছে, ক্রমেই যন্ত্রণাটা বাড়ছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না ডাক্তার।'

তাঁর গলায় প্রায় একটি অসহায় কান্নার সুর বেজে ওঠে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি ঠিক করে বলুন তো, কী রকম যন্ত্রণা বোধ

boiRboi.net

করেন ? কোন রকম জ্বলা, না টনটনে ব্যথা, কী রকম ?'

'তা আমি ডেফিনিট করে কিছু বোঝাতে পারি না ডাক্তার, একটা যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা।'

ডাক্তার হঠাৎ তার টেবলের ওপর থেকে ছোট্ট একটি পালক নিয়ে, কবজির চামড়ায় খুব আলতো ভাবে স্পর্শ করে বলল, 'টের পাচ্ছেন ?'

শুভেন্দুনারায়ণ যন্ত্রণার সঙ্গেই বললেন, 'পাচ্ছি বৈকি ডাক্তার। ভীষণ যন্ত্রণা যে, সামান্য, সামান্যতম স্পর্শও ওখানে টের পাওয়া যায়, মনে হয়, যেন আমার সমস্ত প্রাণটা ওখানে এসেই ঠেকেছে। কেন, আপনি এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

ডাক্তার বলল, 'আপনি যদি কোন স্পর্শ বোধ না করতেন, তা হলে আপনার কুষ্ঠের লক্ষণ দেখা দিয়েছে মনে করতাম।'

শুভেন্দুনারায়ণ যেন চমকে উঠলেন, একটু আশ্বস্ত হলেন, বললেন, 'দেখুন তো, দেখুন তো ডাক্তার, তা হলে বোধ হয় আমার কুষ্ঠই হয়েছে, হাঁ লেপ্রসি, লেপ্রসি !'

শুভেন্দুনারায়ণের অভিব্যক্তিতে ডাক্তার একটু অবাক না হয়ে পারল না। সে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, 'না, আপনার তা হয় নি, তা হলে আপনার কোন স্পর্শ-বোধ থাকত না। তা ছাড়া আপনি যে রকম বলেছেন, সে রকম জ্বালাও করতো না।'

'তবে কী হয়েছে, কী হয়েছে আমার ওখানে।'

বলতে বলতেই, তিনি আবার তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কিন্তু অসহ্য জ্বালা ডাক্তার।'

ডাক্তার প্রেমনাথ কয়েক মুহূর্ত শুভেন্দুনারায়ণের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'আপনি সারারাত্রি ড্রিংক করে এসেছেন ?'

'অন্ গড ডাক্তার, বিশ্বাস করুন। দ্বিতীয়বার যে পেগ আমি ঢেলেছিলাম, তাও শেষ করতে পারিনি। আমি মাতাল নই ডাক্তার, বিশ্বাস করুন। আমি যদি তা হতে পারতাম, তা হলে তো অনেক শান্তি পেতাম, তা হলে আমার যন্ত্রণা আর থাকত না।'

প্রেমনাথ তবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। সে যেন একটা কিছু চিন্তা করল এবং তার চোখের সংশয়ে যেন সন্দেহ দৃঢ় হল। বলল, 'আচ্ছা বসুন, আমি আসছি।'

সে উঠে পাশের ঘরে গেল। আলো জ্বালিয়ে, অপারেশন ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স থেকে ছুরি বের করে, স্পিরিটের তুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিল। আর মনে মনে বলতে লাগল, 'হয় বদ্ধ পাগল, নয় যাচ্ছেতাই মাতাল ! বড়লোক মানুষ, কিসের খেয়ালে ঘুরছেন, তা উনিই জানেন।'

তারপরে সে এ্যাণ্টিসেপটিক লোশন আর তুলো নিয়ে এসে, শুভেন্দুনারায়ণের সামনে দাঁড়ালো। দৃঢ় গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি আপনার কবজিটা কেটে দেব।'

ডাক্তার হয়তো ভেবেছিল, শুভেন্দুনারায়ণ তার কথা শুনে ভয় পাবেন। কাটতে দিতে রাজী হবেন না। কিন্তু শুভেন্দুনারায়ণ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'যা খুশি, যা খুশি আপনার। খালি একটু যন্ত্রণা কমিয়ে দিন।'

ডাক্তার একটু অবাক হল, তবু সে শুভেন্দুনারায়ণের হাতটা টেনে নিয়ে, কবজির উলটো পিঠে, যেখানটায় যন্ত্রণার কথা তিনি বলে থাকেন, সেখানে ধারালো ছুরি

boiRboi.net

দিয়ে একটুখানি কেটে দিল। সামান্য রক্ত বেরুলো। ডাক্তার তীব্র দৃষ্টিতে শুভেন্দু-নারায়ণকে লক্ষ্য করছিল।

শুভেন্দুনারায়ণের মুখে একটা আরামের ভাব দেখা দিল। কাটার জ্বালা এবং রক্ত দেখে, যেন গভীর স্বস্তি বোধ করলেন। চোখ বুজে বলে উঠলেন, 'আঃ! আঃ! একটু যেন আরাম লাগছে। আর একটু ডাক্তার, আর একটু দিন।'

ডাক্তার জানতো, অকারণ ক্ষত বেশী করা যায় না। সে তাই লোশন দিয়ে সদ্য কাটা ক্ষতটা মুছিয়ে দিচ্ছিল। লোশনটায় কয়েক মুহূর্ত জ্বালা বাড়াবার কথা। অথচ উনি যেন তাতেও আরাম বোধ করছিলেন। ডাক্তার অবাক হচ্ছিল। বলল, 'আর কিছু করতে হবে না, এতেই আপনার ভাল হয়ে যাবে, ভাববেন না।'

'যাবে, সত্যি?'

'যাবে বৈকি।'

শুভেন্দুনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন, পকেটে হাত দিয়ে যা টাকা উঠল, তাই ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিলেন।

ডাক্তার বলল, 'থাক্ না, আপনি তো রোজই আসেন, আর অনেকগুলো করে টাকা দিয়ে যান, অথচ আমাকে কিছুই করতে হয় না।'

'তা বললে কি হয় ডাক্তার? আজ আপনি আমাকে একটু আরাম দিয়েছেন। রোজ রোজই তো আপনার ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিয়ে যাই। টাকা দিয়ে তা পূরণ হয় না, তবু আর কী-ই বা দিতে পারি।'

বলতে বলতে শুভেন্দুনারায়ণ দরজার দিকে যান। তাঁর চোখে যেন সত্যি তখন, যন্ত্রণার পরে একটা আরাম ও ঘুমের আবেশ। বললেন, 'চলি ডাক্তারবাবু।'

বেরিয়ে এসে তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন সম্মোহিতের মত মহারাণীর পিঠে ওঠেন। ইতিমধ্যে পুব আকাশের রাত্রের কালিমা অনেকখানি কেটে গিয়েছে। একটা অস্পষ্ট আলোর আভাস যেন দেখা যায়। বোঝা যায় রাত্রি আর বেশী নেই। দূরের রেল লাইন থেকে মালগাড়ির স্তিমিত শব্দ ভেসে আসছে, যে শব্দটা দিনের বেলা হলে শোনা যেত না।

* * *

পরদিন রাত্রে শুভেন্দুনারায়ণের আবার সেই একই অবস্থা। ডান হাত চেপে ধরে, যন্ত্রণাকাতর মুখে, সেই রকম, সারা কুঠিতে অস্থির পদচারণা। এই কুঠির যারা চাকর কর্মচারী সকলেই জানে প্রায় বছর খানেক ধরে এই অবস্থা চলেছে। শুধু তারা নয়, এই সমগ্র অঞ্চলের লোকেরাই জানে, তিনি অপ্রকৃতিস্থ, হয়তো উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন।

এ অবস্থার শুরু হয়েছে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর থেকেই। যতই দিন যাচ্ছে ততই তাঁর অবস্থা, ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছে। সারাদিন তিনি বেশ ভালই থাকেন। কাজকর্ম মোটামুটি দেখাশোনা করেন। লোকজন এলে, সকলের সঙ্গেই সাক্ষাত করেন, কথাবার্তা বলেন। যদিও আগের তুলনায় কথা কম বলেন। তাঁর সেই রাশভারী চরিত্রের মধ্যেও একটি প্রসন্ন আনন্দোচ্ছল মানুষ যে দেখা যেত, একটু বিদ্রূপ-পরায়ণ, যে বিদ্রূপের মধ্যে কোন বিষ ছিল না, এবং রসিক হাসিখুশি মানুষটি অবিশ্যি আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু সারাদিন একরকম কেটে যায়।

রাত্রি হলেই মনে হয়, এই ক্যাসল সদৃশ প্রাসাদের আবহাওয়া যেন বদলে যায়, সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে ওঠেন। সূর্যাস্তের পর থেকেই সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে একটা পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। অন্ধকার হতে না হতেই মনে হয়, যেন অশুভ আত্মারা এই প্রাসাদের সর্বত্র চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এবং তাদের অশুভ মায়া দিয়ে, শুভেন্দুনারায়ণকে ভোলাতে থাকে।

আজ আবার তেমনি ভাবেই, গভীর রাত্রে শুভেন্দুনারায়ণ মহারাণীকে নিয়ে বাইরে ছুটে গেলেন। সেই ডাক্তারের বাড়ি এবং কলিং বেল টেপা এবং ডাক্তারের আবির্ভাব। বিরক্ত হলেও ডাক্তার প্রেমনাথ বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শুভেন্দুনারায়ণ উন্মত্ত চীৎকারে ও আর্তনাদে, অপ্রকৃতিস্থ লোকটির প্রতি তার করুণা হয়।

শুভেন্দুনারায়ণ তাঁর হাত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'আজ আর একটু কিছু করে দিন ডাক্তার। গতকাল আমি একটু আরাম পেয়েছিলাম। কিন্তু যেই আস্তে আস্তে রাত হতে লাগল, যন্ত্রণা আবার সেই আগের মত বাড়তে লাগল। যা হোক কিছু করে কালকের মত একটু আরাম করে দিন।'

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত শুভেন্দুনারায়ণকে নিরীক্ষণ করে, তাঁর হাতটা তুলে ধরে। ছোট ক্ষত স্থানটি লক্ষ্য করে। আবার গতকালের মতই, শুভেন্দুনারায়ণের চোখের সামনে সে ছুরিটা আগুনে পোড়ায়। কিন্তু তিনি ফিরেও দেখেন না। চোখ বুজে মুমূর্ষুর মত পড়ে থাকেন। ডাক্তার খুব সাবধানে, পুরনো ক্ষতের সামনেই আবার একটু কেটে দেয়। দিতেই ঈষৎ রক্ত বেরোয়। শুভেন্দুনারায়ণ তৎক্ষণাৎ আরামসূচক শব্দ করে বলে ওঠেন, 'আহ্, বাঁচালেন ডাক্তার, সত্যি আরাম হচ্ছে। আর একটু দিন, আর একটু দিন!'

অনেকটা অসহায় আর্ত শিশুর মত তিনি বলে উঠলেন।

ডাক্তার বলে, 'না, আজ আর নয়। আজ এতেই আপনার আরাম হয়ে যাবে।'

শুভেন্দুনারায়ণ যেন আরামে নিদ্রাকাতর হয়ে ওঠেন। কোনরকমে পকেট থেকে কিছু টাকা তুলে টেবলের ওপর রেখেই টলতে টলতে বেরিয়ে যান। প্রেমনাথ টাকা ফিরিয়ে নেবার কথা বলে, তিনি শুনতেও পান না। প্রেমনাথের চোখে আজ কেবল বিস্ময় বা করুণা নয়। তার চোখে ভ্রূকুটি প্রশ্ন ও কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে তার চোখে একটা সংকল্প দেখা দেয়।

শুভেন্দুনারায়ণ বাইরে গিয়ে কোনরকমে মহারাণীর পিঠের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। অভ্যস্ত ঘোটকী তার নিজের পথে, মন্থর চালে চলতে আরম্ভ করে। আর শুভেন্দুনারায়ণ যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করতে থাকেন, 'একবার—একবার কি আর ফিরে পেতে পারি না, একবার, একবার···।'

* * *

পরদিন আবার আসেন শুভেন্দুনারায়ণ, সেই একই রকম, একই সময়ে। যন্ত্রণাকাতর অস্থির অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ডাক্তারের দরজায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি দেখলেন, কলিংবেলের বোতাম টেপার আগেই দরজা খুলে যায়। প্রেমনাথ দরজায় দাঁড়িয়ে। ডেকে বলে, 'আসুন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'আমার জন্যে?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, জানি আপনি তো আসবেনই।'

শুভেন্দুনারায়ণ ভিতরে ঢোকেন।

ডাক্তার দরজা বন্ধ করে দেয়। শুভেন্দুনারায়ণ রোগী-ঘরের দিকে এগিয়ে যান। প্রেমনাথ বলে ওঠে, 'স্যার, আজকে আপনি ওখানে বসবেন না, আমার সঙ্গে ওপরে চলুন।'

'ওপরে?'

'হ্যাঁ, আসুন। আমি ব্যাচেলার ডাক্তার, আমার ঘরে কেউ নেই, আমি আর আমার চাকর ছাড়া এ বাড়িতে কেউ থাকে না। চলুন।'

শুভেন্দুনারায়ণ বললেন, 'ওপরে গেলে আপনি আমাকে সারিয়ে দেবেন তো?'

'নিশ্চয়ই।'

প্রেমনাথ এগিয়ে এসে, শ্রদ্ধা ও করুণার সঙ্গে শুভেন্দুনারায়ণের হাত ধরে ওপরে নিয়ে যায়। সে তার শোবার ঘরে নিয়ে, চেয়ারে তাঁকে বসতে দেয়। তারপর দরজা বন্ধ করে, সে তাঁর মুখোমুখী হল। গম্ভীর গলায় বলল, 'বলুন।'

শুভেন্দুনারায়ণ যেন অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলব ডাক্তার?'

'যা বলবার আছে। আপনার অসুখের কথা বলুন।'

'অসুখের কথা তো আপনাকে বলেছি।'

'না বলেননি। আপনি বলছেন না বলেই, আমি আপনার চিকিৎসা করতে পারছি না। সেই জন্যে, আমি আজ আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই কিছু চেপে যাচ্ছেন, যে জন্যে আমি আপনার অসুখ ধরতে পারছি না।'

বলতে বলতে প্রেমনাথের মুখ সমবেদনায় ভরে ওঠে। আবার বলে, 'আপনি বলুন, যদি কোন গোপনীয় কথা হয়, জানবেন, আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী কেউ তা জানবে না, আমাকে বিশ্বাস করে, আপনি আপনার অসুখের কথা আমাকে বলুন।'

শুভেন্দুনারায়ণ যেন প্রথমটা বিস্মিত হন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর মুখের পরিবর্তন হয়, এবং তিনি যেন কোন্ বিস্মৃতির গভীরে ডুবে যেতে থাকেন। বলেন, 'ঠিক বলেছেন ডাক্তার, আপনাকে আমি আমার অসুখের কথা বলব। তবে সে কথা অতি গোপন, আপনাকে আমি বিশ্বাস করেই বলব।'

বলে তিনি দরজার দিকে তাকালেন। প্রেমনাথ বলল, 'বন্ধ করে দিয়েছি। আপনি আরাম করে বসে, বলুন।'

শুভেন্দুনারায়ণ বললেন, 'বলব, হ্যাঁ আপনাকে আমি বলব, তা নইলে অসুখটা আপনি ধরতে পারবেন না। কিন্তু একটা অনুরোধ, আলোটা নিভিয়ে দিন। আমি আপনার মুখের দিকে তাকালে, বা কোথায় আছি, তা দেখতে পেলে, বলতে পারব না।'

প্রেমনাথ আলো নিভিয়ে দিল। সমস্ত ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেল, কিছুই দেখা যায় না। একটু পরে, সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে, শুভেন্দুনারায়ণের এক ভিন্ন গলা শোনা গেল, যে গলায় ঠিক যন্ত্রণা বা অস্থিরতা নেই। শোনা গেল:

*　　　*　　　*

'ডাক্তার, আপনি জানেন, কলকাতার কোন্ পরিবারের ছেলে আমি। সারা বাংলা

boiRboi.net

দেশই আমাদের পরিবারের নাম জানে। আমাদের আদি বংশ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও, নবাবী আমলে আমাদের পদবী হয়েছিল হালদার। বংশের গৌরব আমি সেভাবে ঠিক করি না। তবু এ কথা মানতেই হবে, আমাদের পরিবারের একটা বিশেষ মর্যাদা, সারা বাংলা দেশেই আছে। বংশ গরিমা, কৌলীন্য, আমাদের খুবই ছিল, আজও আছে, এবং সে সব রক্ষার জন্যে আমার বাবা ঠাকুর্দারা অনেকটা বাঘের মত কঠিন ও নিষ্ঠুর, যে কারণে আমি একরকমভাবে বলতে গেলে, এই দূর সাঁওতাল পরগনায় নির্বাসিত।

'হ্যাঁ, এটা আমার কাছে একরকম নির্বাসনই বলতে হবে, কারণ, আমি শুধু কলকাতায় মানুষ নয়। ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে, ইউরোপেরও কোন কোন শহরে আমার জীবনটা ঘুরে ঘুরে কেটেছে। হয়তো সে সব কাজের থেকে অকাজই বেশী! আমি তা মনে করতাম না। আপাতদৃষ্টিতে লোকের চোখে বড়লোকের ছেলের বিলাসভ্রমণ বলেই এসব মনে হবে, কিন্তু আমি কিছু সঞ্চয় করেছিলাম। আমাদের পরিবারে ছেলেদের চাকরির কোন প্রশ্নই ছিল না। বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা, তাও আমার দ্বারা কোনদিন সম্ভব ছিল না, কেন না, আমার মেজাজটা ঠিক সে রকম ছিল না। হাল আমলে, হালদার পরিবার কিছু কিছু ব্যবসায়েও টাকা খাটাতে আরম্ভ করেছে, আমি তাতেও উৎসাহী ছিলাম না। তার মানে এই নয় যে, সেই কারণে বাবা আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন, বরং 'যথেষ্ট উদারতার সঙ্গেই আমাকে চলা-ফেরা করতে দিয়েছেন।

'আমার একটু লেখাপড়া করার বাতিক ছিল। বিশেষ করে দেশ দেখা ও সেই দেশ, সেই দেশের মানুষ ও তার আচার আচরণ, সবকিছুই আমাকে ভারী কৌতূহলী এবং অনুসন্ধিৎসু করতো। আমি লেখাপড়া এবং ভ্রমণ নিয়েই ছিলাম।

'আমার অন্যান্য দাদারা বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মোটামুটি বেশ ভালই ছিলেন। তাঁরাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কোন কারণেই কোনদিন আমি তাঁদের দোষ দিতে পারব না। বরং তাঁরা আমাকে আদর করে শিল্পী সাহিত্যিক কবি ইত্যাদি বলতেন। বৌদিদেরও আমার প্রতি স্নেহের মাত্রা একটু বেশীই ছিল। থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক, কারণ, সকলেই বিষয়আশয় নিয়ে থাকতেন, একমাত্র আমিই তাঁদের কাছে অন্য জগতের খবর বহন করে নিয়ে যেতাম। তার পুরস্কার স্বরূপ, প্রচুর স্নেহ প্রীতি ভালবাসা আমি পেয়েছি।

'আমি সবই পেয়েছিলাম, শুধু নির্বাসন আমার কপালে ছিল। যদিও, এ নির্বাসনকে আমি আমার স্বর্গ বলেই মনে করেছিলাম, এবং সত্যি স্বর্গই ছিল। লোকে যে স্বর্গের কথা বলে, সেখানে সকলের অনাবিল আনন্দ ও সুখ, আমার তেমনি ছিল। তবু, কে আর পরিবার ছেড়ে থাকতে চায়? সেই ব্যথাটা একটু ছিল। তারপরে আজ আমি এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।'…

* * *

এই পর্যন্ত বলে, শুভেন্দুনারায়ণ চুপ করেন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন ইতিমধ্যে অনেকখানি হালকা হয়ে আসে। বাইরের দিকে যে জানালাটা খোলা আছে, তার ভিতর দিয়ে একটি অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে। যদিও তাতে কিছুই প্রায় দেখা যায়

boiRboi.net

না। কেবল শুভেন্দুনারায়ণের অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যায়। ডাক্তার এমন একটি কোণ বেছে নিয়েছে, যেখানে অন্ধকারে তাকে একেবারেই দেখা যায় না। ডাক্তারের টাইমপিস্‌ ঘড়িতে টিক্‌ টিক্‌ শব্দ বাজছে। স্তব্ধতার মধ্যে, এ শব্দ যেন সর্বচরাচরের প্রাণস্পন্দনের মত বাজছে। আর এই স্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা প্রতীক্ষাও রয়েছে। শুভেন্দুনারায়ণ কী বলেন, তারই উৎকর্ণ প্রতীক্ষা। এবং টাইমপিসের রেডিয়ম দেওয়া চিহ্নগুলো বিচিত্র উজ্জ্বল চোখে তাঁর দিকেই নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে। বাইরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

শুভেন্দুনারায়ণের স্বর আবার শোনা যায়। যেন অনেক দূর থেকে বলতে বলতে তিনি আসছেন, সেইরকম স্তিমিত গলা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

'এর কারণ কি জানেন ডাক্তার! এর কারণ, আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। তার নাম ছিল, দীপা, দীপালিকা। সত্যি বলতে কি, যদি বাড়াবাড়ি না মনে করেন সে ছিল আমার প্রাণেরই দীপালিকা। রবিবাবুর সেই গানটার কথা আমার প্রায়ই মনে হত, "যাক অবসাদ বিষাদ কালো দীপালিকায় জ্বালাও আলো, আপন আলোয় সাজাও আলোর ধরিত্রীরে।" দীপালিকাকে আমার সেইরকমই মনে হত, মনে হত, সে আমার দীপালিকা, সেই দীপালিকায় আমি আলো জ্বালাই। কিন্তু আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন, আমার ধরিত্রীকে আমি সেই আলোয় সাজাতে পারিনি, যেখানে ঘোর অন্ধকার।'...

আবার একবার তিনি চুপ করেন। যেন তাঁর গলার স্বর কোন গহ্বরের মধ্যে ডুবে যায়। এবং একটু পরে সহসা একটা নিশ্বাস পড়ে। তিনি বলে ওঠেন ঃ

'কিন্তু সে কথা থাক। আমাদের পরিবারে প্রেম করে বিয়ে করা কোনমতেই সমর্থনীয় ছিল না। যে কথাটা আমরা প্রায়ই শাস্ত্র থেকে বলে থাকি, স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা আমরা মানি না। আমাদের পরিবারে তো তা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তবু প্রেম করার একটা হয়তো যুক্তি পরিবার মেনে নিতে পারতো, কারণ যুগের পরিবর্তন ঘটছিল, এবং হালদারবাড়ি সে বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিল না। কিন্তু সেই প্রেমপাত্রী যদি হয় অজ্ঞাতকুলশীলা, তা হলে হালদার বাড়িতে তার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই। হ্যাঁ, দীপালিকা একদিক থেকে বলতে গেলে, অজ্ঞাতকুলশীলাই ছিল।

'তবে ওর আসল পরিচয়টা আমার জানা ছিল। যদিও এক কথাতেই, ওর পরিচয় ছিল বাঈজী রতনবাঈ-এর মেয়ে ও। জানি না, রতনবাঈ-এর নাম আপনি কখনো শুনেছেন কিনা। আমারও শোনবার কথা ছিল না। তবু শুনতে হয়েছে। শুনেছিলাম তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বাঈজী। রতনবাঈ-এর জীবনটা এক দিক থেকে ট্র্যাজিক, সন্দেহ নেই, কিন্তু পেশার দিক থেকে মহিলা নিরুপায় ছিলেন, অর্থাৎ নিরুপায় হয়েই তাঁকে বাঈজীর পেশা গ্রহণ করতে হয়েছিল, আর সেটাও করতে হয়েছিল, খানিকটা নিজের ভাইয়ের জন্যে এবং দীপালিকার মুখ চেয়ে।

'তার আগে আমি বলতে চাই, কী ভাবে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। দেখুন ডাক্তার, অনেকের সঙ্গে অনেকের, অর্থাৎ অনেক ছেলের সঙ্গে অনেক মেয়েরই খুব নাটকীয় ভাবে পরিচয় হয়। যে নাটকগুলোকে আমার স্থূল বলে মনে হয়। স্থূল মানেই

boiRboi.net

খারাপ নয়, কেবল ভয় হয়, কোন চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে পাছে অগভীরতার ব্যর্থতাটা হঠাৎ একদিন ফুটে ওঠে। যে কারণে মনে হয়, কোন বিষয়েই চমকটা ভাল নয়। কিন্তু আপনি আশা করি অনুমান করতে পারেন, মানুষের অন্তর্স্রোতের মধ্যে একটা নাটক ঘটে, যেটা কেউ দেখতে পায় না, তাকে প্রকাশ করাও কঠিন। সেই নাটকটাই বোধ হয় জীবননাট্য। জীবননাট্য কোন অদ্ভুত আর উচ্চকিত কতগুলো ঘটনার ওঠা নামা মাত্র নয়। আমার ভিতরে একটা সেরকম অদ্ভুত নাটকই ঘটেছিল। তবে জীবনটা যে নানান বিস্ময়কর অনুভূতিতে ভরা, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমি নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

'কলকাতায় থাকলে, বিকেলের দিকে প্রায়ই একটু এদিক ওদিক বেড়াতে যেতাম। প্রায় সারাদিনই আমার বাড়ি থাকা অভ্যাস ছিল। কিন্তু বেলা পড়ে এলে, আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারতাম না, তা সে দেশেই হোক, আর বিদেশেই হোক। পাখীদের সঙ্গে এখানেই আমাদের তফাত, বেলা পড়ে এলে তারা ঘরে ফেরে, আমরা বাইরে যাই। আর সেটাই তো মনুষ্যত্বের গর্ব যে, তারা উদয়াস্তের আলো অন্ধকারকে এবং দূরত্বকে জয় করেছে।

'যাই হোক, এরকমই একদিন, কী খেয়াল হল, একটু দক্ষিণেশ্বরের দিকে বেড়াতে গেলাম। এ ঘটনা প্রায় পাঁচ বছর আগের। গাড়িটা রেখে আমি হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারের দিকে গেলাম, সেখান থেকে মন্দিরের চত্বরে। সেদিন কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। সময়টা শরতকাল, এখনো মনে আছে। বৃষ্টিধোয়া শরত-কালের আকাশের বর্ণনা দিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি বাঙালীর ছেলে, কখনো না কখনো, আপনি নিজেও সেই রূপে মুগ্ধ হয়েছেন।

'কিন্তু সেদিন, শুধুমাত্র আকাশে ধোঁয়া ছিল না, প্রায় শেষ বেলায়, পশ্চিমের আকাশে কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়ে লাল রঙ পড়ে এমন বিচিত্র রঙবাহার হয়েছিল, যেন গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে অমন একটা আকাশ দেখতে পাওয়া মানবজন্মের পরম সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছিল। আমি কবি কিনা জানি না, আমি যদি কবি, তবে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যেই সেই কবি বাস করেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ওইরকম আকাশ দেখলে, আমার মধ্যে বরাবরই একটু ভাবাবেগ দেখা দেয়, যে কারণে দাদা বৌদিরা আমাকে ক্ষ্যাপাতেন। সে ভাবাবেগটাও এমনই, আমার ভিতরে কী হয়, জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার চোখ থেকে জল এসে পড়ে। পাঁচ বছর আগে সেদিনও আমার তাই এসেছিল। আমি ঘাটের দিক থেকে ঘুরে এসে, চত্বর পেরিয়ে, পশ্চিমদিকে যে শিব-মন্দিরগুলো আছে, তার বারান্দায় উঠেছিলাম, এবং মন্দিরের পিছনে গিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। সেদিন যেন, আকাশের রঙের তীব্রতাটা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু এমন একবারও মনে হয়নি, চাকলা চাঁকলা রক্তাক্ত মাংস কেউ আকাশে সেঁটে রেখেছে বা যক্ষ্মারুগীর বুকের রক্তের মত আকাশটাকে আমার একবারও মনে হয়নি। বরং একটা আশ্চর্য উজ্জ্বলতা ছিল, যে উজ্জ্বলতায় মনের ভিতরটা এক অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে। আর কোন এক অজানা কারণে চোখে জল এসে পড়ে।

'এ কথা শুনে অনেকে হয়তো মনে করবে, আমার প্রাণে কোন ক্ষত ছিল। কিন্তু সত্যি বলছি, তখনো পর্যন্ত আমার প্রাণে কোন ক্ষত তো দূরের কথা, কোন আঘাতও

পাইনি। যাকে বলে একেবারে টাটকা খাঁটি বেদাগী প্রাণ, তাই ছিল। তবু আমার মধ্যে একটা আবেগ আসতো।

'আমি আকাশ দেখছিলাম। গঙ্গার পশ্চিম পাড় থেকে, মাঝামাঝি পর্যন্ত জলও আকাশের রঙে মিশে গিয়েছিল। কয়েকটা নৌকা চলাচল করছিল, অধিকাংশই জেলেদের ডিঙা। আমার গায়েও আকাশের রঙ লেগেছিল, সবখানেই লেগেছিল, এমন কি গাছে গাছে, পাতায় পাতায়। দুর্বাঘাসের ওপরেও।

'দেখতে দেখতে আমি একটু উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিকটায় কয়েকটা গাছপালা রয়েছে। উদ্দেশ্য নিজেকে আরো একটু নিবিড় করে নেওয়া। কিন্তু, কিছুটা গিয়েই আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমি যেখানটায় যেতে চেয়েছিলাম, সেখানে আগেই একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখও পশ্চিম দিকে, দৃষ্টি সেই রাঙা আকাশের প্রতি। আমার আসাটা সে একেবারেই টের পায় নি, এমনই আত্মমগ্ন হয়ে সে পড়ন্তবেলার আকাশ দেখছিল।

'যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে একটি মেয়ে। ভেবে দেখতে গেলে, ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনব নয়। একটি মেয়ে, শিবমন্দিরের পিছনে দাঁড়িয়ে, নিতান্তই সূর্যাস্ত দেখছিল। কিন্তু, আমার মনে হল, এমন অপরূপ সৌন্দর্য আর পবিত্রতা যেন কোনদিন দেখি নি। ওই যে সেই একটা গান আছে না, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' ঠিক সেইরকম। তা শুধু সুন্দর নয়। পবিত্র নয়, মধুর, এবং তার কোন শেষ নেই।

'মেয়েটি সুন্দর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। রঙটা টকটকে নয়, ফর্সা রঙের মধ্যে অনেক সময়ে একটা স্নিগ্ধতা থাকে, সেইরকম। নাকটি টিকলো, চোখ দুটি ডাগর বললেই সব বলা হয়ে যায় না। ডাগর, কিন্তু টানাটানা, এবং কোন কোন চোখের দিকে তাকালেই যেমন মনে হয়, এ চোখে অনেক ভাব, অনেক কথা, তারও সেই রকম। চোখে তার কাজল ছিল না, চুলে তেল না, বিনুনী না, মাঝখানের সিঁথির দুপাশ দিয়ে পিঠে এবং ঘাড়ে ছড়িয়েছিল। তেমন বাতাস ছিল না, চুল বা শাড়ি তার এলোমেলো হচ্ছিল না। মুখে কোন প্রসাধনের প্রলেপ ছিল না, অলঙ্কারের মধ্যে, খুবই সাধারণ কানে দুটো সোনার রিঙ। দু হাতে দুই রুলি। শাড়ি জামাও খুবই সাধারণ ছিল, কিন্তু সেই মোটা সোটা হাল্‌কা বাসন্তী রঙের, লাল পাড় শাড়ি আর ওই রঙেরই জামায়, তাকে অপরূপই লাগছিল। আসলে, তার স্বাস্থ্যটি ছিল নিটোল, নিটুট, শরীরের গঠন ছিল দীর্ঘাঙ্গী।

'জীবনে সুন্দরী মেয়ে যে দেখিনি, এমন নয়। বলতে গেলে, পৃথিবীর অনেক সুন্দরী মেয়েকেই দেখেছি, এবং আমাদের বাড়ির অন্তঃপুরকেও সুন্দরীদের রাজ্য বলা যায়, কারণ বৌদিরা সকলেই একটু বাছাই করা সুন্দরী ছিলেন, সেরকম দেখেই তাঁদের সন্ধান করা হয়েছিল। কিন্তু, দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দিরের পিছনে যে সৌন্দর্য আমি দেখেছিলাম, তা আর কিছু, যা রূপের থেকে বেশী, দেহের সৌন্দর্য থেকে বেশী। আমি চোখ ফেরাতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার পক্ষে যেটা একেবারেই অভাবনীয়, কোন অচেনা মেয়ের দিকে, সব কিছু ভুলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকা। এমন আর কখনো হয় নি বলেই, আমার সমস্ত প্রাণ জুড়ে তখন সেই অন্তস্রোতের নাটক শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার বুকের ভিতরে এক আশ্চর্য দোলা, আমি যেন শুনতে পেলাম,

boiRboi.net

আমার ভিতর থেকে কেউ বলে উঠছে, "কে, এ কে, এ কে ?"

'আমি বুঝতে পারলাম, যে প্রকৃতির মধ্যে আমি সারা জীবন সৌন্দর্য দেখে এসেছি, ভাবাবেগে হেসেছি কেঁদেছি, সে প্রকৃতি ছিল অসম্পূর্ণ, তার পূর্ণরূপ কখনো দেখিনি। সেইদিনই দেখলাম, সেইদিনই বুঝলাম, প্রকৃতির যে ফাঁকটুকু ছিল, মেয়েটি সেই ফাঁক জুড়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বারেবারেই আমার শালীনতা বোধকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। যেমন করে আকাশ ও প্রকৃতি দেখি, তেমনি করেই তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, এবং জীবনে অনুভূতির যে জায়গাটা কখনো কোন কারণেই নাড়া খায় নি, সে জায়গাটাই আমার দুলতে আরম্ভ করছিল। তার মানে, আমার মধ্যে নাটক শুরু হয়েছিল, আমার জীবননাট্যের প্রথম দৃশ্যের শুরু।

'কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম জানি না। মেয়েটির মুখে আকাশের আলো লেগেছিল। উজ্জ্বল নয়, একটা গাম্ভীর্য কিছুটা বিষণ্ণতার ছোঁয়াই ছিল যেন। আমার মনে হয়, মানুষ না দেখলেও, তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোথাও একটা জায়গা হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে, সে অনুভব করে, কে যেন তাকে দৃষ্টি দিয়ে ধরে রেখেছে। মেয়েটিরও যেন হঠাৎ সেইরকম হল। সে আমার দিকে ফিরে তাকাল। তাকিয়ে, কয়েক মুহূর্ত যেন লাগল তার বুঝতে, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, এবং সে একজন পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি বলতে কি, আমি যদি ঠিক দেখে থাকি, তা হলে বলব, চমকানো বা বিরক্তি, কিছুই তার চোখে তখন ছিল না, বরং, বিস্ময়-এবং-হ্যাঁ একটা মুগ্ধতাই যেন দেখেছিলাম। সেইভাবে কয়েক মুহূর্ত থাকবার পরেই, হঠাৎ সে মাথা নত করেছিল, তার মুখ আরো লাল হয়ে উঠেছিল। সে চোখ তুলে চকিতে আর একবার আমাকে দেখেছিল, আমি চোখ ফেরাতে পারিনি তখনো। আমার দিকে তাকিয়ে আবার চোখাচোখি হতেই, তার চোখে একটি সন্দিগ্ধ ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, সে উত্তর দিকে পা বাড়িয়েছিল।

'আমার মনে হল, চোখের সামনে থেকে আমার আলো চলে যাচ্ছে, আমার জীবন পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। জীবনে যা কখনো করিনি, কোন অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে যেচে কথা বলা, তাই করে ফেললাম, বলে উঠলাম, "আপনি আমার ওপর বিরক্ত হন নি তো ?"

'সে থমকে দাঁড়ালো। আশা করতে পারে নি, আমি কথা বলে উঠব। তাই খানিকটা অবাক ও বিব্রত হয়ে বলল, "ওহ্, না না, বিরক্ত হব কেন ?"

'কথাগুলো সে আমার দিকে তাকিয়ে বলেনি। লজ্জা বোধ করছিল, বুঝতে পারলাম। কথা কয়টি বলেও সে আবার চলতে আরম্ভ করেছিল। আমি আবার না বলে উঠে পারিনি, "যদি কিছু মনে না করেন, দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?"

"বলুন।" বলে সে আবার দাঁড়িয়েছিল।

'আমি বলেছিলাম, "দেখুন, আপনার দিকে যে ভাবে তাকিয়েছিলাম, আমার নিজের শালীনতা বোধ থেকেই বলতে পারি, সেটা ঠিক উচিত হয় নি। কিন্তু বিশ্বাস করবেন, না তাকিয়ে পারি নি।" এ কথা বলার পর, সে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। তখন তার চোখে অনেকটা সরলতা এবং জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে। আমি আবার বললাম, "আমি যদি আপনার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞেস করি, আপনি কি তাতে রাগ করবেন।"

boiRboi.net

'সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, "রাগ করব কি না, জানি না, অচেনা কোন লোককে আমি কেন তা বলব, বুঝতে পারছি না।"

'তা ঠিক, এমন পরিচ্ছন্ন সরল জবাব পাওয়াও দুরূহ, এবং সেটাই স্বাভাবিক। তার কথার ভেতর থেকে, আমি যেন তার মন ও চরিত্রের খানিকটা সন্ধান পেলাম। বললাম, "ঠিকই বলেছেন, আমারই অন্যায় হয়েছে, আমার পরিচয়টা আপনাকে আগে দেওয়া উচিত, অবিশ্যি তার থেকে ধরে নেবেন না আমি কেউকেটা কেউ।" বলে আমি আমার নাম-ধাম সবই বলেছিলাম, এবং মেয়েটি, কতই বা তার বয়স তখন, আঠারো উনিশের বেশী নয়, একটু হেসে উঠে বলেছিল, "ধন্যবাদ! আমার নাম দীপালিকা।"

'এর বেশী আর একটি কথাও সে বলে নি। পদবী নয়, পরিচয় নয়, ধাম নয়। নামটা বলেই সে পিছনে ফিরে চলে গিয়েছিল। আমি ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারি নি। তখন আমার আজন্ম রুচি ও সংস্কার যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল। যে কথা বলতে চায় না, তাকে জোর করে কখনো কথা বলানো যায় না। বিশেষতঃ যেখানে দুজনেই পরস্পরের অচেনা, এবং দুজনেই একটা বিশেষ বয়সের ছেলে মেয়ে। অবিশ্যি মেয়েটি আমার থেকে বেশ খানিকটা ছোটই বলতে হবে, তুলনায়, তার থেকে আমার বয়স কম করে দশ বেশী হবে।

'দীপালিকা নামে সেই মেয়েটি চলে যাবার পর আমার চোখের আলো যেন চলে গেল। সেই বোধহয় জীবনে প্রথম, প্রকৃতির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকতে ভুলে গেলাম। আমার আর কিছুই ভাল লাগল না, আকাশ না, গঙ্গা না। মেয়েটি যেন প্রকৃতির বুক থেকে সব রঙ রূপটুকু শুষে নিয়ে চলে গেল। বেশ খানিকক্ষণ তারপরেও দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু সেই মুখখানি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলাম না। আর জীবনে সেই প্রথম, বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে এল, যে দীর্ঘশ্বাসের কথা আমার জানা ছিল না।

'আমি মন্দিরের বাইরে চলে এলাম। আসতে আসতেও চারপাশে বারে বারে তাকালাম, যদি তাকে দেখতে পাই। সেখানে কোথাও তাকে দেখতে পাই নি। আমি বাইরে এসে গাড়িতে উঠেছিলাম, আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলাম, সঙ্গে কেউ ছিল না। কিছুদূরে আসার পর, আমার সামনে পড়ল একটা ঘোড়ায় টানা পালকী গাড়ি। কিন্তু গাড়িটা কলকাতার নেহাত সেই ছ্যাকরা গাড়ি নয়। কালো রঙের গাড়িটা বেশ ঝকঝকে চকচকে, এবং একটা বেশ বড় বাদামী রঙের ঘোড়া সেটা টানছিল। ঘোড়াটার সাজসজ্জাও বেশ ভাল ছিল, চোখের ঠুলির চামড়া বেশ চকচকে, পিতলের শিরস্ত্রাণটিও বেশ ঝকঝকে, কেশরগুলো কদম ছাঁটে ছাঁটা। ঘোড়াটা কদম চালে চলছিল না, দুলকি চালেই বলা যায়, কারণ, বরানগরের রাস্তায় তখন বেশ ভিড়। আমার পক্ষে পাশ কাটানো সম্ভব ছিল না, যদিও বারকয়েক হর্ন দিয়েছিলাম। কিন্তু খানিক বাদেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, মনে মনে ভেবেছিলাম কে এক আদ্যিকালের সেকেলে বড়লোক চলেছেন, তিনি পথ ছাড়ছেন না। খুব ঘন ঘন হর্ন দিয়ে, গাড়িটাকে পাশ কাটাবার জন্যে, আমি হঠাৎ, বেশ বিপজ্জনকভাবেই, বাঁ দিকে অনেকখানি পাশে ঢুকে পড়েছিলাম। দীপালিকা গাড়ির মধ্যে বসে আছে। তাকে দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম, কারণ তার দেখা পাব, আশা করতে পারি নি।

boiRboi.net

আমার পাশ কাটার ভঙ্গিতে সে বিরক্তি বোধ করছিল। তারপর গাড়িতে আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমটায় অবাক হয়েছিল। জানি না, আমার মুখে বোধহয় একটু হাসি ফুটে উঠেছিল, এবং সব মিলিয়ে সে বোধহয় আমাকে ভুল বুঝেছিল, আমি হয়তো তাকে অনুসরণ করছি। সে হঠাৎ তার গাড়ির দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি পাশ কাটাতে না পেরে পেছিয়ে এসেছিলাম। আমারও একটু রাগ হয়েছিল। এতটা বাড়াবাড়ি করবার কী আছে? মানুষ হয়ে কি, মানুষ চেনা যায় না? আমি কি ঠিক ততটাই অভদ্র যে একটি অনিচ্ছুক মেয়েকে অনুসরণ করব?

'কিন্তু সত্যি বলতে কি, সেটা অভদ্রতা কিনা জানি না, আমি সত্যি সত্যি তাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছিলাম। কারণ আমার মন মানে নি। আমার জানতে ইচ্ছা করছিল, সে কোথায় থাকে, কাদের বাড়ীর মেয়ে, কী তার পরিচয়। তবে, গাড়োয়ানটার ব্যবহারে আমি সত্যি চটেছিলাম, এবং একবার কোনরকমে পাশ কাটিয়ে, অনেক মন্থর গতিতে, ওর সামনে সামনে চলছিলাম। ঘোড়াটা তাতে অস্বস্তি বোধ করছিল। একজস্টের ধোঁয়াটাও তার খুব পছন্দ হচ্ছিল না। গাড়োয়ান চীৎকার করে বলেছিল, "এই মোটরওয়ালা বাবু! জলদি চালান।"

'তারপরই তার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে দীপালিকার সঙ্গে কথা বলছে। সে বলছিল, "হ্যাঁ দিদিমণি, সেই মোটর গাড়িটা। আগে আগে এমন আস্তে আস্তে চলেছে যে, ঘোড়া দৌড়ুতেই পারছে না।" নিশ্চয়ই দীপালিকা মুখ বাড়িয়ে দেখেছিল, আরো বিরক্ত হয়েছিল, রাগ করেছিল, কিন্তু তার করবার কিছুই ছিল না।

'কিন্তু ওদের গাড়িটা হঠাৎ বাঁক নিয়েছিল, টের পাই নি। আমি কাশীপুরের মধ্য দিয়েই চলে যাবার কথা ভাবছিলাম। ওদের গাড়িটা বরানগর বাজারের কাছে বাঁয়ে যে রাস্তাটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেই রাস্তায় বেঁকে গিয়েছিল। আমার পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ না পেয়ে, পিছন ফিরে দেখেছিলাম, এবং গাড়ি ঘুরিয়ে, ওদের রাস্তা ধরেছিলাম। এবার আমি ইচ্ছে করেই অনেকটা দূরে ছিলাম। ওদের গাড়িটা বেশ জোরেই চলছিল।

'বড় রাস্তায় পড়ে, ওদের গাড়ি দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ কলকাতার দিকে কিছুটা গিয়ে, বড় রাস্তার ধারেই, পূর্বদিকে একটা মস্তবড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। বাড়িটার সামনে অনেকখানি জায়গা, যেখানে গোটা কয়েক বড় বড় গাছ ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে। কয়েকটি আম গাছ ছাড়াও, দুটি বড় দেবদারু ছিল। ঠিক তেমন সাজানো গোছানো বাগান না হলেও, গুটি কয়েক গোলাপ গাছ, কিছু জুঁই বেল ফুলের ঝাড় রয়েছে। গেটের সামনে বেশ বড় রকমের মাধবীলতার ঝাড় বেঁধে উঠেছে। খুব পুরনো নয়, এরকম একটা দোতলা বাড়ি একটু ভিতরে, গাছপালার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। বাড়িটাকে যেন ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

'গেটটা বন্ধ ছিল। কোচোয়ান তার আসন থেকে নেমে গেট খুলে দিতেই, ঘোড়া নিজেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল।

'দীপালিকা গাড়ি থেকে, সোজা বাড়ির মধ্যে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কী মনে করে সে একবার রাস্তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ঠিক সে সময়েই তার চোখ আমার

boiRboi.net

গাড়ির মধ্যে পড়ে। সে আশা করে নি, আমি তখনো আছি। ভেবেছিল, আমি চলে গিয়েছি। আমার ভীষণ লজ্জা করছিল, কিন্তু, একটা কথা মানতেই হবে, সময়ে সময়ে প্রাণ বড় নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। তখন সে আর কোন কিছু মানতে চায় না। আমি দেখলাম, রাগে ও বিদ্রূপে, ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর ধিক্কার ও বিদ্রূপ কটাক্ষ দেখে আমি আর দাঁড়াই নি, সোজা চলে গিয়েছিলাম।'...

* * *

শুভেন্দুনারায়ণ থামলেন। এমনভাবে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন তাঁর কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি সেই যে চলে গিয়েছিলেন, যেন আর কখনো ফেরেন নি। বাইরের অন্ধকার প্রকৃতির মধ্যে যে-আলো ঘরের মধ্যে এসে, নিবিড় অন্ধকার হাল্কা করেছিল, তার মধ্যেই দেখা যায়, তিনি দু হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়েছেন। টাইমপীস্-এর টিক্ টিক্, ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যেতে থাকে। আর রেডিয়মের নিষ্পলক চোখ, যেন ডাক্তারের চোখের মতই তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপরে সম্ভবতঃ ডাক্তারের সন্দেহ হয়, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। তাই খুব দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে সে ডাকে, 'মিঃ হালদার! স্যার—।'

তৎক্ষণাৎ তাঁর গলা শোনা যায়, 'আমি ভাবছিলাম ডাক্তার। সেই যে দীপালিকার ধিক্কার ভ্রূকুটিবিদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলাম, সেখানেই সমস্ত ঘটনার যদি অবসান হত, তা হলে কেমন হত। তা হলে তো আমাকে জীবনের এই পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে হত না। এমন পরিণতি ভোগ করতে হত না।...না না, সে জন্যে আমি ভাগ্যকে ঠিক দোষ দেব না। ভাগ্য কী? ভাগ্য তো আসলে আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি। একটু মনোযোগ দিয়ে যদি চিন্তা করি, তবে আপন অবচেতনের দিকে ফিরে তাকালেই তো হয়। আপনি ডাক্তার মানুষ, নিশ্চয়ই বুঝবেন। কারণ বিজ্ঞানের মূল্যই আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী। মনে করুন একজন, ঈশ্বর ভজনের জন্যে বনে চলে গেল। সারা জীবনব্যাপী সে ঈশ্বরকে ডেকেও, দেখা গেল হয় তো বৃদ্ধ বয়সে একটি বনবালাকে বিয়ে করে দিব্যি সংসারী হয়ে বসে আছে। সবাই বলবে, ঈশ্বর তার ভাগ্যে ছিল না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলবে, তার অবচেতনে নারীর সান্নিধ্য লাভের জপতপই আসলে ছিল। ফলে সারা জীবনব্যাপী সে যে তপস্যা করছিল, তা ওপরের, ভিতরে ঢুকতে পারে নি। ভিতরে একটি বনবালা যুবতী ঈশ্বরের ন্যায় লীলা করছিল।

'অতএব, আমারই বা সেই ফিরে যাওয়াতেই অবসান হবার উপায় কী ছিল। আমার অবচেতনে যে ক্রিয়া শুরু হয়েছিল, সেই তো আমার নিয়তি। আমার সেই নিয়তিই আমাকে পরিচালনা করছিল।

'তাই চলে গেলে কী হবে আমি সেই মুখ ভুলতে পারছিলাম না। সহসা কাউকে কিছু বলতেও পারছিলাম না। রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না, কেবলি ভাবতে লাগলাম, "ও কে, কাদের মেয়ে?" আর নামটা বারে বারেই উচ্চারণ করতে লাগলাম, "দীপালিকা, দীপালিকা"...

'পরদিন সেই সময়ে আবার আমি দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। ভাবলাম, হয়তো রোজই মেয়েটি ওই সময়ে ওখানে বেড়াতে যায়। কিন্তু সে ভাবনা আমার ভুল, তার কোন চিহ্নও ছিল না সেখানে।

boiRboi.net

'বোধহয়, ধবধবে সাদা কাপড়ে হঠাৎ বড় রকমের কোন দাগ পড়ে গেলে, সেটাকে যেমন কোনরকমেই লুকানো যায় না, আমার এতদিনের বেদাগী মন প্রাণের অবস্থা সেরকমই হয়েছিল। ব্যাপারটা কিছুতেই লুকানো যাচ্ছিল না, আর বড় বেশী খচ্ খচ্ করছিল। যে কারণে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা একটা যন্ত্রণার মত লাগছিল, একটা অসুখের মত, যে অসুখে আমি কখনো ভুগি নি। অনেক দিনের শুকনো খটখটে জ্বালানি যেমন খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে, যে জ্বালানিতে কখনোই কোনরকম জল পড়ে নি, ভেজা জায়গায় পড়ে থাকে নি, আমি ঠিক সেইভাবেই পুড়তে লাগলাম। আমার দেশ-দেশান্তর, এত মানুষ দেখা, সব যেন মুহূর্তেই ডুবে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল, অমন আর দেখি নি, ভুলতে পারছি না। সেই মুখ আমার মনে পড়তে লাগল বারে বারে। ডাক্তার, আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি একটি তরুণী মেয়ের যৌবনের যাদু লাগা সুন্দর মুখখানির জন্যেই ভুলতে পারছিলাম না। কিন্তু সে কথা আপনাকে আগেই বলেছি, সুন্দর মুখ আমি অনেক দেখেছি। সুন্দরী যুবতী, নিটুট নিখুঁত দেহিনীও অনেক দেখেছি। এখানে, সেই প্রকৃতিগত সৌন্দর্যের অধিক কিছু ছিল। সেই রক্তাভ মেঘের আলোয়, নিরালায় যে মুখ আমি দেখেছিলাম, তার মধ্যে অন্য কিছু ছিল। অন্য এক অভিব্যক্তি, যার মধ্যে এক বেদনা বিধুর হৃদয়ের ছায়া পড়েছিল। কিংবা আমি ব্যাখ্যায় অক্ষম। কেন সেই মুখ ভুলতে পারছিলাম না।

'সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েও আমি শিবমন্দিরের পিছনে, গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। দীপালিকা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাতে আমার কষ্ট আরো বেড়ে উঠল। অস্থিরতা আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠল। প্রকৃতির আর নিজের মধ্যে ওরকম শূন্যতা যেন আর বোধ করি নি কখনো। সেই শূন্যতাই যেন আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এল। আমি গাড়ি নিয়ে, বরানগর দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম, এবং সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'আশ্চর্য, আমি একবারও আমার পারিবারিক সম্মানের কথা ভাবলাম না, নিজের সম্মানের কথা ভাবলাম না, একটি মেয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ করার জন্যে, আমি শুভেন্দুনারায়ণ হালদার, যা একেবারেই অভাবিত অসম্ভব ছিল, সেই বাড়ির গেটের কাছে গাড়ি দাঁড় করালাম। দরজা খুলে নামলাম। অবিশ্যি, সে ক্ষেত্রে, আমার মনের মধ্যে একটি মাত্র কৈফিয়তই ছিল, আমি তো দুশ্চরিত্র বা লম্পট নই। আমি অবিবাহিত পুরুষ, এবং আমি এসেছি কোন সম্মানজনক শর্তের কথা চিন্তা করেই।

'দেখলাম, সেখানে কেউ নেই। গেটে দারোয়ান বা আশেপাশে কোন চাকর, কাউকেই দেখতে পেলাম না। কেবল দূরে স্তিমিত একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম ঘুঙুরের, তার সঙ্গে ক্ষীণ সারেঙের সুর এবং তবলার আওয়াজও একটু একটু পাচ্ছিলাম। তাতে মনে হল, দোতলার কোন অংশে, কেউ যেন নাচছে।

'গেটের সামনে গাড়িটা রেখে, গেট খুলে ভিতরে ঢুকলাম। বাড়িটা একটু ভিতরে। কিন্তু পাঁচিলের আড়াল পড়ায়, সেদিন দেখতে পাই নি, ভিতরে ডান দিকে ছোট একটি একতলা ছোট্ট বাড়ি রয়েছে। বাঁ দিকে, উত্তরের পাঁচিল ঘেঁষে রয়েছে, আস্তাবল। সেখানে আমি গাড়িটা দেখতে পেলাম। ঘোড়াটা হয়তো বন্ধ রয়েছে।

boiRboi.net

সেদিকেই চাকরবাকরদের ঘরও রয়েছে। আমি চুকে, সোজা দোতলা বাড়ির দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন মধ্যবয়স্ক লোক কোথা থেকে এগিয়ে এল। বোধহয় ডান দিকের একতলা বাড়ি থেকেই এল। তার চাউনিতে ভ্রূকুটি, সন্দেহ এবং বিরক্তি। কথা বলল, গলার স্বর রুক্ষ বটে, উঁচু নয় একেবারেই। বলল, "কী চান আপনি? জানেন না, মা এ বাড়িতে কারুর সঙ্গেই দেখা করেন না।"

'মা? মা আবার কে, আমি বুঝতে পারলাম না। লোকটাকে নেহাত চাকর দরোয়ান বলে আমার মনে হল না। তার থেকে আলাদা কিছু এবং মা যিনিই হোন, তাঁর কথা বলতে লোকটির গলায় রীতিমত শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। দীপালিকাকে কি এরা মা বলে, না কি আর কেউ আছেন?

'আমি বললাম, "দেখুন মা কে আছেন, তা তো আমি জানি না। এ বাড়িতে দীপালিকা দেবী আছেন, আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি।"

'লোকটি আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে রইল, তারপরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথা থেকে আসছেন।"

'বললাম, "কলকাতা থেকেই। আমার নাম শুভেন্দুনারায়ণ হালদার। বোধহয় এই বললেই তিনি চিনতে পারবেন। একটু ডেকে দেবেন দয়া করে?"

'লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি রুমির কলেজের ছেলে?"

আমাকে তখনো ছেলে বলায় একটু অবাকই হয়েছিলাম। অন্ততঃ কলেজের ছেলে বলার কোন কারণই ছিল না। এবং রুমি কে, তাও ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না। হতে পারে, দীপালিকার এটা ডাক নাম। কিন্তু রুমির কলেজের ছেলে নই, একথা সোজাসুজি বলতে পারলাম না। পাছে সেই কারণেই লোকটি আমাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দেয়। অথচ মিথ্যে কথা বলতে আমি অনভ্যস্ত। তাই আমি বলেছিলাম, "আমি এখন আর কলেজে পড়ি না।"

'লোকটি কে, বা কী সম্পর্ক, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সে বলল, "ও তো এখন নাচ শিখছে, গুরুজী এসেছেন। তবু বসুন, আমি খবর পাঠাচ্ছি। নামটা কী যেন বললেন?"

'আমি আবার নামটা বললাম। লোকটি আমাকে সামনের বারান্দায় উঠে, সামনের ঘরেই বসতে দিল। সত্যি বলতে কি, বাড়িটি যে বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি, তখনই বুঝতে পারলাম, ঘরের সোফা-সেট আসবাবপত্রাদি দেখে। আমার যতই সাহস থাক, কার বাড়িতে এসেছি, কার মেয়ে দীপালিকা, কিছুই জানি না। এবং আমি কিছুটা অপমানিত হতে পারি, সে সম্ভাবনাও মনের মধ্যে ছিল। তার জন্যে আমি প্রস্তুতও ছিলাম, কারণ এ কথা আমার একবারও মনে হয় নি, আমি কোন পাপ করছি। আর যুগটাও এমন নয় যে, কোন মেয়ের সঙ্গে যেচে এসে আলাপ করা যাবে না। যদিও জানতাম, অধিকাংশ বাড়িতেই তা তখনো অসম্ভব।

'ইতিমধ্যে সেই ঘুঙুরের শব্দ থেমে গিয়েছিল, এবং আমি জানতেও পারি নি, দীপালিকা কখন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা আমার অনুমান হলেও পরে জানতে পেরেছিলাম, সে বেশ খানিকক্ষণ পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেছিল। তারপরে আমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠেছিল, "আপনি তো সেই ভদ্রলোক, যাকে

মন্দিরে দেখেছিলাম।"

'আমি প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দীপালিকাকে দেখেছিলাম। দীপালিকা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল। আমি বলেছিলাম "হ্যাঁ, আমি সেই লোকই।"

'দীপালিকার মুখ নত, গম্ভীর, ঘর্মাক্ত ছিল। লক্ষ করেছিলাম, তখনো ওর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছিল। সেদিন ওর চুল বিনুনী না করেই আঁট করে বাঁধা ছিল। প্রসাধন কিছুই ছিল না। বরং ওকে বেশ অগোছালই লাগছিল। মনে হয়েছিল, যেন গাছকোমর বাঁধা আঁচলটা সেইমাত্র খুলে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। কারণ আঁচলটা কোঁচকানো ছিল। ওর নত মুখ, নীরবতা দেখে, আমার ধারণা হয়েছিল, ও যেন কিছু ভাবছে, বোধহয় আমাকে কী বলবে, তাই ভাবছে।

'কাছাকাছি এসে বলেছিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

'মনে মনে কী যে কৃতার্থ বোধ করেছিলাম, তা বলতে পারি না, কারণ অতখানি ভদ্রতা বা বসতে বলা আমি আশা করি নি। বসেছিলাম, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। দেখেছিলাম, আমার সামনে সেই মূর্তি। জানি না কী চোখে তাকে মন্দিরে দেখেছিলাম, সেই পড়ন্ত বেলায়। সেই মুহূর্ত থেকে সে যেন আমার ভিতরের কোন এক অনাবিষ্কৃত দুর্জ্ঞেয় জায়গায় অবস্থান করছিল। বলেছিলাম, "আপনি বসবেন না?"

'দীপালিকা মুখ না তুললেও জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ, বসব।"

'বলে সে বসেছিল। তার মুখে হাসির লেশমাত্র ছিল না। চোখে ছিল নিবিড় সন্দেহের ছায়া। আমি তাকে আর ভাববার অবকাশ না দিয়ে নিজেই বলে উঠেছিলাম। "দেখুন, এই অজ্ঞাতপরিচয় লোককে আপনি হয়তো এবার জিজ্ঞেস করবেন—।"

'দীপালিকা গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিল, "আপনি অজ্ঞাতপরিচয় নন, আপনি আপনার নাম-ধাম দুটোই আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে আছে। আপনার বাবার নাম বোধহয় ইন্দ্রনারায়ণ হালদার?"

'তখন আমার অবাক হবার পালা, কারণ আমি আমার বাবার নাম তাকে বলি নি। নিজের নাম এবং বাড়ির ঠিকানাটাই একমাত্র বলেছিলাম। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি আমার বাবার নামটা জানলেন কী করে?"

"আপনি বলাতে এখন সঠিক জানলাম, তার আগে আন্দাজ করেছিলাম মাত্র। আমি গতকালই আপনার বাবার নাম শুনেছি। আপনি কোন পরিবারের ছেলে, আপনাদের পরিবার কত বড়, কিছু বৃত্তান্ত আমি গতকাল শুনেছি।"

"আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। দীপালিকা আবার বলেছিল, "সেই জন্যেই আজ যখন মৃণাল কাকা খবর দিলেন, আপনি এসে আমাকে খোঁজ করছেন, তখন না এসে পারলাম না। কারণ আমি ভাবতে পারি না, ইন্দ্রনারায়ণ হালদার বাড়ির ছেলে, পথে দেখা একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসবেন।"

'তার কথার মধ্যে বেশ একটু ব্যঙ্গ মেশানো ঝাঁজ, সন্দেহ এবং বিরক্তি। আমি তৎক্ষণাৎ না বলে পারি নি, "আপনি যদি আমাকে অপমান করতে চান, করতে পারেন কিন্তু তার আগে—।"

boiRboi.net

'দীপালিকা কি ভেবেছিল জানি না। সে চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে, একটু যেন চমকে উঠেই অনেকটা প্রতিবাদের স্বরেই বলে উঠেছিল, "না-না, এটাকে আপনি অপমান মনে করছেন কেন? ঠিক যা ঘটেছিল, আমি তাই বলছি।"

'আমি বলেছিলাম, "হয়তো ঘটনাটা ঠিক এ ভাবেই ঘটেছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য কার্যকারণগুলো একটু বিচার করে দেখলে, আপনি যে রকম ব্যাখ্যা করতে চাইছেন, তা নাও হতে পারে।"

'দীপালিকার ভিতরে যে একটি যুক্তিশীলা কঠিন মেয়ে ছিল, তা ওর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। বলেছিল, "আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি বোধহয়। আমি কেন ব্যাখ্যা করতে চাইব। বরং আমি বলতে চেয়েছিলাম, হালদার বাড়ির কোন ছেলেকে আমি মোটেই সে রকম ভাবতে পারি নি। পারি নি বলেই, অবাক হয়েছিলাম।"

"কী রকম?"

"এই যেমন ধরুন, রাস্তায় বেরুলে, যে সব ছেলেরা মেয়েদের পেছনে লাগে, পিছু পিছু ঘোরে, কটুকাটব্য ঠাট্টা ইয়ারকি করে, আপনি তা কী করে করবেন? তাই আমি গতকাল অবাক হয়েছিলাম, যখন অনুমান করলাম, আপনি সেই বাড়ির ছেলে।"

'আমি দীপালিকার চোখের দিকে তাকিয়ে, একটা অশান্ত আবেগ দমন করতে পারছিলাম না। যে আবেগ আমার গলার স্বরের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি যেন একটি খাঁটি দলিল তুলে ধরার মত, ওর চোখের দিকে চেয়ে বলেছিলাম, "বলুন তো, আমাকে কি আপনার তাই মনে হয়?"

'দীপালিকা আমার চোখের দিকে চেয়ে চকিতে চোখ নামিয়েছিল। সহসা কোন জবাব দেয় নি। আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বলুন, বলুন না। আপনি যদি তা মনেও করেন, আমি কিছু মনে করব না। কারণ আপনি আমাকে কতটুকুই বা চেনেন।"

'দীপালিকা আবার চকিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার সেই দৃষ্টিতে একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা ছিল। বলেছিল, "একটা সত্যি কথা বলবেন?"

' "নিশ্চয়ই বলব। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি মিথ্যা কথা বলি না। এখনো আমার সে প্রয়োজন হয় নি। বরং সেদিক থেকে আপনি আমাকে একটু শুচি-বায়ুগ্রস্ত বলতে পারেন। আমি মিথ্যা সহ্যও করতে পারি না।"

'দীপালিকা বলেছিল, "আপনি কি আমাকে আগে থেকে চিনতেন! আমি কে, কার মেয়ে, কোথায় থাকি, কোন পরিচয়?

'আমি বলেছিলাম, "আশ্চর্য, কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন জানি না। কিন্তু গত-কাল দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আপনাকে দেখার আগে পর্যন্ত, এ পৃথিবীতে আপনার মত একটি মেয়ে যে আছে, তার নাম যে দীপালিকা, সে যে এ বাড়িতে বাস করে, আমি তার কিছুই জানতাম না। আপনার কি একবারও সেরকম সন্দেহ হয়েছিল?"

'দীপালিকা সত্যি কথাই বলেছিল, "একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম না।"

"এখন?"

'দীপালিকা একটু যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। চোখ তুলে তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারে নি। তার মুখে একটু রক্তাভা দেখা গিয়েছিল। বলেছিল, "এখন সে

boiRboi.net

সব কিছুই মনে হচ্ছে না।"

'আমি না জিজ্ঞেস করে পারি নি, "কিন্তু আমি আপনার পরিচয় আগেই জেনেছি, এমন সন্দেহ আপনি করেছিলেন?"

'দীপালিকা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলেছিল, "না না, সে কথা আলাদা। আমার একটা কৌতূহল মাত্র।"…

'কথাটা যেন তেমন পরিচ্ছন্ন শোনায় নি আমার কানে। সে যেন কী একটা কথা বলতে চায় নি। একটু গোপন করার বা একটা অস্বস্তিকর অবস্থা মনে হয়েছিল। তারপরে সে বলেছিল "আপনার সম্পর্কে এখন আমার কোন ভুল বা সন্দেহ নেই।"…

'আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, "সে জন্যে সত্যি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। আমি আমার কথা বলতে খুব একটা জটিলতার সৃষ্টি করব না, সোজাসুজি বলতেই চেষ্টা করব, কারণ ঘুরিয়ে কথা বলবার মত আমার মনের অবস্থাও নয়। তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কি করে আমার পারিবারিক পরিচয়টা জানতে পারলেন?"

'দীপালিকা বলেছিল, "ঠিক মত এখনই মাত্র জানতে পারলাম, আপনি স্বীকার করার পরে। গতকাল যখন আপনাকে দেখলাম, আপনি গাড়ি নিয়ে, আমার ঠিকানাটা চিনে গেলেন, তখন খুবই রাগ হয়েছিল, বিরক্ত হয়েছিলাম। মাকে গিয়ে বলেছিলাম। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে লোকটি? আমি আপনার নাম বলেছিলাম, কোথায় বাড়ি, তাও বলেছিলাম। আমার মা খুব অবাক হয়ে আপনার বাবার নামটা উচ্চারণ করে বলে উঠলেন, সে কি, ছেলেটি ইন্দ্রনারায়ণ হালদারের বাড়ির ছেলে নাকি? তখন মায়ের মুখে বিখ্যাত হালদার বাড়ির কথা শুনলাম। তাতেই অবাক হলাম আরো বেশী, সে রকম বাড়ির ছেলে, কেন একটা অজানা অচেনা মেয়ের—"

'দীপালিকা যেন কথাটা লজ্জাতেই শেষ করতে পারে নি। এবং ওর গলায় ও সেইমাত্র নামিয়ে নেওয়া চোখে আমি একটা অপার কৌতূহলের ঝিলিক দেখতে পেয়েছিলাম। বলেছিলাম, "আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি। তার জবাবটা এতই কঠিন যে এক কথায় হঠাৎ বলতে পারছি না। তবে প্রথম কথাই আপনাকে বলতে পারি, গতকাল আমার জীবনে যা ঘটেছে, এই প্রথম তা ঘটেছে। আমি নিজেও জানতাম না, কোন একটি মেয়ের শুধু নামটি জানা ছাড়া কোন পরিচয় না পেয়েই তার সম্পর্কে জানবার জন্যে এতটা ব্যগ্র হয়ে উঠব। হ্যাঁ, আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। এর থেকে অন্ততঃ নিজেকে আমি এটুকু বুঝেছি, নিজেকে আমি চিনি না। কারণ, গতকাল যা করেছি, তার কোন সিদ্ধান্তই আমার ছিল না।"

'দীপালিকা ওর সেই টানা বড় বড় চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই চোখে অনুসন্ধিৎসা এবং বিস্ময়। তাকিয়েই কিন্তু ও আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওর প্রশ্নের জবাব ও পায় নি, ওর চোখ থেকে তখনো জিজ্ঞাসা যায় নি।

'আমি আবার বলেছিলাম, "এবার নিশ্চয়ই আমাকে বলতে হবে, কেন ওরকম আচরণ করেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই তাই জানতে চান?"

'দীপালিকা আর একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল। তার চোখে আমি সপ্রশ্ন কৌতূহল দেখতে পেয়েছিলাম। সে জানতে চায়। অথচ সত্যি বলতে কি, প্রেমের

boiRboi.net

কথা অনেক শুনেছি, বইয়েও পড়েছি। কিন্তু কী করে তা প্রকাশ করা যায়, তা জানতাম না। আমি যদি এক কথায় বলতে পারতাম, আপনাকে আমি ভালবেসেছি, তা হলে সবই মিটে যেত। কিন্তু আমরা কতগুলো সংস্কার মেনে চলি, কথা বলবার আগে ভাবি। অথচ কী বলতে হবে, তা জানতাম না। তাই, আমি যে অমন বেগে ছুটে গিয়েছিলাম, এক অদ্ভুত উন্মাদনা নিয়ে, তা যেন হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। আমার গলায় যে অত আবেগ ছিল, তা হঠাৎ কোথায় ডুবে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেন, আমি বোবা হয়ে রইলাম। আমার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, আন্দাজ করতে পারলাম। গলার কাছে কথা আটকে ছিল।

একটু পরে আমি, নিচু স্বরে থেমে থেমে বলেছিলাম, "সে বিষয়ে আপনাকে আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না। আমি জানি না, গতকাল আপনাকে মন্দিরের পিছনে দেখে হঠাৎ কী হল। কারণ আমার জীবনে আগে আর কখনো, সত্যি সে রকম কিছু হয় নি। তাই আমি বলতে পারব না। তবে…"

'এই পর্যন্ত বলে, আর একবার আমার গলায় কথা আটকে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে, প্রায় রুদ্ধ গলায় বলে উঠেছিলাম, "তবে আপনাকে আমার আরো দেখতে ইচ্ছা করছিল, এখনো যেমন করছে, এবং এখন মনে হচ্ছে, চিরদিনই করবে।"

'বলেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দীপালিকা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বলেছিল, "কী হল?"

'আসলে আমার অবচেতনে একটা ভয়ের চিন্তা এসেছিল। ভেবেছিলাম, আমার এতটা স্পষ্ট কথা হয়তো দীপালিকা সহ্য করতে পারবে না। আমাকে কঠিন রুষ্ট কথা কিছু বলবে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, বলেছিলাম, "আমি এবার যাই, হয়তো আমার কথা আপনার ভাল লাগে নি, কারণ কোন মেয়ের পক্ষেই তা লাগতে পারে না। একজন অপরিচিত পুরুষের কাছ থেকে এরকম শুনতে কে-ই বা চান।"

'দীপালিকা বলেছিল, "আপনি সত্যি বলছেন, এই ভেবেই আমি অকপটে শুনছি।"

'আমি বলেছিলাম, "তবু একজন মেয়ের পক্ষে এতটা শোনা—।"

'দীপালিকা একটু যেন হেসেছিল। আমার কথার মাঝেই বলেছিল, "মেয়েদের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল থাকতে পারে। তা ছাড়া, আমরা কি সত্যি আর অপরিচিত?"

' "আপনি কিছু মনে করছেন না তো আমার কথায়?"

' " এখনো সে সুযোগ আপনি আমাকে দেন নি।"

'আমি দীপালিকার, আমার বিষয়ে ওর মনোগত কথা জিজ্ঞেস করবার আগে, অন্য কথাই জানবার ইচ্ছা করেছিলাম। তাই বলেছিলাম, "আমার সব শেষের জিজ্ঞাসাটা কী হবে, বুঝতে পারছি না। তার আগে, অন্য দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

' "বলুন।"

' "তবে এবার বলুন একটা কথা, আপনার বাবার নাম কী?"

'দীপালিকার মুখ এবার একটু গম্ভীর হল। মুখে ছায়া ঘনাল। একটু সময় চুপ করে রইল, তারপরে বলল, "তিনি জীবিত নেই, মারা গিয়েছেন অনেকদিন। আমার জন্মের বছর খানেকের মধ্যেই। তাঁর নাম ছিল মুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায়।"

boiRboi.net

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার অভিভাবক কে?"

'এই প্রশ্নের জবাব দিতেও যেন দীপালিকা দ্বিধা করেছিল। একটু থেমে বলেছিল, "আমার মা।"

'আমি তখনো দাঁড়িয়েছিলাম, কী বলব, বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হয়, দীপালিকা আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, আমি কী জন্যে ওর খোঁজ খবর করছি। আমি ওকে দেখে, কুমারী অনূঢ়াই ভেবেছিলাম কিন্তু আমার খোঁজ খবর নেবার ব্যাপারে, ওকে উৎসাহিত দেখলাম না, এমন কি কোন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা, কিছুই না। ও আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। আমি আবার বলেছিলাম, "আপনি আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন না তো?"

'বলেছিল, "না, কিন্তু আপনি আমার অভিভাবকের খোঁজ কেন করেছেন, তা যদি জানতে পারতাম—।"

'আমি সহসা জবাব দিতে পারি নি। তবে, অনেক সময়, মুখচোরা লাজুক মানুষ মদ খেলে যেমন তার মুখ ফুটে যায়, আমার তখন সেই রকমই হয়েছিল। আমি যেন মদ খেয়েছিলাম। যদিও সত্যি তখনো মদের স্বাদ আমি জানতাম না। আমাদের বংশ বা পরিবারে মদ যে একেবারেই অস্পৃশ্য বা অনাস্বাদিত ছিল, তা নয়। বর্তমানেও নয়। দাদাদের সকলেরই একটু আধটু পান চলে। সেটা নিতান্তই সংহত ভোগের মধ্যে যেটুকু হয়। অসংযত উচ্ছৃংখলতা কখনো দেখা যায় নি। যার সম্ভাবনা ছিল খুবই। বাদ ছিলাম মাত্র আমিই। অথচ নানান দেশ-বিদেশ আমি ঘুরে এসেছি, অভ্যাসটা আমারই হতে পারতো। এক বছর আগেও জানতাম না, আমি এরকম মদ্য পান করব। তবু আমার ভিতর থেকে কথা আপনিই বেরিয়ে এসেছিল। অনেকটা প্রলাপের মতই বলেছিলাম, "আমি অবিশ্যি, এক পক্ষ থেকে, এক তরফা কথাই বলে যাচ্ছি। এটা এক ধরনের অভব্যতা বলেই মনে হচ্ছে আমার। কারণ, এই একটা ক্ষেত্রে, একতরফা ডিক্রী চলে না, কী বলেন?"

'দীপালিকা কিছুই বলে নি। সে যে আমার কথাটা সঠিক বুঝতে পেরেছে, তা আমি ধরতে পারছিলাম না। সে জন্যে ভিতরে ভিতরে আমি যথেষ্ট উদ্বেগ ও কুণ্ঠা বোধ করছিলাম। সে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

'আমি আবার বলেছিলাম, 'তবে ডিক্রীটা হয়তো পরেই হবে। অন্ততঃ আমার নিজের পক্ষের কথাটা না বলে পারছি না। কারণ আমি আমার নিজেকে চিনতে পেরেছি।"

'আমার কথা শুনে, দীপালিকা মুখ তুলে তাকিয়েছিল। ওর চোখে আমি একটু বিস্ময়ের জিজ্ঞাসু ঝিলিক দেখেছিলাম। বলেছিল "আপনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন, মানে—?"

'কথাটা সে শেষ করে নি। কারণ, আমার কথাটা তার কাছে খুব স্পষ্ট বোধ হয় নি। বলেছিলাম, "চিনতে পেরেছি বলতে এই বোঝাতে চাইছি আমি, একটা কিছু সিদ্ধান্তের আগে নিজের সঙ্গে যতটা বোঝাপড়া করা দরকার, ততটা আমি করেছি। সেই হিসাবেই আমি বলছি, আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। তাই আমি—।"

'কথা শেষ না করে আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। জানি না, আমার মুখে

তখন কী ভাব ছিল। আমার চোখে তখন দৃষ্টির কী ভঙ্গি ছিল। মনের মধ্যে ছিল একটি মুগ্ধ-আবেদন। আর দীপালিকাকে দেখে, তার মনের ভাব বুঝতে পারার চেষ্টা। দেখছিলাম, আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই, দৃষ্টি নত করেছিল দীপালিকা। ওর মুখে একটা চকিত লজ্জার রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মানে—তার মানে, ও বুঝতে পেরেছিল আমার মনের কথা। আমি যদি তেমন অভিজ্ঞ হতাম, তা হলে আমার বোঝা উচিত ছিল, একজন পুরুষকে—সেই বয়সের একজন পুরুষকে, ওইরকম অবস্থায় দেখলে, কোন মেয়ের পক্ষেই কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় না। সম্ভবতঃ মেয়ে মাত্রেরই সে ক্ষমতা আছে, মানুষকে তারা বেশী চিনতে পারে। যদিও নিজেও সে মানুষ, তবু একটা জিনিস তাদের পুরুষের থেকে অধিক, তারা মানুষকে গর্ভে ধারণ করে এবং জন্ম দেয়।

'দীপালিকার রক্তিম মুখ, লজ্জিত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে দেখে, আমার সমস্ত আবেগের স্রোত ভেঙে পড়বার উপক্রম করছিল। অথচ প্রেমের ভাষা আমার জানা ছিল না। গল্পে উপন্যাসে নাটকে থিয়েটারে কত প্রেমের কথা পড়েছি শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে সে কথা বলা যায় বলে কোনদিনই বিশ্বাস করি নি। বলতেও পারি নি। কিছুক্ষণ ধরে দুজনের মাঝখানেই একটা অস্বস্তিকর নীরবতা থমকে ছিল। তারপরে আমি যেন অনেক চেষ্টা করে বলেছিলাম, "আমি আপনার কথা কিছুই জানি না, অর্থাৎ আপনার মনের কথা।"

'তখন দীপালিকা মুখ না তুলেই বলেছিল, "আপনি কি মনে করেন, মনটাই সব? সংসারে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে, যা মনের মূল্য দিতে চায় না।"

'সেই কথা শুনে, আমার আবেগের পালে যেন আরো জোরে হাওয়া লেগেছিল। মনে হয়েছিল, দীপালিকা যেন আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। আমাদের কথা তখন খোলাখুলি স্পষ্ট না হলেও, ভিতরে ভিতরে দুজনে যেন দুজনকে বুঝতে পারছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও বলতে চেয়েছিল, মনের দিক থেকে ওর কোন বাধা নেই, কিন্তু সাংসারিক কোন বাধা হয়তো আছে। আর সেই সাংসারিক বাধাকে, আমি সামাজিক বাধা বলে চিন্তা করি নি। আমি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী, অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলেছিলাম, "সংসারের মূল্যকে অস্বীকার করব না, কিন্তু মনকে একেবারে কানাকড়িতে বিকিয়ে দিয়ে নয়। অন্তঃত এ ক্ষেত্রে আমি মনের মূল্যই সব থেকে বেশী দেব। সেই হিসেবেই আপনার কাছে একটি আবেদন। দোনদিকেই কোন গোলযোগ দেখতে পাচ্ছি না আমি। আপনার পদবীটাও জেনেছি। আপনার আপত্তি না থাকলে, এর পরে আমি প্রথানুযায়ী এগোতে চাই।

'আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই দীপালিকা বলে উঠেছিল, "বাধা আছে, আপনি সেরকম চেষ্ট করবেন না।"

'আমি যে বিবাহের কথাই বলতে চেয়েছি, তা বোঝবার মত বুদ্ধিমতী সে নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে যেন মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল, এমন কি আমার বুকের আলোও। যে কারণে আমি কয়েক মুহূর্ত সকল অনুভূতির বাইরে চলে গিয়েছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দীপালিকা কিন্তু তখনই স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল, হেসে বলেছিল, "কিন্তু উঠছেন কেন,

একটু বসুন, এখুনি আসছি।"

'কিন্তু, আমার অবস্থা তখন, নির্মেঘ আকাশের মেঘের মত। জানেন তো, যে আকাশে মেঘ ছড়ানো থাকে, সে আকাশ তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে না, কিন্তু যে আকাশে মেঘ নেই, তার কোন এক পাশে একবার মেঘ জেগে উঠলে, দেখতে দেখতে সে আকাশ ছেয়ে ফেলে, বিদ্যুৎ চমকায়, ঝড় আসে। আমার অবস্থা সেইরকম। আমার আকাশে কোন মেঘ ছিল না। যখন এল, সে দিগন্তব্যাপী গ্রাস করতে লাগল। আমি বলে উঠেছিলাম, "যাবেন না। একটু শুনে যান, আমি আমার নিজের পরিবর্তনে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ছি। আমার বাড়ির লোকেরা এখন আমাকে দেখলে বিশ্বাস করতে পারতেন না, আমার এমন অবস্থা হয়েছে। আপনি আমাকে চেষ্টা করতে বারণ করেছেন, তখন আর এক মুহূর্তও আমাকে এখানে বসতে বলবেন না। কারণ, আমি আমার নিজের সম্পর্কে ভয় পাচ্ছি, আমার আচরণে গোলমাল হতে পারে। আমি যাচ্ছি।"

'দীপালিকা অবাক হয়েছিল। আর আমার মনে হয়েছিল, ক্রমাগতই যেন একটা অন্ধকারের আবর্তে ডুবে যাচ্ছি। পাক খাচ্ছি। ওর স্পষ্ট কথায়, আমি যেন অতলে ডুবে গিয়েছিলম। মানুষ যে কত অসহায়, তখন বুঝতে পারছিলাম। অথচ আমি ভেবে চিন্তে কিছুই করি নি। আমি পা বাড়িয়েছিলাম।

'দীপালিকা বলে উঠেছিল, "আপনি তো অদ্ভুত লোক। মানুষয় কি সবই তার নিজের ইচ্ছে মত পেতে পারে, আর না পেলেই কি সে সব কিছু ছেড়ে চলে যাবে?"

'আমি ওর কথার মধ্যে যেন একটু প্রীতি ও ব্যথার সুর শুনতে পেয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখেছিলাম, ওর চোখেও সেই প্রীতি ও ব্যথার ছায়া। তার সঙ্গে একটু বিব্রত ভাব। নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার চলে যাবার উদ্যোগে দীপালিকা দুঃখিত হচ্ছিল। এটুকুও বুঝতে পেরেছিলাম, কিছুক্ষণ আগে যে-দীপালিকা ওপর থেকে নেমে এসেছিল, বিদায় নেবার মুহূর্তে, মনের দিক থেকে সে-দীপালিকা আর ছিল না। তবু বলেছিলাম, "আমি হয়তো আপনাকে বোঝাতে পারছি না, আমার কী অবস্থা। সম্ভবতঃ সেটা আমার কিছুটা একসেনট্রিসিজম্ হচ্ছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। নিশ্চয় আমি নিজেকে এ বিষয়ে শাসন করব, মনকে ঠিক করে তুলব, তবু আপনি খালি একটু মনে রাখবেন, আমি আর যাই হই, কোন রকম ছলনা বা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিই নি। আমার জীবনে যা ঘটেছে, তা একবারই, আর তা, অল্পক্ষণের জন্যেই। হয়তো মানুষের জীবনে এরকম হয়। এতে আমার অভিজ্ঞতাই বাড়ছে।"

'দীপালিকা আহত স্বরে বলেছিল, "কিন্তু আপনি তো কিছুই শুনলেন না! আপনি এলেন, কথা বললেন, চলে যাচ্ছেন। আপনার কি আর কিছুই শোনবার নেই?"

'হতাশা মানুষের এমনি ব্যাধি, আমার কানে তখনো ওর সেই কথাই বাজছিল, "বাধা আছে, আপনি সেরকম চেষ্টা কিছু করবেন না।" আমি যতই ভাবছিলাম, ততই অস্থির হয়ে উঠছিলাম।

boiRboi.net

"আর হতাশা থাকলে মনও সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। কেন, তাও বলছি। সেই মুহূর্তে দোতলা থেকে একজন যুবক নেমে এসেছিল। পায়জামা আর লখ্‌নৌ বুটিদার পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে কাশ্মীরি নাগরায় তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে আসতে আসতে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়েছিল। আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিল, "রুমনো, তোমার কী দেরী হবে?"

'যুবকটি কে, কী সম্পর্ক দীপালিকার সঙ্গে কিছুই জানতাম না। অথচ তাকে দেখে, তার মুখে রুমনো সম্বোধন শুনে, আমার মনের ভিতরটা আরো ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ডাক্তার। আমার অবচেতনে কিসের ঢেউ লেগেছিল। ঈর্ষার ঢেউ, ওকেই ঈর্ষা বলে। ভেবেছিলাম, দীপালিকার সংসারের বাধা বোধহয় সেই ছেলেটিই। আমি আর এক মুহূর্তও দেরী না করে, অস্ফুটে একবার বলেছিলাম, "চললাম।"

'আমি জানি না, দীপালিকা আমাকে কী ভেবেছিল, রাগ করেছিল, না বিদ্রূপ করেছিল, না অভিমান করেছিল, কিছুই জানি না। বাড়িতে বৌদিদের মেয়েটির পরিচয় না বললেও, প্রাণে যে দাগ ধরেছে, সে কথাটা গোপন করি নি, এবং এ কথাও জানিয়েছিলাম, তার পরিচয় দিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ কখনো তা হবে না।'

★

এই সময়ে সহসা একটা শব্দে, শুভেন্দুনারায়ণ চমকে উঠলেন, কথা থামালেন। ডাক্তার প্রেমনাথও যেন একটা স্বপ্নের থেকে জেগে উঠল। দুজনেই অবাক হয়ে দেখলেন, পুবদিকের জানালায় একটা পাখী এসে বসেছে, পিক্ পিক্ শিস দিয়ে ডাকছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বাইরে দিনের আলো ফুটেছে। এখনো রোদ ওঠে নি, কিন্তু পুব আকাশ লাল হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

শুভেন্দুনারায়ণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চকিতে একবার ডাক্তারের দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে, তাঁর মুখের ওপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে যেতে লাগল। অন্ধকার রাত্রি নিশীথে, যে নিশি-পাওয়া ঘোরের আচ্ছন্নতা তাঁর সারা মুখ জুড়ে ছিল, তা কেটে যেতে লাগল। যেন নতুন একটা মুখ জেগে উঠল, নতুন মানুষ দেখা দিল। আত্মসচেতন, গম্ভীর স্বাভাবিক মানুষ। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে উঠল। এমন কি, তাঁর গলার স্বর পর্যন্ত আবেগহীন সংযত শোনাল। বললেন, 'আমি দুঃখিত ডাক্তার, আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি। কখন সকাল হয়েছে, কিছুই জানতে পারি নি। আপনি আমাকে আর একটু আগে···।'

তিনি যেন লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বলল, 'বিশ্বাস করুন আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না।'

শুভেন্দুনারায়ণ পকেট থেকে একগোছা টাকা তুলে, সামনের টেবিলে রাখলেন। ডাক্তার বাধা দিয়ে কিছু বলতে চাইল। তার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি কী সব কথা বলছিলাম, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সবই অর্থহীন প্রলাপ। সেইজন্যেই একটা অনুরোধ করছি, এসব কথা কাউকে

boiRboi.net

বলবেন না।'

ডাক্তার বলে উঠল, 'না না, আপনি তা একেবারেই ভাববেন না।'

কথা শেষ পর্যন্ত না শুনেই শুভেন্দুনারায়ণ ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সোজা বাইরে গিয়ে দেখলেন মহারাণী তাঁর অপেক্ষায়। মহারাণীর পিঠে উঠে পুবদিকে ছুটে চললেন। কেবল ডাক্তার দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখেমুখে একটা হতাশা, তীব্র কৌতূহল। যেন পিপাসার্তের মুখের সামনে থেকে কেউ জলের পাত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। পুবের রক্তিম আকাশের বুকে সে কেবল দেখল, একটি অশ্বসওয়ার মূর্তি ক্রমে বিন্দুর মত ছোট হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার সেই বিন্দুর দিকে চেয়ে, অস্ফুটে বলে উঠল, 'তারপর ?'

কোন জবাব সে পেল না। কিন্তু তার মুখে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা উঠল। সে জানালার কাছ থেকে সরে এল।

গভীর রাত্রে, আবার মহারাণীর পায়ের শব্দ বেজে উঠল। সেই একই অবস্থায়, নিশির ঘোরে, যন্ত্রণা কাতর অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে হাত চেপে ধরে ছুটে এলেন শুভেন্দুনারায়ণ। কলিঙবেল বাজবার আগেই, ডাক্তার দরজা খুলে দাঁড়াল। তার মুখে, সকালবেলার সেই একটুখানি হাসি লেগেছিল। সকালবেলার হাসির কারণও তাই। সে জানত, শুভেন্দুনারায়ণ আসবেন, তাঁকে আসতেই হবে। সে ডাকল 'আসুন।'

শুভেন্দুনারায়ণ ভিতরে ঢুকে তেমনি আর্তনাদ করে বললেন, 'ডাক্তার অসহ্য যন্ত্রণা, একটু সারিয়ে দিন।'

ডাক্তার গতকালের মতই, তাঁকে ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। অন্ধকার ঘর। টাইমপীস্-এর তেমনি টিক্ টিক্ পল গোনা ও রেডিয়মের নিষ্পলক চোখ। শুভেন্দুনারায়ণকে বসতে দিয়ে, ডাক্তার বলল, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আপনি নিঃসঙ্কোচে সব না বললে আমি চিকিৎসা করতে পারব না। আপনি আমাকে সব বলুন।'

একটু চুপচাপ। শুভেন্দুনারায়ণ বললেন, 'ঠিক বলেছেন ডাক্তার, সব না বললে আপনি অসুখটা ধরতে পারবেন না। আপনাকে আমি কাল অনেকটাই বলেছি।'

'হ্যাঁ, আপনি দীপালিকা চ্যাটার্জির বাড়ি থেকে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, সেই পর্যন্ত বলেছিলেন, এবং আপনাদের বাড়িতে কাউকে কিছু বলেন নি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

যেন তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে, এমনি ভাবে তিনি বললেন। তার গলার স্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি যেন কোন্ দূর অন্ধকার থেকে বলতে লাগলেন। অন্ধকারে সবই ডুবে গেল, কেবল জেগে রইল একটি কণ্ঠস্বর ঃ

'কিন্তু ডাক্তার, সে-ই কি সব ? আমরা নিজেদের কতটুকু জানি ? তারপরে কয়েকদিন ঘর থেকে কোথাও বেরুতে ইচ্ছা করে নি। বৌদিদের বলা ছিল, তাঁরা যেন ও বিষয়ে বাড়িতে দাদাদের কারুর সঙ্গে আলোচনা না করেন, তা হলে দাদারা আমার কাছে জানতে চাইবেন, কে সেই মেয়ে। যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে কথা

boiRboi.net

বলে লাভ কী ?

'কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন নতুন প্রশ্ন জাগছিল, কেন দীপালিকা আমাকে চেষ্টা করতে বারণ করেছিল ? আমি তো তা একবারও জানতে চাই নি ? আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ও হয়তো সেই ছেলেটিকে ভালবাসে, কিংবা কোথাও হয়তো ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। যাই হোক, এমনও তো হতে পারে, সেই বাধা আমি অতিক্রম করতে পারি। দীপালিকা তো জিজ্ঞেস করেছিল, আমার আর কিছুই কি শোনবার নেই ? হয়তো ছিল, আমি শুনি নি। পুরুষের সহজাত সম্মানবোধ আর ঈর্ষাই কেবল আমার মধ্যে কাজ করেছিল। কারণ এটা তো ঠিকই, ও আমার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করে নি, যার দ্বারা আমি বুঝতে পারি, ও আমাকে এক কথায় বিদায় করতে চেয়েছে।

'আসলে, এসব আমার মনে হয়েছিল, মনে মনে ওর কাছে যাবার জন্যে আবার আমার মন ব্যাকুল হচ্ছিল, তাই কিছু যুক্তি খাড়া করছিলাম, এবং আবার আমি গিয়েছিলাম। না, ওদের বাড়িতে নয়। আমি দক্ষিণেশ্বরেই গিয়েছিলাম, যদি দেখা হয়ে যায়।'

★

একটু থামলেন শুভেন্দুনারায়ণ। জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকালেন। মুখ ফিরিয়ে আবার বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ওর দেখা পাই নি। তখন ওদের বাড়ি যাব মনে করেই যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, দেখলাম, ঘোড়ায় টানা সেই পালকিগাড়ি মন্দিরের সীমায় ঢুকছে। আমি থমকে গেলাম। ও এসে গাড়ি থেকে নামল, আর আমাকে দেখতে পেয়ে, আমার মতই থমকে দাঁড়াল। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, আজ দীপালিকাই কয়েক পা আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "চেহারাটা এত খারাপ করলেন কী করে ?"

'বললাম, "শরীরটা ভাল নেই।"

'দীপালিকা কী বলবে, এক মুহূর্ত ভেবে পেল না। জিজ্ঞেস করল, "ফিরে যাচ্ছিলেন ?"

'বললাম, "না, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।"

'দীপালিকা অবাক হল, বলল, "চলুন না, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি।"

'আমি আবার কৃতার্থবোধ করলাম। কিছু না বলেই ওর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনি পৃথিবীর অনেক জায়গাই দেখে এসেছেন, না ?"

"কেন বলুন তো ?"

"শুনলাম।"

"কোথায় ?"

"আপনার মত লোকের কথা শুনতে তো চেষ্টা করতে হয় না। কলেজের মেয়েদের কাছে আপনার নাম বলতেই দেখলাম, অনেকে আপানাকে এক ডাকেই চেনে।"

'আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, "না, সেরকম কিছু নয় যে, এক ডাকেই

boiRboi.net

আমাকে চিনবে, তবে বিদেশের মানুষ, সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা টেকা মাঝে মধ্যে থাকে।”

“কেন আপনার ‘দূর-প্রবাসে’ নামে একটা ভাল বই আমি পড়েছি।”

‘শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম যে, আমার লেখা বইও সে পড়েছিল।

‘দীপালিকা কয়েক মুহূর্ত যেন কেমন একরকম ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে মুখ নামিয়ে, নিচু স্বরে বলে উঠল, “আমার কী সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আপনি তো জানলেন না, আপনার থেকে আমি কত নিচে, কোন্ অন্ধকারে থাকি।”

‘বলতে বলতে ওর মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। বলেছিলাম, “না না, এ কথা বলছেন কেন ?”

“সে কথাই তো আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম। আপনি চলে যাবার পর, কেবলি ভাবছিলাম, কেমন করে আপনাকে একটু খবর দিই। আপনি এমন করে চলে গেলেন, আপনাকে ফিরে ডাকতেও ভয় হল।”

সেজন্যে আমিও লজ্জিত, আমারও খারাপ লেগেছে, তাই আজ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম।”

“তারপরে আপনার আরো সব পরিচয় যখন পেলাম তখন মনে হল, জীবনে অমন সুযোগ বোধহয় একবারই আসে। আর বোধহয় আপনার সঙ্গে কোন দিন দেখা বা কথাবার্তা হবে না।”

‘বলতে বলতে ওর গলায় একটা নিবিড় ব্যথা ও হতাশা ফুটে উঠেছিল। আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাওয়ার মধ্যে, কোন ছলনা ছিল না, তা বুঝতে পেরেছিলাম। পরমুহূর্তেই বলেছিল, “কদিন ধরে আমি রোজই এখানে আসি। যদি আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আজও আশা করি নি। কিন্তু—।”

‘কথা শেষ না করে, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দীপালিকা চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। দেখেছিলাম, একটা খুশির হাসি ও লজ্জায়, রক্তাভা লেগেছিল ওর মুখে। বলেছিলাম, “আমিও আজ আপনার কাছে যাবই স্থির করেছিলাম। আজ বোধহয় দেখা হওয়াটা নিয়তিরই বিধান ছিল।”

‘আমরা গঙ্গার ধারে, একটু উত্তরে নিরালা দেখে বসেছিলাম, এবং দীপালিকার মুখ থেকে, ওর বাবার আর মায়ের কথা আমি শুনেছিলাম। সন্দেহ নেই, সেটা একটা মস্ত বড় বাধা আর সেই বাধাই আমাকে আরো ব্যগ্র ও কঠিন করে তুলেছিল, আমি যেন ওর পবিত্রতা, ব্যথিত জীবনকে আরো বেশী করে জানতে পেরেছিলাম।

‘ও আমাকে যা জানিয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত হল এই, ও মুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে বটে, কিন্তু বর্তমানে ওর পরিচয় ও এক বাঈজীর মেয়ে। বাবার অবস্থা ভাল ছিল না, তিনি অকালেই মারা যান। সংসারে আত্মীয় স্বজনহীন অবস্থায় ওর মা খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের রূপ তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল একটা মস্ত গুণ, তিনি খুব ভাল গান জানতেন। কুমারী সময়ে তিনি যে গুরুর কাছে গান শিখতেন, আবার সেই গুরুর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি মায়ের অসহায়তা দেখে, তাঁকে আরো শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, তোমার

boiRboi.net

সম্মানের দায়িত্ব আমার, তুমি লোককে গান শোনাও।

'ওর মায়ের তখন মাত্র বিশ বছর বয়স। গুরুদেব তাঁকে গান শুধু নয়, নাচও শিখিয়েছিলেন। অবিশ্যি এসবের পিছনে একটা বড় কারণ ছিল, দু একজন আত্মীয় স্বজন। দীপালিকার নিজের কাকা, তাঁরা সবাই মাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে, অপমানের অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মা তাঁদের কখনো আপন জন বলে ভাবতে পারেন নি, বরং ভয় পেতেন। একথা সত্যি। আজ মায়ের সেই সম্মান নেই, এবং তাঁকে প্রায় স্বৈরিণীর পর্যায়েই ফেলা যায়, কারণ, তিনি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়েছেন। লোকের কাছে তাঁর পরিচয়, তিনি বাঈজী। অনেকটা জেদ বশেই তিনি এ-পথে এসেছিলেন, আত্মীয়রা তাকে চারদিক থেকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিলেন। তখন একমাত্র বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন, মায়ের গুরু। দীপালিকার মামার বাড়িতে মেয়েদের মধ্যেও গানের চর্চাটা খুবই ছিল। তবে তাঁদের অবস্থাও ভাল ছিল না। যে কারণে মা সেখানে গিয়ে তাদের বোঝা হয়ে উঠতে চান নি। কিন্তু তাঁরাও যখন জেনেছিলেন, মা গান ও নাচকে পেশা হিসাবে নিতে যাচ্ছেন তখন তাঁরাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। মাকে এসব বিষয়ে আর একজন প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, বাবার এক বন্ধু, যাঁর নাম মৃণাল চৌধুরী, যিনি এখন মায়ের কাছে অনেকটা তাঁর কর্মচারীর মত জীবনযাপন করছেন।

'দীপালিকা ওর মায়ের বিষয় বেশী কিছু বলতে পারে নি, তবে এটা ওর নিশ্চিত বিশ্বাস, মায়ের দ্বারা কখনো কোন পাপকাজ হতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্যে, শ্মশানে যেমন করে সাধককে শব সাধনা করতে হয়, মা তেমনি করেই এ জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু বাইরের জগতের তা দেখবার বা জানবার নয়। মা নিজেও তা দেখাতে বা জানাতে চান নি।

'তবে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বেও, আর একটা কথা থেকে যায়। শুধু গান বাজনা অর্থ, এই-ই জীবনযাপনের একমাত্র সম্বল ছিল মায়ের? দীপালিকা তা বিশ্বাস করে নি। ও আমাকে পরিষ্কার জানিয়েছিল, ওর মা যে সাহস করে, সেই জীবন-যাপন অনায়াসে চালিয়ে গিয়েছিলেন, তার কারণ মৃণাল চৌধুরী। মৃণালবাবু একজন শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। ইচ্ছা করলে, জীবনে তিনি অনেক কিছুই করতে পারতেন। কিন্তু অবিবাহিত জীবনে, তিনি হয়ে রইলেন, এক বন্ধুপত্নী বাঈজীর রক্ষিত পুরুষ মাত্র। বাইরের থেকে যেমনই দেখাক, মৃণালবাবু ওর মাকে ভালবাসতেন মনে মনে। মুখ ফুটে সে কথা কোনদিনই প্রকাশ করেন নি। মাও এমন ভাব কখনো দেখান নি যে, তিনি মৃণাল কাকার মনের কথা কিছুমাত্র জানেন। অথচ দীর্ঘকাল কাছাকাছি থেকে, মায়ের মনে যে কোন ভাবান্তর হয় নি, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁরা দুজনেই ছিলেন, একই কক্ষে বিচরণশীল দুটি গ্রহ, অয়ন চলনের কোথাও তাঁদের একত্র হওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু মা মৃণালকাকাকে বিশ্বাস করতেন, জানতেন, তাঁর জীবনে তিনি রক্ষাকবচের মত।

'কিন্তু এ সব কোন কথাই দীপালিকার জীবনে সান্ত্বনা নয়। সে তার মায়ের জীবনের প্রতিনিধিত্ব কোন ভাবেই করতে চায় না। অথচ আজ বাইরের লোকের কাছে তার শীলমোহর করা পরিচয়, সে একজন বাঈজীর মেয়ে। কলেজে অনেকেই

boiRboi.net

জানে, যদিও মুখ ফুটে তাকে কেউ কিছু বলে না, তবু ইশারা ইঙ্গিত আছে। তার চেয়েও বড় কথা, ওর মায়ের ইচ্ছা, দীপালিকাও মায়ের পেশাই গ্রহণ করুক।

'আমি ওকে যেদিন প্রথম মন্দিরের পিছনে দেখেছিলাম, সেদিন মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে ও এসে দাঁড়িয়েছিল, এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি প্রার্থনা করছিল, ও যেন সাহস করে অন্য জীবনে যেতে পারে, এবং সেই দিন, সেই মুহূর্তে, ও যেন ওর মধ্যে একটা দৈব ঘোষণা শুনতে পাচ্ছিল, যে ভিন্ন জীবনের প্রার্থনা ও করছে, তাই পাবে। সেই জন্যেই সেদিন ওর মুখে আমি একটা পবিত্রতার ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। তখন দীপালিকা, ওর প্রার্থনার মধ্যে যে শক্তি, সেই শক্তিকে অনুভব করছিল।

'দীপালিকা আমাকে আরো জানিয়েছিল, যেদিন আমি ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই দিন ও নাচ শিখছিল। ওর মা নিজে ওকে নাচ শেখাতেন। হয়তো নিচে এসে দেখা করতে বাধা দিতেন, কিন্তু আমার নাম শুনে তিনি একটু থমকে গিয়েছিলেন। দীপালিকার ভাষায়, তিনি সাহস পান নি। সেদিন দোতলা থেকে যে যুবকটি নেমে এসেছিল, তার নাম বুলাকিলাল, তবলচি। দীপালিকার নাচ শেখার সময় বাজায়। দেরী দেখে, মা-ই তাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল।

'দীপালিকার মা নাকি এটাই ভেবেছিলেন, যখন ওর পরিচয় কেউ পাবে তখন কেউ ওকে বিয়ে করতে চাইবে না। অতএব নাচ গান শেখাই ওর পক্ষে ভাল। যদিও দীপালিকা চেয়েছিল, ও লেখাপড়া শিখে ভিন্ন-ভাবে জীবনযাপন করবে, বিয়ের জন্যে কখনো লালায়িত হবে না।

'দীপালিকা আমাকে বুঝিয়েছিল, আমি যেন না ভাবি, মা ওকে ভালবাসেন না। বাসেন বলেই, তিনি চিরদিন তাকে নিজের কাছে রেখে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধ ভালবাসা অনেক সময়েই অন্ধকারে নিয়ে ফ্যালে, সে কথা লোকে মনে রাখে না।

'সমস্ত ঘটনা বলার পর দীপালিকা আমাকে বলেছিল, "এবার আপনি বুঝতে পারছেন, কেন আপনাকে বাধার কথা বলেছিলাম, কেন চেষ্টা করতে বারণ করেছিলাম? বিশেষ করে, আজ আপনাকে আমি আরো বেশী করেই বাধা দেব। সেদিন শুধু আপনার পারিবারিক বা বংশ পরিচয় জানা ছিল, তারপর আপনার কিছু কিছু ব্যক্তিগত পরিচয়ও পেয়েছি, এর পরে আমি ভাবতেও পারি না, জীবনে আপনি এত বড় ভুল করবেন।"

'ওর কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলাম। আমি যে-বাড়ির ছেলে, তাতে শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও, একটা সাধারণ সংস্কারের গণ্ডী আমাকে ঘিরে ছিল। একবার মনে হয়েছিল, তারপরে আর দীপালিকাকে বিয়ে করার প্রশ্ন থাকতে পারে না।

'কিন্তু চোখ তুলে যে-মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, সেই মুহূর্তেই আমার নিজের বুকের ভিতরটাই যেন দেখতে পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম, সেখানে কোন সংস্কারের গণ্ডী নেই। সেখানে শুধুই দীপালিকা। সত্য পবিত্র অসহায় যার রূপ।

boiRboi.net

'আমি বলেছিলাম, "এ কথা কেন বলছেন।"

'দেখেছিলাম, ওর চোখে জল এসে পড়েছে, কথা বলতে পারছে না। আমার খুবই ইচ্ছা করছিল, ওর হাতটা ধরি, কিন্তু পারি নি। কেবল গঙ্গার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছিল। একটু পরে আবার বলেছিল, "আমাকে যারা চেনে, তারা আমার দিকে কী চোখে দ্যাখে, তা আমি জানি। আমাকে তারা কী ভাবে, তাও বুঝি। আমি তারপরে ভাবতেও পারি না, আপনার মত মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন। না না, ছি ছি।"

'আমি ডেকে উঠেছিলাম, "দীপালিকা দেবী—।"

"আমাকে দেবী বলবেন না, নাম ধরে বলুন।"

"বলব, কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, একমাত্র এই বাধা ছাড়া, আর অন্য কোন বাধা নেই তো ?"

"অনেক বাধা। আপনাকে তো বলেছি, আমি ভাবতেই পারি না। আপনি হয়তো আপনার বাড়ির কথা ভুলে গেছেন, কিংবা নিতান্ত ঝোঁকের মাথায়—।"

'আমি বলে উঠেছিলাম, "প্রতিবাদ না করে পারছি না এ কথার। বাড়ির কথা আমার সব সময়ই মনে থাকে। ঝোঁকের মাথায় আমি কোন কাজ করি না, বা বলি না। যারা ঝোঁকের মাথায় কিছু করে আমার এই বয়সের লোকেরা তারা অনেকবারই ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছু করে। সুযোগ থাকলে আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকতে চাই। তাছাড়া ঝোঁকের কথায় মনে হয়, আপনি হয়তো নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন, আমাকেও খাটো করছেন, ভাবছেন, আমি প্রাচীন ধনী পরিবারের ছেলে, আজ যা করব, কাল তা ফেলে চলে যাব।"

'দীপালিকা চুপ করেছিল। আমি আবার বলেছিলাম "এই কি আপনার ধারণা ?"

"আপনার সম্পর্কে আমি তা ভাবতে পারছি না।"

"ভাবলেও আমি অবাক হব না। আপনি আর কতটুকুই বা আমাকে জানেন।"

"জানি, এখন জানি, তবু আপনাকে আমি বারণ করব।"

'এ কথা সে বলছিল, কিন্তু গলা তার বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু সে আবার বলেছিল, "আমি চিরদিন ধরে এই ক'টি দিনের কথা মনে রাখব, কখনো ভুলতে পারব না। স্বয়ং আপনি যে আমাকে—আমাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, এ কথা ভেবে, চিরদিন একটা গোপন অহংকার আমি হয়তো পুষে রাখব তবু—তবু—!"

'সেই আমি প্রথম ডেকে উঠেছিলাম, "দীপালিকা।"

'দীপালিকা কিন্তু গঙ্গার দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে বলেছিল, "কেন, কেন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হল, কেন আপনি এমন করে আমার সম্পর্কে ভাবলেন। আপনি কেন বুঝতে পারলেন না, আমি কে, আমি কী।"

'আমি বলেছিলাম, "আমি জানি তুমি কে, তুমি কী।"

'এই কথা বলে, আমি ওর হাত না ধরে পারি নি। ও যেন কেঁপে উঠেছিল। শিউরে উঠেছিল। আমার দিকে ওর ভেজা চোখ দুটি মেলে তাকিয়েছিল। সেই মুখখানি আমার বুকে এখনো আঁকা। আমি তখন মুগ্ধ পুরুষের মতই ওর

boiRboi.net

দিকে তাকিয়েছিলাম। ও আবার লজ্জায় মাথা নত করেছিল। আমার হাত সরিয়ে নেয় নি।

'সেই সন্ধ্যাবেলায় তখন একটা অখণ্ড নীরবতা ছিল। পাখীরা কিছুক্ষণ আগেও ডাকাডাকি করছিল, ঘোর সন্ধ্যায় তারা একেবারেই চুপ করেছিল। সূর্য অস্ত গিয়েছিল একটু আগেই। গঙ্গায় একটা নৌকাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হয়েছিল, যেন সন্ধ্যাবেলার সেই সংসারে, আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। গঙ্গার ধারে কেবল দুটি নরনারী।

'সেদিন ও নিজেই বলেছিল, "আপনি আমাকে বাড়ি পেঁছে দিন। সহিস আমাদের গাড়ি নিয়ে আলাদা চলে যাবে।"

'ও যে কেন হঠাৎ পেঁছে দেবার প্রস্তাব করেছিল, পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ও যে আমাকে কতটা বিশ্বাস করে সেটা জানাতে চেয়েছিল। তা ছাড়া বাড়িতে ওর মাকেও বোধহয় দেখাতে চেয়েছিল, দু জনের ঘনিষ্ঠতা।

'আমি ওকে পেঁছে দিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, ওকে যেন কতদিন চিনি। ওকে পেঁছে দেবার পর আবার বলেছিল, "আপনি যখন খুশি আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কেবল একটা অনুরোধ করব, হঠাৎ কিছু করবেন না, আপনি অনেক ভাববেন।"

★

এই পর্যন্ত বলে শুভেন্দুনারায়ণ থামলেন। তিনি যেন তাঁর গলার আবেগ প্রশমিত করতে চাইলেন। অন্ধকারের মধ্যে কেবল ঘড়ির টিক্‌টিক্ শোনা গেল, যার মধ্যে শুধু এগিয়ে যাবার সময়ের ঘোষণা। তারপরে আবার সেই দূরাগত স্বর বেজে উঠল ঃ

'ওর কথার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ও আমাকে ওর কাছে যাবার সব অধিকারই দিয়েছিল, তবু আমি যেন না ভাবি, ওকে যে আমি বিয়ে করতে চেয়েছি তা আমাকে করতেই হবে। যার অর্থ দাঁড়ায়, ও আমার জন্যে চিরদিনই থাকবে। তবু মুখ ফুটে ও আমাকে অনেকদিন বলেছে, আমাদের বাড়ির পুত্রবধূ হবার কথা ও বাস্তবে কল্পনাও করতে পারে না। আমি যেন বাবা দাদা সবাইকে আঘাত করে কিছু না করে বসি।

'এ কথা ঠিক, অনেকদিন পর্যন্তই আমি বাড়িতে কিছু বলি নি। কিন্তু ওকে দু-একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছি। বৌদিদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছি। সকলেই ওকে ভালবেসেছিলেন, যতদিন ওর পরিচয় জানতেন না। ক্রমে আমাদের বাড়িতে আলোচনাও হচ্ছিল সে বিষয়ে, ছোটবাবু প্রেম করছেন, তিনি আসনাই করে বিয়ে করবেন।

'অন্যদিকে দীপালিকার মায়ের মনোভাবটা দাঁড়িয়েছিল, তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে ঠিক অসম্মতি জানান নি, কিন্তু গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন, কোনদিন আমি বিয়ে করব কিনা। সেটা আমার কাছে ক্রমেই অপমানকর বোধ হচ্ছিল, যে কারণে বাড়িতে ঘোষণা করতে আমি আর দেরী করি নি, দীপালিকাকে আমি বিয়ে করব।

boiRboi.net

'আমার প্রতি দাদাদের বা বাবার একটা বিশ্বাস ছিল, আমি এমন কিছুই করব না, যাতে বংশে কোনরকম কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারে। আর আমি নিজেও এ কথা ভাবি নি, দীপাকে বিয়ে করতে চেয়ে, সেরকম কোন অপরাধ করেছিলাম, কারণ তার মায়ের জীবনের জন্যে তার কোন দায় নেই, এবং নিতান্ত জন্মসূত্রেই কেউ এই পৃথিবীর কাছে অপরাধী হতে পারে না। আমি তাকে পবিত্রতমই মনে করতাম।

'অতএব যখন আমার কাছে জানতে চাওয়া হল, পাত্রী কে, তার পরিচয় কী, আমি কোন কথাই গোপন করি নি। আর মুহূর্তেই সকলের মুখের হাসি দূর হয়ে গিয়েছিল। বৌদিরা পর্যন্ত আমাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, আমি শেষে কিনা একটি বাঈজীর মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছি।

'কিন্তু আমার মত পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ছিল না। প্রথমে এল ভয় দেখানো, শাসন, তারপরে অনুরোধ উপরোধ, বংশের দোহাই তো ছিলই। কিন্তু আমার কিছুই বলার ছিল না, কারণ তখন দীপালিকাকে বাদ দিয়ে আমি জীবনকে চিন্তাই করতে পারছি না।

'তারপর এল, আমাকে দূর করে দেবার প্রশ্ন। বৌদিরা আর কথা বলতেন না, তাঁরা হয়তো বশীকরণের ভাবনায় শিউরে উঠেছিলেন। দাদারা ভাবলেন আমি একটা দুশ্চরিত্র। বাবা ভাবলেন, একটি কুলাঙ্গার। মুহূর্তের মধ্যেই আমার সকল গুণ তাঁদের চোখ থেকে মুছে গেল।

'তাঁদের আমি দোষ দেব না, কারণ মানুষ তার নিজেকে ছাড়িয়ে যাবে, এ হয় না। ছাড়াতে হলে, তার নিজেকে অনবরতই বাড়াতে হয়, আর সেই বাড়াবার জায়গাটা তো অভিজ্ঞতা এবং মন। আমি কেবল বংশ পরিবার এবং পুরনো ধারণা নিয়ে কোনদিনই থাকি নি, অতএব দীপালিকাকে স্বীকার করতে আমার বাধে নি। তা ছাড়া, আমি বলব, ভালবাসা অনেকটাই অসহায়, কেউ কখনো ভেবে ভালবাসতে পারে না।

'শেষ পর্যন্ত আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হল। এবং পূর্বপুরুষদের উইলে যেহেতু এমন কোন কথা ছিল না যে, কেউ ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে করলে, তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হবে, একমাত্র সেই হেতুই, কলকাতা থেকে অনেক দূরে, বাঙলা দেশের প্রান্তে, সাঁওতাল পরগনার এই সম্পত্তি আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বিদায় নেবার সময়, আমার সঙ্গে বাড়ির কারুরই দেখা হয় নি।

'ইচ্ছে করেই কেউ দেখা করে নি। আমি কেবল মায়ের ছবিটার কাছে একবার দাঁড়িয়েছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, "তুমি জানো, আমি অন্যায় কিছুই করি নি, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করছি। তার যে কোন পাপ নেই, তা তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে নিশ্চয়ই জানতে পারছো।"

'নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়েছিল আমার। দীপালিকার মা এবং কাকাও তাঁদের নিজেদের কর্তব্য পালন করেছিলেন। তার আগেই, এখানে, অর্থাৎ এই কুঠিতে আসার সংবাদ জানিয়ে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। বিয়ের কয়েকদিন পরেই, দীপালিকাকে নিয়ে, আমি আমার সম্পত্তির দখল নিতে

boiRboi.net

এসেছিলাম।…তাই বা আজ কতদিনের কথা? যেন সেদিন! মনে হয়, এই তো সেদিন আমি দিনেমার কুঠিতে এসে উঠলাম। আমার জীবনের আর এক পর্ব শুরু হল। নিঃসন্দেহে সে পর্ব সুখের ও কর্মের এবং প্রতিষ্ঠার।'

★

'দিনেমার কুঠিতে বারোমাসই লোকজন থাকতো, কাজকর্ম করতে। কারণ, কিছু না হোক, প্রায় বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী এটা। অতএব আমি এসে যখন উঠলাম, তখন সবই ঠিক ছিল। কুঠিও মোটামুটি বাসযোগ্য ছিল। আরো ভাল করা হয়েছিল, সাজানো গোছানো হয়েছিল, তার জন্যে অর্থ বা লোকের অভাব হয় নি।

'দু একজন কর্মচারী কিছু কিছু অন্যায়ভাবে চুরিচামারি করে সম্পত্তি করেছিল। সে সব আমি দাবী করি নি, কিন্তু নতুন করে আর যাতে কেউ কিছু না করতে পারে, সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম।

'দিনেমার কুঠিতে নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছিল। আমি দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম, আর সে সবই দীপালিকার সহযোগিতায়, ওরই পরামর্শে। আমার কাজটুকু বাদ দিলে, আর তো দীপালিকাই ছিল। আমরা সত্যি সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলাম।

'তবে আমরা ঠিক প্রাচীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতাম না, বাইরে বেড়াতে যেতাম ওকে নিয়ে। হেঁটে হেঁটেই, এমন কি, দীপাকে ঘোড়ায়ও চাপাতাম মাঝে মাঝে। ওকে নিয়েই, কাছাকাছি শিকারে যেতাম। আমাকে ঘিরে আমার কর্মচারীরা অধিকাংশই খুশি ছিল। তারা জানতো, বিশ্ব-সংসারে আমার সব থেকে বড় পাওনা দীপালিকা, অতএব তাদের কাউকে কোনরকমেই বঞ্চিত করব না।

'দীপালিকা বারে বারেই বলত, "আমার এতবড় সৌভাগ্যকে বড় ভয় করে।"

'আমি হেসে বলতাম, "তোমার পিছনে কুসংস্কারের ভূতটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে।"

'সত্যি বলতে কি, ও বড় নির্লোভ মেয়ে ছিল। কত রকম অলঙ্কার শাড়ি বিদেশের সেণ্ট প্রসাধন এনে দিয়েছি। ওর যেন সে সবে কোন লক্ষ্যই ছিল না। আমার বেশী কাজের চাপ পড়লেই মুখখানি গম্ভীর করে কুঠিতে বসে থাকতো, ওটাই ছিল ওর অভিমানের একটি মাত্র জায়গা।

'তবে ওর একটি সঙ্গিনী ছিল, ভারী হাসিখুশি একটি মেয়ে, নাম তার ময়না। ওরই সমবয়সী কিংবা দু এক বছরের ছোটই হবে। আমাদের কুঠির পশ্চিমদিকে কর্মচারীদের যে ভদ্রাসনগুলো ছিল, ময়না তাদেরই কোন এক বাড়ির মেয়ে। সে প্রথমে দীপালিকাকে ছোট বৌদিরাণী বলে ডাকতো, তারপরে বৌদিরাণী সম্বোধন কবে একদিন শুধু বৌদি হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে, ময়না অনেকটা ওর সখী হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি দেখতে এমন কিছু সুন্দরী ছিল না। রঙ ময়লা, কিন্তু তার মধ্যে একটি লাবণ্য ছিল, যেন ঢলঢল ভাব। নাক একটু বোঁচা, তাতে আবার একটি নাকছাবি ছিল। তাতে ওকে যেন দুষ্টু বলে মনে হত। অথচ ডাগর চোখ দুটিতে সব সময়েই এমন একটি আলোছায়ার ভাব খেলা করত, মনে হত একটি চঞ্চল হরিণী।

boiRboi.net

'চঞ্চল হরিণীর মতো সেই মেয়েটি অনেকদিন হঠাৎ আমার সামনেও পড়েছে, এবং ভয়ে প্রায় জবুথবু হয়ে পড়েছে। আমার খুবই হাসি পেত, ভয় পাওয়াটা আমি বেশ উপভোগ করতাম। কিন্তু যেন চিনি না এমনি ভাবে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করতাম, "কে তুমি ?"

"আজ্ঞে আমি ময়না।"

'ভীতা হরিণীর মত জবাব দিত।'

"এখানে কী করছ ?"

"ছোট বৌদিরাণী আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"কেন ?"

"অ্যাঁ ? কেন তা তো জানি না।"

'আরো খানিকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে বলতাম, "আচ্ছা যাও।"

'অমনি একেবারে এক ছুটে পালাতো।

'কখনো কখনো তার গানও শোনা যেত।—সে সব গান কোনটাই আজকালকার আধুনিক গান নয়, বা ক্লাসিকও নয়। ওর রূপ আর ছন্দের মধ্যে যেমন একটা প্রাকৃতিক ভাব ছিল, সেই রকম গানই গাইত। বাউল কীর্তন, এই সব ধরনের গান আমি ওর গলায় শুনেছি। ওই সব গানের মধ্য দিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে অনেক কথা হত। আমি যেন কৃষ্ণ, মথুরায় গিয়েছি, আর দীপা রাধা, বিরহ কাতর হয়ে পড়ে আছে। ময়না যেন রাধার সখী বৃন্দাদূতী হয়ে গান করত। ওর গলাটাও ছিল ভারী মিষ্টি। আমার খুব ভাল লাগত।

'কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ময়নার সঙ্গে আমার নিয়ম মাফিক পরিচয় হয় নি। পরে দীপালিকা ওকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, তবু আমাকে দেখলেই ময়না লজ্জা তো পেতই, একটা ভয়ের ভাবও থাকতো। সেটা বোধ হয় এই কারণে যে, আমি ওদের মনিব, এবং পুরুষ।

'ময়নার কাছে আমি মনে মনে কৃতজ্ঞ ছিলাম, দীপালিকাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। কারণ ওর কোন সঙ্গিনী ছিল না। কুঠির ঝি আর চাকরদের সঙ্গে কেবল সময় কাটানো যায় না নিশ্চয়ই। এমন কি, আমার অনুমতি ছিল, ময়নার সঙ্গে ইচ্ছা করলে দীপালিকা একটু এদিক ওদিক বেড়াতে যেতেও পারে। ওরা দুজনে প্রায়ই তা যেত।

'ময়না মেয়েটি তেমন লেখাপড়া করতে পায় নি। ওদের পরিবারে মেয়েদের পড়াশুনাটা তেমন ছিল না। তা' ছাড়া শহরে এসে পড়াও অসুবিধে ছিল। তবু মেয়েটির মধ্যে রুচিবোধ ছিল। দীপালিকা আর ময়নাতে এতই ভাব ছিল, ঠাট্টা করে আমিই এক এক সময় দীপাকে বলতাম, "ময়নাকে আমার ঈর্ষা হয়। আমার বউটিকে সে যেমন করে পায়, আমি তেমন করে পাই না!"

'দীপালিকা বলতো, "তার কারণ আমাদের যে সময় কাটে না, আর তোমার যে সময় নেই।"

'দিনেমার কুঠিতে এক্কা গাড়ি ছিল, আপনারাও তা দেখেছেন। দীপা আর ময়না প্রায়ই সেই এক্কা গাড়িতে করে বেড়াতে যেত মাঠের দিকে। মাঝে মাঝে দেখতাম, ময়না আসে নি। জিজ্ঞেস করলে, দীপা বলতো, "ওদের বাড়ির লোকগুলো

boiRboi.net

বড্ড সেকেলে, মেয়েকে বেরুতে দিতে চায় না।”

‘এ কথায় আমার রাগ হত, কারণ আমার কুঠিতে, আমার স্ত্রীর কাছে আসতেও বাধা দিতে সাহস পায় কেমন করে? কিন্তু দীপা আমাকে রাগ করতে দিত না। বলত, “ওদের মেয়ের বিষয় ওদের হাতেই রাখতে দাও। তবে আমার ইচ্ছা ময়নার বিয়েটা আমিই দিই।”

‘দীপা যদি তা দিত, আমার কোনই আপত্তি ছিল না। ময়নার বাবা দিনেমার কুঠিতে খাতা লেখা একজন সাধারণ কর্মচারী ছাড়া কিছুই ছিল না। তার পক্ষে বিশেষ খরচ-খরচা করে মেয়ের বিয়ে দেবার উপায় ছিল না।

‘যাই হোক, সব মিলিয়ে আমার দিনগুলো, এককথায় মধুরভাবেই কাটছিল। অনেক মজার ঘটনার মধ্যে, একবার পুজোর সময়, দিনেমার কুঠির মজলিশ-বাড়িতে বাঈজী আনানো হয়েছিল।

‘ইতিমধ্যে দু একজনের সঙ্গে আমার একটু সখ্যতাও হয়েছিল, হয়তো তারা আমাকে খানিকটা তোষামোদও করতো! সে দু একজনের মধ্যে একজন ছিল এক বড়লোক বিহারী, অপর জন শহরের বড় ব্যবসায়ী। তারা সেদিন আমাকে একটু মদ্যপানের জন্যে অনুরোধ করেছিল। আমি করেওছিলাম। তারপরে মজলিশ-বাড়িতে, জগ্দানবাঈয়ের নাচ দেখতে গিয়েছিলাম।

‘একটু পরেই, কুঠির একজন চাকর এসে আমাকে আস্তে আস্তে বললে, “ছোট মা আপনার জন্যে মজলিশ-ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, ডাকছেন।”

‘আমি কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। বাঈজীকে বিদায়ের ইঙ্গিত জানিয়ে, তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। দেখলাম দীপা মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে বলল, “কুঠিতে এস, কথা আছে।”

‘কুঠিতে এলাম, দীপার সঙ্গে, একেবারে শোবার ঘরে। ও আমাকে বসতে বলে বাইরে গেল, এবং একটু পরেই চাকরকে নিয়ে ফিরে এল। দেখলাম চাকরের হাতে মদের বোতল, গেলাস, ঘুঙুরের গুচ্ছ। চাকরকে বিদায় দিয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিজের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আমার সামনে মদের বোতল আর গেলাস দিল, তারপর মেঝের ওপরে ঠিক বাঈজীর মত বসে, একটা কিছু গান ধরতে গেল।

‘সমস্ত ব্যাপারটাই এত আকস্মিক, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কেবল ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল গম্ভীর, অস্বাভাবিক এবং উত্তেজিত। আমি হাসব কি না ভাবছি, আর ও গান ধরবার কয়েকবার চেষ্টা করল। এবং এক লাইন কোনরকমে গাইলও, “বৃন্দাবন কী কুঞ্জ্ গলি মে, কর পকড়ত মেরী চীর!!”…

‘সে গলা কিন্তু ময়নার গলা নয়। স্বভাব ও প্রকৃতিদত্ত গলা বা গান নয়। সে গান দীর্ঘদিনের শিক্ষায় মার্জিত, সুললিত। গানটা ছিল একটা বিখ্যাত ঠুংরী। গানটা ও ধরেছিল ভালই। কিন্তু এক লাইন গেয়েই হঠাৎ কেঁদে উঠেছিল। একেবারে হু হু করে কেঁদে উঠল।

‘আমি তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে, বুকের কাছে টেনে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে আমাকে বল, আমি তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে কিছুই করি নি।”

দীপা কান্নারুদ্ধ গলাতেই বলল, “তুমি আমাকে কেন বল নি, তুমি আজ

মজলিশঘরে গিয়ে বসবে, ড্রিঙ্ক করবে, বাঈজীর নাচ গান ভোগ করবে?"

'বললাম "যাব বলে যাই নি দীপু, ওরা আমাকে ডেকে নিয়ে গেছল। তা ছাড়া আমারই বাড়ির পুজোয়, আমারই মজলিশঘরে সব কিছু হচ্ছে। না গেলে একবার ভাল দেখায় না, তা-ই। লক্ষ্মীটি, রাগ করো না, আমি আর ওরকম যাব না।"

'দীপা বলল, "আমি কি তোমার সব নই? আমি তোমার স্ত্রী, যদি তোমার বাঈজীর নাচ দেখতে ইচ্ছা হয়, গান শুনতে ইচ্ছা হয়, সেও তোমার আমিই, আমিই তোমাকে সব দেব। কিন্তু তুমি আর কোনদিন কোন বাঈজীর কাছে যেও না।"

'এই কথা বলতে বলতেই, ওর চোখে আবার জল এসেছিল। আবার বলেছিল, "তা ছাড়া তুমি জান না, বাঈজী নাম আমার কাছে বিষ। আমার জীবনের সব থেকে বড় ঘা।"

'তৎক্ষণাৎ যেন আমার বুকেও সাপের দংশন হয়েছিল। আমার মনে পড়ে গেছল দীপার মা, আমার শাশুড়ি, তিনিও বাঈজী। একদা তিনি মেয়েকেও তা-ই করতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, "আমাকে ক্ষমা কর দীপা, আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি এই দিনেমার কুঠিতে আর কোনদিন ওসব হতে দেব না।"

'সেই রাত্রে ওকে আমি শান্ত করেছিলাম। তারপর সেই রাত্রি আমরা অবিস্মরণীয় করে রেখেছিলাম। ও সত্যি গান করেছিল, নেচেছিল, আর আমি পাগলের মত ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলাম।...'

★

এই পর্যন্ত বলে শুভেন্দুনারায়ণ থেমেছিলেন একবার। টাইমপীস-এর রেডিয়মের উজ্জ্বল চোখ যেন সেই মুহূর্তে বড় বেশী করে জ্বলে উঠল। টিক্‌টিক্ শব্দ বেশী জোরে বাজতে লাগল। বাইরে, কোন গাছে একটা অশুভ শব্দে বাজছিল, হুম্ হুম্ হুম্। কালপ্যাঁচাটার সেই হুম্ হুম্ শব্দ যেন, মহাকালের অদৃশ্য বুকে বসে, সর্বজ্ঞের মত বিশ্বসংসারের সব কিছু দেখে, বিদ্রূপ করে ঘাড় নাড়িয়ে চলেছে।

শুভেন্দুনারায়ণের গলা যেন বহু দূর থেকে গোঙানির মত বেজে উঠল। তিনি বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার, পুজোর দিনের সেই রাত্রির আনন্দ আমার মনের মধ্যে এক ভয়াবহ বিষের সঞ্চার করেছিল। আমি তা জানতে বা বুঝতে পারি নি। কুয়োর ব্যাঙ যেমন, কুয়োর ভিতর থেকে যতটুকু আকাশ দেখা যায়, সেটাকেই সবখানি মনে করে, আমরা অধিকাংশই সেই রকম কূপমণ্ডূক। সেই রাত্রে আমার অবচেতনে যে আর একটি ক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল, সেটা একটুও ধরতে পারি নি।

'আসলে, সেই রাত্রে দীপা যে বাঈজীর পোশাক পরেছিল, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচেছিল, গান করেছিল, যেটাকে আমি তখনকার মত খুবই উপভোগ্য মনে করেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে সেটা আমার আজন্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের মধ্যে একটা বিপরীত ভাবেরই সৃষ্টি করেছিল। কুসংস্কারটা আর কিছুই নয়। যেহেতু দীপার মা বাঈজী ছিলেন, এবং দীপাকেও তা-ই করতে চেয়েছিলেন, সেই হেতুই, আমার অবচেতনে এইরকম একটা সংশয়ের জন্ম হয়েছিল, দীপা ওর মাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। ওর ভিতরেও একজন বাঈজী রয়ে গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে বলেই, ওর মধ্যে সেই সব ইচ্ছাগুলো সেই রাত্রে রূপ পেয়েছিল। ও বাঈজী হয়ে উঠতে চেয়েছিল।

'মানুষের মনের সব থেকে বড় শত্রু হল তার সংশয় অবিশ্বাস সন্দেহ। সেই শত্রু যে আমাকে ভিতরে ভিতরে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছিল, তা বুঝতে পারি নি। অথচ সেই রাত্রির পর থেকে, কোথায় যে একটা ছোট্ট কাঁটা আমার বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করছিল, একটুও বুঝতে পারি নি।

'মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে যেমন টের পাওয়া যায় না, সেই মাটির নিচে ক্লেদাক্ত সরীসৃপ, বুকে হাঁটা কেঁচো আছে, এ ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম। তার পরিণতি কী হতে পারে, আমার জীবনই তার প্রমাণ।

'এখন ভাবি, আমি যদি সে সব কথা না ভাবতাম, সে সব কথা মনে স্থান না দিতাম, তা হলে ভয়ংকর সর্বনাশটা হয়তো ঘটত না। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে স্থান দিই নি। আমার ভিতরে আপনা থেকেই তার জন্ম হয়েছিল।'

বলে একটু চুপ করে, আবার শুরু করেছিলেন, 'যাই হোক, দিনগুলো যখন এভাবে চলছে, তখন একদিন শোবার ঘরে, দীপা খাট থেকে নামতে গিয়ে, হঠাৎ কেমন করে ওর পায়ের গোড়ালির দিকটা একটু মচকে গেল। আমি তখন বেরুবার জন্যে মাথা আঁচড়াচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি ওর কাছে এলাম। কিছুতেই পায়ে হাত দিতে দেবে না। বলল, "কোন রকমে মচকে গেছে।"

'আমি ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে আয়োডেক্স-এর কৌটাটা খুঁজতে গেলাম। কিন্তু কোন ড্রয়ারেই তা খুঁজে পেলাম না। সব ড্রয়ারগুলোই খোলা, কেবল একটা ড্রয়ার চাবি বন্ধ।

'আমি বললাম, "এই ড্রয়ারটায় দেখছি চাবি লাগানো, বোধ হয় এতেই আয়োডেক্স্‌টা রয়েছে, দাও তো চাবিটা।"

'দেখলাম, পায়ের ব্যথার থেকেও দীপা যেন বেশী উদ্বেগ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, "না না, ও ড্রয়ারে কিছু নেই, আমি দেখছি আয়োডেক্স্‌ কোথায় আছে।"

'ওর উদ্বেগ ব্যাকুলতা দেখে একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। ড্রয়ারটা সম্পর্কে ও যেন একটু বেশী সতর্ক ও উৎকণ্ঠিত। বললাম, "সবই খোলা, এটাই বন্ধ, নিশ্চয়ই এতে আছে, তুমি দাও না চাবিটা।"

"না না, ওতে নেই আমি জানি। পায়ের জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না, আমি দেখছি।"

'আমি কৌতূহল প্রকাশ না করে পারলাম না। বললাম, "হ্যাঁ গো, এ ড্রয়ারটাই বা বন্ধ কেন, সবই তো খোলা।'

'দীপা একটু হাসল। হাসিটার মধ্যে কিছু একটা গোপনীয়তার ভাব আছে, মনে হল। বলল, "যাই থাক, তুমি ওটা খুলতে চেও না লক্ষ্মীটি!"

"এমন কি আছে, যা আমাকেও বলতে পার না?"

'আমি হাসতে হাসতেই বলেছিলাম। ও বলল, "পারলে তো বলতামই।"

'তারপরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই ড্রয়ারে কী আছে, তুমি কোনদিন জানতে চাইবে না. দেখতেও চাইবে না, কেমন?"

'ওর মুখের ওপর যে সরলতা ছিল, তাতে আমার কোন বাজে সন্দেহ ছিল না হবে হয়তো কিছু লুকিয়ে রেখেছে। বললাম, "আচ্ছা, তাই হবে।"

boiRboi.net

"না, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলে যাও।"

'ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও, দীপা কখনো কখনো যে ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে পারে তা আমি জানতাম। হয়তো ওর ছেলেবেলার খেলার পুতুলগুলোই লুকিয়ে রেখেছিল।'

'আমি গা ছুঁয়েই দিব্যি গালি নি, একেবারে ওর ঠোঁটে মুখ ডুবিয়েই বলেছিলাম, "আচ্ছা গো আচ্ছা।"

'কিন্তু ডাক্তার, মনে রাখতে হবে, ঘটনাটা যত সহজে মিটে গিয়েছিল, ভিতরে কিন্তু তত সহজে মেটে নি। আমার অবচেতনে কিন্তু ঘটনাটা একটা গভীর দাগ রেখে দিয়েছিল। অথচ তখন তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়েছিলাম। যেমন কাজ করি, তেমনি কাজ করছিলাম। একবারের জন্যেও কিছু মনে হয় নি। মনে যেটুকু হয়েছিল, তা ঘটনাটা ভেবে হয়তো মনে মনে দু-একবার হেসেছিলাম।

'আসলে, সে-হাসি হাসি ছিল না। এখন তো নিজেরই মনে হয়, ওটা চিতাবাঘের হাসি। যে-হাসিতে হিংস্রতা থাকে।

'তারপরে নানান কাজে কর্মে, ঘটনাটা আর মনেই ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে ছিল না। ক্রিয়াটা ভিতরে ভিতরে চলছিল। নিজের অজান্তে, এক দুরারোগ্য ব্যাধির মত, সে ক্ষতি যা করবার করে যাচ্ছিল।

'কিন্তু দিনগুলো যেমনভাবে চলবার, ঠিক তেমনি ভাবেই চলছিল। সবকিছুই যেমন, নিরন্তর আবেগে চলছিল, তেমনই ছিল।

'ময়না যেমন আসছিল তেমনি আসছিল। ওদের সখীত্ব আগের থেকে আরো গভীর গাঢ় হয়েছিল। সম্পর্ক এবং অবস্থার জন্যে, যাও বা সামান্য একটু দ্বিধা বা আড়ষ্টতা ছিল, সময় তা একেবারেই হরণ করে নিয়েছিল।

'কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। প্রায়ই হয় তো ওরা হেসে দাপিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। আমাকে দেখলেই হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে যেত। ভাবতাম, মেয়েদের কত নিজস্ব গোপনীয়তা আছে, যা কিছুতেই লজ্জা কাটিয়ে বলা যায় না। তবু, মনটা একটু যে খচ্‌খচ্‌ না করত তা নয়।

'কখনো কখনো দেখেছি, ওরা দুজনে চুপি চুপি কথা বলছে। আমাকে দেখেই চুপ হয়ে যায়। বুঝতে পারতাম না, চুপিচুপি বলার মত এমন কি কথা থাকতে পারে, যা আমার সামনে বলা যায় না। কিন্তু, আমার ভিতরেও একটা সূক্ষ্ম অভিমানের ভাব ছিল। যার কথা, সে নিজে যদি না বলে, তা হলে তার জন্যে কাউকে পীড়াপীড়ি করা যায় না। বলবার মত হলে দীপা আমাকে নিশ্চই বলত।

'অনেকদিন দেখেছি, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দীপা আর ময়না ভিতরে। দরজায় শব্দ করলেই, টের পেতাম, ওরা যেন কী নিয়ে ভিতরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দিতে সময় লাগত।

'বেড়াতে যাবার ব্যাপারেও তাই। এক একদিন ওদের দুজনেরই এমন ত্রস্ত ব্যস্ততা লেগে যেত, আমিই অবাক হয়ে যেতাম। যেন বেড়াবার থেকেও বেশী, বিশেষ কোন কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি হেসে ঠাট্টা করে বলেছি, "কী ব্যাপার,

boiRboi.net

খুব জরুরী ব্যাপার নাকি ?"

'ওরা চোখে চোখে তাকিয়ে হাসত। কোন জবাব দিত না। যেন কী এক রহস্যে ওরা ঢাকা দিয়ে রাখত নিজেদের।

'কখনো যে আড়ি পেতে ওদের কথা শুনব, সে-প্রবৃত্তি আমার ছিল না। কিন্তু দিনগুলো চলছিল তেমনিই। কোন সময় আমার কাজ বেড়ে যেত, আবার কমে যেত। কমে গেলেই দীপা ছাড়া কিছু জানতাম না। তিনবছর এমনি কাটবার পর এক সময়ে মনে হল, আমাদের দুজনের মাঝখানে আর কেউ এলে ভাল হয়, যে আমাদের দুজনের মাঝখানের সেতু হয়ে উঠবে।...

★

'এমনি অবস্থায় একদিন আমি বিকেলের অসময়ে বাড়ি ফিরে এলাম। সে সময়ে আমার কাজের খুব চাপ, বছরের শুরু। খাতাপত্র দলিল দস্তাবেজ ছাড়াও লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, আদায় উশুল মাপ, সবই পুরাদমে চলেছে।

'কিন্তু একদিন আর ভাল লাগল না। বেলা চারটে নাগাদ ফিরে এলাম। দীপা জানত, আমি সন্ধ্যার পর ফিরব তাই ও বেরিয়েছিল ময়নার সঙ্গে, সে খবর আমাকে আগেই চিরকুটের মাধ্যমে ঝিয়ের হাত দিয়ে কুঠির কাছারিতে জানিয়ে দিয়েছিল, "ছোটবাবু, ময়নাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাচ্ছি—ইতি ছোটরাণী।"

'এ ভাবেই ও আমাকে সব সংবাদ দিত, যখন কাছে থাকতাম না।

'ভেবেছিলাম, আমিও বাইরে যাব, ওদের সঙ্গে গিয়ে মাঠে দেখা করব, একসঙ্গে ফিরে আসব। তাই পোশাক না ছেড়েই, মাথাটা আঁচড়ে নেবার জন্যে ড্রেসিং টেবলের কাছে গেলাম। চিরুনী তুলে, মাথা আঁচড়াতে গিয়ে দেখি, দেবলের ওপর ড্রয়ারের চাবিটা পড়ে রয়েছে। সেই ড্রয়ারের চাবি, যেটা দীপা আমাকে না খোলবার জন্যে দিব্য দিয়েছিল। গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল। ভাবলাম, খুলে দেখি তো কী আছে ড্রয়ারে। পরমুহূর্তেই ওর বারণের কথা মনে পড়ে গেল।

'তাই মাথা আঁচড়াতে লাগলাম। কিন্তু মনটা কিছুতেই মানতে চাইল না। চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। হেসে ভাবলাম, ওর জিনিস, আমি দেখব, তাতে কী হয়েছে ? নিশ্চয় ওটা ওর ছেলেমানুষী। বরং দেখে মনে মনে হাসব ! ওকে কিছুই বলব না।

এই ভেবে, আমি চাবিটা নিয়ে, সেই বন্ধ ড্রয়ারটা খুলে ফেললাম। হায়, সে সময়ে আমার হাতটা যদি অবশ হয়ে যেত। কোন অলৌকিক কারণে যদি হাতটা ভেঙে যেত, যাতে আমি চাবি না খুলতে পারি। কিন্তু তা না হলে নিয়তির হাতের পুতুল কেন আমি ! চাবিটা খুলতেই দেখি, একটা মস্তবড় খাম তার মধ্যে রয়েছে। এবং খামটা বেশ মোটা। তখন আমি কৌতূহলের শেষ সীমায়। তবু দেখব না ভেবে রাখতে গিয়েও, খামটা খুলে ফেললাম। দেখলাম, তার মধ্যে এক তাড়া চিঠি। এক তাড়া মানে অনেকগুলো। একটা চিঠি খুলে দেখলাম। আগের দিনের তারিখ দেওয়া রয়েছে, যার অর্থ, চিঠিগুলো বর্তমানের। সম্বোধন, প্রত্যেকটা চিঠিরই, "প্রিয়তমা" বলে।

'আমার বুকের মধ্যে তখন কী রকম করছিল, আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তলায় দেখলাম, প্রত্যেকটি চিঠিরই নিচে, ইতি লেখা আছে 'বি' বলে। প্রত্যেকটা চিঠি যতই পড়তে লাগলাম ততই বুকের মধ্যে একটা, সাপে ছোবলানো

boiRboi.net

বিষের মত যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমার সারা গায়ে ঘাম ঝরছিল, শরীরটা অবশ হয়ে আসছিল, আর কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। চিঠিগুলোর তারিখ দেখে মনে হচ্ছিল, প্রায় প্রতিদিন ধরেই লেখা, এরই কোন কোনটার ভাষা বললে, আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন, আমার কেন কষ্ট হচ্ছিল।

'যেমন ধরুন, এই ধরনের প্রায় প্রত্যেকটা চিঠিতেই ছিল,…"আমি জানি কুঠির কোন অংশে কখন তুমি রয়েছ, আর কখন উত্তরদিকের বারান্দায় আসবে, যাতে আমাকে বাগানে দেখতে পাও। আমার তো খালি ভয় হয়, কর্তা কখন আবার এসে পড়বেন। আমাকে হয়তো বাগানে দেখতে পাবেন, তা হলে তো আর কথা নেই, হৈ-চৈ লেগে যাবে। যাই বল, এভাবে বড় খারাপ লাগে।"

….'কিংবা ধরুন, "…গতকাল তুমি যখন গাড়িতে করে মাঠে এলে, থুড়ি, তুমি তো আবার গাড়ির কথা চিঠিতে উল্লেখ করতে বারণ করেছ, আমি তখন সেই আদ্যিকালের গাব গাছটার নিচে ছিলাম, তুমি দেখতে পাও নি। তারপরে তোমাকে কেমন চমকে দিয়েছিলাম? আচ্ছা বলতে পার তোমার এত লজ্জা কিসের? সন্ধ্যাবেলা মাঠে গাছের আড়ালেও একটু হাত ধরতে দিতে তোমার এত ভয়! তুমি যে বলেছিলে, সত্যি সত্যি আমার আশা পূরণ করবে, তা কবে কবে কবে?'…''

'তার পরের চিঠিতেই বোঝা গিয়েছিল, পত্রলেখকের আশা পূর্ণ হয়েছে।

'আর একটা চিঠি, যেমন ধরুন,…"উঃ গতগাল তোমাদের কর্তার কাছে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। সত্যি ও ভাবে তুমি আর আমাকে তোমাদের বাড়ির কাছে যেতে বলো না। কারণ আমি একটা মারামারি বাধাতে চাই না। তার পরিণতি স্বরূপ হয়তো তোমাকে চিরদিনের জন্যেই হারাবো। কিন্তু তোমাকে হারালে আমি কী নিয়ে থাকব? তবে হ্যাঁ, এই গোপন প্রেমের যন্ত্রণা নিয়ে আমি আর থাকতে পারছি না, একটা কিছু বিহিত করতেই হবে"…ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এমন সময়ে আমি হলঘরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, দীপা আসছে। মনে মনে বললাম, "অভিসারিকা অভিসার সেরে ফিরছে।"

তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো বড় খামে পুরে, ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি বন্ধ করে দিলাম এবং চাবিটা যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখলাম। আমি আবার চিরুণীটা হাতে করলাম।

'দীপা খুব তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকল, এবং প্রথমেই দেখল, চাবিটা আছে কি না। সেটা চকিতে হাতে নিল আমাকে একবার দেখে নিয়ে। ড্রয়ারটা টেনে দেখল বন্ধই আছে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "তুমি কখন এলে গো?"

'আশ্চর্য, কী বিচিত্র ছলনা! গলার স্বরে কোথাও একটু পরিবর্তন নেই, যেন আরো আবেগে আদুরে হয়ে উঠেছিল। আমি সেই মুহূর্তেই কথা বলতে পারছিলাম না। বারে বারে নিজেকে বলছিলাম, "না না, আমাকে শান্ত থাকতে দাও, শান্ত থাকতে দাও।" বলেছিলাম, "এই তো এলাম, একটু বেরুবো ভাবছি।"

'দীপা সেই প্রেমময়ী গলাতেই বলেছিল, "এখন আর বেরুবে কেন, সারাদিন কাজ করে এখন আর বেরুতে হবে না। কোথায়ই বা যাবে?"

'ভাবলাম, ওর হয়তো কোন অসুবিধা আছে, হয়তো, এই কুঠির আশেপাশেই কোথাও ওর সেই 'বি' লুকিয়ে আছে, জানালা দরজা দিয়ে যাকে দেখা যাবে।

বললাম, "ভাল লাগছে না, একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসি।"

'তারপরেই ও হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে চমকে উঠল, বলল, "তোমার কী হয়েছে? এ কি, তোমাকে এমন ফ্যাকাশে আর খারাপ দেখাচ্ছে কেন?"

'বললাম, "শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

'এই বলে যখন বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি, তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে বলল, "না-না, এ শরীর নিয়ে তোমাকে আমি বাইরে যেতে দিতে পারি না।"

'আঃ সেই স্পর্শে, আমি তো কই একবারও বুঝতে পারলাম না, অন্য পুরুষের আলিঙ্গন থেকে সে এই মাত্র ফিরে আসছে। আঃ। মানুষের অনুভূতি কত অন্ধ। সে কতটুকু জানে, কতটুকু বোঝে! মানুষ যেন কোন অহংকার না করে। সেই মুহূর্তে মনে হল, ওকে আঘাত করে ছুঁড়ে ফেলে দিই। পারলাম না। বললাম, "না, আমাকে একটু ঘুরে আসতেই হবে।"

'ও ভেবেছিল, মাঝে মাঝে কাজে কর্মে আমি একটু চিন্তিত এবং উত্তেজিত থাকি। তাই বলল, "তা হলে তাড়াতাড়ি চলে এস। আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

'আমি বেরিয়ে গেলাম। তখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। মাঠের দিকেই গেলাম। পথে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ ছাড়া কাউকেই দেখতে পেলাম না। কিন্তু বুকের যন্ত্রণাটা বাড়ছিল বৈ কমছিল না। তারপরে হঠাৎ আমার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। এমন গভীর অন্ধকার আমার চোখে আর নামে নি, এমন অসহায় আর কখনো বোধ করি নি। যদি পারতাম, তবে ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে কাঁদতাম। কিন্তু আমার সে উপায় ছিল না। আমার চোখের সামনে বাবা দাদাদের এবং বৌদিদের মুখগুলো ভাসছিল। মায়ের মুখখানি মনে পড়তেই বললাম, "তুমি তো সবই জানতে, কেন একটু অনুভূতিকে নাড়া দাও নি?"

'তারপরে সেই দক্ষিণেশ্বরের রক্তাক্ত আকাশ, আর একটি মুখ আমার চোখে ভেসে উঠল। সে কি আমি কোনদিন ভুলতে পারি? সে কি ভোলবার? আমার জীবনে সেই যে প্রথম ও শেষ। কিন্তু, কিন্তু এমন ভয়ংকর ছলনা সেখানে কেমন করে এল? এমন মিথ্যাচার? রক্তে? না জীবনযাপনের পদ্ধতিতে?

'সেই সময়ে আমার হাত শক্ত হয়ে উঠেছিল, আমার চোয়াল বাঘের মত কঠিন বোধ হচ্ছিল। শুধু পাগলের মত অন্ধকার মাঠে, নিশি পাওয়ার মত ঘুরতে লাগলাম। নেই, আলো নেই পৃথিবীর কোথাও। আমার বুকের অন্ধকারে আলো জ্বালায়, আর এমন আলো পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট নেই।

★

'অনেক রাত্রে বাড়ি এলাম। দীপার চোখে মুখে উদ্বেগ। আসা মাত্র সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "কী হয়েছে গো তোমার আজ?"

'আঃ ঈশ্বর, কে এদের গলায় এমন মাধুর্য দিয়েছিল, এত মমতা, এত প্রীতি, স্নেহ, স্নিগ্ধতা। ডাকিনী নাগিনী সকলের চোখে কি একই দৃষ্টি। সকলের গলায় কি একই স্বর। সকলের দেহে কি একই রক্ত-মাতাল সুধা। অন্ধকার, বড় অন্ধকার! বললাম, "কিছু না, এমনি একটু চিন্তায় পড়েছি।"

'তারপরে জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। দীপা যেমন করে আমাকে

boiRboi.net

রোজ খেতে দেয়, তেমনি করেই খেতে দিল। সেই নিটোল সুন্দর দুখানি হাত, কতদিন কত রূপে দেখেছি। সে হাত সেবায় একরকম, প্রেমে আর এক রকম। কতদিন না আমার দুষ্টামিতে দুম্ দুম্ করে মেরেছে, যে মার খেলে নেশা ধরে যায়।

'খেতে দিয়ে ও বারে বারে জানতে চাইল, আমার কী হয়েছে। শহর থেকে ডাক্তার ডাকবে কিনা। আমি বারণ করলাম। খেতে পারলাম না, দীপাও খেতে পারল না। দুজনেই শুতে গেলাম।

'ও যেমন করে রাত্রের কাপড় পরে ক্রীম মেখে শুতে আসে, তেমনি এল। আমি তখনো খাটের পাশে বসে আছি। ও খাটের ওপর এসে, আমার কোলের ওপর হাত রেখে বল, "ওগো, আমার মনটা খারাপ লাগছে, কী হয়েছে তোমার, আমাকে বল।"

'আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, আমার বুকের মধ্যে ফেটে যাচ্ছিল। আমার মনে হল, আমি নরকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার মধ্যে পিশাচের ভর হয়েছে। আমি ওকে দু হাতে চিত করে শুইয়ে দিলাম, এবং ওর দিকে তাকালাম! আঃ! এ যে সেই মুখখানি!

'দীপা ভাবল, স্বাভাবিকভাবেই আমি ওকে চুম্বন করব এবার। অস্ফুটে বলল, "কী গো?"

'আমি দু হাত দিয়ে ওর গলা ধরলাম, আর প্রাণপণ জোরে টিপতে লাগলাম, "ছলনা, ছলনা, এ বিশ্বের সকল ছলনার শেষ হোক, হে ঈশ্বর, শেষ হোক।"

'দীপা যেন বুঝতেই পারে নি, কী ঘটছে, তাই ও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাল। এবং দেখতে দেখতে সেই চোখ বড় হল, ফেটে বেরুতে চাইল, আর এক ফোঁটা জল ওর বাঁ চোখ থেকে বেরিয়ে গাল বেয়ে চিবুকের পাশ থেকে, আমার ডান হাতের এই কবজির পিঠে পড়ল। তারপর ও আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল।'

★

এই পর্যন্ত বলেই শুভেন্দুনারায়ণ চীৎকার করে উঠলেন, 'উঃ অসহ্য অসহ্য ডাক্তার, তাড়াতাড়ি একটু কিছু করে দাও, আমার জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।'

ডাক্তার তাড়াতাড়ি নিচের থেকে ছুরি নিয়ে এসে, একটু কেটে দিল আবার, এবং ওষুধও লাগিয়ে দিল। শুভেন্দু নারায়ণ যেন আরামে ঢলে পড়লেন, বললেন, 'আঃ তোমার ছুরিতে যত জ্বলে, ততই আরাম পাই। কাল আর একটু বেশী করে কেটে দিও ডাক্তার। তারপরে একেবারে শেষ করে দিও। কিন্তু আমার দম বন্ধ লাগছে, পুব দিকের জানালাটা খুলে দাও।'

ডাক্তার তাই দিল। দেখা গেল পুবের আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। শুভেন্দুনারায়ণ সেদিকে তাকালেন।

ডাক্তার বলল, 'দেখুন, মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। সে কথা চিরদিন মনে রেখে এই কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। আপনি তার কথা ভুলে যান।'

শুভেন্দুনারায়ণ চমকে উঠে বললেন, 'ভুলে যাব? ভুলে যেতে বলছ তুমি? তা হলে এর পরের অংশটুকু শুনে নাও, তারপরে তুমি ভুলতে পার কিনা ভেবে দেখো, পরে আমাকে বলো।'

'পরের দিন সবাই জানল, দীপা মারা গিয়েছে। হয়তো অনেকের সন্দেহ

boiRboi.net

হয়েছিল, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস কারুর ছিল না। এ অঞ্চলে যেখানে শব-দাহ হয়, সেখানেই দীপাকে দাহ করা হল। তারপরে আমি ভাবতে বসলাম, কী করব। বাবা দাদাদের কাছে ফিরে যাব? সেটা পারলাম না। তবে দিনেমার কুঠি গুটিয়ে চলে যাব, এটাই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তখন, আপাততঃ কিছুদিন বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলাম।

'দীপার হত্যার সাতদিন পরে বিকেলে আমি শোবার ঘরেই বসে আছি। তারপর দিন বাইরে যাব।

'এমন সময়ে ময়না এল। ও বেচারী তখনো কাঁদছিল। আমার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। যদিও সেই কান্নায় আমার কোন সমবেদনা ছিল না। কারণ আমি অনুমান করেছিলাম, দীপার অভিসারের সে দূতী। বললাম, "কিছু বলছ ময়না?"

'বলল, "হ্যাঁ, এ সময়ে বলতে অবিশ্যি খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু আপনি কাল চলে যাবেন শুনে, না এসে পারলাম না।"

"কী বল?"

'দেখলাম, দুঃখের মধ্যেও ময়নার গালে একটু লজ্জার রক্তাভা। বলল, "ড্রেসিং টেবলের একটা চাবি দেওয়া ড্রয়ারে, আমার কতগুলো চিঠি বৌদির কাছে রেখেছিলাম—।"

'আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম, "কী বলছ তুমি?"

"রাগ করবেন না ছোটদাদাবাবু, আপনাকে কোনদিন বলতে হবে জানতাম না। বৌদি অবিশ্যি কোনদিনই আপনাকে দেখান নি, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ওগুলো আপনাকে কখনো দেখাবেন না।"

'মনে হল, তখনই পাগল হয়ে যাব, শুধু আমি ধৈর্য ধরে বললাম, "আমাকে সব বুঝিয়ে বল ময়না, সব বল আমাকে, বৌদিকে যা বলতে পার, আমাকেও তা পার, বল!"

'ময়না বলল, "বিমল নামে একটি ছেলে আমাকে ভালবাসে, কাছের শহরেই থাকে। কিন্তু বাড়িতে খুবই আপত্তি, ছেলেটি কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ। বৌদিকে সবই বলেছিলাম, তিনি আমাকে সমর্থন করতেন, ছেলেটিকে নিজের চোখে দেখেছিলেন। আমি যে বৌদির সঙ্গে বাইরে যেতাম, তার কারণও বিমলের সঙ্গে দেখা করতেই। কিন্তু চিঠিতে যেন বৌদি বা কারুর নাম কখনো লেখা না থাকে, সাবধান করা ছিল, কারণ কারুর হাতে যদি পড়ে। তবে সবাই সবকিছু জেনে যাবে। আমি আপনাকে মিথ্যে বলব না ছোটদাদাবাবু, আপনি ইচ্ছে করলে, চিঠিগুলো খুলে দেখতেও পারেন।"

'আঃ! আঃ! ডাক্তার, বল, ভুলতে পারবে! চিঠিগুলো আমি সবই দিয়ে দিয়েছি ময়নাকে, কিন্তু নিজে যে নরকের সৃষ্টি করেছি, আমি তারই মধ্যে পাক খেয়ে মরছি। পারবে ভুলতে, ডাক্তার? দীপাকে ভুলতে পারবে, আমার দীপালিকাকে?'

পুবের আকাশে তখন রক্তাভা ফুটে উঠেছে।*

---

* বিদেশী ছায়ায়

boiRboi.net

অন্ধকার গভীর গভীরতর

boiRboi.net

মানুষের জীবন একদিকে যেমন বিস্ময়কর, আর একদিকে তেমনিই অপ্রাকৃত। কথাগুলো বিশ্বাস করবার হেতু ঘটেছে, আমার নিজের জীবনের কিছু ঘটনায়। আমি জ্ঞানত সেরকম কোনো পাপ না করেও, পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত, অথচ তার কোনো কারণ থাকা উচিত না। প্রায় অন্যমনস্ক অবস্থায়, আমি যেন শিউরে শিউরে উঠি, মনে হয়, একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে আমি মরে যাচ্ছি।

কিন্তু এসব কথা বলার আগে, প্রস্তাবনা স্বরূপ, আমার নিজের পরিচয়টা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি, এবং সেই সঙ্গে, আমার নিজেকে যতোটুকু জানা আছে, আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আচার-আচরণ ভালো-মন্দ লাগাগুলো বলে নিতে চাই। আমি একটি ব্যাংকের হেড অফিসের ম্যানেজার। চাকরির দিক থেকে খুবই লোভনীয় চাকরি আমার। তিন হাজার টাকা বেতন পাই। কলকাতায় পৈতৃক বাড়িতে বাস করি, এবং সেটা দক্ষিণ ঘেঁষে, মধ্য কলকাতার মতো জায়গায়। আমার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান বর্তমান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। আমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

পারিবারিক এবং সাংসারিক ও সামাজিক জীবনধারণের ক্ষেত্রে, যেগুলো থাকলে, মানুষ নিজেকে মোটামুটি সচ্ছল ও সুখী মনে করতে পারে, আমার প্রায় তার সবই আছে। বাড়ি গাড়ি টেলিফোন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে কোনো কথাই উঠতে পারে না। আমার স্ত্রীর বয়স তেত্রিশ। তেমন একটা রূপসী না হলেও, মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। এখনো স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। দাম্পত্য জীবনের দিক থেকে খুব একটা অসুখী বলা যায় না, তবে কিছুটা ঈর্ষায় সব সময়েই প্রায় ভোগে, এবং তার হেতু আমিই। ওর প্রতি আমি নিরাসক্ত না, কিন্তু যাকে বলা যায় ফেইথফুল হাজব্যান্ড, আমাকে ঠিক তা বলা যাবে না। যদিচ আমার স্ত্রী কখনো আমাকে অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখে নি, তথাপি, আমি জানি, নানা লোকে নানা কথা ওর কাছে বলে। যারা বলে, তারা হয় তো তিলকে তাল করতে ভালবাসে, কিন্তু তিল পরিমাণ ব্যাপারটার মধ্যে সত্যতা আছে।

তাছাড়া, লোকের কথা বাদ দিলে, আমার স্ত্রী নিশ্চয় আমাকে কিছুটা বুঝতে পারে। এবং সে আমাকে অনুযোগ করতে ছাড়ে না যে, আমি পুরোপুরি বিশ্বাসী স্বামী না। দু'একজন মহিলার বিষয়ে ও জানে, আমি তাদের একটু অনুরক্ত, মেলামেশাও করি। যা ও খুব সুনজরে দেখে না।

কিন্তু এসব কথায় পরে আসছি। কেন না, আমার স্ত্রীর পার্সপেক্‌টে, আমাকে আমি উপস্থিত করতে চাই না। নিজের বিষয় নিজেই ব্যক্ত করবো। আমার ছেলের বয়স প্রায় বারো, কন্যার বয়স আট। এখনো তাদের নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কিছু দেখা দেয় নি। ওরা দুজনেই আমাদের অত্যন্ত অনুরক্ত সন্তান, আমরাও ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী বাবা-মা।

এর পরে আমি আমার নিজের কথায় আসি। আমি আমার চাকরির ক্ষেত্রে কখনোই প্রায় দায়িত্ববোধহীনতার পরিচয় দিই না। কাজে কেউ ফাঁকি দিলেও আমি বিরক্তবোধ

boiRboi.net

করি। সেজন্য অফিসে আমি সকলের প্রিয় হতে পারি নি। আবার অনেকের প্রিয়ও আছি। আমার আচরণে মোটামুটি সকলেই, অন্তত সামনাসামনি খুশি। আমি মুখ গোমড়া করে একটা মুহূর্তও থাকতে পারি না। এমন কি কারোর কাজের গাফিলতির সময়েও, আমি মোটেই মেজাজ গরম করে, চড়া স্বরে কথা বলি না। আমি খুব দুঃখিত ও ম্রিয়মাণভাবে সমালোচনা করি। খুব বিক্ষুব্ধ হলে, খানিকটা অভিমানহতভাবে নীরব থাকি, অথবা বড়জোর বলি, ইম্‌পসিবল, আমি আর এভাবে চাকরি করতে পারছি না।

অর্থাৎ, আমি অপরের মনে অনুশোচনাবোধ জাগিয়া তুলতে চাই, যাতে সে তার কাজ সম্পর্কে নিজেকে শুধরে নিতে পারে। যদিও বর্তমানকালটা আমার এইসব আচরণ-বিধির সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে চলতে চায় না, তথাপি স্বীকার করতেই হবে, আমি সার্থক। আমি ভারিক্কি গম্ভীর চালে, কখনো কথা বলি না। আমার বয়সের তুলনায়, আমি তরুণের মতো ব্যবহার করবার চেষ্টা করি। অবিশ্যি, হাসতে হাসতে বলতে পারি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, আমার চেহারাটি ভালোই, এবং গোপনে বলতে পারি, অনেকের হিংসার পাত্র। পোশাক-আশাকের দিকে আমার নজর খুবই সচেতন। নিজেকে, চুল থেকে পা পর্যন্ত সাজাতে ভালবাসি, এবং কী পোশাকে মানায়, আমি তা জানি। আসলে, বলা যেতে পারে, আমি সব সময়েই স্মার্ট থাকতে চেষ্টা করি। যে কারণে আমার বন্ধুরা বলে থাকে, আমাকে মোটেই একজন রেসপন্‌সিবল্‌ কর্মকর্তা বলে মনে হয় না। ডনজুয়ান ছোকরা বলে মনে হয়।

বন্ধুরা আমাকে কেউ কেউ লেডিকিলারও বলে। অফিসেও বলে। এবং আমি জানি, আমার অফিসের মেয়েকর্মীরা আমার দিকে কী চোখে তাকায়। অবিশ্যি আমি সেখানে যথেষ্ট সাবধানে থাকি, এমন কি কোনো কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখতে ভালো লাগা সত্ত্বেও। এমনিতেই আমাকে নিয়ে নানারকম কথা হয়, আমি আর অফিসের লোকদের মুখর করতে চাই না, ঈর্ষাকাতরও না।

আমি সত্যিই একজন লেডিকিলার কিনা জানি না, তবে অনেকের প্রীতি এবং অনুরাগ আমার ভাগ্যে জুটেছে। আমি নিজেও মেয়েদের সম্পর্কে, বলতে গেলে, একটু বেশি মাত্রায় দুর্বল। অবসর এবং অবকাশের সময়ে, আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতেই ভালবাসি। যদিও তা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বরং অনেক সময় বান্ধবীদের বঞ্চিতই করতে হয় আমাকে। এবং তার জন্য মনে মনে অনুশোচনা হয়, এবং বিক্ষুব্ধ হলেও, কিছু করার থাকে না, কারণ কোনো অনিবার্য হেতু না থাকলে, বান্ধবীদের সান্নিধ্য আমি কখনোই ছাড়তে চাই না।

অতএব বলা যেতে পারে, মেয়েদের প্রতি আমার যথেষ্ট আসক্তি আছে, আর সেই সঙ্গেই আছে সুরার ওপর। সুরাপান করতে ভালবাসি বললে ভুল হবে, আমি রীতি-মতো সুরাসক্ত। আর সুরাপান করে, রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকবার পাত্র আমি না। বোধহয় সুরাসক্ত ব্যক্তিরা কেউ তা নয়। একটু হাসি খুশি নাচ গান করতে পেলে খুবই খুশি। যে কারণে একলা মদ্যপান, আমি চিন্তাই করতে পারি না, আর ভালো লাগে না, একান্তই পুরুষের আড্ডায় বাস, মদ্যপান আর মেয়েদের নিয়ে রসালো গল্প। ওটা আমার কাছে ভালগারিটি বলে মনে হয়। তার চেয়ে, মেয়েদের সঙ্গে বসে পান করা

boiRboi.net

অনেক ভালো। সেখানে প্রেমালাপ না হোক, এমন কি রসালাপ না হয়ে যদি অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়, তাতে আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

এর পরে, বোধহয়, ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না, আমার স্ত্রী কেন কিছুটা ঈর্ষায় ভোগেন। এ ক্ষেত্রে আমার অনেকবারই মনে হয়েছে, ঠিক একই ব্যাপার যদি আমার স্ত্রী করতেন, তা হলে আমি কি করতাম। জানি, আমার স্বীকারোক্তি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমার স্ত্রী যদি আনন্দ পান, অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশে, আমি আপত্তি করবো না। সত্যি বলতে কি, তিনি যদি কিছু করেনই, আমার আপত্তিতে কী যায় আসে? কেন না, আমার মতো, তিনিও নিশ্চয়ই জানিয়ে কিছু করবেন না। তথাপি আমি বলবো, ওর যদি কারোকে ভালো লাগে, তা হলে ও তার সঙ্গে মিশতে পারে, অবিশ্যিই এর দায়-দায়িত্ব তার নিজেরই, ও কী ভাবে পরিবার ও সমাজে সেটাকে রূপদান করবে।

এর পরে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভালবাসা বলে ব্যাপারটা তা হলে শূন্য নাকি?

আমি খুবই বেকাদায় পড়ে যাই। সত্যি, এর সঠিক কোনো জবাব আমার জানা নেই। অথচ জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, আমি চোখের জল রোধ করতে পারি নি, বুক টনটন করেছে, ব্যথা বোধ করেছি। আর সেসব বিভিন্ন কারণে, তার সঙ্গে আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আমার স্ত্রীকে যখন আমি কখনো একলা বিষাদভরা মুখ নিয়ে বসে থাকতে দেখেছি, তখন আমার বুকে কেমন একা কষ্ট বিঁধে যায়। সন্তান প্রসবের সময় গভীর উদ্বেগ বোধ করেছি, এবং দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিট এবং সুখ প্রশ্নের অতীত। কিন্তু ভালবাসা? আমি জানি না, সত্যি জানি না, লোকে যে এতো ভালবাসা বলে, তার সঠিক অর্থটা কী।

আমার নিজের এই মোটামুটি পরিচয়ের পরে, আমি যা বলতে চাইছিলাম, সে কথাই বলি। নিজের বিষয়ে যে সব কথা বললাম, সে সব বিষয়জাত কারণেই যে আমি পাপবোধে আক্রান্ত, এ কথা আমার কখনো মনে হয় না। আমি যেন এক অজ্ঞাত কারণে পাপবোধে আক্রান্ত, যে পাপবোধে, মাঝে মাঝে আমি শিউরে উঠি। আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়, অনেকটা মূর্ছাগ্রস্তের মতো হয়ে পড়ি, এবং সেটা কখন কী ভাবে আসে, আমি আগে থেকে কিছুই জানতে পারি না। আমি জানি না, যারা এপিলেপ্সিতে ভোগে, তারা আগে থেকে, শরীরে মনে বা মস্তিষ্কে কিছু অনুভব করে কী না।

তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমার জীবনযাত্রার যে সব প্রণালীর কথা বললাম, তার সঙ্গে সেই অজ্ঞাত পাপবোধের কোনো যোগাযোগ আমি কখনো অনুভব করি নি।

* * *

টা রাখলাম।'

ঘুমটা আমার পাতলা হয়েই এসেছিল। রাস্তার যানবাহনের শব্দ পাচ্ছিলাম। দূরের ট্রাম রাস্তার ট্রামের ঘর্ঘর বা ভারি মোটরবাসের গর্জনও কানে আসছিল। পুত্র-কন্যার কণ্ঠস্বর একটু-আধটু শুনতে পাচ্ছিলাম। এখনকার অবস্থাটাকে ঘুম বলে না। জেগে ওঠবার আগে, একটা ঘোর মাত্র।

boiRboi.net

সকালবেলার প্রথম চা, শোবার ঘরে আমার স্ত্রী-ই দেয়। আমি জবাব দিলাম, 'হুম্ !'

'বেশি দেরি করো না, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পৌনে আটটা বেজেছে।'

একথাও ও রোজই বলে। যদিচ, আমি প্রায় কখনোই তারপরে আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকি না। কালে-ভদ্রে কখনো কখনো হয়ে থাকতে পারে। এ কথা বলেই ও চলে যায়। আমি উঠে বসলাম। চৈত্র মাস। গরম মোটামুটি বেশ পড়েছে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। তবে কলকাতার চৈত্র মাসের প্রকৃতি আমার বেশ ভালোই লাগে। কলকাতাকে যে যাই বলুক বা মনে করুক, আমি কিন্তু চৈত্র মাসে কলকাতায় মধুমাসেরই রস পাই।

আমি খাট থেকে নেমে, সামনের টেবিলের কাছে চেয়ারে বসলাম। ইংরেজি আর বাঙলা খবরের কাগজটা চোখের সামনেই। আমি সেদিকে চোখ রেখে, চায়ের কাপের হাতলে হাত দিয়ে কাপ তুলতে গিয়ে, বুড়ো আঙুলে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করলাম। চায়ের কাপটা তুলতে পারলাম না। আঙুলটা চোখের সামনে তুলে দেখলাম, একটু ফুলেছে, একটা নীলশিটা দাগও পড়েছে। কখন কী ভাবে লাগলো, কিছু মনে করতে পারছি না। বাঁ হাত দিয়ে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা হেলাতে গিয়ে দেখলাম, ব্যথা অনুভূত হচ্ছে এবং আঙুলটা বেশ গরম।

আমি বাঁ হাতে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিলাম, এবং অনেক ভাববার চেষ্টা করলাম, বুড়ো আঙুলটায়, কখন কিভাবে লাগলো। যেন মচকে গিয়েছে, বা কেউ জোর করে ধরে মটকে দিয়েছে, সেরকম একটা ভাব। কী হতে পারে, কিছুই বুঝতে পারছি না। আঙুলটা আমি গালে ঠেকালাম, বেশ গরম। ভয় লাগে, প্লেগ রোগ নাকি এ ভাবেই প্রথম দেখা দেয়। আঙুল ফুলে, ব্যথা হয়, আর সেটা বুড়ো আঙুলই।

এমন সময় আমার স্ত্রী এলো। ওর নাম রমা। জিজ্ঞেস করলাম, 'রমা, গতকাল রাত্রে ফিরে, আমি কি তোমাকে আঙুলের ব্যথার কথা কিছু বলেছিলাম ?'

রমা অবাক হয়ে বললো, 'না তো ? কোন্ আঙুলে ব্যথা ?'

আমি ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখালাম। ও স্পর্শ করে বললো, 'এ তো বেশ লেগেছে দেখছি। কী করে লাগালে ? কাল রাত্রে কিছু বলো নি তো ?'

বললাম, 'জানিই না তো কিছু। এখন চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে ব্যথা টের পেলাম, তার পরে দেখছি, ফুলেছে !'

'নীলশিটা দাগও তো পড়েছে দেখছি। গাড়ির দরজায় চেপটে যায় নি তো ?'

'মনে পড়ছে না তো ?'

'কাল তো তুমি সেরকম একটা বেহুঁশ ছিলে না ? ড্রিংক খুব কম করো নি, তবে টালমাটাল অবস্থা ছিল না। কিন্তু—'

রমা চুপ করে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কী ?'

রমা ঠোঁট টিপে হেসে, আমার খাটের দিকে সরে গিয়ে বললো, 'তোমার গা থেকে খুব ইনটিমেসির গন্ধ বেরোচ্ছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মেখে বেরোও নি তো, তাই বলছি।'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, এখন আর রমা হাসছে না, মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে

boiRboi.net

এসেছে। আমি মুখ ফিরিয়ে, চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। আমার চোখের সামনে রূপোর মুখ ভেসে উঠলো। মনে পড়লো, গতকাল রাত্রে আমি রূপোর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। রূপো অবিশ্যি আজকাল বম্বেতে থাকে। কয়েকদিন হল এসেছে। ও ডিভোর্সি ওয়াইফ। বম্বেতে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। এক ছেলে, বছর ছয়েক বয়েস, ও বম্বেতেই রূপোর সঙ্গে থাকে। রূপোকে মাঝে মাঝে চাকরির ব্যাপারেই কলকাতায় আসতে হয়। পুরনো বান্ধবী। এলেই খবর দেয়। সুরাপ্রীতিটা ওরও আছে। ধূমপানও করে। বয়েস এখন বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। আমরা ভোলাপচুয়াস বলি, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী ধরনের মেয়ে। ড্রিংক করলে বেশ ওয়াইল্ড হয়ে ওঠে। রূপ আর স্বাস্থ্য, দুটোই এখনো বেশ বজায় রেখেছে। মনে পড়ে গেল, গতকাল রাত্রে ওর ওখানে গিয়েছিলাম। আমি হেসে রমাকে বললাম, 'যেসব মেয়েরা সেণ্ট ব্যবহার করে, তাদের সামনে গেলেই গায়ে গন্ধ এসে যায়।'

রমা বললো, 'অ্যাজ পার য়োর থিওরি। তুমি তো এখন সিগারেট খাবে। আমি একটু নুন গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, আঙুলটা একটু ডুবিয়ে রাখো। আরাম হবে।'

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, কাল রাত্রি থেকেই ওর মন খারাপ হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, গতকাল রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়েছি কী না। মনে করতে পারছি না। তবে আমি গত রাত্রে তো নাকি বেশ সোবার ছিলাম। তা হলে নিশ্চয়ই বাড়িতে এসে খেয়েছি। না খেলে, রমা বোধহয় এখনই আমাকে কিছু বলতো। গতকাল রাত্রে রূপোর ওখানে গেলাম, রূপো স্কচের বোতল বের করলো। ঝি এসে সোডার বোতল আর ওপ্নার এনে দিয়ে গেল। আমরা ড্রিংক করলাম। বোধহয় কিছু খাবারও ছিল।

আমার তেমন খেতে ইচ্ছে ছিল না। মনও ছিল না। দু-এক পেগের পরেই, রূপোকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলাম, এটা মনে আছে। রূপোও তার প্রায় আগ্রাসী প্রতিদান দিল, তাও মনে করতে পারছি। তারপরে···তারপরে একেবারে ব্ল্যাকআউট। কিছুই মনে করতে পারছি না। জামাটামা খুলেছিলাম কিনা, কিছুই মনে নেই। বোধহয় জামা খুলেছিলাম। তা না হলে জামায় রূপোর লিপস্টিকের দাগ লাগতো। এখন যেন আবছা মনে পড়ছে, রূপোর সঙ্গে গতকাল কিছুই বোধহয় বাদ যায় নি। আবছা হলেও, ওর নিরাবরণ শরীরটার ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে, এবং সেই সঙ্গে ওর উজ্জ্বল আরণ্যক আচরণ। কিংবা ভুল ভাবছি, আর কিছুই মনে করতে পারছি না। কি ভাবে বিদায় নিয়েছি, গাড়িতে উঠেছি, বাড়ি এসেছি, খেয়েছি, এবং রমার সঙ্গেও আমার মিলন ঘটেছে কি না, কিছুই মনে করতে পারছি না। পায়জামাটা যে কি ভাবে পরেছি, তাও মনে নেই। সম্ভবত রমাই পরিয়ে দিয়েছে, কারণ আমার সে অবস্থায় চাকর-বাকরো কেউ আমার সামনে বিশেষ আসে না। রমাই তাদের আসতে দেয় না। মোটামুটিভাবে, রাত্রে বাড়ি ফিরে আসার পরে, সমস্ত দায়িত্ব রমার।

আমি আঙুলটা তুলে আবার দেখলাম। না, কিছুই মনে করতে পারছি না। ফোলা নীলশিটা দাগ, ব্যথা, সব কিছু থেকে রমার কথাটাই সত্যি বলে মনে হয়, যেন গাড়ির দরজায় বা সেই রকম ভাবেই কোথাও বুড়ো আঙুলটা চেপ্টে গিয়েছিল। তখন খেয়াল থাকলে নিশ্চয়ই আমি আঙুলটা ঠাণ্ডা জলে ডোবাতাম, বা রূপোর বাড়িতে

কিছু ঘটলে, ওর ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে, আঙুলে ঘষতাম। কখন কি ভাবে, কি ঘটেছে, কিছুই মনে নেই। টোটাল ব্ল্যাকআউট, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমার মস্তিষ্কের কোষে। কিছুই মনে করতে পারছি না।

অফিসে কিছু হয়ে থাকলে মনে থাকতো। অফিসের প্রায় প্রত্যেকটি কথাই আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমানত বা পেমেণ্ট, ছুটির দরখাস্ত, ইউনিয়নের নোটিশ, অফিস ক্লাবের নাটক এবং বিশেষ বিশেষ যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সবকিছু, সকলের কথাই আমার মনে আছে। অফিসে সারাদিন বারে বারেই রূপার কথা মনে পড়েছে, তাও আমার মনে আছে। কাজ শেষ করে কখন রূপার কাছে যাবো, সেটা আমার মনে মনে বেশ ক্রিয়া করেছিল। সেখানে আমার আঙুলে কোনোরকম লাগলে, একটা রীতিমতো ব্যস্ততা লেগে যেতো। তা ছাড়া, সেখানে আঙুলে লাগবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

রূপা কি আমার এই বুড়ো আঙুলটা কামড়ে দিয়েছিল? একটু মেতে তেতে গেলে, রূপার দাঁত জিভ একটু বেশি কাজ করে। জিভ যে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, তা শুধু না। নানাভাবেই তা ক্রিয়াশীল। এবং দাঁতও সেই রকম। কিন্তু আঙুলটা দেখে মনে হচ্ছে, এটা দংশনের আঘাত না। তা ছাড়া রূপা জানে, আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে, রমার সামনে এসে দাঁড়াতে হবে, ও কোনো দাগ রেখে দেবে না, যাতে আমি কোনো রকমে বিব্রত হতে পারি বা অস্বস্তিতে পড়তে পারি।

রমা—আমার স্ত্রী, ও অবিশ্যি আমাকে যখনই আদর করে চুমো খায়, তখনই একটু ঠাট্টা করে বলে, কতো চুমোর দাগ যে এ ঠোঁটে আছে, আমার আর ইচ্ছা করে না। যদিচ তথাপি খায়। রূপা, আমার এখন মনে পড়ছে, গতকাল একবার আমার ঠোঁটে দংশন করেছিল, তখন ও রীতিমতো তেতেই ছিল, আমিই আত্মরক্ষা করেছিলাম। অবিশ্যি আমি তখন ওকে রমার কথা বলি নি, তা হলে ওর জেদ বেড়ে যেতো, এবং একটা দাগ রেখে দেবার চেষ্টা করতো। এ সব বিষয়ে, মেয়েরা বোধহয় একটু প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়, অথবা ব্যাপারটা মোটেই তা না, নিতান্তই প্রকৃতিজাত—অর্থাৎ ইনস্টিংকট যাকে বলে।

চা শেষ করে, আমি সিগারেট ধরালাম। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে, অন্যমনস্ক-ভাবে চোখ বোলাতে গেলাম, চাকর একটা চিনেমাটির পাত্রে নুন গরম জল নিয়ে এল। বললো, 'মা আপনাকে আঙুল ডোবাতে বললেন।'

বাটিটা রেখে ও চলে গেল। আমি আঙুলটা ডুবিয়েই তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম। জলটা এখনো বেশ গরম, ডুবিয়ে রাখা যায় না। পিছন থেকে রমার গলা শুনতে পেলাম, 'একটু কষ্ট করে আঙুলটা ডোবাও। অনেক গরম তো সহ্য করো, এটাও একটু করো।'

ও যে আবার কখন ঘরে ঢুকেছে, খেয়াল করি নি। হেসে বললাম, 'আমার মতো অফিসে কাজ করতে হলে, তোমাকেও গরম সহ্য করতে হতো।'

রমা বললো, 'আমি তোমার অফিসের গরমের কথা বলি নি।'

'তবে আবার গরম কী। আমি তো জানি, অফিসের সবাই গরম হয়ে আছে, আর সেই গরম আমাকে সহ্য করতে হয়।'

boiRboi.net

'তুমি ভালোই জানো, আমি কোন্ গরমের কথা বলছি। আঙুলটা ডোবাও।'

আমি মুখ ফিরিয়ে রমার দিকে দেখলাম। ও ওয়ারড্রব খুলে, আমার শার্ট আর টাই বের করে, মিলিয়ে দেখছে, ঠিক ম্যাচ করছে কী না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে না। আমি বুড়ো আঙুলটা আবার গরম জলে ডোবালাম, 'তোমার গরমের কথা বলছো ?'

রমার জবাব শোনা গেল, 'ভালোই জানো, আমার আর কোনো গরম নেই। তুমিই এখনো অগ্নিশ্বর।'

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'কথাটা কি ঠিক বললে রমু, তোমার আর কোনো উত্তাপ নেই ? তোমার উত্তাপেই আমি অগ্নিশ্বর।'

'থাক আর ও ঠাট্টাটা করো না। কাল রাত্রে কোথায় কার কাছে গেছলে বলো তো ?'

আমি বেশ সচেতনভাবেই, তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'ক্লাবে গেছলাম বলেই তো মনে পড়ছে যেন।'

'মনে নেই ?'

'মনে আছে, ক্লাবেই গেছলাম।'

'কাদের সঙ্গে বসেছিলে ?'

'সেটা ঠিক সব মনে নেই। কিছু ননবেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ছিল মনে হচ্ছে।'

'সকলেই লেডিজ, না জেণ্টলম্যানও ছিলেন ?'

'কমবাইনড—বোধহয়।'

'বোধহয় ?'

হেসে ফেললাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ এত জেরা করতে শুরু করলে কেন বলো তো ?'

রমা বললো, 'জানতে চাইছি, আঙুলটায় ওভাবে লাগলো কেমন করে। কারোর সঙ্গে মারামারি করতে হয় নি তো ?'

'মারামারি ?'

'অসম্ভব কি ? কারোকে নিয়ে হয়তো কমপিটিশন লেগে গেছলো।'

'তার মানে, প্রেমের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বলছো ?'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম। রমা বললো, 'প্রেম কি না জানি না, দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে পারে তো ?'

হেসেই বললাম, 'ওটা কোনোদিন করেছি বলে তো মনে করতে পারি না। আজকাল কি আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের যুগ আছে ?'

রমা বললো, 'আছে নিশ্চয়ই, ভিন্ন রূপে, সেটা তুমি ভালোই জানো। দ্যাখো, এই জামা আর টাই রাখলাম, পরবে ?'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, র সিল্কের হাই কলার সোনালি শার্ট, কোর্স কাপড়ের রাঙা নাগা টাই।

বললাম, 'চমৎকার, এ টাইটা অনেক দিন পরি নি।'

টাইটার রঙ রাঢ় দেশের লাল মাটির মতো, গেরুয়া রঙ যাকে বলে, আর লাল

boiRboi.net

তীরের ফলা, এমব্রয়ডারি করা। রমা বললো, 'কোন্‌টাই বা পরছো। আমি যা বেছে দিই, তাই তো পরো।'

বললাম, 'তোমার পছন্দই, আমার পছন্দ।'

রমা বললো, 'শুনতে খুবই ভালো লাগে। আঙুলটা কেউ কামড়ে দেয় নি তো, কোন বান্ধবী ?'

রমা মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে নি। বললাম, 'সে রকম কোনো বাঘিনীর কথা তো মনে করতে পারছি না।'

রূপাকে নিয়ে প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছিল। রমা বললো, 'বাঘিনী কেন, মানবীরাও মাঝে মাঝে দাঁত বসাতে ভালবাসে।'

রমা দাঁত বসায়, তবে তেমন মারাত্মক কিছু না, অর্থাৎ রূপার মতো না। বা আমার আরো দু'একটি বান্ধবী যেমন আছে, দাঁত বসাতেই তাদের তুষ্টি। সেটা সাদিজম্‌ কিনা, জানি না। আঙুলটা গরম জলে ডুবিয়ে, এখন আরো বেশি লাল হয়ে উঠেছে। তুলে রমার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি মনে হয়, এটা কামড়াবার দাগ ? কামড়ালে তো রক্তপাত হতো। এ তো যেন রক্ত জমে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'জানি।'

'তবে, কামড়াবার কথা বললে কেন ?'

'চেষ্টা করে দেখছি, তোমার মনে পড়ে কী না।'

রমা আমার কাছে এসে আঙুলটা ছুঁয়ে দেখলো। একটু টিপে দিতেই, আর্তনাদ করে উঠলাম, 'উহ্‌, ব্যথা !'

রমা বললো, 'আঙুলটা বাঁকাতে পারছো না ?'

চেষ্টা করে দেখলাম, পারলাম না। রমা ভুরু কুঁচকে, চিন্তিত মুখে বললো, 'ফ্রাকচার হয় নি তো ? অফিসে যাওয়ার পথে, ডক্টর ব্যানার্জিকে একবার দেখিয়ে যেও। কী যে বলবো তোমাকে, হাতে কী করে লাগলো, তা পর্যন্ত তোমার মনে নেই।'

আমি বললাম, 'আজ অফিসে গিয়ে কলম ধরতে পারবো না, লিখতে সই করতেও পারবো না।'

রমা ঘর ছেড়ে, চলে যেতে যেতে বললো, 'ডক্টর ব্যানার্জি কী বলেন শোনো, যদি এক্সরে করতে বলেন, করো আর ওষুধ দিলে খেও। ব্যথা বাড়লে বাড়ি চলে এসো, অফিসে বসে থেকো না।'

রমার চলে যাওয়া শরীরের পিছন দিকে তাকিয়ে বললাম, 'অফিসে কি আমি বসে থাকি নাকি ?'

রমা ফিরে বললো, 'না, শুনেছি তোমাদের ব্যাংকও তো নাকি এখন প্রমীলারাজ্য হয়েছে।'

বলেই, বারান্দার ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি হাসলাম, রমা খবর কিছু কম রাখে না। গরম জলটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। বেশ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছি, নিয়মিত। এভাবে ভুগলে পাইলস্‌ অবশ্যম্ভাবী। দাঁত মেজে দাড়ি কামাবার সময় দেখতে পেলাম, আমার ঠোঁট

boiRboi.net

দুটো যেন আজ অতিরিক্ত লাল দেখাচ্ছে। চোখ দুটিও এখনো বেশ লাল। কপালের সামনে, আর জুলফির কাছে কয়েকটি শাদা চুল দেখা যাচ্ছে। মুনাকে তুলে দিতে বলবো, মানে আমার মেয়েকে। ও বেশ পটপট করে তুলে দিতে পারে। আগেও দিয়েছে কয়েকবার। শাদাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল। চুল শাদা হওয়ার সঙ্গে কি শরীরের ক্ষমতা কমে যায়? শরীরের ক্ষমতা বলতে এক্ষেত্রে আমি একটি বিষয়ের কথাই ভাবছি, এবং মনে হয়, কথাটা আদপে সত্যি না। আমার তো মনে হয়, যতোদিন যাচ্ছে, যৌবনের আনন্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাড়ি কামাবার পরে মাথার ওপরের সাওয়ারটা খুলে দিলাম। আহ্, শরীরটা যেন জুড়িয়ে যেতে লাগলো। বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম, বৃষ্টি ধারার মতো শরীর বেয়ে জল পড়তে লাগলো। সাওয়ার বন্ধ করে সারা গায়ে সাবান মাখলাম। নগ্ন না হয়ে আমি কখনোই চান করতে পারি না। রমা বলে, ওর পক্ষে নাকি অসম্ভব। বলে, যতোই একলা থাকি, একেবারে সব কিছু খুলে ফেলে আমি স্নান করতে পারি না। এতোটা বয়স হলো, এতোদিন বিয়ে হয়েছে, ও এখনো আমার সামনেই কখনো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে না, বলে, আমার ভীষণ লজ্জা করে।

ও যে মিথ্যা বলে, তা না। সত্যি পারে না। দাম্পত্য মিলনের সময়ে, আমার অবলোকন ওকে রীতিমতো বিব্রত করে তোলে। আর বিব্রত হওয়া মানেই মিলনের বাধার সৃষ্টি করে। সে জন্য, আমিও বেশি অবলোকন থেকে বিরত থাকি।

অথচ আমার নিজের জীবনেই তো কতো বান্ধবীকে দেখলাম। সাওয়ারটা আবার খুলে দিয়ে, সাবানের ফেনা ধুতে ধুতে, অনেক নগ্ন শরীরের ছবিই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। আমি মনে করি না, তার মধ্যে কোনো বিকার আছে। নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য কদর্য, দুই-ই আছে। এক-একজনের নগ্নতা, রীতিমতো ভালগার বলে মনে হয়। সেটা বোধহয় নির্ভর করে, শরীরের গঠনভঙ্গি, এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্যে।

এখন আমার মনে পড়ছে, গতকাল রাত্রে যেন রূপাও নগ্ন হয়েছিল। ঝাপসা অস্পষ্ট মনে হলেও; আমি ওর সেই উজ্জ্বল শরীরের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, যার মধ্যে আছে একটা আনন্দের তীব্রতা। স্নিগ্ধতা বলবো না, কারণ রূপার মধ্যে স্নিগ্ধতার অভাব আছে। কিন্তু হাসি-মাখানো এমন একটা লজ্জার আবেশ ওর সারা গায়ে লেপে থাকে, যে লজ্জার মধ্যে একটু শাসনের ভ্রূকুটি, আবার ক্ষণে ক্ষণে হাসির নিক্কণ, এবং হঠাৎ নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অথবা যেন আদরের ব্যাপারটা কিছুই না, এই সব মিলিয়ে, ওর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কিন্তু সত্যি কি রূপা কাল নগ্ন হয়েছিল, অথবা আমি ভুল ভাবছি!

কিছুই মনে করতে পারছি না। পান চুম্বন হাসি-ঠাট্টা ইয়ারকি, এসব কিছু [illegible] মনে করতে পারছি, তারপরে একেবারে ব্ল্যাক-আউট। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া [illegible] নেই। ভালো না, এটা একেবারেই ভালো না, মদ্যপানটা না কমালে চলবে না।

[illegible] ব্যানার্জি অবিশ্যি আমাকে বলেছেন, সমস্ত মদ্যপায়ীরই এটা ঘটে না। এরকম [illegible]ারে ভুলে যাওয়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যে-কোনো নেশাকে কেন্দ্র করেই ঘটতে [illegible]ারে। কারণ একেবারে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা নাকি আমাদের মতো ব্যক্তির

boirboi.net

অবচেতনের মধ্যেই আছে। মদ্যপানকে কেন্দ্র করে, তা প্রকাশ পায়। এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। কেন না, আমার জীবনে এরকম একেবারে ভুলে যাওয়া কিছু নতুন না। অনেকবারই হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবী বা স্ত্রীর কাছে পরে অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু আমি কখনো মনে করতে পারি নি। বরং অবাক হয়েছি, বা নিজের ভুলে যাওয়া আচরণের জন্য লজ্জিত হয়েছি, কখনো কখনো নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি।

একে মনোম্যানিয়া বলে না। মনোম্যানিয়া, অন্য জিনিস। ডক্টর ব্যানার্জি এর একটা কী নাম বলেছিলেন, এখন মনে করতে পারছি না। এটা নাকি, এক ধরনের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে হয়। আমি তো বিশ্বাস করতে পারি না। বরং মনে থাকে না বলেই, আমার খারাপ লাগে, মনে মনে ভীষণ অনুশোচনা বোধ করি। কী করলাম, কী বললাম, কিছুই ঠিক মনে রাখতে পারছি না, ভাবলেই তো খারাপ লাগে। অন্তর থেকে আমি তা চাই না। অথচ ডাক্তারের অভিমত, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে এরকম হয়। এমন ইচ্ছা জীবনে পোষণ করেছি বলে তো মনে করতে পারি না। অবিশ্যি ডাক্তার বলেছেন, ক্রিয়াটা অবচেতনের, তাই রোগী নিজেও জানে না যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলে যায়। এভাবে বহুলোক নেশাগ্রস্ত হয়ে, নিজের সর্বনাশ করেছে। সারা জীবনে হয়তো মনে করতেই পারলো না, মত্তাবস্থায় কয়েক লক্ষ ব্ল্যাক টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

ভাবা যায় না। আর আমার চাকরিটা এমনই দায়িত্বের এরকম ব্যাপার আমার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে। তবে সৌভাগ্য এই, আমি কখনোই কাজের সময় মদ্যপান করি না। যদিও ব্ল্যাকআউট ব্যাপারটা আমার মাঝে-মধ্যে ঘটে, প্রত্যহের কোনো ব্যাপার না, তথাপি আমি কাজের সময় কখনোই মদ্যপান করি না। করা সম্ভব না, করতে পছন্দও করি না। কাজের দায়িত্ব পালন না করাটা আমার কাছে অপরাধ বিশেষ।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে গিয়ে, আঙুলটায় ব্যথা করে উঠতেই, আমি আবার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তুলে দেখলাম। আশ্চর্য, কোথায় কী ভাবে লাগলো, কিছুই মনে করতে পারছি না। কী যে খারাপ লাগে, মনে হয়, মাথাটা ঠুকি, মস্তিষ্কের মধ্যে একটা শলাকা ঢুকিয়ে, স্মৃতি নামক পদার্থটা খুঁচিয়ে জেনে নিই, কী করে আমার এ আঙুলটায় লাগলো। একটু বাঁকাতে পারছি না, লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, আর সামনের দিকে ডগার কাছে নীলশিটা পড়েছে। বেশ ভালোভাবেই লেগেছে, অথচ লাগবার সময়ও খেয়াল হয় নি। এও কি বলতে হবে আমার ইচ্ছাকৃত ভুলে যাবার প্রবণতা থেকেই হয়েছে ? ভগবান জানে।

তোয়ালেটা জড়িয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। মুনা ইস্কুলে গিয়েছে, ওর মর্নিং ইস্কুল। দামু, আমার ছেলের ডাক নাম, ও এখন মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে। রমা নিশ্চয়ই আমার প্রাতঃরাশ তৈরিতে ব্যস্ত। যদিও কাজ করার লোকজন সবই আছে। কিন্তু আমার সব কিছু রমাই করে।

আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। জানলাগুলোতে পর্দা টানাই ছিল, না-থাকলেও বাইরে থেকে আমাদের এ দোতলার বিশেষ কিছু দেখা যায় না। দোতলা আর একতলার অংশ বিশেষ নিজের জন্য রেখে, বাকী অংশ ভাড়া দেওয়া আছে।

boiRboi.net

ভাড়াটেরা আমার বাবার আমলের গুজরাতি পরিবার একটি, আর একটি বাঙালী। আমার কোনো ভাগীদার নেই এ বাড়িতে, বাবার আমি একমাত্র সন্তান। আমার ভাড়াটেরাও ভদ্রলোক, কোনো গোলমাল নেই।

আমি তোয়ালেটা খুলে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, গায়ে পাউডার মাখলাম। মুখেও সামান্য পাফ বোলালাম। পাশেই র‍্যাকের ওপর সবকিছু রয়েছে, রমা রেখে গিয়েছে। আমি জাঙিয়া পরে, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, আগে শার্ট পরলাম। টাই বাঁধলাম। তারপরে ট্রাউজারটা গলিয়ে, টুলের ওপর বসে জুতো মোজা পরলাম। মুশকিলটা হলো জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে। পারছি না। টাইটা তবু কোনোরকমে ম্যানেজ করেছি। ফিতে বাঁধা অসম্ভব। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যে এতো দরকারি, আগে কখনো মনে হয় নি। এ জন্যই বোধহয় লোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, বলতে চায়, দেখ আমার বুড়ো আঙুল আছে।

মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে দরজা খুললাম। খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, রমা রান্নাঘরে। গ্যাসের সামনে কিছু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রমু, নাথু কোথায় গেল?'

'নিচে, কেন?'

বলতে বলতেই ও খাবার ঘরে এল। আমার খাবার ওর হাতে। কর্নফ্লেক আর দুধের পাত্র। বললাম, 'জুতোর ফিতেটা কিছুতেই বাঁধতে পারছি না।'

রমা খাবার টেবিলে দিয়ে বললো, 'তুমি খাও, আমি বেঁধে দিচ্ছি।'

'তুমি কেন, নাথুই তো দিতে পারতো।'

'কেন, আমি কখনো তোমার জুতোর ফিতে বেঁধে দিই নি? আর নাথুর ফিতে বাঁধা তোমার পছন্দ হবে না, আমি জানি।'

রমা জুতোর ফিতে বেঁধে দিল। আমি কর্নফ্লেক্সে দুধ ঢেলে, চিনি মিশিয়ে নাড়তেই, টেলিফোন বেজে উঠলো। রমা বললো, 'তুমি খাও, আমি দেখছি।'

ওপরেই টেলিফোন। নিচে একটা বসবার ঘর থাকলেও, ঘনিষ্ঠদের নিয়ে ওপরেও একটা বসবার ঘর আছে। টেলিফোনটা সে ঘরেই আছে। এখন কে টেলিফোন করতে পারে? পারে অবিশ্যি অনেকেই নানান কারণে কিংবা আমার টেলিফোন না, রমারই কল।

'তোমাকে ডাকছেন।'

বলতে বলতে রমা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'রাধা, সসপেনটা দাও, পোচটা করে ফেলি। টোস্ট সেঁকেছ?'

রাধা কি জবাব দিল, শোনবার অপেক্ষা না করেই বললাম, 'রমু, কে ডাকছেন বললে না?'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে জবাব এল, 'তোমার সেই মিসেস চক্রবর্তী, পৃথ্বীশ চক্রবর্তীর স্ত্রী।'

ললিতা? হঠাৎ এ সময়ে টেলিফোন কেন? ওরা স্বামী স্ত্রী আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং ললিতার সঙ্গে যে আমার একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, পৃথ্বীশ তা খুব ভালোই জানে। এমন কি ওর সামনেই দু-একবার ললিতাকে আদর করেছি, পৃথ্বীশ রাগ করে নি। এক ভাবে, ললিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা মেনে নিয়েছে। রমা ললিতার ওপর মোটেই খুশি না। সেই বিরাগটাই বোঝা গেল।

boiRboi.net

আমি উঠে গেলাম, বাঁ হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, 'বলো।'

ওপার থেকে ললিতার সেই হাসি মাখানো, একটু রহস্য জড়ানো স্বর ভেসে এল, 'কী করছিলে? ব্রেকফাস্টে বসেছিলে বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

'আন্দাজ করছিলাম। বিরক্ত হলে নাকি?'

'না, অফিসে যেতে হবে তো। সময় হয়ে এল!'

'কাল রাত্রে ও-ব্যাপারটা করলে কেন?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল রাত্রে? কাল রাত্রে কী করেছি?'

'মনে নেই?'

'না তো।'

'আমাদের বাড়ি এসেছিলে, মনে আছে?'

আরো অবাক হয়ে গেলাম, বললাম, 'তোমাদের বাড়ি? তোমাদের বাড়ি গেছলাম নাকি?'

ললিতাও অবাক হেসে বললো, 'মনে নেই একটুও?'

'অন গড বলছি, কিছু মনে নেই। কোনো খারাপ কিছু করি নি তো? মানে—তোমাকে পৃথ্বীশের সামনে—।'

'সেটা নতুন কিছু না। বাজে বকো না। কিন্তু কাল যা করলে, অবাক কাণ্ড! এলে, ও তো ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি তখনো জেগে। আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারলে না, হঠাৎ বললে, মাফ করে দিও। বলেই চলে গেলে।'

আমি একেবারে অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'অ্যাবসার্ড', হতেই পারে না।'

'আমি কি মিথ্যা কথা বলছি, না তোমার ভূত দেখেছি? আমি তোমার পেছন পেছন গেলাম। ডাকলাম, তুমি ফিরেও তাকালে না। নিচে গেলে, গাড়িতে উঠলে, স্টার্ট করলে, চলে গেলে।'

'সত্যি বলছো?'

'হোয়াট ডু য়ু থিংক, সকালবেলা শুধু শুধু মিথ্যে বলবো কেন? তোমার কিছুই মনে নেই?'

'একটুও না।'

'আশ্চর্য। ওর তখন ঘুম ভেঙে গেছে, জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, আমি বললাম। ও বললো, দ্যাখো প্রেমিকপ্রবর কোথাও থেকে হয় তো রিফিউজ্‌ড হয়ে ফিরে এসেছে। মাতাল অবস্থায় এখানে ক্ষমা চাইতে এসেছিল।'

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো টেলিফোনে। আমি বললাম, 'মোটেই না, আমি বরং কাল সন্ধ্যাটা যথেষ্ট ভালোই কাটিয়েছি।'

'কার সঙ্গে?'

নামটা বলতে চাইলাম না। বললাম, 'বিশেষ কেউ না, অনেকের সঙ্গেই। তোমাদের ওখানে কত রাত্রে গেছলাম বলো তো?'

'তা রাত্রি প্রায় এগারোটা তো হবেই।'

'স্ট্রেঞ্জ, কিছুই মনে করতে পারছি না।'

boiRboi.net

'সে প্রমাণ আমি আগেও পেয়েছি, প্রথমে দুঃখ পেয়েছিলাম, এখন আর পাই না।'

ললিতার এ কথারও বিশেষ অর্থ আছে। এমন ঘটেছে, ওর সঙ্গে অ্যাফেয়ারের কথা আমি বেমালুম ভুলে গেছি। বললাম, 'আচ্ছা, বলতে পারো, আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যথার কথা কিছু বলেছিলাম কী না?'

ললিতার অবাক-স্বর শোনা গেল, 'ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যথা?'

'হ্যাঁ, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি, আঙুলটা ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, নীলশিটে দাগ, বেশ ব্যথা। মনেই করতে পারছি না, কোথায় কখন কী ভাবে লাগলো।'

ললিতা হেসে উঠে বললো, 'চমৎকার! কোথায় গেছলে ভেবে দ্যাখো! এখন আর কিছু বলবো না, ও-বেলা আমাদের এখানে আসবে নাকি?'

'যাবো, পৃথ্বীশকে থাকতে বলো।'

'না, বলবো না।'

বলেই ললিতা লাইন কেটে দিল। তাজ্জব ব্যাপার! রূপার বাড়ি থেকে আবার ললিতাদের বাড়িও গিয়েছিলাম? কিছুই মনে করতে পারছি না। অথচ নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছি। এ বিষয়ে রমার যথেষ্ট আপত্তি। আমাকে গাড়ি চালাতে দিতে চায় না, বিশেষ করে, ড্রিংকের পরে। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত একটাও অ্যাকসিডেন্ট করি নি। এতো কথা ভুলে যাই, কিন্তু গাড়ির চাবি ঘোরাতে, গিয়ার টানতে তো কখনো ভুল করি না। ঠিক গাড়ি চালিয়ে আসি, গ্যারেজে ঢোকাই, নাথু গ্যারেজ বন্ধ করে। অবিশ্যি কী ভাবে ঢোকাই, এঞ্জিন বন্ধ করি, সব দিন মনে করতে পারি না। যেমন মনে করতে পারছি না, গতকালের কথা। অথচ গাড়ি ঠিকই গ্যারেজে ঢুকিয়েছি।

রমা আমার সামনে প্লেটে টোস্ট বাটার পোচ ছাড়াও, আর একটা প্লেটে গরম করা রোল্ রাখলো। দেখলেই চেনা যায়, চিকেন রোল্। অবিশ্যি চায়নিজ রোল না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন আবার চিকেন রোল্ কোথা থেকে এল?'

রমা বললো, 'এখন আসবে কেন, কাল রাত্রে তো তুমি নিজেই এনেছ। বললে, কী খেয়াল হলো, নিজামের রোল্ কিনে নিয়ে এসেছ। অথচ এক টুকরো মুখে দিলে না। বাড়ির খাবারও খেলে না।'

এ তো দেখছি আর এক বিস্ময়। নিজামের রোল্ মাঝে মাঝে খেতে ভালবাসি। কিন্তু গতকাল রাত্রে আবার রোল্ কিনতে গেলাম কখন? বাড়িতে যখন নিয়ে এসেছি, নিশ্চয়ই ফেরবার পথেই কিনেছি। তবু একদিনে এতগুলো ভুল হবার কারণ তো দেখছি না? অবিশ্যি হয় না যে কখনো, তা বলবো না। একবার এক মাড়োয়ারি বন্ধুর সামনে, গঙ্গার ধারে পান করতে করতে, হাতের ঘড়ি খুলে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপরে রাত্রে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলাম। আমার কিছুই মনে ছিল না। আমার সেই বন্ধু পরের দিন সকালবেলাই মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লী চলে গিয়েছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, ঘড়িটার কথা কিছুই মনে করতে পারি নি। সাত দিন পরে সেই বন্ধু ফিরে আসার পরে জানতে পেরেছিলাম, আমার কীর্তির কথা। কিন্তু কেন যে ঘড়িটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, তার কারণও আমার কাছে চিরঅজ্ঞাত। আমার সেই বন্ধু বলেছিল, আমি নাকি আমার ঘড়ির স্টিলের ব্যাণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

রমা বললো, 'রোল্ এনেছিলে, মনে করতে পারছো না তো ?'

লজ্জিত হেসে বললাম, 'না। কিন্তু রমু, আমি এখন আর এ রোল্ খাবো না।'

রমা বললো, 'জোর করবো না। কিন্তু কাল এত গুম হয়েছিলে কেন বলো তো ? কারোর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে নাকি ?'

অবাক স্বরে বললাম, 'না তো।'

রমা বললো, 'হয় তো তোমার মনেই নেই।'

হতে পারে, এ ব্যাপারে আমি একেবারে অসহায়। কিন্তু ঝগড়া করবার মতো কারোর সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল, মনে করতে পারছি না। ঝগড়া বিবাদ যে কখনোই করি না, তা বলবো না, তবে যাকে বলে রেয়ার, তা-ই। ঝগড়ার অভিযোগ আমার নামে শোনা গিয়েছে কালে-ভদ্রে। তাও পরে জানা গিয়েছে, আমি নিজে পায়ে পা দিয়ে কখনো ঝগড়া করি নি। করবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই করেছি। অনেককেই দেখেছি, তাদের পেটে দু'এক পেগ পড়লেই, তারা হঠাৎ বীরপুরুষ হয়ে ওঠে, সবাইকেই তুচ্ছজ্ঞান করতে আরম্ভ করে, অপমানজনক কথাবার্তা বলে। আমি সাধারণত সেইসব ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলি।

আমি হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি কফির কাপে চুমুক দিলাম। পৌনে দশটা বেজে গিয়েছে। কফি পান শেষ করেই, আমার ঘরে গিয়ে, আগে টেবিলের ড্রয়ার খুললাম। এ ড্রয়ারেই আমার গাড়ির চাবি, অফিসের চাবি আর পার্স থাকে। পার্স আর গাড়ির চাবি আছে, কিন্তু অফিসের চাবি নেই। গোটা ড্রয়ারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অফিসের চাবি পেলাম না। ভীষণ উদ্বেগের ব্যাপার। আমি গলা তুলে ডাকলাম, 'রমু—রমু।'

রমা আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'অফিসের চাবি পাচ্ছি না। তুমি কি জানো ?'

রমা অবাক হয়ে বললো, 'না তো। তোমার পকেটে আমি যা-যা পেয়েছি, সবই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্যই করি নি, কী ছিল না ছিল।'

'অফিসের চাবিটা লক্ষ্য করো নি ?'

'লক্ষ্য মানে কি, খেয়াল করি নি। যেমন রোজ তোমার প্যান্টের পকেট থেকে সব কিছু নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিই, সেই-রকমই রেখে দিয়েছি। রুমাল গেঞ্জি আর জাঙিয়া বাথরুমের বালতিতে ফেলে দিয়েছি।'

ব্যস্তভাবে বললাম, 'দ্যাখো দ্যাখো, রুমালের সঙ্গে অফিসের চাবি চলে গেছে কী না।'

রমা যেতে যেতে বললো, 'অসম্ভব। সে-সব কখন ধোয়া হয়ে গেছে। চাবি পেলে নাথু আমাকে বলতো না ?'

আমি আবার ভালো করে খুঁজতে লাগলাম। অন্যান্য ড্রয়ারেও দেখলাম। ওয়ারড্রব খুলে হ্যাঙারে ঝোলানো প্রতিটি ট্রাউজার আর জামার পকেট ঘেঁটে দেখলাম। চাবি নেই। তার মানে, অফিসের কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। রমা এসে বললো, 'না, নাথু বালতির মধ্যে কোনো চাবিই দেখতে পায় নি।'

অসহায়ভাবে বললাম, 'কী করি বলো তো, সাংঘাতিক ব্যাপার। এ চাবি না পেলে—'

boiRboi.net

উদ্বেগে আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। রমা বলে উঠলো, 'তবু তো ড্রিংক করা ছাড়বে না। যার এত দায়িত্বের কাজ—'

আমার রাগ হয়ে গেল, বলে উঠলাম, 'তুমি আর এখন অ্যাডভাইস দিও না।'

বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম। ডুপ্লিকেট পেতে হলেও এই চাবি ছাড়া আমি তা বের করতে পারবো না। এখন রুপার বাড়ির কথাই মনে পড়ছে কেবল। গতকাল রাত্রে ওর বাড়িতে বোধহয় ট্রাউজার খুলে ফেলেছিলাম। তখন হয়তো চাবির রিঙ পড়ে গিয়ে থাকবে। নিচে নেমে দেখলাম, নাথু গ্যারেজের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আগে গাড়ির দরজা খুলে, সীটের ওপর, নিচে, সবখানে দেখলাম, চাবিটা আছে কী না। নেই। আমার উদ্বেগ বাড়তে লাগলো। গাড়ি বের করে নিয়ে ছুটলাম।

★ ★ ★

রুপার ফ্ল্যাট বাড়ি একটা বিরাট ম্যানসন, সফাস্টিকেটেড পাড়ায়। গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় গিয়ে দেখলাম, একটা পুলিসের জীপ আর ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক, এখন আমার এসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। আমি গাড়ি পার্ক করে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে লিফটে উঠলাম। ও থার্ড ফ্লোরে থাকে। সেখানে উঠে, রুপার ফ্ল্যাটের দরজাটাতেই দেখলাম, পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভিতরে ঢুকতে যাবার মুখেই একজন কনেস্টবল আমাকে বাধা দিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

কনেস্টবল বললো, 'খুন।'

'খুন? কে খুন হয়েছে।'

'এ ফ্ল্যাট মে যো লেডি থি, ক্যায়া মিসেস রুপা চৌধুরী উন কি নাম।'

আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো। রুপা খুন? কী করে তা সম্ভব? কখন কী ভাবে? প্রায় এক মিনিট কিছু বলতেই পারলাম না। তারপরে পকেট থেকে আমার কার্ড বের করে, কনেস্টবলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্দর মে কোই অফিসার হ্যায়?'

'হাঁ, ডি ডি সাব হ্যায়?'

'উনকো এ কার্ডঠো দিজীয়ে, বলিয়ে ম্যায় উনকে সাথ বাত করনে মাংতা।'

'ঠার যাইয়ে।'

বলে সে আমার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে ভিতরে চলে গেল। পর্দাটা ঢাকা। ভিতরে লোকজনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কী ব্যাপার? রুপা খুন? রুপার ফ্ল্যাটে কোনো চাকর-বাকর নেই। ও এলে সাময়িকভাবে কেউ কাজ করে। রাত্রে থাকে না। এই ম্যানসনেরই কোনো লোক কাজ করে, এবং সে-রকম এখানে পাওয়াও যায়। ও যখন আসে, নিজেই গ্যাসে একটু রান্না-বান্না করে। একটা ফ্রিজও আছে। সাময়িকভাবে বহাল করা সে লোকটা কাল কখন গিয়েছে বা কতোক্ষণ ছিল, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।

অফিসার পর্দা সরিয়ে, মুখ বের করে বললেন, 'আপনি এ কে মিত্র ব্যাংক ম্যানেজার?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

আমি ওঁর সঙ্গে ভিতরে গেলাম। সামনেই বসবার ঘর, পাশে ডাইনিং স্পেস্। তারপরে দুটি শোবার ঘর, সংলগ্ন বাথরুম। বসবার ঘরে কয়েকজন পুলিসের লোক ছাড়াও, বোধহয় ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মনে হয় সে ব্যক্তি থানার ও সি। ডাক্তার বলে যাঁকে সন্দেহ করলাম, তার কারণ, তিনি তখন বলছিলেন, 'আমার মনে হয়, শী হ্যাজ বীন কিল্ড ফ্রম নাইট নাইন টু মিডনাইট। সেটা ঠিক জানা যাবে ময়না তদন্তের পরে।'

আমাকে যে অফিসার নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকলেন, ও সি-কে বললেন, 'ইনি ব্যাংক ম্যানেজার মিঃ এ কে মিত্র।'

ও সি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওহ্? আপনি? আপনি খবর পেয়েছেন?'

বললাম, 'না তো। আমি কোন খবরই পাই নি। আমি এসেছিলাম একটা বিশেষ দরকারে।'

'মিসেস চৌধুরীর কাছে?'

'হ্যাঁ। আমি তো কাল সন্ধ্যায় ওর এখানে এসেছিলাম, আমার—।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমার পাশে দাঁড়ানো অফিসার বলে উঠলেন, 'আপনি কাল ইভনিং-এ এসেছিলেন এখানে? মানে মিসেস চৌধুরীর কাছে?'

'হ্যাঁ। শী ইজ মাই ফ্রেন্ড। বম্বে থেকে তিন দিন আগে এসেছে। এসেই আমাকে টেলিফোন করেছিল। গতকাল সন্ধ্যায় আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু কনেস্টবলের মুখে যা শুনলাম—'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ, মিসেস চৌধুরী লাস্ট নাইটে খুন হয়েছেন। আপনার হাতে সময় থাকলে একটু বসুন না।'

আমি তখন মনে মনে উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, বিস্মিত। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। বললাম, 'বুঝতেই পারছেন, অফিসে যাবার পথে আমি এখানে এসেছিলাম।'

অফিসার বললেন, 'বোধহয় চাবির খোঁজে?'

অবাক হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা কি করে জানলেন?'

'আপনার ব্যাংকের নাম লেখা আছে চাবির গায়ে। সেই চাবির রিং চাবিসহ আমরা মিসেস চৌধুরীর শোবার ঘরে পেয়েছি। তাতে অনুমান করেছিলাম, ব্যাংকের কোনো লোক মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আমি একটু আশ্বস্ত হলাম চাবির সন্ধান পেয়ে। বললাম, 'চাবির জন্যই দুশ্চিন্তা নিয়ে ছুটে এসেছিলাম, সেটা পাওয়া গেছে, কিন্তু যা শুনলাম, তার পরে আর কিছু ভাবতেই পারছি না। আমি কি রূপাকে একটু দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, চলুন। আমাদের ফটোগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিণ্ট এক্সপার্ট ওঁরা সব কাজ করছেন। আপনি চলুন।'

আমি অফিসারের সঙ্গে রূপার শোবার ঘরে গেলাম। এসেই থমকে দাঁড়ালাম। সেই উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী রূপা, হাসিতে ঝলকানো, পুরুষের রক্ত পাগল করা রূপা, ওর শোবার খাটে হাত এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। বুকের জামা যেন কেউ টেনে ছিঁড়ে

boiRboi.net

খুলে দিয়েছে, বা নেই, শাড়িটা এলোমেলো, সায়া অনেকখানি উঠে আছে। গলার কাছ থেকে, রক্তের ধারা বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে, এখন শুকনো। ওর সেই কামনার আগুন ধরানো ঠোঁট খোলা, জিভটা যেন ভিতরে এলিয়ে রয়েছে। চোখ বোজা। ওর ঘাড় অবধি চুল ছড়ানো। ওর বলিষ্ঠ খোলাবুকের দিকে যেন তাকিয়ে থাকা যায় না।

এখনো হুইস্কির বোতল গেলাস সোডার বোতল, সবই টেবিলের ওপর রয়েছে। আমরা এ ঘরেই গত রাত্রে বসেছিলাম। আমরা সোফা চেয়ারে বসি নি। ঘনিষ্ঠভাবে বিছানাতেই বসেছিলাম। সেইজন্য কাঁচের নিচু টেবিলটা খাটের কাছে টেনে আনা হয়েছিল। আমি দেখলাম, ফটোগ্রাফার সমস্ত ঘরটার নানান ভাবে ফটো নিচ্ছে। রুপার ফটো বোধহয় আগেই নিয়েছে। এখন সে স্কাইলাইটের ফটো নিচ্ছে। সেখানে স্কাইলাইটের কাঁচ খোলা, কয়েকটা দাগ, পায়ের দাগের মতো দেওয়ালে লেগে রয়েছে, অথচ ঠিক যেন পায়ের দাগ বলে মনে হয় না। ওখান দিয়ে কোনো লোকের পক্ষে ঢোকা সম্ভব বলে মনে হয় না।

সে-সব যাই হোক, আমার চোখ আবার রুপার দিকেই ফিরে গেল। আমি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করে মারলো?'

অফিসার আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'সেই অস্ত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে আমাদের ডাক্তারের অনুমান, কণ্ঠনালিতে ফর্ক ঢুকিয়ে মার্ডার করা হয়েছে।'

'মানে, কাঁটা চামচ?' বলে আমি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণাবোধে চোখ বুজলাম। বললাম, 'চলুন ও ঘরে যাই।'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ চলুন। আপনার চাবির গোছা আমার কাছেই আছে, এই নিন।'

বলে অফিসার আমাকে চাবির রিঙ দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'চাবিটা কোথায় পেলেন?'

অফিসার বললেন, 'টেবিলের ওপরেই ছিল।'

আমরা বসবার ঘরে এলাম। ও সি বললেন, 'বসুন মিঃ মিত্র।'

আমার পক্ষে এখন বসা সম্ভব না, কারণ আমাকে অফিসে পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও একবার যেতে হবে। চাবিগুলো অন্তত পৌঁছুনো দরকার। আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে আপনাদের কথা বলা দরকার, আমার নিজেরও অনেক কিছু জানার বা বলার আছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে একবার অফিসে যেতেই হবে।'

অফিসার বললেন, 'যান না, আপনি অফিস থেকে ঘুরে আসুন। ততক্ষণে আমরা এদিককার কাজগুলো দেখছি। ইন ফ্যাক্ট, মিসেস চৌধুরী সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এই ম্যানসনের কেয়ারটেকারের কাছে কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি মিসেস চৌধুরী এই ফ্ল্যাট কিনেছেন। তিনি বম্বেতে কি একটা চাকরি করেন, এক মাস দু-মাস অন্তর কলকাতায় আসেন, চার-পাঁচ দিন থাকেন, আবার চলে যান। কখনো কখনো ওঁর সঙ্গে ওঁর ছেলেও আসে।'

boiRboi.net

আমি বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন, তবে অল্ দ্য ডিটেল আমি আপনাদের এসে বলবো, এখন যাচ্ছি। মনে হয় আধঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসতে পারবো।'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ তাই আসুন, আপনি একজন রেসপনসিবল ম্যান, হেড অফিসের ম্যানেজার, আপনাকে যেতেই হবে।'

আমি বেরিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে আশেপাশের ফ্লাটে ব্যালকনিতে মহিলা পুরুষদের ভিড় জমেছে। আমি লিফট-এ নিচে এসে গাড়ি নিয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ব্যাংকে গেলাম। আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার অ্যাসিস্টাণ্ট আর ক্যাশিয়ার দুজনেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওঁরা ইতিমধ্যে আমার বাড়িতেও ফোন করেছিলেন। আমি যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে ওঁদের হাতে চাবি দিয়ে বললাম, 'আমার বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দেবেন, আমি অফিসে এসেই আবার বেরিয়ে গেছি, তা না হলে আমার স্ত্রী ভাববেন, কেননা, উনি জানেন এতক্ষণে আমার অফিসে আসা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার কথাটা বলবেন না, ভয় পাবেন।'

অ্যাসিস্টাণ্ট আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, চলে যান।'

* * *

আমি আবার রুপার ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলাম, আর ওর সেই খাটে পড়ে থাকা মূর্তিটা চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। কে এমন কাজ করতে পারে? ওর প্রাক্তন স্বামী সুদীপ চৌধুরী আবার বিয়ে করেছে। ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক যেমন নেই, তেমনি কোনো তিক্ততার কথাও শুনি নি। রুপার কোনো শত্রু থাকতে পারে বা ছিল, ওর মুখে কোনো দিনের জন্য শুনি নি। আর এই রুপার সঙ্গে গতকালই আমি—উহ্, আমি কী না করেছি। ওকে পেলে যে আমি পাগল হয়ে যেতাম। প্রতিটি হাসির স্পর্শের আদরের প্রতিদান দিতে ওর জুড়ি মেয়ে বোধহয় আর কেউ ছিল না। আর আশ্চর্য, গতকালই আমি অফিসের চাবি ভুল করে ওর ফ্ল্যাটেই ফেলে গেলাম?

আমি গাড়ি পার্ক করে লিফট-এ থার্ড ফ্লোরে উঠলাম। ডি ডি আমার অপেক্ষাতেই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। যাওয়া মাত্র অভ্যর্থনা করলেন—'আসুন আসুন, আপনার জন্য আমরা র্যাদার অ্যাংসাস্লি ওয়েইট করছি। আমাদের ডক্টর রয়েছেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আপনার প্রিন্ট নেবার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আমি অফিসারের সঙ্গে ভিতরে গেলাম। বললাম, 'নিশ্চয়ই আমার হাতের ছাপ শোবার ঘরের সবখানেই পাবেন। অন্তত গেলাসে বোতলে টেবিলে বিছানায়, এমন কি—আই মীন রুপার শরীরেও পেতে পারেন।'

অফিসার বললেন, 'আপনার এই স্পষ্টবাদিতার জন্য ধন্যবাদ মিঃ মিত্র। আপনি বসুন।'

আমি একটা সোফায় বসলাম। ও সি তখন ভিতরে কাজ করছিলেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এসে আমার দু-হাতে কালো রঙ লাগানো রোলার চেপে চেপে ঘোরালেন।

boiRboi.net

তারপরে একটা বড় কাঁচের টুকরোয় দুটো হাতেরই ছাপ নিলেন। সেই কাঁচ ফটোগ্রাফারকে দিয়ে বললেন, 'নেগেটিভ আর প্রিণ্ট আপনি আজকেই দেবার চেষ্টা করবেন।'

ফটোগ্রাফার বললেন, 'আজই পেয়ে যাবেন।' বলে ফটোগ্রাফার আমারও দুটো ফটো তুলে নিয়ে হেসে বললেন, 'ডোণ্ট মাইণ্ড, থ্যাংকু।'

আমি বললাম, 'থ্যাংকু।'

ও সি এসে ডি ডি-কে বললেন, 'এদিককার কাজ তো শেষ। ডেডবডি কি রিমুভ করবো স্যার ?'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ, করে দিন, তারপরে আমরা মিঃ মিত্রের সঙ্গে বসে একটু কথা বলে নিই।'

ও সি তার অধস্তন ইনস্পেক্টরকে ডেকে ডেডবডি রিমুভ করতে বললেন। আমাদের সামনে দিয়েই রূপার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলো। অবিশ্যি এখন ওকে বেড-শীট দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এমন কি মুখটাও ঢাকা। শেষবারের জন্য আর মুখখানি দেখা হলো না।

তারপরে ডি ডি বললেন, 'এবার বলুন মিঃ মিত্র, মিসেস চৌধুরী সম্পর্কে আপনি কী জানতেন।'

আমি মোটামুটি রূপার অতীতের কথা বললাম, এবং আমার সঙ্গে ওর স্বামীর মারফত প্রথম পরিচয়, পরবর্তীকালে ওদের দাম্পত্য জীবনের জটিলতা, পরিণতি বিবাহ-বিচ্ছেদ, ওর চাকরি, যা-যা জানতাম সবই বললাম। ডি ডি, ও সি এবং ডাক্তার তিনজনেই আমার কথা শুনলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কখন জানলেন, কী ভাবে জানলেন, জানতে পারি ?'

ও সি বললেন, 'নিশ্চয়ই। মিসেস চৌধুরীর যে টেম্পরারি সারভেণ্ট, যে এ ম্যানসনে বলতে গেলে, অনেকের ফ্ল্যাটেই রিসিভার হিসেবে কাজ করে, সে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় দরজা খোলা, মিসেস চৌধুরী ও-ভাবে মরে পড়ে আছেন। ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে কেয়ার টেকারকে খবর দেয়। কেয়ার টেকার আমাদের জানায়।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'দরজা খোলা থাকবে কেন। চাকরটারই তো রূপাকে খেতে দিয়ে বিদায় নেবার কথা। ওর তো রাত্রে ফ্ল্যাটে থাকবার কথা নয়।'

ও সি বললেন, 'সে কথা ও বলেছে। কিন্তু ওর বক্তব্য হচ্ছে, মিসেস চৌধুরী তাঁর কোনো পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে ড্রিংক ক'রে খুবই মাতামাতি করছিলেন। ও তখন রান্নাঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ঘুম ওর ভোরবেলা ভাঙে। তারপরে ও এসব দেখতে পায়। অবিশ্যি ওকে আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি।'

ডি ডি বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মিঃ মিত্র, পুরুষ-বন্ধুটি বোধহয় আপনিই ?'

অস্বস্তি বা লজ্জা হলেও এক্ষেত্রে কোনো কথা গোপন করা উচিত নয় জেনেই আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওর কাছে এসেছিলাম। আর কেউ আসতে পারে বলে তখন ওর কাছে কিছু শুনি নি। আর আমার মনে হয়, আমি ছাড়া কলকাতায় ওর বোধহয় আর কোনো পুরুষ-বন্ধু নেই।'

ডি ডি বললেন, 'এটা একান্তই আপনার ধারণা।'

বললাম, 'হ্যাঁ, নিজের ধারণার কথাই আমি বলছি।'

'আপনারা দু'জনেই কি কাল ড্রিংক করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস চৌধুরী কি নিয়মিত ড্রিংক করতেন ?'

'নিয়মিত কী না জানি না, কলকাতায় এলেই আমরা দু'জনে একসঙ্গে ড্রিংক করতাম। কিন্তু রোজ না। ও যেদিন আমাকে ডাকতো, সেইদিন। বাকী দিন ও একলা একলা ড্রিংক করতো বলে মনে হয় না।'

'বোতল দেখে মনে হলো, প্রায় পুরো একটা বোতলই আপনারা শেষ করেছেন।'

'তা হতে পারে, কারণ শেষের দিকে আমার প্রায় কিছুই মনে নেই।'

এ সময়ে আমার আঙুলের কথাটা একবার মনে পড়লো। কিন্তু আমি সে-কথা আর তুললাম না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছুই মনে নেই মানে কী, আপনি চলে যাবার সময় মিসেস চৌধুরী কী করছিলেন বা আপনাকে কী ভাবে বিদায় দিয়েছেন, কিছুই মনে নেই ?'

আমি সত্যি কথাই বললাম—'কিছুই মনে নেই। আমি আপনাদের কাছে গোপন করতে চাই না, আমার এই পর্যন্ত মনে আছে, আমরা দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছলাম, তারপরে কখন এক সময়ে চলে গেছি কিছুই মনে করতে পারি না।'

ডি ডি ও ও সি এবং ডাক্তার তিনজনেই পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। স্পষ্টতঃই তাঁদের চোখে যুগপৎ সন্দেহ এবং বিস্ময়। ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি রাত্রে ক'টার সময় এখান থেকে গেছেন আপনার মনে নেই ?'

'না, আমি ঘড়ি দেখি নি, দেখার কথাও আমার মনে ছিল না।'

'আপনি কি ভাবে গেলেন ? নিশ্চয়ই আপনার গাড়ি ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার ছিল ?'

'না, আমি নিজেই গাড়ি চালিয়েছি।'

'অথচ আপনার কিছুই মনে নেই ?'

'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন অফিসার, ড্রিংকের পরে আমার কখনো কখনো এমন একটা সময় আসে, আমি কিছুই মনে করতে পারি না। টোটালি ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়।'

ডাক্তার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'নট অ্যাবসার্ড', এরকম হতে পারে।'

ও সি অবাক স্বরে বললেন, 'ব্ল্যাকআউট অবস্থায় নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় ?'

ডাক্তার বললেন, 'যাওয়া যায়—ওটা একটা স্বপ্নের ঘোরের মতো, যেন ঘুমন্ত অবস্থায় একটা লোক অভ্যাসবশত সব কিছুই করে যাচ্ছে।'

আমি ললিতা চক্রবর্তীর কথা এবং চিকেন রোলের কথাও ওঁদের বলালাম। এবং আজ সকালে কেউ কিছু না বললে যে সবই আমার অজ্ঞাত থেকে যেতো, সেকথাও

boiRboi.net

বললাম। ডি ডি এবং ও সি অবাক, ডাক্তারের মুখ গভীর চিন্তিত। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, অবিশ্যিই ইংরেজিতে, 'গতকাল রাত্রে, মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কি আপনার দৈহিক মিলন ঘটেছিল ?'

অস্বস্তি আর লজ্জায় আমার কান গরম হয়ে উঠলো। বললাম, 'সঠিক মনে করতে না পারলেও অসম্ভব না, কেননা ওর সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক ছিল। জানি না, আপনারা আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন, কিন্তু—।'

ও সি বলে উঠলেন, 'এর দ্বারা আপনার চরিত্রহীনতারই প্রমাণ হয়।'

ডি ডি প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'ওহ্, য়ু প্লীজ কীপ কোয়ায়েট। ওঁর চরিত্রের ভালো মন্দ নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই। আমরা মিসেস চৌধুরীর মার্ডারের বিষয়টাই জানতে চাই। য়ু আর নট দ্য পারসন্, হু উইল কমেন্ট হোয়াট ইজ্ হি। লেট আস হিয়ার, হোয়াট হি সেস্।'

আমি ও সি-এর মুখের দিকে ফিরেও তাকালাম না। এসব লোকের চরিত্র এবং মন আমি জানি। এরা কারোকে অপমান করার সুযোগ পেলে তা ছাড়ে না। সেটা কেবল পদাধিকার বলে না, এদের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ডি ডি বললেন, 'বলুন মিঃ মিত্র, আপনি কি বলতে চাইছিলেন।'

আমি বললাম, 'কিছুই না। আমি বলতে চাইছি আপনারা আমাকে যাই ভাবুন, আমি আপনাদের কাছে কোনো কথাই গোপন করতে চাই না।'

ডি ডি বললেন, 'সেজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ মিত্র। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, আই মীন্ মিসেস চৌধুরীকে নিয়ে ?'

'আমি তো মনে করতে পারছি না।'

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এরকম ব্ল্যাকআউট কি প্রায়ই হয় ?'

'প্রায়ই বলবো না। মাঝে মধ্যে হয়ে যায়।'

'আপনি মিসেস চৌধুরীকে খুবই ভালবাসতেন ?'

এমন একটা সময়েও আমি একটু না হেসে পারলাম না। বললাম, 'ওকে আমার খুবই ভালো লাগতো। এমন না যে ওকে আমি কখনো বিয়ে করার কথা ভেবেছি, রুপাও সেরকম কিছু ভাবতো না। তাছাড়া আমার নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

'আপনার স্ত্রীর থাকতে পারে ?'

'অভিযোগ আছে কি না জানি না তবে বান্ধবীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতায় মনে মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পায়।'

ওঁরা তিন জনেই চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ডি ডি ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার বললেন, 'আমার ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

ডি ডি বললেন, 'আপাতত আমারও না। আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন ?'

ডি ডি ও সি-এর দিকে তাকালেন। ও সি নোটবুক বের করে আমার বাড়ীর ঠিকানা, ফোন নাম্বারও টুকে নিলেন। আমি ডি ডি-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি ভাবছেন, আমি জানতে পারি ?'

ডি ডি বললেন, 'আমরা ভাববার মতো এখনো কিছু পাই নি। প্রথমত মোটিভ

boiRboi.net

অব দ্য মার্ডার জানা দরকার, কেন না ভ্যালুয়েবল্স্ কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে না। আর কলকাতার এ ফ্ল্যাটে বোধহয় মিসেস চৌধুরী মূল্যবান কিছু রাখতেন না।'

বললাম, 'আমিও তাই জানি। কেননা, ফ্ল্যাটটা তো খালিই পড়ে থাকে। ওর ইচ্ছা, কলকাতায় একটা ভালো চাকরি পেলে, এখানে এসে থাকতো।'

ডি ডি বললেন, 'টাকা-পয়সা যা ওঁর ব্যাগে পাওয়া গেছে তা প্রায় শ' ছয়েক টাকা। আগামী পরশু দিনের মর্নিং ফ্লাইটের বম্বের একটা টিকিট। এমন কি ওঁর ঘড়ি বা আঙুলের আংটি কিছুই খোয়া যায় নি। এতে বোঝা যাচ্ছে, টাকার লোভে ওঁকে কেউ খুন করে নি। ফিজিক্যালি টর্চার্ড হয়েছিলেন এটা বোঝা গেছে—কেননা ওঁর গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, যেন কেউ টেনে ছিঁড়েছে। বুকে আঁচড়ানো দাগও দেখা গেছে। অথচ আপনার সঙ্গে ওঁর রিলেশন যা ছিল—'

আমি না বলে পারলাম না, রূপার জামাকাপড় নিয়ে টানাটানি করার কোনো কারণই আমার দিক থেকে থাকতে পারে না। পরিষ্কার মনে করতে না পারলেও, আমি প্রায় ঝাপসাভাবে যেন মনে করতে পারছি—কাল রাত্রে ও সম্পূর্ণ ন্যুড হয়েছিল আমার সামনে। আমি চলে যাবার পরে হয়তো ও সায়া শাড়ি জামা পরে থাকবে।

ও সি বলে উঠলেন, 'কিন্তু সেটা প্রমাণ করা যাবে কেমন করে?'

বললাম, 'আমার পক্ষে সম্ভব না। আগেই বলেছি আমি কিছু মনে করতে পারছি না।'

ডি ডি বললেন, 'অন্য একটা সম্ভাবনার কথাও আমরা ভুলতে পারছি না, কারণ স্কাইলাইট দিয়ে কারোর আসাটা অসম্ভব না। তবে খুবই কঠিন। মিসেস চৌধুরীর শোবার ঘরের স্কাইলাইটের কাঁচটা বন্ধ ছিল না, দেয়ালে কয়েকটা দাগও দেখা গেছে। মই বেয়ে উঠে সে দাগগুলো আমরা দেখেছি, ফটোও নিয়েছি। অ্যাট্ অল্ সেগুলো কারোর পায়ের দাগ কি না, বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে ফরেনসিক রিপোর্টের ওপর। ভদ্রমহিলার কলকাতায় কোনো আত্মীয়স্বজন আছে?'

আমি মনে করতে পারলাম না। রূপা একবার যেন বলেছিল, কলকাতায় ওর বাবা আর পিসীমা থাকেন। কিন্তু কোথায় থাকেন তা কখনো বলে নি বা তাঁদের ঠিকানাও আমাকে কখনো বলে নি। আমি সে কথা বললাম। তারপরে বললাম, 'তবে আপনাদের একটা কাজ করা উচিত, রূপার বম্বের অফিসে এবং কলকাতার ব্রাঞ্চ অফিসে একটা খবর দিলে ওর বিষয়ে আরো কিছু জানতে পারবেন। ওর একটি দশ বছরের ছেলে আছে। তাকে খবরটা কেমন করে জানানো যাবে বা তার দায়িত্বই বা কে নেবে বুঝতে পারছি না।'

ডি ডি বললেন, 'মিসেস চৌধুরীর প্রাক্তন স্বামী কি তাঁর সন্তানের দায়িত্ব নেবেন না?'

বললাম, 'বলতে পারি না। হয়তো নিতেও পারে, আফটার অল্, নিজেরই ছেলে তো।'

ও সি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনি গত রাত্রে যে পোশাক পরে এখানে এসেছিলেন, সেগুলো এখন কোথায়?'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'আপনার সন্দেহ অনুযায়ী বলতে হয় এগুলো আমি

boiRboi.net

পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছি। তবে আপনি এখনই আমার বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললেই তিনি সে-সব পোশাক আপনাকে দেখাতে পারবেন। পাবেন না কেবল গেঞ্জি রুমাল আর জাঙিয়া, কেন না ওগুলো ধুয়ে ফেলা হয়েছে এতক্ষণে। অর্থাৎ আমি বলছি আপনি যদি কোনো চিহ্ন খুঁজতে চান—'

ডি ডি বলে উঠলেন, 'এনাফ মিঃ মিত্র। ও সি যদি দেখতে চান তিনি পোশাক-গুলো দেখে আসবেন। আপনাকে আর আটকাতে চাই না। তবে আমাদের কোনো সাহায্যের দরকার হলে আপনার দ্বারস্থ হবো।'

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'ওহ্ শ্যুর শ্যুর এনি টাইম, আয়াম অ্যাট য়োর সার্ভিস। রূপার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য যে কোনোরকম সাহায্য দরকার আমি করবো।'

আমি এখন আর কোনো তাড়াহুড়ো করছি না। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার থেমে ডি ডি-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা চাকরটা সারা রাত্রে ঘুম থেকে একবারও ওঠে নি?'

'না। তাই তো বলছে সে।'

আমার ভুরু কুঁচকে উঠলো। আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটার কাজকর্ম শেষ করে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবার কথা। সারা রাত্রি রান্নাঘরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল? ভাবতে ভাবতে আমি ব্যালকনি দিয়ে, বারান্দা দিয়ে এগিয়ে লিফট-এ নিচে নামলাম, গাড়ি নিয়ে ব্যাংকের দিকে চললাম। রমাকে একবার টেলিফোন করবো ভাবলাম। কিন্তু থাক। ও সি লোকটা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, ভাববে আমি আগে থেকেই স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছি। রাসকেল, আমাকে বলে চরিত্রহীন। যেন কলকাতার কারোর কিছু জানতে আমার বাকী আছে। অফিসে আমার অ্যাসিস্টান্ট এসে আমার সঙ্গে কথা বললো। তাকে সব কথাই বললাম। এ-ও বললাম, সে যেন অফিসে এসব নিয়ে কোনোরকম আলোচনা না করে। সে করবে না বললেও, করবেই আমি জানি। তবু আমি বললাম, যাতে সবাই ভাবে, আমি ঘটনাটা নিয়ে লুকোচুরি করতে চাইছি না, কারণ আমার মনের দিক থেকে তার কোনো কারণ নেই।

আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের আমার এক অফিসার বন্ধুকে টেলিফোন করলাম। সে একজন এ ডি সি। তাকে পাওয়া গেল। আমি মুখ খোলবার আগেই সে বললো, 'সব খবর আমার কাছে পৌঁছে গেছে এইমাত্র। তোমার বিষয়ে খোঁজ-খবর চলছে।'

আমি বললাম, 'তা চলুক, সে-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তোমাকে ফোন করছি এজন্য, এটা একটা ভয়ংকর আশ্চর্য ব্যাপার। এ খুনটার কিনারা করতেই হবে।'

'নিশ্চয়ই। তা মক্ষীরানীটির সঙ্গে কাল কতোক্ষণ ছিলে?'

'তুমি ভালোই জানো, সামটাইস্ আমার কী রকম হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়। গত রাত্রেও তাই হয়েছিল। আমি যে রূপার বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছি, কী ভাবে বাড়ি ফিরেছি কিছুই মনে করতে পারছি না। আই হ্যাভ কমন সেন্সেস যে এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যায় না কারণ আমি কাল রূপার সঙ্গে ড্রিংক করেছি, আরো অনেক কিছুই। ভাবো, পুরো একটা স্কচের বোতল শেষ করেছি এবং ধরেই নিচ্ছি বেশিটা আমিই টেনেছি তা না হলে ব্ল্যাকআউট হতো না। কিন্তু রূপাকে

মারবার বদলে কেউ যদি সারা জীবন ওর বুকে মুখ রেখে আমাকে পড়ে থাকতে বলতো আমি তাই পারতাম।'

'তার মানে, তুমি বলছো মার্ডারের পেছনে তোমার কোনো মোটিভই থাকতে পারে না।'

হেসে বললাম, 'আমি কিছুই বলছি না ভাই, তোমরা পুলিসরা যা ঠিক বুঝবে তাই করবে, আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এক মাস দু-মাস অন্তর অন্তর ওকে একটু পেতাম, ওকে কেউ খুন করতে পারে ভাবতেই পারি না।'

বন্ধু বললো, 'অনেক কিছুই ভাবা যায় না। মানুষ এক বিস্ময়কর জীব।'

'তা যা বলেছ। যাই হোক তোমাকে ফোন করার উদ্দেশ্য আর কিছু না ব্যাপারটা যাতে ঠিক মতো ইনভেসটিগেট হয় সেটা করো।'

বন্ধু বললো, 'এটা ঠিক আমাদের ব্যাপার না, যা করবে লালবাজার আর আই বি ডিপার্টমেন্ট। এনি হাউ আমি খবর রাখবো, ডি আই জি-র সঙ্গেও কথা বলবো। আজ সন্ধ্যেয় কোথায় ?'

উদাস স্বরে বললাম, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাবছি বাইরে কোথাও বসবো না, পৃথ্বীশের বাড়িতে গিয়ে বসবো।'

বন্ধু ঠাট্টা করে বললো, 'ললিতার কাছে যাবে বলো।'

'না, আজ মনের অবস্থা ঠিক সে-রকম নেই।'

'কোয়াইট রাইট। ও কে বয়, ইফ আই ম্যানেজ মে জয়েন য়ু অ্যাট্ ললিতা'জ প্লেস।'

'বায় বায়।'

টেলিফোনটা ছেড়ে দিতেই হঠাৎ যেন আমার শিরদাঁড়ার কাছে একটা কাঁপুনি লাগলো। আর সেই কাঁপুনিটা শিরদাঁড়া বেয়ে ক্রমে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করলো, আমি স্পষ্টই টের পেলাম আমার সারা শরীর জুড়ে একটা আক্ষেপের আলোড়ন ঢেউয়ের মতো উঠছে, আমি খামচে টেবিলটা ধরে মুখটা টেবিলে গুঁজে দিয়ে ঘষতে লাগলাম এবং একটা ব্যথা-বর্জিত, অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি কারোকে ডাকতে পারছি না, আমার এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে চিৎকার করে ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না এবং আমার পায়ের নিচে পুশ্‌বেলটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরেই আবার আমার শরীর স্থির হয়ে এল, আমি আমার রিভলভিং চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম আর কেবলই মনে হতে লাগল একটা ফর্ক দিয়ে নিজের গলায় বিদ্ধ করি, ঠিক যেমনভাবে রূপাকে কেউ বিদ্ধ করেছে।

★ ★ ★

boiRboi.net

বেশিক্ষণ আমি এভাবে থাকতে পারলাম না। একের পর এক কাজ শুরু হয়ে গেল। ফাইলের পর ফাইল আসতে লাগলো। স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশন দিতে হলো। বেলা দু'টোর পরে ক্যাশিয়ার এলেন। তাঁর হাত থেকে ছাড়া পেলাম সাড়ে তিনটেয়। তারপরে এল ইউনিয়নের সেক্রেটারি। পাঁচটা অবধি কোথা দিয়ে কেটে গেল। ঠিক

এ সময়েই রমার ফোন এল। বললো, থানার লোক এসে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে গিয়েছে। বিশেষ করে গতকাল আমি যে-পোশাক পরেছিলাম সে-সব পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে শুধু দেখে নি নিয়েও গিয়েছে। আমি তখন ওকে ব্যাপারটা বললাম এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। যেহেতু আমি গতকাল মহিলার (রূপার) বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই জন্যই পুলিস আমাকেও সন্দেহ না করে পারছে না এবং সেটাই স্বাভাবিক। এবং ওকে এ কথাও জানিয়ে রাখলাম, আমি অফিস্ থেকে বেরিয়ে পৃথ্বীশের বাড়ি যাবো, কোনো প্রয়োজন হলে রমা যেন আমাকে সেখানে টেলিফোন করে। তা ছাড়া আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।

সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে পৃথ্বীশের বাড়ি গেলাম। ললিতা আমার দিকে যেন কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো, তার সঙ্গে জিজ্ঞাসাও আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

ললিতা বললো, 'সে-কথা তো আমিই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। ব্যাপার কী ? রূপা মার্ডার হয়েছে ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি জানলে কী করে ?'

'পুলিস এসেছিল যে আমাদের বাড়িতে !'

'তোমাদের বাড়িতে ? কেন ?'

'তোমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে।'

এ সময়ে পৃথ্বীশও বেরিয়ে এল ভিতর ঘর থেকে, বললো, 'কী হে ওথেলো, ডেস্‌ডেমোনিয়াকে হত্যা করে বসে আছো ?'

আমি সোফায় বসতে বসতে বললাম, 'তাই তো দেখছি। পুলিস তোমাদের কী জিজ্ঞেস করলো ?'

ললিতা বললো, 'ও কিছু জানে না, ও বাড়িতে ছিল না। কথা হলো আমার সঙ্গেই। আমি বললাম, অধীপ মিত্র (আমি) যখন এসেছিলেন তখন আমার স্বামী ঘুমিয়েছিলেন, উনি আমার সঙ্গে দেখা করেই চলে গেলেন।'

আমি বললাম, 'ওরা তোমাকে কী জিজ্ঞেস করলো ?'

ললিতা বললো, 'ওরা আসতেই তো আমি অবাক। একজন ডি ডি এসেছিলেন, আর একজন কে শাদা পোশাকের লোক, তাকে আমি চিনতে পারলাম না। চাকর এসে আমাকে বললো, একজন পুলিস অফিসার এসেছেন। কলিং বেল-এর শব্দ আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম। বাইরের ঘরে এলাম। ভদ্রলোক প্রথমে পৃথ্বীশের খোঁজ করলেন। বললাম, উনি বেরিয়েছেন, কী ব্যাপার বলুন তো ? তখন বললেন, ওঁরা তোমার সম্পর্কে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতেন, গতরাত্রে তুমি এসেছিলে কী না, এবং ক'টায়। আমি যা বলবার তাই বললাম। ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তখন কী রকম দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, খুবই শান্ত যদিও বেশ ড্রিংক করেছিল, আর তুমি বলেছিলে আমাকে মাফ করে দিও। সে কথাও বললাম। তারপরেই তুমি চলে গেলে। একটি কথাও না বলে। ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গায়ে কোনো রক্তের দাগ টাগ কিছু ছিল কী না। আমি বললাম, কিছুই না, কেবল ওকে উসকো-খুসকো দেখাচ্ছিলো। যেটা খুবই স্বাভাবিক। তখন আমি জানতে চাইলাম ব্যাপারটা

boiRboi.net

কী ঘটেছে। ডি ডি রূপার খুনের ঘটনা বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী অধীপকে সন্দেহ করছেন নাকি ? ডি ডি হেসে বললেন, 'মিঃ মিত্র আপনাদের বন্ধু। কিন্তু ঘটনাটা এমনভাবেই ঘটেছে, উনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। কারণ হিসাবে তুমি তাঁদের কাছে যা বলেছ, সে কথা আমাকে বললেন, আর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তোমার এ রকম ব্ল্যাকআউট হয় কী না, তুমি ভুলে যাও কী না। আমি বললাম, অধীপের ব্যাপারে আমরা বেশ কয়েকবার এরকম দেখেছি, ও কিছুতেই সব কথা মনে করতে পারে না।'

বলতে বলতে ললিতা হাঁপিয়ে উঠলো। দম নেবার জন্য থামলো। পৃথ্বীশ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'শেষটায় বাস্তবার্থেই তুমি লেডিকিলার হয়ে গেলে ?'

হেসে বললাম, 'তাই তো দেখছি।'

বলতে বলতে আমার যেন বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। আমার চোখে জল এসে পড়ার উপক্রম করলো। পৃথ্বীশ বলে উঠলো, 'আরে অধীপ, ডোণ্ট বি সো মাচ সেণ্টিমেণ্টাল, আমি তোমাকে সে সব ভেবে কিছু বলি নি।'

বললাম, 'তা জানি। কিন্তু রূপার সেই ডেডবডি যদি তোমরা দেখতে যাকে আমি গতকাল রাত্রেই— ।'

ললিতা আমার সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো। এক্ষেত্রে ললিতার ঈর্ষা হবারই কথা। কিন্তু ও সমবেদনায় করুণ। বললো, 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অধীপ, উই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড য়ু।

আমি ললিতার হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে বললাম, 'তারপরে বলো, পুলিস আর কী জিজ্ঞেস করলো।'

ললিতা বললো, 'ডি ডি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মিত্রের এরকম ব্ল্যাকআউটের পিরিয়ড কতোক্ষণ থাকে। আমি বললাম, সেটা ঠিক বলতে পারবো না। কখনো কখনো দেখেছি পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে কী ঘটে গেছে ও কিছুই মনে করতে পারছে না, অথচ তার আগের এবং পরের সমস্ত ঘটনাই ওর মনে থেকেছে। আবার এমনও দেখা গেছে একটা সময়ের পর থেকে ও আর কিছুই মনে করতে পারে না, টোটাল ব্ল্যাক-আউট যাকে বলে তাই হয়। তার জন্য অধীপ খুব কষ্ট পায়, অনেক সময় রেগে গিয়ে বলে ড্রিংক ছেড়ে দেব। এই সব বলতে হয় তাই বললাম। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, রূপা চৌধুরীকে আমি চিনি কী না। বললাম, সাক্ষাৎ পরিচয় কখনো হয় নি, অধীপের মুখে শুনেছি। তার পরে ডি ডি আমাকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, বললেন, ড্রাংক অবস্থায় মিঃ মিত্র কখনো ফ্লেয়ার করেন কী ? অ্যাঙ্গার যাকে বলে হঠাৎ রেগে গিয়ে একটা কিছু করে বসা ? আমি বললাম, আজ পর্যন্ত আমরা তো কখনো দেখি নি। তা ছাড়াও রাউডিজম্ বা ঝগড়াবিবাদ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, ও যতো ড্রিংক করে ততো সুইটার, দো হি বিকামস ওয়াইল্ড, নট ইন দ্য সেন্স অব ফ্লেয়ারিং ; বাট য়ু ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অফিসার হোয়াট আই মীন, হি ইজ এ নাইস চাম্। শুনে ডি ডি আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন, আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।'

boiRboi.net

পৃথ্বীশ বলে উঠলো, 'তার মানে ডি ডি বুঝেছেন তুমি অধীপ মিত্রের একজন অনুরাগিণী বান্ধবী।'

ললিতা বললো, 'খুবই স্বাভাবিক। তারপরেই ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মিত্র কি এর মধ্যে আপনাদের টেলিফোন করেছিলেন? আমরা এখানে আসবার আগে? বললাম, না, কোনো টেলিফোনই সে করে নি। আমি সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজেই ওকে একবার বাড়িতে টেলিফোন করেছিলাম। ডি ডি বললেন, সে কথা মিঃ মিত্র আমাদের বলেছেন এবং চিকেন রোল্ কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন, সে কথাও বলেছেন। তারপরে ভদ্রলোক যাবার আগে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, আর বললেন, মিঃ মিত্র এমন চার্মিং জেন্টলম্যান তাঁকে দিয়ে আমরা কিছু ভাবতেই পারছি না। ওঁর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোনো খারাপ রেকর্ড নেই, একসেপ্ট হি ইজ এ ম্যান অব্ উওমেন'স ওয়ার্ল্ড। আমি মনে মনে হাসলাম, মনে মনে বললাম, ওটা অধীপ মিত্রের দোষ না মেয়েদের কপাল।'

বলে ললিতা হেসে উঠলো। পৃথ্বীশ বললো, 'তা এসব ডিটেকটিভ মার্কা গপ্পোই হবে, নাকি আর কিছু হবে। অধীপ মিত্র মহাশয় কি আজ থেকে ড্রাই লাইফে চলে গেলেন?'

বললাম, 'মোটেই না। দাও, বের করো কী আছে। তবে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো, রমাকে টেলিফোনে জানিয়েছি। ও খুব দুশ্চিন্তায় আছে, কারণ পুলিস আমার বাড়িতে গেছলো, আমার গতকালের পোশাক ট্রাউজার শার্ট টাই সবই ফরেনসিক টেস্টের জন্য নিয়ে গেছে।'

ললিতা অবাক হয়ে বললো, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। লোকাল থানার ও সি বেশ হোস্টাইল মনে হলো। হবে হয়তো ভদ্রলোক মনে মনে চাইছেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে একদিন আলাপ পরিচয় করবো, সে সব করি নি। তিনি তো আমার মুখের ওপরেই আমাকে চরিত্রহীন বললেন, অবিশ্যি ডি ডি আমার সামনেই তাঁকে ধমকে দিয়েছেন।'

ললিতা বললো, 'বসো আমি এদিকে একটু অ্যারেঞ্জ করি।'

ও ভিতরে চলে গেল। আমার এই বন্ধু পৃথ্বীশ একদিক থেকে বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছে। ও যথেষ্ট বড়লোক। কলকাতায় খানকয়েক বাড়ি আছে। বড়বাজারে পৈতৃক ব্যবসা আছে, যেখানে ও সারাদিনে ঘণ্টা কয়েক কাটায়। একটিমাত্র মেয়ে বছর দশ বয়স সে দার্জিলিং-এ থেকে পড়াশোনা করে। কটা গোটা বাড়িতে ওরা দু'জন আর চাকর-বাকর ছাড়া কেউ নেই। ওর ধারণা নিজে যে বাড়িতে থাকবে সেখানে কোনো ভাড়াটে রাখা চলে না। একদিক থেকে যেমন ঠিক তেমনি বাড়িটাকে ভুতুড়ে বলে মনে হয়। আট দশটা ঘরওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি, বাস করে একমাত্র স্বামী-স্ত্রী, কেমন যেন ফাঁকা লাগে।

ললিতা এল। পিছনে চাকরের হাতে ট্রে, ট্রে-র ওপর হুইস্কির বোতল গেলাস আর সোডার বোতল রয়েছে। প্লেটে কিছু কাজু নাইস্। বললো, 'অধীপ, তুমি তো অফিস থেকে সোজা এসেছ, একটু মাছভাজা গরম করে আনতে বলেছি।'

আমি বললাম, 'তার কী দরকার ছিল।'

কী ঘটেছে। ডি ডি রূপার খুনের ঘটনা বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী অধীপকে সন্দেহ করছেন নাকি? ডি ডি হেসে বললেন, 'মিঃ মিত্র আপনাদের বন্ধু। কিন্তু ঘটনাটা এমনভাবেই ঘটেছে, উনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। কারণ হিসাবে তুমি তাঁদের কাছে যা বলেছ, সে কথা আমাকে বললেন, আর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তোমার এ রকম ব্ল্যাকআউট হয় কী না, তুমি ভুলে যাও কী না। আমি বললাম, অধীপের ব্যাপারে আমরা বেশ কয়েকবার এরকম দেখেছি, ও কিছুতেই সব কথা মনে করতে পারে না।'

বলতে বলতে ললিতা হাঁপিয়ে উঠলো। দম নেবার জন্য থামলো। পৃথ্বীশ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'শেষটায় বাস্তবার্থেই তুমি লেডিকিলার হয়ে গেলে?'

হেসে বললাম, 'তাই তো দেখছি।'

বলতে বলতে আমার যেন বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। আমার চোখে জল এসে পড়ার উপক্রম করলো। পৃথ্বীশ বলে উঠলো, 'আরে অধীপ, ডোণ্ট বি সো মাচ সেণ্টিমেণ্টাল, আমি তোমাকে সে সব ভেবে কিছু বলি নি।'

বললাম, 'তা জানি। কিন্তু রূপার সেই ডেডবডি যদি তোমরা দেখতে যাকে আমি গতকাল রাত্রেই— ।'

ললিতা আমার সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো। এক্ষেত্রে ললিতার ঈর্ষা হবারই কথা। কিন্তু ও সমবেদনায় করুণ। বললো, 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অধীপ, উই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড য়ু।

আমি ললিতার হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে বললাম, 'তারপরে বলো, পুলিস আর কী জিজ্ঞেস করলো।'

ললিতা বললো, 'ডি ডি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মিত্রের এরকম ব্ল্যাকআউটের পিরিয়ড কতোক্ষণ থাকে। আমি বললাম, সেটা ঠিক বলতে পারবো না। কখনো কখনো দেখেছি পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে কী ঘটে গেছে ও কিছুই মনে করতে পারছে না, অথচ তার আগের এবং পরের সমস্ত ঘটনাই ওর মনে থেকেছে। আবার এমনও দেখা গেছে একটা সময়ের পর থেকে ও আর কিছুই মনে করতে পারে না, টোটাল ব্ল্যাক-আউট যাকে বলে তাই হয়। তার জন্য অধীপ খুব কষ্ট পায়, অনেক সময় রেগে গিয়ে বলে ড্রিংক ছেড়ে দেব। এই সব বলতে হয় তাই বললাম। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, রূপা চৌধুরীকে আমি চিনি কী না। বললাম, সাক্ষাৎ পরিচয় কখনো হয় নি, অধীপের মুখে শুনেছি। তার পরে ডি ডি আমাকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, বললেন, ড্রাংক অবস্থায় মিঃ মিত্র কখনো ফ্লেয়ার করেন কী? অ্যাঙ্গার যাকে বলে হঠাৎ রেগে গিয়ে একটা কিছু করে বসা? আমি বললাম, আজ পর্যন্ত আমরা তো কখনো দেখি নি। তা ছাড়াও রাউডিজম্ বা ঝগড়াবিবাদ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, ও যতো ড্রিংক করে ততো সুইটার, দো হি বিকামস ওয়াইল্ড, নট ইন দ্য সেন্স অব ফ্লেয়ারিং ; বাট য়ু ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অফিসার হোয়াট আই মীন, হি ইজ এ নাইস চাম্। শুনে ডি ডি আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন, আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।'

boiRboi.net

পৃথ্বীশ বলে উঠলো, 'তার মানে ডি ডি বুঝেছেন তুমি অধীপ মিত্রের একজন অনুরাগিণী বান্ধবী।'

ললিতা বললো, 'খুবই স্বাভাবিক। তারপরেই ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মিত্র কি এর মধ্যে আপনাদের টেলিফোন করেছিলেন? আমরা এখানে আসবার আগে? বললাম, না, কোনো টেলিফোনই সে করে নি। আমি সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজেই ওকে একবার বাড়িতে টেলিফোন করেছিলাম। ডি ডি বললেন, সে কথা মিঃ মিত্র আমাদের বলেছেন এবং চিকেন রোল্ কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন, সে কথাও বলেছেন। তারপরে ভদ্রলোক যাবার আগে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, আর বললেন, মিঃ মিত্র এমন চার্মিং জেণ্টলম্যান তাঁকে দিয়ে আমরা কিছু ভাবতেই পারছি না। ও'র বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোনো খারাপ রেকর্ড নেই, একসেপ্ট হি ইজ এ ম্যান অব্ উওমেন'স ওয়ার্ল্ড। আমি মনে মনে হাসলাম, মনে মনে বললাম, ওটা অধীপ মিত্রের দোষ না মেয়েদের কপাল।'

বলে ললিতা হেসে উঠলো। পৃথ্বীশ বললো, 'তা এসব ডিটেকটিভ মার্কা গপ্পোই হবে, নাকি আর কিছু হবে। অধীপ মিত্র মহাশয় কি আজ থেকে ড্রাই লাইফে চলে গেলেন?'

বললাম, 'মোটেই না। দাও, বের করো কী আছে। তবে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো, রমাকে টেলিফোনে জানিয়েছি। ও খুব দুশ্চিন্তায় আছে, কারণ পুলিস আমার বাড়িতে গেছলো, আমার গতকালের পোশাক ট্রাউজার শার্ট টাই সবই ফরেনসিক টেস্টের জন্য নিয়ে গেছে।'

ললিতা অবাক হয়ে বললো, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। লোকাল থানার ও সি বেশ হোস্টাইল মনে হলো। হবে হয়তো ভদ্রলোক মনে মনে চাইছেন ও'র সঙ্গে গিয়ে একদিন আলাপ পরিচয় করবো, সে সব করি নি। তিনি তো আমার মুখের ওপরেই আমাকে চরিত্রহীন বললেন, অবিশ্যি ডি ডি আমার সামনেই তাঁকে ধমকে দিয়েছেন।'

ললিতা বললো, 'বসো আমি এদিকে একটু অ্যারেঞ্জ করি।'

ও ভিতরে চলে গেল। আমার এই বন্ধু পৃথ্বীশ একদিক থেকে বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছে। ও যথেষ্ট বড়লোক। কলকাতায় খানকয়েক বাড়ি আছে। বড়বাজারে পৈতৃক ব্যবসা আছে, যেখানে ও সারাদিনে ঘণ্টা কয়েক কাটায়। একটিমাত্র মেয়ে বছর দশ বয়স সে দার্জিলিং-এ থেকে পড়াশোনা করে। কটা গোটা বাড়িতে ওরা দু'জন আর চাকর-বাকর ছাড়া কেউ নেই। ওর ধারণা নিজে যে বাড়িতে থাকবে সেখানে কোনো ভাড়াটে রাখা চলে না। একদিক থেকে যেমন ঠিক তেমনি বাড়িটাকে ভুতুড়ে বলে মনে হয়। আট দশটা ঘরওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি, বাস করে একমাত্র স্বামী-স্ত্রী, কেমন যেন ফাঁকা লাগে।

ললিতা এল। পিছনে চাকরের হাতে ট্রে, ট্রে-র ওপর হুইস্কির বোতল গেলাস আর সোডার বোতল রয়েছে। প্লেটে কিছু কাজু নাইস্। বললো, 'অধীপ, তুমি তো অফিস থেকে সোজা এসেছ, একটু মাছভাজা গরম করে আনতে বলেছি।'

আমি বললাম, 'তার কী দরকার ছিল।'

অবিশ্যি বলতে ভুলে গিয়েছি, অফিসে আমাকে লাঞ্চ দেওয়া হয়েছিল। আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম আমাকে যেন খালি একটু স্যুপ আর টোস্ট দেওয়া হয় উইদাউট বাটার। ললিতা বললো, 'অফিসে আজ কী লাঞ্চ করেছ সে তো তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

পৃথ্বীশ ইতিমধ্যে তিনটি গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে প্রস্তুত। বললো, 'নাও আগে একটু চুমুক দাও।'

ললিতা আমার দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিল। আমি ডান হাত বাড়িয়ে গ্লাস ধরতে যেতেই গ্লাস পড়ে যাবার উপক্রম করছিল। বুড়ো আঙুলটার কথা এখন আমার মনে পড়ে গেল আর গ্লাস ধরবার জন্য মুড়তে গিয়ে ব্যথা অনুভব করলাম। ললিতা বললো, 'কী হলো?'

আমি আঙুলটা ওদের সামনে তুলে ধরে দেখালাম। এখনো প্রায় এক রকমই রয়েছে। ফোলা লাল নীলশিটা দাগ। আজ আমি একটাও সই করতে পারি নি, সবই আমার অ্যাসিস্টান্টকে করতে হয়েছে। ললিতা আমার আঙুলটা আলতো করে ধরে বললো, 'কী করে এরকম লাগালে বলো তো? দেখে তো মনে হচ্ছে, কোথাও চেপটে গেছলো।'

আমি বাঁ হাতে গ্লাস তুলে নিয়ে বললাম, 'কিছুই মনে করতে পারছি না। কাল রাত্রে তো কোনো পেইন ফীল করি নি। আজ সকালে চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে টের পেলাম। ভেবেছিলাম, ডাক্তারকে একবার দেখাবো। সে কথা আর মনেই নেই।'

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু লাগিয়েছো?'

'কিছুই না।'

পৃথ্বীশ বললো, 'আমাদের ডাক্তারকে একবার ডাকবো নাকি?'

আমি বললাম, 'থাক না কী দরকার। এমনিই সেরে যাবে। ফ্রাকচার হলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হতো। তা যখন করছে না তখন মনে হয় সেরকম কিছু হয় নি।'

ললিতা ওর স্বামীকে বললো, 'না না, তুমি একবার ডাক্তারকে টেলিফোনে ডাকো, উনি যেন চেম্বার সামলে একবার ঘুরে যান। একবার দেখা দরকার।'

পৃথ্বীশ হাতে গ্লাস তুলে বললো, 'তার আগে চিয়ার্স'টা করে যাই।'

আমরা তিনজনেই গ্লাস তুলে চুমুক দিলাম। ললিতা বললো, 'অধীপের মিথ্যা কলঙ্ক মোচনের আশায়।'

পৃথ্বীশ চলে গেল। আর হুইস্কির পাত্রে চুমুক দিয়েই আমার গতকালের কথা মনে পড়ে গেল। গতকালের হুইস্কির স্বাদ ছিল আলাদা, একটা তীব্র সুখের জ্বালার মতো। আর এখন যেন বিষের জ্বালার মতো মনে হলো। যেন আত্মহননের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার মতোই মনে হলো, আমি বিষ পান করবো। ভাবতে ভাবতেই আমি সুদীর্ঘ চুমুকে গ্লাসের প্রায় অর্ধেক শূন্য করে দিলাম। ললিতা হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললো, 'এ কি করছো অধীপ, ডোণ্ট বী সেণ্টিমেণ্টাল। ওরকম করে খাচ্ছো কেন।'

বলে ও আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলে। আমি বললাম,

boiboi.net

'জানো ললিতা, আজ আমার বিষ পানের ইচ্ছা হচ্ছে। আই অ্যাম নট রিয়্যালি সেণ্টিমেণ্টাল বাট দেয়ার ইজ সামথিং ইনসাইড মী যা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না। সামথিং ভেরি পেইনফুল, টেরিবল টরমেণ্টিং। আমার মাথা কুটতে ইচ্ছা করছে কেন আমি কিছু মনে করতে পারছি না। আমি যদি রূপাকে ঠিক মতো রেখে আসতে পারতাম তাহলে এ দুর্ঘটনা কখনোই ঘটতো না। একটা জীবন এভাবে নষ্ট হয়ে গেল।'

ললিতা আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'এ জন্য এখন আর ভেবে কী হবে অধীপ। তুমি ভালোই জানো তোমার কিছুই করবার নেই। আমার মনে হয় রূপা ড্রাংক অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, তুমি কখন দরজা খুলে বেরিয়ে চলে এসেছ সেই ফাঁকে কেউ এ কাণ্ড করেছে।'

'কিন্তু কেন, কেন করবে? রূপার টাকা-পয়সা কিছু খোয়া যায় নি। যদি ধরে নিই কেউ ওকে রেপ্ করতে চেয়েছিল তার জন্য ওভাবে মার্ডার করার কী দরকার ছিল?'

ললিতা বললো, 'তা তুমি বলতে পারো না। পৃথিবীতে সেডিস্টরা যে কী করতে পারে আর না পারে, তা কেউ বলতে পারে না। দে ক্যান গো টু এনি এক্সট্রিম্! একটি মেয়েকে তারা টুকরো টুকরো করে কাটতে পারে, ব্রেস্ট কেটে ফেলতে পারে ইভন দ্য—

আমি আর শুনতে পারলাম না, বলে উঠলাম, 'প্লিজ স্টপ ললিতা ডোণ্ট স্যে।'

ললিতা চুপ করে গেল। পৃথ্বীশ ঢুকলো, বললো, 'ডাক্তার বললো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছে।'

আমি হাতের ঘড়ি দেখলাম, প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। তার মানে ডাক্তারের আসতে প্রায় সাড়ে সাতটা। কিন্তু আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো। আটটা সাড়ে আটটার বেশি দেরি করতে চাই না।

এ সময়েই ললিতার চাকর ফিশ ফ্রাইয়ের প্লেট নিয়ে এল। বেশ গরম, ধোঁয়া উঠছে এখনো। আমি সিগারেট ঠোঁটে চেপে ডান হাত দিয়ে লাইটার জ্বালাতে গিয়ে আবার ভুল করলাম, ব্যথা করে উঠলো বুড়ো আঙুলে। ললিতা আমার হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করলো, 'অফিসের কাজকর্ম করলে কী করে আজ?'

বললাম, 'হাতে কিছুই করি নি মানে লেখা বা সই করি নি, দেখেছি আর বলেছি।'

ললিতা একটা ঝকঝকে ফর্ক আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও মাছভাজা খাও।'

আমি হাতটা বাড়াতে গিয়েও যেন আতঙ্কে থমকে গেলাম। স্থির আতঙ্কিত চোখে ফর্কটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর আমার শিরদাঁড়ার কাছে আবার সেইরকম একটা কাঁপুনি লাগলো যেটা ক্রমেই শিরদাঁড়া বেয়ে মস্তিষ্কের দিকে উঠতে লাগলো। মনে হলো, ফর্কটা টেনে আমি আমার গলায় বিঁধিয়ে দেব, ঠিক যেমন করে রূপার গলায় বেঁধানো হয়েছিল। ললিতা প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'অধীপ, অধীপ কী হয়েছে?'

boiRboi.net

পৃথ্বীশ তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'এই অধীপ, কী হয়েছে এতো ভয় পাচ্ছো কেন ?'

আমি ললিতার হাতের ঝকঝকে যেন উদ্যত থাবার মতো ফর্কের নখগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে স্খলিত গলায় বলতে পারলাম, 'ডাক্তার বলেছে এরকম একটা ফর্ক দিয়েই নাকি রূপাকে গলায় বিঁধিয়ে মারা হয়েছে।'

শোনামাত্র ললিতা আমার চোখের সামনে থেকে ফর্কটা সরিয়ে নিল। আরো যে-দুটো ফর্ক ছিল, সেগুলো নিয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই, হাতে চামচ নিয়ে। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। তখনো পৃথ্বীশ আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আমি যেন আস্তে আস্তে আবার নিজেকে ফিরে পেলাম। মুখ ঢেকে রাখা অবস্থাতেই বললাম, 'সরি, আয়াম সরি।'

বলে মুখ থেকে হাত সরালাম। পৃথ্বীশ আমাকে ছেড়ে ওর জায়গায় গিয়ে বসলো। ললিতা আমার পাশে যেমন বসেছিল তেমনি বসলো। নিচু উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কেমন বোধ করছো অধীপ। চোখে মুখে একটু জল দেবে কী ?'

আমি বললাম, 'না না, তার কোনো দরকার হবে না। আসলে রূপার ডেডবডিটা আমার দেখা উচিত হয় নি। কণ্ঠার ঠিক ওপরেই ওর সেই গলায় ফর্ক ঢোকানো গর্তটা আর শুকনো রক্তর কথা আমার মনে পড়ে গেল, তাইতেই— ।'

আমি কথাটা অসমাপ্ত রেখে আমার হুইস্কির গ্লাস তুলে নিলাম। পৃথ্বীশ আর ললিতাও নিল। ললিতা বললো, 'আমার একটুও ভাল লাগছে না। তুমি অধীপ, আমাদের সকলের আনন্দ আর খুশির মধ্যমণি, তোমার চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। এসব চিন্তা তুমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যালো তো, একটু অন্য কথাবার্তা বলো। নাও, মাছ খাও। তুমি তো ডান হাত দিয়ে ভেঙে খেতে পারবে না আমিই মুখে তুলে দিচ্ছি।'

বলে এক টুকরো ফ্রাই ভেঙে আমার মুখে তুলে দিল। আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে পৃথ্বীশের দিকে তাকালাম। পৃথ্বীশ বললো, 'ইয়া, য়ু শুড গিভ রিটার্ন।'

আমি ললিতার গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে দিলাম। তারপরে মাছ চিবিয়ে খেতে লাগলাম। মাছ গিলে নিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলাম। ললিতাও হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'চলো আজ আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি। ডায়মণ্ডহারবার বা কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসা যাক। না হয় তো ফিল্ম শো'তেও যাওয়া যায়।'

আমি বললাম, 'রমাকে বলেছি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।'

পৃথিবীশ বললো, 'রমাকেও সঙ্গে নিয়ে বেরুনো যাক।'

বললাম, 'তা বোধহয় ও বেরোতে চাইবে না। থাক, এখানেই বসি।'

বলে আমি আমার পাত্র শূন্য করে পৃথ্বীশের দিকে এগিয়ে দিলাম। পৃথ্বীশ বললো, 'ডোণ্ট গো মাচ ফাস্ট।'

হেসে বললাম, 'একটু ফাস্ট নেওয়াই ভালো। মেজাজটা যাতে হালকা হয়।'

পৃথ্বীশ আমাকে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে দিল। ললিতা হেসে বললো, 'সে-রকম বোঝ তো অন্য কোনো বান্ধবীর কাছে যাবে নাকি ?'

boiRboi.net

বললাম, 'তোমার যদি ভালো না লাগে, তা হলে যেতে পারি।'

ললিতা আমার শার্টের কলারের ওপরে গলায় আস্তে করে একটা চিমটি কাটলো। বললো, 'য়ু শ্যুড বী অ্যাসেম্‌ড। তোমার সেই বান্ধবীটির খবর কী, ছাত্রীটি?'

বললাম, 'আছে। কিন্তু তার কাছে যাবার কোনো আর্জ ফীল করছি না। ওটা একটা অন্য মুডের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রেম করার মতো। সামটাইম্ সত্যি খুব রোমান্টিক।'

'ফীলিং জেলাস?'

'জেলাস হলে যদি তুমি তাকে ছেড়ে দিতে, তা হলে জেলাস হতাম। আদার ওয়াইজ লাভ কী?'

ললিতা আমার মুখে ফ্রাইয়ের টুকরো তুলে দিতে দিতে বললো। আমি মাছ চিবোতে চিবোতে বললাম, 'সরি।'

ললিতা বললো, 'বাচ্চাগুলোকে এবার ছাড়ো না। আমাদের মেয়েরাও যে বড় হচ্ছে। তুমি কী শেষটায়—'

আমি হোহো করে হেসে উঠলাম। ললিতা বললো 'না না, তোমার ব্যাপার মোটেই সুবিধার না। এর পরে দেখছি তুমি কেলেঙ্কারি করবে।'

পৃথ্বীশ ঠাট্টা করে বললো, 'ওর কী দোষ বলো। মাতা নহমাতারা এক সঙ্গে যদি ওকে নিয়ে টানাটানি করে, ও কী করবে?'

আমি বললাম, 'এটা কোনো আলোচনার বিষয় হতে পারে না।'

ললিতা বললো, 'তুমি পারো আর আমরা আলোচনা করতে পারি না, না? এবার একটু শান্ত হও না।'

আমি ম্লান হেসে বললাম, 'সত্যি আমি একটা ফিলাণ্ডারার কী না জানি না, তাই সামটাইমস্ আই হেট মাইসেলফ্। দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি সামথিং রঙ্ ইনসাইড মী! তবে একথাও ঠিক, আমি কারোর ক্ষতি করতে চাই না। নিজেকেও আমি একটা হাইপার সেকস্যুয়াল বলে মনে করি না। যে সমাজে আমি বাস করি, তার মধ্যে আমি এ প্যাটার্ন অব্ লাইফ বেছে নিয়েছি। তার মধ্যে নিরঙ্কুশ সুখ নেই, বরং একটা অসুখী বিক্ষোভ বোধহয় কোথাও জমা হয়ে থাকে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, একটু পান, প্রেম-প্রেম খেলা ইত্যাদি নিয়ে কাটিয়ে দিতে চাই। পণ্ডিত লোক নই যে, কোনো ব্যাপক চিন্তার জগতে ডুবে থাকবো। আমি একটা চাকর মানুষ, সেখানে বহুবিধ অন্যায় অবিচার চোখের সামনেই ঘটছে। আমার নিজের হাত দিয়েও ঘটছে, অথচ তার বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতাও আমার নেই।'

বলতে বলতে আমি হঠাৎ থেমে গিয়ে গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'লেকচার শুরু করে দিয়েছি। মানে হুইস্কির এফেক্ট শুরু হয়ে গেছে!'

ললিতা বললো, 'মোটেই না। তুমি বেশ ভালো মুডেই কথা বলছো। তোমার ন্যাচারেল মুডে। তুমি বলো না কী বলছিলে?'

বললাম, 'কী আর, এ সবই। যেমন ধরো, আমি বেশ খেয়ে পরে বেশ ভালোই আছি, অথচ একবারের জন্যও যখন আমার মনে পড়ে যায় সম্পদের সামান্য অংশও বেশির ভাগ মানুষ ভোগ করতে পায় না, তখন সমস্ত জীবনটাকেই কেমন একরকম অবিশ্বাস্য

boiRboi.net

বলে মনে হয়। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই অবাস্তব। অথচ আমি কিছুই করতে পারি না, আমার মধ্যে কোথাও আত্মবিদ্রোহ নেই। তার চেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক জীবনটা। এবং সত্যি বলতে কি আমার জীবনটাকেও অনেকে খুব খারাপ চোখে দেখতে পারে, পারুক, আমি বলবো, মেয়েদের সান্নিধ্য আমার ভালোই লাগে, অবিশ্যিই যারা একটু দয়াবতী এবং রসিকা।'

বলে ললিতার দিকে তাকিয়ে আমি হেসে উঠলাম। ও আমার মুখে ফ্রাই গুঁজে দিয়ে বললো, 'সেটা অন্যায় কিছু না।'

আমি পৃথ্বীশের দিকে তাকালাম। ও ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'বুঝি না ভাই। ব্যবসা-ট্যাবসা নিয়ে থাকি, তা নিয়েই কেটে যাচ্ছে। তবে মহিলারা স্ব-মুখেই যখন বলছেন, অন্যায় কিছু না আমি আর কী বলতে পারি? তোমার নিজেরো তো ভালোই লাগে।'

বললাম, 'সে কথা তো একশোবার স্বীকার করছি। অবিশ্যি আমি মেয়ে বলতে একটা ব্যাপারই বুঝি না। আই রেসপেক্ট দেম, আই রিগার্ড, তাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কেও আমি মোটেই নির্বিকার থাকবার লোক নই। তবে হ্যাঁ, ভালবাসা ব্যাপারটা তো কোনোদিনই বুঝতে পারি নি, ওটা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বোঝবার জন্যই থাক। আমি কারোকে আহত না করে, সমাজকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না করে, একটু হেসে খেলে যাতে কাটিয়ে যেতে পারি তারই চেষ্টায় আছি। আর আমি এটাও মনে করি, জগৎ সংসারে মেয়েরা প্রাণস্বরূপ। আমাদের জীবনে তাদের ভূমিকার অন্ত নেই। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা যখন সে শক্তিরূপিণী, আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি। আমি সেই রূপেই তাদের ভজন-পূজন করতে চাই।'

কথা থামিয়ে আমি আবার গেলাসে চুমুক দিলাম। ললিতা আমার মুখে ফ্রাই গুঁজে দিল। আমি হেসে বললাম, 'তা ছাড়া আমার এক বন্ধুর বিদেশিনী পত্নীর সেই মজার কথাটা কখনো ভুলতে পারি না।'

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী?'

বললাম, 'তোমাদের বলি নি বুঝি? এই তো বছর খানেক আগেকার কথা, আমরা একটা ক্লাবের লনে প্রায় বারো তেরোজন বন্ধু গোল হয়ে বসে ড্রিংকের সঙ্গে গল্প-গুজব করছি। বন্ধুটি এল সস্ত্রীক। আমরা সবাই বন্ধুপত্নীকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালাম। বন্ধুপত্নী যেন কেমন গম্ভীর হয়ে রইলেন। বসলেন, কথাবার্তাও বললেন, কিঞ্চিৎ পানও করলেন। পরে শুনলাম, সে তার স্বামীকে বলেছে, তোমার বন্ধুরা কি হোমোসেকসুয়াল নাকি? সন্ধ্যেবেলা ডজনখানেক যুবা-পুরুষ একসঙ্গে বসে ড্রিংক করছে, মনে হলো ওটা সমকামীদের একটা আড্ডা।'

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো।, বলে উঠলো, 'যাহ্, অধীপ এটা তুমি বানিয়ে বলছো।'

আমি বললাম, 'অন গড বলছি, বানিয়ে বলে আমার কী লাভ। ব্যাপারটা তোমরা ভেবে দ্যাখো, বন্ধুপত্নী যে দেশের মেয়ে, সে হয়তো ভাবতেই পারে না সন্ধ্যেবেলা একদল পুরুষ একসঙ্গে বসে পান করছে, গল্প করছে। একটিও মেয়ে নেই। আমি নিশ্চয়ই সে দেশের মানুষ নই, কিন্তু কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমাদের

boiRboi.net

দেশের রেওয়াজ অবিশ্যি তাই, আমাদের সমাজ সামাজিকতাও ভিন্ন, বন্ধুপত্নী যা বলেছিল সেটাও তার দিক থেকে সে কিন্তু অন্যায় বলে নি। আমিও মনে করি, চাইও তাই, যে নিছক পুরুষদের থেকে মেয়েদের সঙ্গে অড্ডা দেওয়া অনেক ভালো। আর শুনেছি, গুরুদেব লোকেরা নাকি তাই করে থাকেন, যদিও বাইরে থেকে তাদের দেখা বা চেনা যায় না।'

বলে আমি হাসলাম। গেলাসে চুমুক দিলাম। ললিতা আমার মুখে ফ্রাই দিল। পৃথ্বীশ বললো, 'গুরুদেব তো আমাদের সামনেই বসে আছেন।'

আমি বললাম, 'তা যা-ই বলো ভাই, ব্যাপারটাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা অনেকখানি, তবু বলবো, আমি নারীসঙ্গ চাই। এই যে ললিতা এখন আমাকে মাছভাজা খাইয়ে দিচ্ছে, ডাক্তার ডেকে আনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো, এটা নারী হিসাবে কেবল যে বন্ধুকৃত্য করলো তা-ই না, এটা তো একদিকে মায়েরও কর্তব্য।'

ললিতা আমার কাঁধে একটু চাপড় মেরে বললো, 'আমি তোমার এ কমপ্লিমেন্ট আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। আমি অনেক সময় মা হিসাবেই তোমাদের দেখে থাকি।'

এ সময়েই ডাক্তার এলেন। এ পরিবারের ইনি ডাক্তার, ডক্টর ঘোষ। আমার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। ললিতা ডাকলো, 'আসুন ডক্টর ঘোষ।'

ডক্টর ঘোষ লোকটি, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথাজোড়া টাক, গোলগাল মানুষ এবং বেশ হাসিখুশি। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কী, শুনলাম কোথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে গিয়ে বুড়ো আঙুলে চোট লাগিয়েছেন?'

আমি বেশ বুঝতে পারছি হুইস্কি পেটে পড়তে শুরু করার পরে আমি কথা যেমন বেশি বলতে আরম্ভ করেছি, আমি আমার ফর্মকেও ফিরে পেতে আরম্ভ করেছি। আঙুলের ব্যথাটা এখন যেন তেমন অনুভবই করছি না। বললাম, 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ কী না জানি না, তবে চোট একটা লেগেছে কোনোরকমে, কিন্তু কোথায় কী ভাবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ললিতা আমার পাশ থেকে উঠে বললো, 'ডক্টর ঘোষ, আপনি এখানে বসুন। আপনার জন্য একটা গ্লাস আনি?'

ডক্টর ঘোষ হেসে বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ মিসেস চক্রবর্তী, কিন্তু আমার এখনও কয়েকটা কল বাকি আছে। সেসব না সেরে ড্রিংক-টেবিলে বসতে পারবো না। কই দেখি মিঃ মিত্র আঙুলটা দেখি।'

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলাম। ডক্টর ঘোষ আমার হাতটা টেনে ধরে বুড়ো আঙুলটা দেখলেন। হাত দিয়ে একটু জোরে টিপতেই আমার লাগলো। উনি তেমন গ্রাহ্য করলেন না। প্রায় জোর করেই, আঙুলটা সামনের দিকে বাঁকাতে চেষ্টা করলেন, আমার আরো বেশি লাগলো। ডাক্তার তবুও গ্রাহ্য না করে, আঙুলটা পেছনে হেলাবার চেষ্টা করলেন। তারপরে নীলশিটা পড়া দাগের ওপর আঙুল বুলিয়ে, নখ দিয়ে একটু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখলেন, বললেন, 'হুম্, এমন কিছু ব্যাপার না, ফ্রাকচার হয় নি। আঙুলটার দু'পাশ থেকে চেপ্টে গিয়েছিল, সেইজন্য এখানে রক্ত জমে গেছে। যখন লেগেছিল, তখনই একটু বরফ ঘষে দিলে এতোটা ফুলতো না, ব্যথাও কমে যেতো।'

boirboi.net

ললিতা বললো, 'বরফ লাগাবে কে। ও তো জানেই না, কখন কোথায় কি ভাবে লেগেছে।'

ডাক্তার বললেন, 'যেখানেই লেগে থাকুক, সেখানে শুধু মেটাল ছিল না, কোনো-রকমের হার্ড রাবার বা ওই জাতীয় কোনো লাইনিং প্যাড ছিল, তা না হলে কেটে গিয়ে রক্ত পড়তো। গাড়ির দরজায় লাগতে পারে। না হয় মনে করে দেখুন, ফ্রিজ বন্ধ করতে গিয়ে নিজের আঙুলসুদ্ধ দরজা চেপে দিয়েছিলেন কী না। কিংবা কোনো ফোল্ডিং সোফার ভাঁজে, আঙুলটা চাপা পড়ে গেছলো কী না।'

অন্ধকার, গভীরতর, নিশ্ছিদ্র, কিছু মনে করতে পারছি না। ললিতা আর পৃথ্বীশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ডাক্তার বলে উঠলেন, 'যাহোক মারাত্মক কিছুই হয় নি, হাড়ে লাগে নি। দু'একটা দিন একটু ভোগাবে। আমি একটা মালিশ লিখে দিচ্ছি, ওটা লাগান। একটা ট্যাবলেটও লিখে দিচ্ছি, খুব বেশি ব্যথা করলে, সেটা খাবেন।'

ললিতা তাড়াতাড়ি একটা রাইটিংপ্যাড নিয়ে এসে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিল। ডাক্তার ওষুধের নাম লিখলেন। আমি বললাম, 'এমনিতে আমার কোনো পেইন নেই। তবে কিছু ধরতে গেলে আঙুলে লাগছে।'

ডাক্তার বললেন, 'কিছু না, ঝোঁকের মাথায় কোথায় কখন লাগিয়ে বসে আছেন, সামনের দিকে ফেটে গিয়ে রক্তপাত হতে পারতো, হয় নি, জমে গেছে।'

ডাক্তার রাইটিংপ্যাডটা ললিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে, গ্লাসের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আর একটু পেটে পড়লে, ব্যথা আর থাকবেই না হয় তো, তবে আর চোট লাগাবার চেষ্টা করবেন না।'

ললিতা হেসে উঠলো। পৃথ্বীশ পকেট থেকে বত্রিশটা টাকা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ডাক্তার ঘোষ বলে উঠলেন, 'থ্যাংকু মিঃ চক্রবর্তী, ওটা এখন পকেটে রাখুন। মিঃ মিত্রের কাছে আমাকে শীগগিরই ছুটতে হবে, নার্সিংহোমটায় হাত দিয়েছি তো, মিনিমাম তিন লাখ টাকার দরকার হবে।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমিও পকেট থেকে পার্স বের করেছি। বললাম, 'সে আপনি দশ লাখ টাকার জন্য আসুন না, আমার ঘর থেকে তো দেবো না। কিন্তু ভিজিট নেবেন না কেন।'

ডাক্তার ঘোষ তখন দরজার কাছে চলে গিয়েছেন, বললেন, 'তখন অনেক ভিজিট আমাকেই দিতে হবে কী না, সেটা একটু কমিয়ে রাখলাম।'

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। ললিতা বললো, 'ছেড়ে দাও, ডাক্তার আমাদের কাছ থেকে অনেক টাকা আজ পর্যন্ত পেয়েছে, আজ বত্রিশটা টাকা না নিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

আমি হেসে বললাম, 'এয়ারে কয় মাইয়ামানুষ।'

ললিতা বললো, 'অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, একে বলে স্ত্রীলোক। তোমাদের মতো অতো ভদ্রতা আমার নেই। ডক্টর ঘোষের টাকার অভাব কী। আমাদের সঙ্গে কি কেবল ওঁর টাকার সম্পর্ক?'

boiRboi.net

বলে ললিতা চাকরকে ডেকে বলল, 'এ ওষুধগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। ওই ড্রয়ারে টাকা আছে, দশটা টাকা নিয়ে যাও, মনে হয় ওতেই হয়ে যাবে।'

আমি জানি, ললিতাকে ওষুধের টাকা দিতে যাওয়া বৃথা, ও আমার কথা শুনবে না। পৃথ্বীশ বললো, 'আসলে ডক্টর ঘোষ তো বলেই গেলেন তাঁর নিজের কথা। নেহাত অধীপের ব্যাপার বলেই টাকাটা নিলেন না, আমাদের কারোর ব্যাপার হলে, ঠিক টাকা নিয়ে ভেগে পড়তেন! এসব ব্যাপারে ডাক্তাররা বড় শক্ত মানুষ।'

আমি গেলাস শূন্য করে, আবার পৃথ্বীশের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার মন মেজাজ এখন বেশ হাল্‌কা বোধ করছি। দূর আকাশে মেঘ করলে, সেখান থেকে বিদ্যুৎ চমকের ঝিলিক যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনিভাবে রূপার মুখটা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাকে তা গভীরভাবে বিচলিত করতে পারছিল না। আমি যেন ক্রমেই অন্য মানুষ হয়ে উঠছি। খানিকটা খুশি আর আনন্দে বিহ্বল।

এ সময়ে চাকর মালিশের ওষুধ আর ট্যাবলেট নিয়ে ফিরলো। ললিতা মালিশের শিশি খুলে, সাদা রঙের পাতলা মালিশ আমার আঙুলে লাগিয়ে দিল।

পৃথ্বীশ আমার দিকে গ্লাস পূর্ণ করে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'দেন বয় য়ু আর গেটিং য়োরসেলফ?'

আমি গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালো লাগছে।'

মাছের ফ্রাই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ললিতা নিজেই খালি প্লেটটা ভিতরে রেখে আমার পাশে এসে বসলো। বললো, 'থাক তোমার যে ভালো লাগছে এটাই ভালো। কিন্তু মাইণ্ড, দিস ইজ য়োর লাস্ট ড্রিংক। তুমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলেছ।'

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, 'নিশ্চয়ই। আটটা বাজছে। সাড়ে আটটায় আমি বাড়ি পৌঁছুবো।'

এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলো। পৃথ্বীশ উঠে গেল পাশের ঘরে টেলিফোন ধরতে। আমি ললিতার দিকে তাকালাম। ললিতা বললো, 'চোখে তো ঘোর লেগেছে দেখছি।'

'তোমাকে দেখলেই লাগে।'

'কিন্তু রূপার সামনে থাকলে নিশ্চয়ই লাগতো না।'

আমি চমকে উঠলাম। বলে উঠলাম, 'কে রূপা?'

বলতে না বলতেই, রূপার সেই নগ্ন নিহত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেসে ওঠা মাত্রই, আমার কোমরের নিচে, ঠিক মাঝখানের গ্রন্থির কেন্দ্রে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো অনুভূত হলো। আর বিদ্যুৎ কষায়, একটা কাঁপুনি আমার শিরদাঁড়ায় লাগলো। সেই কাঁপুনি কমে ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করলো। আমি মোটেই এ ব্যাপারে আর অচেতন নেই, আজ দুপুরেই একবার অফিসের ঘরে এ ঘটনা ঘটেছিল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে, এই সাপ বেয়ে ওঠা কাঁপুনিটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা এমনই তীব্র এবং অনিবার্য, তার গন্তব্যের যাত্রা আমার মস্তিষ্কের দিকে একই ভাবে এগিয়ে চললো, আর আমার শরীর জুড়ে যেন একটা আক্ষেপ শুরু হলো, এবং আমি দু'হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চাইলাম, কেন না আমার মনে হলো

boiRboi.net

আমি যেন গভীর শূন্যে থেকে অসহায়ভাবে পড়ে যাচ্ছি, যে কারণে মুখটা কোথাও গুঁজে দিতে ইচ্ছা করলো।

আমার বাড়ানো হাত ললিতা নিজের হাতে ধরে ফেললো, আমার মুখ ওর কাঁধের কাছে গুঁজে দিলাম। কিন্তু ললিতা যে আমাকে ধরেছে বা ওরই কাঁধে আমি মুখ গুঁজে দিয়েছি, এ ব্যাপারেও আমি যেন তেমন সচেতন নই। আমি যেন বহুদূর থেকে ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি, অধীপ-অধীপ—অধীপ…। আর সেই ডাকে সাড়া দেবার জন্য চেষ্টা করেও, আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের করতে পারছি না, এবং আমি পা দিয়ে জোরে জোরে মেঝে আঁকড়ে ধরতে চাইছি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই, আমি আমার কানের কাছে আমার নাম শুনে হঠাৎ বলে উঠলাম, 'অ্যা, কী ?' বলেই ললিতার কাঁধ থেকে আমি মুখ তুললাম। আমার শরীরের আক্ষেপ স্তব্ধ। আমি নিজেকে ফিরে পেলাম, এবং যেন ঠিক মনেই করতে পারছি না, মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল। দেখলাম ললিতা আমার দিকে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে, এবং পাশের ঘরে তখনো পৃথ্বীশের গলা শুনতে পাচ্ছি, সে টেলিফোনে কারোর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছে।

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে অধীপ ?'

আমি খানিকটা অসহায় ভাবে বললাম, 'কি যেন একটা হয়ে গেল, তাই না ?'

আমার পাল্টা জিজ্ঞাসা শুনে, ললিতা যেন আরো অবাক হলো। বললো, 'তুমি জানো না, তোমার কী হয়েছিল ?'

আমি বললাম, 'না, ঠিক বুঝতে পারলাম না, মনে হলে, শিরদাঁড়ার কাছ থেকে কাঁপতে কাঁপতে কি একটা যেন আমার ব্রেনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, তা ছাড়া আর কিছু ফীল করতে পারি নি।'

ললিতা ওর শাড়ির আঁচল তুলে, আমার ঠোঁটের কষ মুছিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার ?'

ললিতা বললো, 'তোমার মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে।'

আমার মনটা ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গেল। এবং একটা ভয়ও যেন পেলাম। আমার কি হিস্টিরিয়া জাতীয় কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে নাকি ? আমি তো বেশ ভালোই ছিলাম। আমার থার্ড পেগ চলছিল এবং আমি বেশ স্পষ্টই মনে করতে পারছি, পৃথ্বীশ টেলিফোন ধরতে যাবার পরেই আমি ললিতার দিকে তাকিয়েছিলাম। ওকে একটা চুমো খাবো বলে। একটা নতুন কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল মনে করবারও কোনো কারণ নেই। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং মাত্রাধিক্য পরিমাণ পান হয়ে গেলে পৃথ্বীশ যে কোনো বাধা নয়, সেকথাও আগে বলেছি। পৃথ্বীশের সামনেও সেরকম ঘটনা ঘটেছে। তথাপি যেন কি ঘটে গেল, আমিও বুঝতে পারলাম না। ললিতা এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর চোখে গভীর জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল।

আমি গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'আমার কি হিস্টিরিয়া গ্রো করছে নাকি বুঝতে পারছি না।'

ললিতা বললো, 'না, মূর্ছা না, আমার যেন মনে হলো তোমার মধ্যে মৃগী রোগের

boiRboi.net

লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এটা তো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তোমার মতো লোকের কখনও এরকম অসুখ করতেই পারে না। তবে আমার মনে হয়, সেরকম কিছুই না, এটা একটা সাকিং থেকে হঠাৎ হয়েছে।'

তাতে আমি কোনো সান্ত্বনা বোধ করলাম না। বললাম, 'মৃগী রোগ কি সাকিং থেকে হতে পারে না? মৃগী রোগের লক্ষণ কী?'

বলতে বলতে আমি গেলাসে চুমুক দিলাম। ললিতা বললো, 'হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করা, হাত পায়ে খিঁচুনি ধরা বা ছোঁড়া, মুখ গোঁজড়ানো, ইত্যাদি।'

'আমার কি সেরকম হয়েছিল নাকি?'

ললিতা এ কথার হঠাৎ কোনো জবাব দিল না। পৃথ্বীশ ফিরে এল। ললিতা ওর নিজের গেলাস নিয়ে চুমুক দিল। পৃথ্বীশ বললো, 'কি ব্যাপার, তোমরা যেন কেমন চুপচাপ?'

আমি বললাম, 'আমার মধ্যে হঠাৎই কেমন একটা চেঞ্জ এসেছিল। আই ডিড সামথিং। হোয়াট আই কাণ্ট প্রোপারলি ডেস্‌ক্রাইব। ললিতার মনে হয়েছে, আমার মধ্যে মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।'

ললিতা বলে উঠলো, 'আমি মোটেই তা বলি নি। আমার মনে হলো সাকিং থেকে এরকম হয়েছে। অধীপ হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল, ওর সমস্ত শরীরে একটা আক্ষেপ। যাকে খানিকটা খিচুনির ভাব বলা যায়, আর গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। বোধহয় মিনিট খানেক, তারপরেই আবার ঠিক হয়ে গেল। আর সেটা হলো তখুনি যে মুহূর্তে আমি রূপার নাম নিয়েছি।'

পৃথ্বীশ বললো, 'এইটুকু সময়ের মধ্যে এতো ঘটনা ঘটে গেল?'

আমি অবাক হয়ে ললিতার দিকে চেয়ে বললাম, 'রূপার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম হবে কেন? আগেও তো রূপার নাম নিয়েছ।'

ললিতা গম্ভীর হয়েই বললো, 'নিয়েছ, সেটা গত রাত্রের ঘটনায়, পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনার সময়ে। এখন যখন রূপার নাম নেওয়া হয়েছিল, সে সময়ে তোমার মুড একটু অন্যরকম ছিল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কি রকম মুড?'

ললিতা বললো, 'সে কথা বলে কোনো লাভ নেই। তবে—।'

বলে ললিতা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওর ভাসা ভাসা সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। বললো, 'অধীপকুমার মিত্র মহাশয়, আজ প্রথম আবিষ্কৃত হলো, যে ভালবাসা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না বলতে, রূপার সঙ্গে সেই ভালবাসাই তোমার ছিল। তুমি নিজেও হয়তো জানতে না, রূপাকে তুমি ভালবাসো। তা না হলে রূপার নাম নেওয়া মাত্র তোমার এরকম ঘটতো না। এটা তোমার কাছে এখন ভয়ংকর সাকিং। অবিশ্যি নিশ্চয়ই, রূপা যেভাবে মার্ডার হয়েছে সেটা এমনিতেই সাকিং। কিন্তু তোমার কাছে তা ভিন্ন রকম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

ললিতা কথাগুলো বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আমি অন্তত কখনো আবিষ্কার করতে পারি নি, সেই মিনিংলেস ভালবাসা ব্যাপারটা আমার জীবনে

boiRboi.net

ঘটেছে, তাও আবার রূপার সঙ্গে। শী ওয়াজ রিয়্যালি চার্মিং। এনি টাইম আই হার্ড হার ভয়েস ওভার টেলিফোন, মাই হার্ট ক্লিকড, আই ওয়াজ থার্স্টি ফর হার ওয়ান্ডারফুল ফিজিক, বাট ভালবাসা আই ডোণ্ট নো ললিতা। তবে হ্যাঁ, আমার মনে হয় ওর ডেডবডিটা আমার নিজের চোখে না দেখলেই বোধহয় ভালো হতো। তারপরে ডাক্তারের মুখে যখন শুনলাম, একটা ফর্ক গলায় ঢুকিয়ে—।'

ললিতা আমার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল। বললো, 'এ প্রসঙ্গই থাক অধীপ।'

এই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হলো, ললিতার চোখে একটা বিষণ্ণতার গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে। ওর মনের মধ্যে যেন একটা কষ্ট। তার কারণটা বোঝবার মতো অনুভূতিও আমার আছে। যে ভালবাসা নিয়ে আমি বলতে গেলে একটা ক্যালাস ধারণা ছাড়া কিছুই কখনো বুঝি নি, রূপার প্রতি আমার সেই ভালবাসা আবিষ্কারই ওর বিষণ্ণতার মূল। যদিচ, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, ভালবাসা নামে ব্যাপারটা রূপার সঙ্গে আমার কখনোই ঘটে নি।

হেসে বললাম, 'তাহলে পুরোপুরি তোমার প্রসঙ্গে আসা যাক ?'

বলেই আমি আমার গেলাস শূন্য করে দিলাম। ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আমার প্রসঙ্গটা কী ?'

আমি ওর গালে আলতো করে ঠোঁট স্পর্শ করলাম। পৃথ্বীশ বললো, 'বেড়ালটাকে এবার ঘর ছাড়তে হয়।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'ইয়ার্কি ছাড়ো, আমাকে আর একটা পেগ দাও।'

ললিতা বলে উঠলো, 'নো মোর। পৃথ্বীশ, ওকে আর দিও না, অলরেডি আটটা পনেরো। ওর সাড়ে আটটায় বাড়ি যাবার কথা। এবং যাওয়া উচিতও, কারণ রমা নিশ্চয় খুব চিন্তায় আছে। তাছাড়া আমার মনে হয়, পৃথ্বীশ, তুমি অধীপের সঙ্গে ওর বাড়ি অবধি যাও।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ? ভাবছো আমি আবার কোথাও ড্রিংকের জন্য ঢু মারবো ?'

ললিতা বললো, 'সেজন্য বলি নি। তোমার শরীর আর মনের কথা ভেবে বলছি।'

আমি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মোটেই না, আমার কিছুই হয় নি। আমি বাড়ি গিয়ে তোমাকে টেলিফোন করছি।'

পৃথ্বীশ বললো, 'চলো না ঘুরেই আসি।'

'এনজয় য়োর ড্রিংক অ্যান্ড'—ললিতাকে চোখের কোণে দেখিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, 'গুডনাইট।'

ওরা দুজনেই গুডনাইট করলো। আমি নিচে নেমে গেলাম।

★

boiRboi.net

আমি গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়িই এলাম। আসবার সময় কেবলই আমার মনে হলো, একটা গাড়ি আমাকে সব সময়ে ফলো করছে। কিংবা হয়তো আমি ভুলও ভাবতে পারি। আমি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই নাথু গ্যারেজের দরজা খুলে দিল। আমি গাড়ি ঢুকিয়ে সোজা ওপরে চলে গেলাম। রমা দেখলাম সত্যি খুব উদ্বিগ্ন মুখে

আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'এসেছ ? আমি যে কী ভয় পাচ্ছিলাম। সারাটা দিন আমার খুব খারাপ কেটেছে।'

এত তাড়াতাড়ি আমি কোনোদিনই বাড়ি ফিরি না। আজ আমার ছেলেমেয়েরাও জেগে রয়েছে। আমার মেয়ে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমাদের বাড়িতে পুলিস এসেছিল কেন ? তোমার ট্রাউজার শার্ট সব দেখেছে, নিয়ে গেছে।'

আমি রমার চোখের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম আমার ছেলেও ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সকলেই খুব ভয় পেয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। আমি গলার টাইটা ঢিল করে বসে বললাম, 'বসো, তোমাদের সবাইকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলি।'

রুপার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বা ড্রিংক ইত্যাদি প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি মোটামুটি খুনের ঘটনাটা বললাম, এবং এটাও ওদের বুঝিয়ে দিলাম, যেহেতু গতকাল আমি সেখানে গেছলাম, সেই হেতু পুলিসকে অনুসন্ধান করে দেখতে হচ্ছে, কে খুন করতে পারে। পুলিস তার নিজের কর্তব্যই করছে, এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ, আমি তো আর সত্যি সত্যি খুন করি নি। তথাপি আমার পুত্র কন্যার আরো অনেক কৌতূহলিত জিজ্ঞাসার জবাব আমাকে দিতে হলো। তারপরে ওরা শুতে গেল। রমা আমার সামনে সরে এসে আমার গলা থেকে টাইটা পুরোপুরি খুলে নিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, আমার আঙুলের কথা। বললাম, 'ডাক্তার দেখেছে, বলেছে কোনো-রকমে চেপটে গিয়েছিল। ওষুধও এনেছি, একবার মালিশও করেছি। ওষুধটা গাড়িতে ফেলে এসেছি, নাথুকে নিয়ে আসতে বলো।'

রমা নাথুকে ডেকে গাড়ি থেকে ওষুধ আনতে বলে চাবির কথা জিজ্ঞেস করলো। বললাম, পাওয়া গেছে, ওটা রুপার ঘরেই পড়েছিল।'

তারপরে ওকে বললাম, কী ভাবে রুপাকে হত্যা করা হয়েছে, এবং মৃতদেহের বর্ণনাও দিলাম। রমা শুনে শিউরে উঠলো। বললো, 'পুলিস কি তোমাকে সন্দেহ করেছে নাকি, যে তুমি মার্ডার করেছ ?'

আমি হেসে বললাম, 'পুলিস সবাইকে সন্দেহ করে, সেটাই তাদের কাজ। রুপার টেম্পরারি সারভেণ্টকে ওরা অ্যারেস্ট করেছে। তার নাকি ভোরবেলার আগে ঘুমই ভাঙে নি। রুপার শোবার ঘরের স্কাইলাইটের দেওয়ালে পায়ের ছাপের মতো দাগ দেখা গেছে। আমি তো মনেই করতে পারছি না, কখন ওর ঘর থেকে চলে এসেছি। কেননা, তারপরেও আমি পৃথ্বীশের বাড়ি গেছলাম, চিকেন রোল কিনেছি, কিছুই আমার মনে নেই! আমার ব্ল্যাকআউটের ব্যাপারটা পুলিসকে আমি জানিয়েছি, ওদের ডাক্তারই বলেছে এরকম ব্ল্যাকআউট হওয়া সম্ভব। তবে আমি একটা কথা মনে করতে পারছি না, কেন আমি ললিতাকে শুধু এ কথা বলেছিলাম, আমাকে মাফ করে দিও।'

রমা বললো, 'ড্রিংক করে এসে ওরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তুমি অনেক বলো, যার কোনো ভিত্তি নেই। পরে দেখেছি, সেসব কথা তোমার নিজেরো মনে নেই। যাই হোক বাপু, পুলিসী ব্যাপারকেই আমার সব থেকে বেশি ভয় হয়।'

বললাম, 'জড়িয়ে যখন গেছি, তখন কিছু ঝামেলা হয়তো পোয়াতেই হবে। তবে

boiRboi.net

আসলে তো এরা আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে, সেটা আমার ভাগ্য।'

বুঝতে পারলাম, রমার মনের মধ্যে, একটা অস্বস্তি বিঁধে রইলো। আমি বাইরের পোশাক ছেড়ে, বাথরুমে গেলাম। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ব্যথাটা এখনো বেশ রয়েছে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতেই, আমার নিজেকে হঠাৎ ভীষণ একা এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হলো। আর নিহত রূপার মূর্তি আবার আমার চোখে ভেসে উঠতেই, আমি দরজা খুলে, ঘরের মধ্যে চলে এলাম। কী কারণে রমা ঘরে এসেছিল, অবাক হয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?'

আমি স্বাভাবিকভাবে বলবার চেষ্টা করলাম, 'কিছু না, পায়জামা নিতে ভুলে গেছি।'

রমার চোখে মুখে বিস্ময় আরো নিবিড় হলো, এবং দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। বললো, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন কোনো কারণে ভয় পেয়েছ। তুমি বাড়ি আসার আগেই তো, আমি পায়জামা বাথরুমে রেখে দিয়েছি।'

আমি যে কিছু একটা গোপন করতে চাইছি, রমা বোধহয় সেটা বুঝতে পারছে। সেই রকম শিরদাঁড়ার কাঁপুনি বা, শিরদাঁড়ার নিচের প্রান্তে, গ্রন্থিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ হেনে যাওয়ার ঘটনা হয় তো ঘটতে পারতো, যেটা আমি রমাকে বলতে চাই না। অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই, বাথরুমে উঁকি দিয়ে বললাম, 'ওহ, সত্যিই, পায়জামা তো রয়েছে, আমি দেখিই নি। কিন্তু ভয় পাবো কেন? ভয় পাবার কিছুই ঘটে নি। ঠিক আছে, আমি হাতে মুখে জল দিয়ে নিচ্ছি।'

বলে, বাথরুমের দরজাটা বন্ধ না করেই, বেসিনের ট্যাপ খুলে, দু'হাতে জল নিয়ে মাথায় মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম। দরজাটা আমি ইচ্ছা করেই খুলে রাখলাম, কিন্তু রমা তার জন্য অবাক আরো বেশি হলো, এবং সেই সঙ্গে চিন্তিতও। ও সামনে থেকে সরে গেল। আমি হাত মুখ মুছে, পায়জামা পরে, বেরিয়ে এলাম। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে, মাথা আঁচড়ে, খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, রমা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বেশি রাত্রি হয় নি, আজ ও খায় নি। অন্যান্য দিন খেয়ে নেয়। আমাকে খেতে দিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা কথা বললো। বলা ঠিক না, জিজ্ঞেস করলো, এবং সব কটি কথাই রূপার সম্পর্কে। আমি মোটামুটিভাবে রূপার যে চিত্র ওকে দিলাম, তা হলো, একটি স্বেচ্ছাচারিণী ডিভোর্সি মেয়ে, যার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। আমি আসলে রূপার স্বামীর বন্ধু ছিলাম। কিন্তু সে এখন আর কলকাতায় আসে না। রূপা আসে, আর এলে আমাকে খবর দেয়, তাই দেখা সাক্ষাৎ করতে যাই। আরো বললাম, রূপা অত্যন্ত সুরাসক্ত মেয়ে, এবং আরো অনেক ব্যাপারেই তার আসক্তি আছে। গতকাল তার ওখানে আমি প্রচুর পান করেছি, যে কারণে কিছুই প্রায় মনে করতে পারছি না।

আমার খাওয়া শেষ করে ওঠবার মুহূর্তে রমা বললো, 'একদিন তুমি রূপা নাম করে, ইংরেজিতে কিছু বলছিলে, প্রায় মাস ছয়েক আগে। যেন কোনো কবিতা আবৃত্তি করছিলে, তার মধ্যে কয়েকবার রূপার নাম নিয়েছিলে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কোনোদিন বলো নি তো?'

boiRboi.net

রমা বললো, 'বলে লাভ কী ? তুমি কি মনে করতে পারতে ? ও রকম কতো নাম, কতো সময় তুমি বলে থাকো, আমারই সব মনে থাকে না।'

আমি রমার দিকে তাকিয়েছিলাম। রমা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, টেবলে নিজের খাবার নিয়ে বসলো। আমি বেসিনের কাছে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপরে একটু হেসে বললাম, 'পাগলামি।'

রমা আমার দিকে না তাকিয়ে খাবার খেতে লাগলো। আমি শোবার ঘরে গেলাম। সিগারেট ধরিয়ে, প্রথমেই আমার দৃষ্টি পড়লো, মাঝখানের দরজার দিকে। পাশের ঘরেই, আমার ছেলেমেয়েরা শোয়। পাশের ঘরে যাবার দরজাটা ভেজানো আছে। রমা মেয়ের সঙ্গে এক খাটে শোয়। এ'ঘরে আমি একলা শুই। আমি আমার খাটের বিছানার দিকে দেখলাম। বেডকভার গোটানো। ক্রীম রঙের এম্‌ব্রয়ডারি করা চাদর পাতা। রমা বিছানা তৈরি করেই রাখে। কোনো কোনো দিন আমি এসেই শুয়ে পড়ি। কখন কী অবস্থায় আসি, ঠিক থাকে না বলে, ও আগে থেকেই বিছানা প্রস্তুত করে রাখে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। খাবার ঘরের পাশে, বসবার ঘরে টেলিফোন। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম। রিসিভার তুলে বললাম, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে ললিতার স্বর শোনা গেল, 'কী হলো, ফিরে গিয়ে টেলিফোন করবে বলেছিলে যে ? কখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

বললাম, 'দুঃখিত ! আসলে আমি ঠিক সময়ে, ঠিকভাবেই চলে এসেছি বলে আর টেলিফোন করি নি।'

ললিতা বললো, 'কিন্তু সে কথাটাই জানবার ছিল। যাই হোক, লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে পড়ো। এখন থেকে রাত্রি করে বাড়ি ফেরাটা ছাড়ো।'

বললাম, 'আজ থেকেই তো ছেড়ে দিলাম।'

ললিতার একটু হাসি, এবং তারপরে কথা শোনা গেল, 'আজ থেকেই ? দেখা যাক। আশাকরি কাল দেখা হবে ?'

'আশা করছি।'

'ছাড়লাম।'

'গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে খাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রমা নেই। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ও ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে, খোঁপা খুলছে। মুখ নড়ছে, মশলা চিবোচ্ছে। খোঁপা খুলে মাথায় চিরুনি টানতে লাগলো। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও আয়নায় আমার দিকে তাকালো। আমি নিচু হয়ে, ওর মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে, ঠোঁটে চুমো খেলাম। ও ভেজা ঠোঁট দুটো নিয়ে, আয়নায় আমার দিকে তাকিয়ে, একভাবেই চিরুনি টানতে লাগলো।

আমি বললাম, 'আজ রাত্রে তুমি আমার কাছে শোবে।'

রমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সারা রাত ?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অসুবিধা আছে ?'

রমা এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। ওর চোখে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা,

boiRboi.net

কোঁচকানো। বললো, 'কী যে বলো। তুমি কি সারারাত আমার সঙ্গে শোও নাকি? তা ছাড়া, মেয়ে আমার সঙ্গে শোয়। ঘুম ভেঙে গেলে, আমাকে খুঁজবে। তুমি ঠাট্টা করছো বুঝি?'

কথাটা রমার কাছে ঠাট্টা মনে হওয়া স্বাভাবিক। ছেলেমেয়ে হবার আগে, যদি বা কিছুকাল দুজনে এক বিছানায় শুয়ে থাকি, হবার পরে, সাময়িক সহবাস ছাড়া, সারারাত্র কখনো একসঙ্গে থাকি নি। নানান কারণেই তা সম্ভব ছিল না। রমা কখনোই আয়া বা ধাত্রীদের হাতে ছেলেমেয়ে ছেড়ে থাকতে রাজী ছিল না। ছেলে-মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার প্রশ্নও ছিল। যদিচ, ছেলেমেয়েদের একটা বয়স অবধি, তাদের সঙ্গে, তাদের মাকে নিয়ে, বাবার এক শয্যায় শোয়াটাকে আমি বিশেষ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি, যা পশ্চিমের চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে মেলে না। অঙ্কুরেই ছেলেমেয়েদের বাবা মায়ের যুগল শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুভ ব্যাপার না। বরং তারা বাবা মায়ের সঙ্গে নিজেরাও শয্যার অংশীদার, উভয়ের স্নেহ ভোগ এবং সেই কারণে বাবা মায়ের সম্পর্ক বিষয়ে নিজেদের আস্থা ও নিশ্চিন্তবোধকে বাড়িয়ে তোলা, তাদের মানসিক ক্ষেত্রের পক্ষে শুভ। বাবা মা নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের সামনে তাদের যৌন আচরণ করবে না। আবার এমন আচরণ করা উচিত না, যা বিপজ্জনক গোপনীয় বলে চিহ্নিত করা যায়। বাবা মায়ের মধ্যে গভীর ভাব এবং বন্ধুত্ব আছে, এবং তাদের দ্বারা তারা উৎপাদিত, অস্পষ্টভাবে হলেও, তা বুঝতে দেওয়া উচিত। বাবা মায়ের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে, অহেতুক তাদের বঞ্চিত করা উচিত না, বাবা মায়ের নিবিড় বন্ধুত্বের ভাগ তাদেরও প্রাপ্য, এবং তাতে সুফলই পাবার কথা। যে ছেলেমেয়েরা জীবনে কখনো বাবা মায়ের দাম্পত্য সংস্পর্শে থাকে নি, তাদের মনে যৌন প্রশ্ন বা অনুভূতি, নানা কারণেই অনেক আগে জেগে যেতে পারে। তাকে ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রশ্নই নেই।

কথাগুলো আজ না মনে হলেই পারতো। হঠাৎ এই সব চিন্তা, অনেকটা উপদেশা-বলীর মতো আমার মনে জেগে উঠলো, যা আমি রমাকে শোনাতে পারি না। আমার সঙ্গে এক শয্যায় থাকতে, রমা কখনো আপত্তি করে নি। আমরাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিলাম, আমাদের আলাদা ঘরে আলাদা বিছানায় শোয়া ভালো। কলকাতায় নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরিতে, অনেক বড় লোক বাঙালীরা সাহেবদের মতোই, জন্মের পরক্ষণে, সন্তানদের ধাত্রীর হাতে সমর্পণ করতো, একটু বড় হলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে। দিনান্তে একবার মায়ের আদর কপালে জুটলেও, বাবা মায়ের দৈনন্দিন জীবন যাপনে, কোথাও তাদের ছায়াপাত হতো না, জানতেও পারতো না সেই জীবনচিত্রের স্বরূপ, যদিচ, সেইভাবেই পালিত সন্তানদের মধ্যে, পরবর্তীকালে কেউ কেউ প্রতিভাধর হয়েছেন, কিন্তু সেটাই সঠিক ফর্মুলা না।

আমি টেবিলের সামনে সরে গিয়ে,, আর একটা সিগারেট ধরালাম। জানি, রমার মনে বিশেষ কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা, এবং ও চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে, আমার দিকে দেখছে। কিন্তু ও কোন দুশ্চিন্তা করতে পারে ভেবে, আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম, বললাম, 'এমনি হঠাৎ মনে হলো, আজ তোমাকে নিয়ে শুই।'

রমা চুল আঁচড়ানো শেষ করে, আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর চুল আগের

boiRboi.net

তুলনায় কিছুটা পাতলা হলেও, দু'পাশে ছড়ানো খোলা চুলে, এখনো সাবেক দিনের ছবিটা যেন ভেসে ওঠে। জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি ?'

আমি ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে, কাছে টেনে বললাম, 'সত্যি। কিন্তু তা বলে মেয়েকে একলা রেখে, সত্যি সত্যি তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে না।'

রমা সরলভাবেই জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি একলা শুতে অস্বস্তি হচ্ছে ?'

প্রকৃত সত্যি শুনে, আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললাম, 'না না, অস্বস্তি আবার কিসের। মনটা ভালো নেই, এই যা।'

এবং আমার কোনো অস্বস্তি নেই, এটা বোঝাবার জন্যই, আমি ওকে বুকের কাছে চেপে ধরে, ওর গালে গাল ঠেকিয়ে বললাম, 'সারারাত না হোক, এখন আমি তোমাকে ছাড়বো না।'

আমি জানি না, রমা কী বুঝলো। ও দু' হাত আমার ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে বললো, 'তোমার ঘুম না আসা পর্যন্ত, আমি তোমার কাছে থাকবো।'

আমি ওর ঠোঁট দুটি আগ্রাসী চুম্বনে নিজের মধ্যে নিলাম, তারপরে ও নিজেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে, দংশিত চুম্বনে আদর জানিয়ে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'তুমি শোও, আমি আসছি।'

নিজেকে আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগছে, যেন এই আমি ঠিক আমি না। আমি রমার জন্য যেন খুবই ব্যাকুলতা বোধ করছি, কারণ নিঃসঙ্গতা আমি সহ্য করতে পারছি না, এবং জেগে থাকা অবস্থায়, অন্ধকারে থাকা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। রমা ঘরে এসে, আলো নিভিয়ে দিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম, অন্ধকার। মনে হলো, আমি যেন এইমাত্র পাশ ফিরে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এবং হঠাৎ-ই তন্দ্রা ভেঙে গেল। ঘুমের কোনো অনুভূতি নেই। আমি উঠে বসলাম। কোনো জড়তা নেই বলেই, আমি তাড়াতাড়ি উঠে, খাট থেকে নেমে আলো জ্বাললাম। দেখলাম মাঝখানের দরজাটা খোলা, ভিতরে কিছু দেখা যায় না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি, আমি ছাড়াও আমার মধ্যে যেন কেউ অবস্থান করছে, আর সে আমাকে কোথাও টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। অথচ সেরকম কোনো ভুতুড়ে ব্যাপার আমার পক্ষে সম্ভব না যে, আমি হঠাৎ কোথাও চলতে আরম্ভ করবো। মনে হচ্ছে, আমি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, যেখান থেকে এক পা বাড়ালেই, অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো। এসব কিসের লক্ষণ আমি জানি না। হঠাৎ মনে হলো, আমার দাঁতে দাঁত চেপে বসছে, হাত মুঠি পাকিয়ে উঠছে, এবং শিরদাঁড়ার কাছে একটা বিদ্যুতের ঝাপটা। আমি ডেকে উঠলাম, 'রমা, রমা।'

এই ডাক আমার কানে যেতেই, আমি নিজেই চমকে উঠলাম। রমা ঘুম চোখে মাঝখানের দরজায় এসে দাঁড়ালো, বললো, 'কী হয়েছে ?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন ক'টা বেজেছে ?'

রমা এগিয়ে আসতে আসতে বললো, 'দেখছি। ভোর হয়ে গেছে।'

রমা ড্রয়ার খুলে, আমার ঘড়িটা দেখে বললো, 'সাড়ে পাঁচটা। এত তাড়াতাড়ি তোমার ঘুম ভাঙলো ? স্বপ্ন দেখেছিলে নাকি ?'

BDeBoi.net

বললাম, 'না তো।'

আমি টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতেই, রমা তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে বললো, 'থাক, আর সিগারেট ধরাতে হবে না। চলো, আর একটু শোবে।'

বলে ও আলো নিভিয়ে দিয়ে, আমার হাত ধরে খাটের কাছে টেনে নিয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই আমার মনে পড়লো, গতরাত্রে, আমরা দুজনেই, পরস্পরকে উপভোগ করেছি, এবং রমাকে জড়িয়ে ধরেই ঘুমিয়ে ছিলাম। এবং এখনো আমরা পরস্পরকে একইভাবে আলিঙ্গন করে, আচরণে প্রবৃত্ত হলাম। তারপরে আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।

সকালবেলা স্বাভাবিক নিয়মে স্নান প্রাতঃরাশ সেরে অফিসে বেরোলাম। রমা একবার বললো, 'তোমার মুখে কেমন একটা ছাপ পড়েছে।'

আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে, তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না। আঙুলের ব্যথা আর ফোলাটা একটু কম মনে হলো।

*

দুপুরের লাঞ্চ আওয়ারের মুখেই সেই ডি ডি ভদ্রলোক এলেন। আমি ওঁকে অভ্যর্থনা করলাম। উনি বসে বললেন, 'মিসেস চৌধুরীর মার্ডার খুবই মিস্টিরিয়াস। গেলাসে বোতলে টেবিলে বিছানায় সর্বত্রই আপনাদের দু'জনের হাত পায়ের ছাপ। চাকরের হাত পায়ের ছাপও পাওয়া যাচ্ছে। তবে সেটা ভাইটাল ব্যাপার কিছু না—মানে মার্ডারের সঙ্গে তেমন কোনো যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে এই নয় কি যে, সে মার্ডার করতে পারে না। তবে স্কাইলাইটের ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারণ বাইরের দেওয়ালে কোনো ছাপটাপ দেখা যাচ্ছে না। খুনী একটা ধাপ্পা দেবার জন্যও, স্কাইলাইটের কাছে দাগ লাগাতে পারে।'

আমি খানিকটা অসহায় বিস্ময়ে বললাম, 'তাই নাকি? আশ্চর্য! যতোই শুনছি, আমারো কেবল মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না, এ খুনের তাৎপর্য কী, মোটিভই বা কী, কে-ই বা এমন কাজ করতে পারে।'

ডি ডি হেসে বললেন, 'তা হলে তো কালপ্রিটকে ধরা সহজ হতো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেসিক্যালি, এ মার্ডারের কোনো মোটিভ আমরা খুঁজে পাই নি।'

বলে, ভদ্রলোক আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, পরশু রাত্রে কি আপনার ডান হাতের বুড়ো আঙুলে লেগেছিল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই দেখুন না এখনো ফুলে আছে। অথচ কিছুই মনে করতে পারছি না, কী ভাবে লেগেছিল।'

ডি ডি হেসে বললেন, 'আমি জানি কী ভাবে লেগেছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি? কী ভাবে বলুন তো?'

'আপনি মিসেস চৌধুরীর ডাইনিং স্পেসে, ফ্রিজ থেকে সোডার বোতল আনতে গিয়ে নিজের আঙুলসুদ্ধ দরজাটা চেপে দিয়েছিলেন, অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গেই খুলে নেন, এবং চুষতে আরম্ভ করেন।'

boiRboi.net

'কী করে আপনি জানলেন ?'

'মিসেস চৌধুরীর সারভেন্ট ব্যাপারটা দেখেছে। ডাইনিং হল অন্ধকার ছিল, আপনি ভেবেছিলেন, কেউ আপনাকে দেখছে না। কারণ আপনি তখন—আই মীন ফুল ন্যাকেড ছিলেন।'

বলে ডি ডি মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। আমি লজ্জায় কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলাম না। এর পরে আর বুঝতে বাকী থাকে না, আমি আর রূপা কতোখানি মাতামাতি করেছিলাম। তার মানে আমি আর রূপা, দুজনেই বোধহয়, নগ্ন ছিলাম। এখন সুস্থ অবস্থায় ভাবতেই পারছি না, চাকরটা আর কী দেখেছিল। সে হয়তো আমার আর রূপার সব আচরণই দেখেছে। আমার সংকুচিত ভাবনার মধ্যেই, ডি ডি বলে উঠলেন, 'তারপরেই অবিশ্যি, চাকরটি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। কেননা, সে ধরে নিয়েছিল, আপনি কখন মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নেবেন, তার কোনো ঠিক নেই। আপনি বিদায় না নিলে, তার ছুটির কোনো প্রশ্ন নেই। তার বক্তব্য হচ্ছে, সে ভেবেছিল, মেমসাহেব তাকে ডেকে তুলে, ছুটি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবেন। তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙে ভোরের দিকে। যদি ওর কথা সত্যি হয়—তারপরে সে মিসেস চৌধুরীকে সেই অবস্থায় দেখতে পায়।'

আমি হেসে বললাম, 'তা হলে খুনের দায়টা দেখছি আমার ওপরেই এসে পড়ে।'

ডি ডি হেসে উঠলেন, বললেন, 'এখনো তার কোনো ডেফিনিট প্রমাণ আমাদের হাতে আসে নি। এলে তার ব্যবস্থা করবো। তবে আপাতত আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি, আপনার পোশাকে কোথাও রক্তের দাগ পাওয়া যায় নি। আপনার ধুয়ে ফেলা গেঞ্জি জাঙিয়াও টেস্ট করা হয়েছে। অনেক সময় ধুয়ে ফেলার পরেও কিছু চিহ্ন থেকে যায়। কিছুই পাওয়া যায় নি! ময়না তদন্তে জানা গেছে, মিসেস চৌধুরীকে কেউ গায়ের জামা ধরে টেনে ছিঁড়ে খামচালেও জোর করে তাঁকে কেউ রেপ্ করে নি। তিনি যে স্ব-ইচ্ছায় সেক্স এনজয় করেছেন বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় তাই জানা গেছে, তাতে জামা ছেঁড়া বা আঁচড়ানোর সঙ্গে ব্যাপারটা মেলানো যাচ্ছে না। হতে পারে, কেউ চেষ্টা করেছিল, আপনি চলে যাবার পরে, পারে নি বলেই ফর্ক গলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাথরুমের বেসিনে দু-এক ফোঁটা রক্ত দেখা গেছে, সেটা মিসেস চৌধুরীরই রক্ত। পাওয়া যাচ্ছে না কেবল ফর্কটার সন্ধান। আপনি যদি আপনার মেমারি একটু রিকালেক্ট করতে পারতেন, তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেতো।'

বললাম, 'আপনাকে কী বলবো, অল্‌মোস্ট আয়াম সাফারিং টেরিবলি, শুধু মনে রাখতে পারার জন্য। কিন্তু আমি জানি গভীর সমুদ্রে একটি কয়েন ডুবে গেলে তার সন্ধান পাওয়া যায় না, এও সেইরকম। আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। অথচ তার জন্য একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করছি।'

ডি ডি বললেন, 'আই ফীল ইট মিঃ মিত্র, য়ু ওআ্যার ভেরি ফণ্ড অব্ হার। আমরা আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোতেও জিজ্ঞেস করেছি, মিসেস চৌধুরী কলকাতায় এলেই যে আপনি ওঁর কাছে যেতেন, এটা অনেকেই জানে। তবে আরো দু-একজনকে কখনো-সখনো দেখা গেছে, তাদের কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারছে না। আপনি কি জানেন, ওঁর কাছে আর কে আসতো ?'

boiRboi.net

নি ! তবে, শী ওয়াজ ভোলাপচুয়াস্ টাইপ। আদার বয়ফ্রেন্ড থাকাটা আশ্চর্যের না।'

আমি বললাম, 'এলেও আমাকে জানিয়ে আসতো না বা রূপাও আমাকে কখনো বলে

ডি ডি বললেন, 'আমরা ওঁর বাবা আর পিসীমার খোঁজ পেয়েছি। দেখলাম, ওঁরা মিসেস চৌধুরীর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। ডিভোর্সের ব্যাপারে ওঁরা নিজেদের মেয়েকেই দোষী ভাবেন। সেইজন্যই দেখা সাক্ষাৎ হতো না।'

আমি বললাম, 'এরকম অনুমান আমারো ছিল। ও কলকাতায় এলে, কখনোই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতো না, অথচ আমি জানতাম, ওর বাবা কলকাতায় রয়েছেন।'

ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মিঃ মিত্র, আপনি কি মিসেস চৌধুরীর স্বামীর কথা কিছু বলতে পারেন ? হিজ হোয়ারাবাউটস্—কোথায় আছেন, কী করেন ?'

আমি বললাম, 'না।'

বলেই, একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কেন না, কথাটা একটু বিশদভাবে বলা দরকার। আমি আমার চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বললাম, 'আপনাকে আমি পরিষ্কার করেই বলি। রূপার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বন্ধুপত্নী হিসাবেই। ওর স্বামী আমার বন্ধু ছিল, নাম হারীন চৌধুরী। ওর চাকরিটা ছিল একটা ফরেন ফার্মে, কন্ট্রাক্ট বেসিসে। প্রচুর টাকা বেতন পেতো। রূপা তখন এরকম ছিল না—মানে এরকম ফাস্ট লাইফ ছিল না, ভোলাপচুয়াসের কোনো প্রশ্নই ছিল না। শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে, মিষ্টি স্বভাব। মিষ্টি স্বভাবটা বরাবরই ছিল, কিন্তু ওর শেষের দিকের জীবনের জন্য, হারীনই দায়ী। হারীনই ওকে ড্রিংকে আসক্ত করে, ক্লাবে, বারে, নানান জায়গায় নিয়ে যেতো, বাড়িতেও প্রায়ই পার্টি লেগে থাকতো। তারপরে হারীন নিজেই পস্তাতে আরম্ভ করেছিল, ফলে দু'জনের মধ্যে ক্ল্যাশ। দুজনেই সমান এগোয়িস্ট, কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী না। রূপাই প্রথমে বম্বে চলে গেল একটা চাকরি নিয়ে। হারীন ডিভোর্স ফাইল করলো। রূপা কনটেসট্ করলো না, কারণ খোরপোষের দাবি ওর ছিল না। একতরফা ডিক্রিতে, অনায়াসেই ডিভোর্স হয়ে গেল। কেবল একটা ব্যাপারে রূপা জেদ ধরেছিল, ছেলেকে তার চাই। যা ভেবেই হোক, হারীন রাজী হয়েছিল। তারপরে হারীন কলকাতা ছেড়ে, প্রথমে যায় দিল্লী। সেখান থেকে, অন্য একটা ফরেন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে হায়দ্রাবাদ। সে আবার বিয়ে করেছে, বৌ নিয়ে কলকাতায় এসেছে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নি। বলতে গেলে, সে তার কলকাতার পুরনো দিনের বন্ধু বান্ধব, সবাইকেই ত্যাগ করেছে। তার কারণও আছে।'

আমি থামলাম। ডি ডি গম্ভীর মনোনিবেশের সঙ্গে, আমার কথা শুনছেন। কিছু না বলে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জানি না, ডি ডিকে এসব কথা বলা আমার উচিত হচ্ছে কী না, যদিচ আমার দিক থেকে গোপনীয়তার কিছুই নেই। অস্বীকার করবো না, রূপাকে প্রথম দেখা থেকেই, আমার মন যথেষ্ট আর্দ্র ছিল। রূপা তা জানতো, কিন্তু রূপা দয়া না করলে কারোরই কিছু পাবার ছিল না। রূপা হয় তো আমার মনের কথা জানতো, তথাপি প্রেম নিবেদনের কোনো অবকাশই তখন পাই নি। ঈর্ষা কাতরতায় যে ভুগি নি, তা বলা চলে না। বললাম, 'হারীনের বন্ধুরা অনেকেই রূপাকে নিয়ে মেতেছিল, রূপাকে নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক কম্পিটিশনও ছিল।'

boiRboi.net

ডি ডি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও কি তাদের মধ্যে একজন কম্পিটিটর ?'

ডি ডি-এর ঠোঁটের কোণে হাসি, দৃষ্টি আমার চোখের ওপর। বললাম, 'তা একরকম বলতে পারেন, আমি রূপার সম্পর্কে খুবই দুর্বল ছিলাম।'

ডি ডি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কম্পিটিশন নিশ্চয় ইদানীং কালে আরো বেড়েছিল ; বিশেষত উনি যখন আবার ডিভোর্সি ?'

আমি একটু থমকে গেলাম, তারপরে বললাম, 'না, ইদানীং কম্পিটিশনের কোনো ব্যাপারই ছিল না। রূপা কলকাতায় থাকতো না, বছরে দু'তিনবার কয়েকদিনের জন্য আসতো। ও হঠাৎ কখন কলকাতায় আসতো না আসতো, ও নিজে থেকে কারোকে না জানালে, জানবার উপায় ছিল না। যে বম্বেতে থাকে, তাকে নিয়ে কলকাতায় কম্পিটিশন চলতে পারে না। যে কারণে আপনাকে আমি বলেছি, তার আর কোনো বয়ফ্রেন্ড কলকাতায় থাকলেও, বা দেখা সাক্ষাৎ করলেও, আমার তা জানা নেই। আমাকে ও সে সব বলতো না। তবে থাকাটা কিছু অসম্ভব না।'

ডি ডি একটু চুপ করে রইলেন, ভদ্রলোককে চিন্তিত আর গম্ভীর মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আগের দিনের, দু' চারজন বন্ধুর নাম ধাম বলতে পারেন ?'

'পারি।'

আমি কয়েকজনের নাম ঠিকানা বললাম। ডি ডি একটি নোটবুকে তা টুকে নিয়ে বললেন, 'যে ফ্ল্যাটটা উনি কিনেছেন, এটা কতোদিন আগে কিনেছেন, আপনি জানেন ?'

বললাম, 'জানি। ফ্ল্যাটের ব্যাপারে, ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম। ধরুন প্রায় বছর চারেক আগে ফ্ল্যাটটা কিনেছিল।'

ডি ডি আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। তা হলে বলা যায়, ইদানীং-কালে, আপনার সঙ্গেই মিসেস চৌধুরীর বেশি অন্তরঙ্গতা ছিল।'

আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'তা বলতে পারেন।'

ডি ডি বললেন, 'সেটা অনুমান করাই যায়। তারপরে বলুন, আপনি গোড়া থেকে কী বলতে চাইছিলেন।'

আমি বললাম, 'হারীনের কথা বলতে চাইছিলাম। এখন যে সে কোথায় আছে, কিছুই জানি না। হয় তো রূপা খবর রাখতো। কিন্তু সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। আমিও জিজ্ঞেস করার দরকার বোধ করতাম না! রূপারও দরকার করতো না। হারীনকে আমরা ভুলেই গেছি। সেইজন্যই বলছিলাম, তার হোয়ারাবাউটস্ কিছুই বলতে পারবো না।'

ডি ডি ঘাড় ঝাঁকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস চৌধুরীর ছেলের বয়স কতো হবে ?'

'বছর এগারো বারো হবে।'

'তাকে এ খবর জানাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মিসেস চৌধুরীর বম্বের অফিসের ঠিকানা আমরা পেয়েছি, যোগাযোগও করা হয়েছে। বম্বের পুলিসের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করেছি। মিসেস চৌধুরীর পরিচিত লোক, যাদের সঙ্গে উনি ওখানে মেলামেশা করতেন, সব খবরই আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি। দেখা যাক কী হয়।'

আমি অবিশ্যি এতোখানি ভাবতে পারি না, বম্বে থেকে কেউ এসে, রূপাকে খুন

boiRboi.net

করে গিয়েছে। কিন্তু যদি সেরকম মোটিভ কারোর থেকে থাকে, একেবারে অসম্ভব কিছু না। ওঁৎ পেতে থেকে, সুযোগ বুঝে, হয় তো কাজ মিটিয়ে সরে পড়েছে। এরকম হতে পারে, আমি হয় তো দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে এসেছিলাম। রূপা ইনটক্সিকেটেড অবস্থায়, অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছিল। চাকরটা ঘুমোচ্ছিল, রান্নাঘরে। সেই অবকাশে আততায়ী ঢুকে পড়েছিল। এরকম ক্ষেত্রে দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে ফ্ল্যাটের গেট অতিক্রম করা সম্ভব না। কিন্তু কে দেখছে, বা সন্দেহ করছে? এতোবড় ম্যানসন। এতো লোকের যাতায়াত। দারোয়ানের পক্ষে কারোকে সন্দেহ করা কঠিন।

ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন মিঃ মিত্র?'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আপনার কথাই ভাবছি—ভাবছি বন্ধুবের কারোর পক্ষে একাজ করা সম্ভব কী না?'

'কি মনে হয় আপনার?'

'মোটিভ থাকলে অসম্ভব কিছু না।'

'ঠিক বলেছেন, আমাদেরও তাই সন্দেহ। আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। পরশু রাত্রে মিসেস চৌধুরীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে, আপনি মিসেস চক্রবর্তীর বাড়ি গেছলেন। তাঁকে আপনি বলেছিলেন, ক্ষমা করে দিও। কথাটা কেন বলেছিলেন, মনে আছে?'

আমি মাথা নেড়ে, নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'না। আমি যে ললিতাদের বাড়ি গেছলাম তাও আমার মনে নেই।'

ডি ডি চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, 'সেটাই হয়েছে মুশকিল। আপনার মেমারি যদি—।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এটা মেমারির ব্যাপারই না, টোটাল ব্ল্যাক আউট। এখান থেকে কিছুই রিকালেকট করা সম্ভব না। পারলে আমিই শান্তি পেতাম।'

'তা ঠিক, আমি বুঝি, দ্যাট য়ু আর হেলপ্‌লেস্‌। স্যো উই আর ফিলিং হেলপ্‌লেস্‌।'

এ সময়েই আমার বেয়ারা ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'আভি লাঞ্চ দেগা সাব?'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আভি নেই।'

ডি ডি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আর বসবো না, চলি। আপনি লাঞ্চ সেরে নিন।'

আমি বললাম, 'আপনি বসুন না, আরো যদি কিছু জানবার থাকে, আমি বলছি।'

ডি ডি বললেন, 'দরকার হলে, আমি অনেকবার আপনার কাছে আসতে পারবো। হয়তো আসতেও হবে। তার জন্য লাঞ্চ বন্ধ করে, আমার কথার জবাব দিতে হবে না। আপনি বসুন, আমি চলি। আপনি তো কলকাতার বাইরে এখন যাচ্ছেন না?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না, সেরকম কোনো দরকার এখন নেই।'

'ও কে, স্যো লঙ!' ডি ডি একটা হাত কপালের কাছে তুলে, বেরিয়ে গেলেন। আমি বসলাম।

boiRboi.net

★

আমি রূপার খুনের চিন্তাতেই ডুবে ছিলাম।

বেয়ারা সাদা বড় ন্যাপকিনে ট্রে ঢাকা দিয়ে আমার খাবার নিয়ে এল। ট্রে সামনে দিয়ে, জলের ফ্লাস্‌কটা সামনে রেখে চলে গেল। আমি ট্রের ঢাকনাটা খুললাম। স্যুপ্‌, টোস্ট, বাটার, মীট সসেজ, তারপরে……আমার চোখ একটি মাত্র বস্তুর ওপরে স্থির নিবন্ধ হলো, ফর্ক। ঝকঝকে ফর্ক এখন আর খাবার মতো দেখাচ্ছে না, যেন একটা কঙ্কালের দংশনোদ্যত শাণিত দাঁতের মতো ঝকঝক করছে। তা এমনই ভয়ংকর আর ভয়াল মনে হলো, একটা উদ্যত ফণা বিষধর সাপের থেকেও সাংঘাতিক। আমার শিরদাঁড়ার নিম্নকেন্দ্রে যেন বিদ্যুৎ হেনে গেল আর সেই সাপের মতো অনুভূতিটা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমে আমার ঘাড়ের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের দিকে এগিয়ে চললো, এবং তখনই আমার সমস্ত শরীরে আক্ষেপ শুরু হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে কিছু একটা খামচে ধরার জন্য, আমি ট্রের খাবারের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, আমার মুখ গরম স্যুপের মধ্যে ডুবে গেল, এবং নিশ্বাস নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায়, মুখটা তুলে নিতে গিয়ে, ডিশটা উলটে গেল, তার গায়ে মুখটা ঘষতে লাগলাম। বেয়ারাকে চিৎকার করে ডাকতে চাইলাম, পারলাম না। আর কেবলই চেষ্টা করতে লাগলাম, নিজেকে ফিরে পাবার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে পেলামও, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ রিভলভিং চেয়ারসুদ্ধ ঘুরে বসলাম। ন্যাপকিন টেনে মুখ মুছতে মুছতে দম নেবার চেষ্টা করতে, পায়ের নিচে জুতো দিয়ে পুশবেল টিপলাম।

আমার পেছনে বেয়ারার গলা শুনতে পেলাম, 'হাঁ সাব।'

আমি মুখ না ফিরিয়েই বেয়ারাকে বললাম, 'সব কুছ্‌ লে যাও, পানীকা ফ্লাস্ক ছোড়কে।'

সে বোধহয় খুবই অবাক হলো। স্বাভাবিক, কারণ স্যুপের ডিশ উল্‌টে ট্রেতে পড়েছে, বাটার আর টোস্টের প্লেটেও ছলকে গিয়েছে। ছিটকে পড়েছে মিট আর সসেজের প্লেটেও। সে ট্রে নিয়ে চলে গেল। আমি উঠে আগে কোণের বেসিনের ওপরে একটা ছোট ঝোলানো আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম। আমার মুখের সমস্ত রক্ত যেন শুষে নিয়েছে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই, কপালে, নাকের পাশে কয়েকটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কালি পড়েছে চোখের কোলে। মাথার সামনের চুলে এখনো স্যুপের খানিকটা লেগে রয়েছে। বেয়ারা নিশ্চয়ই দেখেছে, এবং আরো বেশি অবাক হয়েছে।

বেসিনের ট্যাপের মুখ খুলে, জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললাম। মুখ মুছে ড্রয়ার থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নিলাম। একটু ভালো লাগলেও, মুখের চেহারা একটুও বদলালো না। ফ্লাস্ক থেকে অনেকটা জল পান করলাম। কিন্তু আমার খিদে রয়েছে, খেতে পারছি না। অসম্ভব ক্লান্তি লাগছে, বোধহয় একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হতো, অথচ ঘুম আসছে না। এলে ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারতাম, যদিচ, এ সবই আমার ক্ষেত্রে নতুন। কাজের সময়, আমার কখনোই এরকম হয় না। যা ঘটছে, তা নিশ্চিতরূপেই স্নায়ুর কোনো গোলযোগ। কী ঘটতে পারে? আমার এই চেম্বারে বা বাড়িতে যদি এরকম ঘটে, সেটা একরকম। কিন্তু বাইরে চলতে ফিরতে বা গাড়ি চালাতে যদি এরকম ঘটে? দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে

আমি অস্থিরতা বোধ করলাম। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না, আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান ডক্টর ব্যানার্জিকে টেলিফোন করলাম। হসপিটাল থেকে ফিরে, এ সময়ে তিনি বাড়িতে, বিশেষ জরুরি কোনো কেস থাকলে দেখেন। সন্ধ্যায় নিজের চেম্বারে বসেন। তাঁকে টেলিফোনে পেয়ে বললাম, 'আমি এখনই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, গুরুতর কিছু ঘটেছে নাকি ?'

বললাম, 'গুরুতরই বলা যায়।'

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো অ্যাকসিডেণ্ট ?'

বললাম, 'না। আমার নিজের শরীরের ব্যাপারে, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার।'

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন, 'সেটা এখনই করা দরকার ? ওবেলা হতে পারে না ? তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে পরামর্শ করা যেতো। শরীরে কোথাও কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ? সেই বুড়ো আঙুলের ব্যথা নাকি ?'

'না, কোনো যন্ত্রণা-টন্ত্রণা না, বুড়ো আঙুলের ব্যথাও না। বরং তার চেয়ে কিছু বেশি, স্নায়ুঘটিত গোলমাল মনে হচ্ছে।'

'টেলিফোনে বলা যায় ?'

আমি বুঝতে পারলাম, এ সময়টা ডাক্তারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক। সকাল থেকে হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি এসে, জরুরি কেস দেখার পরে, এখন খাওয়া আর বিশ্রামের সময়। মনে হলো, আমি একটু বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। লজ্জাও পেলাম, বললাম, 'বলতে একটু সময় লাগবে। ঠিক আছে, অফিস থেকে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে, আমি সোজা আপনার কাছে যাবো।'

ডক্টর ব্যানার্জি বোধহয় একটু বিচলিত বোধ করলেন, বললেন, 'আপনি যদি ইনস্ট্যাণ্ট বিপজ্জনক কিছু ঘটতে পারে মনে করেন, তা হলে চলে আসুন।'

আমি বললাম, 'না, তার দরকার নেই। আমি বিকালেই আপনার কাছে যাবো। আমার জন্য একটু বেশি সময় রাখবেন।'

ডক্টর ব্যানার্জি তথাপি একটু হেসে বললেন, 'একটু আর্লি নাইটে আপনাকে তো আবার বাড়িতে পাওয়া যাবে না। তা হলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে, বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতাম।'

'তার দরকার হবে না, আমি আপনার চেম্বারেই যাবো।'

'তাই আসুন তা হলে।'

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখতেই, আমার অধস্তন অফিসার, উদ্বিগ্ন মুখে দরজা ঠেলে ঢুকলো, জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি শরীর খারাপ করেছে নাকি ? সব খাবার ফিরিয়ে দিয়েছেন ?'

আমার নিজের ঘরে একলা বসে থাকার চেয়ে, সহকর্মী পার্থ রায়কে পেয়ে স্বস্তিবোধ করলাম। বললাম, 'বসুন। হ্যাঁ, শরীরটা ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। টেলিফোনে ডাক্তারকে সে কথা বলছিলাম।'

পার্থ রায় আমার দিকে কেমন একটা অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখছে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি মাথা ঘুরে গেছিলো ? পড়েটড়ে গিয়েছিলেন ?'

boiRboi.net

বুঝতে পারছি, কেন সে এ কথা জিজ্ঞেস করছে। বেয়ারার মুখে সে স্যুপের ডিশ উলটে পড়ে যাবার কথা শুনেছে, এবং হয়তো আরো শুনেছে, আমার চুলে স্যুপ লেগেছিল। কিন্তু প্রকৃত যা ঘটেছিল, তার থেকে মাথা ঘুরে যাওয়াটা অনেক সরল ব্যাখ্যা হয়। বললাম, 'হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হলো। যেন মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল, আর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, অবিশ্যি উইদ্‌ইন্‌ এ মোমেণ্ট আবার সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর আমি কিছুই বোধ করছি না।'

পার্থ রায়কে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দেখালো, বললো, 'আপনার প্রেশারটা ইদানীং দেখেছেন ?'

আমি জানি, এটাও একটা অনিবার্য প্রশ্ন, এবং অতিমাত্রায় সরল। আর এও জানি, আমার রক্তচাপের উচ্চনিম্নের ভারসাম্য ঠিকই আছে, সেখানে কোনো গোলযোগ নেই। তথাপি আমি একটু দ্বিধার সঙ্গে বললাম, 'যতদূর জানি প্রেশার ঠিকই আছে।'

পার্থ রায় ব্যস্তভাবে বলে উঠলো, 'না না মিঃ মিত্র, এটা কোনো কাজের কথা না। আপনি আজই প্রেশারটা চেকআপ করান। বুকে কোনোরকম ব্যথাট্যথা— ?'

আর একটা অনিবার্য সরল জিজ্ঞাসা। বললাম, 'না কোনো ব্যথা ফীল্‌ করি নি। সেদিকে ঠিকই আছে মনে হয়।'

পার্থ রায় বললো, 'পুলিসের লোকেরা তো মানুষের মন বোঝে না। হয় তো, সেই মার্ডারের ব্যাপারে আপনাকে অকারণ অনেকক্ষণ উত্ত্যক্ত করেছে, বাজে বাজে কথা জিজ্ঞেস করেছে, তাতেই আপনি অসুখ বোধ করেছেন।'

সম্ভবত পার্থ রায়ের আসল অভিযোগ বা আমার শরীর খারাপের কারণ, ডি ডি-র এতোক্ষণ থাকাকেই মনে করেছে। অনুমান করতে পারি, অফিসে এ বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনাও চলছে। পার্থ রায় সেইজন্যই হয় তো এসেছে, আমার কাছ থেকে সে নিজে কিছু জানতে পারে কী না। বললাম, 'না। যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, উনি খুবই ভালো লোক। যে মহিলা খুন হয়েছেন, উনি আমার পরিচিত ছিলেন। ওঁরা খুনীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, সেইজন্য আমার সাহায্য ওঁদের দরকার।'

পার্থ রায় বললো, 'তা করুক। পুলিসের কথা তো, হয় তো আপনাকেই খুনী ভাবছে।'

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'না, তা ভাববে না, ভাববার কোনো কারণও নেই।'

'সে তো জানিই, এ আর বলবার কী আছে। তবু, খুনের দিন আপনি সেই মহিলার বাড়ি গেছলেন তো, পুলিস হয় তো তা থেকেই, একটা ধুন্দুমার ব্যাপার বাঁধিয়ে বসবে।'

আমি একটু অবাক হলাম পার্থ রায়ের কথা শুনে। আমি যে রূপার খুনের দিন, ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, এ কথা পার্থ রায় বা অফিসের কারোকেই আমি বলি নি, বা রূপার খুনের যে-সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে, সেখানেও আমার নামের কোনো উল্লেখ নেই। তথাপি পার্থ রায়—তার মানে, সমস্ত অফিসের লোকই খবরটা শুনেছে। পুলিসের লোক বা আমার স্ত্রী অথবা ললিতা এবং ওর স্বামী এসে, অফিসে খবরটা জানিয়ে যায় নি। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, যে ভাবেই হোক, খবরটা

boiRboi.net

প্রকাশ পেয়েছে, বেশ কিছুটা রটনাও হয়েছে। পরিণতি কী, আমার জানা নেই। হয় তো কিছু গুজব রটনা, নিজেদের মনের মতো গল্প বানানো। প্রকৃত অর্থে সেই জন্য আমার কিছু যায় আসে না। পুলিস যদি ঠিকমতো চেষ্টা করে, খুনীকে তারা নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবে। প্রকৃত ঘটনা, সব কল্পিত গল্পের ইতি টেনে দেবে। বললাম, 'পুলিস এতোটা বোকা বলে আমার মনে হয় না যে, একজন নির্দোষ লোককে তারা খুনী বলে চালিয়ে দেবে। দেখা যাক, কী দাঁড়ায়।'

পার্থ রায় বললো, 'হ্যাঁ, দেখা ছাড়া উপায়ই কী আছে। তবে স্যার, কাগজ পড়ে দেখলাম, খুনটা সাংঘাতিক নৃশংসভাবে ঘটেছে। মহিলার গলার মধ্যে ফর্ক ঢুকিয়ে খুন করেছে।'

আমার চোখের সামনে, রূপার সেই নিহত মূর্তি ভেসে উঠলো। পার্থ রায়ের এসব কথা আমাকে বলার কোনো অর্থ নেই, সব আমি নিজের চোখেই দেখেছি, এবং এখনো দেখতে পাচ্ছি। ডি ডি-র কথা মনে পড়তে, এখন আমার আরো অবাক লাগে যে, রূপাকে কেউ জোর করে রেপ্ করে নি। অভিজ্ঞের মতামত হচ্ছে, রূপা নিজের ইচ্ছায় সেকস্ এন্‌জয় করেছে। তার মানে—চাকরের উক্তি আমার মনে পড়ে গেল, আমাকে সে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় ফ্রিজ খুলতে দেখেছিল, যে-কথা আমি মোটেই মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমার সেই নগ্ন মূর্তিকে আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং রূপার স্বইচ্ছায় সেকস্ :এনজয় করাটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যদিচ সে কথাও আমি মনে করতে পারি না। কেন? সত্যি কি পারি না? রূপার নগ্ন শরীর আমার চোখের সামনে ভাসছে। কেবল নগ্ন শরীর না, ওর যৌবন টলটল শরীরের নানান ভঙ্গি। উদ্বেল শৃঙ্গার, আবেগ মথিত রক্তিম দৃষ্টি, ঠোঁটের অভিব্যক্তিতে, যা কেবল হাসি না, একটু উচ্ছ্রিত মিলনের কামনা, বাসনা দগ্ধ শীৎকার, এবং আলিঙ্গন এবং আগ্রাসী চুম্বন এবং তারপর অন্ধকার—অন্ধকার গভীর, গভীরতর—কিন্তু হঠাৎ একটা কথা যেন চাবুকের শিসের মতো আমার কানে বেজে উঠলো, 'বড় অ-সুখ, বড় অ-সুখ, এই পাওয়া···যা-ই ঘটুক, ভয় পাই না, চিরদিন চাই।'···গলার স্বর আমার। কথা ক'টি চাবুকের ঝাপটার মতো বাজতে লাগলো, এবং তার মধ্যেই, পার্থ রায়ের গলা আমি শুনতে পাচ্ছে, তার মুখ আমার সামনে, 'আশ্চর্য, খুনী কোনো চিহ্নই রেখে যায় নি, অথচ ভীষণ রক্তপাত হয়েছে, বেড শীট দিয়ে রক্তের ফিনকি চেপে ধরা হয়েছিল।'··· আমার শিরদাঁড়ার নিচের কেন্দ্রে বিদ্যুৎ হানলো, আমি তাড়াতাড়ি ডেকে উঠলাম, 'মিঃ রায়!'

পার্থ রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'কী বলছেন? আপনার ভয় করছে?' বলতে বলতে সে আমার কাছাকাছি চলে এলো। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হলো, চেতনা সচকিত। বললাম, 'ভয়? না, ভয় না—মানে, রূপা চৌধুরী আমার বন্ধু ছিল, ওর খুনের কথা শুনলে আমি যেন নিজেকে স্থির রাখতে পারি না।'

পার্থ রায় অবাক স্বরে বলে উঠলো, 'ওহ্, ঠিক আছে, ওসব নিয়ে আর ডিসকাশন করবো না।'

বলতে বলতে পার্থ রায় উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি এখন খাবেন? খাবার পাঠাতে বলবো?'

boiRboi.net

বললাম, 'না, এখন আর খাবার ইচ্ছা নেই।'

হাতের কব্জির ঘড়ি দেখলাম, তিনটা বাজে। পার্থ রায় বেরিয়ে গেল, কিন্তু যাবার আগে, তার চোখে মুখে কেমন একটা অবাক জিজ্ঞাসা দেখলাম। আমিও উঠে দাঁড়ালাম, আর একবার আয়নার সামনে গেলাম। আমার মুখে কি ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল? এখন অবিশ্যি আমার মুখের অবস্থা আর বর্ণ অনেক স্বাভাবিক। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে, অফিসের অন্যান্য বিভাগে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, একজন বেয়ারা ঢুকলো, কিছু ফাইলপত্র নিয়ে। তার পিছনেই ক্যাশিয়ার অবনীবাবু। একলা চুপচাপ বসে না থাকার জন্যই বাইরে যাচ্ছিলাম। ডাকলাম, 'আসুন অবনীবাবু, বসুন।'

আমি বসলাম।

★ ★ ★

বিকাল পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে, ডক্টর ব্যানার্জির চেম্বারে গেলাম। মনে করেছিলাম, উনি আসেন নি, অপেক্ষা করতে হবে। সাড়ে ছটার আগে চেম্বারে আসেন না। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, এসে পড়েছেন। বললেন, 'একটু আগেই এসেছি। আপনার জন্য। ঘণ্টা খানেক আগেই এলাম। ভাবলাম, কী জানি, কী অসুখ করেছে আপনার।'

হেসে বললেন, 'বসুন। এখানে আর কেউ আসবে না। আপনি নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পারেন। ঘণ্টা খানেক সময় পেলে আপনার হবে তো?'

আমি একটু লজ্জিত হেসে বললাম, 'যথেষ্ট।'

আমি জানি, ডক্টর ব্যানার্জির মতো একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের এক ঘণ্টার মূল্য কতোখানি। তিনি আমার থেকে কিছু বড়, রাশভারি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, যদিচ সদালাপী, নিরহংকারী। তিনি জেনারেল ফিজিশিয়ান নন, মেডিসিন তাঁর বিষয়বস্তু, তথাপি আমাদের পরিবারের সঙ্গে অনেককাল পরিচয়। প্রথম পাস করে, হাউস সার্জন থাকাকালীন, বাবার সঙ্গে পরিচয়, তারপরে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। নিজের বিষয়বস্তু ছাড়াও, তাঁর অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানের বিস্তৃতি অনেকখানি। আমাদের পরিবারে, কারোর কোনো অসুখ হলে, আগে তাঁকেই জানানো হয়। তারপরে তিনি যা উপদেশ দেন, তাই করা হয়। বিশেষ করে, আমার বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। আমার যে মাঝে মধ্যে ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়, এ বিষয়ে তিনি জানেন এবং অনেক কথাও বলেছেন। আমাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছেন।

আমি বসবার পরে, তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঙুলের ব্যথাটা কেমন আছে?'

বললাম, 'অনেক কম। একজনকে দেখিয়েছিলাম। ফ্রাকচার না, একটা মালিশের ওষুধ লাগিয়েছি।'

ডঃ ব্যানার্জি বললেন, 'টেলিফোনে শুনে, আমারো তাই মনে হয়েছিল। তারপরে বলুন, আপনার কী স্নায়ুর অসুখের কথা বলছিলেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, গতকাল থেকে আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। তার আগে, আপনাকে আরো কিছু বলা দরকার।'

boiRboi.net

আমি সমস্ত ঘটনা ওঁকে বললাম। আমার কথা শুনতে শুনতে, ওঁর মুখে নানান অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। আমার বক্তব্য যতোই শেষ হয়ে এলো, ওঁর চোখে মুখে যেন একটা ভ্রূকুটি তিরস্কার, বিরক্তি, এমন কি ক্রোধের সঞ্চার দেখতে পেলাম। যে কারণে, আমার কথা বলতে অস্বস্তি হলো। উনি আমার চোখে, ওঁর তীক্ষ্ন চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ করে বললেন, 'বলুন, বলে যান, থামবেন না।'

আমি আজ দুপুরের, লাঞ্চের ঘটনা পর্যন্ত সব-ব্যক্ত করে বললাম, 'তারপরে আর নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারলাম না, আপনাকে টেলিফোন করলাম।'

ডক্টর ব্যানার্জি তখনই কিছু বললেন না, একভাবে, তীক্ষ্ন চোখে, আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি এখন অস্বস্তি বোধ করলাম, ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। উনি বললেন, 'হুঁম্, কিন্তু দুর্ঘটনা যা ঘটবার, তা ঘটে গেছে।'

আমি উদ্বিগ্ন চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ দুর্ঘটনা?'

উনি বললেন, 'সব দুর্ঘটনা। রুপা চৌধুরীর খুন, আর আপনার অসুখ। আপনাকে আমি অনেকদিন আগেই সাবধান করেছিলাম, একটা পারটিকুলার কোয়ান্টিটির পরে, আপনি আর ড্রিংক করবেন না। সে কথা আপনি শোনেন নি।'

ডক্টর ব্যানার্জিকে এখন আর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে না, কিন্তু তাঁর মুখ থম্থম্ করছে।

আমার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ এতো সত্যি, আমায় জবাব দেবার কিছু নেই, তা-ই বিমর্ষ সংকোচে একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রুপার মার্ডারও কি আমার ব্ল্যাক আউটের জন্য?'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'টু সাম এক্সটেন্ট, নিশ্চয়ই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার ব্ল্যাক আউট পিরিয়ডের মধ্যেই, যা কিছু ঘটবার ঘটে গেছে। পরশু রাত্রে আপনার ব্ল্যাকআউটের পিরিয়ড অনেকখানি সময়। আপনি নেকেড অবস্থায়, ফ্রিজ খুলে, সোডার বোতল বের করার আগে থেকেই, আপনার ব্ল্যাকআউট পিরিয়ড শুরু হয়েছিল। তারপরে আপনি রীতিমতো স্যুটেড বুটেড হয়ে, গাড়ি চালিয়ে, আপনার বন্ধুর বাড়ি গেছেন, রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন রোল্ কিনেছেন, বাড়ি ফিরেছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেও আপনি মনে করতে পারেন নি, আপনার আঙুলে কেমন করে লেগেছে। আপনার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত একটা লঙ্ পিরিয়ড কেটেছে, এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে এবং ঘটেছে। আপনার যদি ব্ল্যাকআউট না হতো, হয় তো এ দুর্ঘটনা এড়ানো যেতো।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে?'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'দো আয়াম নট অ্যান ইনভেস্টিগেটর অব্ মার্ডার। তবু এটা তো সহজেই বলা যায়, আপনি যদি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে চলে না আসতেন, তা হলে খুনী ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকতে পারতো না। অবিশ্যি, সত্যি যদি খুনি বাইরে থেকে এসে থাকে। চাকরটার মার্ডারের কোনো মোটিভ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। মিসেস চৌধুরির টাকা পয়সা গহনা চুরি গেলে, সেটা বলা যেতো। তা ছাড়া, চাকরই ব্যাপারটা সবাইকে জানায়, সে পালিয়ে যায় নি। এ কথা বলতে পারি না। সে একজন সেডিস্ট।

boiRboi.net

সেডিজমের সঠিক আচার আচরণ বলাও মুশকিল। যদি বলা যায়, পীড়ন ধর্ষণ তারপরে খুন করা তাদের কাজ, তা হলেও একটা বিষয় পরিষ্কার, রূপা চৌধুরিকে কেউ ধর্ষণ করে নি। এটাও বোধহয় খুনীরই একটা ট্যাকটিস্, রেপ করা হয়েছিল, এটা বোঝানো। আদৌ যা হয় নি।'

'তা হলে, এ খুনের কী মোটিভ হতে পারে, আপনার মনে হয়?'

'অনেক কিছু। প্রতিশোধের জন্য খুন করতে পারে, তা যে কোনো কারণেই হোক। কে বলতে পারে, আপনার বান্ধবী কারোকে ব্ল্যাকমেলিং করছিলেন কী না? আর একটা ভাইটাল কারণ থাকতে পারে। ঈর্ষা। জেলাসি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জেলাসি?'

ডক্টর, ব্যানার্জি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, জেলাসি। আমি প্রেমজাত ঈর্ষার কথা বলছি। কথাটা পুরনো শোনালেও, সত্যি, ভালবাসা আর প্রতিহিংসাপরায়ণ ঘৃণা, এ পিঠ ও পিঠের ব্যাপার। একটা থেকে আর একটা জ্বলে উঠতে পারে।'

বললাম, 'আমি এরকম কথা শুনেছি, ব্যাপারটা বুঝি না।'

ডক্টর ব্যানার্জি একটু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা ওথেলোও বুঝতো না। কিন্তু সে ভেসডেমোনিয়াকে হত্যা করেছিল। এটাকে অনেকে মনোগ্যামির রক্ষণশীলতার পর্যায়ে ফেলতে পারে, আদৌ তা না। প্রেমে ব্যর্থতা আর না পাওয়ার যন্ত্রণা আর হিংসা, আলাদা। আমার নিজের চোখে দেখা, দু একটা ছোট ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। একটি পাঁচ ছ' বছরের ছেলে তার বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। তার মা তাকে বকলে বা দু চার ঘা মারলেও সে সহ্য করে, কিন্তু তার বাবা সামান্য গায়ে হাত তুললেও, সে এমনই ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই সে চিৎকার করে, তার বাবার মৃত্যুকামনা করে, খারাপ ভাষায় গালাগাল দেয়। একটি ওয়ার্স্ট ঘটনা জানি। পাঁচ বছরের ছেলে, তার বাবার হাতে একটি চাটি খেয়ে চারতলার ব্যালকনি থেকে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেছলো। কারণ, ছেলেটির অসহায় রাগ এবং ঘৃণা। পারলে সে তার বাবাকেই চারতলা থেকে ফেলে মেরে ফেলতো। সেটা সম্ভব ছিল না। এটাকে মোটেই পজেসিভ্‌নেস্ বলে না। লাভ এ্যাণ্ড হেট্রেডের ব্যাপার।'

আমি যেন মনে মনে শিউরে উঠলাম, পরমুহূর্তেই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলাম। আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো, যেন অন্ধকারের মধ্যে, একটা বন্ধ দরজার গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বলছেন, রূপা এই কারণে খুন হয়েছে?'

ডক্টর ব্যানার্জি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, রূপা চৌধুরী এই কারণেও খুন হতে পারেন, যদি তাঁর জীবনে সেরকম কোনো পুরুষ থেকে থাকেন। কে বলতে পারে, তাঁর প্রাক্তন স্বামীই এ কাজ করতে পারেন।'

আমি বললাম, 'তা কী করে সম্ভব? রূপার একস্ হাজব্যাণ্ড আবার বিয়ে করেছে। যতোদূর জানি, সে এখন বেশ সুখী।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। জেলাসি মাটির নিচে সাপের মতো, ওপর থেকে বোঝা যায় না, অনেককাল ধরে থাকতে পারে। অবিশ্যি পুলিস নিশ্চয়ই এ বিষয়ে খোঁজ খবর করে দেখবে। মিঃ চৌধুরি পরশু রাত্রে কোথায় কখন ছিলেন, তাঁর এ্যালিবাই পরীক্ষা করে দেখবে। আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছি, মাত্র।'

boiRboi.net

'সে কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরে থাকে।'

ডক্টর ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'হাজার মাইল দু'ঘণ্টায় আসা যায়। খোঁজ খবর রেখে, কেউ কিছু করতে চাইলে, দূরত্বটা তার কাছে কোনো ক্রাইসিস না।'

যুক্তিপূর্ণ কথা, আমার প্রতিবাদের কিছু নেই। যদিচ নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

ডক্টর ব্যানার্জি আবার বললেন, 'এবার আপনার কথা বলুন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমার শরীরের—।'

'আপনার শরীরের কথায় পরে আসছি।' ডক্টর ব্যানার্জি বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি রূপা চৌধুরীকে কী চোখে দেখতেন?'

'প্রীতির।'

'না, তার থেকে কিছু বেশি। শুধু প্রীতির সম্পর্ক আলাদা। আপনাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে, আপনারা কোনো বাধাই মানেন নি, রাখেন নি। বন্ধুত্বের পর্যায়ক্রম মানতে গেলে, একটি মহিলা বন্ধুর সঙ্গে, আপনার দৈহিক পর্যায়ের সমস্ত সীমাই অতিক্রম করে গেছে, তাই না?'

আমাকে স্বীকার করতে হলো, 'হ্যাঁ।'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'এ ক্ষেত্রে আপনারা দুইজনেই ফ্রি লান্সার। আপনাদের মধ্যে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই, আপনারা কেউ তা এ্যাডাপ্ট করতেও চান নি, না?'

ডক্টর ব্যানার্জির দৃষ্টি আমার চোখে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু আপনি রূপা চৌধুরীর কলকাতায় আসার সময়ের কথা মোটামুটি জানতেন, টেলিফোনের জন্য সে সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন, নিজের কাজের বিষয়েও আনমাইণ্ড-ফুল হয়ে যেতেন। বছরে, দু এক দিনের জন্য হলেও, আপনি রূপা চৌধুরীর কাছে বম্বেতেও যেতেন। তার মানে, বছরে প্রায় বার চারেক আপনাদের দেখা সাক্ষাত হতো।'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা দুজনেই দুজনকে দেখবার বা পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে থাকতেন।'

'রূপার কথা বলতে পারি না, আমি তো যেন তাই থাকতাম।'

ডক্টর ব্যানার্জি একটু হেসে বললেন, 'প্রেম ভালবাসার কথা আপনি বোঝেন না বলেন, শুধু ফিজিক্যালি না, মেণ্টালিও আপনি রূপা চৌধুরীর সম্পর্কে ইনভলবড্ ছিলেন?'

মুহূর্তের মধ্যেই মনে হলো, রূপার মুখ আমার বুকে গোঁজা। একটা কষ্ট বোধের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ, তা বলা যায়।'

'তবু আপনার অভিমত হলো, রূপা চৌধুরী স্বেচ্ছাচারিণী। নিজের সম্পর্কে তার নিজের ইচ্ছাই সব।'

আমার কি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে? আমার যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বললাম, 'সেটাও সত্যি।'

ডক্টর ব্যানার্জি কয়েক সেকেণ্ড আমার চোখে চোখ রেখে, ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার ব্ল্যাকআউটের বিষয়ে, আপনাকে আগেই বলেছি। এই যে স্মৃতির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, একেবারে টোটালি ভুলে যাওয়া, এটা স্ব-ইচ্ছায় ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই

boiRboi.net

উদ্ভূত। এটা একটা ব্যাধি। অসুস্থ ব্যক্তির সাবকনসাস মাইণ্ডেই তা থাকে, সে নিজেও জানে না, যা সে মনে করতে পারে না, তা সে মনে রাখতে চায় না বলেই, ভুলে যায়।'

আমার মধ্যে সে অদ্ভুত অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠলো, আমি যেন অন্ধকারে বন্ধ দরজায় আঁচড়াতে আরম্ভ করেছি, তথাপি ডক্টর ব্যানার্জির কথা শুনে, আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এ প্রসঙ্গে কেন তিনি এলেন, এবং আমি তাঁর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছি না। তিনি আবার বললেন, 'আপনি যদি আপনার অবচেতন অন্ধকারে পর্দা ছিঁড়ে দেখতে পেতেন, ব্ল্যাকআউট পিরিয়ডে আপনি কী করেছিলেন, তাহলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেতো। মনে করতে পারেন, আপনি তখন ফর্ক হাতে নিয়েছিলেন কী না?'

ফর্ক! একটা ঝকঝকে তীক্ষ্ন ফর্ক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, যা একটা উদ্যত কংকালের থাবার থেকেও, কংকালের দাঁতের মতো মনে হলো। ঝটিতি আমার শিরদাঁড়ার নিচের কেন্দ্রে বিদ্যুৎ হানলো, এবং আমি যেন অন্ধকারে সেই বন্ধ দরজাটা দু হাতে আঁকড়ে ধরবার জন্য হাত তুললাম, আর শিরদাঁড়ার কাঁপুনি ক্রমে মস্তিষ্কের দিকে কিলবিল করে অগ্রসর হতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শব্দ এবং চিৎকারে। আমি স্থির:হয়ে গেলাম। সেই অবস্থায় ডক্টর ব্যানার্জি দু হাতে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'আপনার আবার সেই অবস্থা হচ্ছিল, না?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। তিনি বললেন, 'বুঝেছি। কিন্তু সেই অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়তে পারলেন না, তাই না?'

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম। ডক্টর ব্যানার্জি দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু হয় নি, তুমি যাও। পেশেন্টদের বসাও, সময় হলে বলবো।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ডক্টর ব্যানার্জির অফিস বেয়ারা অবাক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্দেশ পেয়ে, দরজা বন্ধ করে চলে গেল। বোধহয় শব্দে আর চিৎকারেই সে এ ঘরে এসে ঢুকেছিল। শব্দটা ডক্টর ব্যানার্জিই করেছিলেন, টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে। চিৎকারও তিনি করেছিলেন। বললেন, 'বসুন মিঃ মিত্র।'

আমি বসলাম। তিনি কাগজ কলম টেনে নিতে নিতে বললেন, 'আই ক্যান্নট ইনভেস্টিগেট এ মার্ডার, বাট আই ক্যান ইনভেস্টিগেট এ ডিজিজ। বাড়িতে অফিসে বা রেস্তোরায়, যেখানেই যান, সব জায়গায় আগেই জানিয়ে দেবেন, আপনার সামনে যেন কখনো ফর্ক না আনা হয়।'

'কেন?'

'ফর্ক আপনার ব্রেইনের ইকুয়িলিব্রিয়াম নষ্ট করছে। শুধু চোখে দেখা না, এমনকি নাম শুনলেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে, আপনাকে কনভালশনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কনভালশন?'

'হ্যাঁ, একে বলে সন্ন্যাসরোগের লক্ষণ, আই মীন, এপিলেপ্সি।'

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠলো, 'এপিলেপ্সি?'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'ভয় নেই, একেবারে গোড়াতেই ধরা পড়েছে, দিস ইজ এ ক্যুরেবল ডিজিজ ইন দিজ ডেজ। সেরে যাবে!'

boiRboi.net

আমি অসহায়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আমার কেন এ অসুখ করলো ডক্টর ব্যানার্জি ?'

ডক্টর ব্যানার্জি আমার দিকে কৃপা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'সম্ভবতঃ আপনার পরশু রাত্রের ব্ল্যাকআউটের সঙ্গে, এই রোগের সূত্রপাতের কোনো যোগাযোগ আছে, যা কোনোদিনই জানা যাবে না। এটা একটা রিয়্যাকশন।'

আমি হতাশ বিমর্ষ হতবাক চোখে ডক্টর ব্যানার্জির দিকে তাকালাম। ডক্টর ব্যানার্জি মুখ নিচু করে লিখতে লিখতে বললেন, 'আমি একটা ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি, এটা আজই খাওয়া শুরু করুন।'

ওষুধের নাম লিখে, কাগজটা তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ড্রিংকটাকে একটা লিমিটের মধ্যে আনুন। কী করবেন বলুন, সকলের কনস্টিটিউশন এক রকম না। আপনার লিমিটলেস্ হলেই আপনার ব্ল্যাকআউট হয়। আর একজনের হয় না। সেজন্য আপনাকেই সাবধান হতে হবে।'

ডক্টর ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পার্স বের করলাম। ডক্টর ব্যানার্জি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'ওটা পরে চেয়ে নেব, এখন আপনি বাড়ি যান। মনে রাখবেন, ব্ল্যাক আউট যদি ক্রাইম হয়, এ অসুখ আপনার পানিশমেন্ট।'

আমি ডক্টর ব্যানার্জির মুখের দিকে একবার দেখলাম। তিনি সহৃদয় ভাবে হাসছেন। আমি ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম। জনবহুল পথে, গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হলো, এই চলমান জগৎ সংসার থেকে, আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। সকলের মাঝখানে থেকেও, আমি নরকবাসী, শাস্তি ভোগ করিনি। কিন্তু কেন, তা জানি না, কারণ অন্ধকার গভীর, তার পর্দা কখনো ছিন্ন করা যাবে না।

---

boiRboi.net

বারোবিলাসিনী

boiRboi.net

boiRboi.net

আমার ইমিডিয়েট বস্‌ বলতে যাঁকে বোঝায়, তিনি হলেন চিফ্‌ রিপোর্টার। তাঁর বিশেষ যোগাযোগ অবিশ্যিই এডিটর এবং নিউজ এডিটরের সঙ্গে। নিউজ এডিটরের থেকেও, এডিটরের সঙ্গেই তিনি আলোচনা পরামর্শ করে আমাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। আমি সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার, এ কথা আর না বললেও চলে। খুব বেশী দিনের চাকরি আমার নয়। বছর চারেক রিপোর্টারের চাকরি করছি। একজন রিপোর্টারের জীবনে, চার বছরের অভিজ্ঞতা এমন কিছু না। আমার মাথার ওপরে অনেক বাঘা বাঘা রিপোর্টার আছেন, যাঁদের অভিজ্ঞতা অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর। আমি জানি, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দূরদর্শী প্রত্যুৎপন্নমতি রিপোর্টার তাঁর জীবনের সব অভিজ্ঞতার কথা কখনো লিখতে পারেন না। বহু বাধা সেখানে অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তা যে কেবল মাত্র আইন-কানুনের বাধা, তা না। ব্যক্তি এবং সমাজের অনেক গোপন কথা প্রকাশ হয়ে হুলস্থূল কাণ্ড আর দুর্যোগ বাধিয়ে বসতে পারে। এমন কি চরম সর্বনাশও ঘটে যেতে পারে। অবিশ্যি অনেক সময় হাস্যকর নাটকীয় ঘটনারও অবতারণা ঘটতে পারে। নানা রকম কেচ্ছা কেলেঙ্কারী তো আছেই।

আমি বা আমার বয়সী রিপোর্টারেরা, অবকাশের সময়ে অভিজ্ঞ বয়স্কদের নানান কথা অবাক হয়ে শুনি। নিজেদের কাজের প্রণালী আর যোগ্যতাকে তখন খুবই খাটো মনে হয়। তাঁদের খবর সংগ্রহের বিচিত্র আর দুঃসাহসিক অভিনবত্ব, অনেক সময় গোয়েন্দা কাহিনীর মতোই উত্তেজনাকর আর থ্রিলিং। বিশিষ্ট মহারথীদের এক-একটি প্রশ্নের আকস্মিকতায় রীতিমতো ধরাশায়ী করে ফেলার উপস্থিত বুদ্ধি যেন, বৈদ্যুতিক সুইচ্‌ টেপার মতোই নিখুঁত আর নির্ঘাত। অবিশ্যি সত্যি কথা বলতে কি, এঁদের মধ্যে দু'একজনকে আমার অসৎ বলেও মনে হয়েছে। কারণ তাঁদের প্রতিভা, অনেক সময়েই তাঁদের ব্ল্যাকমেলারের ভূমিকায় পর্যবসিত হয়েছে। একজন রিপোর্টারের পক্ষে, এ পদ্ধতি হলো সব থেকে কলঙ্কজনক আর ইতরতাপূর্ণ।

কিন্তু আপাতত এসব বিষয় আমার আলোচ্য না। এডিটরের ঘরে, এডিটর এবং চিফ্‌ রিপোর্টার একটু আগেই আমাকে যে-কাজের প্রস্তাবটি দিলেন, তা নিয়ে আমি খুবই বিব্রত আর অস্বস্তি বোধ করলাম।

এডিটর ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে, চোখের পাতা কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি রেড লাইট এরিয়াতে যাওয়া আসা আছে নাকি?'

আমি সচরাচর কোনো কথাতেই সহসা অপ্রস্তুত হই না, বা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠি না। কিন্তু এডিটরের কথায় আমি কুঁকড়ে উঠে, মাথা নেড়ে বললাম, 'আজ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি, মানে কোনো কারণ ঘটে নি।'

এডিটর এবং চিফ্‌ রিপোর্টার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাঁদের এই জিজ্ঞাসার কারণটা আমি এখনো যথার্থ জানি না বলেই, অস্বস্তি বোধ না করে পারছি

boiRboi.net

না। রেড লাইট এরিয়া মানে গণিকালয়। চার বছর চাকরির পরে, আমার চরিত্রের সততা অসততা যাচাই করা হচ্ছে কী না, বুঝতে পারছি না। আমি তাঁদের দু'জনের দিকেই অবাক অনুসন্ধিৎসু এবং অস্বস্তি ভরা চোখে তাকালাম।

চিফ্ রিপোর্টারের হাসি মুখে একটু গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো, ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের অভিজ্ঞ রিপোর্টারদের মধ্যে দু'একজনের তো ও সব জায়গায় নিয়মিত যাতায়াত আছে। শুনি, অনেক সময় দিন রাত্রের ঠিক থাকে না, যখন খুশী তখনই সেখানে তারা কাটায়। সে রকম কেউ তোমাকে কখনো, তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় নি? তারা তো অনেকেই নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করে।'

কথাটা একেবারে মিথ্যা না। কিন্তু আমাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করবার কারণ কী? সেই সব অভিজ্ঞদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো? স্বভাবতই মুখ খুলতে আমার অস্বস্তি হলো। অন্তত দু'জন রিপোর্টারের কথা আমি জানি, যাঁরা রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারার মতোই, নিয়মিত গণিকালয়ে গিয়ে থাকেন। গণিকাদের সম্পর্কে নানা রকমের রসালো আর কেচ্ছা কাহিনী আমাদের ডেকে শোনান। সঙ্গে যাবার জন্য টানাটানিও করেন। মনের মধ্যে একটা কৌতূহল যে কখনো হয় না, তা বলতে পারি না। কিন্তু কখনো সে রকম উৎসাহ বোধ করি নি। উৎসাহ বোধ না করার পিছনে, সবটাই যে চারিত্রিক বলিষ্ঠতা বা সুনীতিমূলক, তাও সত্যি না। এই প্রাচীনতম পেশাটির প্রতি, একটা প্রাচীনতম আকর্ষণ আর কৌতূহল আমারও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে খুব মোক্ষমভাবেই, কুসংস্কার আর ভয়। কুসংস্কার বলছি এই কারণে, যা আমার অজ্ঞাত, তাকে আগে থেকেই একটি প্রচলিত বিশ্বাসের অচলায়তনে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। অথচ আমার এই অনুত্তীর্ণ তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই, আমার চারপাশে, এই জীবিকার স্বরূপকে দেখেছি, যার চেহারাটা অবিশ্যি তথাকথিত গণিকালয়ের মতো না। তবে কোনো না কোনো ভাবে, তাদের জীবিকাও যে দেহ, এবং দেহজাত নানান কলাকুশলতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমার এসব চিন্তার কোনো অবকাশ আপাতত নেই। আমি চিফ্ রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাবে, একটু দ্বিধা আর অস্বস্তিতে বললাম, 'না, তাঁদের সঙ্গে আমার কখনো যাওয়া ঘটে নি।'

এডিটর হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঘাবড়ে যাচ্ছো নাকি?'

বললাম, 'না, কিন্তু প্রস্তাবনার মূলটা ঠিক অনুমান করতে পারছি না!'

এডিটর আর চিফ্ রিপোর্টার দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠলেন। চিফ্ রিপোর্টার বললেন, 'যাই হোক, তা হলে রেড লাইট এরিয়া বা সেখানকার মেয়েদের সম্পর্কে তোমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, তাই তো?'

আবার এই জিজ্ঞাসা কেন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই।'

এডিটর বললেন, 'আমি এটাই অনুমান করেছিলাম, আর সেই কথাই বিনয়কে (চিফ্ রিপোর্টার) বলছিলাম, অমলের কাছে এই জগৎটা এখনো অজানা আছে।'

অমল আমার নাম। আমি একটু হেসে বললাম, 'কিন্তু গত দুটো শীতের মরসুমে, কলকাতায় হোটেলে যতো দেশ-বিদেশের ক্যাবারে নর্তকী এসেছে, তাদের অনেকের সঙ্গেই আমি কথাবার্তা বলেছি, আর তা থেকে—'

চিফ্ রিপোর্টার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা থেকে তুমি যা-ই বুঝে থাকো, সেটা কিন্তু পরের কথা। আপাতত তোমাকে দেখতে হবে, একজন ক্যাবারে ড্যান্সার মেয়ের নাচটাই হলো পেশা, দেহ বিক্রি না। তাই না? এ ক্ষেত্রে পাদপ্রদীপের আলো থেকে, তুমি যাচ্ছো পর্দার অন্তরালে, তার অন্য এক জীবনের সন্ধানে। সেখানে সে দেহ বিক্রি করে কি না করে, সেটা সেকেন্ডারী ব্যাপার। করতে পারে, নাও করতে পারে। করলেও, আমরা যাদের দেহোপজীবিনী বলি—অর্থাৎ বেশ্যা, নিশ্চয়ই তার কারবারটা সে রকম ডাইরেক্ট না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বেশ কয়েকজন ক্যাবারে ড্যান্সারকেই জানি—মানে, শুনেছি, তারা নিয়মিত দেহব্যবসা করে।'

এডিটর আবার আগের মতো ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললেন, 'তোমরা শোনো কী করে? শোনাটা কোনো অভিজ্ঞতা নয়, দেখা বা জানাটাই আসল। তুমি যা জানো, তাই বলো। শোনার মতো দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা থাক।'

আমি জানি, আমাদের এডিটর কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী একজন ঝানু সাংবাদিক। এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত। প্রথমে তিনি কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকে সাব এডিটরের চাকরি নিয়ে ঢুকেছিলেন। সেখানে অ্যাসিস্টান্ট এডিটরের পদে প্রমোশন পাবার পরেই দিল্লীর একটি ইংরেজী দৈনিক তাঁকে নিউজ এডিটরের চাকরি দিয়ে নিজেরাই ডেকে নিয়ে যায়। তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে তখন দিল্লী বোম্বের অনেক সংবাদ-পত্রের কর্তৃপক্ষই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এ সবই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্যতার গুণ। দিল্লী থেকে তিনি যোগদান করেছিলেন বোম্বের একটি ইংরেজী দৈনিকে, সহযোগী সম্পাদক হিসাবে। শেষ পর্যন্ত তিনি আবার কলকাতায়, বাংলা দৈনিক সম্পাদক রূপে। মনে হয় এখানেই তাঁর মূল শিকড় নিহিত, বাংলা ভাষা ও সাংবাদিকতার মধ্যে। আমাদের সকলের সঙ্গেই তিনি বন্ধুতামূলক আচরণ করেন। বয়সটা তাঁর কাছে বড় কথা না। কিছু কিঞ্চিৎ অশ্লীল ঠাট্টা, বা স্ল্যাং, তিনি অনায়াসেই আমাদের সামনে উচ্চারণ করেন।

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, আমার কথায় গলদটা কোথায়। একটু বিব্রত হেসে বললাম, 'আমি জানি, আমি নিজের চোখেই দেখেছি, ক্যাবারে ড্যান্সার মেয়েদের কাছে তাদের কাস্টমাররা কী ভাবে অ্যাপ্রোচ করে, আর বিজনেস্ হয়। সে জন্যই বলছিলাম, ওটাও একটা ক্লিন প্রসটিটিউশন। অবিশ্যি সব ক্যাবারে মেয়েরা নয়।'

চিফ্ রিপোর্টার হেসে বললেন, 'আমি বিশ্লেষণটা একটু বিশুদ্ধভাবে করতে চাইছিলাম। আমাদের দেশে কতগুলো বিধিবদ্ধ আইনকানুন আছে। একজন ক্যাবারে বা বেশী ড্যান্সার, একজন আয়করদাতাও বটে, তাই না? কিন্তু একজন গণিকা আয়করের আওতার বাইরে, লাইসেন্স হোল্ডার প্রসটিটিউট যাকে বলে। আইনত তার মৃত্যুর পরে, তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারে বর্তায়। এ ক্ষেত্রে, তারাও হয় তো আইনের নানান সুযোগ সুবিধা নিয়ে থাকে। কারণ বেশ্যারাও চায় না, তাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হোক। তার জন্য তারা নিশ্চয়ই কলকাতার বাঘা বাঘা আইনজীবীদের সাহায্যও নিয়ে থাকে।'

এই মুহূর্তে আমার একটি ঘটনা বিদ্যুচ্চকিতের মতো মনে পড়ে গেল, আমি বললাম, 'বিনয়দা (চিফ্ রিপোর্টারকে আমরা দাদা বলেই ডাকি) একজন বিখ্যাত ল'ইয়ারের কথা আমি জানি, যাঁর সঙ্গে সোনাগাছির—।'

'আমরা আমাদের সাবজেকট্ থেকে সরে যাচ্ছি।' কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে গিয়ে, আপাতত আমাদের কোনো লাভ নেই। কলকাতার অনেক রথী-মহারথীরই ও বিষয়ে যোগাযোগ থাকতে পারে। স্যো হোয়াট! আর বিনয়, তুমি সব বিষয়ে একটু বেশি খোঁচাতে ভালোবাসো। আইন ও বেশ্যাবৃত্তি, এ ধরনের কোনো কিছু নিয়ে আমরা কাগজে লিখতে যাচ্ছি না। অমলকে সোজা কথাটা সহজ করে বুঝিয়ে দাও, আর সেই সঙ্গে ওর ডিউটি।'

চিফ্ রিপোর্টার সংকুচিত হেসে বললেন, 'অমলকে আমি মোদ্দা কথাটা বলতে চাইছিলাম।' বলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ক্যাবারে ড্যান্সার বা কল্ গার্ল', এদের কথা আপাতত তুমি ভুলে যাও। রেড লাইট এরিয়া বলতে যা বোঝায়, এরা কেউ সেখানকার বাসিন্দা নয়। খাঁটি বাংলায় যাকে বলে বেশ্যা-পল্লী, একটু আগে তুমি যে অঞ্চলের নাম করছিলে, সোনাগাছি, যেখানে সোজাসুজি দেহবেসাতি একমাত্র ব্যবসা, আমি সেখানকার কথাই তোমাকে বলছি। সেখানে অন্য কোনো পেশা বা ব্যবসার সাইনবোর্ড নেই, কোনো ছদ্মবেশ নেই। সকলের জীবিকা এক আর অভিন্ন, দেহ বিক্রি। ভেরি ডাইরেক্ট। তাই না?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম, কিন্তু বিষয়টির অবতারণার কারণ আমি এখনো অবগত নই। যেহেতু, আপাতত আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সেই হেতু আমি ধরেই নিচ্ছি, চিফ্ রিপোর্টার যা বলছেন, তা সত্যি। এডিটর আগেই আমার সম্পর্কে অনুমান করে বলছেন, এই জগৎ সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাঁর অনুমান শতভাগ সত্যি। কলকাতার তথাকথিত বেশ্যাপল্লীর জগৎ, অদ্যাবধি আমার অজানা। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী আমাকে বললেন, 'এবার আমি বলি! আমি তোমার মতো একজন অনভিজ্ঞ আনকোরা যুবককেই সেই সব এলাকায় পাঠাতে চাই। বেশ্যালয় সম্পর্কে কোনো ঝানু আর অভিজ্ঞ রিপোর্টারকে পাঠাতে চাই না, কারণ, আমার বিশ্বাস, তাদের চোখে আর কোনো কিছুই নতুন লাগবে না। তাদের চোখের রঙের মতোই, সবটাই দেখবে পুরনো আর বিবর্ণ। বিষয়টি খুবই পুরনো, নিঃসন্দেহে, কিন্তু নতুন জেনারেশনের চোখ দিয়ে দেখার একটা সমীক্ষা আমরা আমাদের কাগজে প্রকাশ করতে চাই। ব্যাপারটা তুমি বুঝেছ?'

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী ভুরু কুঁচকে, ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর এই চাউনি আর ভঙ্গিটা দেখলে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করি। এই ভঙ্গির মধ্যে অনেক কিছুই আছে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মোটামুটি।'

চিফ্ রিপোর্টার হেসে বললেন, 'মোটামুটি বোঝবার কিছু নেই। এই সমীক্ষার দায়িত্বটা তোমাকেই দেওয়া হচ্ছে। খুশী?'

খুশী! অসম্ভব! আমি ভিতরে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছি। কার্যকারণটি এতক্ষণে যথার্থ জানা গেল। কিন্তু এমন একটি সমীক্ষা এবং লেখার ব্যাপারে আমাকেই

boiRboi.net

কেন? আমার বয়সী আরো নতুন, নবীনতর রিপোর্টারও আছে। নতুন জেনারেশনের চোখ দিয়ে দেখার ক্ষেত্রে, তারা আমার থেকে কম কিছু করবে না।

'খুশী হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব না।' কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'অমলের চোখ মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি ও ভীষণ প্রমাদ গুনছে। কী হে, ঠিক বলিনি?'

মুখে স্বীকার করতে পারলাম না, কিন্তু আমার অপ্রস্তুত হাসি দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'খুশী হবার কোনো প্রশ্নই নেই, কিন্তু কাগজটা তুমিই করো। গত বছর তুমি তথাকথিত অসামাজিক যুবকদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে যে লেখাগুলো লিখেছিলে, আমি সেগুলোর কথা মনে রেখেই, তোমাকে এ কাজটা করতে বলছি। তোমার সেই সমীক্ষার যেটা বিশেষত্ব ছিল, তা আমি আগেই বলেছি। সেই যুবসমাজের প্রতি তোমার নিজের কর্তব্য আর দায়িত্ব-বোধ, তার সঙ্গে তাদের প্রতি তোমার ভালবাসা। অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য, আর অশ্চর্য সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় লিখেছিলে। তোমার আর কাগজের, দুইয়েরই সম্বন্ধেই প্রশংসা হয়েছিল।'

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর মুখে প্রশংসা শুনলে, যে-কোনো রিপোর্টারই গর্বিত বোধ করতে পারে। আমিও করছি, কিন্তু তার সঙ্গে যথেষ্টই লজ্জা আর সংকোচও বোধ করছি, যদিও সেটা খুশীর সঙ্গেই। আমি লজ্জিত হয়ে তাঁকে কিছু বলবার আগেই, তিনি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কনককে আমরা এ কাজটা দিতে পারতাম। কনকলাল রায়, বয়সে তোমার থেকেও নিশ্চয়ই দু-এক বছরের ছোট, ইংরেজি বাংলা, দুইয়েতেই ভালো দখল আছে। কিন্তু ফর ইওর ইনফরমেশন, জেনে রাখো, কনক তার টিন্ এজ্ থেকে ব্রথেল গোয়ার। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও প্রবীণদের মতো ঘষা চোখে সব কিছু দেখবে।'

আমি থ হয়ে গেলাম কনকের কথা শুনে। সে-টিন্ এজ্ থেকে ব্রথেল গোয়ার? কথাটার বাংলা করলে কী দাঁড়ায়? বেশ্যালয়ে গমনা-গমনকারী, অথবা বেশ্যাসক্ত?

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বিনয়দার দিকে তাকিয়ে, চোখাচোখি করে হাসলেন। চিফ্ রিপোর্টার বিনয়দার হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম, কনকলালের ব্যাপারটা তিনিও জানেন। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কনকের সঙ্গে এ নিয়ে তোমার কথা বলবার দরকার নেই। আসলে কথা হচ্ছে, যাদের চোখে বেশ্যা একমাত্র বেশ্যাই, তাদের দিয়ে কাজটা ঠিক হবে না।'

আমি একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু বেশ্যাকে বেশ্যা ছাড়া, আর কী চোখে দেখা যেতে পারে? আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যে তাদের যেমন মহীয়সী-টহীয়সী করে দেখানো হয়েছে, বা হয়ে থাকে, সেরকম আরোপিত পিছু—?' কথাটা আমি শেষ করলাম না। মনে হলো, একটু বেশীই বলে ফেলেছি বোধ হয়।

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী হেসে বললেন, 'না, তোমাকে কিছু আরোপ করতে হবে না। ঠিক মহীয়সী বলতে যা বোঝায়, আমাদের সাহিত্যে সেরকম ভাবে কিছু লেখা হয় নি, নারীত্বের দিকটা কেউ কেউ উন্মোচন করেছেন। সেগুলোকে নকল করে পরবর্তী-কালে কেউ কেউ কিছু সস্তা লেখা লিখে গেছে, সেগুলো কোনো কাজের না। সিনেমা

boiboi.net

থিয়েটারে কিছু টাকা রোজগার করা ছাড়া। তবে আরোপ করলে কী না হয়? তুমি বেশ্যাকে বেশ্যার চোখেই দেখবে, ঠিক তোমারই চোখ দিয়ে, তোমার যা মনে হবে। বিনয় বোধ হয় বলতে চাইছিল, তোমার যদি কোনো অনীহা বা ঘৃণা থাকে, সেটা হয় তো তোমার সমীক্ষার পক্ষে অসুবিধা করবে, তাই না বিনয়?' তিনি বিনয়দার দিকে তাকালেন।

চিফ্ রিপোর্টার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক তাই, একটা সিমপ্যাথিটিক মন নিয়ে গেলে হয় তো, একটু বেশী কিছু জানতে পারবে।'

'সেটা ওর ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক।' কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বললেন, 'এ নিয়ে বেশী কিছু বলার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।'

আমার নিজেরও তাই মনে হয়। একটা কাজের দায়িত্ব যখন আমাকে নিতেই হচ্ছে, আমি আমার মতো করেই তার সব কিছু সমাধা করতে চেষ্টা করবো। অনীহা? হ্যাঁ, গণিকা জীবন সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ কোনো কালেই ছিল না। কনকলালের এদিকটা আমি জানতাম না। কিন্তু অন্য কারোর জানি। আমার পরিচিত কিছু কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, যাদের গতিবিধি সেই সব অঞ্চলে আছে, তাদের কাছে অনেক সময় অনেক ঘটনাই শুনেছি। শুনে মনে হয়েছে, বিপথগামীতার বয়স বা মন তাদের নেই, সব কিছুই করে থাকে যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তার মধ্যে আনন্দ কিছু থাকে বলে আমার মনে হয় না, এবং যে-সব মেয়ের কাছে তারা যায়, তাদের সম্পর্কেও সম্যক কিছু বোঝা যায় না। আমি তাদের কারোর মধ্যেই কোনো মেয়ের জন্য তেমন আকুতি দেখি নি। অথচ ফরাসী শিল্পীদের জীবনী আমি পাঠ করেছি। রক্ত মাংসের বেশ্যার কথা আমি পড়েছি, যে-সব চরিত্র কাল্পনিক না, বাস্তব এবং ঐতিহাসিক। সে-সব জীবন কী করুণ আর যন্ত্রণাদায়ক! হাসিগুলো কী নিষ্ঠুর!

সত্যি কথা বলতে কি, আমি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে, গণিকাদের জীবনের সেরকম কিছু পাই নি। বাস্তব চিত্রের সঙ্গে, অন্তর্নিহিত জীবনের একটা তফাত আছে। আমি আমাদের দেশের দেহোপজীবিনীদের জীবন সম্পর্কে জানি না কিছুই, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আমাদের সাহিত্যে বাস্তব চিত্র যতোটা ফুটে উঠেছে অন্তর্নিহিত জীবনের কথা সে-ভাবে উপস্থিত হয় নি। তার কারণ বোধ হয় এই, আমাদের উপন্যাসের কোনো পুরুষ চরিত্রই, গণিকা জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে যায় নি। যার ফলে, গণিকারা পেয়েছে সাহিত্যিকের আদর্শগত কিছু করুণা। অথবা আমাদের ভারতীয় মানসিকতা ভিন্ন, অতএব তার প্রকাশভঙ্গিও ভিন্নতর। কিন্তু সময়ের কি পরিবর্তন হয় নি? যুগ এবং তার সঙ্গে মূল্যবোধেরও কি পরিবর্তন ঘটে নি? ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে, যা ভারতীয় বলে চিহ্নিত করা যায়, তবু এ কথা মানতেই হবে ভারত বিশ্বের কোনো সৃষ্টিছাড়া দেশ না। পৃথিবীর সঙ্গে সেও কাল থেকে কালান্তরের পথে চলেছে।

'আর একটা কথা।' কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বললেন, এবং আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'তুমি এখন থেকেই বিষয়টা নিয়ে খুব ভাবিত হয়ে পড়েছ দেখছি। সেটা খারাপ না। বর্তমান সময়ের একজন তরুণ হিসাবে, তোমার ব্যক্তি ও সমাজবোধের

boiRboi.net

দায়িত্ব থেকেই, সমস্ত বিষয়টি দেখতে হবে। সমীক্ষার নামে, গণিকাদের নিয়ে কোনো সস্তা রচনার কথা আমরা কেউ ভাবছি না।' বলে তিনি চিফ্ রিপোর্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সমীক্ষার কাজটা একমাত্র রেডলাইট এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী আমি নই। মাঝে মধ্যেই পুলিসের কাছ থেকে আমাদের কাছে যে-সব সংবাদ আসে, তাতে বোঝা যায়, আপাতত রেডলাইট এরিয়া বলতে কয়েকটি অঞ্চলকে বোঝালেও, শহরের বহু জায়গায় অনেক স্পট্ ছড়িয়ে আছে। যেখানে নাচ বা গানের কোনো আবরণ নেই, একমাত্র দেহ ব্যবসা ছাড়া। এগুলো সিক্রেট বিজনেস্, একেই তো বোধ হয় হাফ গেরস্থ বলে?'

চিফ্ রিপোর্টার হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'ঠিক তাই।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'কথাটা পথে ঘাটে আখ্চারই শোনা যায়।'

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বললেন, 'কারণ, আখ্চারই এটা ঘটে। অতএব অমল, তোমার সমীক্ষার ক্ষেত্র থেকে তুমি বাদ দেবে না কিছুই। কোথাও কোনো সীমারেখা টেনে দেওয়া হচ্ছে না, তুমি স্বাধীনভাবে তোমার কাজকর্ম চালিয়ে যাবে, যখন যেমন বুঝবে, এবং যখন যেখানে। আমার আর কিছু বলার নেই। কী ভাবে তুমি তোমার কাজ শুরু করবে, তুমিই ঠিক করবে। নাউ গেট আউট, অ্যান্ড গো অন ইওর ওয়ে। আমি নিউজ এডিটরকে ডেকে নিয়ে কথা বলে নিচ্ছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। চিফ্ রিপোর্টার উঠতে যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বললেন, 'তুমি একটু বসো, কথা আছে।'

আমি এডিটরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

*

বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু কী ভাবে কাজটা শুরু করা যায়, ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। নিষিদ্ধ অঞ্চলের মতোই, সমস্ত বিষয়টি আমার সামনে একটা নিষেধের গণ্ডীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কীভাবে এটাকে অতিক্রম করা যায়, আমার কোনো ধারণাই নেই। গত বছর তথাকথিত অসামাজিক তরুণ-সমাজের বিষয়ে লিখতে গিয়ে, আমি কোনো কোনো তরুণীর সান্নিধ্যেও এসেছিলাম। সেই সব তরুণীও অসামাজিক, এক ধরনের অসুখ অস্থির মানসিকতায় ভোগে। এখন আমার যাদের নিয়ে কাজ করতে হবে, তাদের সঙ্গে মূলতঃই সে-সব তরুণীর অনেক তফাত। সেই-সব তরুণীরা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিকার, তরুণদের মতোই।

আমার পাশের চেয়ারে বসে, কনকলাল একজন মন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে। বিশেষ কারণে ও মন্ত্রীর সাক্ষাৎ চায়। আমি ওর কথাগুলো পুরোপুরি শুনছিলাম না, আজ ওর দিকে নতুন চোখে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবতে আমার অবাক লাগছে, এ বয়সেই ও কেমন করে নিষিদ্ধ অঞ্চলের মেয়েদের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। ও আমাকে কখনো কথাটা বলে নি। অফিসের সহকর্মীদের মুখেও কখনো ওর এই বিষয়ে কিছু শুনি নি। আমি জানতাম, নানারকম ড্রাগে ওর আসক্তি আছে, ও নিজেই সে-সব কথা আমাকে বলে। ও দেখতে পাতলা ছিপছিপে ফরসা, এক মাথা কালো চুল। চেহারার মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। কলকাতার একটি বনেদী পরিবারের ছেলে। ওকে আমি সমাজের বিশিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে, কাফে

boiRboi.net

রেস্তোরাঁয় গল্প করতে আড্ডা দিতে দেখেছি। কী করে ভাববো, ও টিন্ এজ্ থেকে গণিকালয়ে যাতায়াত করে। যদি অনুমান করে নেওয়া যায়, মানুষ অভাবে নিষিদ্ধ এলাকার মেয়েদের কাছে যায়, কনকের ক্ষেত্রে তা খাটে না। অতএব, ধরে নিতে হয়, কনকলাল একটি ব্যতিক্রম চরিত্র, মনোবিজ্ঞানীরা যার বিশ্লেষণ করতে পারে। ওকে নিয়ে ভেবে আমার লাভ নেই। ওর সাহায্য পেলে, আমি হয়তো একটা প্রবেশপথ পেতাম, কিন্তু তখন ওর চোখ দিয়েই হয়তো আমাকে সব দেখতে হবে।

'এই যে ব্রাদার, একটা সিগারেট ছাড়ো তো।' কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পিঠে একটি চাপড় পড়লো।

তাকিয়ে দেখলাম শচীশ ঘোষ, একজন সিনিয়র রিপোর্টার। তাঁর ঈষৎ রক্তাভ চোখ আর নিঃশ্বাসের গন্ধেই টের পাওয়া যায়, এই বিকালবেলাতেই কিছু দ্রব্য তাঁর উদরস্থ হয়েছে। আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, তাঁকে দিলাম। তিনি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'তারপর, চিফ্ আর এডিটরের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী কথা হচ্ছিল?'

শচীশ ঘোষ আমাদের শচীদা! আমাদের অফিসের যে কয়েকজন নিষিদ্ধ অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াত করেন, উনি তার মধ্যে একজন ভেটেরান্। হেসে বললাম, 'আপনি আবার তা লক্ষ্য করলেন কখন? আপনি তো তখন অফিসে ছিলেন না, আমি যখন এডিটরের ঘরে গেছলাম?'

শচীদা বললেন, 'ছিলাম না ঠিকই, আমি রাওয়েলদের একটা লাঞ্চে গেছলাম। এসে শুনলাম।'

কনকলাল রিসিভার নামিয়ে রেখে বললো, 'মিনিমাম এক ঘণ্টা অমল এডিটরের ঘরে ছিল। ব্যাপার কি অমল? ফরেন গভর্নমেণ্টে ইনভিটেশন পেলে নাকি?'

হেসে বললাম, 'সে বরাত কি আর আমরা করেছি? ইনভিটেশন এলে তোমরাই আগে জানতে পারবে।'

শচীদা ধমকের সুরে একটি অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, 'কিন্তু এতক্ষণ ধরে কথাটা কী হলো, তাই বলো। ফরেন যাওয়া চুলোয় যাক।'

শচীদা দুবার বিদেশ ঘুরে এসেছে। আমাকে আপাতত আসল কথাটা চেপে রেখেই বলতে হলো, 'জেলাগুলো ঘুরে ঘুরে লিখতে বলছেন।'

'কী লিখবে?' শচীদা জিজ্ঞেস করলেন, 'জেলাগুলোতে তো অনেক বিষয় আছে।'

আমি বললাম, 'এই ধরুন মফঃস্বল শহর আর গ্রামের সামাজিক জীবন।'

শচীদা বললেন, 'কোনো লাভ নেই।'

আমি হেসে বললাম, 'অবিশ্যি সেই সব জায়গার নিষিদ্ধ জীবনের কথাও বলার চেষ্টা করবো।'

'নিষিদ্ধ জীবন?' শচীদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সে বস্তুটা আবার কী?' বলেই হোহো করে হেসে উঠে বললেন, 'ওহ্, তোমরা তো আবার মাগীবাড়ি বেশ্যা-টেশ্যা বলতে পারো না। প্রসটিটিউশনকে বলো নিষিদ্ধ জীবিকা, বেশ্যাপাড়াকে বলো নিষিদ্ধ পল্লী। আসলে সুড়সুড়িটা ওসব শব্দেই বেশি। কিন্তু তুমি আবার ডিসট্রিক্টের শহরে

boiRboi.net

গঞ্জে নিষিদ্ধ জীবন কী দেখবে? তুমি তো সে সব পাড়ায় ঢুকতেই পারবে না।'

আমি কনকের দিকে একবার দেখে, হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন শচীদা? নিষেধ আছে নাকি?'

শচীদা বললেন,'তোমাদের পক্ষে তো ওসব এমনিতেই নিষিদ্ধ পল্লী। নিষেধের কথাটা তো তোমাদের। আমাদের নয়। কিন্তু কোনো দিন সোনাগাছিতে যেতে পারলে না, আর মফস্বল শহরের বেশ্যাপাড়ায় যাবে? তোমাকে তো সব খুলে দেখিয়ে দেবে।'

কনক হেসে উঠলো। আমি ইচ্ছা করেই শচীদাকে একটু ঘাঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কেন দেখাবে? কলকাতায় কি দেখায়?'

'কলকাতা হলো বনেদী জায়গা।' শচীদা বললেন, 'তবে হ্যাঁ, কলকাতাতেও সেরকম জায়গা পাবে, যেখানে রিকশাওয়ালা ঠ্যালাওয়ালারা যায়। তেমন পাড়াও আছে। মফস্বলের শহর মানে, শিলপাঞ্চল, ওখানকার ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবার মতো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমাকে সব দর্শন করিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, এককালে চন্দননগরের খুব নামডাক ছিল। ফরাসীদের আমলে। কলকাতার বাবুরা তখন ফরাসডাঙায় যেতো ফুর্তি করতে। শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পড়া আছে?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আছে, কেন বলুন তো?'

শচীদা বললেন, 'তাহলে তো জানোই, এককালে কেষ্টনগরেও খানদানি বেবুশ্যেরা ছিল। তোমরা যাঁদের বিদ্বদ্‌জন বলো, তাঁদের অনেকেরই সে-সব জায়গায় যাওয়া আসা ছিল। আর একটু ভালো জিনিস হলে, তাকে নিয়ে তাঁদের কমপিটিশনও হতো।'

শচীদা রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের কোন্‌ অংশের উল্লেখ করছেন, তা মনে করতে পারছি না। কথাটা তিনি মিথ্যা বলেন নি, তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখার মধ্যে সফ্‌স্টিকেশন ছিল। শচীদার ভাষার সঙ্গে মিলবে না। বললাম, 'কিন্তু গোটা বইয়ের মধ্যে ওটা একটা সামান্য অংশ।'

শচীদা যেন একটু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'আরে সামান্যই হোক আর অসামান্যই হোক, তৎকালীন বঙ্গসমাজের সেটাও একটা চিত্র তো বটে। শিবনাথ শাস্ত্রী যাঁদের কথা লিখেছেন, তাঁরা সমাজের কেউ চুনো-পুঁটি লোক ছিলেন না, গেঁয়ো জমিদারও না। আজকালই দেখি যতো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়, বেশ্যার কথা বললেই গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধোবার দরকার হয়।'

শচীদা জানেন অনেক কিছু কিন্তু তাঁর এ কথাটা মেনে নিতে পারলাম না। নিজের কোনো চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকুক, আমার চারপাশে গণিকা নিয়ে কথাবার্তা প্রায় সময়েই শুনতে পাই। তথাকথিত এই নিষিদ্ধ ব্যবসা আগের তুলনায় কমেছে বলে আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না, বরং অনেক সময় মনে হয়, সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তা আরো ছড়িয়ে পড়েছে। আইনত বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত তার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় নি। উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়েছে কী না, তা

boiRboi.net

আমি জানি, না। কিন্তু কথায় কথায় আমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই গণিকা আর গণিকালয় নিয়ে গল্প করে। যে-ভাষায় তারা তা বলে, গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধোবার দরকার হয় না।

আমি দেখলাম, কনকলাল এ বিষয়ে নির্বিকার, এবং সে টেলিফোনের রিসিভার তুলে আবার ডায়াল করতে আরম্ভ করেছে। শচীদা আবার বললেন, 'তবে ব্রাদার, একটা কথা জেনে রেখো, তোমাদের ওই সব নিষিদ্ধ জীবন-টীবন, মফস্বলে বিশেষ কিছু নেই। সব উঞ্ছ আর ভিখিরির দল। অনেক শহর গঞ্জে ঘুরে দেখেছি। কোনোরকমে টিকে আছে, ধুঁকছে। যেমন হতশ্রী, তেমনি নোংরা। যা আছে, সব এই কলকাতায়। কলকাতা সব শুষে নিয়েছে, যেমন নিয়েছে মাছ সব্‌জি দুধ ঘি থেকে শুরু করে, সব কিছু। এই আরবান্ কলকাতা হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তির স্বর্গ। মফস্বলে গিয়ে তুমি কী কাঁচকলা পাবে? মফস্বলের লোকেরা আসে কলকাতায়, যারা বেশ্যাদের সন্ধানে আসে।' শচীদা হেসে আবার বললেন, 'সেই কে যেন বলেছিলেন না, শব সাধনা করতে হলে শ্মশানে বসেই করতে হয়? তোমাদের ওই নিষিদ্ধ জীবন দেখতে হলে, কলকাতাই হলো সেই জায়গা, বুঝলে ব্রাদার? দাও, আর একটা সিগারেট ছাড়ো দেখি।' বলে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি খুশী হয়েই শচীদাকে আর একটা সিগারেট দিলাম। মানুষের অভিজ্ঞতার মূল্য দিতেই হয়। শচীদা মাতাল হোন আর বেশ্যাসক্তই হোন, তাঁর কথাগুলো যে ভেবে দেখবার মতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি নিজে কলকাতায় এসেছি একটি জেলা শহর থেকে। সে শহরে আমাদের পরিচয়টা একটু ভিন্ন। এখন যে-কথা বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতে সংকোচ হয়, আমি হলাম সেইরকম একটি জমিদার বংশের সন্তান। জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে অনেক কাল। আমি ছেলেবেলা থেকেই জমিদারি কথাটা শুনে এসেছি, কিন্তু মূলে ব্যাপারটার স্বরূপ কিছুই জানি না। আমার ছেলেবেলাতেই পরিবারের আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে আমার বংশ পরিচয়ের সঙ্গে, জমিদার কথাটা উল্লেখে লজ্জা তো করেই, কেমন যেন অসম্মান বোধ করি। তবে, জমিদারি নেই বটে, জমি নেই এ কথা বলা চলে না। এ জন্য আমার বাবা কাকারা তাঁদের মস্তিষ্ক যতোখানি খাটাবার খাটিয়েছেন। নানাবিধ ব্যবসার পত্তনও করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার প্রথম কাল থেকেই, রাজনীতিও পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সম্ভবত সেটাও একটা রক্ষাকবচ। অতএব, সেকালের জুড়িগাড়ি না থাক, অটোমোবিলের অভাব ঘটে নি। আধুনিকতা বলতে, পরিবারে বড় সরকারি আমলার জন্ম হয়েছে। নেতা তৈরি হয়েছে।

এরকম পরিবারের ছেলের পক্ষে সাংবাদিকতাকে তেমন একটা ভালো নজরে দেখা হয় না। কারণ, তাঁদের কাছে সাংবাদিকতা তেমন অর্থকরী আর নাম ডাকের বিষয় না। তার থেকে আইন ও অর্থনীতি অনেক বেশী প্রার্থিত। কিন্তু সাংবাদিকতায় আমার প্রবণতা ছেলেবেলা থেকেই। কলকাতায় ইউনিভারসিটিতে পড়বার সময় সেটা আরো দৃঢ়তর হয়েছিল, যদিও কলকাতা ইউনিভারসিটির সাংবাদিকতা বিভাগে, আমি কস্মিনকালেও পড়তে যাই নি, পরীক্ষা দিতে যাই নি। তখনকার ধারণা, কাব্যে

boiRboi.net

উপেক্ষিতের মতোই, ইউনিভারসিটির জারনালিজম্ বিভাগটি নীরক্ত। পত্র-পত্রিকার বন্ধুদের দ্বারাই, সংবাদপত্রে আমার অনুপ্রবেশ। অবিশ্যি আমার মনের একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা সাহিত্য রচনার দিকেও। কথাটা আমি সচরাচর কারোকে বলি নি, যদিও অনেক কবি সাহিত্যিক আমার ঘনিষ্ঠ। আমার সংবাদপত্রের রচনার ভাষাকে তারা ইতিমধ্যেই অনেক প্রশাংসা করেছে, তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে, আমার মধ্যে সাহিত্য রচনার ক্ষমতা আছে, এবং অনেকে লিখতেও বলেছে।

আমি লিখি নি। এক শ্রেণীর লেখক আমাদের দেশে আছেন, যাঁরা খুবই জনপ্রিয়। নিজেদের পেশার সুযোগে, যে-সব ঘটনা নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়, অনেকটা সাংবাদিকতার মতোই, তা দিয়ে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেন। জীবন সম্পর্কে কোনো গভীর ভাবনা চিন্তা, আত্মজিজ্ঞাসা, মানুষের সম্পর্ক, সমাজের বিবর্তন, এ সব তাঁদের নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাৎক্ষণিক, এক শ্রেণীর সংবাদ সাহিত্যের মতোই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের কিছু ঘটনা লিখে সাহিত্যিক হবার চেষ্টা করতেন, ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম। এ ধরনের কোনো লেখক হবার ইচ্ছা আমার নেই।

কিন্তু যে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা হলো, শচীদার কথার সত্যতা। আমি নিজে একটি জেলা শহরের ছেলে, ইস্কুলের লেখাপড়া সেখানেই হয়েছে। আমাদের জেলা শহরের গণিকালয় আমি দেখেছি। দেখবার জন্য না, শহরে চলাফেরা করতে গেলেই তা অনিবার্যভাবে চোখে পড়ে। সে চিত্র সত্যি দরিদ্র, হতশ্রী, নোংরা। ঠিক মতো বলতে গেলে, রাস্তার কুকুরের নর্দমার জলে তৃষ্ণা মেটাবার প্রতীক, কলকাতার গণিকালয় ও জীবন কি তার থেকে স্বতন্ত্র ?

আপাতত এই সমীক্ষাই আমার কাজ। কিন্তু আমার মতো একজন আনাড়ীর পক্ষে, এই জীবনে প্রবেশের পথ কী ? অফিসে এবং বাইরের বন্ধুদের বললে, এখনই একটা পথ পাওয়া যায়। তার আগে, ভিন্ন পথের কথা একটু ভাবা যাক।

বিকালবেলায় কোনো কাজ না থাকায়, বাড়িতেই সময় কাটাচ্ছিলাম। বাড়ি বলতে, আমার নিজেরই আস্তানা। ব্যাচেলার ডেন্ বলা যায়। পাড়াটা মধ্য কলকাতার কসমোপলিটন অঞ্চল। কোনো এককালে হয় তো সাহেবপাড়া ছিল, এখন সারা ভারতের হরেক রাজ্যের, যাবতীয় ধর্মের লোকের বাস। এ বাড়িটার মালিক আমরাই, আমাদের পরিবারের সম্পত্তি। ভাড়াটে এবং বাড়িভাড়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তার জন্য আলাদা লোক আছে। কলকাতায় আমাদের আরো দুটি বাড়ি আছে। একটি খিদিরপুর অঞ্চলে, আর একটি পুরনো আলিপুরে। আলিপুরের বাড়িতে আমার এক কাকা সপরিবারে স্থায়ী বাসিন্দা। জেলা শহরের বাড়ি থেকে কেউ এলে, সবাই আলিপুরের বাড়িতেই ওঠে। খিদিরপুরের বাড়িও ভাড়া দেওয়া আছে।

আমাকে আলিপুরে কাকার সঙ্গে থাকতে বলা হয়েছিল। আমার মোটেই তা পছন্দ ছিল না, অর্ধেক স্বাধীনতা সেখানেই বিসর্জন দিতে হতো। আমার নিজের সত্তা থাকতো কুঁকড়ে, সর্বদাই বাড়ির ছেলে হয়ে থাকতে হতো, আর বাড়ির

boiRboi.net

অভিরুচিকে মূল্য না দিয়ে উপায় ছিল না। তার চেয়ে আমি মেসে থাকা পছন্দ করেছিলাম।

আমার বাবাকে যথেষ্ট উদার বলতে হবে, তিনি আমাকে মধ্য কলকাতার এ বাড়িতে থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন। চারতলার একটি মাত্র ঘরে আমি থাকি। সংলগ্ন বাথরুম আছে। বাকীটা সবই খোলা ছাদ। আমার আগে এ ঘরে এক মুসলমান ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর টেলিফোন ছিল, এবং সেটা এখনো আছে। তিনি এখন লণ্ডনবাসী। টেলিফোনটা তাঁর নামেই আছে, তার জন্য তাঁকে দু'হাজার টাকা দিতে হয়েছিল। টাকাটা আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তা হোক, তবু একটা টেলিফোন থাকা, একদিক থেকে যথেষ্ট ভাগ্যের কথা।

এই গোটা বাড়িটাতে ফ্ল্যাটের সংখ্যা ন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সবরকম ভাড়াটেই আছে। বাড়িওয়ালা হিসাবে তাদের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র লেনদেন না থাকলেও, আমার প্রতি তাদের নজর দেখে বুঝতে পারি, কিঞ্চিৎ ভিন্নতর। সকলের না, কারোর কারোর। আমার বা তাদের, তাতে কারোরই কিছু যায় আসে না। ওটা একটা সংস্কারের মতো। আমার নিজের কখনো মনে হয় না, আমি বা আমরা এ বাড়ির মালিক।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, একটা ফিউডাল আবহাওয়া আমাদের পরিবারে আছে। তার স্বরূপ চেনা সহজ না। কলকাতার অনেক আরবান পরিবারেও ফিউডাল আবহাওয়া আমি দেখেছি, যদিও চালচলন পুরোটাই আপাতঃদৃষ্টিতে খুবই মডার্ন। তথাপি আমাকে এ কথাও স্বীকার করতেই হবে, আমার বাবা আমাদের পরিবারের বিত্ত সম্পত্তি ও মর্যাদার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে শেখান নি। আত্মবিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার কথাই বরাবর বলে এসেছেন। তার একটা কারণ সম্ভবত এই, আমরা যেন পারিবারিক সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত না হই। আর এই কারণেই, এখনো পর্যন্ত, বাড়ি-ঘর সম্পত্তির বিষয়ে, আমার নিজের বলে কোনো আত্ম-সন্তুষ্টিতে ভুগি না।

আমি একটা মনের মতো কাজ করি। এ বাড়িতে আমিও আর দশজনের মতো বাস করি। এ বাড়িরই কোনো ফ্ল্যাটে হয় তো আমি পেয়িংগেস্ট হিসাবে আমার দু'বেলার খাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম। কোনো কোনো পরিবার থেকে সেরকম আভাসও পেয়েছি। আমি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গিয়েছি। হিটার জ্বালিয়ে চা জল-খাবারের ব্যবস্থা রেখেছি। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা অফিসের কাছেই একটি রেস্তোরাঁয় নিয়মিত, মাসের শেষে টাকা দিই। রাত্রের খাবার যখন যেদিন যেখানে হয়, কোনো ঠিক থাকে না। আমার চাকরিটাই এমন, রাত্রের ব্যবস্থা ঠিক রাখা মুশকিল। অবিশ্যি আমার বন্ধুবান্ধবের আড্ডা এখানে প্রায় লেগেই থাকে। সেটা প্রতিরোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। এরকম একটি ব্যাচেলরের ফ্ল্যাটে বন্ধুবান্ধবরা মাঝে মধ্যে হই-হুল্লোড় করবে, এটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে, তিনতলার সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে, আমার একটি ঘরের ছাদসুদ্ধ রাজ্যটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি নিজেও একজন আড্ডাবাজ, এটা মানতে হবে।

boiRboi.net

অসুবিধা হয় কিছু মাতাল দাঁতাল বন্ধু নিয়ে। আমার ঘরে বসে মাতলামি করলে কিছু যায় আসে না। রাত দুপুরে এসে হানা দিলেই মুশকিলে পড়তে হয়। সেই সময় যদি আবার বন্ধুর সঙ্গে থাকে একটি মেয়ে সঙ্গিনী। এরকম ঘটনাও অনেক ঘটেছে। অনেক বন্ধু তাদের প্রেমিকাকে নিয়ে, আমার ফ্ল্যাটটাকেই অভিসার মিলনের জায়গা হিসাবে বেছে নেয়। প্রথম দিকে এ বিষয়ে আমি কিছুটা উদার থাকলেও, পরে আর সব সময় তা সম্ভব হয় নি। কেউ কেউ আমার ফ্লাটের চাবি দাবি করতে আরম্ভ করেছিল, আমার অবর্তমানে বান্ধবীকে নিয়ে সময় কাটাবার জন্য। সে দাবিও এক সময় মেনেছি। এখন আর তা দিই না। কারণ, এসব সংবাদ আমাদের জেলা শহরের বাড়িতে চাপা থাকে নি। তা ছাড়া, ব্যাপারটা আমার নিজেরও ভালো লাগে নি। অনেকের এমন ধারণা হয়েছিল, আমি বোধহয় আমার ফ্লাটটা, তথাকথিত হোটেল রুমের মতো, সাময়িকভাবে ভাড়া দিয়ে, কিছু উপার্জন করি। একটা হীনমন্যতা বোধ আমার মধ্যে এসেছিল।

আমার দরজা কারোর জন্যই বন্ধ নেই। কিন্তু ক্ষেত্র ও পাত্র-পাত্রী বিশেষে, নিশ্চয়ই বন্ধ! আমি ভালো ছেলের সার্টিফিকেট চাই না, মনের শান্তি চাই। আমাকে নিয়ে কে কী বললো, সেটা বড় কথা না। আমি নিজে কী, নিজের কাছে অন্তত সেটা পরিষ্কার থাকা দরকার। এ বাড়িরই অনেক ফ্ল্যাটে অনেক কিছু ঘটে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার জন্যও তাদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমি কারোকে অকারণ অতিশয় কৌতূহলিত বা অবাক করতে চাই না। যদিও তা সব সময় সম্ভব হয় না।

একটা সময় গিয়েছে, প্রায়ই বেদেশী হিপি-হিপিনীরা আমার এই আস্তানায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অধিকাংশই শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, যদিও তাদের অনেক আচরণই বিচিত্র আর অস্বাভাবিক। আমার নিজেরও তাদের বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল ছিল। এদের মধ্যে অনেকেরই পড়া-শোনা জ্ঞান-গাম্যি বেশ ভালো। নিজের থেকে মুখ খুললে, তাদের সঙ্গে কথা বলা যায় অনেক কিছু নিয়ে। তারা যে পশ্চিম জগতের এক রকমের বিদ্রোহী, তা বোঝা যায়। মেয়ে আর পুরুষের মধ্যে সমকামিতার প্রচলন আছে। নানা রকমের ড্রাগ ছাড়া থাকতে পারে না। একটি বিষয় বড় খারাপ, সকলেই নোংরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তা সে শোবার ঘরই হোক বা বাথরুমেই হোক, কোথাও থাকে না। এসব যদি বা মেনে নেওয়া যেতো, আমার দেশীয় বন্ধুরাই ঝামেলা করতো বেশী। কারণ তারাও হিপি হয়ে ওঠার চেষ্টা করতো, অতএব তাদেরই বা নগ্ন হতে বাধা কী? নেশা ভাং করতেই বা বাধা কোথায়?

বাধা এক জায়গায়, তারা হই-হুল্লোড় করে নরক গুলজার করে তুলতো। আমার আস্তানায় হিপি-হিপিনীদের এনে তোলবার একটিই মাত্র তাদের লক্ষ্য ছিল, হিপিনীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা। অথচ তারা নিজেরা হিপি নয়, হিপি মনোবৃত্তিও নেই।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে, হিপিদের বোঝা কঠিন। কিন্তু তাদেরও কতগুলো নীতি এবং বিশ্বাস আছে। সভ্যতার সব কিছুকেই তারা অস্বীকার করতে চায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাশ্চাত্যের শ্মশানে এদের জন্ম, পরবর্তী কালের বহু

কারণে তারা সংসার সমাজ ছেড়েছে। আমাদের থেকেও, ওদের নিজেদের দেশে অনেক বড় সমস্যা।

আমার এই এক কোণের নিরালা আশ্রয়ে, এখনো যে বন্ধু-বান্ধবের দৌরাত্ম্য একেবারে হয় না, তা বলা যায় না। তবে আগের থেকে অনেক কম। এখন আমি কিছুটা শান্তিতে আছি। যদিও পান ভোজনের প্রোগ্রাম প্রায়ই লেগে থাকে। সেটা আমাকে মেনেও নিতে হয়। কোথাও বসে একটু পান ভোজন আড্ডা দিতে হলে, আমাকে রাজী হতেই হয়। আমিও তো একেবারে নিরীহ গোবেচারাটি নয়। তা ছাড়া, হোটেল রেস্তোরাঁয় খরচও অনেক বেশী।

অবিশ্যি অনু—মানে অনসূয়া এলে আলাদা কথা। ও এলে, আগে থেকে টেলিফোন করে আসে, অথবা কখন আমি থাকবো না থাকবো, সেসব ভেবেই আসে। কলেজে পড়ার সময় অনসূয়া আমার থেকে এক বছরের জুনিয়র ছিল। এতো দিনের মেলামেশায়, আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী? এক কথায় যদি বলতে পারতাম প্রেম, তাহলে ইতিমধ্যে একটা পরিণতি ঘটতে পারতো। কিন্তু তা ঘটে নি। অথচ দুজনেই—।

টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো। অনসূয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিচার বিশ্লেষণ ছেড়ে, খাট থেকে হেলে পড়ে, মাথার কাছে টেবিলের ওপরে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যালো।'

টেলিফোনের ওপার থেকে জবাব এলো, 'সুহাস বলছি। তোর অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। কেউ কিছু বলতে পারলো না, তুই কোথায় বেরিয়েছিস। তাই বাড়িতে একটা চান্স নিলাম।'

সুহাস একটি পাবলিসিটি ফার্মে চাকরি করে, এক সঙ্গে পড়াশুনো করেছি। বললাম, 'আজ তেমন কাজ ছিল না, চলে এসেছি।'

'খুব ভালো হয়েছে।' সুহাস টেলিফোনে বললো, 'আজ তোর ওখানে যাচ্ছি। নরেশ থাকবে, সঙ্গে আরো দু-একজন।'

নরেশ ওদেরই ফার্মের কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ছেলেটি এমনিতে খারাপ না, কিন্তু পেটে দ্রব্য পড়লেই, সে আর কারোকে কথা বলতে দেবে না। সবাইকেই নিজের প্রতি ব্যস্ত রাখে। এরকম কিছু লোক আছে, যাদের বাইরে থেকে খুবই অমায়িক আর উদার মনে হয়, যা তারা আদৌ নয়। নরেশ সেই রকম একজন। মদ্যপান করলে সে যে একজন কতো বড় আর্টিস্ট, বাকীরা সব গর্ভস্রাব, এ কথা সে বারে বারে বলতে থাকে। কেউ তার কথা না শুনলে তাকেও তখন গালাগালি দেয়। কিছু না হোক, চিৎকার করে এমন গান জুড়বে, কারোকে একটি কথাও বলতে দেবে না। অবিশ্যি এ কথাও মানতে হবে, ও সত্যিকারের একজন ভালো শিল্পী। ওকে আমার এমনিতে খারাপ লাগে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আরো দু-একজনটা কারা?'

সুহাস জবাবে বললো, 'বঙ্কিম আর ওর ভাবি বউ রত্না আর একজন যেতে পারে।' বলে ও থানা অফিসারের নাম বললো।

থানা অফিসারটিকে আমি জানি, বয়স বেশী না। বঙ্কিম রত্নাও আমার অচেনা না, আর এটাও মনে মনে জানি, রত্না বঙ্কিমের ভাবী বউ-ই থেকে যাবে, বিয়ে কোনো

boiRboi.net

দিনই হবে না। বঙ্কিমের চাকরিটা এমন কিছু না, আসল পরিচয়টা ওর কবি-খ্যাতিতেই। কিন্তু রত্নার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি। তাতে অবিশ্যি আমার কিছু যায় আসে না। বললাম, 'তোরা আয়। বেশী রাত করা যাবে না।'

সুহাস বললো, 'রাত দশটার মধ্যেই আমরা তো ওখান থেকে চলে যাবো। তোকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা সব কিছু নিয়ে যাবো।'

সব কিছুর মধ্যে ভোজ্য আর পানীয়। আমার ভাবনা একটু বঙ্কিম আর রত্নাকে নিয়েই। অন্ধকারে কোনো এক সময়ে, বঙ্কিম আর রত্না নিশ্চয়ই ছাদে বেরিয়ে যাবে তাতেই বা আমার করার কী থাকতে পারে। আশেপাশে বাড়ি থেকে কেউ কিছু না দেখতে পেলেই হলো। আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে, আবার খাটে এলিয়ে পড়ার মুহূর্তেই থমকিয়ে গেলাম। থানার অফিসারের কথাটা আমার মনে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো একটা কথা মনে করিয়ে দিল। আমি যে নতুন কাজটা করতে যাচ্ছি, তার জন্যে থানা অফিসারের সাহায্য নিলে কেমন হয়? কথাটা মনে হতেই আমি উঠে বসলাম, এবং তারপরেই মনে হলো, আমি যদি পুলিসের সাহায্য নিয়েই নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবার চেষ্টা করি, তাহলে থানা অফিসার কেন? কলকাতার পুলিসের দু-একজন বড়কর্তার সঙ্গে আমার সবিশেষ পরিচয় আছে। আমাকে যথেষ্ট খাতিরও করেন। সাহায্য নিতে হলে, তাঁদের দ্বারস্থ হওয়াই উচিত।

কথাটা মনে উদয় হতেই, আমি আর দেরি করলাম না। লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে, টেবিলের ওপর থেকে নোট বইটা টেনে নিলাম। মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতা থেকে সামান্য হোটেলের টেলিফোন নাম্বারও এতে লেখা আছে। নোটবুক থেকে একটি নাম্বার দেখে, রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম। ওপারের স্বর শুনেই চিনতে পারলাম, আমি যাঁকে ফোন করছি, ইনি তাঁরই অধস্তন একজন অফিসার, অনেকটা সেক্রেটারি-কাম-অ্যাসিসটান্টের পদ। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'মিঃ মুখার্জিকে একটু কাইন্ডলি দিন, বিশেষ জরুরী দরকার।' কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, লাইন চলে গেল বিজিতেশ মুখার্জীর খাস কামরায়, তাঁর গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'কী খবর বলো। তোমাকে দেবার মতো কোনো খবর তো এখন আমার অফিসে নেই।'

বুঝতে পারলাম, ওঁকে লাইনটা দেবার আগেই, আমার পরিচয় জানানো হয়েছে। সেটাই রীতিগত পদ্ধতি।

আমি হেসে বললাম, 'না স্যার, সেরকম কোনো সিডিউল কাজের জন্য আপনাকে টেলিফোন করিনি। আপনার সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা বলতে চাই।'

মিঃ মুখার্জীর স্বর শোনা গেল, 'কেন হে, এনি স্কুপ? কোনো গোপন অপরাধের সন্ধান পেয়েছ নাকি?'

আমি সশব্দে হেসে উঠে বললাম, 'না না, তা নয়। ব্যাপারটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত। একটু মুশকিলে পড়ে গেছি।'

'মুশকিল!' মিঃ মুখার্জীর স্বরে বিস্ময়, 'কোথাও কোনো গোলমাল বাধিয়ে বসে আছো নাকি? কোনো ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিকে বা মাতলামি মারামারী—।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনি তো স্যার আমাকে ভালোই জানেন।

boiRboi.net

ওসব নিয়ে আমাকে কখনো ঝামেলায় পড়তে হয় না। বরং নিজের বন্ধুদের জন্য অনেক সময় আপনার কাছে দরবার—।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, টেলিফোনে মিঃ মুখার্জীর হা হা হাসি আমার কানে তালা লাগিয়ে দিল। হাসি সামলিয়ে তিনি বললেন, 'আরে, আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম। তোমাকে আমি ভালোই জানি। কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত মুশকিলটা কী? টেলিফোনে বলা কি সম্ভব?'

আমি বললাম, 'একটু অসুবিধা আছে, তা ছাড়া একটু সময়েরও দরকার। আপনি যদি একটু সময় আমাকে দেন—!'

'কখন তোমার সুবিধা?' মিঃ মুখার্জী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আগামী কাল থেকে দু-তিন দিন তুমি আমাকে পাবে না, আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকবো। তোমার হাতে সময় থাকলে, তুমি এখুনি এসে পড়তে পারো।'

আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলে উঠলাম, 'আপনার অনুমতি পেলে আমি এখনই যেতে পারি।'

মিঃ মুখার্জী বললেন, 'চলে এসো।' বলেই তিনি টেলিফোন কেটে দিলেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখবার মুহূর্তেই, সুহাসের কথা মনে পড়লো। কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই, তীর ধনুকের ছিলার বাইরে চলে গিয়েছে। আমি জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতেই, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, কাজ আগে, আড্ডা পরে। সুহাসরা নিশ্চয়ই আমার ওপর খুবই বিরক্ত হবে, চটেও যাবে, আমি নিরুপায়। চাবি রেখে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব না। অনেক সময় প্রয়োজনে, নিচের একতলায়, একটি পরিবারের কাছে আমি চাবি রেখে যাই। পরিবারটি নিজেদের পদবী হিসাবে ব্যবহার করেন ব্রহ্মচারী। পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা, বলতে গেলে সারা জীবন জেল খেটেছেন। তাঁর ছোট ভাইয়ের পরিবার। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁদের সংসার। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, শান্ত নিরীহ ধরনের। এ বয়সেই বেশ গম্ভীর, একটি কলেজে লেকচারারের চাকরি করে। পরের বোনটিও একটি ছোটখাটো সরকারি চাকরি করে। এখনো বিয়ে করে নি। আমার প্রতি পরিবারটির কিছু কিঞ্চিৎ প্রীতি ও স্নেহ আছে। তাঁরা নিজেরাই বলেছেন, কখনো কোনো প্রয়োজন হলে যেন তাঁদের বলি।

আমার প্রয়োজনের মধ্যে, বিশেষ কারোর জন্য চাবি বা চিঠি রেখে যাওয়া। সেদিক থেকে ব্রহ্মচারী পরিবারকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়।

বাইরে যাবার পোশাক পরেই, সুহাসকে আগে টেলিফোন করলাম। জানতাম, তাকে পাবো না। অতএব আমি তাড়াতাড়ি কাগজ কলম টেনে নিয়ে, পুলিসের বড়কর্তার ডাকের জরুরী খবরটা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে একটা চিঠি লিখে ফেললাম। নোট বই, কলম আর পার্স নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিচে এসে, খোলা উঠোনের বাঁ দিকে ব্রহ্মচারীদের ফ্ল্যাটের দরজায়, বড় মেয়ে রীতার দেখা পেয়ে গেলাম। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর পোশাক দেখে বুঝলাম, ও এই মাত্র অফিস থেকে ফিরছে।

রীতাকে মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়, এবং স্বাস্থ্যবতী। ও কখনো সোজা

boiRboi.net

চোখে আমার দিকে তাকায় না, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে ওঠে। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'কী, ঘরের চাবি দিয়ে যাবেন তো? আপনার সেই গার্লফ্রেন্ড অনসূয়া এলে, চাবিটা তাকে দিয়ে দিতে হবে, তাই তো?'

রীতা এরকম কথাই বলে থাকে, এবং অনসূয়ার নাম পরিচয়টা মোটামুটি জানে। অনসূয়ার নাম করে, একটু ঠোঁট মুচকে হেসে প্রায় খোঁচা দেবার মতো করেই বলে। আমি বললাম, 'না, আমি একটা চিঠি রেখে যাচ্ছি, আমার বন্ধু সুহাসের নামে। ওরা আসবে। কিন্তু আমার থাকবার উপায় নেই। এই মাত্র লালবাজার থেকে একটা ফোন পেয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে।'

রীতার মুখে একটু দুশ্চিন্তা ফুটলো, বললো, 'আপনাদের চাকরিটা ভারী খারাপ। এখন লালবাজারে ডাক?'

আমি হেসে চিঠিটা রীতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় নিলাম। আমাকে এরকম একটা ভান করতেই হলো, যেন পুলিস আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, আমার কোনো কাজে যাচ্ছি না।

*

মিঃ মুখার্জী আমার সব কথা শুনে হেসে বললেন, 'এ আর এমন কী কথা? কলকাতার সব লাল বাতি এলাকা তোমাকে আমি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবো।'

আমি বললাম, 'ঘুরে দেখাটাই আমার কাজ না। আমি সেই সব মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাদের জীবন ভাবনা চিন্তা, সবই আমাকে খুঁটিয়ে জানতে হবে।'

মিঃ মুখার্জী হাত তুলে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই তুমি জানতে পারবে, সেরকম অফিসারই আমি তোমার সঙ্গে দেবো। আপাতত তুমি আমাদের নকশাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নাও। কলকাতার কোথায় কোথায় রেড লাইট এরিয়া আছে, এক নজরে সব দেখে নিতে পারবে।'

মিঃ মুখার্জী বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'বাগচিকে একবার আসতে বলো।' তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তা এসব নিয়ে কাগজে লেখালেখি করবার দরকার হলো কেন? আমাদের পুলিসদের আদ্যশ্রাদ্ধ করবে বুঝি?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, পুলিসের বিষয়ে কোনো কথাই আমি লিখতে যাচ্ছি না। তাহলে আর আপনার কাছে ছুটে আসবো কেন? আমি জানতে চাই, এই পেশার রীতি-নীতি, কোন্ কোন্ সমাজ থেকে এইসব মেয়েরা আসে, কেন আসে, নিজেদের সম্পর্কে তাদের কী ধারণা—অর্থাৎ, প্রসটিটিউটস্ অ্যান্ড প্রফেশনের একটা টোটাল চেহারা আমার চাই।'

'খুব মুশকিল ব্রাদার, খেই পাবে বলে মনে হয় না।' মিঃ মুখার্জী বললেন।

এই সময়ে মিঃ বাগচি এসে ঢুকলেন। মিঃ মুখার্জী বললেন, 'একে চেনেন তো? অমল মিত্র, রিপোর্টার। ওকে আমাদের রেড লাইট এরিয়ার চার্টটা দেখান তো।'

মিঃ বাগচি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ওঁদের পাড়ার থানায় আমি যখন ও-সি ছিলাম, তখন থেকেই চিনি। কী অমলবাবু, তাই তো?'

মিঃ বাগচি ঠিকই বলেছেন। বললাম, 'মনে আছে।'

বুঝতে পারলাম, মিঃ বাগচি এখন একজন ডি-ডি পর্যায়ের অফিসার। মিঃ মুখার্জী

boiRboi.net

সংক্ষেপে দু-এক কথায় আমার উদ্দেশ্যের কথা বাগচিকে জানিয়ে বললেন, 'অমলকে আমি ভালবাসি। মহেশ্বরী কেস্‌টা নিয়ে ও লিখেছিল, মনে আছে আপনার ?'

মিঃ বাগচি বললেন, 'নিশ্চয়, খুব ভালো লেখা হয়েছিল, ওঁর লেখা থেকে আমরাও কিছু কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছিলাম।'

মিঃ মুখার্জী বললেন, 'ঠিক। এবার ও একটা সমীক্ষামূলক লেখা লিখতে চাইছে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনিই ফিটেস্ট ম্যান ওকে সাহায্য করার। ওটা আপনারই জুরিসডিকশন। দেখবেন নাকি একটু ?'

মিঃ বাগচি উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, 'কেন নয় ? আমি ওঁকে সব তত্ত্ব-তল্লাশ আর যোগাযোগই ঘটিয়ে দিতে পারি। আজ রাত্রি দশটা নাগাদই তো আমরা এক জায়গায় হানা দিচ্ছি, আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।'

মিঃ মুখার্জী বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আপনারা তো আজ সেণ্ট্রালের—।'

'হ্যাঁ', 'মিঃ বাগচি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমি নিজেই যাচ্ছি।'

মিঃ মুখার্জী বললেন, 'ভেরি গুড! অমলকে নিয়ে যান, আজই ওর একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাক।'

কোথায় হানা দেওয়া, কী ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি কেবল দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মিঃ মুখার্জী আবার বললেন, 'তা হলে আপনি অমলকে আপনার ঘরে নিয়ে যান, ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নিন।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'খোদ লোকের হাতেই তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম। মিঃ বাগচির সঙ্গে লেগে থাকো, তোমার কার্যসিদ্ধি হবে। বাট মাইণ্ড, পুলিসকে কোনো রকম খোঁচা-টোঁচা দিয়ে কিছু লিখতে যেও না।'

'আমি ওদিকেই নেই।' বলে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালাম। মিঃ মুখার্জীর ঘর থেকে বেরিয়ে মিঃ বাগচির ঘরে এলাম। তাঁর মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় হানা দিতে যাবেন ?'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'বিশেষ একটি এরিয়ায়, দু-একটা বাড়িতে। এ বাড়িগুলো এক ধরনের বেশ্যালয়। এগুলো তথাকথিত রেড লাইট এরিয়া নয়, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক—দালাল বলতে পারেন, যারা এ ব্যবসা চালায়। মেয়েরা কেউ-ই ওখানে থাকে না, তারা আসে নানান জায়গা থেকে। আর এ সবের খোঁজে যারা থাকে, তারা ঠিক খবর পেয়ে যায়। ঢালাও কারবার।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব মেয়েরা থাকে কোথায় ?'

'নিশ্চয়ই তাদের ঘরবাড়ি কোথাও আছে।' মিঃ বাগচি বললেন, 'পার্মানেণ্টলি ওখানে কেউ থাকে না, যেমন, সোনাগাছিতে থাকে। এসব বাড়িতে মেয়েরা রোজ আসে, ব্যবসা করে, ফিরে যায়। বাড়িওয়ালা আর দালালরা হচ্ছে মিডল ম্যান, মেয়েদের রোজগারের একটা পার্সেণ্টেজ এরা পায়।' বলে তিনি উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুলতে খুলতে বললেন, 'আমার ডান দিকেই দেয়ালে যে চার্ট দেখতে পাচ্ছেন, তারই একটা কপি আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। আপনাকে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে না। আমাদের কিছু কেস্‌ হিস্ট্রি রিপোর্টও আপনাকে দেখাবো, তাতে একটা আন্দাজ পাবেন।'

মিঃ বাগচি একটি ভাঁজ করা মোটা কাগজ আমার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, 'লাল স্পটগুলো দেখলেই, কলকাতার রেড লাইট এরিয়া আপনি মোটামুটি দেখতে পাবেন। পার্মানেন্ট এরিয়াগুলোকে নিয়ে আমাদের বিশেষ দুর্ভোগ ভুগতে হয় না, মুশকিল হয় টেম্পোরারি আর ইরেগুলার ব্রথেলগুলোকে নিয়ে। এগুলোকে আমরা বলি ভ্যাকান্ট হাউস ব্রথেলস্। একরকমের ভুতুড়ে বাড়ি বলতে পারেন। আজ আমরা সেরকম একটি বাড়িতে হানা দেবো।'

আমি কাগজটার দিকে চোখ দিলাম। উত্তর কলকাতার জায়গাগুলো চিনতে অসুবিধা হয় না। কালীঘাট অঞ্চল, খিদিরপুর, মধ্য কলকাতার মধ্যে বহুবাজারের কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত। তা ছাড়াও মধ্য কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় ছোট ছোট দাগে চিহ্নিত করা দেখে মনে হয়, কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এ ব্যবসা চলে।

মিঃ বাগচি বললেন, 'এ ছাড়াও, আমাদের কাছে নানাভাবে খবর আসে। গোপনে এ ব্যবসা কতো জায়গায় কতোরকমভাবে যে ছড়িয়ে আছে, তার সঠিক হিসাব করাই কঠিন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ তো আশ্চর্যের ব্যাপার। এর কারণ কী?'

বাগচি হেসে বললেন, 'কারণ কি একটা? দারিদ্র্য নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। কলকাতায় এক শ্রেণীর লোকের এটাই ওন্‌লি প্রফেশন, এরা হলো এজেন্ট আর সেলস্‌ম্যান। রাজ্যের মেয়েদের দিয়ে এরা কারবার চালাচ্ছে। কিন্তু দারিদ্র্যই বেশ্যাবৃত্তির একমাত্র কারণ হতে পারে না। তা হলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারগুলোকে আমরা কী বলবো? লোকলজ্জা আর সংস্কারের ভয় কারোর কারোর থাকতে পারে, তাদের সংখ্যা নগণ্য।'

কথাটা খুবই স্বাভাবিক মনে হলো। কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে আছে। আমার মনে একটা ধারণা ছিল, গণিকাবৃত্তির একটিই মাত্র কারণ, দারিদ্র্য। এই মুহূর্তে তা ভাবতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, কারণ কথাটা একেবারে অযৌক্তিক মনে হলো না।

মিঃ বাগচি আমার সামনে একটি বড় খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে কিছু কেস্ রিপোর্ট আছে, পড়ে দেখতে পারেন।' বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'আপনি যদি আজ সঙ্গে যান, সাড়ে ন'টার মধ্যে এখানে পেঁছে যাবেন। আমি একটু বেরোচ্ছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি থাকলে অসুবিধা হবে না?'

বাগচি হেসে বললেন, 'অসুবিধা কেন হবে? অফিসে আরো লোক আছে। আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি।'

বাগচি বেরিয়ে গেলেন। আমি খাতা খুলে বসলাম।

*

কেস্ রিপোর্ট বলতে, বেআইনী বেশ্যাবৃত্তির কিছু অপরাধের অভিযোগের তালিকা। কিছু নাম-ধাম ইত্যাদি। এ থেকে আমার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু পাওয়ার তেমন সুযোগ নেই। আমি কিছুটা দেখে, খাতা রেখে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিজের ফ্ল্যাটে আর ফিরে গেলাম না। বরং অনুসন্ধিৎসু চোখ নিয়ে,

boiRboi.net

রাস্তার নানান জায়গায় রাত্রি ন'টা অবধি ঘুরে বেড়ালাম। তারপর মিঃ বাগচির কাছে গেলাম।

মিঃ বাগচি তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। আমাকে ডেকে নিলেন তাঁর জীপে। তারপরে অভিযান। যে পাড়ায় এই অভিযান, আমার নিজের পাড়া থেকে সেটা খুব দূরে না। সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে প্রায় বীভৎসই মনে হলো। মিঃ বাগচির জীপ একটা বড় গেটওয়ালা বাড়ির চত্বরের মধ্যে ঢুকতেই, গোটা তিনতলা বাড়িটার মধ্যে একটা ছোটা-ছুটি দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পালাবার পথ নেই। মিঃ বাগচি সেরকম ব্যবস্থা করেই এসেছেন। পালাবার সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই পাহারা রেখেছেন।

এই সময়ে লুঙ্গির ওপরে পাঞ্জাবি পরা, বিরাট গোঁফওয়ালা দশাসই একটি লোক ছুটে এসে, মিঃ বাগচির সামনে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানালো। নুয়ে পড়লো কোমর ভেঙে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললো, 'সাব, খোদ আপনে এসে গেলেন! আমার কি গোস্তাকি—।'

'চুপ করো রামু সিং।' মিঃ বাগচি ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, এবং ইনস্পেক্টরের দিকে ফিরে নির্দেশ দিলেন, 'ভেতরে চলুন, সবাইকে টেনে বের করুন।'

রামু সিং তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'স্যার, আপনি কেন তক্‌লিফ করবেন। আমি নিজে সবাইকে আপনার কাছে এখানে হাজির করে দিচ্ছি।'

মিঃ বাগচি রামু সিং নামক লোকটির কথায় কর্ণপাত করলেন না। সদলবলে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দোতলায় গেলাম। আমার চোখের সামনে দিয়েই একটি মেয়ে আলুথালু বেশে দৌড়ে একদিকে চলে গেল। মিঃ বাগচি প্রত্যেকটি বন্ধ দরজায় লাথি কষাতে লাগলেন, সঙ্গে ইনস্পেক্টর এবং সেপাইরাও।

গোটা বাড়িতে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক ঘরেই একটি করে মেয়ে এবং তাদের ক্রেতা খরিদ্দারেরা। কোনো কোনো মেয়ে তখনো বিছানা ছেড়ে পোশাক পরার অবকাশও পায় নি, ভয়ে দু'চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি সকলেরই একরকম না। মাতাল আর নির্ভীক মেয়েও কিছু কম নেই। ঘরগুলোকে ঠিক ঘর বলা যায় না। আগের কালের বাড়ি, বড় বড় ঘরগুলোকে পার্টিশান দিয়ে পায়রার খুপরি তৈরি করেছে। এক একটা খুপরিতে এক একটা মেয়ে। তা ছাড়াও, বেশ কিছু মেয়েকে আবিষ্কার করা গেল তিনতলার পিছন দিকের একটি ঘরে। অনুমান করা যায় তারা ছিল খরিদ্দারদের অপেক্ষায়।

মিঃ বাগচির নির্দেশে, সমস্ত মেয়েকে হাজির করা হলো নিচের তলার একটি বড় হলঘরে, সেই সঙ্গে খরিদ্দারদেরও। এক পাশে মেয়েরা, আর এক পাশে তাদের খরিদ্দারেরা। আমি কাদের ছেড়ে, কাদের দিকে তাকাবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। খরিদ্দারদের মধ্যে, ইতিমধ্যেই একটি চেনা মুখ আমার চোখে পড়েছে, যিনি একটি কোম্পানির সেলস্‌ ম্যানেজার। সুরার ঝলকে তাঁর চোখ আরক্ত, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। আমার দিকে তাঁর লক্ষ্যই নেই। তিনি মিঃ বাগচিকে একবার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন। মিঃ বাগচি তাঁকে ইংরেজিতে ধমক দিয়ে বললেন, 'আপনি যে-ই হোন, যা বলবার তা আগামীকাল কোর্টে গিয়ে বলবেন।'

বিভিন্ন বয়সের পুরুষদের, আমার মতোই সাধারণ মানুষ বলে মনে হলো। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কেউ কেউ মাথা নীচু করে, মুখ ঘুরিয়ে আছে। এদের মানসিক অবস্থা কিছুটা অনুমান করা যায়। আবার কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলছে।

মেয়েদেরও বিভিন্ন বয়স। বিভিন্ন তাদের বেশভূষা। লক্ষ্য করে, রূপ দেখবার মতো পরিস্থিতি এটা না। তবু কোনো কোনো মেয়েকে দেখে চোখের দৃষ্টি থমকিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো, আমার চারপাশে এরা সব সময়েই ঘুরে বেড়ায়। জিন স্ল্যাকস্, বেলবট, ম্যাক্সি, শাড়ি বাকি নেই কিছুই। বিনুনি খোঁপা ববড্ আর বয়েজ কাট, সবরকমের কেশবিন্যাসই আছে। কিন্তু একটি মেয়েকে দেখে, আমার যেন ছুরি বেঁধা বিস্ময়ের চমক লাগলো। ফ্রক পরা মেয়েটির বয়স তেরো চোদ্দর বেশী কিছুতেই মনে হলো না। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তার আতঙ্কিত চোখে জলের ধারা। লক্ষ্য করে দেখলাম, সে বারে বারেই একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের দিকে তাকাচ্ছে, আর স্ত্রীলোকটি তাকে চোখের ইশারায় কিছু বলতে চাইছে।

মিঃ বাগচির নির্দেশে ইতিমধ্যে এখানেই সকলের নাম ধাম পরিচয় লেখা শুরু হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেউই সত্যি কথা বলছে না। আমি মিঃ বাগচিকে সেই ফ্রক পরা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম, 'মেয়েটিকে দেখে তো ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। ও কি ব্যবসার জন্যই এখানে এসেছে?'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'আপনি কি ভেবেছেন, ও ওর মায়ের সাঙা দেখতে এসেছে? দাঁড়ান, ওকে ডাকছি, আপনার সামনেই—।'

'না না থাক।' আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম।

মিঃ বাগচি ততক্ষণে একজন সেপাইকে মেয়েটিকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। সেপাইটি হুকুম মাত্র মেয়েটির হাত টেনে ধরলো। মেয়েটি একটি আর্তনাদ করে উঠলো। সেপাই চিৎকার করে ধমক দিল, 'চুপ রহো।'

মেয়েটি কাছে আসতে, মিঃ বাগচি বললেন, 'এই, কান্নাকাটি রাখ্, যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দে। তুই কোথা থেকে এসেছিস?'

মেয়েটি কান্নারুদ্ধ স্বরে জবাব দিল, 'সোনারপুর থেকে।'

'বাড়িতে কে আছে?'

'মা।'

'বাবা নেই?'

মেয়েটি মাথা নাড়লো। মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বয়স কতো?'

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। দেখলাম, ও এতই কমবয়সী, ওর ভিতরে কোনো অন্তর্বাস নেই। সস্তা ফ্রকটার পিঠের দিকে সব বোতামগুলো লাগাবার অবকাশ পায় নি। মুখটা একেবারেই ছেলেমানুষের।

মিঃ বাগচি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কতদিন থেকে আসছিস?'

মেয়েটি বললো, 'দশ-বারো দিন।'

'আজ তোর ঘরে লোক এসেছিল?'

boiRboi.net

মিঃ বাগচির প্রশ্নটা যেন আমার কানে তপ্ত শলাকার মতো বিঁধে গেল। মেয়েটি চুপ করে রইলো।

মিঃ বাগচি ধমকে উঠলেন, 'যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দে।'

'দুজন এসেছিল।' মেয়েটি স্খলিত স্বরে বললো।

আমার মনে হলো, এ কথা শোনা থেকে মর্মন্তুদ আর কিছু নেই। মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'মদ-টদ খেয়েছিস ?'

মেয়েটি নীরব। আমার ইচ্ছা হলো বলি, মিঃ বাগচি যেন ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করেন। তার আগেই তিনি ধমকিয়ে উঠলেন। মেয়েটি বললো, 'একটু বীয়ার খেয়েছি।'

অভূতপূর্ব ! তার থেকেও বেশী, আমার কানে অবিশ্বাস্য ঠেকলো। মেয়েটি ভয়ে মিথ্যা বলছে না তো ? মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর নাম কী ?'

'সুপ্রিয়া কর্মকার !' মেয়েটি বললো।

মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কার সঙ্গে এখানে এসেছিস ?'

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। আমি সেই বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালাম। সে অপলক উৎসুক চোখে মেয়েটির দিকে দেখছে।

মিঃ বাগচি বললেন, 'বললে তোকে আমি ছেড়ে দেবো, মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবি। তা না হলে, কোর্ট থেকে তোকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবে।'

সুপ্রিয়া নামে মেয়েটি তথাপি নিশ্চুপ, মাথা নীচু করে রইলো। মিঃ বাগচি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ট্রেনিং দেখেছেন ? আপনারা হয় তো কাগজে এদের নিয়ে পিটিফুল স্টোরি কভার করতে পারেন, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।'

আমি বললাম, 'আপনি তো ওর নাম ঠিকানা পেয়ে গেছেন সেখানে পাঠিয়ে দিলেই হয় ?'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'অমলবাবু আই অ্যাম এ পুলিসম্যান নট এ মিশনারি। আমাকে আইন মাফিক কাজ করতে হয়।'

বলেই তিনি ডাকলেন, 'রামু সিং !'

রামু সিং হাতজোড় করে এগিয়ে এলো, বললো, 'বলেন স্যার।'

'এ মেয়েটা কার মারফত এসেছে ?'

রামু সিং হাতজোড় করেই বললো, 'কী করে বাতাবো স্যার। আমার হোটেলঘর খোলা আছে। এরা সব কলকাত্তা বেড়াইতে আসে, ঘর নেয়, থাকে, চলে যায়। কার সাথে আসে, কী করে, আমি কী করে জানবো ?'

আমি লোকটার শান্ত অমায়িক কথা শুনে হতবাক্ হয়ে গেলাম। মিঃ বাগচি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'শুনলেন তো ? ব্রথেল নয়, এটা একটা হোটেল। কারা আসছে, কোথা থেকে আসছে, কে জানে ?'

আমি রামু সিং-এর নির্বিকার মুখের দিকে তাকালাম। লোকটাকে আমার ভয়াবহ মনে হলো, অথচ কী শান্ত আর মুখে অমায়িক হাসি।

মিঃ বাগচি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ওর নাম আর ঠিকানা যা বললো, দুটোই মিথ্যা।'

boiRboi.net

আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। ও মিঃ বাগচির কথার কোনো প্রতিবাদ করলো না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। মিঃ বাগচি বললেন, 'আপনি ওর সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে চান?'

আমি একটু চমকিয়ে উঠে বললাম, 'তাতে কিছু লাভ হবে?'

'আমার বিশ্বাস, হবে না।' মিঃ বাগচি বললেন, 'সত্যি কথা ওর কাছ থেকে বের করা কঠিন। কারণ ও জানে, আবার একদিন ও ফিরে আসবে। ওর লোকদের হাতেই ওকে পড়তে হবে। অবিশ্যি আমরা জেনে যাবো সবই। আগামীকাল বা যেদিনই হোক, কোর্টে প্রডিউস করলেই, ওর হয়ে কেউ আসবে, আর ফিকটিশাস্ কোনো স্টোরি জাজকে শোনাবে। মেয়ে হারিয়ে গেছলো, বা কেউ ফুসলে নিয়ে এসেছিল, এইরকম নানান কিছু।'

বলে তিনি তাঁর হাতের ঝকঝকে ছপ্‌টি দিয়ে মেয়েটির ডানায় খোঁচা দিয়ে বললেন, 'যা, ওদিকে গিয়ে দাঁড়া।'

সুপ্রিয়া, বা যাই ওর নাম হোক, মেয়েটা মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে মেয়েদের দলের দিকে এগিয়ে গেল। এখনো ওর চোখ থেকে জল পড়ছে। শ্যামলী এক কিশোরী। ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, যৌবনের জোয়ার উদ্যত হয়ে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনো ওর সর্বাঙ্গে। প্রশ্নাতীতভাবেই মেয়েটি মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের ঘরের বালিকাদের, অথচ কী আশ্চর্য বিপরীত! ওর কি সত্যি মা আছে? সে কেমন স্ত্রীলোক? কেমন তার প্রাণ?

দারিদ্র্য মহাপাপ। তার থেকেও বড় পাপ যুদ্ধ। বইয়ে পড়েছি, ইওরোপে যুদ্ধের সময় সামান্য খাবারের জন্য, মা তার ন-দশ বছরের মেয়েকে বিজেতা সৈনিকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সে দৃশ্য যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি মর্মান্তিক। যুদ্ধের কারণে মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তরের একই চিত্র আমাদের দেশে। কিন্তু সে সবই ভয়াবহ দুঃসময়ের ইতিহাস। সুপ্রিয়াদের জীবনে ভয়াবহ দুঃসময় কি চিরকালীন? আমাদের হাজার বছরের পূর্বের বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের কবিরা, তাঁদের কবিতায় দারিদ্র্যের অসহায়তার কথা লিখে রেখে গিয়েছেন। বৃষ্টিতে ঘরের দাওয়া ভাঙছে, মাথার চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে। মা শয্যাশায়ী, শিশুটি খিদেয় কাঁদছে। হাজার বছর পরেও আমাদের দেশে সে-চিত্র অম্লান। দারিদ্র্যের করালগ্রাস চারদিকে হাঁ করে রয়েছে তবু তার বিরুদ্ধে মানুষ সর্বদা সংগ্রামরত। প্রশ্ন জাগে, সুপ্রিয়া নামে মেয়েটির মা, এই বয়সেই মেয়েকে এমন একটি জীবিকার দিকে ঠেলে দিয়েছে কেমন করে?

এ সবই হয়তো আমার ভাবাবেগ-আশ্রিত জিজ্ঞাসা। মানুষের প্রতি মুহূর্তে বাঁচার বিড়ম্বনার কাছে, এ জিজ্ঞাসা তুচ্ছ হতে পারে। আমার জীবনের বাস্তবতা দিয়ে সুপ্রীয়াদের জীবনের বাস্তবতার পরিমাপ যাচাই করা সম্ভব না। তবু জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, বাঁচার জন্য এই নাবালিকাকে গর্হিত পথে ঠেলে দেওয়া কেন? এ কি কোনো বিশেষ মনোবৃত্তি? আর কি কোনো পথই ছিল না?

'অমলবাবু, খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন দেখছি।' মিঃ বাগচি আমার পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে হেসে বললেন, 'এসব নিয়ে বেশী ভাববেন না। আপনার যা জানবার

boiRboi.net

আমাকে বলবেন, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে কিছু বলতে পারবো। অবাক হবেন না। আপাতত চলুন, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।'

দেখলাম, ইতিমধ্যেই মেয়েদের এবং পুরুষদের দুটি ভিন্ন লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। পুরুষরা অধিকাংশই নতমুখ, বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন। মেয়েদের মধ্যে সে ভাবটা তেমন নেই। আমি স্বীকার না করে পারছি না, কোনো কোনো মেয়ে রীতিমতো দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। তাদের স্বাস্থ্য রূপ বেশ-বাস, যে কোনো আধুনিক তরুণীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কী এদের পরিচয়, কারা এরা ? সমাজের কোন্ স্তর থেকে এরা এসেছে ? আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি, কোনো কোনো মেয়ে নিজেদের মধ্যে এখনো হাসাহাসি করছে। বয়স সঠিক অনুমান করা সম্ভব না। বোধ হয় আঠারো থেকে ছত্রিশের মধ্যে সকলের বয়স, ব্যতিক্রম কেবল ফ্রক পরা সুপ্রিয়া। অবিশ্যি ফ্রক পরা মেয়ে আরো রয়েছে। ব্যতিক্রমের মধ্যে আরো দু-তিনজনকে দেখলাম, যাদের দেখলে মধ্যবয়স্কা নার্সদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ঠিক দেহোপজীবিনী বলে মনে হয় না।

মিঃ বাগচির নির্দেশে, দুটি দলকেই সার বেঁধে, প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বাইরে।

মিঃ বাগচি আমাকে ডাকলেন, 'আসুন অমলবাবু।'

বাইরে এসে দেখলাম, দুটি আলাদা ভ্যানে মেয়ে আর পুরুষদের তোলা হলো। আমি মিঃ বাগচির সঙ্গে তাঁর জীপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এদের এখন কোথায় পাঠাচ্ছেন ?'

মিঃ বাগচি বললেন, 'হাজতে। আমাদের কাগজপত্র তৈরি হয়ে গেলেই, কোর্টে প্রডিউস করা হবে। সেটা আগামীকালই হতে পারে, দু-একদিন দেরিও হতে পারে। অবিশ্যি জামিনযোগ্য বিবেচিত হলে, কেউ কেউ জামিনও পেতে পারে, কিন্তু কেস হবেই।'

ভ্যান দুটি এবং অন্যান্য পুলিসের গাড়ি চলে গেল। আমি মিঃ বাগচির সঙ্গে তাঁর জীপে উঠলাম। জীপ চলতে আরম্ভ করলো। মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বলুন, আপনি যা জানতে চান, তার কিছু কি এখানে পেলেন ?'

আমাকে স্বীকার করতেই হলো, 'আদৌ কিছু না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে চমকপ্রদ ঘটনার মতো। জানার মতো কিছুই আমি পাই নি। ওই বাচ্চা মেয়েটির নাম যা-ই হোক, এটা একটা পিটিফুল স্টোরি হতে পারে। ব্যাকগ্রাউণ্ড কিছুই জানা গেল না। আপনি নিজেই বললেন, মেয়েটি যে সত্যি কথা বলছে, তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।'

মিঃ বাগচি বললেন, 'ঠিকই বলেছি, নাম ধাম কেউ সত্যি বলে না। তবে ধরে নিতে পারেন, ও সোনারপুর থেকে হয়তো আসে নি, এসেছে চম্পাহাটি থেকে, অথবা ডায়মণ্ডহারবার থেকে। কিংবা বারাকপুর বা বারাসত বা বনগাঁ সাবডিভিশনের কোথাও থেকে। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই এরা কোথাও থাকে। কলকাতার মধ্যে, খুব কাছে পিঠে থেকেও আসতে পারে। আর এটা চালানো হয় খুব অর্গানাইজড্ ভাবে।'

boiPhoi.net

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সে অর্গানাইজেশনটা কী-রকম ?'

'আপনাকে আগেই বলেছি, এগুলো পার্মানেণ্ট অর্থাৎ যাকে বলে রেসিডেন্সিয়াল ব্রথেল নয়।' মিঃ বাগচি বললেন, 'যেমন সোনাগাছি বা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, হাড়কাটা গলি যাকে বলে। অবিশ্যি বেশ্যাবৃত্তির আয়ের একটা বড় অংশ একশ্রেণীর লোক ভোগ করে, যারা সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোক। আর এরাই হলো অর্গানাইজার। এদের আড়কাটি আর দালালরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যবসার জন্য মেয়ে জোগাড়ের ফিকিরে। আপনি দু-একটি স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করেছিলেন কী না জানি না, যারা আজ ধরা পড়েছে। এদের বলে কুটনী, ফিমেল প্যাণ্ডার। ওই যে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখলেন, ওকে নিশ্চয়ই কোনো কুটনী সংগ্রহ করে এনেছে। বেশ্যা-বৃত্তির আয়ের একটা মোটা অংশ ভোগ করে বাড়িওয়ালা, দালাল আর কুটনীরা। ইনকাম বেশ ভালোই, ফলে সারা দেশে এরা জাল পেতে রেখেছে।'

আমি মিঃ বাগচিকে বললাম, 'ফিমেল প্যাণ্ডারদের আমি বোধহয় চিনতে পেরেছি। তাদের দেখে অনেকটা নার্সের মতো মনে হয়েছিল। একজনকে দেখেছি, ছোট মেয়েটিকে নানারকম ইশারা করতে।'

'ঠিকই দেখেছেন।' মিঃ বাগচি বললেন, 'সেই কুটনীরই সংগ্রহ নিশ্চয় বাচ্চা মেয়েটা। বেশ্যাবৃত্তি এক জিনিস, আর এই ব্যবসার গোটা চেহারাটা আলদা। ডাইরেকট্ বিজনেস বলে, এ লাইনে কিছু নেই। মিডলম্যানরা না থাকলে, অনেক মেয়েরেই এ লাইনে আসা সম্ভব না। এ সবই আপনি আস্তে আস্তে জানতে পারবেন। আজকের ঘটনাটা একরকম চমকপ্রদই বলা যায়, কিন্তু সমস্ত বিষয়টা আরো ডীপ রুটেড, আর বহু বিস্তৃত। রকমারি তার চেহারা। আজ আপনাকে আমি একটা ঘটনা দেখালাম মাত্র, এর পরে আপনাকে আমি আরো অনেক জায়গায় নিয়ে যাবো।'

চলতে চলতেই তিনি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিলেন। গাড়ি তৎক্ষণাৎ বাঁ দিকে ব্রেক কষে দাঁড়াল। আমি মিঃ বাগচির কথায় অন্যমনস্ক থাকার দরুন খেয়াল করি নি, আমরা পার্ক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে চলেছি। গাড়ি দাঁড়ানো মাত্র, ফুটপাথের ওপর দাঁড়ানো সেপাইটি চকিতে সটান হয়ে, বুট ঠুকে সেলাম জানালো। সেপাইয়ের পাশেই একটি তরুণী দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া। মিঃ বাগচি আঙুলের ইশারায় সেপাইটিকে কাছে ডাকলেন। সেপাই লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া হুয়া, লেড়কি কৌন হ্যায় ?'

সেপাই সসম্ভ্রমে বললো, 'সাব, আধা ঘণ্টাতক্ লেড়কি ইধার ঠারীতি, হম উস্‌কো পুছতা রহা, কিস্ লিয়ে ঠরীতি।'

মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'লেড়কি কো সাথ্ কোই আদমি নহি ?'

সেপাই বললো, 'হ্যায়, লেড়কিকো পিছে খাড়া হুয়া।'

আমি দেখলাম, মেয়েটির পিছনেই, খুব সাধারণ জামা প্যাণ্ট পরা একটি তরুণ, অসহায় উদ্বেগে, এদিকেই তাকিয়ে আছে। সেপাই আবার বললো, 'সাব, মুঝে মালুম হোতা, লেড়কি ঝুট বাত বোল্‌তি।'

'লেড়কি কেয়া বোল্‌তি ?' মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন।

সেপাই বললো, 'কৌন এক আদমি আনেবালা, ইধার উসকো ঠারনে বোলা।'

boiRboi.net

মিঃ বাগচি মেয়েটির দিকে তাকালেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি প্রাইভেট গাড়ি মিঃ বাগচির জীপের আগে এসে দাঁড়ালো। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে এক ভদ্রলোক ডাকলেন, 'এই তপন, এই যে এদিকে।' বলতে বলতেই তিনি দরজা খুলে নামলেন, এবং মেয়েটির সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী রে চন্দনা, ওরকম জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। তোর বউদি যতো নষ্টের গোড়া, দ্যাখ্ এখন গাড়ির মধ্যে বসে হাসছে।'

দেখলাম সামনের গাড়িতে, একটি মহিলাও বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বসে আছেন, যদিও আমরা তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ির ভদ্রলোক সেই উদ্বিগ্ন তরুণ তরুণীর সঙ্গেই কথা বলছিলেন। তিনি বেশ অবাক হয়েছেন, এবং তাঁর পরিচিত তপন বা চন্দনার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে, আমাদের গাড়ির দিকে তাকালেন। মিঃ বাগচি হাত তুলে বলে উঠলেন, 'একস্‌কিউজ মী জেণ্টলম্যান, একবার এখানে আসবেন?'

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি চোখে একবার সেপাইয়ের দিকে তাকিয়ে, মিঃ বাগচির জীপের কাছে এগিয়ে এলেন। মিঃ বাগচি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু মনে করবেন না, ছেলে মেয়ে দুটি কি আপনার পরিচিত?'

ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই, কেন বলুন তো?'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'ওরা বোধহয় কলকাতার বাইরে থেকে এসেছে?'

ভদ্রলোক অবাক স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

মিঃ বাগচি বললেন, 'গোলমালটা সেখানেই হয়েছে। ওরা এখানে আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এ রাস্তায় নানারকম ব্যাপার হয়, জানেন তো? সেপাই কিছু সন্দেহ করে, ওদের কিছু জিজ্ঞেস করেছে, ওরা খুব ঘাবড়ে গেছে। আপনি ওদের নিয়ে চলে যান।'

ভদ্রলোক রুষ্ট স্বরে বললেন, 'তার মানে আপনি বলতে চান, এ রাস্তায় রাত্রে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারবে না?'

মিঃ বাগচি শান্তভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। সেই জন্যই আপনাকে আমি এ রাস্তা আর তার আশপাশের ব্যাপারটা একটু ভাবতে বলছি। ভদ্রলোক ছোটলোক তো গায়ে লেখা থাকে না। আমি না এসে পড়লে হয়তো সেপাই এতক্ষণে ওদের থানায় টেনে নিয়ে যেতো, সেটা আরো খারাপ হতো। নির্দোষ বেচারিরা ফ্যাসাদে পড়তো। আমাকে ভুল বুঝবেন না।' বলে তিনি সেপাইকে হুকুমের স্বরে বললেন, 'ইনলোগ্‌কো ছোড়কে, আপ আপনা কাম দেখিয়ে।'

সেপাই তৎক্ষণাৎ আর একবার সেলাম ঠুকে, রাস্তার অন্য পাশে পা বাড়ালো। মিঃ বাগচি ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলেন। আমার কাছে ব্যাপারটা এখনো তেমন পরিষ্কার না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আসলে, ঘটেছে কী?'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'একটি ভুল। মেয়েটি কলকাতার বাইরে থেকে এসেছে, বোধহয় গ্রাম্য। এদিকে সাজগোজ করেছে, বেণী দুলিয়েছে, নাকে নাকছাবি। ছেলেটিকে দেখে মনে হলো, নিতান্ত গোবেচারা। কিন্তু সেপাইয়ের সন্দেহ হলো, মেয়েটি আসলে স্ট্রীট গার্ল, শিকার পাকড়াবার জন্য সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, আর

boiRboi.net

ছেলেটিকে শিখণ্ডী হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এমন ঘটনা, এসব এলাকায় নতুন না, প্রায়ই ঘটে। সেপাইটাকেই বা দোষ দিই কী করে? ভদ্রলোকের উচিত হয় নি, ছেলেমেয়ে দুটিকে পার্ক স্ট্রীটে অপেক্ষা করতে বলা, বিশেষ করে এরকম রাত্রে।'

আমি বললাম, 'এ তো মশাই বড় মুশকিলের ব্যাপার।'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'সেটা তো আমিও স্বীকার করছি। অথচ সত্যিকারের শিকার যারা খুঁজছে, তাদের চলাফেরা পোশাক-আশাক আর ঠাট ঠমক দেখে, তাদের হয়তো চেনাই যাবে না। সেপাই হয়তো উল্টে তাদের সেলাম করে মেমসাব্ বলবে।' বলতে বলতে তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন।

আমি বললাম, 'এটা আমাদের জীবনের জাতীয় ট্র্যাজেডি।'

'তবু কিন্তু আমি সেপাইটাকে পুরোপুরি দোষ দিতে পারছি না।' মিঃ বাগচি বললেন, 'মধ্য কলকাতার এসব অঞ্চলে, রাস্তায় ময়দানে কীভাবে দেহের ব্যবসা চলে, আপনার কি কোনো অভিজ্ঞতা নেই?'

একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। যদিও আমি সেসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মতো কোনো জায়গায় দু-একবার দালালের পাল্লায় পড়েছি। কোনো কোনো মেয়ের চোখের ইশারাও দেখেছি। বললাম, 'কিছু কিঞ্চিৎ, তবে সেটাকে অভিজ্ঞতা বলা যায় না।'

'কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারেন না, আশেপাশে এ ব্যবসা নানান ভাবে ছড়িয়ে আছে।' মিঃ বাগচি বললেন।

বললাম, 'তা পারি না।' বলে আমি কবজি তুলে ঘড়ি দেখে বললাম, 'আপনি কি আমাকে একটু বাড়ি অবধি লিফট্ দেবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

মিঃ বাগচি আমার ঠিকানা জেনে পেঁছে দিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, সুযোগ পেলেই আপনাকে ডাকবো।'

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে, জীপ থেকে নেমে, ফ্ল্যাটের চাবির জন্য ব্রহ্মচারীদের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে এখনো সেই সুপ্রিয়া নামে বালিকাটির চেহারা ভাসছে।

*

কয়েক দিন ধরে মিঃ বাগচির সঙ্গে নিশাচরের মতো ঘুরে, আমার কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। কোনো কোনো অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বিকৃত আর বীভৎস। মিঃ বাগচি আমাকে খিদিরপুরের এক নপুংশকদের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ্যাবৃত্তিকে অপরাধ জগতের পর্যায়ে ফেলা যায় কী না, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। কিন্তু নপুংশক অর্থাৎ হিজড়েদের ব্যাপারটা নিতান্তই অপরাধ জগতের বিষয়। আমার সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা পতিতাবৃত্তিকে একরকম বুঝি। নপুংশকদের যৌনাচার বিকৃত আর বীভৎস ছাড়া কিছু মনে হয় নি। এর যারা পৃষ্ঠপোষক, তারাও নিশ্চয়ই এক শ্রেণীর অপরাধী। মিঃ বাগচির মুখেই শুনেছি, এরা শিশু-পুরুষকে অপহরণ করে, তাদের নপুংশক তৈরি করে। আর তা করে অত্যন্ত বীভৎস উপায়ে, যার ফলে অধিকাংশ শিশু-পুরুষই মারা যায়।

boiRboi.net

আমার বই পড়া বিদ্যায়, পুরুষ এবং নারীর সমকামিতা বিষয়েও একটা ধারণা আছে। সেটাও বিকৃত রুচির ব্যাপার, তথাপি তার কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নপুংশকদের যৌনাচার, যা নেই তার জন্যই এক ধরনের উন্মত্ততা ছাড়া আমার আর কিছু মনে হয় নি। অবিশ্যি সমীক্ষার ক্ষেত্রে, এই শ্রেণীর অভিজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন আমার নেই! তা ছাড়া, এ কদিনে আমার আরো একটা অভিজ্ঞতা হলো, পুলিসের সাহায্য নিয়ে আমার মূল লক্ষ্যে পেঁছানো সম্ভব না। স্থায়ী পতিতালয়-গুলোতে আমি যখনই গিয়েছি, তখনই স্থানীয় থানার পুলিস অফিসারের সঙ্গে গিয়েছি। তার ফল হয়েছে বিপরীত। মেয়েরা পুলিসকে ভয় পায়, আদৌ সত্যি কথা আমাকে কেউ বলে নি। তারা আমাকে যথেষ্ট খাতির করেছে, সবটাই এক রকমের ভয়ে আর ভক্তিতে। মনের কথা কেউ বলে নি।

আমি অতঃপর মনে মনে স্থির করলাম, মিঃ বাগচির সাহায্য নিলে আমার চলবে না। হয় খরিদ্দারের অথবা আমার স্ব-ভূমিকাতেই তাদের কাছে আমাকে উপস্থিত হতে হবে। আমার দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতেই একজন আমাকে আলাপ করিয়ে দিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকই তাঁকে আমি বলবো। তিনি একটি বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে। বিবাহিত, বয়স তিরিশের কাছাকাছি। পেশা ট্রান্সপোর্ট বিজনেস। কিন্তু পতিতালয়ে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। হয়তো এর মধ্যে তাঁর রুচিবিকার কিছু থাকতে পারে, সেসব আমার বিচার্য নয়। আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় দেখলাম পতিতালয় যেন তাঁর স্ব-গৃহ। মেয়েদের আচরণও সেই রকম, অতি আপনজনের মতো। মুহূর্তের মধ্যেই আমার চোখের সামনে এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেল।

ভদ্রলোকের নাম সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে বলে দিলদরিয়া, তিনি সেইরকম লোক। তার থেকে বেশী, আমার মনে হলো তিনি হৃদয়বান ব্যক্তি। আমাকে প্রথম দিন থেকেই তিনি 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন, এবং জানিয়ে দিলেন, 'এ ব্যাপারে তোমাকে কলকাতার সমস্ত অন্ধি-সন্ধি দেখিয়ে দেবো। তুমি যা জানতে চাও, সব জানতে পারবে।'

কথাগুলো মিথ্যা না। কয়েক দিনের মধ্যে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। মিঃ বাগচির কথাও একদিক থেকে সত্যি। এ পেশা যে কতোভাবে ছড়ানো, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি উৎকণ্ঠার বিষয়। কলকাতার অত্যন্ত অভিজাত পল্লীর, অভিজাত ফ্ল্যাট বাড়িতেও এ ব্যবসা চলেছে। পাশের বাড়ির লোকও তা জানতে পারে না। সন্দেহ করবার কোনো অবকাশও নেই। গৃহস্থ, এমন কি সম্পন্ন বধূ, কলেজের ছাত্রী, আরো বিবিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ ও পরিবারের মেয়েদের সংখ্যা আমাকে অবাক করেছে। ভীত করেছে যৌন ব্যাধির দুরন্ত প্রসার। দারিদ্র্য একটি মূল কারণ, কিন্তু তা জেনেও, নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব।

তথাপি আমি দেখলাম, স্থায়ী আর উচ্চপর্যায়ের পতিতালয়গুলিকে নিয়েই আমার লেখা উচিত। প্রকৃত চিত্র সেখানেই। আমি চিফ রিপোর্টার আর এডিটরের সঙ্গে কথা বলে আমার প্রথম কিস্তি লিখে ফেললাম, ছাপা মাত্রই, তা নিয়ে নানান আলোচনা আর বিতর্ক শুরু হলো।

boiRboi.net

কিন্তু যথার্থরূপে ভাগ্যবাদী না হয়েও, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তখন আমার আন্তর্যামী, অদৃশ্যে মুখ টিপে হাসছিলেন। অন্যথায় আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটতো না।

*

ঘটনাটা ঘটলো আমার পতিতা বিষয়ে দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশের পরেই। অনসূয়াদের বাড়ি বালিগঞ্জ থেকে ফেরার পথে, আমি পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকেছিলাম। অনসূয়া আমার লেখা পড়ে কিছুটা বিরক্ত আর ঈর্ষাবোধ করছে। আমার এই লেখার জন্য একটা সামাজিক লজ্জাও ওর মনে রয়েছে। ওর একেবারেই ইচ্ছা না, আমি এসব বিষয়ে লিখি।

অনসূয়াকে দোষ দিতে পারি না, এর মধ্যে রয়েছে আমাদের নীতিগত সংস্কারের প্রশ্ন। যদিও সেটার মূল্য তেমন নেই। আমার হাসি পাচ্ছিল, অনসূয়ার ঈর্ষা দেখে।

রেস্তোরাঁয় বেয়ারা এসে আমার টেবিলের সামনে দাঁড়ালো। আমি তাকে খাবার মেনু আনতে বললাম। বেয়ারা জিজ্ঞেস করলো, 'কুছ ড্রিংকস্ ?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম 'না।'

এটা রেস্তোরাঁ-কাম-বার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁটি পার্ক স্ট্রীটের একটু ভিতর দিকে, নিরিবিলি পাড়ার মধ্যে। পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে অনেকে আসে। প্রেমিক প্রেমিকারাও এখানকার মৃদু আর নরম আলোর পরিবেশে নিজেদের সচ্ছন্দবোধ করে। পান ভোজন এবং কূজন গুঞ্জনও ভালো জমে। আমি চোখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। প্রায় প্রত্যেকটি কোণেই জোড়া জোড়া বসে আছে, পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে। হঠাৎ একটি টেবিলের ওপর আমার চোখ পড়তেই একটু থমকিয়ে গেলাম।

একটি মেয়ে একা একটি টেবিলে বসে আছে। সেটা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার না। হয়তো সঙ্গীর প্রতীক্ষায় আছে। সামনের গেলাসে কিছু পানীয়ও রয়েছে, দেখে মনে হয় কোকাকোলা। কেন না, আমি জানি, কলকাতার কোনো বারেই একলা কোনো মহিলাকে মদ্য পরিবেশন করা হয় না। কিন্তু মেয়েটি এমন অপলক চোখে আমার দিকে কী দেখছে? আমি মনে মনে অবাক হলাম, কারণ মেয়েটির মুখ আমার অচেনা। ভাবলাম হয়তো অন্য কারোর দিকে দেখছে। ভেবে আমার আশেপাশে পান-ভোজনে ব্যস্ত টেবিলগুলোর দিকে তাকালাম, এবং তারপর মেয়েটির দিকে। আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে মেয়েটি এবার ঠোঁটের কোণে একটু হাসলো, এবং তার অপলক কাজল কালো চোখে যেন চকিতের জন্য একটি ইশারা খেলে গেল।

মেয়েটির বয়স আমি ঠিক অনুমান করতে পারছি না, কিন্তু কুড়ি-একুশের বেশী কখনোই না। ঘাড়ের একটু নিচে অবধি ছাঁটা চুল খোলা। দেখলেই বোঝা যায় চুল বেশ ফাঁপানো আর ঢেউ খেলানো। তেমনি রূপসী না হলেও, চোখ মুখ ভালো, একটা বিশেষ চটক আছে। নাক তেমন চোখা না, চোখ দুটোও তেমন আয়ত না, ঠোঁট ঈষৎ মোটা, হাল্কা রঙ লাগানো। গায়ে হাই কলার হাফ হাতা রঙীন ছাপা জামা, নিচে বেলবট পরা। স্বাস্থ্যের দীপ্তি চোখে পড়ার মতো।

boiRboi.net

তা সে মেয়েটি দেখতে যেমনই হোক, আমার দিকে এভাবে তাকানোর কারণ কী? দেখছি টেবিলের ওপরে একটা ফোমের লেডিজ ব্যাগ রয়েছে। আমার দিকে চোখ রেখেই, সে ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ালো, এবং আবার যেন তার চোখের তারা দুটো কেঁপে উঠে, একটা ইশারার ভঙ্গী করলো। ঠোঁটের কোণে সেই রকম হাসি। আশ্চর্য। আমি চোখ নামিয়ে খাবারের মেনুর দিকে তাকিয়ে স্মৃতি হাতড়ে মুখটি চেনবার চেষ্টা করলাম। আমার কলেজ জীবনের বান্ধবীদের মুখগুলো একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। যদিও তা অর্থহীন, কারণ আমার কলেজ-জীবনের বান্ধবীরা কেউ আর ওই মেয়েটির বয়সী নেই। অন্যান্য পরিচিত মেয়েদের মুখও মনে করবার চেষ্টা করলাম। না, মিলছে না। আমি মেয়েটির দিকে আর না তাকিয়েও চেহারাটা মনে করতে পারছি। যাকে বলে অ্যাপ্লিসাইজ, টেবিলের মেয়েটিকে অনেকটা সেই রকম মনে হচ্ছে। অবাঙালী হতে পারে। অথবা মেয়েটি কি সেই জাতীয় নাকি, যারা এ সময়ে শিকার খুঁজে বেড়ায়? অসম্ভব! সেরকম কোনো মেয়ের পক্ষে এ রেস্তোরাঁয় ঢুকে শিকার খোঁজার সাহসই হবে না।

আমি মেয়েটিকে ভোলবার চেষ্টা করলাম। যাকে চিনি না, তাকে চেনবার ব্যর্থ চেষ্টা করা অর্থহীন। মেনু খুঁটিয়ে না দেখেই আমি মোটামুটি খাবার ঠিক করে ফেললাম। মুখ তুলে হাতের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে বললাম, 'দো তন্দুরি রোটি, এক পনীর বাটার মসলা।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল। একটা অদম্য ইচ্ছা আর কৌতূহল থাকলেও আমি মেয়েটির টেবিলের দিকে না তাকিয়ে বিপরীত দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার নাকে একটা সস্তা পারফিউমের গন্ধ পেলাম, আর তার পরেই আমার টেবিলের ওপর একটি ছায়া পড়লো।

আমি মুখ ফিরিয়ে অবাক চোখে দেখলাম, সেই মেয়েটি উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। ওর ঠোঁটে বিব্রত হাসি, একটা অপ্রস্তুত লজ্জা দুই চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গীতে একটা লাস্য। না, ও হাত তুলে আমাকে নমস্কার করলো না, ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

আমি আমার অভ্যাসবশত উঠে দাঁড়ালাম, বিব্রত বিস্ময়ে বললাম, 'মাফ করবেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। কোথায় আপনাকে দেখেছি বলুন তো?'

মেয়েটি অবাক হেসে বললো, 'এ কি, আপনি উঠে দাঁড়ালেন কেন? বসুন বসুন।'

একজন মহিলাকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলে উঠে দাঁড়ানোটাই ভদ্রতাসূচক নিয়ম বলে জানি, অতএব একথার কোনো জবাব থাকতে পারে না। তা হলে, অতঃপর মেয়েটিকে আমাকে বসতে বলতে হয়। কিন্তু মেয়েটিই তার আগে বলে উঠলো, 'আমি একটু বসছি, অ্যাঁ?'

বলার ভঙ্গীটা অনেকটা সরল গ্রাম্য ধরনের, মেয়েটিকে এক নজরে দেখে যা ভাবা যায় না, এবং বলেই সে আমার উলটো দিকের সামনে বসে পড়লো। ব্যস্তভাবে হেসে বললো, 'বসুন না, আপনি বসুন। আমি বলছি, আপনি আমাকে কোথায় দেখেছেন।'

আমি অবাক আর অস্বস্তি বোধ করে চোখ তুলে একবার আশেপাশে দেখে নিলাম।

boiRboi.net

প্রথমেই আমার চোখ পড়লো, বার কাউণ্টারের কাছে দাঁড়ানো হেড স্টুয়ার্ড মিঃ ভট্টাচার্যের দিকে। মধ্যবয়সী মিঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। কিন্তু উনি যেন কেমন রুষ্ট বিরক্ত চোখে মেয়েটিকে দেখছিলেন, এবং আমার সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। আশেপাশের কেউ কেউ ঘটনাটা সোজা বা আড় চোখে লক্ষ্য করছিল। অথচ আমি খানিকটা নিরুপায় ভাবেই, নিজের আসনে বসলাম, এবং মেয়েটিকে এভাবে উপযাচিকা হয়ে বসতে দিতে আপত্তি করতে পারলাম না। কিন্তু হেড স্টুয়ার্ড মিঃ ভট্টাচার্যের চোখে এমন রুষ্ট বিরক্তি কেন? আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটু ভদ্রতা করেও হাসলেন না।

মেয়েটি হেসে আমার চোখের দিকে তাকালো, তারপরে ঘাড় বাঁকিয়ে একটা ভঙ্গী করে, ওর ফোমের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখলো, বললো, 'বাইরে কি খুব মেঘ করেছে। একটু আগে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।'

কথাটা মিথ্যা না। আমি এখানে ঢোকবার আগেই ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, একটি অপরিচিতা মেয়ে, যেচে এসে আমার টেবিলে বসে, এতো অনায়াসে কেমন করে বাইরের আবহাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। এখনো পর্যন্ত আমি ওর কোনো পরিচয়ও জানি না। আমি গম্ভীরভাবেই বললাম, আপনি যেখানে আছেন, আমিও সেখানেই আছি। বৃষ্টি হচ্ছে কী না, তা কী করে বলবো?'

মেয়েটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বললো, 'আপনি খুব রেগে যাচ্ছেন। তা তো হবেই, এভাবে—আসলে, আপনি একটু আগেই ঢুকলেন তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। তবে আপনি তো ভেজেন নি। বৃষ্টি নামলে ঠিক ভিজে যেতেন। আমি একটা বোকার বেহদ্দ মেয়ে। কিন্তু আপনি মাইরি আমাকে আপনি করে বলবেন না, আমার খুব খারাপ লাগছে।'

মেয়েটার মুখে 'মাইরি' শব্দটি শুনে আমি হতবাক্ হয়ে গেলাম। আমি ওর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, আর আমার চোখে পড়লো, ওর বাঁ গালের কাছে, চোখের একটু নিচেই একটা কাটা দাগ। আর এই মুহূর্তেই ওর মুখের গোটা চেহারাটা যেন আমার কাছে বদলিয়ে গেল। ওর মুখে একটা সুন্দর মেয়েলী চটক তো আছেই, যেটাকে কিছুটা চটুলতাই বলা যেতে পারে। এখন মনে হলো, একটা বন্যতাও ওর মুখে আছে। শুধু মুখেই না, গোটা শরীরেই বন্যতা যেন ছড়ানো। ওর গ্রীবা একটু দীর্ঘ, ঘাড় দোলানোর মধ্যেও একটা মরালীর ভঙ্গী ফুটে উঠছে। কিন্তু 'মাইরি' উচ্চারণ করার মানে কী? ও কোন্ সমাজ থেকে আসছে? ওর চুলের ছাঁট, পোশাক-আশাক, কোনো কিছুর সঙ্গেই, এরকম একটা ইতর দিব্যি গালা মানায় না।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে, অবিকল একটা মরালীর মতোই, ওর সুগঠিত বুক যেন এগিয়ে এলো, ঘাড় ঈষৎ কাত করে ঠোঁটের কোণে হাসলো। আমি মনে মনে একটু হকচকিয়ে গেলাম। এই মুহূর্তেই আমি অনুভব করলাম, ওর মধ্যে একটা ভীষণ আকর্ষণী ক্ষমতা আছে, যা একান্তই রমণীর আকর্ষণ। আমি মনে করতে পারি না, কোনো মেয়ে আজ অবধি ঢেউয়ের মতো এগিয়ে দেওয়া বুকের ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আমার ভিতরে এমন আকস্মিক আলোড়ন তুলতে পেরেছে কী

না। কিন্তু এসব কথা ভাবলে চলবে না। আমি যথেষ্ট গম্ভীর আর শক্ত হবার চেষ্টা করলাম, অথচ কথা বললাম অপ্রস্তুত জড়তা নিয়ে, 'কোনো অচেনা মহিলাকে আমি আপনি ছাড়া বলতে পারি না।'

'মহিলা!' বলেই মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠতে গিয়ে, তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিল। হাসিটা সামলিয়ে নিয়ে বললো, 'মহিলা বলছেন আপনি আমাকে? আমি কি মহিলা নাকি? ওসব তো বাসে মেয়েদের সিটের ওপর লেখা থাকে, আর সিনেমা-থিয়েটার পাইখানা পেচ্ছাবখানায়!'

আধুনিকা মেয়েটির 'মহিলা' সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা! বাসে আর সিনেমা থিয়েটারের লেখা? ওর কথাগুলো আমার রীতিমতো অশালীন বোধ হলো। ওর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নিজেকে ও মহিলা ভাবতেই শেখে নি। তার মানে কী? ও নিজেকে কী ভাবে? আমি ওর সামাজিক আর শ্রেণী চরিত্রটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। অথচ, কী আশ্চর্য, অশালীন মনে হলেও, ওর এই সহজ আচরণ আর অনায়াসে হেসে ওঠা, আমার ভালো লাগছে। আমি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করছি, যা আমি কিছুতেই স্বীকার তো করতেই পারি না। এমন কি ভাবে ভঙ্গীতেও তা বুঝতে দিতে চাই না। বললাম, 'আমি আপনার নাম ধাম, এখনো কিছুই জানি না, আর কোথায় কী ভাবে পরিচয় হয়েছিল, তাও শোনা হয় নি।'

'বলছি বলছি।' মেয়েটি ব্যস্তভাবে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমাকে কেউ আপনি করে বলে না, মহিলা-টহিলা তো নয়ই। আপনি আমাকে খালি একটু দয়া করবেন, আপনার পায়ে পড়ি, দয়া ধর্ম করে আপনি খালি আমাকে এখান থেকে, একটু বের করে নিয়ে যাবেন। পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে আমি ঠিক পালিয়ে যেতে পারবো।'

এসব কথার মানে কী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কথাগুলো বললো দ্রুত নীচু আর উদ্বিগ্ন স্বরে। এখন ওর মুখেও একটা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। ও আবার বললো, 'আমি যদি আজ ফিরতে না পারি, তাহলে আমার কপালে অনেক দুর্গতি আছে। এখানে আমি ঢুকতাম না, ভয়ে ঢুকে পড়েছি, মাইরি বলছি।'

আবার 'মাইরি'! কিন্তু আমি ওর কথাগুলোর যথার্থ অর্থ বুঝতে পারছি না। কিসের ভয়, কেন ভয়? ওর চোখে মুখে এখন ভয়ের সঙ্গে একটা অসহায় ভাব। আমি বললাম, 'কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না। ভয়, মানে কাকে, কিসের ভয়?'

মেয়েটি আড় চোখে একবার রেস্তোরাঁর বাইরে যাবার দরজার দিকে দেখে নিয়ে বললো, 'আপনি ঢোকবার সময় গুঁপো সেপাইটাকে দেখতে পান নি? ও আমাকে তাড়া করেছিল! এখন শালা নিশ্চয়ই বাইরে ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বেরোলেই ধরে থানায় নিয়ে যাবে। থানাটা তো কাছেই!'

গুঁপো সেপাই! হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, একজন না, দুজন সেপাইকে আমি রেস্তোরাঁর বাইরে রাস্তায় দেখেছি। তারা নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছিল, আর রেস্তোরাঁর দিকে দেখছিল। সেটা আমার কোনো ব্যাপারই ছিল না। ওসব তাকিয়ে দেখবার কী আছে? দিন রাত্রই তো দেখছি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'পুলিসে তাড়া করেছে? কেন, পুলিসে তাড়া করেছে কেন?'

boiRboi.net

মেয়েটি ওর উদ্বেগের মধ্যেও হেসে উঠলো, বললো, 'ওহ্, আপনি তো আসল ব্যাপারটাই জানেন না। আপনার তো মনেই নেই আমাকে কোথায় দেখেছিলেন। রামু সিং-এর সেই বাড়িতে—মনে আছে ?'

রামু সিং-এর বাড়ি ! কিছুই মনে পড়লো না। আমি ওর কথাবার্তায় ক্রমেই আরো বেশী অবাক হচ্ছি, এবং মনের মধ্যে নানারকম খটকাও লাগছে। কী ধরনের মেয়ে ও হতে পারে ? যে মেয়ে অনায়াসে 'শালা' উচ্চারণ করে ? ও আমার দিকে একটু ঝুঁকে কাত হয়ে বসলো। ওর বাঁ স্তন টেবিলে স্পর্শ করলো। ওর বাঁ ঠোঁটের কাটা দাগটা আবার আমার চোখে পড়লো। মুখের আদলে একটা বন্যতা আনার জন্য, যেন দাগটা কোনো শিল্পী সযত্নে এঁকে দিয়েছে।

'রামু সিং-এর বাড়ি ভুলে গেলেন ?' মেয়েটি আবার বললো, 'আমরা ওটাকে রামুর খোপ বলি। আচ্ছা, সেই পুঁচকে ছুঁড়িটার কথা মনে আছে, যে বলেছিল, ওর নাম সুপ্রিয়া, সোনারপুর থেকে এসেছে ! ওইটুকু মেয়ে, একটা মাগীর বাড়া, সত্যি বলছি। ও বোধহয় মায়ের পেট থেকে পড়েই—।' কথাটা শেষ না করে ও হেসে উঠলো, আর হাসির উচ্ছ্বাসেই ওর ডবল ব্রেস্ট জামার বুকের অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেল।

আমি রীতিমতো স্তম্ভিত ! রামু সিং—সুপ্রিয়া—সোনারপুর—তার মানে, এ মেয়েটা আসলে সেখানকার ? আশ্চর্য তাই তো ! আমার এতক্ষণে ওর কথাবার্তা আচরণেই বোঝা উচিত ছিল। এখন আমার কাছে সব কিছুই জলের মতো পরিষ্কার লাগছে। মেয়েটা এ এলাকায় খদ্দেরের খোঁজে এসেছিল। কোনো রকম বেকায়দায় পুলিসের চোখে পড়ে গিয়েছিল। এলাকার পাহারা সেপাইরা ওকে নিশ্চয়ই চেনে। দেখেই তাড়া করেছে, আর ও তাড়া খেয়ে এখানে ঢুকে পড়েছে। হেড স্টুয়ার্ড মিঃ ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই ওকে চেনেন, তাই আমার টেবিলে ওকে আসতে দেখে রুষ্ট আর বিরক্ত হয়েছেন। এখন আর আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। বুঝতে পারছি, ওকে এ অঞ্চলে অনেকেই চেনে।

'আমার কাছে কিছু টাকা থাকলেও পার পেয়ে যেতে পারতাম।' মেয়েটি বললো, 'কিন্তু কোনো কাজই হয় নি, সন্ধ্যে থেকে ঘুরছি। তারপরে আকাশের যা অবস্থা, আজ আর কোনো আশা নেই ! এসব হচ্ছে বড়লোকের জায়গা, একটা কোকাকোলার দামই দু'টাকা আড়াই টাকা। সেটা কোনোরকমে দিতে পারবো। সে যাই হোক, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচান। পুলিসের স্পাইটাকে আপনি খালি বলবেন, আমি আপনার চেনা, আর—আর আপনি আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন—দেখা করতে। তা নইলে আমাকে ঠিক থানায় ধরে নিয়ে যাবে, রাত্রে হাজতে আটকে রাখবে, তারপরে কোর্ট ঘর, কেস্। ওহ্, মাইরি, আমি মরে যাবো।'

মেয়েটির মুখে এখন সকরুণ আর্ত অভিব্যক্তি ! অথচ ওর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসি, আর চোখের গভীরে এখন যে ঝলকটা চাপা পড়ে আছে, তার মধ্যে, এই করুণ ভাবটা একেবারেই মানায় না। বিশেষ করে, বাঁ চোখের নিচে, গালে সরু কাটা দাগটা, ওর উদ্বেগ করুণ মুখের সঙ্গে রীতিমতো বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটছে আসলে আমার মধ্যেই। সব জেনে শুনেও, আমি

boiRboi.net

রেগে উঠতে বা বিরক্ত হতে পারছি না। দু সপ্তাহ ধরে এতো রকমের পতিতা জীবন ঘেঁটে দেখে শুনে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। মিঃ বাগচি ব্যাপারটা দেখলে কী ভাবতেন? আজ দুপুরেও, একটি গোপন খবরের সূত্র ধরে, এক জায়গায় হাজির হয়েছিলাম, আর এক মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। মহিলা আমাকে সবই স্বীকার করেছেন, তিনি তাঁর চাকুরে স্বামীর সম্মতি নিয়েই, পতিতাবৃত্তি করছেন। তাঁর গাড়ি, টেলিফোন, ফ্রিজ, সবই আছে। ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়াম নামকরা ইস্কুলে পড়ে। গড়ে তাঁর দৈনিক আয় প্রায় দেড় শো টাকা। সমস্ত টাকাটাই হিসাব বহির্ভূত আয়করবিহীন। অবিশ্যি এই পতিতাবৃত্তির পিছনে আছে দীর্ঘ ইতিহাস, যা খুবই করুণ আর অপমানকর।

'এই কচুপোড়া খেলো যা।' মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমার নামটাই তো বলা হয় নি। আমার নাম হলো মল্লিকা—মল্লিকা ঘোষ।'

নামটা উচ্চারণ শেষ হওয়া মাত্রই, বেয়ারা আমার খাবার নিয়ে এলো। খাবার রেখে, শক্ত মুখে, মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কোকাকোলার বিলটা কি এখানেই দেবো?'

বেয়ারার স্বরে রীতিমতো উষ্মা, আর অভদ্রোচিত তার ভঙ্গী। মল্লীকা তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ।' বলেই ওর ফোমের নীল ব্যাগটা টেনে নিয়ে, তার মুখ খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে লাগলো। আমার কান গরম হয়ে উঠলো। আমার ভিতরে যথেষ্ট সংকোচ আর দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, আমি বেয়ারাকে বলে উঠলাম, 'বিলটা আমার সঙ্গেই দিও।'

বেয়ারা অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো, তার দৃষ্টিতে সন্দেহ আর অশ্রদ্ধা। তার মানে, বেয়ারাটাও তাহলে মল্লিকার পরিচয় জানে? অবাক হবার কিছুই নেই, ওরাই হয়তো আমাদের থেকে অনেক বেশী এদের চেনে। বেয়ারা চলে যেতে উদ্যত হতেই আমি ডাকলাম, 'শোন।'

মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার জন্য কী দিতে বলবো?'

মল্লিকা চোখ কপালে তুলে বললো, 'আমার জন্য? না না, কিছু না, আমি কিছু খাবো না।'

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ঘন আর মোটা করে কাজল আঁকা। ও খুব সাবধানেই কোকাকোলা খেয়েছে, ঠোঁটের রং একটুও মোছে নি। কিন্তু ও নিজেই বলছিল, সন্ধে থেকে কোনো কাজ হয় নি। তার মানে কোনো খদ্দের জোটে নি। রাত কিছু কম হয় নি। এখন খিদে পাওয়া উচিত। হয়তো লজ্জা পাচ্ছে। তাছাড়া, একজনকে সামনে বসিয়ে রেখে, আমিই বা গোগ্রাসে খাই কী করে। বললাম, 'অল্প কিছু খান, সামান্য কিছু।' বলেই আমি বেয়ারাকে নির্দেশ করলাম, 'এক প্লেট ফিশ ফ্রাই নিয়ে এসো।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল। আসলে লোকটার ওইরকম সন্দেহজনক তাকানো নিয়ে উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।

মল্লিকা বললো, 'কেন খাবার দিতে বললেন? আমি জানি এখানে খাবারের দাম

boiRboi.net

ভীষণ চড়া। সেরকম লোকজনের সঙ্গে এলে ঘাড় ভেঙে খুব খাই বটে, আপনি তো আর সেরকম না।'

সেরকম লোকজন বলতে, মল্লিকা নিশ্চয়ই ওর খদ্দেরদের বোঝাচ্ছে। 'আপনি যে আমাকে আজকের মতন বাঁচিয়ে দিচ্ছেন, এই আমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি, মাইরি।

অন্য কেউ এভাবে বললে, আমি হয়তো হেসে উঠতাম। অথবা রেগেও যেতে পারতাম। এখন আমার সেরকম কিছুই হলো না। কিন্তু যদি লোকের ঘাড় ভেঙে খেতে পারে, তাহলে সাধা খাবার খেতে আপত্তি কী? কথা শুনে মনে হচ্ছে, ও ধরেই নিয়েছে, আমি ওকে আজকের মতো বাঁচিয়ে দেবো। তবে একটা কথা ও খুব সত্যি বলেছে, এ অঞ্চলে খাবারের দাম খুব চড়া। খাবারের সঙ্গে সার্ভিস আর সেল্-ট্যাক্স্ও যোগ হয়ে একটি মোটা অংক দাঁড়ায়। এ কথার পরে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তেমন সম্পন্ন জীবনের উজ্জ্বলতা ওর মুখে নেই। কাজল দিয়ে যতোই চোখ আঁকুক, পরিপূর্ণ ভোগের দীপ্তি নেই চোখের কোলে। অথচ আছে এমন একটা তীব্রতা, যাকে হয় তো মাদকতা বলা যায়। হ্যাঁ, এটাই বোধ হয় যথার্থ, ওর চোখে, ওর মুখে, শরীরে, বন্যতার সঙ্গে একটা মাদকতা আছে। ওর চোখের দিকে তাকালেই, মনে হয় যেন সোজা আদিম রিপুতে গিয়া আঘাত করছে। অবিশ্যি রিপুর আবার আদিমতা বা আধুনিকতা বলতে কী আছে, আমি জানি না। রিপু তো একটা চিরন্তন বিষয়, এবং তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও অনিবার্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিম বললে, অর্থের স্পষ্টতা ফোটে। যেমন হত্যা, ধর্ষণ, যৌনতা।

ইতিমধ্যে পুরো তিন কলামে, দুটি নিবন্ধে আমি পতিতালয়ের কতো কথাই লিখলাম। কতো মেয়ের বিশদ বর্ণনা, তাদের জীবনের খুঁটিনাটি, বৃত্তি বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। আমি নিজেই সেখানকার কোনো কোনো মেয়েকে সুন্দরী আর স্ব্যাস্থ্যবতী বলে বর্ণনা দিয়েছি, অথচ আকর্ষণের বা মুগ্ধ হবার মতো, কিছুই হয় নি। মল্লিকাও সেই রকমই একজন। বরং বলা যায়, সোনাগাছিতে যারা ঘর ভাড়া নিয়ে স্থায়ীভাবে আছে, তাদের অবস্থা অনেক ভালো। তাদের আয় অনেক বেশী। খদ্দেররা নিরাপত্তা, নিরাপদ অভিসার আর নিশ্চিন্ত হতে পারে সেখানে গিয়ে, অতএব সম্পন্ন ব্যক্তিরা সেখানেই যায়। রাস্তায় মেয়ের খোঁজে তারা থাকে না, তাদের শিকারও তারা হতে চায় না। অস্থায়ী পতিতালয়ের আর পথে ঘোরা মেয়েদের অবস্থা তাদের থেকে খারাপ। স্থায়ী পতিতালয়ের মেয়েদের ঘরে রেডিও, ট্রানজিসটার, রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিওগ্রামও দেখেছি। খাট সোফা তো থাকেই। কারোর কারোর ঘরে রীতিমতো বইয়ের আলমারি দেখেছি, এবং তারা যে বই পড়ে, তার প্রমাণও পেয়েছি। অধিকাংশ পড়াশোনা না করলেও, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই আক্ষরিক জ্ঞান আছে। বম্বে সিনেমার নায়িকাদের মতো সাজবার আর চটুল হবার ঝোঁক আছে অনেকের মধ্যে। কিন্তু আমার হিসাবে, অধিকাংশ মেয়েই বিবাহিতা। ক্ষেত্র বিশেষে স্বামী ত্যাগ করার দরকার হয় নি, স্বামী এবং পরিবারের সম্মতিক্রমেই এই বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। অভাব দারিদ্র্য ছাড়াও, চারিত্রিক প্রবণতাও দেখা গিয়াছে। কোনো কোনো মেয়ে নগ্ন ক্যাবারে নাচ দেখায়! আমি অবাক হয়েছি বড় বড় হোটেলের

ক্যাবারে নাচিয়ে মেয়েদের থেকে, তাদের ক্ষমতা কিছু কম নেই। তারা অনায়াসেই সেখানে বাবু সাহেবদের হাততালি পেতে পারে।

'আপনি খুব রেগে যাচ্ছেন, না?' মল্লিকা বলে উঠলো, 'তাই গুম্ খেয়ে বসে আছেন। আমি হা পিত্যেশ করে দরজার দিকে তাকিয়েছিলাম, একটা কোনো চেনা লোক দেখলেই, তাকে বলবো। আপনাকে ঢুকতে দেখে আমি প্রথমটায় চমকে উঠেছিলাম। পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে আপনাকে দেখেছিলাম, আপনাকেও পুলিসই মনে করেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। আমারও মনে পড়ে গেল, আপনার গায়ে সেদিনও পুলিসের পোশাক ছিল না। তাহলে আপনি কে? ভাবলাম একটা চান্স্ নিয়ে দেখি।'

আমি ওর মুখে 'চান্স' কথাটা শুনে, আবার ওর দিকে তাকালাম। ও এবার এমনভাবে হাসলো, যা একটু আগেও হাসে নি। লাস্য বা মদির, কী বলবো এই দৃষ্টিকে, বুঝতে পারছি না। ওর চোখে মুখে একটা আবেগের নিবিড়তা। জানি না, ওর জামার বোতাম দু একটা খুলে ফেলেছে কী না, আমি ওর নিটোল বুকের বেশ খানিকটা উন্মোচিত দেখতে পেলাম। দেখে, আমার কি সেই রিপুর তাড়নাই জাগলো, অথবা একটা আবেশ ঘনীভূত হয়ে উঠলো, বুঝতে পারছি না। এখন অনুমান করতে পারছি, মানুষ তার নিজের কাছেই সব থেকে বড় বিস্ময়, কথাটা কেন বলা হয়েছে। এখন আমিই আমার কাছে সব থেকে বড় বিস্ময়। ওর বুক থেকে চোখ তুলে বললাম, 'সাদা পোশাকের পুলিসও আছে।'

মল্লিকার চোখে আতঙ্ক দেখা দিল, বললো, 'সে কি রে বাবা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! আপনি সত্যি পুলিস নাকি? আমাকে ধরিয়ে দেবেন?'

আমি না চাইলেও, আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'সেটা পরে দেখা যাবে।'

'আপনি কখ্খনো পুলিসের লোক নন।' মল্লিকা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, 'পুলিসের চালচলন চেহারাই আলাদা হয়। আপনি আমার জন্য খাবার আনতে বললেন। আপনি তো কসাই নন, যে খাইয়ে দাইয়ে খাসী কাটবেন।' বলে ও ওর নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো, আবার বললো, 'গেল মাসে একটা খুব মজার ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিনও কোনো খদ্দের পাই নি, ময়দানে এক দারোগার হাতে ধরা পড়ে গেলাম। লোকটাকে দেবার মতন টাকাও ছিল না। তা, সে গায়ে গায়েই শোধ তুলে নিল। পুলিস হলেও মানুষ তো! মজাটা কী হলো, লোকটা উঠে যখন মাথায় টুপি পরে ঠিক হচ্ছে, তখনই আর একটা পুলিসের গাড়ি এসে পড়লো। গাড়ির আলো সোজা এসে পড়লো আমাদের দুজনের ওপরে। তারপরেই একজন কে গাড়ি থেকে নেমে আসতেই, দারোগা মুখ চুন করে সেলাম ঠুকলো, আর আমাকে দাঁতে দাঁত পিষে বল্লো, 'ছুঁড়ি পালা শীগ্গির। আমি অমনি দৌড়।'

হাস্যকর ঘটনাই বটে, কিন্তু আমি অবাক হলাম ওর কথায়। কেমন অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে বললো, 'পুলিস হলেও মানুষ তো।' এই অবাক হওয়ার সঙ্গেই, আমি কেমন একটা অশান্তি আর রাগ বোধ করলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, খোলা আকাশের নিচে, মাঠের অন্ধকারে ওর নগ্ন শরীরের ওপর একটা পুরুষ। আমার মনে কেমন একটা কষ্ট আর জ্বালা ধরে গেল। আমার ইচ্ছা হলো

boiRboi.net

বলি, এসব কথা আমি আর শুনতে চাই না। যেন ওর নিম্নাঙ্গ হাট করে খোলাই আছে। যে কোনো সময়, যে কোনো লোকের জন্য। অবিশ্যি বৃত্তিটা সেই-রকমেরই, তবু আমি অশান্তি বোধ করছি।

এ সময় হঠাৎ কয়েকজন মহিলা পুরুষ ঢুকলেন। দরজার দারোয়ানের হাতে একটি মাত্র ছাতা। সকলেই প্রায় ভিজে গিয়েছেন। দরজা খোলার মুহূর্তেই, বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ পেলাম। তাঁদের কথা থেকেও বুঝলাম, ভীষণ বৃষ্টিতে কলকাতা ভাসছে।

মল্লিকা বললো, 'এই মরেছে, বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। বাস বন্ধ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে পারবো না। কিন্তু সেপাইটা বোধহয় বৃষ্টির মধ্যে পালিয়ে গেছে।' কথাটা বলতে বলতে ওর কাজল কালো চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই আবার চোখে ছায়া নামলো, বললো, 'ও শালা যাবে না, ঠিক ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। সারা গায়ে খামচি কাটতে কাটতে থানায় নিয়ে যাবে।' তারপরে এতক্ষণে ওর খেয়াল হলো, আমার খাবারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আরে, খাবার খান। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তো।'

আমি বললাম, 'খাবো, আর একটা প্লেট আসুক। কিন্তু বাইরে একজন না, দুজন সেপাই আছে।'

মল্লিকার চোখ আতঙ্কে বড় হয়ে উঠলো, বললো, 'আপনি দেখেছেন? তাহলে তো কখনই যায় নি। একলা হলে যদি বা যেতো, এখন আর যাবে না। দুজনে গল্প করছে, আর ভাবছে, আমি কখন বেরোব।'

এই সময়ে দরোয়ান ছাতা মাথায় আগলে, আরো দুজনকে ভিতরে ঢোকালো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলে গেল না। সে অনুসন্ধিৎসু চোখে চার দিকে নজর করে দেখতে দেখতে, মল্লিকার দিকে স্থির চোখে তাকালো। তারপর আমার দিকে দেখে, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, বাইরের সেপাইদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। সে দেখে নিয়ে, ওদের খবর দিতে গেল। মল্লিকা ব্যাপারটা খেয়াল করলো না। বেয়ারা এসে ফিস ফ্রাইয়ের প্লেট টেবিলে নামিয়ে দিল। আমাকে বললো, 'স্যার, আপনাকে ভট্টাচার্যিসাব একবার সেলাম দিয়েছে।'

আমি ভ্রূকুটি চোখে কাউন্টারের দিকে তাকালাম। দেখলাম মিঃ ভট্টাচার্য একটু হেসে, মাথা ঝাঁকালেন, তর্জনী দেখিয়ে ইশারা করলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। উঠে, কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। মিঃ ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে, আমাকে ক্যাশ কাউন্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনাকে চিনি বলেই বলছি। মেয়েটিকে কি আপনি চেনেন?'

আমি আমার ভিতরের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ চিনি।'

'চেনেন!' মিঃ ভট্টাচার্য অবাক হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম, মেয়েটি আপনাকে জ্বালাতন করছে। মানে, আপনার সঙ্গে যেচে—।'

আমি তাঁকে বেশী কিছু বলতে না দিয়ে বললাম, 'না না, সেরকম ভাববার কোনো কারণ নেই।'

boiRboi.net

মিঃ ভট্টাচার্য তথাপি অবাক স্বরে বললেন, 'আপনি মেয়েটিকে চেনেন! আপনি কি আগে থাকতেই ওকে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন নাকি?'

আমি বললাম, 'ঠিক আগে থাকতে নয়, এখানে এসেই ওকে দেখতে পেলাম।'

'অবিশ্যি আগে খেয়াল করলে, মেয়েটিকে হয় তো গেটম্যান ভেতরে ঢুকতেই দিতো না।' মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'কিছু মনে করবেন না যেন, আমাদের কাছে মেয়েটার অন্য একটা পরিচয় আছে—মানে, আমাদের রেস্তোরাঁর সুনামের পক্ষে ক্ষতিকারক।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'মাফ করবেন মিঃ ভট্টাচার্য, আপনার কাস্টমারদের মধ্যে সব মহিলার পরিচয় আমরা কেউ জানি না, বা তার খোঁজও করি না। এটা আমার একটা প্রফেশনাল ব্যাপার বলে ধরে নিতে পারেন।'

মিঃ ভট্টাচার্যের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললেন, 'কাস্টমারদের গায়ে ছাপ মারা থাকে না নিশ্চয়ই, কিন্তু আমরা ধরেই নিই এখানে সবাই রেসপেকটেবল্ সমাজ থেকেই আসেন। আপনার মান সম্মানও আমার দেখা কর্তব্য। অবিশ্যি আপনি কী জন্য প্রফেশনাল অ্যাফেয়ারের কথা—।' এ পর্যন্ত বলেই তিনি থমকিয়ে গেলেন, আমার দিকে সচকিত চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ওহ্, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, এদের নিয়ে আপনার লেখা তো আমি কাগজে পড়েছি—।'

আমি আবার তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'মিঃ ভট্টাচার্য, এ বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না। আমি যা করছি বা বলছি, তা আমার দায়িত্বেই বলছি। আপাতত স্পষ্টভাবে আমি আপনাকে বলতে চাই, ও আমারই পরিচিত সঙ্গী হিসাবে আমার টেবিলে বসে আছে। আমার কাছে কেউ কোনো জবাবদিহি চাইলে তা আমি দেবো।'

আর কোনো কথা না বলে, আমি মুখ ফিরিয়ে টেবিলে ফিরে এলাম, বললাম, 'চটপট খেয়ে নেওয়া যাক। বৃষ্টি যেরকম নেমেছে, কতোক্ষণ চলবে কে জানে।'

আমি রুটি ছিঁড়ে মুখে দিলাম। মল্লিকা হাত দিয়ে ফিশ ফ্রাই তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওই লোকটা কী বলছিল? আমার কথা, না?'

মল্লিকা বোকা না, যথার্থই অনুমান করেছে। কিন্তু আমি বললাম, 'না, অন্য একটা কথা হচ্ছিল। তোমার বিষয়ে উনি আর কী বলতে পারেন? উনি কি তোমাকে চেনেন?' প্রশ্ন করে আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম।

মল্লিকা তখনো ঠোঁটের রঙের মায়া বাঁচিয়ে, দাঁত দিয়ে অদ্ভুতভাবে বেশ বড় মাছ ভাজাটি কামড়ে ধরেছে। ওর সমস্ত দাঁতগুলোই আমি দেখতে পাচ্ছি। কোনো মহিলাই রেস্তোরাঁয় বসে, ওর মতো এরকম দাঁত বের করে খাবার খেতে পারবে না। তাঁদের ভদ্রতা আর শালীনতায় আটকাবে। মল্লিকা সেসব আদবকায়দা জানে না। অথচ ওর সাদা দাঁতের সারি, খাবার এই ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগছে। সৌন্দর্য আর পাশবিকতা যেন পাশাপাশি। এক টুকরো মাছ মুখের মধ্যে নিয়ে, একটু চিবিয়ে ও বললো, 'চিনতে পারে। আমাকে যে-কেউই চিনতে পারে।'

ওর কথার মধ্য দিয়ে এটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ও এমন একজন সাধারণ গণিকা, এ এলাকার যে কোনো লোকের সঙ্গেই হয়তো ওর যোগাযোগ হয়েছে। যোগাযোগ মানে, শোয়া আর শরীর বিক্রি করা। একটা বিষণ্ণতা বোধ জেগে উঠলো

boiboi.net

আমার মনে। তবু ওর মুখ থেকেই কথাটা শোনবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, তুমি কি এমনই নামকরা, যে তোমাকে যে-কেউ চিনতে পারে?'

মল্লিকা ঠোঁট বাঁচাবার চেষ্টা করলেও, ফিশ ফ্রাইয়ের তৈলাক্ত পদার্থ কিঞ্চিৎ লেগে গিয়েছে, আর তার জন্য ওর ঠোঁট চিকচিক করছে। ও হেসে বললো, 'না, তা কেন? আমি তো আর সিনেমা করি না, যে আমাকে দেখলেই লোকে চিনতে পারবে। হয়তো রামু সিং-এর বাড়িতেই আমাকে অনেকে দেখেছে। আমি তো প্রায়ই ওখানে যেতাম। ওরকম আরো কয়েকটা বাড়ি আছে, আমি সে-জায়গাতেও গেছি। ইদানীং ওই বাড়িগুলোর ওপর পুলিস খুব কড়া নজর রেখেছে, তাই রাস্তায় নেমেছি। কারবারি লোকেরা আমাদের ঠিক চিনতে পারে। এসব এলাকার হোটেল-টোটেলের লোকেরাও আমাদের চেনে। বাবুদের জন্য বেয়ারারা আমাদের অনেক সময় ডেকেও নিয়ে যায়। অন্য সময় শালারা লাত্থি মেরে তাড়িয়ে দেয়, হোটেলের কাছে-পিঠে ঘেঁষতে দেয় না।' বলে ও দাঁত বের করে, আবার মাছ ভাজায় কামড় বসালো।

এক মুহূর্তের জন্য আমার সাংবাদিক মনটা সচকিত হয়ে উঠলো, আমি ওর কথাগুলো শুনলাম। পর মুহূর্তেই আমার মনটা আবার বিমর্ষ হয়ে উঠলো। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, কতো ওর বয়স হতে পারে, আর কতো দিন ধরে ও এই পেশা নিয়েছে? ওর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এসব এলাকার অস্থায়ী বেশ্যালয়গুলোতে ও দেহ বিক্রি করেছে। এমন কি হোটেলেও লোকের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। ওর নিজের কি কোনো হিসাব আছে, আজ পর্যন্ত কতগুলো লোকের কাছে ও নিজেকে বিক্রি করেছে? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলেও, প্রশ্নটা বাতুলতা বলে আমার মনে হলো। কারণ, কোনো পতিতার পক্ষেই এ হিসাব রাখা অসম্ভব। এ বিষয়ে সোনাগাছির একটি মেয়ে আমাকে হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'সে হিসাব কী করে দেব? প্রত্যেক মানুষ যদি শরীরে কোনো আলাদা দাগ রেখে যেত, তাহলে হিসাব করা যেত। কিন্তু শরীরে তো দাগ পড়ে না।'

কথাটা আমি আমার দ্বিতীয় নিবন্ধে লিখেছি। ধরেই নিতে পারি মল্লিকার জবাবও সেইরকমই হবে। সোনাগাছির মেয়ে আরো বলেছিল, 'তবে হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ লোকের কথা মনে থাকে, তার হিসাবও দিতে পারি। এখন যেমন ধরুন, সপ্তাহে তিনজন আমার বাঁধা লোক আছে। সপ্তাহে এরা দু'দিন করে আসে। ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা দুয়েক থাকে, চলে যায়। এই সব বাঁধা খদ্দের আমাদের লক্ষ্মী। এরা কেউ বরাবর থাকে না। যায় আসে, তবে যতোদিন শরীর-টরীর ভালো থাকে, বাঁধা খদ্দেররাও থাকে। তাছাড়া নামকরা লোকজন মাঝে মধ্যে আসে, তাদের হিসাবও দিতে পারি। সিনেমা থিয়েটারের লোক, নামকরা লেখক কবিরাও কখনো কখনো আসে।'

আমি মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কতোদিন ধরে এসব করছো?'

'তা হবে প্রায় বছর তিন চারেক।' মুখের মধ্যে মাছ ভাজা চিবোতে চিবোতে, কিছুটা জড়ানো আর লালা ভেজানো স্বরে বললো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বয়স কতো হলো?'

মল্লিকা তেমনি ভাবেই জবাব দিল, 'তা হবে কুড়ি-বাইশ।'

boiRboi.net

বয়সটা আমিও এইরকমই অনুমান করেছিলাম। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ও নিজেই বলে উঠলো, 'পুলিসের তাড়ায় কতদিন যে চালাতে পারবো, বুঝতে পারছি না। কিন্তু টাকা তো শালা চাই-ই, তা নইলে বাড়িই ঢুকতে পারবো না। এখন হয়েছে, খদ্দের নজর দিলেই এক কথা, ঘরটর আছে, না ট্যাকসিতে ময়দানে ?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তার মানে ?'

মল্লিকা আবার মাছ ভাজায় কামড় বসিয়ে, মুখের মধ্যে খানিকটা নিয়ে হেসে উঠে বললো, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো আর কিছু হতে পারে না। জায়গা একটা চাই। কেউ কেউ ঘরে নিয়ে যায়, কিন্তু হুজ্জোতির ভয় লাগে। অচেনা জায়গা। কেউ ট্যাকসিওয়ালাকে টাকা দিয়ে রাজী করিয়ে নেয়। অন্ধকার ময়দান তো আছেই, তবে পুলিসের নজর ফাঁকি দেওয়া খুব মুশকিল।'

মল্লিকা কথাগুলো খুব সহজ ভাবেই বলে যাচ্ছে। এখন ও অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত নই। ওর কথাগুলো শোনবার কৌতূহল থাকলেও, ভিতরে ভিতরে আমি রীতিমতো একটা যন্ত্রণা বোধ করছি। এরকমটা মোটেই সাংবাদিকসুলভ মনোবৃত্তি না, আর আমার আশ্চর্য ব্যাপারটা সেখানেই। আমার নিশ্চিন্ত না হওয়ার কারণটাও একটা উদ্বেগ থেকে। মিঃ ভট্টাচার্যকে আমি যাই বলে থাকি, মল্লিকাকে ঠিক মতো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া যাবে কী না, আমার মনের মধ্যে সে উদ্বেগও রয়েছে। আমি ওর কোনো কথার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে লাগলাম, তার কথাটা আমার হঠাৎ মনে হতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, সোনারপুরের সেই সুপ্রিয়া মেয়েটার কী ব্যাপার ? ওইটুকুনি একটা মেয়ে—!'

'ওইটুকুনি একটা মেয়ে !' মল্লিকা আমাকে বাধা দিয়ে, আমার কথারই প্রতিধ্বনি করে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ওর হাসিটা এতোই উচ্চগ্রামে, আমি অস্বস্তিতে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম। কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকালো। হেড স্টুয়ার্ড মিঃ ভট্টাচার্য ক্যাশ কাউণ্টারের কাছ থেকে আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। মল্লিকা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি হাসিটা সামলিয়ে নিল। খোলা চুল ওর মুখের এক পাশ ঢেকে দিয়েছে, এখন ওর একটা কৌতুকে ঝলসানো চোখ দেখতে পাচ্ছি। কপালের ওপরও চুল পড়েছে। ওর মুখের খুব অলপ অংশই দেখা যাচ্ছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামালো। ফিশ ফ্রাই প্রায় শেষ, আলু ভাজা মটরশুঁটি বিন্ সেদ্ধ কিছু মুখে পুরে দিল।

আমি কিছু না বলে, খেতে লাগলাম। হয় তো আরো দু-একটা রুটি খেতাম। কেন যেন আর খেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু মল্লিকা এরকম বিদ্রূপ করে হেসে উঠে কী বলতে চায়। সুপ্রিয়া কি সত্যি একটি বাচ্চা মেয়ে না ? ও এখন অনেকটা ঝুঁকে বসেছে। জামার ডবল ব্রেস্ট কলারের মাঝখানটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে পড়েছে। ওর বুকের আলো আঁধারির মধ্যে দুই বক্ষ, আর বক্ষান্তরের মাঝখান অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোনো মেয়ের রূপ দেখে আমি কখনো মুগ্ধ হই নি, এমন কথা বলা যায় না। কোনো মেয়ের শরীরের স্পর্শ, আমার রক্তধারাকে চলকিয়ে তোলে নি, এমন

boiRboi.net

কথা হলফ করে বলতে পারি না। আমি আর দশজনের মতোই একজন সাধারণ যুবক। অসাধারণত্বের কোনো দাবিই আমার নেই। অবিশ্যি মেয়েদের সঙ্গ-বঞ্চিত আর্ত ক্ষুধার্ত জীবন আমার নয়। অনেক যুবকের মধ্যেই যে আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত দীন ও দীনতর ভাবে প্রকাশ পেতে দেখেছি। কিন্তু সব জেনে শুনেও, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, মল্লিকার বুকের দিকে তাকিয়ে এক অভূতপূর্ব শিহরণ আমি অনুভব করছি। যা আর কখনো হয় নি। এ আমার রুচিবিকার কী না, আপাতত তা বিচার করবার মতো মনোবৃত্তি আমার নেই।

'বেঁটেখাটো ফ্রক পরা মেয়ে হলেই কি সে এইটুকুই হয়ে যায়?' মল্লিকা ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, 'খুব বেশী হলে, তেরো চৌদ্দর বেশী আমার মনে হয় নি।'

মল্লিকা বললো, 'ওই বয়সেই কোনো কোনো মেয়ে মাগী হয়ে ওঠে।'

কথাটা আমার কানে বজ্রাঘাতের মতো লাগলো, কিন্তু মল্লিকা খুব সহজভাবেই যেন বললো, 'সাত মাস ধরে ও নাগাড়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ও সব আপনি বুঝবেন না। ছুঁড়িটা বোতল বোতল বীয়ার টানতে পারে, আর খুকী সেজে দিব্যি বাঁদরামি চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু লোক আছে, শালারা বাচ্চা মেয়ে পেলে খুব খুশী, তারা ওকে লুফে নিতো। ওই বাচ্চাই রোজ তিনটে চারটে পুরুষকে সামলায়।'

আমি বলে উঠলাম, 'থাক, সুপ্রিয়ার কথা থাক!'

মল্লিকা একটু সোজা হয়ে বসলো, আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি রাগ করেছি কী না, তা বোঝবার চেষ্টা করছে। আমি রাগ করি নি, আসলে মল্লিকার মুখ থেকে কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে। আমি ভাবতে পারি না, একটা মেয়ে, একটি মাত্র প্রয়োজনে, শুধুই মেয়ে। দেহোপজীবিনীদেরও অনেক রঙ্গরস ছলাকলা থাকে। সুপ্রিয়ার মতো মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না। মল্লিকা বললো, 'ওর নাম মোটেই সুপ্রিয়া নয়। আর সোনারপুরেও ওর বাড়ি নয়।'

মিঃ বাগচির কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনিও এরকম সন্দেহই করেছিলেন। মল্লিকা আবার বললো, 'ওর নাম আসলে সরস্বতী, বেলঘরিয়া থেকে আসতো।'

সরস্বতী! নিতান্ত সাবেকী নাম। ওই মেয়ের নাম সরস্বতী! আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি বেয়ারাকে হাত তুলে ডেকে ইশারায় বিল আনতে বললাম। আর মনে মনে ভাবলাম, আমার নিবন্ধের প্রথম কিস্তিতেই আমি মেয়েটার সম্পর্কে এক করুণ চিত্র এঁকেছি। করুণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সরস্বতীদের জগতে হয়তো সেটাই হাস্যকর। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়েটির কী হলো? কোর্টে প্রডিউস করেছিল?'

'করেছিল।' মল্লিকা বললো, 'কোর্টে হাজির হয়ে মেয়েটা ওর সত্যি নামধাম বলেছিল, তবে গপ্‌পোটা বদলায় নি, কেমন করে ও রামু সিং-এর কুঠীতে এসেছিল। ওর মা কোর্টে এসেছিল, হুজুর ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। উকিলরা সবই করতে পারে। তবে অনেক টাকা লেগেছিল।'

বেয়ারা বিল নিয়ে এলো। আমি হিপ পকেট থেকে পার্স বের করে বেয়ারাকে টাকা দিলাম। মল্লিকা আমার পার্সের দিকে তাকিয়ে ছিল। বেয়ারা চলে গেল।

boiRboi.net

আমি ন্যাপকিন দিয়ে হাত মুখ মুছে নিলাম, মনে পড়লো, আজ মল্লিকার কোনো কাজ হয় নি—অর্থাৎ রোজগার হয় নি। পাসের দিকে তাকিয়ে ওর তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করেছি। অনুসন্ধিৎসাটাকে লোভ বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে।

মল্লিকা ন্যাপকিন দিয়ে হাত মুছে, খুব আলগোছে চেপে চেপে ঠোঁট মুছলো। বললো, 'মনে রেখো, বাইরে কিন্তু সেই যমদূতটা বসে আছে।'

ও আমাকে তুমি সম্বোধন করে এই প্রথম বললো, 'আর বেশ স্বাভাবিকভাবে অনায়াসেই বললো। আমিও কোনো এক সময় ওকে তুমি করে বলতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু যমদূত একজন না, দুজন। শেষ পর্যন্ত কী ঘটতে পারে জানি না, তবে আমি ওকে বাঁচাবার জন্য সব রকমের চেষ্টা করবো। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। বললাম, 'ওঠা যাক।'

মল্লিকা ওর ফোমের ব্যাগটা হাত দিয়ে টেনে নিল। এই প্রথম দেখলাম, ব্যাগটা জীর্ণ, কোনো কোনো জায়গায় পোকায় কাটার মতো দাগ। ও উঠে দাঁড়ালো। বেয়ারা তাড়াতাড়ি বিল পেমেণ্ট করে বাকী টাকা ফিরিয়ে নিয়ে এলো। আমি একটু বেশী উদারতা দেখিয়ে বললাম, 'ঠিক হ্যায়।'

প্রায় পাঁচ টাকা বখশিশ দেবার কোনো দরকার ছিল না। তথাপি আজ যেন বেয়ারার সেলামের বহরটা তেমন দেখা গেল না। আমি মল্লিকাকে নিয়ে, দরজা ঠেলে বাইরে এলাম। দরোয়ান উঠে দাঁড়ালো এবং আমার দিকে অবাক্ হয়ে তাকালো।

আমি নির্বিকার আর সহজ থাকবার চেষ্টা করলাম। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম না। এখনো অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় বেশ খানিকটা জল জমেছে, রাস্তার আলোগুলো সব জ্বলছে না। কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির কোনো চিহ্ন নেই, কতগুলো রিক্শা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার রাতে ওরাই অগতির গতি। পার্ক স্ট্রীটের দিকে আলো জ্বলছে। রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে। সেখানেও ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন। লটারী পাওয়ার ভাগ্যের মতো ব্যাপার। মল্লিকাকে নিয়ে আমাকে ওদিকেই যেতে হবে। পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর মোড়ে যেতে পারলেই নাকি ও নিরাপদ।

মল্লিকা মোটেই নির্বিকার ছিল না। ও উদ্বিগ্ন চোখে আশেপাশে দেখতে লাগলো। আমি ফুটপাথে নেমে দাঁড়াতেই, ও আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরলো। ওর স্পর্শের মধ্যে ভয়ার্ত চমকটা আমি টের পেলাম। আর দু'জন কনস্টেবল আমার দুপাশ থেকে এগিয়ে এলো। আমি ভুরু কুঁচকে তাদের দিকে ফিরে তাকালাম। তারা দু'জনেই আমার দিকে শক্ত মুখে জরীপ করার ভঙ্গিতে তাকালো। হঠাৎ একজনের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, ডান হাত একটু তুলে বললো, 'নমস্তে। আপ ডি ডি সাবকো তো পহচন্তে না?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'কৌন ডি ডি সাব? মিঃ বাগচি?'

কনস্টেবল মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'জী! আপকো হম্ উনকো সাথ দেখা। মগর এ লেড়কি কো—।'

'লেড়কি?' আমি মল্লিকাকে দেখিয়ে বললাম, 'আপ ইনকো বাত কহতা?'

'জী।' কনস্টেবল একটু অপ্রস্তুতভাবে বলে, চোখের কোণে মল্লিকার দিকে দেখে

boiRboi.net

নিল, বললো, 'ইনকো আপ জানতে হ্যাঁয় কেয়া ?'

আমি বললাম, 'হাঁ।'

কনস্টেবল বললো, 'হম দুনো ইঁস কি ইনতেজার মে ইধার ঠারতা। সায়েদ বাবুজী, এ লেড়কি কো আপ নহি জানতে ?'

আমি অবাক্ হবার ভান করে বললাম, 'হমারা সাথী কো হম নহি জানে গা তো কৌন জানে গা।' কথা না বাড়িয়ে মল্লিকার হাত ধরে আমি এগিয়ে গেলাম। কনস্টেবল দু'জন আমার পিছন ছাড়লো না। অন্য একজন কনস্টেবল বলে উঠলো, 'এ লেড়কি কো হম্ থানা মে লে যায়েগা।'

আমি গম্ভীর মুখে, ধমকের সুরে বলে উঠলাম, 'আপ কিসকো লেড়কি লেড়কি করতে হ্যাঁয় ? হম্ খুদ থানা মে যায়েঙ্গে, অফিসার কো সাথ বাত করেঙ্গে, মিঃ বাগচিকো টেলিফোন করেঙ্গে। ইসকে পহলে, ইনকো হম গাড়ি পর চড়ায়েঙ্গে।'

প্রথম কনস্টেবলটি বলে উঠলো, 'স্যার, ডি ডি সাবকো সাথ আপ রামু সিংকা রেণ্ডিখানামে ইসকো দেখা নহি ? আপকো ইয়াদ নহি আতা ?'

আমি মনে মনে চমকিয়ে উঠলাম, তবু বললাম, 'নহি, এয়সা কুছ ইয়াদ নহি আতা ? ইনকো হম বহুত পহ্লে সে জানতা।'

মল্লিকা আমার হাতটা দু'হাতে ওর বুকের কাছে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। ওর মতো একটা বেপরোয়া মেয়ে, রাস্তায় শিকার ধরেই যে জীবিকা চালায়, পুলিসের প্রতি তার ভয় আশ্চর্যরকম ভয়ংকর। সত্যি এদের ও যমদূত মনে করে। ও ভয়েই আমার হাতটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে। আর ওর বুকের স্পর্শ আমার ভিতরে তরঙ্গ তুলছে। কী বিচিত্র সব বৈপরীত্য।

কনস্টেবল বললো, 'স্যার, আপ এক বড়া জেন্টলম্যান, ডি ডি সাব কো জান পয়েচান আদমি, আপ ইস কি সাথ কেয়সে ফাঁস গয়া, মুঝে মালুম নেই আতা।'

আমি তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে চললাম। কনস্টেবল আবার বললো, 'স্যার, এ লেড়কি আপকো জিন্দগী একদম বুরা বানায়েগি। উসকো হমারা হাত মে ছোড় দিজিয়ে।'

মুহূর্তেই পার্ক স্ট্রীটের ওপর থেকে একটা ট্যাক্সি মাথায় আলো জ্বালিয়ে, এদিকেই মোড় বেঁকলো।

আমি হাত তুলে চিৎকার করলাম, 'ট্যাক্সি।'

ট্যাক্সির গতি আস্তে করে, ড্রাইভার বাংলায় বললো, 'ভবানীপুর অবধি যেতে পারি।'

আমি বলে উঠলাম, 'তাতেই হবে।'

ইতিমধ্যে বৃষ্টিতে বেশ খানিকটা ভিজে গিয়েছি। ফুটপাথ থেকে বাধ্য হয়েই রাস্তার পায়ের পাতা ডোবা জলে, মল্লিকাকে নিয়ে নামতে হলো, আমার পায়ে জুতো, ওর পায়ে স্যাণ্ডেল। ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে ওঠার সময় কনস্টেবল পিছন থেকে বলে উঠলো, 'ঠিক হ্যায় ছোকরি, কোই দিন ও জরুর পাকাড় যায়েগী।'

ট্যাক্সির ড্রাইভার কৌতূহলিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি তাকে শুনিয়ে ইচ্ছা করেই বললাম, 'আপ হম্‌কো সাথ্ ডি ডি সাহাব কা মোকাম পর আ

boiRboi.net

সকতা।' বলতে বলতে দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বললাম, 'চলুন।'

আলো বিশেষ নেই, তবু ড্রাইভার মল্লিকার মুখের দিকে পিছন ফিরে দেখলো। আমার নতুন উৎকণ্ঠিত সংশয় দেখা দিল। ড্রাইভার মল্লিকাকে চেনে না তো? কিছুই আশ্চর্যের না। কিছুক্ষণ আগে ওর মুখ থেকেই যে সব কাহিনী শুনেছি, ওকে বা ওর আসল পরিচয় জানা, একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের পক্ষে অসম্ভব না।

ট্যাক্সি দু'দিকে জল ছিটিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। আমার গায়ের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, মল্লিকা এক পাশে কাত হয়ে মাথার চুলে হাতের ঝাপটায় জল ঝাড়তে লাগল। ওর আর একটা হাত অনায়াসেই আমার কোলের ওপর রেখেছে। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথার চুলে ঘষলাম। মল্লিকা বললো, 'বাস-টাস পাবো কী না, কে জানে।'

এই প্রথম আমার খেয়াল হলো, ও কোথায় থাকে, আমি কিছুই জানি না। নিতান্ত পুলিসের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্যই আমি ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছি। ড্রাইভার বললো, 'কলকাতার রাস্তায় এখন আর বাস নেই। যা বৃষ্টি, গোটা কলকাতা ভাসছে।'

আমি গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'গোপালনগর।' মল্লিকা বললো. 'আলিপুরের দিকে। তুমি কোথায় থাকো?'

বললাম, 'আমি থাকি খুব কাছেই, হেঁটেই চলে যাওয়া যায়।'

মল্লিকা উৎসাহিত হয়ে বললো, 'এত কাছে? কে কে আছে বাড়িতে?'

বলবার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। ওর ভেজা ভেজা চুলের গোছা আমার চিবুকের কাছে ঠেকছে। ও আমার দিকে অনেকখানি ফিরে বসলো। আমি বললাম, 'আমি একলাই থাকি।' বলে ওর দিকে তাকাতে গিয়ে, ওর নিশ্বাস লাগলো আমার গলার কাছে। চোখ দুটো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চিকচিক করছে। বললো, 'তা হলে তোমার ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দিলে হয়।'

এই সামান্য কথাটা যে আমাকে কতোটা বিভ্রান্ত আর ব্যাকুল করে তুলতে পারে, ওর কোনো ধারণা নেই, আমারও নেই। আমি তৎক্ষণাৎ কথাটার কোনো জবাব দিতে পারলাম না। মল্লিকা হঠাৎ আরো ঝুঁকে, আমার কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে বললো, 'ভয় নেই, তুমি কিছু করলেও, আমি তোমার কাছে টাকা চাইবো না, মাইরি বলছি। তুমি যতো ভোরে বলবে, আমি উঠে চলে যাবো। এখন আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে চাই না।'

ও ঠিক ওর মতোই কথা বলছে। আমার ভিতরে কী ঘটে যাচ্ছে, তা আমিই বুঝতে পারছি। ওর কোমল তপ্ত বুক আমার ডানায় ঠেকছে। উষ্ণ নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে কানের কাছে, গালে আর ঘাড়ে। ওর মুখ থেকে এখনো ফিশ ফ্রাইয়ের গন্ধ পাচ্ছি। ও একটা হাত তুলে আমার কাঁধে চাপ দিল, ফলে ওর শরীর আমার শরীরে আরো নিবিড় হলো। আশ্চর্য আমার চিরকালের সংস্কার আর রুচি কতো দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। লোকভয় আর অপবাদের কোনো বাধাও আমি বোধ করছি না।

'অবিশ্যি তুমি পুলিস সাহেবের বন্ধু, হয় তো খুব বড় মানুষ।' মল্লিকা আবার কানের কাছে মুখ রেখে বললো, 'এসব বলছি বলে রাগ করছো না তো? দেখো বাপু, আমাকে আবার ডুবিও না। হয় তো বেশী সাহস করে বলে ফেলেছি। তা

boiRboi.net

হলে আমাকে চৌরঙ্গীর ওপর নামিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু রাগ-টাগ করো না।'

আমি ড্রাইভারের উদ্দেশে, বিনীত আর নরম স্বরে আমার ঠিকানাটা জানিয়ে বললাম, যদি সে দয়া করে সেই রাস্তায় নামিয়ে দেয়। ড্রাইভার একবার পিছন ফিরে দেখলো, তারপরে বললো, 'সে রাস্তা তো একটু বাঁ দিকে গেলেই হবে, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে হয়তো আবার কেউ পাকড়াবে, তখন আমি কী করবো?'

বললাম, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাকে যাতে কেউ না পাকড়ায় আমি সে রকম জায়গাতেই নেমে যাবো। বাড়ির কাছেই অন্ধকার ফাঁকা জায়গায় আমি নেমে যাবো।'

ড্রাইভার কথাটা বিশ্বাস করলো কী না জানি না, কোনো জবাব না দিয়ে, বাঁ দিকের রাস্তায় ঘুরে আমাদের পাড়ার দিকে গাড়ি চালালো। আমি বুঝতে পারছি, মল্লিকা এখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ও আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছে। কিন্তু আমার কি কিছু আর বলার আছে? কয়লার গুদামে আগুন লাগলে যেমন, ভিতরের আগুন থেকে ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকে, আমার সেই রকম হচ্ছে। ভিতরে আগুন, আর বাইরে ধোঁয়ার মতো আচ্ছন্নতায় আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছি। আমি কোনো কথা বলতে পারছি না।

'তোমাকে অবিশ্যি আমার ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে।' মল্লিকা আবার বললো, 'আমার ভয়-টয় করছে না, বেশির ভাগ লোকজনকেই যেমন লাগে। তবে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমি চোর নই। আমাদের তো কেউ বিশ্বাস করে না। ভাবে, ঘর থেকে কিছু হাতিয়ে সটকে পড়বে।'

এরকম কোনো কথা আমার মনে জাগেই নি। আমি দূর থেকে আমাদের গেট দেখতে পেয়ে, ট্যাক্সিকে থামতে বললাম। গোটা পাড়াটাই একেবারে নিঝুম। কোনো কোনো বাড়ির জানালায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। এখনো টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে, মল্লিকাকে নিয়ে নামলাম। ঘরের চাবি আমার সঙ্গেই রয়েছে। সব দিন চাবি ব্রহ্মচারিদের দিয়ে যাই না।

*

সিঁড়ির আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুইচের সন্ধান জানা সত্ত্বেও আমি আলো জ্বাললাম না। কারণ, বিভিন্ন ফ্ল্যাটের কোনো কোনো চাকর সিঁড়ির নিচে বা মাঝখানের চওড়া জায়গায় রাত্রে ঘুমোয়। আমি মল্লিকার হাত ধরে, যতোটা সম্ভব কম শব্দ করে, আমার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ইয়েল লকের তালা খুলে, ভিতরে পা বাড়িয়ে বললাম, 'চলে এসো।'

মল্লিকা ভিতরে ঢোকবার পরে, দরজা বন্ধ করে আমি ঘরের আলো জ্বাললাম। ঘরের মধ্যে বেশ গরম, পাখাও খুলে দিলাম। মল্লিকা কয়েক মুহূর্ত ঘরের চারদিক দেখলো। বাথরুমের আর ছাদে যাবার বন্ধ দরজা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওগুলো কি ঘরের দরজা?'

আমি বললাম, 'না, একটা বাথরুমের দরজা, আর একটা ছাদে যাবার।'

মল্লিকার চোখ ঝকমকিয়ে উঠলো, বললো, 'ছাদও আছে? কী মজা! আর এই

boiRboi.net

এত বড ঘরটায় তুমি একলা থাকো ?'

আমার জবাবের প্রত্যাশা না করেই, ও ছাদের দরজার কাছে গেল। ছাদে যাবে নাকি ? কিন্তু দরজার পাশ দিয়ে গিয়ে, আমার সাবেকী আমলের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে দেখলো। যেন এটাই ওর প্রথম কাজ ছিল, আমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখে নেওয়া। মাথার চুল হাত দিয়ে তুলে তুলে পিছনে ঠেলে দিল। ব্যাগটা রাখলো আমার টেবিলের ওপরে। বললো, 'জামাটাও একটু ভিজে গেছে। কিন্তু তোমার এখানে আমার পরবার মতো কিছুই নেই। বেলবটস খোলা দরকার। তোমার লুঙ্গি আছে ?'

'পায়জামা আছে।'

'সেটা তো আমার বুকের ওপর উঠে আসবে।' বলে ও হেসে উঠলো, 'গুটিয়ে নিয়ে পরা যাবে। আর তোমারই একটা জামা গায়ে দিতে পারবো। সেটাও বোধ হয় হাঁটুর কাছে নেমে আসবে। তুমি বেশ ঢ্যাঙা আছো। আমার অবিশ্যি কিছুই দরকার নেই, এমনিই থাকতে পারি। জামাটা খুলে ফেলি ?'

আমি একটু ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আমার হাওয়াই শার্ট দিচ্ছি, বাথরুমে গিয়ে বদলে এসো।'

আমার কথার মধ্যেই, ও ওপেন ব্রেস্ট জামার বোতামগুলো খুলে ফেলে, জামাটাও খুলে ফেললো। গায়ে শুধু ব্রা। অল্প দামী ব্রা, নিশ্চয় অনেকদিন কাচা হয় নি। ঘামে আর ময়লায় অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। ও জামাটা একটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, নিজের বুকে দুহাত একবার বুলিয়ে বললো, 'সেই কখন পরেছি। জামা খোলবার জন্য বাথরুমে যাবার দরকার কী ? তবে আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে। তোমার বিছানাটা এত বড় কেন ? এ তো বউকে নিয়ে শোবার মতন বড় খাট। তোমার বউ আছে ?'

আমি ওর গায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিলাম না। বললাম, 'নেই। খাটটা সাবেক কালের। এ ঘরের সবই সাবেক কালের। এক সময়ে এসব আসবাবপত্র এ বাড়ির অন্য ঘরে ছিল। এখনো কিছু কিছু অন্য ঘরে ভাড়াটের কাছে রয়ে গেছে।'

'আমি তোমার কথা ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।' ও আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'এসব জিনিসপত্তর কার ?'

আমিই একটু অপ্রস্তুত হেসে বললাম, 'আমাদেরই। মানে এ বাড়িতে আমাদের দেশ থেকে যখন বাড়ির লোকেরা এসে থাকতো, তখন এসব করানো হয়েছিল।'

মল্লিকা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ঠোঁটে রঙ, চোখে ঘন কাজল, বুকে ব্রা, আর বেলবটস পরা একটি মেয়ে, আমার ঘরে, আঁকা ভুরু জোড়া কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, এটা এমনই অভিনব, আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এই অভিনবত্বের মধ্যে, আমার মনে একটা মুগ্ধতাও রয়েছে, আর তা আমার সংস্কারগত অপরাধে মেশানো। আমি ওর গা থেকে সস্তা পাউডারের গন্ধ পাচ্ছি, তার সঙ্গে ঘামের। সরু কোমরের ওপর, বেলবটস শক্ত হয়ে এঁটে আছে। ডান কাঁধের নিচে বুকের কাছে ব্রা-র একটা স্ট্র্যাপের অংশ বাতাসে কাঁপছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'এ বাড়িটা কি তাহলে তোমাদের নাকি ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমাদের ফ্যামিলি প্রপার্টি।'

মল্লিকা যেন হঠাৎ কেমন রুষ্ট হয়ে বললো, 'ফ্যামিলির কী, তা জানতে চাই না। বলো যে, বাড়িটা তোমাদের, ভাড়াটে বাড়ি না, তাই তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম। ও তৎক্ষণাৎ বললো, 'তার মানে তোমরা বড়লোক। সেটা বলতে গিয়ে মিছিমিছি আমার কাছে ন্যাকামো করছো। এই জন্যেই, আমি বড়লোকদের দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

ন্যাকামো! আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। ও ব্যাপারটা আমি নিজে একদম পছন্দ করি না। নিজেকে বড়লোক ভাবা, আর তা নিয়ে ন্যাকামো করা, আমি আদৌ এসব পারি না। বললাম, 'ন্যাকামো ব্যাপারটা আমার জানা নেই। নিজেকে বড়লোক ভাববারও কোনো কারণ নেই। আমার বাবা কাকারা বড়লোক হতে পারেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'আরে, তুমি রেগে গেলে নাকি?' মল্লিকা একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর দু'হাত আমার কাঁধে তুলে দিল। তারপর হেসে, মুখটা এগিয়ে নিয়ে এলো।

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ওর ঠোঁট খোলা, কয়েকটা দাঁত ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। ওর নাসারন্ধ্র কাঁপছে, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে একটা নিবিড় আবেগ। এরকম অভিব্যক্তিকে আমন্ত্রণ বলে বোধ হয়। ও ফিসফিস করে বললো, 'তুমি খুব ছেলেমানুষ আছো দেখছি, অল্পেতেই রেগে যাও। বড়লোক হওয়া মোটেই খারাপ না। ন্যাকামো বলাটা আমার অন্যায় হয়েছে, না? আসলে তুমি লজ্জা পাচ্ছিলে, তাই তো?' বলে হেসে উঠে, ও দু'হাত দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে আমার বুকের কাছে নিজেকে চেপে ধরলো। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিল আমার ঘাড়ে, আর হেসে, চোখের তারা ঘোরালো।

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট, যদিও অশালীন। হয় তো এরকমভাবেই ও ওর খদ্দেরদের সঙ্গে আচরণ করে, কিন্তু আমার ভিতরেও একটা অদম্য আকুলতা জেগে উঠলো। এখন মুখোমুখি, আর সোজাসুজি ওর বুকের কোমল তপ্ত স্পর্শ আমার শরীরে নিবিড়তর। ও শরীরের নিম্নদেশও আমার শরীরে গাঢ় ঘনত্বে চেপে রয়েছে। আমার মুগ্ধ চোখে, ওকে রীতিমতো রূপসী দেখছি। আমাকে এমন করে আর কেউ কখনো মুগ্ধ করেছে বলে মনে হয় না, এমন করে সব বিচার বুদ্ধি লোপ করে দেওয়ার মতো। ওর চোখের নিচে গালে কাটা দাগটা, যেন আমারই বুকে কেটে বসছে। ও প্রায় জোর করেই আমার মাথাটা টেনে নুইয়ে দিল, ঠোঁট চেপে ধরলো আমার ঠোঁটে, তারপরেই ওর তপ্ত জিভের স্পর্শ আমার মুখের মধ্যে, সুখের তড়িত ঝলকের মতো ছোবল দিল। এখনো ওর মুখে হালকা মাছ ভাজা আর মৃদু কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ। আমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে, বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে, ওর আগ্রাসী চুম্বনের প্রতিটি জবাবে, আগ্রাসী হয়ে উঠলাম। ও ধারালো দাঁতে মাঝে মাঝে এমন দংশন করলো, একজন পুরুষ হয়েও, রীতিমতো ব্যথা বোধ করলাম। কিন্তু এ ব্যথা আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে যেন চকিত সুখে তোলপাড় করে তুললো। তারপরে ও ঠোঁটের স্পর্শকে শিথিল করে, আমার ঘাড়ের ওপর মুখ নামিয়ে আনলো। আমি ওর চোখের নিচে, গালের কাটা দাগটার ওপরে, জিভ আর ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলাম।

boiRboi.net

মল্লিকা হঠাৎ হেসে উঠে, একটু সরে দাঁড়ালো, আর গালের কাটা দাগের ওপর আঙুল বুলিয়ে বললো, 'এই দাগটার ওপর তুমি চুমো খাচ্ছো?'

আমার নিঃশ্বাস এখনো দ্রুত, রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে দাগটা হলো? কেটে গেছলো?'

'বাঘে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল।' বলে ও হাসতে হাসতে আমার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে সরে গেল, তরপরেই একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ঘরের এদিকে ওদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ঘরে মাল-টাল কিছু নেই? তুমি নেশা-টেশা কর না?'

ও মদের কথা জিজ্ঞেস করছে। আমার ঘরে বন্ধু-বান্ধবদের আসর মাঝে মধ্যে হয়। আমি নিজেও তাতে অংশ নিই। মদ্যপ বলতে যা বোঝায়, সেরকমটা হয়ে উঠতে পারি নি। চাকরির সূত্রেই, মাঝে মধ্যে লাঞ্চ ডিনারের নিমন্ত্রণে, অল্পস্বল্প পান করে থাকি। ক্যাজুয়ালি বলতে যা বোঝায়, আমার মদ্যপান সেইরকম। তেমন কোনো অদম্য আকর্ষণ বোধ করি না, আমার কোনো বন্ধু, এমন কি বান্ধবীও যেমন করে থাকে। আমাদের সাংবাদিকদের একটা মদ্যপ বলে দুর্নাম আছে। দুর্নামের কলঙ্কটা শতভাগ স্বীকার্য না। কিন্তু আমার ঘরে কি কিছু আছে?

আমার নিজেরই সংশয় জাগলো। আমার এই আইবুড়ো আস্তানায়, বন্ধু-বান্ধবদের আসরের ছিটে ফোঁটা অনেক সময় পড়ে থাকে। কিন্তু বেশী দিন কখনোই থাকে না। অন্য কেউ এসে, খুঁজে-পেতে তার সদ্‌গতি করে যায়। আমি নিজে কখনো কিছু কিনে এনে রাখি না। বললাম, 'কখনো-সখনো, অল্পস্বল্প, বন্ধুদের সঙ্গে। আমার মনে হয় না, কিছু আছে বলে। তবু দেখছি। বন্ধুরা অনেক সময় বোতল শেষ না করতে পেরে রেখে যায়।' বলে আমি আমার লেখার টেবিলের ডান দিকের বড় দেরাজটার পাল্লা খুলে দেখলাম। কিছু নেই। আলমারি খুলেও হতাশ হলাম। এমন কি ওয়ারড্রবটাও দেখতে ভুললাম না। কারণ বন্ধুরা অনেক সময় ওটার মধ্যেও বোতল ঢুকিয়ে রেখে যায়। আসলে লুকিয়ে রেখে যায়, যেন অন্য বন্ধুরা এসে খুঁজে না পায়।

আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'সরি, তোমাকে ওটা দিতে পারলাম না।'

'সে তো তোমার খোঁজা দেখেই বুঝেছি।' মল্লিকা বললো, 'বন্ধুরা কে কবে ছিটে-ফোঁটা ফেলে রেখে যাবে, সেই আশায় থাকলে হয়?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি রোজই খাও নাকি?'

'তা প্রায়ই খাই।' ও বললো, আবার এগিয়ে গেল আয়নার সামনে, 'এক একদিন যা ধকল যায়, না খেলে চলে না। আজ অবিশ্যি সেরকম কিছু হয় নি, তবু একটু খেলে বেশ জমতো। একটু মৌতাত যাকে বলে।' বলে আঙুলে চিমটি কাটার ভঙ্গি করে, ঠোঁট ছুঁচলো করলো, আর চোখের তারা ঘুরিয়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করলো।

ইঙ্গিতটা খারাপ, ভাল্‌গার যাকে বলে, কিন্তু বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ঘাত! আমি মনে মনে হতাশ আর বিমর্ষ হয়ে উঠলাম, মনে হলো, আমি একটা বিশেষ সুযোগ হারালাম। মল্লিকা আবার বললো, 'একটু খেলে, রাত্রে ঘুমটাও ভালো হয়। রাত্রে ঘুম না আসার মতন পাপ আর কিছু নেই। মেজাজটা তো খিঁচড়ে থাকে। আমরা

অবিশ্যি সস্তার মদ খাই, টিউবের চোলাই মাল।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'সাইকেলের টিউব জানো না? তার মধ্যে চোলাই করা মাল পাওয়া যায়।' মল্লিকা বললো, 'সেসব আস্তানা আমি চিনি, আমাদের ওদিকে। চেনা লোক না হলে দেয় না, আবগারির টিকটিকিরা নজর রাখে তো। একটা সিগারেট ছাড়ো তো। না কি তাও খাও না?'

আমি তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুতভাবে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে, ওর কাছে এগিয়ে গেলাম, বললাম, 'আমাকে এতোটা ভালো ছেলে ভাববার কারণ নেই। দোকান খোলা থাকলে, তোমাকে কিনে এনে খাওয়াতে পারতাম।'

মল্লিকা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো, আমি দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম। ও আয়নার দিকে তাকিয়ে, ভক্ করে ধোঁয়া ছাড়লো, আর মুখটা একটু বিকৃত করে ধোঁয়া ছাড়লো। দেখেই মনে হলো, ও ধূমপানে অভ্যস্ত না। আয়নায় আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'আমাকে রেস্টুরেন্টের মধ্যে দেখেই তোমার ভালো লেগেছিল, না?'

প্রশ্নটার সঠিক অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। মল্লিকার যে জবাবের বিশেষ প্রত্যাশা আছে, তা মনে হলো না। ঈষৎ কোমর দুলিয়ে, বুক ঘুরিয়ে ও নিজেকেই, আয়নার বুকে দেখতে লাগলো। আমি বললাম, 'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসছিলে, বোধহয় কোনো ইশারাও করছিলে, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। ভেবেছিলাম, কারোর জন্য অপেক্ষা করছো।'

'আমাকে তোমার ভালো লাগে নি?' ও আয়নাতে আমার দিকে তাকিয়ে, ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো।

আমি ওর সুগঠিত কাঁধে একটা হাত রাখলাম, একটু চাপ দিলাম, বললাম, 'তাতো নিশ্চয় লেগেছে।'

ও আমার দিকে ফিরে হাসলো, তারপর সিগারেটটা আমার ঠোঁটে ঢুকিয়ে দিয়ে, বাথরুমের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'একটু বাথরুম ঘুরে আসি।'

'তোমাকে কি পায়জামা আর জামা দেবো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মল্লিকা দরজা খুলে, বাথরুমের ভিতরে গেল, বললো, 'দাঁড়াও, একটু পরে। বাহ্, তোমার বাথরুমটা দারুণ! আমি এখন চুল ভেজাবো না, তবে গাটা ধুয়ে নেব।'

ও দরজা বন্ধ করলো না। আমার গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করতে লাগলো, আর যেন নিশ্বাস আটকে এলো, অথচ আমি নিজে গিয়ে দরজাটা টেনে দিতে পারছি না। হঠাৎ বাথরুমের ভিতর থেকে ওর খিলখিল হাসি ভেসে এলো, তারপরে স্বর, 'শালা সেপাই দুটোকে তুমি খুব জব্দ করেছো। আমি তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছলাম। খালি মনে হচ্ছিল, এই বুঝি আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তাহলেই হয়েছিল, কদিন হাজতবাস আর জরিমানা কেউ ঠেকাতে পারতো না।'

আমি ফ্লাশ টানার শব্দের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কোনো শব্দ হলো না, মল্লিকা ওর বেলবট্সের জীপটা টেনে দিতে দিতে বেরিয়ে এলো, কাছে এসে বললো, 'কিন্তু তুমি তো বললে না, তোমার সঙ্গে পুলিসের কী সম্পর্ক? সেইদিন তুমি অফিসারের

boiRboi.net

সঙ্গে রামু সিং-এর কুঠিতে গেছলে কেন ?'

ওর বেলবট্‌সের বন্ধ করা জীপ্‌ থেকে চোখ সরাতে আমার দেরি হচ্ছিল। বললাম, 'তোমাদের দেখতে আর জানতে।'

'তার মানে ?' মল্লিকা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের আবার দেখা আর জানার কী আছে ?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমি খবরের কাগজে কাজ করি। তোমাদের নিয়ে লেখবার জন্য, তোমাদের দেখার দরকার, জানা দরকার, তাই না ?'

'খবরের কাগজগুলোর বুঝি খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই ?' মল্লিকা বললো, 'আমাদের কথা আবার লেখবার কী আছে ? লিখেই বা তোমরা কী করবে ? দেশ থেকে আমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে ?' একটা চ্যালেঞ্জের সুর ওর গলায়।

আমি ব্যস্ত হবে বললাম, 'না না, বিদায়-টিদায় করার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমাদের বিষয়ে দেশের লোককে জানানোর জন্যই লেখা। কী অবস্থায়, কেন, আর কীভাবে তোমরা তোমাদের জীবনটা কাটাও।'

মল্লিকা হাত তুলে, হেসে উঠে, একটা বিদ্রূপের ধ্বনি করে বললো, 'তাতে আমাদের—।' ও একটা অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করলো, এবং আবার বললো, 'দেশের লোকেরা কি সব চোখ কান বুজে আছে, লিখে আমাদের কথা তাদের জানাতে হবে ? আমরা তো দেশের লোকের সঙ্গেই কারবার করি, তবে ? দেশের লোকের জানতে বাকীটা কী আছে ? গতর খাটাচ্ছি, খাচ্ছি, ব্যস্‌।'

মল্লিকার কথার মধ্যে একটা অনায়াস সহজ অথচ শক্ত যুক্তি আছে তথাপি কিছু কথা বোধহয় থেকেই যায়। বললাম, 'সাধারণ লোকে তোমাদের কথা আর কতো-টুকু জানে ? এই যেমন ধরো দালাল আর বাড়িওয়ালারা তোমাদের দৌলতে অনেক টাকা কামিয়ে নেয়।'

'জানি জানি।' মল্লিকা বলে উঠলো, 'তেমনি সেসব জায়গায় খানদানি মালদার খদ্দেররাও যায়। বেশী টাকা কামালে বেশী ভাড়া তো দিতেই হবে। পুলিসের হুজ্জোতি নেই, বাজে লোকেরা ঝামেলা করতে পারে না। জায়গার গুণ নেই ? কালীঘাটের কালী কি বেহালায় মেলে ?'

আমি ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ্যালয়ের বাড়িওয়ালাদের ওপর ওর অভিযোগ তো নেই-ই, ওর বয়সী একটা মেয়ের কাছ থেকে এরকম পাকা যুক্তিপূর্ণ কথাও আশা করি নি। তুলনাটা অদ্ভুত। ও আয়নার দিকে দেখে নিয়ে আবার বললো, 'আমরা যে চৌরঙ্গি ধর্মতলা পার্ক স্ট্রীটে পাক মারি, কেন ? এই জন্যেই তো। অনেক খদ্দের মিলে যায়। আলিপুরে বালিগঞ্জে কি মিলবে ? তাহলে ওদিকেই যেতাম। যেখানকার যা সেখানেই তা করতে হয়। পুলিসের হুজ্জোতি না থাকলে, রামু সিং-এর কুঠিতে কারবার ভালোই চলে। অনেক লোক আছে, যারা এসব পাড়াতেই কাজ মিটিয়ে নিতে চায়। তার উপায় নেই।'

ওর কথার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, আর এই সব বলতে বলতেই ও কোমর ঘুরিয়ে, কাঁধে ঢেউ দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তাহলে সোনাগাছির মতো একটা জায়গায় ঘর ভাড়া নাও না কেন ?'

'ঘর ভাড়া না নিয়েই যদি চলে যায়, খারাপ কী?' মল্লিকা বললো, 'ওরকম শিকড় গেড়ে বসতে আমার ইচ্ছা করে না। তোমাদের এ তল্লাটেই তো কয়েকটা বাড়ি আছে, এসব কারবারই চলে। আমাদের গোপালনগরেও আছে, অনেক শাঁসালো খদ্দেরও সেখানে আসে। সব বাড়িতেই আমার যাওয়া আসা আছে। ভয়ও আছে এসব বাড়িতে। কখন যে পুলিসের হামলা হবে, কেউ বলতে পারে না। আমি আসলে এ কারবার চালাতে চাই না।' ও হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালো, আয়নার দিকে তাকালো। কেমন একটা ভ্রূকুটি অভিমানভরা দৃষ্টি। তারপরেই ওর বুকটা ফুলে উঠলো, একটা গভীর নিশ্বাস ফেললো, এবং হঠাৎ হেসে বলে উঠলো, 'এরকম একটা আয়না আমার থাকলে বেশ হতো। তোমার কী দরকার? এরকম একটা আয়না তো আমারই দরকার, তাই না?' আমার দিকে ঘাড় কাত করে তাকালো।

ও আর এ ব্যবসা চালাতে চায় না, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিবর্তন যেন ওর মধ্যে দেখা গেল। এটা ওর কী ধরনের বীতস্পৃহা? কথাটা কি আদৌ সত্যি?

আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না, কিন্তু ওর এ কথাটাও খুবই যুক্তি-পূর্ণ মনে হলো। সত্যি, নিজের আপাদমস্তক দেখতে পাওয়া একটা আয়না থেকে ওরই বেশী দরকার। যে-কোনো মেয়েরই দরকার। ওর দরকারটা হয়তো আরো বেশী। এ ঘরে আসার পর থেকে, ও আয়নার সামনেই কাটাচ্ছে। নিজেকে নানান-ভাবে দেখাটা যেন ওর অবচেতন থেকেই ঘটছিল, অথচ ও অন্য কথা বলে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'ঠিক বলেছো। তোমার কী রকম আয়না আছে?'

ও দু হাত প্রসারিত করে দেখিয়ে বললো, 'এ্যাত্তো বড়, ছোট একটা কুলুঙ্গির মধ্যে।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো, আবার বললো, 'ওটাকে জানালার গরাদে ঝুলিয়ে, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিই।'

ওর মুখে 'ম্যানেজ' শব্দটাও অদ্ভুত। আমারই এতক্ষণ খেয়াল করা উচিত ছিল, ওর বেলবটস্-এর কাপড়টা কতো সস্তা। সোফার ওপরে ছুঁড়ে ফেলা জামাটাও সেইরকমই। দরজার কাছে খুলে রাখা, জলে ভেজা স্যান্ডেল দুটোর দামও বেশী না। অথচ, এক পলকেই, পার্ক স্ট্রীটে ওকে দেখলে, প্রায় সম্পন্ন আধুনিক মেয়ে বলে মনে হবে। ওর শরীরের গড়ন অসাধারণ না হলেও, বেশ দীর্ঘ, সুগঠিত, ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণ নেই। মুখ দেখলে মোটেই বোকা গ্রাম্য মনে হয় না। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে, একটা বিশেষ আকর্ষণও আছে ওর মুখের, চোখের দৃষ্টিতে। আমি কিছুই জানি না, ও কীরকম পরিবেশ থেকে এসেছে।

মল্লিকা হঠাৎ একটা হাই তুলে বললো, 'আহ্, একটু মাল থাকলে বেশ হতো। এসো তো, পিছনের ফাঁসটা খুলে দাও তো।' বলে পিছন ফিরে দাঁড়ালো। কাঁধের কাছে ব্রেসিয়ারের সরু স্লিভটা একটু টেনে ধরলো। আমি কাছে গিয়ে অবাক হয়ে বললাম, 'এটা খুলবে নাকি? তাহলে বাথরুমে গেলেই তো হতো।'

'কেন, আমার খোলা গা দেখলে তোমার জাত যাবে?' বলতে বলতে ও এক পা পেছিয়ে এসে, আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো, 'আমার গায়ের জিনিস-টিনিসগুলো খারাপ না, সবাই দেখতে চায়। তোমার কথা অবিশ্যি আলাদা, তুমি ইচ্ছা করে

boiRboi.net

আমাকে ঘরে ডেকে আনো নি, আমি নিজেই এসেছি। কিন্তু আমাকে তো তোমার ভালোই লেগেছে। লাগে নি?' বলেই ও ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। চোখের কোণে ওর তির্যক্ দৃষ্টি।

আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। ওর এই জিজ্ঞাসার মধ্যেও যেন একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ও যেন আমাকে যাচাই করতে চায়? এখন ও খুব ভালো করেই জানে, ওকে আমার ভালো লেগেছে। যে-ভালো লাগা, আমাকে রীতিমতো অসহায় করে তুলেছে। আমার এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের এতোকালের, নিজেকে চেনা-চিনি, সবই ও পালটে দিয়েছে।

মল্লিকা হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়েই, ওর পাশ ফেরানো মুখটা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলো। আমি পিছন থেকে ওর বাঁ কাঁধে একটা হাত রেখে, ওর ঠোঁটের কোণে ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলাম। ও তার মধ্যেই, খুব দ্রুত আর মৃদুভাবে আমার ঠোঁটে দংশন করলো, এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'আমি জানি আমাকে তোমার ভালো লেগেছে। দাও, ফিতের ফাঁসটা খুলে দাও।'

আমি চোখ নামিয়ে, ব্রেসিয়ারের আংটাটা দেখলাম। ব্রেসিয়ারটা রীতিমতো ময়লা। দেখলেই বোঝা যায়, অনেক দিন কাচা হয় নি। ওর কি বাড়তি আর একটা নেই? আমি আংটাটা ভালো করে দেখে, একটু চাপ দিয়ে টেনে খোলার চেষ্টা করলাম। এরকম একটা কাজ আমার জীবনে এই প্রথম, কোনো মেয়ের ব্রা খোলা। আমি ভয় পেয়ে বললাম, 'তোমার বুকে লাগছে না তো?'

'মোটেই না, তুমি আরো জোরে টানো।' ও বললো।

অথচ আমার ধারণা, ওর লাগছে। আমি আর একটু জোরে টেনে, আংটা খুলে দিলাম। মল্লিকা বললো, 'ঠিক আছে।' বলে ও কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে, ব্রা খুলে ফেললো।

দেখলাম পিঠে রীতিমতো লাল দাগ পড়ে গিয়েছে। ও আয়নার দিকে ফিরে, ব্রাটা ছুড়ে ফেলে দিল সোফার ওপরে জামার কাছে। বুকের নিচে হাত দিয়ে ঘষে বললো, 'আহ্, বাঁচা গেল।'

আমি আয়নায় ওর খোলা বুকের দিকে তাকালাম। মনে হলো, আমার চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। কেন জানি না, আমি ওর এতোটা অনম্র সুগঠিত বক্ষ আশা করি নি। বৃন্ত থেকে নুয়ে পড়তে উদ্যত, জোড়া বেলের মতো ওর বুক। মেদহীন শরীরের বুকের মাঝখান থেকে একটা রেখা যেন ওর নাভির কাছে নেমে গিয়েছে। ও আয়নার মধ্যেই আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো, এবং চোখের তারা ঘুরিয়ে একটা ইশারা করলো। যা হয় তো কোনো সুস্থ সাধারণ মেয়ের পক্ষেই সম্ভব না। তারপরেই ও জীপটা টেনে খুলে দিয়ে এক পা তুলে বেলবটস্ হাত দিয়ে টেনে খুলে ফেললো। সেটাকে সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, জাঙিয়া পরা অবস্থায় বাথরুমে চলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই এমনভাবে ঘটলো, যেন খুবই স্বাভাবিক আর সহজ, যদিও কোনো মেয়ের কাছ থেকেই এরকম নির্লজ্জতা আশা করা যায় না। মল্লিকার কাছে হয় তো এরকমটাই স্বাভাবিক। নগ্নতায় কোনো নিষেধ নেই। ওর জীবনেরই অভ্যস্ত অঙ্গ।

boiRboi.net

মল্লিকা বাথরুমে ঢুকে, এবার দরজাটা ভিতর থেকে ঠেলে দিল। আমি গায়ে জল ঢালবার শব্দ পাচ্ছি তারপরেই ওর স্বর ভেসে এলো, 'আহ্, অনেকদিন এরকম ভালো বাথরুমে চান করি নি। তোমার সাবানটার গন্ধ খুব সুন্দর। খুব দামী, না? এই, শুনছো।'

আমি চমকিয়ে উঠে বললাম, 'হ্যাঁ, বলো।'

'আমি ছাই তোমার নামটাও মাইরি জানি না।' কথা বলতে বলতে বোধ হয় ওর গলায় জল ঢুকে গেল, কিংবা আর কিছু।

কিন্তু আমার নামটা জানা কি ওর খুব দরকার? কী হবে জেনে? আমি যদি একটা বাজে নাম ওকে বলে দিই, তা হলেই বা ও জানছে কেমন করে। বাথরুমের ভিতর থেকে আবার ওর গলা শোনা গেল, 'এই, শুনছো, তুমি কোথায়?'

'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?' ওর স্বর ভেসে এলো, জল ঢালার শব্দের মধ্যে। আমি বললাম, 'আমার নাম অমল।'

'বাহ্, তোমার নামটা বেশ ভালো।' ও ভিতর থেকে বললো, 'জানো, আমি একদিন দুপুরে এসে, তোমার এই বাথরুমে খুব ভালো করে চান করবো। মাথার ওপরের ঝর্নাটি খুলে দিয়ে, বুঝলে? রাত্রে তো মাথার চুল ভেজাতে পারবো না, তাই ঝর্নাটা খুলতে পারলাম না। ওটা দিয়ে জল পড়ে তো, না কি খালি লোক দেখানো রয়েছে?'

বোঝা যাচ্ছে, ওর এই কথার মধ্যে একটা ব্যর্থ অভিজ্ঞতার সূত্র আছে। অনেক বাথরুমেই শাওয়ার থাকলেও, তা কার্যকরী থাকে না। অতএব, তখন সেটা লোক দেখানো ছাড়া, আর কিছুই না।

আমি বললাম, 'ওটা এখনো ভালোই আছে, বেশ তোড়ে জল পড়ে।'

ও ভিতর থেকে বললো, 'তা হলে আমি একদিন দুপুরে এসে, এখানে ভালো করে চান করবো। তোমার শ্যাম্পুটা বেশ দামী, বোতলটা দেখেই বুঝতে পেরেছি। খবরের কাগজে ওটার ছবিও দেখেছি। যেদিন আসবো, সেদিন চুলে শ্যাম্পুও করবো। অনেক দিন ভালো করে মাথা ঘষা হয় নি।'

শ্যাম্পু আর মাথা ঘষা, দুটো কথা ও এক সঙ্গেই ব্যবহার করছে। ওর চুল দেখে আমার মনে হয়েছিল, শ্যাম্পু করা নরম ঢেউ খেলানো চুল। ও আবার ভিতর থেকে ডাকলো, 'এই শুনছো।'

ডাকটা এতোই স্বাভাবিক, আর এমন সহজ করে ও ডাকছে যেন এর মধ্যে কোনো কিছু ভাববার অবকাশই নেই। অথচ আমার নামটা ও জানে, কিন্তু নাম ধরে ডাকছে না। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বলো।'

'এখানে যে পাউডারের কৌটো রয়েছে, এতে কি পাউডার আছে?' ও জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, 'তা আছে বই কি।'

ও ভিতর থেকে বললো, 'বাথরুমে পাউডারের কৌটো থাকে, আমি জানি না। তোমার বাথরুমের আয়নাটাও বেশ বড়। আহ্, ঢেলে ঢেলে আর সাধ মিটছে না। রোজ রাত্রে যদি এতোটা জল ঢেলে গা ধুতে পারতাম, এমনিতেই আমার ঘুম এসে

boiRboi.net

যেতো।'

আমি বলে উঠলাম, 'কেন, তোমাদের কি গা ধোয়ার জল থাকে না?'

'গা ধোয়া?' বলতে গিয়ে ওর মুখে বোধহয় জল ঢুকে গেল, একটু সামলিয়ে নিয়ে বললো, 'শালা খাবার জলই মেলে না, তায় আবার গা ধোয়া। দিদির বাড়িতে গেলে শুধু একটু পাওয়া যায়, ওরা চৌবাচ্চায় জল ধরে রাখে। আমাদের বাড়িতে তাও নেই। পয়সা দিয়ে জল কিনতে হয়, নয় তো নিজেরাই রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে আসি। অবিশ্যি আমাদের পাড়ায় একটা বড় পুকুরও আছে, বড় লোকদের বাগানবাড়ির পুকুর, ওখানেও চান করতে যাই কিন্তু দরোয়ানটা ভারী খচরামি করে।'

আমি ওর জীবনযাপনের চেহারাটা সব বুঝে উঠতে পারছি না। ভিতরে জল ঢালা বন্ধ হতেই বুঝলাম, ওর গা ধোয়া শেষ হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ওয়ারড্রবের কাছে যেতে যেতে বললাম, 'ভেতরে শুকনো তোয়ালে আছে।'

ওর কোনো জবাব পাওয়া গেল না। আমি তাড়াতাড়ি একটা পায়জামা আর হাওয়াই শার্ট নিয়ে ভেজানো দরজার কাছে গেলাম, বললাম, 'পায়জামা আর জামা এনেছি, এ-গুলো হাত বাড়িয়ে নিয়ে নাও।'

'আরে ভেতরেই এসো না।' মল্লিকা বললো, 'তুমি আমাকে ল্যাংটো দেখলে, আমার জাত যাবে না।'

তা আমি জানি। জাত আমারো যাবে না। গত দুই সপ্তাহে, আমার কিছু কম দেখা হয় নি। নগ্নতার চূড়ান্ত রূপ আমি দেখেছি। কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে নি, তা বলতে পারবো না, কিন্তু তার চেহারা আলাদা। সেখানে আমার কোনো আবেগ ছিল না, নির্মোহ কৌতূহল ছিল। এখানে তা না। এখন আমি নিজেই আকাঙ্ক্ষার গ্রাসে কবলিত।

'কি হলো, আসতে পারছো না?' মল্লিকা বলতে বলতেই, দরজাটা হাট করে খুলে আমার সামনে দাঁড়ালো। আবার বললো, 'এত ভদ্রতা কিসের? তোমরা তো আমাকে এভাবেই দেখতে চাও। তবে আর এতো ন্যাকামো কিসের? সবাই আমার কাছে যা চায়, তুমিও তো তাই চাও, অ্যাঁ? তবে?' বলে ও থাবা দিয়ে ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে পায়জামা আর জামা নিয়ে ভিতর দিকে চলে গেল।

বাথরুমের আলোয় আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনো ওর গায়ের সব জল মোছা হয় নি। আলোর ছটায়, সোনালি বিন্দুর মতো ওর গায়ে জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। কিন্তু আমার মনটা ভিতরে ভিতরে কেমন বিমর্ষ হয়ে উঠছে। ওকে নগ্ন দেখার জন্য না, ওকে নগ্ন দেখা মানেই, আমার আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠা, ব্যাকুলতা বেড়ে ওঠা। ওর কথাগুলো আমাকে কেমন যেন বিমর্ষ করে তুলছে। আমি কি সত্যি ওকে এভাবে দেখতে চাই? আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না, সবাই ওর কাছে যা চায়, আমিও তাই চাই। আমি ওকে চাই, পরিপূর্ণ রূপেই চাই, কিন্তু সকলের মতো করে না। ও যাদের সঙ্গে আমাকে তুলনা দিচ্ছে। এই তুলনাটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আর এখানেই হয় তো আমার জীবনের বিপদের সংকেতটা রয়েছে, যা আমি এখন সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারছি না।

মল্লিকাকে দোষ দিয়েও অবিশ্যি কোনো লাভ নেই। ও তো ওর জীবনের

boiRboi.net

অভিজ্ঞতা থেকেই এসব বলছে। আমাকে আলাদা করে দেখবার বা বিচার করবার কোনো কারণই নেই। ও তো ধরেই নিয়েছে, আর সেটাই স্বাভাবিক, আমি আর দশটা সাধারণ বেশ্যাসক্ত পুরুষ খদ্দের ছাড়া, আর কিছুই নই। অন্যভাবে দেখবার বা ভাববার অবকাশই বা ও পেল কখন? আমার প্রতি ওর একটাই মাত্র বিশ্বাস, আমি নিজে থেকে ওর কাছে কোনো প্রস্তাব করি নি, আমার ঘরে ডেকে আনি নি। সে-কথাও ও বলেছে, আর সেই কৃতজ্ঞতাতেই ও আমার কাছে থাকতে চেয়েছে, কোনো রকম টাকা পয়সার বিনিময় ব্যতীতই।

মল্লিকাকে দোষ দিতে পারি না, কিন্তু স্বখাত সলিলে যে আমিই ডুবেছি। আমি ওর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করছি, অথচ আমি গণিকাসক্ত নই। আমার এই আকস্মিক আকাঙ্ক্ষার পশ্চাদপট আমার নিজেরই অজ্ঞাত। আমার সমাজ পরিবার শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি অনুযায়ী ও কোনো রকমেই আমার প্রেমপাত্রীও হতে পারে না। কিন্তু সেই রকম একটা অনুভূতিই আমার মধ্যে কাজ করছে। সকলের থেকে ব্যতিক্রম, এবং অনন্য হয়েই ওকে আমার পেতে ইচ্ছা করছে। সে কথা ওকে বলা যেমন দুঃসাধ্য, তেমনিই আমি নিজের কাছে নিজেই জটিলতর হয়ে উঠছি।

ও হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। গায়ে মুখে পাউডার ছড়ানো, তার ওপরেই হাওয়াই শার্ট আর পায়জামা পরা। ঘরের মধ্যে পাখার বাতাসে, পাউডারের আর সদ্য মাখা সাবানের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। এখনো ওর জামার বুকের বোতাম লাগানো হয় নি। তার জন্য ওর বুক হাট করে খোলা নেই, পাউডার লাগানো স্তনান্তরের অংশটুকু মাত্র দেখা যাচ্ছে। আমার শার্টটা সত্যি ওর হাঁটুর কাছে নেমেছে। ওর হাসবার কারণটাও কোমরের কাছে জামা সরিয়ে দেখালো। পায়জামাটাকে কোমরে অনেকগুলো পাক দিয়ে জড়িয়ে ওকে পরতে হয়েছে, অথচ চওড়ায় ওর কোমরে রীতিমতো আঁটসাঁট হয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক না। ও নিজেই বললো, 'আমার পাছাটা তোমার থেকে অনেকটা চওড়া, মেয়েদের পাছা তো।' বলতে বলতে ও আয়নার দিকে এগিয়ে গেল।

মল্লিকার চোখে এখন কাজলের দাগ নেই, ঠোঁটে রঙ নেই। গালে কপালের নানা জায়গায় পাউডার লেগে রয়েছে। ওর মুখটা দেখাচ্ছে ফরসা, আর রক্তহীন ফ্যাকাসে মতো। ওর চোখ দুটো বড় না, কিন্তু কালো, আর পাতাগুলো বড়। ও আমার চিরুনিটা হাতে তুলে নিল। আমি বললাম, 'এবার আমি বাথরুমে চানটা সেরে নিই।'

'তাড়াতাড়ি যাও, গা ধুয়ে এখন আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।' মল্লিকা মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে বললো।

আমি ওয়ারড্রব থেকে আমার রাত্রে পরে শোবার পোশাক নিয়ে, বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'তুমি ইচ্ছা করলে শুয়ে পড়তে পারো।

ও কোনো জবাব দিল না। এখন ওকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। অথবা, এ আমার চোখের ভ্রম। প্রথম থেকেই ওকে আমি সুন্দর দেখছি। রাত্রে বাড়ি ফিরে আমি রোজই স্নান করি। আমার সাময়িক বিমর্ষতার মধ্যেও, আমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে লাগলাম, আর কেবলই আমার মনে হতে লাগলো, আমার দেখা আর

boiRboi.net

দশটা মেয়ের চেহারার সঙ্গে, ওর তফাত কোথায়? ওকে দেখে কী করে বোঝা যাবে, ও একজন রাস্তায় ঘোরা পতিতা। আচরণে অবিশ্যিই বোঝা যায়, এবং কথাবার্তায়। অন্যান্য পতিতালয়েও, অনেক মেয়েকে দেখেই আমার একথা মনে হয়েছে। জীবিকা এবং পেশা ছাড়া, সমাজের সঙ্গে ওদের কোনোক্রমেই আলাদা করে চেনা সম্ভব না। কয়েকজন মোটামুটি শিক্ষিতা পতিতার সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে। তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের এমন একজন মহিলাকেও আমি পেয়েছি, যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো অঞ্চলে একটি চিলড্রেনস্ হোমও চালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার আগে থেকেই, তার অন্য জীবনটা শুরু হয়েছিল। তাকে পুরোপুরি পতিতাবৃত্তি বলা যায় না। স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী যুবকদের সঙ্গে তার মেলামেশা ছিল, যারা তাকে ভোগ করেছে, টাকা পয়সা দিয়েছে। তথাপি সে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। পারে নি। তা বোধহয় সম্ভবও ছিল না। উপরন্তু, তার নিরাপত্তাই প্রতি পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছিল। তার সাফ কথা, 'ওদের সঙ্গে মিশে আমার পেটও ভরছিল না, ইজ্জতও থাকছিল না। ওরা আমাকে যেমন খুশী ভোগ করতে চেয়েছিল। যখন খুশী পেতে চেয়েছিল। তাহলে আমার সোনাগাছিই ভালো। আমি এখানে অনেক ভালো আছি, নিশ্চিন্তে আছি।'

আমার জিজ্ঞাসার জবাবে সে বলেছিল, সে বিবাহিতা, একটি ছেলে আছে। স্বামী অযোগ্য, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে তার দায় দায়িত্ব ত্যাগ করেছিল। ছেলে এখন পাহাড়ে কোনো এক ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি ইস্কুলে পড়ছে।

সেই মহিলাকেও আমি মনে মনে প্রশংসা করলেও, করুণাই করেছি। তার বিড়ম্বিত জীবনের কষ্টকে বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ কি ঘটছে আমার জীবনে? মল্লিকা কিসের কারণ হয়ে এলো, কী বহন করে নিয়ে এলো আমার জীবনে? এ তো অনেকটা যেন সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো! আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর সেই কথাটা, 'আমি আর এ কারবার চালাতে চাই না।' তারপরেই বুক উথ্লিয়ে ওঠা একটা গভীর নিঃশ্বাস। এর মানে কি? কে তবে ওকে এ কারবার চালিয়ে যেতে বলছে? ওর চকিতে পরিবর্তন আর দীর্ঘশ্বাসই প্রমাণ করে, কথাটা ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমাকে শোনাবার জন্য বলে নি।

অন্যান্য পতিতালয়ে, কয়েকজনের মুখে আমি শুনেছি, তারা এ জীবন থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে-মুক্তি তারা কোনোদিন পাবে না। তাদের নিয়ে কেউ কোনোদিন সুস্থভাবে জীবন-যাপন করবে না। কিংবা তারা নিজেরাই হয়তো ফিরে আসবে। এরকম কোনো কোনো ঘটনা তারা ইতিমধ্যেই দেখেছে। অবিশ্যি দু-একটি ক্ষেত্রে সার্থকতাও তারা দেখেছে। যারা সত্যি সত্যি আর দশটা সাধারণ সংসারী জীবন-যাপন করছে। এমন কি তাদের নতুন স্বামীর ঔরসে ছেলেমেয়েও হয়েছে, আর তারা সুস্থ পরিবেশে মানুষ হচ্ছে।

মল্লিকাও কি সেইরকম কিছু চায়? মনের মধ্যে জিজ্ঞাসাটা রেখেই, আমি গা মাথা মুছে, পোশাক পরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, ও ড্রেসিং টেবিলের কাছে বসে, একটা ইংরেজি রঙিন ম্যাগাজিন পড়ছে। পড়ছে বলাটা হয়তো ভুল, দেখছে। ও নিশ্চয়ই ইংরেজি পড়তে পারে না। অথচ দেখলে মনে হয়, ও গভীর অভিনিবেশ

সহকারে পড়ছে। ও ড্রেসিং টেবিলের ওপরে কনুইয়ে ভর রেখে, গালে হাত দিয়ে, পাশ ফিরে ঝুঁকে রয়েছে। খোলা চুল একদিকে এলিয়ে পড়েছে, বাতাসে কাঁপছে। এখন ওর জামার বোতাম বন্ধ।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও, ও মুখ তুলে তাকালো না। আমি চিরুনিটা নিতে গিয়ে ঝুঁকে দেখলাম, ও কতগুলো সংবাদচিত্রের পাতা মেলে ধরে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দেখছো?' ও আমার কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মটকা জুয়াটা কী? এই যে লিখেছে, রিং লীডার—হ্যাঁ? রিং লীডার আপস্—আপস হিজ টু হ্যান্ড টু—টু—টু ফ্রন্ট অফ্ পুলিস।'...

ইতিমধ্যে আমার চিরুনি চালানো একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি হতবাক্ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি ইংরেজি পড়তে পারো নাকি?'

'একটু একটু।' ও মাথা ঝাঁকিয়ে কপালের কাছ থেকে চুল সরাবার চেষ্টা করে বললো, 'মটকা মানে কী? গাম্‌লিং লিখেছে।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে আমার মনে হলো। মাথা আঁচড়াতে ভুলেই গেলাম, বললাম, 'মটকা মানে লোকে যাকে সাট্‌টা খেলা বলে। কিন্তু তুমি যে ইংরেজি পড়তে পারো, আমি ভাবতেই পারি নি।'

'এটাকে আবার জানা বলে নাকি?' ও বললো, 'শালা সেই কবে ইস্কুলে পড়েছিলাম। কিন্তু সাট্‌টা খেলা তো আমি জানি। মটকার কথা তো আমি কখনো শুনি নি?'

আমি ওর কাঁধে একটা হাত না রেখে পারলাম না। এখন ও মুখের পাউডার ঘষে অনেকখানি মিলিয়ে দিয়েছে। ও আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। ওর ঠোঁটের স্বাভাবিক রঙটা আমার অনেক বেশী ভালো লাগলো। বাঁ গালের কাটা দাগটা এখন যেন আরো তীক্ষ্ম আর জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

আমি বললাম, 'লোকে জানে না, তাই সাট্‌টা বলে। অনেক আগে সাট্‌টা খেলা ছিল, আর সেটা ছিল আমেরিকার কটন মার্কেটের—মানে তুলার বাজারের শেয়ারের ওঠা নামার সঙ্গে বাজি ধরে খেলা। সাট্‌টা কথাটা সেই থেকে চলে আসছে। তখনো বম্বে থেকে খেলার ফলাফল জানা যেতো। মটকাও বম্বেতেই খেলা হয়। তুমি কোন ক্লাস অবধি ইস্কুলে পড়েছিলে?'

ও মটকা সাট্‌টার কথা শোনবার জন্যই বেশী ব্যগ্র ছিল। আবার মুখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'ক্লাস এইট-নাইন অবধি পড়েছিলাম। আমি মাইরি যতোবার বাজি লেগেছি, একবারও সাট্‌টায় জিততে পারি নি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর পড়লে না কেন?'

'ভালো করে খাওয়াই জুটতো না, তার আবার পড়া।' ও ঝপ্ করে ম্যাগাজিনের পাতা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলো, 'আমি তখন পীরিত করতে আরম্ভ করেছি। আমাদের আশেপাশে কেউই ভালো করে লেখাপড়া শিখতো না। কে ওসব ঝামেলা করে। পেটে ভাত নেই, ইস্কুলের মাইনে নেই, কেউ গায়ে হাত চালিয়ে কিছু পয়সা দিলেই সিনেমা দেখতে যেতাম। আর বাড়িতে মার খেতাম। তখন তো বাড়ি থেকেই

boiRboi.net

বলতো, 'বাইরে ছেনালি চলানি করবি তো, বাড়িতে পয়সা এনে দিবি।' বলতে বলতে ও উঠে দাঁড়ালো।

ওর সম্পর্কে আমার আকর্ষণ এই মুহূর্তে প্রবলতর হয়ে উঠলো। আমি ওকে এবার নিজের থেকে আমার কাছে দু-হাতে টেনে নিয়ে, ওর ঠোঁটে চুমো খেলাম। ও ঠোঁট ফাঁক করে জিভের স্পর্শ দিতেই, তীব্র বাসনায় জ্বলজ্বলিয়ে উঠলাম। ওকে নিষ্পেষিত করলাম বুকের মধ্যে। কিন্তু প্রথমবারে ওকে যেমন উচ্ছ্বসিত দেখেছিলাম, এখন ততোটা না। ও আমার চুলের মুঠি ধরে কয়েকবার আলতোভাবে টানলো, কয়েকবার মৃদু দংশন করলো ঠোঁটে। তারপরে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললো, 'এবার শোয়া যাক।'

আমি ওকে ছেড়ে দিলাম, ও খাটের দিকে এগিয়ে গেল। আমি বললাম, 'তোমার তো রাত্রের খাবার খাওয়া হলো না।'

'এখন আর তা ভেবে কী হবে?' ও বললো, 'এখন তো আর কিছু খাবার পাওয়া যাবে না।'

আমি বললাম, 'ঘরে কিছু খাবার আছে, তৈরি করে নিতে হবে। ব্যবস্থা সব আছে। কেরোসিনের জনতা স্টোভ, ডিম, পাঁউরুটি আর চায়ের সব সরঞ্জাম।'

'আমি এখন ওসব বানাতে পারবো না।' ও খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, হেসে বললো।

বললাম, 'আমিই না হয় তৈরি করে দিচ্ছি, কতোক্ষণ আর সময় লাগবে?'

ও জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললো, 'না না, এখন আর কিছুই বানাতে হবে না। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। এরকম কতো রাত না খেয়ে কেটে যায়। কে-ই বা আমার জন্য এত রাত্রে খাবার নিয়ে বসে থাকে। গোপালনগরে দিদির বাড়িতে গেলে হয় তো কিছু চোলাই মাল জুটতো। তাই খানিকটা কাঁচা মেরে দিয়ে শুয়ে পড়তাম। অবিশ্যি সেখানেও যদি কোনো খদ্দের বসে না থাকতো। তাহলে তো কথাই নেই, আবার জামা কাপড় খুলতে হতো।'

আমি ওর কথা থেকে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলাম না। দিদির বাড়িতে খদ্দের? তার মানে কী? আর সেখানে চোলাই মদই বা আসবে কোথা থেকে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তো বলছিলে, গোপালনগরে তোমাদের বাড়ি।'

'তাই তো।' মল্লিকা বললো, 'আমাদের বাড়িটা অনেক ভেতর দিকে, দিদির বাড়িটা সামনে।'

আমার মনে পড়ে গেল, ওর দিদির বাড়িতে চৌবাচ্চায় জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দিদির বাড়িতে চোলাই মদ পাওয়া যায়, আবার খদ্দেরও আসে? তোমার নিজের দিদির বাড়িতে?'

'আমার মায়ের পেটের কোনো দিদি নেই।' ও বললো, 'দিদি, বলে ডাকি, ওর বাড়িতেই কাজ কারবার হয়। বড় জুয়ার আড্ডা বসে, আমাদের কাজ কারবারও চলে। ও বাড়িতে টেলিফোনও আছে।'

আমি অবাক্ হয়ে বললাম, 'তোমার দিদির বর এসব চলতে দেয়? সে কী করে?'

'ও শালা তো রোজ রোজ বউয়ের সাঙা দ্যাখে চৌদ্দবার করে।' ও বললো

boiRboi.net

কোমরে একটা মোচড় দিয়ে, উৎকট ভঙ্গি করে। যে-ভঙ্গির মধ্যে একটা ঘৃণা আর রাগও ঝলকিয়ে উঠলো, বললো, 'লোকটার এক সময়ে ভালো অবস্থাই ছিল। এখন বুড়িয়ে গেছে। কী রোগ নাকি আছে। আগে উকিল ছিল, আলিপুর কোর্টেই যেতো। এখন মাগীর দাপটে কোণঠাসা। বাড়িটা হয়েছে গুপ্ত বৃন্দাবন, আর জুয়ার আড্ডা। এখন আসল মালিক জিতেন মিত্তির। ওই শালার জন্য আমিও মরলাম।' ও হঠাৎ চুপ করে গেল, আর অন্যমনস্কভাবে, ভুরু কুঁচকে চোখ বুজলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে জিতেন মিত্তির?'

'একটা বাঘ।' ও চোখ বুজেই বললো।

আমি ওর গালের দাগের দিকে তাকালাম। মনে পড়লো, ও দাগটার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, বাঘে আঁচড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই বাঘটাই কি তোমার গালে আঁচড়ে দিয়েছে নাকি?'

মল্লিকা চোখ তাকিয়ে, একটু অবাক্ হয়ে বললো, 'ঠিক বলেছ। কী করে জানলে বলো তো?'

বললাম, 'তুমিই তো বলেছিলে, একটা বাঘ তোমার গালে আঁচড়ে দিয়েছে। আর এখন বললে, জিতেন মিত্তির একটা বাঘ।'

'সত্যি ও একটা বাঘ।' মল্লিকা বললো, 'ওর মুখে একটা কাতরতা ফুটলো, 'ও আমার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, ও আমাকে—।' বলতে বলতে ও হঠাৎ থামলো, আর রীতিমতো রাগত স্বরে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো, 'কী সব আজে-বাজে বকাচ্ছ তুমি? যা করবার তাড়াতাড়ি কর, তোমার দেনাটা মিটিয়ে দিয়ে খালাস হই, একটু হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোই।' বলেই ও গা থেকে আমার হাওয়াই শার্টটা খুলে ফেললো। তারপরই কোমর থেকে পায়জামাটা খুলতে ব্যস্ত হলো।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি শুয়ে পড়ো। আমার কাছে তোমার কোনো দেনা নেই, কিছু মেটাতেও হবে না।' ওর খোলা গা থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে, আমি ওর সংশয়াচ্ছন্ন স্বর শুনলাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তোমাকে বাপু আমার কেমন ভয় ভয় লাগছে।'

আমি অবাক্ চোখে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। পায়জামাটা ও খোলে নি, এমন কি হাওয়াই শার্টটা বুকের মাঝখানে জড়ো করে ধরে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'তুমি বললে, তুমি খবরের কাগজে চাকরি কর, হ্যাঁ?' ও মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আবার পুলিসের বড় কর্তাদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম চলা-ফেরাও আছে। তুমি আমাকে কোনো বিপদে-টিপদে ফেলবে না তো?'

আমি চিরুনিটা রেখে দিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললাম, 'তোমাকে আবার আমি কী বিপদে ফেলবো? আর কেনই বা ফেলবো? তুমি তো আমার কোনো ক্ষতি করো নি। করেছ কী?'

'তা কী জানি।' ও খানিকটা অসহায়ভাবে বললো, 'তোমাদের কতোটুকুই বা

boiRboi.net

বুঝি ? কিন্তু নিজের চোখেই তো আমি তোমাকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখেছি। আজও দেখলাম, সেপাই দুটো তোমাকে কিছুই করতে পারলো না। কতো বাঘা বাঘা লোককে পুলিস টিট করে দেয়।'

আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু আমি তো আর পুলিস নই। আর তুমি দহরম-মহরম বলতে যা বোঝাচ্ছ, তাও নেই। আমার কাজের ব্যাপারেই তাদের কাছে যেতে হয়।'

'তা সে যাই হোক গে, তুমি যেন আমার কথায় রাগ-টাগ করো না।' ও বেশ নরম সুরে অনুনয় করে বললো, 'পুলিসকে আমার বড় ভয়। আমি যদি কোনো গোল-মালের মধ্যে পড়ি, তবে মার খেতে খেতে আমার জান চলে যাবে।'

আমি বললাম, 'পুলিস তোমাকে মারবে কেন ?'

'পুলিস কেন ? আমাকে মারবার একজন লোকই আছে।' ও বললো, 'কিন্তু পুলিসের হাতে পড়ে কোনো বিপদ ঘটলে আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমি গোপাল-নগরের বাড়িটার কথাও বলে ফেলেছি, আর ওর নামটা ?'

আমি বুঝতে পারছি, ও জিতেন মিত্তিরের কথা বলছে। ও সত্যিই ভয় পেয়েছে। কিন্তু জিতেন মিত্তির সম্পর্কে ওর অনুভূতিটা কেমন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর মুখেই একটু আগে শুনলাম, সে লোকটা ওর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওর মার খাবার ভয়টাও বোধ হয় তার কাছেই। আমি বললাম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার বিষয়ে কোনো কথাই আমি কারোকে বলবো না। একটি কথাও না।'

মল্লিকা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো, আর দু-হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তার ফলে, বুকের কাছে জড়িয়ে ধরা জামাটা ওর কোলে পড়ে গেল। ও যেন খুব আবেগপূর্ণ ফিসফিস স্বরে, একটু মাথা ঝাঁকিয়ে ডাকলো, 'এসো, কাছে এসো।'

আমার যথার্থ কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও, মনে হলো, ওর এই হাসি আর ডাকটা ছলনা। ইতিমধ্যে ওর কোনো কোনো আচরণ অশালীন আর অশ্লীল মনে হলেও, ঠিক ছলনা বলে মনে হয় নি। এই প্রথম মনে হলো, এবং নিজের সম্পর্কে, এই প্রথম যেন ওকে সতর্ক আর সচেতন মনে হলো। আমি ওর প্রসারিত বাহুতে ধরা দিলাম। ও নিজে থেকেই আমার মুখটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নামালো, চেপে ধরলো ! তেমনি আবেগভরা ফিসফিস স্বরে, আমার কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে বললো, 'আমি তোমাকে খুব বিশ্বাস করি। বিশ্বাস না করলে, তোমার সঙ্গে এভাবে চলে আসতাম কী করে ? আমি জানি, তুমি আমার কোনো ক্ষতি করবে না।' ও আমার কানের পিঠে ওর ঠোঁট চেপে ধরলো।

আমার শরীরের প্রতিটি কোষ জাগ্রতই ছিল, ওর স্পর্শে দ্রুত উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, একটা অনিবার্য গতিতে। কিন্তু আমার মনটা বিবন্ন হয়ে উঠতে লাগলো। ওর কথাগুলো এতোই সাজানো, আবেগপূর্ণ আর কোমল, আমার মনটা বারেবারে বলতে লাগলো, ছলনা, ছলনা, ছলনা। ও এবার আমাকে সত্যি ভয় পেয়েছে, আমার সম্পর্কে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে ভাববার চেষ্টা করছে, এবং আমাকে যে চটানো উচিত না, তা ও অনুভব করেছে। যা আদৌ সত্যি না। কিন্তু আমি ওকে এখন তা

বোঝাতে পারবো না। ও গোপালনগরের বাড়ি, বাঘের মতো সেই জিতেন মিত্তির নামে লোকটা, তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এটাই তো স্বাভাবিক।

ও আবার বললো, 'এসো, এখন শুয়ে পড়ি। তোমার কাছে আমি এখন শোব। বুঝেছ? আমি এখন শুতে চাই, খুব খুব খুব।'

ওর প্রতিটি কথারই অর্থ অতি স্পষ্টভাবেই আমি হৃদয়ঙ্গম করছি। আমি ওর বুকের কাছে থেকে মুখ তুলে তাকালাম।

ও আমার চোখের দিকে তাকালো। ওর ঠোঁটে হাসি। বললো, 'বাতিটা নেভাবে, না জ্বলবে?'

বললাম, 'যা তোমার ইচ্ছা।'

'নিভিয়ে দাও।'

আমি উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম, এবং অভ্যস্ত পা ফেলে খাটের কাছে এলাম।

*

আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে। ছাদের দিকে জানালায় চোখ পড়তেই ভোরের আবছা আলো চোখে পড়লো। তারপরেই দেখলাম, মল্লিকা ওর নিজের পোশাক পরে তৈরি। মাথার চুলে চিরুনি চালিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে।

গতকাল রাত্রের কথা আমার সবই মনে পড়ছে। বিষণ্ণ আর বিমর্ষতা সত্ত্বেও, ওর সঙ্গে দেহযোগের কোনো বাধা আসে নি। জীবনে এই প্রথম আমার কৌমার্য হারালাম, এমনভাবে বলা যায় না। প্রেম প্রেম খেলা, এই বয়সে কিছু খেলেছি। কিন্তু আমার জীবনে, এটাই স্মরণযোগ্য ঘটনা। সেই হিসাবে, এটাই আমার প্রথম কৌমার্য-জীবনের ভঙ্গ হলো, কারণ এভাবে কখনোই কিছু ঘটে নি। অথচ, মল্লিকা আমার সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, গতরাত্রে ছলনা করেছে, এমন কি দৈহিক আচরণেও।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। পায়জামা গলিয়ে নিলাম দু-পায়ে। ও আমার দিকে ফিরে, হেসে নীচু স্বরে বললো, 'উঠে পড়েছ? আমি ভাবছিলাম, ঠিক বেরোবার সময়ে তোমাকে ডাকবো, দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য। আমি এখন যাচ্ছি। এখনো রাস্তা-ঘাট খুব ফাঁকা পাওয়া যাবে, রাস্তায় ট্রামও নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছে।'

ওর সব অনুমানই সত্যি, এবং এই সময়ে উঠে, ও ঠিক কাজই করেছে, তা না হলে এ বাড়িতেও জানাজানি হয়ে যাবার ভয় ছিল। সিঁড়ির নিচে চাকর-বাকরেরা এখনো হয়তো ওঠে নি। উঠলেও, কেউ ঠিক কিছু অনুমান করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমি তাড়াতাড়ি নেমে আমার লেখার টেবিলের কাছে গেলাম। টানা দেরাজ খুলে, ঘড়িতে দেখলাম, পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। পার্সটা নিয়ে, পঞ্চাশটা টাকা বের করে, মল্লিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এ টাকাটা তুমি রাখো।'

'কেন? না না না।' ও মাথা নাড়িয়ে বললো, 'এতগুলো টাকা আমার লাগবে না। আমি তো বলেইছি, তোমার কাছ থেকে এ রাত্তিরটার জন্য আমি কোনো টাকা নেব না। তুমি আমাকে দুটো টাকা দাও, আমি ঠিক চলে যাবো।'

আমি পার্স রেখে, ড্রয়ার বন্ধ করে, টাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে বললাম, 'আমি তোমাকে কাল রাত্রের জন্য টাকা দিচ্ছি না, আমার দিতে ইচ্ছা করছে, তাই দিচ্ছি।

boiRboi.net

তুমি নিলে আমি খুব খুশী হবো।'

ও আমার চোখের দিকে তাকালো। ও ভালো করে ঘুমোয় নি, চোখের কোল দেখলেই বোঝা যায়। ওর চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। আমি বললাম, 'ভয় নেই, আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি কারোকেই কোনো কথা বলবো না। বরং তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হলে, খুশী হবো। কিন্তু কোথায় তোমাকে পাবো? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খোঁজা তো সম্ভব না। তাছাড়া, পার্ক স্ট্রীটে এলাকার পুলিস তোমাকে চেনে, আমি রোজ রোজ তাদের হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতেও পারবো না।'

ও একটু হাসলো। আমি আবার বললাম, 'তাছাড়া, তুমি সারা রাত বাইরে ছিলে, অথচ খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাবে, সেটাও ঠিক না। তোমাকে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত দিতে হবে?'

'তা হবে।' ও বললো, 'তখন আমি সত্যি কথাই বলবো।'

আমি বললাম, 'তবু আমার অনুরোধ টাকাটা তুমি রাখো।' বলে ওর হাত টেনে, টাকাগুলো আমি গুঁজে দিলাম, এবং আবার বললাম, 'পুলিসের হাতে ধরা পড়লে, তুমি মিঃ বাগচির সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করো, আর তাঁকে আমার নাম বলো, অবিশ্যি যদি সম্ভব হয়।'

'যাহ্ বাবা, আমি তোমার নামটা মাইরি ভুলে গেছি।' ও হেসে উঠে বললো।

আমি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে, টেবিলের কাছে গিয়ে, ডট্ কলম নিয়ে, কাগজে দ্রুত হাতে আমার নাম আর অফিসের টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিলাম। বললাম, 'সম্ভব হলে, আমাকে ফোন করো। এখানে নাম্বার লিখে দিয়েছি।'

ও আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে, হাতের নোটগুলোসহ ওর ফোমের পুরনো ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপরে আমার দিকে একবার দেখে, দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, আল্‌তো করে চুমো খেল। আমার ভিতরে একটা আবেগ থরথর করছে, ইচ্ছা হলো, আমি ব্যাকুলভাবে বলে উঠি, তুমি যেও না, থাকো। তুমি আমার কাছে রোজ এসো, রোজ রোজ রাত্রে। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলাম না। ওর ঠাণ্ডা ঠোঁটের স্পর্শ, আমার বাসি তপ্ত ঠোঁটে নিয়ে একটু হাসলাম। ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল, ছিটকিনিতে হাত দিয়ে বললো, 'আমি প্রায়ই চৌরঙ্গি থেকে থিয়েটার রোডের ওপর দিয়ে ঘুরে, ক্যামাক স্ট্রীট হয়ে, সার্কুলার রোডে হেঁটে পাড়ি দিই। রবীন্দ্র সরণীর কাছ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাই। ওদিকটায় পুলিস চট করে ধরতে পারে না। ময়দান আর পার্ক স্ট্রীটের দিকে এগোলেই গোলমাল।' বলেই একটু শব্দ করে ও ছিটকিনি খুললো।

আমিও দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। অনেক কথা আমার গলার কাছে, কিন্তু বলতে পারলাম না। ও দরজা খুললো। সিঁড়িটা এখনো অন্ধকার। ও স্যাণ্ডেল পায়ে টিপে টিপে নিঃশব্দে নেমে গেল। নিচে থেকে কোনো শব্দ ভেসে আসছে না। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপরে ওর নিরাপদে চলে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘরের মাঝখানে এসে খাটের দিকে

boiRboi.net

তাকালাম। এখন আমার চোখে আর ঘুম আসছে না। আমি ছাদের দিকের দরজাটা আস্তে আস্তে খুললাম।

গতকাল রাত্রের মেঘের কোনো আভাস নেই। আকাশ বেশ পরিষ্কার, যদিও আলো ফুটতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তবু আকাশ দেখলেই বোঝা যায়, মেঘ কেটে গিয়েছে। কিন্তু এ মেঘ কেটে যাওয়া আমার ক্ষেত্রে কোনো প্রতীকী না, কারণ আমার মন ভারাক্রান্ত। একটা অভূতপূর্ব শূন্যতা বোধ করছি, যা আমি ইতিপূর্বে কখনো করি নি। আমার এতদিনের চেনা ঘরটা, আমার কাছে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। জীবনের এই সব বাস্তবতাগুলো আমি বুঝতে অক্ষম, যে-বাস্তবতা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই, সহসা অপ্রাকৃত বলে মনে হয়। যা মেনে নিতে কষ্ট হয়, অথচ না মেনেও উপায় থাকে না।

মল্লিকার মতো একটা মেয়ে, আকস্মিকভাবে আমার জীবনে এমন করে আসে কী করে, আমি তার কোনো ব্যাখ্যা পাই না। কোনোরকম বিকারগ্রস্ত কাম-রুচির দ্বারা আমি আক্রান্ত, অথবা আমার অবচেতনে তার কোনো আভাস ছিল, বা আছে, আমি এখনো তা বুঝতে পারছি না। ইতিপূর্বে আমার কোনো আসক্তিও ছিল না। অথচ ওর জন্য একটা ব্যাকুল উন্মাদনা আমার মধ্যে আলোড়িত হচ্ছে, এ সত্যি মর্মে মর্মে অনুভব করছি, আর আমার শূন্যতাবোধও সেই জন্যই।

* * *

আমি বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ওর শোবার জায়গাটার দিকে তাকালাম। গতকাল রাত্রে, শেষ মুহূর্তে, ছলনা করেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। খুব একটা সুখের আবেশে, গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সবটাই ছলনা। কিন্তু ওর নগ্ন শায়িত শরীরটা আমি দেখতে পাচ্ছি। আমারই ব্যবহৃত পায়জামা আর শার্ট একটা সোফার ওপর পড়ে রয়েছে।

আমি হয়তো আর কখনোই ওর দেখা পাবো না। কথাটা মনে হতেই, আমার জীবনের সব থেকে তীব্র যন্ত্রণাটা, এই যেন প্রথম অনুভব করলাম। একাকিত্বের কষ্ট এই আমি প্রথম অনুভব করছি।

এই আমার সমীক্ষা! এখনো কতো কাজ আমার পড়ে রয়েছে। আমার সমীক্ষা-নিবন্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে বিতর্কিত আলোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। যাদের নিয়ে আমি সমীক্ষা করছি, আর যাদের নিয়ে লিখছি, তাদেরই অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর একজন, এখন আমাকে আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যদিও মানসিক দিক থেকে সে ক্ষমতা আপাতত আমার নেই।

আজ আমাকে আর একটি নিবন্ধ লিখতে হবে। এ ঘরে বসেই লিখি, বা অফিসে বসে, লেখাটা আজই শেষ করতে হবে। চিফ্ রিপোর্টার এবং সম্পাদকের সঙ্গে সেইরকম কথাবার্তাই হয়েছে, এবং লেখাটি যে আগামীকাল প্রকাশিত হচ্ছে, সেই বিজ্ঞপ্তিও ছাপা হয়ে গিয়েছে। গত দুদিন আমি কলকাতার আর এক শ্রেণীর পেশাজীবী রমণীদের বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি, বিভিন্নভাবে সাক্ষাৎ করেছি, কথা বলেছি। এরা তয়ফাওয়ালী বা বাঈজী বলে পরিচিত।

আমার কোনো ধারণা ছিল না, কলকাতায় এদের অস্তিত্ব এতোটা বিস্তৃত, এবং

boiRboi.net

ব্যবসার দিক থেকে তাদের আয়ও বেশ ভালো। বহুবাজারের আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় থেকে, ট্রাম লাইন বরাবর প্রায় লালবাজার পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে আছে। আশেপাশে, ভিতর দিকেও এদের আস্তানা আছে। গণেশ অ্যাভেন্যু থেকে বহুবাজার, ভিতরের অলি-গলিগুলিতেও এদের জমজমাট আসর। এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন এক উর্দু কবি। মুনোয়ারাতে তাঁর যথেষ্টই সুনাম আছে, এবং এই বাঈজী মহলে তাঁর যাতায়াত যেমন আছে, খাতিরও যথেষ্ট।

আমার অভিজ্ঞতায়, এই সব বাঈজী রমণীরা সকলেই অবাঙালী। অধিকাংশই হিন্দু, খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান। এরা প্রায় প্রত্যেকেই সুন্দরী, ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, তাই। যে-কজনের গান শুনেছি, প্রায় সকলেই সঙ্গীত পারঙ্গমা। বিশেষ করে গজল এবং ঠুংরি, সকলেরই বেশ আয়ত্তে আছে। প্রায় সকলের কণ্ঠস্বরই সুরেলা, রীতিমতো রেওয়াজের দ্বারা শিক্ষিত। হারমোনিয়াম ডুগিতবলা আর সারেঙ, তিনরকমের বাজনদাররা সঙ্গত করে। এরা যে কিছুটা নৃত্য পটীয়সী, গানের সময়, বসে বসেই শরীরের নানান অঙ্গ-ভঙ্গীতে তা বোঝা যায়। সাধারণত আসরের জন্য সময় সাপেক্ষে, একটা টাকার অঙ্ক স্থির হয়। গানের সময়, বিশেষ বিশেষ সময়ে, শ্রোতারা প্যালা দেয়। সেইজন্য এসব ক্ষেত্রে, একলা কেউ যায় না, দলবল ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে আসর জমায়। আমার হিসাব মতো, দেড়-দু ঘণ্টা গানের আসরে, মোট চার-পাঁচশো টাকা এরা আয় করে। ক্ষেত্র বিশেষে কম বেশী।

এরা কি দেহোপজীবিনী নয়? আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবও আমি পেয়েছি। ধোঁয়ায় আবৃত আগুনের মতো ব্যাপারটা। শরীরের মূল্য এখানে অনেক বেশী, যা অনেকেরই নাগালের বাইরে। একজনের অভিজ্ঞতা, তিনি একটি রূপসী বাঈজীর পিছনে, গান শোনার জন্য বারো তেরো হাজার টাকা ব্যয় করার পরে, তার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়েছেন, এবং সেই টাকার অঙ্কটাও বেশ মোটা। এরা সাধারণত কোনো বিশেষ ধনী ব্যক্তির একার ভোগে থাকতে চায়। আমি এদের দু'জনের ঘরে, বম্বের বিশিষ্ট পুরুষ চিত্র-তারকাদের সঙ্গে তোলা ফটো দেখেছি। এসব ফটো খুবই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক। পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় না। কিন্তু ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কেন? গানের শ্রোতাদের কাছে, এও একটা প্রচার। তাদের ঘরে বিখ্যাত চিত্রতারকাদেরও পদধূলি পড়ে, ফটোগুলো তারই সাক্ষী।

এক অর্থে, অতএব এদের পতিতা বলা যাবে না। ক্যাবারে নর্তকীর মতোই, এখানেও একটা বিশেষ পেশার অদৃশ্য সাইনবোর্ড ঝুলছে।

আমার অন্যমনস্কতাকে চমকিয়ে দিয়ে, টেলিফোনটা বেজে উঠলো। লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যালো?'

ওপার থেকে অনসূয়ার অবাক স্বর ভেসে এলো, 'এ কি, ভোর ছ'টার আগেই তুমি জেগে গেছো নাকি?'

মনে পড়লো, কথা ছিল, অনসূয়া আমাকে ভোর ছ'টায় টেলিফোন করে জাগিয়ে দেবে, কারণ আমাকে আজ লিখতে বসতে হবে। আমতা-আমতা করে বললাম, ঘুমটা একটু পাতলা হয়ে এসেছিল, তার মধ্যেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো।'

অনসূয়া বললো, 'বুঝতে পারছি, গলার স্বরে এখনো ঘুম জড়িয়ে আছে। তাহলে

boiRboi.net

এবার চান-টান করে, লক্ষ্মী ছেলের মতো লিখতে বসে যাও। আমার ডিউটি আমি করলাম।'

বললাম, 'ধন্যবাদ।'

'দরকার নেই।' বলে অনসূয়া একটু হাসলো, বললো, 'হ্যাঁ শোন, কাল রাত্রে কি ঝড় বৃষ্টিতে পড়েছিলে নাকি?'

বললাম, 'তা পড়েছিলাম। রেস্তোঁরায় ঢুকে খাবার খেতে খেতেই তোড়ে বৃষ্টি নেমেছিল। একটু কমার পরে আমি ফিরেছি।'

'ও বেলা কি দেখা হবে?' অনসূয়া জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'তুমি চারটে নাগাদ অফিসে একবার টেলিফোন করো।'

'তোমার কথা এখনো বেশ ঝিমুনো লাগছে।' অনসূয়া বললো, 'ঘুমটা কাটছে না নাকি?'

আমি হেসে বললাম, 'চোখে একটু জল-টল দিই। স্টোভ জেবলে একটু চা করে খাই, তারপরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বেশ, এখন তাহলে ছাড়ছি। চারটেয় অফিসে টেলিফোন করবো।' অনসূয়া লাইন কেটে দিল।

রিসিভারটা নামিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখ ধোয়া, চা করা, কোনো কিছুর জন্যই আমি ব্যস্ত হলাম না। অনসূয়ার কথা মুহূর্তেই ভুলে গেলাম। মল্লিকা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। ওর শরীরের গন্ধ আমার যেন রন্ধ্রগত হয়ে আছে। আমি সরে গিয়ে খাটের দিকে মুখ করে একটা সোফায় বসলাম। আমি আমার মনকে স্থির করতে চাইলাম, সমস্ত ব্যাপারটা বিচার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার নিজের মধ্যেই দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো। একটা আবেগ আর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্বে, আমার বিচারশীল মন পরাভূত হতে লাগলো।

এক সময়ে দরজায় করাঘাত হতেই, আমার আচ্ছন্নতা কাটলো। আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। জানতাম, জমাদার এসেছে বাথরুম পরিষ্কার করতে। এর পরেই আসবে ব্রহ্মচারিদের ছোকরা চাকরটি, ঘর-দোর গোছগাছ পরিষ্কার করার জন্য। সে এসে কিছু জামাকাপড়ও কাচবে, রোজ যা করে। অতএব, আমাকেও দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

বেলা একটা নাগাদ লেখাটা মোটামুটি দাঁড় করালাম। মোটেই খুশী হতে পারলাম না। অফিসে গিয়ে আর একবার বসতে হবে। আপাতত বাইরে বেরিয়ে, দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে হবে। লেখার টেবিল থেকে উঠে পোশাক পরতে পরতেই, টেলিফোন বেজে উঠলো। অনুমান করলাম, চিফ্ রিপোর্টারের ফোন। রিসিভার তুলে আওয়াজ দিতে, ভেসে এলো অন্য এক স্বর, 'অমলবাবু! আমি মিঃ বাগচি বলছি।'

আমি এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ বলুন স্যার।'

মিঃ বাগচি বললেন, 'আমি আপনার অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। না পেয়ে এখানে করলাম।'

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, আমার লেখা নিয়ে কোনো খারাপ রিঅ্যাকশন—।'

boiRboi.net

'আরে না না।' মিঃ বাগচি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'লেখা খুব ভালো হয়েছে। গতকাল পার্ক স্ট্রীটের একটা ব্যাপারে আমাকে জানানো হয়েছে, মনে হলো, আপনার কথাই আমাকে বলেছে। গতকাল রাত্রে কি আপনি কোনো রাস্তার মেয়েকে মীট করেছিলেন?'

ব্যাপারটা অস্বীকার করতে আমার বাধলো। বললাম, হ্যাঁ, মীট করা মানে, অদ্ভুত একটা কোইন্সিডেন্স বলতে পারেন। ও পুলিসের তাড়া খেয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিল—।'

'জানি জানি।' মিঃ বাগচি বললেন, 'আমার সব শোনা হয়ে গেছে। মেয়েটাকে রামু সিং-এর কুঠিতে আমি ধরেছিলাম, ওর নামে এখনো কেস রয়েছে। এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিজনেস করছে। আপনি ওকে কাল রাত্রে পুলিসের হাত থেকে রেসকিউ করেছেন, আমার নামও বোধহয় বলেছেন, তাই না?'

আমি বিব্রতভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, একটু অন্যায় করে ফেলেছি।'

'কিছুমাত্র না।' মিঃ বাগচি বললেন, 'রেসকিউ করেছেন, বেশ করেছেন, ওর সঙ্গে কোথাও যান নি তো?'

আমি সচকিত হয়ে, পরিষ্কার মিথ্যা বললাম, 'না না, কোথায় যাবো? ওকে আমি চৌরঙ্গির ওপরেই ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'

'বেশ করেছেন।' মিঃ বাগচি বললেন, 'শী ইজ এ নটোরিয়াস গার্ল। ওর খোঁজখবর আমি সবই জানি। গোপালনগরে খুব খারাপ লোকের খপ্পরে ও আছে। ও নিজেও খুব দুঁদে মেয়ে।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'ও যাই হোক, ওর খপ্পরে আমার পড়ার কোনো চান্সই নেই।'

মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'তা জানি। তবু ভাবলাম, আপনাকে একটু সাবধান করে দেওয়া ভালো। এর পরেও হয়তো কোনো দিন আপনাকে দিয়ে সুযোগ নিতে পারে। একদম কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। বেশ্যা হলেও, মেয়ে তো মশাই। ওরা অনেক ছলাকলা জানে। বাড়ির ঠিকানা দেন নি তো?'

আমি হেসে জলজ্যান্ত মিথ্যা বললাম, 'তার কোনো অবকাশই ছিল না। মেয়েটা নিজে থেকে এসে আমাকে বললো, ওকে বাঁচাতে হবে। নেহাত দয়াপরবশ হয়েই—।'

'ওদের প্রতি এই দয়া জিনিসটা মারাত্মক।' মিঃ বাগচি হেসে বললেন, 'ওটি কখনো দেখাবেন না। যাই হোক, আমি একটু জেনে নেওয়া, আর আপনাকে সাবধান করার জন্যই বললাম। নতুন লেখা কাল পাচ্ছি?'

বললাম, 'আশা করি।'

'ও কে, থ্যাঙ্ক য়ু!' মিঃ বাগচি লাইন কেটে দেবার আগে বললেন, 'পরে কথা হবে।'

আমি রিসিভারটা নামিয়ে কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খবরটা এতখানি গড়াবে ভাবি নি। এর একটি মাত্রই অর্থ, যা আমার অস্বস্তির মতো লাগছে, অতঃপর পার্ক স্ট্রীটে পাহারাদাররা আমাকে বিশেষ চোখে তাকিয়ে দেখছে। আমি আমার লেখাপত্র নিয়ে ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভাবনাগুলো মাথায়

boiRboi.net

চেপে রইলো। মিঃ বাগচি বললেন, 'ও খুব খারাপ লোকের খপ্পরে আছে। নিশ্চয়ই তিনি জিতেন মিত্তির লোকটার কথাই বলতে চেয়েছেন, যার কথা মল্লিকা নিজেই আমাকে বলেছে। একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, পুলিস ওর বিষয়ে খবর ভালোই রাখে। গোপালনগরের কথা পুলিস জানে, এবং মিঃ বাগচির ভাষায়, ও একটা দুঁদে মেয়ে।

পতিতা অথচ দুঁদে মেয়ে, তার স্বরূপ কী, আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। গতকাল রাত্রে আমি ওর ছলনা ধরতে পেরেছিলাম সেটা কোনো বুদ্ধি বা কৌশলের দ্বারা না, একান্তই আমার অনুভূতির দ্বারা। কারণ আমি কষ্ট বোধ করেছিলাম। হয়তো এটা ওদের জীবনের একটা অপরিহার্য ব্যাপার। কিন্তু আমি নিজেকে ঠিক একজন খদ্দের হিসাবে ভাবতে পারি নি। আমার সেরকম কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। এখনো নেই।

অফিসে পৌঁছেই আমি চিফের সঙ্গে দেখা করে লেখাটা তাঁকে পড়তে দিলাম। তিনিও ব্যস্ত প্রতীক্ষায় ছিলেন। দ্রুত চোখ বুলিয়ে লেখাটা পড়ে, প্রথমেই বললেন লেখাটা একটু আলগা হয়েছে, মানে তেমন কম্প্যাক্ট হয় নি। কিন্তু একটা নতুন জগতের সম্পর্কে, চিত্রটি বেশ ভালো ফুটেছে। তুমি কি লেখাটা নিয়ে আর একবার বসবে?'

বললাম, 'বসবো। আমি এইরকমই ভেবেছিলাম।'

চিফ্ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

আমি অবাক্ হয়ে বললাম, 'না তো। কেন?'

'তোমাকে যেন কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।' চিফ্ হেসে বললেন, 'তার চেয়ে বোধহয় বলা ভালো, একটা যেন মেলাংকলির ছাপ পড়েছে মুখে। এনিথিং ইটিং ইওর হার্ট?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হেসে বললাম, 'না না, সেরকম কিছু না।'

চিফ্ হেসে বললেন, 'না হলেই ভালো।'

আমি লেখা নিয়ে আমার টেবিলে বসলাম, এবং আবার গোটা লেখাটাকে কিছুটা মেরামতের চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে কতোটা সময় কেটে গিয়েছিল, খেয়াল করি নি, চিফ্ তাঁর টেবিল থেকে হাতে তোলা রিসিভার দেখিয়ে বললেন, 'অমল তোমার টেলিফোন। দ্যাট সেম্ সুইট ভয়েস!' বলে একটু চোখের ইশারা করলেন।

আমি উঠে টেলিফোন ধরলাম। ওপার থেকে অনসূয়ার স্বর শুনতে পেলাম, এবং কিছু না ভেবেই বললাম, 'শোন, আমার হঠাৎ একটু কাজ পড়ে গেছে, আজ আর দেখা হচ্ছে না।'

অনসূয়া জিজ্ঞেস করলো, 'অফিসের কাজ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আবার আজ নতুন কোনো রেড লাইট এরিয়া ভেঞ্চার করবে নাকি?' অনসূয়ার স্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর।

আমি উত্তরে শুধু হাসলাম, বললাম, 'প্লিজ কিছু মনে করো না। কাল ভোর

boiRboi.net

ছটায় টেলিফোন করো, কেমন ?'

'যদি উঠতে পারি।' বলেই অনসূয়া লাইন কেটে দিল।

অসসূয়া অসন্তুষ্ট হয়েছে বুঝতে পারলাম, কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার বিষয়ে নিজেই যথার্থ অবহিত নই। রিসিভার নামিয়ে রাখতেই, চিফ্ বললেন, 'বান্ধবীকে অ্যাভয়েড করলে মনে হচ্ছে ? সত্যি কোনো কাজ আছে নাকি ?'

হেসে বললাম, 'অ্যাভয়েড করি নি, আজ আমার এক জায়গায় যেতে হবে, রাত্রি আটটার আগে ফিরে হতে পারবো না।'

বলেই আমি চিফ্-এর কাছ থেকে সরে, আমার টেবিলে লেখাটা নিয়ে বসলাম। আসলে আমি চিফ্-এর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলতে পারছি না। কোথায় যে আমার অস্বস্তি বিঁধে আছে, বুঝতে পারছি না। লেখাটার প্রতিও যে আমার তেমন মনোযোগ আছে, তা নয়। আসলে আমি একটা আচ্ছন্নতার মধ্যেই রয়েছি।

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ লেখাটা আমি আবার নতুন করে দাঁড় করালাম। চিফ্ পড়ে বললেন, 'আগের থেকে একটু অন্যরকম হয়েছে। সমীক্ষক হিসাবে দরদটা একটু বেশী প্রকাশ পেয়েছে, এই এখানে, কলকাতা প্রবাসিনী বাঙ্গালীদের শৈশব জীবন সম্পর্কে তোমার জিজ্ঞাসা বেশ আর্ত হয়ে উঠেছে। এনি হাউ, লেখাটা ভাল হয়েছে।'

আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তায় আলো জ্বলছে। চিফ্‌কে বলে, অফিস থেকে বেরিয়ে, আমি আচ্ছন্নের মতোই হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা হেঁটে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে উঠে পড়লাম। বললাম, 'চৌরঙ্গি।'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, আমি যেন আজ বিশেষ করে প্রত্যেকটি মেয়ের মুখের দিকেই দেখতে লাগলাম। উৎসুক অনুসন্ধিৎসু আমার দৃষ্টি। তারপরে ট্যাক্সি থামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে নেমে, আমি যখন হাঁটতে লাগলাম, দেখলাম রাস্তাটা থিয়েটার রোড। প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে, আমি থিয়েটার রোড থেকে ক্যামাক স্ট্রীট ধরলাম। ক্যামাক থেকে সার্কুলার রোড। রীতিমতো তীক্ষ্ণ চোখে, মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এরকম দেখাটা নিতান্তই অশালীন। আমার সে-বোধ পুরোপুরি নেই।

সার্কুলার রোডের জংশনে এসে, আমি থমকিয়ে দাঁড়ালাম। মনে দ্বিধা জাগলো। ওর আসার সময় হয়েছে কী ? কিংবা, ও কি আজ আদৌ এসেছে, বা আসবে ? ও কী চৌরঙ্গি থেকে থিয়েটার রোডে ঢোকে ? অথবা সার্কুলার রোড থেকে, ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে ?

কিছু স্থির করতে না পেরে, আমি আবার ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে থিয়েটার রোডে ফিরে চললাম। চৌরঙ্গির মোড় অবধি ওকে দেখতে না পেয়ে, আবার ফিরে এলাম। ওকে দেখতে পেলাম না। ব্যগ্রতা আর হতাশা, যুগপৎ আমার মধ্যে জাগতে লাগলো। গোপালনগরের কথা আমার মনে পড়লো। কিন্তু সেখানকার কোনো ঠিকানাই আমার জানা নেই। গোপালনগর ছোট জায়গা নয়, চেতলা পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। সেখানে কোথায় গিয়ে ওর মতো একটি মেয়েকে আমি খুঁজে বের করবো ?

ভাবতে ভাবতে সার্কুলার রোড ধরে পশ্চিমে এগিয়ে গেলাম। রবীন্দ্র সরণীর কথা আমার মনে পড়লো। চৌরঙ্গি জংশন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। বাঁ দিকে

ক্যালকাটা ক্লাব, ডান দিকে ইনফরমেশন সেণ্টার। ডান দিকে কিছু মহিলা পুরুষের ভিড়। গাড়িও কতগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইনফরমেশন সেণ্টারেও রোজই কিছু না কিছু লেগেই থাকে। ক্লাবের দিকের ফুটপাথটা কিছু ফাঁকা। আমার লক্ষ্য রবীন্দ্র সরণী। কিন্তু হঠাৎ আমাকে থামতে হলো। মল্লিকা!

ওকে আমি দেখতে পেলাম, ইনফরমেশন সেণ্টারের ছোটখাটো ভিড়ের কাছেই। সকলের মধ্যে ওকে আমি স্পষ্ট আলাদা করে চিনতে পারলাম। আজ ওর গায়ে লাল শাড়ি, লাল জামা। চুলে দুটো বিনুনি করা। হাতের ব্যাগটা, গতকালের সেটাই। ও যেন কারোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝে মধ্যে আশেপাশের লোকজনের দিকে তাকাচ্ছে। দৃষ্টিটা নিশ্চয়ই সন্ধানী। সাধারণ ভাষায়, শিকার সন্ধানী।

আমি কী করবো, স্থির করে উঠতে পারলাম না। এখনই কি সোজা ওর সামনে চলে যাবো, আর নাম ধরে ডাকবো? অথবা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবো? সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না। নাম ধরে না ডাকলেও, সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আপত্তি কী? এ কথা মনে হতেই, আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। আর তৎক্ষণাৎ একটা মিনি বাস মল্লিকাকে আড়াল করে, ময়দানের দিক থেকে এসে দাঁড়ালো। আমি ব্যস্ত হতাশায় দৌড় দিতে গিয়েই একটা প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাড়িটা জোরে ব্রেক না কষলে, এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। কিন্তু আমার চিন্তা, মিনি বাসে মল্লিকা উঠে না যায়। গেলেও ওকে ধরতে হবে। আমি প্রাইভেট গাড়ির ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, ওপারে ছুটে গেলাম। মিনি বাসটাও ছাড়লো।

আমি ব্যাকুল চোখে বাসটার দিকে একবার দেখে, ফুটপাথের ওপর তাকালাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। দেখলাম, মল্লিকা রবীন্দ্র সরণীর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আমি দ্রুত পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর কাছাকাছি হতেই, ও আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। ওর দু চোখে বিস্ময়, ভুরু কুঁচকে উঠলো এবং থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি!'

হেসে বললাম, 'খুব অবাক্ হয়ে গেলে তো?'

'এদিকে কোথায়?' ওর চোখের দৃষ্টিতে আর গলার স্বরে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাস।

বললাম, 'আমি একটু ইনফরমেশন সেণ্টারে এসেছিলাম। মিনি বাসটা ধরবো বলেই ভেতর থেকে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ তোমাকে চোখে পড়ে গেল।'

'দেখো বাপু, পেছু-টেছু নাও নি তো?' ও সন্দিগ্ধ স্বরেই বললো, 'তোমরা খবরের কাগজের লোক, পুলিসের সঙ্গে চলাফেরা করো।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমার কাল থেকে সন্দেহটা যায় নি দেখছি। বলেছি তো ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ও রবীন্দ্র সরণীর দিকেই চলতে আরম্ভ করলো। এমন নির্বিকার, দেখে বোঝাই যায় না, আজ ভোরে ও আমার শয্যাত্যাগ করে এসেছে। আমার সঙ্গে যেন ওর কোনো সম্পর্কই নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় চললে?'

'দেখি কোন্ দিকে যাই।' ও বললো।

আমি বললাম, 'আমার সঙ্গেই চলো না।'

boiRboi.net

'কোথায় ?'

'যেখানে তোমার ইচ্ছে।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে না দেখলে কী করতে ?'

আমি মিথ্যা করে বললাম, 'হয়তো অফিসেই যেতাম।'

'তাহলে সেখানেই যাও না।' ও পরিষ্কার বললো।

আমি অবাক্ হলাম। ও যখন ওর সেই কাজেই বেরিয়েছে, আমাকে চলে যেতে বলছে কেন ? জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সঙ্গে কারোর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে নাকি ?'

ও নির্বিকার স্বরে বললো, 'না থাকলেও হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'তবে আমার সঙ্গে যেতে আপত্তিটা কী ?'

ও হঠাৎ কিছু বললো না। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'আমি কি তোমাকে ঠকাবো ভাবছো ?'

ও মাথা নেড়ে বললো, 'না। কিন্তু তোমাকে আমি এসব লাইনের লোক ভাবি নি।'

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'তোমার জন্যে ভাবছি এ লাইনের লোক হবো।'

'ওসব আবার কেউ হয় নাকি ? একটা মেয়ের জন্য ?' ওর স্বরে অবিশ্বাস, 'এসব যারা করে তারা আলাদা। সেইজন্যই তোমাকে আমার কেমন অন্যরকম লাগছে।'

আমি হেসেই বললাম, 'আমিও এইরকম দু-একদিন দেখলেই বুঝতে পারবে।' কথাটা বলতে গিয়ে আমার ভিতরে ছুঁচের মতো বিঁধলো।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'কোথায় যাবে ?'

বললাম, 'যেখানে তোমার ইচ্ছে। যে-কোনো হোটেলে বারে—।'

'না না না, হোটেলে-টোটেলে যাবো না।' ও তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'তার চেয়ে মাঠে-ময়দানে ভালো। ওসব জায়গায় গেলেই পুলিসে তাড়া করবে।'

মিঃ বাগচির কথা আমার মনে পড়লো। ও নিজেই আবার বললো, 'তোমার সেই ঘরে যাওয়া যাবে না ?'

আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। এখন রাত্রি আটটাও বাজে নি। ওকে নিয়ে গেলে, বাড়ির কারোর চোখে পড়তে পারে। তবু বললাম, 'হ্যাঁ, কেন যাওয়া যাবে না ?'

'তাহলে সেখানেই চলো।' ও দাঁড়ালো, 'টাকা কী দেবে ? সেটা ঠিক করে নাও।'

আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, বললাম, 'কতো চাও তুমি ?'

'এক ঘণ্টার বেশী থাকবো না, তিরিশ।' ও বললো।

আমি সেই মুহূর্তেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখে, ডেকে দাঁড় করালাম। ওকে বললাম, 'ঠিক আছে।'

ট্যাক্সিতে ওকে নিয়ে উঠে আমি সোজা পুব দিকে যেতে বললাম। কিন্তু কী আশ্চর্য। এই মেয়েই, ভোরবেলা পঞ্চাশটা টাকা নিতে আপত্তি করেছিল। সারাটা দিনের মধ্যে এমন কি পরিবর্তন ঘটতে পারে, আমার সঙ্গেও দরাদরি করতে হয় ? গাড়িতে উঠেই ও আমার কোলের ওপর একটা হাত রাখলো। বুঝতে পারি, এটাও ওর ব্যবসারই অঙ্গ। অন্তরঙ্গ হবার ছলনা।

boiRboi.net

কিছুটা এগিয়ে, আমি একটা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করলাম। ও জিজ্ঞেস করলো, 'কী করবে ?'

বললাম, 'একটা কিছু কিনে নিই। কী খাবে ? হুইস্কি না রাম ?'

'ওহ্ মদ।' ও বললো, 'আজ কি মদ খাবার সময় হবে ? যা হয় নাও। আমি সবই খাই।'

আমি দোকানে ঢুকে একটা হুইস্কি নিলাম। এ দোকানে কিছু শুকনো খাবারও পাওয়া যায়, যা দিয়ে অনায়াসে রাতের খিদে মেটানো যায়। সেরকম কিছু খাবারও কিনে নিলাম। গাড়িতে ফিরে আসতেই ও জিজ্ঞাসা করলো 'এতো কি নিলে ?'

বললাম, 'এমন কিছুই না। সঙ্গে একটু চিবোবার মতো কিছু।'

ট্যাক্সি আমাদের পাড়ায় ঢুকতেই, আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। গ্রীষ্মের সন্ধ্যারাত্রে এখনো পাড়া বেশ সরগরম। এখানে ওখানে ছেলে-মেয়েদের জটলা। অবিশ্যি এমনিতে কিছুই যায় আসে না আমার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখলেই, এ পাড়ার চোখ সহজে ছানাবড়া হয়ে ওঠে না। বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটলেই, কিছু কিঞ্চিৎ কৌতূহল দেখা দেয়। আমার সব থেকে বড় ভয়, এই মল্লিকাই হয়তো কারোর চেনা, এবং সেটা আশ্চর্যের ব্যাপারও কিছু না।

বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, প্যাকেজ নিয়ে নামলাম, খুব স্বাভাবিকভাবেই ডেকে বললাম, 'মল্লিকা, এসো।'

ও নেমে প্রথমেই নীচু স্বরে বললো, 'মল্লিকা নামটা কাল ছিল, আজ আর নেই।'

আমি চলতে গিয়ে যেন হোঁচট খেলাম। তার আগেই আমার চোখ পড়লো ব্রহ্মচারিদের ফ্ল্যাটের দিকে। না, সেখানে কোনো কৌতূহলী উৎসুক মুখ নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু দোতলা থেকে একটি মুখ আমাদের লক্ষ্য করলো। একটি মুসলমান পরিবার ফ্ল্যাটটিতে থাকে। চাকর-বাকরেরা এখন কেউই সিঁড়ির দিকে নেই। আমি ওকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কী তোমার নাম ?'

'আজ কিছু ঠিক করি নি।' ও একটু হেসে বললো, 'নতুন লোক হলে নতুন নাম বলতাম। তুমি আমাকে মল্লিকা বলেই ডেকো।'

আমি ওকে নিয়ে বেশ দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলাম। পকেট থেকে চাবি বার করে লক খুলে, ভিতরে ঢুকে আলো জ্বাললাম। ওকে ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। পাখা খুলে দিতেই ও যেন গতকালের নিজেকে হঠাৎ খুঁজে পেলো। ব্যাগটা সোফায় রেখে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললো, 'তোমার ঘরটা সত্যি সুন্দর। এতো বড় ঘর, একলা একজনের, খুব মজা। ছাদের দরজাটা কি আজ খোলা যাবে ?'

বললাম, 'যাবে। তুমি ছাদে যেতেও পারো, আলসের ধারে গিয়ে, নিচের দিকে উঁকি দিও না। কেউ দেখলেই নানারকম ভাবতে পারে। অবিশ্যি তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'কেন কেন ?' ও হঠাৎ চোখের তারা বড় করে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু যায় আসে না কেন ? তোমার ঘরে কি আক্‌চার বেশ্যারা আসে ?'

কথাটা এমন স্পষ্ট আর সোজা, আমি হঠাৎ কিছু বলতে পারলাম না। একটু

boiRboi.net

থেমে বললাম, 'না বেশ্যাদের কথা হচ্ছে না। আমার বান্ধবীরা তো প্রায়ই আসে। বন্ধুদের সঙ্গে তাদের বউরাও আসে। সকলেই তা জানে, তোমাকেও সেইরকমই একজন ভাববে।' বলতে বলতে আমি টেবিলের ওপর প্যাকেজ রেখে, ছাদের দরজাটা খুলে দিলাম।

ও পিছন ফিরে ছাদের দিকে তাকালো কিন্তু তখনই উঠে এলো না। বললো, 'তোমার বুঝি অনেক মেয়ে বন্ধু আছে?'

হেসে বললাম, 'অনেক নয়, দু-চারজন আছে। কলেজে-টলেজে যাদের সঙ্গে পড়েছি।'

'তাদের সঙ্গে শোয়া-টোয়া—?' ও কথাটা শেষ না করেই আমার দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ইশারা করলো।

আমি বললাম, 'না, তাদের সঙ্গে ওসব কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার কি সোডা লাগবে, না জল দিয়ে খাবে?'

ও সোফার পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বললো, 'জল দিলেই হবে।' তারপরে বললো, 'তোমার এখানে এসেই আমার চান করতে ইচ্ছা করছে।'

ঠিক এ কথাটাই আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছিল। আমি গেলাস আর জলের ব্যবস্থা করতে করতে বললাম, 'তুমি তো আমার এখানে চান করতে আসবে বলেছিলে। কিন্তু তোমার মনে কী সব সন্দেহ ঢুকেছে, আমাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছো না।'

ও কোনো জবাব দিল না। আমি হুইস্কির বোতলের কর্ক খুলতে খুলতে ওকে দেখলাম। লাল শাড়িটা তেমন দামী বা নতুন না, খুব সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ি, জামাটাও সেইরকম। কিন্তু ওকে মানিয়েছে ভালো। কাঁচুলির মতো জামাটা সংক্ষিপ্ত, গলা আর বুকের কাছে অনেকটা কাটা। বিশেষ করে পিছন দিকে, পিঠের অংশ। শাড়িটা পরেছে নাভির নিচে, হালের ফ্যাশান অনুযায়ী। অনেক কেতাদুরস্ত রমণীর থেকে ওকে অনেক বেশী মানিয়েছে। এখন ওর আঁচলটা অনেকখানিই সরে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে ওর সুবর্ত নাভি, আর মেদহীন নাভিস্থল। চুলের মাঝখান থেকে সিঁথি কেটে দু-পাশে দুটো বিনুনি ওর বয়সকে যেন আজ আরো কমিয়ে দিয়েছে। বাঁ চোখের নিচে, গালের কাটা দাগটা তেমনি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। দাগটা আসলে ওর মুখে যেন কী একটা রহস্য এনে দিয়েছে, ওকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। অথবা এসব আমারই মনগড়া কল্পনা।

ও কিরকম পান করতে পারে কিছুই জানি না। গত রাত্রের কথা থেকে মনে হয় ভালোই পারে। আমি অনুমান করে ডবল লার্জ পেগ ওর গেলাসে ঢাললাম। আমি নিজে কোনো দিনই এ বস্তু তেমন উপভোগ করতে পারি নি। আমার সারাদিনে যেরকম মানসিক অবস্থায় কেটেছে, তার থেকে নিষ্কৃতির জন্য হয় তো এ বস্তু আমাকে সাহায্য করতে পারে। যদিও, অবসাদ বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছু আমি বোধ করছি না। ওকে খুঁজে না পেলে হয়তো আমি হতাশায় আর অবসাদে ভেঙে পড়তাম।

দুটো গেলাসে হুইস্কিতে জল ঢেলে, একটা প্লেটে চিকেন প্যাটিসগুলো প্যাকেট থেকে খুলে ঢেলে নিলাম।

boiRboi.net

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?'

'না ঘুমোই নি।' ও বললো সোফার পিঠ থেকে মাথা তুলে, 'আমার মন মেজাজ তেমন ভালো নেই। বাড়িতে খুব ঝগড়া হয়েছে। কই, মাল দাও।' বলে হাত বাড়ালো।

আমি ওর হাতে গেলাস তুলে দিলাম। সেণ্টার টেবিলটা টেনে এগিয়ে দিলাম ওর সামনে, যাতে গেলাসটা রাখতে পারে। প্যাটিসের প্লেটটাও সেখানে রাখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কার সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া করলে ?'

'সেসব তুমি বুঝবে না।' বলে, ও কোনোরকম উইশ না করে, কিছু না বলেই, নিজের গেলাসে ঠোঁট ডুবিয়ে দীর্ঘ চুমুক দিল, বললো, 'খবরের কাগজেই লেখ, আর যাই করো, তোমরা আমাদের কথা কিছু বুঝবে না। তাও আবার তোমার মতন একটা লোক, কলকাতায় যাদের বাড়ি আছে, টাকা আছে, এরকম একটা ঘরে তোফা আরামে থাকে।'

আমার অপরাধটা কোথায়, ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু ওর কথার মধ্যে রীতিমতো বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেল। ও আমার যেরকম একটা ছবি আঁকলো, তার পুরোটা সত্যি না। আমি গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'আমি তোফা আরামে আছি, এরকম একটা ধারণা তোমার কেন হলো ?'

মিছে কথা বলছি নাকি ? তুমি তোফা আরামে নেই ?' ও বললো, 'আজ গোটা দুপুরটা ভ্যাপসা গরমে, আমি মেঝের এক কোণে শুয়ে কাটিয়েছি। শালা মাছির উৎপাতে একটু ঘুমোনোর উপায় নেই। যাক গে, এসব কথা ছাড়ো। তোমার সঙ্গে কিন্তু আমার এক ঘণ্টার কড়ার।'

ও কথাটা ভুলতে পারছে না। বললাম, 'মনে আছে। তুমি খাবারটা খাও।'

ও গেলাসে আবার এক দীর্ঘ চুমুক দিল, প্রায় শেষ করে আনলো। চুমুক দেবার সময় ওর মুখটা ঈষৎ বিকৃত হয়ে উঠলো। সম্ভবত এটাই ওর স্বভাব। ঝাঁজটা তো লাগেই। ও আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু হাসলো, বললো, 'তুমি অমন ভাশুর ভাদ্দর-বউয়ের মতন করছো কেন ? কাছে এসে বসতে পারছো না ? তোমার মতলবটা কী, আমাকে খাইয়ে খুব মাতাল করে দিয়ে, কালকের মতন সারা রাত আটকে রেখে দেবে ?'

আমি অবাক্ হয়ে বললাম, 'কাল রাত্রে কি আমি আটকে রেখেছিলাম ?'

'তা নয়, ওটা একটা কথার কথা।' ও হেসেই বললো, 'কিন্তু তুমি আজ যেরকম সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছ, খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।' বলেই ও ওর গেলাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করে দিল।

আমি আমার কোনো কোনো মাতাল বন্ধুকেও, এতোটা পরিমাণ মদ, এতো তাড়াতাড়ি শেষ করতে দেখি নি। আমি নিজে থেকে এখনই আর মদ ঢেলে দিলাম না, সোফায় ওর পাশে গিয়ে বসলাম। গতকালের তুলনায়, ওর কথাবার্তা আজ একটু এলোমেলো। ও আবার বললো, 'মেলা খেয়ে-টেয়ে মাতাল হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ে যাবো।'

আমি বললাম, 'তুমি একটু খাবার খাও।'

ও ঝুঁকে পড়ে একটি প্যাটিস তুলে নিল, আর সেটাকে দেখিয়ে, তার আকার সম্পর্কে একটা অশ্রাব্য উক্তি করলো, তারপরে সেটা আমার দুই ঠোঁটের মাঝখানে ঠেসে ধরে

boiRboi.net

বললো, 'তুমি এটা ভালো করে চুষে খাও।' বলেই খিলখিল করে হেসে, আমারই গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আমার হাতের গেলাস থেকে খানিকটা হুইস্কি চলকিয়ে পড়লো। আমি প্যাটিস্টা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলাম। ও বললো, 'শালারা আর কোনোরকম সাইজের খাবার বানাতে পারে নি?'

ওকে কেমন করে বোঝাবো, কলকাতার এক সেরা দোকানের খাবারের বিষয়ে ও এই সব উক্তি করছে। আমার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েও, ও আমাকে ছেড়ে দিল না। আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে এক হাত বেষ্টন করে, ওর শরীর আমার গায়ে চেপে রাখলো, ওর মাথাটা ঠেকলো আমার চিবুকের কাছে। ওর গরম নিঃশ্বাস লাগছে আমার গলার কাছে। ও কি মাতাল হয়ে গেল?

এই কথা ভাববার মুহূর্তেই, ও হঠাৎ মাথা সরিয়ে, সোজা হয়ে বসলো। বললো, 'খাবার-টাবার খেতে আমার ভালো লাগে না। আমার গেলাসে তুমি আর মাল ঢালছো না কেন?'

হুইস্কি বা মদ ও বলে না, একটি শব্দ ছাড়া। প্যাটিস আর আমার গেলাস রেখে উঠে, লেখার টেবিল থেকে হুইস্কির বোতল আরে জলের জাগ্ সেণ্টার টেবিলে নিয়ে এলাম। ওর গেলাসে হুইস্কি ঢেলে দিতে দিতে বললাম, 'খাবার ভালো না লাগলে চলবে কেমন করে? কিছু খেতে তো নিশ্চয়ই ভালোবাসো।'

'হ্যাঁ, বাসি তো।' ও বললো, 'এ সময়ে জল ঢালা ঠাণ্ডা ভাত, আর আলু-পোস্তর চচ্চড়ি আমার সব থেকে বেশী ভালো লাগে। রাত্রে গিয়ে আমি তাই খাবো।'

আমার পক্ষে এরকম খাবার যোগানো অসম্ভব। ওর কথায় আমাদের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। গরমের সময় দেখেছি, আমাদের বাড়ির মেয়ে-বউদেরও দিনের বেলা পান্তা ভাত আর গরম মাছ ভাজা খুব প্রিয়। আমি আগের তুলনায় ওর গেলাসে একটু কম করে হুইস্কি ঢাললাম। আমি ওকে মাতাল করতে চাই না। জল ঢেলে ওকে গেলাস দিলাম। ও চুমুক দিয়েই বললো, 'এবার মাল কম দিয়েছো, পানসে হয়ে গেছে।' বলেই আমার জবাবের আশা না করেই, গেলাসটাকে ঠক্ করে রেখে, ও আমার দিকে ফিরে বসলো, আর বুকের এক অংশ আমার গায়ে চেপে বললো, 'এই, তুমি আমাকে গুল মেরেছো আজ, তাই না?'

গুল! মানে মিথ্যা কথা? আমি অবাক্ চোখে ওর দিকে তাকালাম। ওর খল করে কাজল মাখা চোখ জ্বলজ্বল করছে, দৃষ্টিতে কৌতুক, রঙ মাখা ঠোঁটের কোণে হাসি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলো তো?'

ও আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'তুমি যা বললে ওদিকে কোথায় গেছলে, আর আমাকে আচমকা দেখে ফেলেছো, ওটা স্রেফ্ গুল্। তুমি আমাকে খুঁজতেই গেছলে, সত্যি করে বলো, মা কালীর দিব্যি।' এবং দিব্যি দিয়েও, ও আমার একটা হাত টেনে ওর বুকে চেপে ধরলো।

দিব্যি-টিব্যিতে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু এরকম একটা সত্যি কথার মুখোমুখি হয়ে, আমি বিব্রত বোধ করলাম, এবং ওর বুকের স্পর্শে, আমার মিথ্যার শক্তি গলে গিয়ে, একটা তীব্র আবেগের সঞ্চার হলো। আমি ধরা পড়ার হাসি হেসে বললাম, তুমি কী

করে তা বুঝলে ?'

'আমি বুঝেছি। ওসব আমি বুঝি।' ও ওর বুকে চেপে রাখা আমার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কাল আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি কোথায় কোথায় ঘুরি। আর তুমি আজই ওদিকে কাজে গেলে, আমাকে হঠাৎ দেখে ফেললে, আমার বিশ্বাস হয় নি। সত্যি বলি নি, অ্যাঁ ? বলো।'

বললমে, 'হ্যাঁ, সত্যি বলেছো।'

'আমাকে তোমার ভালো লেগেছে, না ?' ও মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমি জানি, আমাকে তোমার ভালো লেগেছে।' বলে ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, দু-হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে, মুখটা তুলে নিয়ে এলো।

ওর এই আচরণটা এমনই আকস্মিক, অথচ সমর্পণের ভঙ্গীটা এমন সুন্দর আর গভীর আমার সমস্ত প্রাণটা তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠলো। এই সব তৃষ্ণার অনভূতিগুলো আমার জীবনে কোথায় গুপ্ত হয়ে ছিল, কিছুই জানি না। আর বাস্তবের বৈচিত্র্য হচ্ছে এই, রাস্তায় ঘোরা একটা সাধারণ দেহোপজীবিনীর শরীরের দরজায় তা প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। কবে যেন কোন মহারথী সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছিলাম, বাস্তব হচ্ছে আসলে অত্যন্ত অপ্রাকৃত। কথাটা বোধহয় এইরকম ছিল, অল্ রিয়ালিটিজ আর আনন্যাচারেল। আমি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ওর ঠোঁটের ওপর চুমো খেলাম। ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, আর অত্যধিক গরম ওর জিভের স্পর্শ পেলাম। আমি দু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে, আরো নিবিড় করে নিলাম।

মিমিট খানেক সময় না যেতেই, ও হঠাৎ আমার আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গিয়ে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকালো, বললো, 'আমার এ কাপড়টা তাঁতের, খুব মাড় দেওয়া আছে। চটকে গেলে, পরে আর বাইরে বেরোতে পারবো না।'

আশ্চর্য, এমন একটা মুহূর্তে, ও শাড়ির কথা ভুলতে পারে নি। আবার বললো, 'আমি বাপু এই সব শাড়ি-টাড়ি পরে তোমার সঙ্গে কিছু করতে পারবো না। আগেই খুলে রাখি।' বলে ও সোফা থেকে উঠে, আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। খুব সাবধানে বুকের থেকে আঁচল সরিয়ে ঘুরে ফিরে শাড়িটা খুললো। কিন্তু ছুড়ে ফেললো না, আল্‌তো করে ধরে অন্য একটা সোফার ওপরে আস্তে রাখলো। তারপরে বললো, 'জামাটাও খুলে ফেলি। নইলে চটকে যাবে।'

বলে ওর লাল ছিটের জামাটাও খুলে, শাড়ির ওপরে রাখলো।

গত রাত্রের ময়লা ব্রা-টা চিনতে আমার অসুবিধা হলো না। ওটা ও আজও কাচে নি। কালো মোটা কাপড়ের সায়াটা পুরনো, এক এক জায়গায় অদ্ভুত ফ্যাকাসে সাদা দাগ। হয়তো কাঁচা রঙ উঠে গিয়েছে। দু-এক জায়গায় সেলাইও পড়েছে। ও আবার আয়নার কাছে গিয়ে নিজেকে একবার দেখলো, তারপরে এগিয়ে এসে, গেলাস তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিল।

এই মুহূর্তেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমি সেদিকে ফিরে তাকালাম, কিন্তু উঠলাম না। ও বলে উঠলো, 'ওটা বাজছে যে। ধরো।'

আমি বললাম, 'থাক।'

ও অবাক্ চোখে, ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো, বললো, 'ধরবে না ?'

boiRboi.net

বললাম, 'না। আমি এখন ঘরে নেই।'

ও আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললো, 'তুমি খুব খচ্চর আছো মাইরি। ঘরে থেকেও জানিয়ে দিচ্ছ, ঘরে নেই। আমিই বলে দিই, তুমি এখন মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করছো।'

ওর সমস্ত কথাগুলোই ওর মতো। টেলিফোনটা এতক্ষণে চুপ করলো। কে হতে পারে? অফিস থেকে নিশ্চয়ই কেউ করে নি। আমি আমার কাজ সেরেই এসেছি। বাড়ি থেকে ট্রাঙ্ককল আসে নি তো? বাবার শরীরটা কিছুকাল ভালো যাচ্ছে না। এ সপ্তাহ শেষে আমার একবার বাড়ি যাবার কথাও আছে। কিন্তু সেসব কি আদৌ আমার মনে আছে? এখন কলকাতা ছেড়ে একদিনের জন্যও আমার কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। অথচ দুদিন আগেও আমি এরকম ভাবতে পারতাম না।

ও এখন নিজেই ওর গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিল, এবং বেশ খানিকটা নিল। জল মেশানো অনেক কম। চুমুক দিল মুখ বিকৃত করে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওর চোখই শুধু লাল হয়ে ওঠে নি, মুখেও লাল ছটা লেগেছে। ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে। আমার পাশে এসে বসলো, জিজ্ঞেস করলো, 'আমি এসেছি এক ঘণ্টা হয় নি?'

বললাম, 'প্রায় এক ঘণ্টা।'

'তবে? আমাকে বসিয়ে রেখেছো কেন?' ও একটা পা তুলে দিল আমার কোলের ওপর, বললো, 'আমাকে এখনো আরও খেপ্ দিতে যেতে হবে, তা জানো? টাকা নিয়ে যেতে না পারলে, আমাকে লাত্থি মেরে তাড়িয়ে দেবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তোমাকে লাত্থি মারবে?'

'যে মারে।' ও আমার বুকের কাছে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমাকে একজনই শালা এ দুনিয়াতে মারতে পারে, আর কেউ না।'

'কে সে?'

'তা শুনে তোমার লাভ নেই।'

হয়তো ঠিক, কিন্তু সেই অপরিচিত অদৃশ্য মানুষটি, একমাত্র যে ওকে মারতে পারে, তার কথা ভেবে আমার ভিতরে কেমন একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভূত হলো। বললাম, 'সে লোক যে-ই হোক, ভালো লোক নয়। টাকার জন্য সে মারবে কেন? তুমি তো আর ইচ্ছা করে টাকা না নিয়ে যাও না।'

'সে ওসব কিছু বুঝতে চায় না।' ও বললো, 'টাকা না পেলেই তার মাথা গরম হয়ে যায়।'

বললাম, 'আমি বলবো, তাহলে সে মুর্খ।'

ও হঠাৎ আমার গায়ের কাছ থেকে সরে, ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে, রীতিমতো স্বর চড়িয়ে বললো, 'এই, দ্যাখো, মেলা ফটফট করো না। তোমাদের শালা শিক্ষিতদের চিনতে আমার বাকী নেই। যে জন্য নিয়ে এসেছো, তাই করো, আমাকে ছেড়ে দাও। সে মুর্খ কি আর কিছু, তা তোমাকে বলতে হবে না।' বলেই হাত বাড়িয়ে গেলাস নিয়ে লম্বা চুমুক দিল।

ওর চড়া স্বরে আমি শশব্যস্ত হয়ে ছাদের খোলা দরজার দিকে তাকালাম। দোতলা থেকে ওর গলার স্বর শুনতে পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র না। ওকে উত্তেজিত করা উচিত

boiRboi.net

না। আমি ইচ্ছা করে ওকে উত্তেজিত করি নি, আমার যা মনে হয়েছিল, তা-ই বলেছি। এখনো আমি সেই অদৃশ্য অচেনা মানুষটার ওপর রাগে আর ঈর্ষায় জ্বলছি। আমি জানি না, সেই মানুষটা ওর কে হতে পারে। ওর কথা থেকে মনে হয়, সে পুরুষ। কিন্তু কী রকম ওদের সম্পর্ক, আমি কিছুই অনুমান করতে পারি না। বাবা বা ভাই যে না, তা ওর কথা থেকেই বোঝা যায়। বললাম, 'ঠিক আছে বলবো না। তবে সে যে খুব নিষ্ঠুর, তা আমি বুঝতে পারছি।'

'সে নিষ্ঠুর কি বাঘ সিংহ হাতী ঘোড়া, কারোর কিছু বলবার নেই।' ও তেমনি চড়া স্বরেই বললো, তারপরে টলতে টলতে খাটে গিয়ে বসলো। আবার বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার যা কারবার, তা মিটিয়ে নাও, আমার কে কোথায় আছে না আছে, ওসব নিয়ে তোমার কী দরকার?'

আমি আবার শঙ্কিত চোখে ছাদের দিকে তাকালাম। ও এখন বিপরীত কথা বলছে। আমি নিজে থেকে ওকে কোনো কথাই বলতে যাই নি। টাকা নিয়ে না যেতে পারলে লাথি খাবার কথাটা ও নিজেই বলেছে। কিন্তু আমি দেখছি, ওকে এ বিষয়ে আর কথা বলতে দেওয়া উচিত না। ওর উত্তেজনা ক্রমে বাড়ছে। আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর আবেগ থাকা সত্ত্বেও, ওকে ভোগ করার মতো স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমি ওর কাছে গিয়ে, ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি আর এ নিয়ে কোনো কথাই বলছি না।'

'তাহলে কেন বলতে গেলে?' ও উচ্চ স্বরে বললো, 'আমি আমার নিজের জ্বালায় মরছি, তুমি আবার তাতে ফোড়ন কাটতে এলে।' ওর চোখ আধ বোজা, ভুরু কোঁচকানো, মুখে একটা তীব্র যন্ত্রণার ছাপ।

বললাম, 'তুমি একটু শান্ত হও, আমি আর কিছু বলবো না। তুমি কি চোখে মুখে একটু জল দেবে?'

'না, এখন আর জল-টল দেবো না।' ও বললো, 'তুমি কিন্তু আমার অনেক বেশী সময় নিয়ে নিচ্ছ।'

বললাম, 'বেশী সময়ের জন্য, আমি তোমাকে বেশী টাকা দেবো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি আজ রাত্রে আর বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারবে না।'

ও মাথাটা নীচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, মালটা বেশী খাওয়া হয়ে গেছে। আবার এখন রাস্তায় গিয়ে, কার পাল্লায় পড়বো না পড়বো, কে জানে? হয়তো পুলিসের হাতেই পড়ে যাবো।'

বললাম, 'আমার মনে হয়, আজ তোমার বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো।'

'বলছো?' ও হাত বাড়িয়ে আমার বুকের জামা ধরে টানলো, তারপরে দু-হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো।

বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তাই বলছি।'

'আসলে কী জানো, তোমাদের এসব হুইস্কি-টুইস্কি আমাদের পোষায় না।' ও বললো, 'এসব যে কী ভাবে কী করে দেয়, ধরতে পারি না।'

আমি ওর তপ্ত গালের সঙ্গে, কাটা দাগটার ওপরে আমার গাল রাখলাম। আমার গলা থেকে ওর হাত খসে পড়লো। আমি আবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলাম,

boiRboi.net

স্পর্শ করলাম। ওর তপ্ত ঠোঁট একেবারে আলগা, প্রতিদানের কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা ওর নেই যেন। ওর সারা শরীরেই একটা মাতাল শৈথিল্য, বসে বসেই বলছে, ভালো করে তাকাতেও পারছে না। বললাম, 'মল্লিকা, তুমি বরং কাপড়-চোপড় পরে নাও। যদি বলো তো, তোমাকে আমি পোঁছেও দিয়ে আসতে পারি।'

'তাহলে তুমি মিটিয়ে নাও।' ও ধপাস করে খাটের ওপর শুয়ে পড়লো।

আমি বললাম, 'আমার কিছুই মেটাবার নেই। তুমি উঠে, কপালে ঘাড়ে একটু জল দিয়ে নাও।'

'কিন্তু টাকার কী হবে?' ও মুখ ফিরিয়ে, লাল টকটকে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আমার ভিতরটা বিমর্ষতায় ভরে উঠলো, বললাম, 'টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি, সেজন্য ভেবো না। যা বলেছিলাম, তার থেকে বেশীই দেবো। কিন্তু তোমাকে একটু সোজা হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, বুঝলে? ভালোভাবে বেরিয়ে গিয়ে, ট্যাক্সিতে উঠতে পারলেই হলো।'

ও হাত বাড়িয়ে বললো, 'বেশ, তোল আমাকে।'

আমি ওর হাত ধরে টেনে তুললাম। ওর শরীর ভারী হয়ে পড়েছে। ও খাট থেকে নেমে টলতে টলতে বাথরুমের দিকে গেল। আমি তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলাম। ও ভিতরে ঢুকলো। আমি হাত ধরে ওকে বেসিনের কাছে নিয়ে গিয়ে, জলের মুখ খুলে দিলাম। ও জল দিয়ে চোখে মুখে ছিটা দিল। ঘাড়ে গলায় বুকেও জল হাত বুলিয়ে নিল। তোয়ালেটা এগিয়ে দিলাম। ও কমোডের দিকে সায়া গুটিয়ে নিতে নিতে এগিয়ে গেল। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমার মনে কোনো আক্ষেপ নেই, কিন্তু একটা হতাশায় কষ্ট বোধ করছি। ও বেরিয়ে এসে শাড়ি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরলো। এখন ওকে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ মনে হচ্ছে, তবুও জামার ওপরে শাড়িটা তেমন যেন গুছিয়ে পরা হোলো না। আমি আমার পার্স থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'পঞ্চাশ টাকা আছে, হবে তো?'

'তোমাদের বাবা আমি কিছু বুঝি না।' ও টাকাটা হাতে নিয়ে বললো, 'টাকা দেবে অথচ কিছু করবে না, এ আবার কী ঢং? এসব হলো বড়লোকী ব্যাপার, তাই না?' ও হাসলো। ওর ব্যাগের মধ্যে টাকা পুরলো।

বড়লোক! আমার যা অবস্থা, তাতে আগামী কালই অফিস থেকে কিছু আগাম টাকা না তুললে চলবে না। সঞ্চয় বলতে আমার তেমন কিছু নেই। আমার বেতনের টাকাতেই, আমাকে চালাতে হয়। দুদিনের মধ্যে এরকম খরচের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ওকে টাকা দিয়ে আমার মনে কোনো আফসোস হচ্ছে না, বরং আমার ভিতরে কোথায় একটা স্বস্তি বোধ হচ্ছে। ভবিষ্যতে ওকে আমি টাকা দিতে পারলে খুশী হবো।

ও তৈরি। আমিও তাড়াতাড়ি আলো পাখা নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে ওকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোলাম। দোতলার মুখেই অন্য ফ্ল্যাটের চাকরের মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। চাকরটির চোখে অবাক্ দৃষ্টি, সে মল্লিকার দিকে দেখছে। আমি ওকে

boiRboi.net

নিয়ে দ্রুত নেমে গেলাম। আমাকে কেউ কোনো দিন এরকম অবস্থায় দেখে নি। চাকরটা মদের গন্ধও নিশ্চয়ই পেয়েছে, আর চাকর মহলে কথাটা এখনই ছড়িয়ে পড়বে। আর সেখান থেকেই বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অন্দরমহলে।

রাত্রি খুব একটা বেশী হয় নি। পাড়ার রাস্তায় এখনো চেনা মুখ ঘোরাফেরা করছে। বড় রাস্তার কাছে এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে ওকে নিয়ে উঠে পড়লাম।

একটা গাড়ি ঢুকতে পারে, এমন একটা গলির মধ্যে একটি বন্ধ দরজা বাড়ির সামনে ও ট্যাক্সি দাঁড় করাতে বললো। ও বললো, 'তোমার সবই আমি আজ মাটি করে দিয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে বাড়ির মধ্যে এসো।'

আমি কথাটার ঠিক অর্থ বুঝলাম না। ও আগে নেমে দরজার গায়ে হাতড়ে কলিং বেলের বোতাম টিপলো। আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, সে যদি একটু অপেক্ষা করে, তাহলে আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে যাবো। ড্রাইভার রাজী হলো, কিন্তু সে গাড়ি নিয়ে গলির মধ্যে থাকতে পারবে না, মোড়ে অপেক্ষা করবে। কোনো গাড়ি এলে গেলে আটকে যাবে। আমি সম্মতি জানিয়ে দরজা খুলে বাইরে গেলাম।

বাড়ির বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। কোনো আলো জ্বলছে না। মল্লিকা বললো, 'আমি এসেছি।' তারপরে পিছন ফিরে আমাকে ডাকলো, 'এসো।'

আমি একটা অদম্য কৌতূহল নিয়েই ওর সঙ্গে ভিতরে গেলাম। সামনে একটা উঠোনের মতো জায়গা রয়েছে মনে হলো। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না। একটি লোক, যে দরজা খুলে দিয়েছিল আবার বন্ধ করে দিল। মল্লিকা আমার হাত ধরে বললো, 'এসো, দেখো, এখানটা একটু উঁচু আছে।'

ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। সামনের ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু আলোর রেখা দরজার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। ও গিয়ে সেই দরজায় কয়েকটা টোকা দিল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল ঘরটা বেশ বড়। একটা পাখা মাথার ওপর বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, কিন্তু গোটা ঘরটা বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় ঠাসা রুদ্ধশ্বাস। সব টেবিলেই মদের গেলাস। গোটা চারেক টেবিল ঘিরে, অনেক লোক বসে তাস খেলছে। এক পলকে দেখেই বুঝতে পারলাম, ফ্ল্যাশ খেলা চলছে। একটা মোটা তীক্ষ্ন স্বর শোনা গেল, 'এখানে কী চাই।'

আমি লোকটার দিকে তাকালাম। কালো শক্ত মুখ, লাল চোখ। মাথায় কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল। গায়ে নীল রঙের শার্ট। তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। সে আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখলো। বয়স চল্লিশের বেশী নয়, কমও হতে পারে। মুখের দিকে দেখলেই মনে হয়, লোকটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর, যে কোনো অপরাধ সে করতে পারে। লোকটাকে আমি কোথাও দেখেছি মনে হলো। এরকম লোককে কোথায় দেখতে পারি? মনে করতে পারছি না।

আমি বুঝতে পারলাম না, মল্লিকা তাকে কোনো ইশারা করলো কী না। সে বললো, 'ঠিক আছে, ওপরে নিয়ে যা।' বলে সে আমার দিকে আর একবার তাকালো। এখন তার দৃষ্টি তেমন চোখা চোখা তীক্ষ্ন না। মল্লিকা আমার দিকে ফিরে

boiRboi.net

বললো, 'খেলবে নাকি ?'

আমি মাথা নাড়লাম। ও আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। কয়েক হাত দূরেই বাঁ দিকে দোতলার সিঁড়িতে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। মল্লিকা বললো, 'ওপরে চলো।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওপরে কী আছে ?'

'দেখবেই চলো না।' ও বললো।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়ে বললাম, 'এটা কি তোমার সেই দিদির বাড়ি ?'

'ঠিক ধরেছ।' ও বললো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর ঐ লোকটা ?'

'ওর নাম জিতেন মিত্তির।'

নামটা শোনা মাত্রই, ওর মুখে শোনা সেই বাঘের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই লোকটাকে ও বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছিল। আর ওর গালের কাটা দাগটাও নাকি বাঘের আঁচড়ে দেওয়া। তার মানে কি এই লোকটার কথাই বলেছে ?

দোতলার সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। দেখলাম, এখানে ওখানে দু-একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। নিচের তলায় কতগুলো ঘর আছে, কিছুই বুঝতে পারি নি। ওপরে এসে দেখলাম, চার-পাঁচটা ঘর রয়েছে। সামনের বড় ঘরে সস্তা বিবর্ণ কতগুলো চেয়ার আর টুল পাতা রয়েছে। সে ঘরে একটি মেয়ের সঙ্গে বসে একজন কথা বলছিল। সেও স্ত্রীলোক, কিন্তু তার বয়স মনে হয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। রঙ ফরসা, শরীরের বাঁধুনি বেশ শক্ত। ইংরেজিতে যাকে বলে সেক্সি, বয়স হলেও, এই স্ত্রীলোকটির শরীরে সেই আবেদনের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তার গায়ে স্লিভ-লেস জামা, বাসন্তী রঙের শাড়ি নাভির নিচে। মাথার চুলে খোঁপা এবং সিঁথায় সিঁদুর। তার মুখের রক্তাভা এবং চোখের রঙ দেখলেই বোঝা যায়, পেটে পানীয় পড়েছে। সে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলো। তারপর মল্লিকার দিকে ফিরে বললো, 'মনে হচ্ছে গুচ্ছের গিলে মরেছিস ?'

ও হাসলো, বললো, 'সেজন্যেই ওকে এখানে ধরে এনেছি। আমার দ্বারা কিছু হলো না, ওর সঙ্গে কোনো মেয়েকে ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

আমি অবাক্ ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, আমার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু তোমাকে পেঁছুতেই এসেছি, এখুনি চলে যাবো।'

স্ত্রীলোকটি হেসে, উঠে আমায় কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'চলে যাবেন কেন, বসুন না। না হয় একটু এমনি কথাবার্তাই বলবেন।'

মল্লিকা বললো, 'এ আমার দিদি।'

স্ত্রীলোকটি ভদ্রমহিলার মতোই কপালে হাত ঠেকিয়ে আমাকে নমস্কার জানালো। আমিও প্রতি-নমস্কার করলাম। তার সাদা ঝকঝকে অটুট দাঁতের হাসিটা বেশ ঝকঝকে। বললাম, 'ওর শরীরটা খারাপ করছিল বলে পেঁছুতে এসেছিলাম। অন্য দিন পারলে আসবো, আজ আমাকে ফিরতে হবে।'

'আহা, আমাদের মেয়েগুলোকেই না হয় এক নজর দেখে গেলেন।' তথাকথিত দিদি বললো, 'দেখুন, পাতে দেবার মতো কী না। আর টুক্‌কির তো বরাত ভালো, আপনার

boiRboi.net

মতো লোক ওকে পেঁছে দিয়ে গেলেন।'

টুক্‌কি! তার মানে মল্লিকারই ডাক নাম টুক্‌কি। কিন্তু দিদিটিকে বোঝানো মুশকিল, পাতে দেবার উপযুক্ত মেয়েদের দেখবার জন্য আমি এখানে আসি নি। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় ইতিমধ্যেই আমি ভদ্রপল্লীতে এরকম ছদ্ম গৃহস্থ পতিতালয় দেখেছি। গুটি চারেক মেয়েকে নিয়ে দিদি ঘরে ঢুকলো। আমি তাদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। সকলেরই বয়স কুড়ি পঁচিশের মধ্যে এবং সম্ভবত রাত পোহালে সকলেই গৃহস্থ কন্যা। মল্লিকা ইতিমধ্যে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল। বললাম, 'মল্লিকা আমি চললাম।'

দিদি বললো, 'আরো মেয়ে আছে, তারা এখন এন্‌গেজড আছে। কবে আসবেন বলুন। আপনার নামটাও তো জানা হলো না।'

বললাম, 'ও জানে। আজ চলি।' কোনো রকমে নমস্কারের একটা ভঙ্গি করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পিছন থেকে দিদির স্বর শুনতে পেলাম, 'নিতাই, ভদ্রলোককে দরজা খুলে দিয়ে আয়।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আমি স্বস্থ বোধ করলাম। সমস্ত পরিবেশটা অত্যন্ত ইতর আর শ্বাসরুদ্ধকারী বলে মনে হচ্ছিল। মল্লিকার জন্য প্রয়োজন না হলে, জীবনে আমি এখানে আর আসতে চাই না। বড় রাস্তায় এসে আমার অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। অনুমান করলাম, জিতেন মিত্তির লোকটা যদি দলপতি হয়, দিদিটি তবে দলপত্নী।

আমার মনে বিমর্ষতা আরো গভীরভাবে নেমে এলো।

পরের দিন অফিসে বেরোবার মুখে ব্রহ্মচারিদের বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তার নীরব হাসি আর দৃষ্টি দেখেই অনুমান করলাম, গত রাত্রের কথা হয়তো কিছু শুনেছে। সকালে অনসূয়া একবার টেলিফোন করেছিল। গতকাল রাত্রে সে-ই আমাকে টেলিফোন করেছিল। ও জানতে চেয়েছিল, আজ বিকালে দেখা হবে কী না। আমি স্থির করে কিছু বলতে পারি নি, অফিসে টেলিফোন করেছি। সকালে আরো কয়েকটা টেলিফোন পেয়েছি, আজ সকালে কাগজে প্রকাশিত লেখাটির জন্য। তার মধ্যে পুলিসের কর্তা মিঃ মুখার্জী এবং মিঃ বাগচির টেলিফোনও ছিল।

অফিসে চিফ্ আমাকে একবার অ্যাসেম্বলিতে যেতে বললেন। আইন সভার বিশেষ অধিবেশন ছিল। সেখানে গিয়েও আমি কার্যত বিশেষ কিছু করতে পারলাম না। অবিশ্যি সবটাই রুটিন মাফিক কাজ, বিশেষ কিছু করারও নেই। দুপুরেই আমি অফিসে ফিরে এলাম, আর যতোই বেলা পড়ে আসতে লাগলো, ততোই আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। আমি চিফ্‌কে জানিয়ে, ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে দু'শো টাকা অ্যাডভ্যান্স নিলাম। আমি বুঝতে পারছি, আমার ভিতরে একটা প্রস্তুতি পর্ব চলছে।

বেলা তিনটে নাগাদ চিফ্ আমাকে ডেকে বললেন, 'অমল, তোমার টেলিফোন।' তাঁর মুখের হাসি দেখে বুঝলাম অনসূয়ার ডাক এসেছে। আমি রিসিভার নিয়ে 'হ্যালো' করতেই, ওপার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেয়ের স্বর শুনতে পেলাম, 'অমলবাবুকে

boiRboi.net

একবার দিন তো।'

আমি অবাক্ হয়ে বললাম, 'বলছি।'

'ওহ, তুমি!' ওপার থেকে শোনা গেল, 'এই, আমাকে চিনতে পারছো। আমি কে বলছি বলো তো?'

মল্লিকা! আমার অবিশ্বাস্য মনে হলো। আমি প্রায় রুদ্ধ স্বরে বললাম, 'মল্লিকা নাকি?'

টেলিফোনে ওর হাসি শোনা গেল, বললো, 'যাক্, চিনতে পেরেছো? তুমি কি ভেবেছিলে, আমি তোমাকে টেলিফোন করতে পারি?'

বললাম, 'সত্যি খুব অবাক্ হয়েছি। তোমার শরীর কেমন?'

'খুব ভালো।' ওর স্বর বেশ খুশী, 'কাল রাত্রেই শরীর ঠিক হয়ে গেছে। এই শোন, আজ কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

আশাতীত ব্যাপার মনে হচ্ছে। বললাম, 'তা হতে পারে। কোথায়?'

'তোমার বাড়িতে।' ও বললো, 'ওখানেই আমার সব থেকে ভালো লাগে। আজ আমি তোমার ওখানে চান করবো, মাইরি বলছি। মাথার ওপরে ঝর্ণাটা খুলে দিয়ে চান করবো, আর ওখানেই চুল শুকোব। আমি যদি রাত্রে থেকেই যাই, কী হবে? তুমি থাকতে দেবে না?'

আমি রীতিমতো অবাক্ হচ্ছি। মনে হচ্ছে, এ এক অন্য মেয়ে কথা বলছে। গত দু'দিনের সেই মেয়ে না। আমি কি মনে মনে খুশী হয়ে উঠছি? উঠছি, কিন্তু একটু যেন কোথায় খটকা লাগছে।

বললাম, 'কেন দেবো না? তোমার যা ইচ্ছে, তাই হবে। কিন্তু তুমি কি চিনে আসতে পারবে?'

'খুব পারবো।' ও বললো, 'ঠিক তোমার দরজায় গিয়ে হাজির হবো। এই ধরো সাতটা নাগাদ, হ্যাঁ?'

বললাম, 'ঠিক আছে।'

'তাহলে ছাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

ও ওপার থেকে লাইন কেটে দিল। আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। চিফ্ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথা হলো? আচ্ছা শোন, পতিতা সিরিজের লেখা কি আর একটা লিখবে তো? ফর কংকুলুশন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, লিখতে হবে।'

আমি ছ'টার আগেই বাড়ি ফিরলাম। আজও আমাকে অনসূয়াকে মিথ্যা কথা বলতে হলো। ওর মনে একটা সন্দেহও জেগেছে, আমি মিথ্যা কথা বলছি। চা খেয়ে, চান করে বেরোবার একটু পরেই মল্লিকা এলো। ও আজ সেই প্রথম দিনের পোশাক পরে এসেছে। জামাটা কলার-বিহীন, নীল রঙের। কিন্তু ও এলো ভিন্ন মূর্তি নিয়ে। ওর টেলিফোনের কথায় যেমন খুশী আর উচ্ছ্বাস ফুটেছিল, সেই তুলনায় ওকে দেখালো ক্লান্ত। মুখে বিরক্তির ভাব। এসেই সোফার ওপর এলিয়ে বসে পড়লো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

ও ব্যস্ততার ভান করে বললো, 'না, না, মাথাটা কেমন টিপটিপ করছে। চান করলেই সেরে যাবে। আমার কাছে এসে বসো।'

আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও আমার গায়ের কাছে নিবিড় হয়ে বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে বোধ হয় খারাপ ব্যবহার করছি, না ?'

'হঠাৎ এ কথা কেন ?'

'এমনি বলছি। তুমি আমাকে এত পছন্দ করো, করো তো ? আর আমি তোমাকে একটু ভালোবাসতেও পারি না।'

ও কথাগুলো বলছে, কিন্তু তার মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। যেন বলতে হয়, তাই বলছে। ও আবার বললো, 'আমি রোজ এলে তুমি খুশী হও ? তাহলে তাই আসবো। যদি সারাদিন থাকতে বলো, সারা রাত, তাই থাকবো, কেমন ? তুমি যদি বলো, তোমার ঘরের টুকিটাকি কাজও করে দিতে পারি। আমি তোমাকে একদিন রেঁধে খাওয়াবো, অ্যাঁ ?' বলে, আমার গালে আলতো করে একটি চুমো খেল।

আমি ওর কথার পারম্পর্য পূর্বাপর সমতা পাচ্ছি না। মনে মনে খুবই অবাক্ হচ্ছি, কিন্তু ওকে এখন তা বলতে পারছি না। বললাম, 'তোমার যা ইচ্ছা হবে, তাই করবে।'

'অবিশ্যি মাঝে মাঝে আমি দিদির বাড়ি যাবো, সেখানে না গেলে পারবো না।' ও বললো, 'কিন্তু আমার জন্য তোমার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। বলতে গেলে, আমার সব খরচাই, তাই না ?'

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই, দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। আমি উঠে দরজা খুলে দিতেই, আমার কয়েকজন কবি বন্ধু হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। তারা সকলেই কিছু কিঞ্চিৎ মাতাল। একজন ঢুকতে ঢুকতেই বললো, 'শালা, আজকাল তুমি মস্ত পতিতা বিশারদ হয়ে গেছ, না ? খুব লিখে চলেছ। আজকাল কি বেশ্যাবাড়িতেই পড়ে থাকো নাকি ? কোনো খবর-টবর নেই কেন, অ্যাঁ ?'

বাকীরা মল্লিকাকে দেখে একটু থমকিয়ে গেল। মল্লিকা খানিকটা নির্বিকার চোখেই সকলের দিকে দেখছিল। আমি সবাইকে বসতে বললাম, বললাম, 'এর নাম মল্লিকা।'

মল্লিকা বেশ ভালোভাবেই কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এখন ব্যস্ত আছো নাকি ? আমরা তো ভাবছিলাম, তোমার এখানে আজ একটু খানাপিনা করবো।'

আমি মিথ্যা কথা বললাম, 'কিন্তু আমাকে এখনই একটু বেরোতে হবে—মানে, একটা বিশেষ কাজে।'

সবাই একবার আমার আর মল্লিকার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। একজন তার মধ্যেই পকেট থেকে পিণ্ট সাইজের মদের বোতল বের করে মল্লিকাকে বললো, 'আমরা একটু খেলে আপনার আপত্তি নেই তো ? ও আমাদের খুবই বন্ধু কী না।'

'আপনাদের কথা আপনারাই জানেন।' মল্লিকা বললো, 'আমি তার কী জানি।'

আমি এবার একটু গম্ভীরভাবে বললাম, 'বলছি তো আজ একটু অসুবিধা আছে। অন্য দিন হবে।'

boiRboi.net

ওরাও গম্ভীর মুখে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, আজই আমার নামে অনেক কিছু রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কিন্তু আমি নিরুপায়। মল্লিকা বললো, 'আমি মাইরি খুব ঘাবড়ে গেছলাম। তোমার বন্ধুরা দেখছি, সবাই মাতাল। আর তুমি একেবারে খোকন সোনা।' বলে ও হেসে উঠলো।

আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ও জিজ্ঞেস করলো, 'এরা কারা, কী করে?'

'এরা সবাই বেশ নামকরা কবি।'

'কবি? কবিতা লেখে এরা? তুমিও আমাকে বোকা বোঝাচ্ছ?' ও আবার হেসে উঠলো।

অন্তত এ বিষয়ে ওকে আমার কিছু বোঝাবার নেই। বললাম, 'তুমি কি চান করবে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পায়জামা দিতে হবে।'

ও চান করতে গেল। বেরিয়ে এলো পায়জামা আর হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে। ফ্যানের নিচে বসে, তোয়ালে দিয়ে চুল মুছে মুছে শুকিয়ে নিল অনেকটা। তারপর 'মাল' খেতে চাইলো। পরিণত হলো গত রাত্রের মতোই।

ও রীতিমতো বেহুঁশ মাতাল হয়ে পড়লো, আর বারে বারেই বলতে লাগলো, 'আমি কি একটা কুত্তি? তুমি শালা আমাকে দিয়ে যা খুশী তাই করাবে?'

এসব কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না। ওকে শুইয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় রইলো না। ও একটা মৃতদেহের মতো পড়ে রইলো।

পরের দিন ভোরবেলাই ও চলে গেল। যাবার সময় টাকা নিয়ে গেল। কিন্তু বিকেলে অফিসে টেলিফোন করে আবার এলো। পর পর কয়েকদিন এরকম চলতে লাগলো। ও আমাকে ভালোবাসার চেষ্টা করলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই ছলনায় পর্যবসিত হতে লাগলো। আমাকে ভালোবাসতে চেষ্টা করাটা যেন ওর কাছে একটা সৈনিকের যুদ্ধজয়ের মতো হয়ে উঠলো, আর বারে বারেই বিফল হতে লাগলো।

আমার দেশের বাড়ি যাওয়া হয় নি। মাইনে পেয়েও, আমাকে মায়ের কাছ থেকে গোপনে টাকা চেয়ে পাঠাতে হলো।

আস্তে আস্তে দেখা গেল, মল্লিকা ক্রমেই যেন আমার ওপর আক্রোশে ফুলতে লাগলো। যা মুখে এলো, তা-ই বলে আমাকে গালাগালি দিতে লাগলো। একদিন প্রায় নগ্ন হয়ে ওর সারা গা আমাকে দেখালো, প্রচণ্ড প্রহারের দাগ। বললো, 'এ সবই তোমার জন্য। তোমাকে আমি পৃথিবীতে সব থেকে বেশী ঘেন্না করি। তোমাকে আর তোমার টাকাকে।'

অবিশ্যি এ সবই ও বলে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। একদিন বললো, 'আমি ভালোবেসেও কিছু পেলাম না। ওই বাঘটা আমার রক্ত চুষছে, আর বাঘিনীটাও তাই চেটে চেটে খাচ্ছে।'

আমি আমার স্বাস্থ্য, কাজের উদ্যোগ, উৎসাহ সবই হারাতে লাগলাম। মল্লিকা ক্রমে আমার গলার ফাঁসের মতো এঁটে বসতে লাগলো। অথচ ওকে প্রাণ ধরে ত্যাগও করতে পারছি না। কলকাতায় আমার পরিচিত মহলে ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে।

BoiRboi.net

মায়ের একটি চিঠিতে মনে হলো, সেখানেও কিছু সংবাদ গিয়েছে। আমার বন্ধু বান্ধবীরা সকলেই, আমাকে প্রায় ত্যাগ করেছে।

প্রায় দু মাস কেটে যাবার পরে, মল্লিকার আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমি বুঝতে পারছিলাম, মল্লিকার ভালোবাসা প্রেম, যা কিছু সবই একজনের জন্য। সে হলো জিতেন মিত্তির। ওর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অনেক কথা থেকেই আমি তা বুঝেছি। কিন্তু জিতেন মিত্তিরের কাছে, ও কেবল টাকা রোজগার করে আনার একটা যন্ত্র। সার্কাসের বাঘের মতোই, ও কেবল খেলা দেখিয়েছে, আদৌ ও প্রাণের কোনো খেলাই খেলে নি। জিতেন মিত্তির ওকে প্রহার করে, লাঞ্ছিত করে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আর ও পুঞ্জীভূত ঘৃণা নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছে। ফিরে গিয়ে জিতেনের হাতে টাকা দিলেই, জিতেন ওকে আদর করেছে। সেই আদরই ওর পরম পাওয়া, ওর স্বর্গ।

মল্লিকার কথা থেকে বুঝেছি, ওর তেরো বছর বয়সে, জিতেন লোকটি ওর প্রথম পুরুষ। জিতেন হয়তো একদা ওকে নানাভাবে ভুলিয়ে, ওকে আয়ত্তে এনেছিল, তারপরে এই পথে ঠেলে দিয়েছে। তার আসল প্রেম, সেই দিদিটি।

মল্লিকা বেশ্যাবৃত্তি করে, অনেক লোকের অঙ্কশায়িনী হয়, আসলে ওর ধ্যান জ্ঞান সবই জিতেন মিত্তির। ওকে বুঝতে পারছিলাম বলেই, ওকে আমার গলার ফাঁস বলে মনে হচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা আর ঈর্ষায় আমি পুড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার জীবনের সব থেকে দুঃসহ সত্য হলো, আমি মল্লিকাকেই ভালোবেসে মরেছি। সেইজন্য ও যতো দিন আমাকে নিজের থেকে ত্যাগ করে যায় নি আমি ওকে চলে যেতে বলতে পারি নি। প্রায় সাত দিন ও আসে নি। আর আসবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু আমার বিশ্বাস সত্যি হলো না। দশ দিন পরে, সকালবেলা অফিসে বেরোবার আগেই, মল্লিকা এলো। মল্লিকা এলো বলা চলে না, ওকে নিয়ে এলো জিতেন মিত্তির।

দেখলাম, মল্লিকা আগের তুলনায় একটু কৃশ, আর ফ্যাকাসে। কিন্তু ওকে দেখাচ্ছে শান্ত আর শ্রীময়ী।

জিতেন মিত্তির বললো, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি নিজেই ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে এলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম 'কেন ?'

'কেন মানে ?' জিতেন বিব্রত হয়ে বললো, 'মানে ও এতোদিন আসে নি কেন জিজ্ঞেস করছেন ? ওর অসুখ করেছিল স্যার, ওকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি জানি স্যার, আপনার থেকে আপন ওর কেউ নেই পৃথিবীতে।'

আমি মল্লিকার দিকে তাকালাম। ও একবার আমার দিকে তাকিয়ে, অন্য দিকে চোখ ফেরালো। ওর দৃষ্টি করুণ। এই মুহূর্তে ওর জন্যই আমার মনটা টনটন করে উঠলো। ওর জীবনের ধন, দয়িত ও দেবতা, তার নিজের মুখে এই সব বলছে, আর ওকে অবিকৃত শান্ত মুখে তাই শুনতে হচ্ছে। কিন্তু জানি, এর প্রতিবাদও নিরর্থক। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা

boiRboi.net

আমার পক্ষে আর সম্ভব না।'

ওরা দুজনেই আমার দিকে অবাক্ চোখে তাকালো। তার মধ্যেই মল্লিকার চোখে যেন করুণ হাসির কিরণ দেখতে পেলাম।

জিতেন মিত্তির অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন স্যার, কেন?'

বললাম, 'সে কথা আপনার শুনে কোনো লাভ নেই।'

'ও কিন্তু স্যার আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।' জিতেন মিত্তির বললো, 'আপনার দয়াতে ওর বেশ ভালোই চলছিল। আপনি ওকে—।'

'আপনি এবার ওকে নিয়ে যেতে পারেন।' আমি একটু কঠিন স্বরে বললাম।

জিতেন মিত্তির চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবলো, তারপরে বললো, 'ঠিক আছে স্যার। ও না হয় একটু পরেই যাবে। ওর যদি কিছু বলার থাকে। আমি যাচ্ছি।' বলেই সে দরজার বাইরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

মল্লিকা আমার দিকে তাকালো। ওর বড় চোখ দুটো অনুসন্ধিৎসু। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'টুক্‌কি, সব কিছুর একটা সীমা আছে, তাই না? ওই লোকটাকে তুমি তোমার প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসো, অথচ সে তোমার সামনেই মিথ্যে মিথ্যে—।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, মল্লিকা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ফিসফিস করে বললো, 'কিন্তু আমি—আমি তো একটা বেশ্যা, কুলটা।'

বললাম, 'তবু তোমার ভালোবাসাটা মিথ্যা না, আমি জানি।'

'উহ্, তুমি কী সুন্দর! কী সুন্দর!' ও আমার একটা হাত টেনে নিয়ে ওর গালে চেপে ধরে ফিসফিস করে বললো, 'কিন্তু আমার ভালোবাসা থাকতে নেই ভালোবাসতে নেই।'

'টুক্‌কি, ভালোবাসা তোমার মনে, এটা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

ও স্নেহ পিপাসায় আমার হাতটা ওর মুখে চেপে ধরলো, আর আমার বুকের কাছে নুয়ে পড়লো। আমার ভিতরটা টলটল করছে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছি। একটা কথাও বলতে পারছি না। কারণ আমার সত্য আমারই, এই মল্লিকার মতো, যা অতি নিষ্ঠুর, আর অনতিক্রমণীয়। জীবনের একটা ক্ষেত্রে ও আর আমি একটা জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। তবু, একবার যদি ওর মতো কাঁদতে পারতাম!

———

boiRboi.net

অলিন্দ

boiRboi.net

boiRboi.net

শুভার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ভাবে, কে তার এমন নাম রেখেছিল। শুভা! ছি ছি! যে মেয়ে এমন একটা প্রকাণ্ড অশুভা, অশুভ যার চারপাশে মৌরসীপাট্টা করে গেড়ে বসে আছে, তার শুভা নামটাই একটা ঠাট্টা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গরাদ হীন জানলাটার ধারে, ঠাণ্ডা দেওয়ালে গাল পেতে, ও বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। জানালা দরজা প্রায় সবই বন্ধ। শুধু এই জানালাটাই শুভা খুলে দিয়েছে। এটা পুবের জানালা, ঠাণ্ডা বাতাস আসে না। সব বন্ধ করে, কেমন যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। খাট, বিছানা, ওয়ারড্রব, আলমারি, ড্রেসিংটেবল, পাশের আর একটা ঘরের শোফাসেট, বইয়ের আলমারি, সেক্রেটারিয়েট টেবল, সবই যেন ওকে গিলতে আসে। আলো জ্বালাতে আরো খারাপ লাগে। তখন যেন নিজের অসহায় অবস্থাটা আরো বেশি করে চোখে পড়তে থাকে। রাত্রি হলেই, যে-উদ্বেগ থার্মোমিটারের পারার মতো ডিগ্রিতে ডিগ্রিতে বাড়তে থাকে, আলো জ্বাললে যেন সেই অসহায় উদ্বিগ্নতা আরো তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

অথচ ঘর অন্ধকার করে দিয়েও থাকতে পারে না। মনে হয়, একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার হাঁ যেন গিলতে আসছে। তখন জানালা খুলে দিয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে থাকলে, তবু যেন একটু স্বস্তি বোধ হয়। তবু যেন মনের অন্ধকার থেকে একটু বেরিয়ে আসা যায়। তবু যেন এ ঘরের পরিবেশ থেকে, নিজেকে একটু অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু এও যেন এক যক্ষপুরীর দেশ। এই দোতলা ঘরের চারপাশে, আটতলা দশতলা ছ'তলা চারতলা বিশাল ইমারতগুলো যেন বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই দোতলা বাড়িটার, পুবের এই জানালার নীচে, অনেকখানি জমি নিয়ে কেমন করে এত বড় একটা গ্যারেজ বজায় রাখা গিয়েছে, শুভা বুঝতে পারে না। নীচের দিকে তাকালেই মস্ত বড় ঢেউ-খেলানো অ্যাসবেসটরের চালটা যেন ওর চোখের সামনে, রৌদ্র-ছায়ার নানা রঙে, পুকুরের মত টলটল করে। এ বাড়ি আর গ্যারেজের মাঝখানে, ডান দিক ঘেঁষে একটা জামগাছও রয়েছে। সেখানে পাখীদের জটলা হয়। গ্যারেজের চালে, ভোরবেলাতেই কাকেরা ভিড় করে। এ বছরের মরসুমে, জামগাছে, জাম হতেও দেখেছে শুভা। কেউ-ই প্রায় খায় না। অ্যাসবেসটরের সাদা চালে, পাকা জাম পড়ে পড়ে, জাম রঙের ছোপ লেগে যায়। কোন কোন দিন হয়তো দেখা গিয়েছে, গ্যারেজের কোন ছোকরা ক্লিনার বা মেরামতী মিস্তিরি বা ড্রাইভার চালে উঠে জাম পাড়ছে। তাও, গ্যারেজের দরোয়ানকে লুকিয়ে চুরিয়ে। তার চোখে পড়লেই চিৎকার করে গাল দেয়।

এখানে আর কারাই বা জাম খাবে! চারপাশে যারা আছে, তারা বোধহয় কেউ জাম খায় না। তারা হয়তো স্ট্রবেরি বা পীচ বা আঙুর খেতেই ভালবাসে। জামের স্বাদ জানে না। অধিকাংশই তো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পার্শী, বড়লোক

boiRboi.net

মুসলমান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ধনী অবাঙালী এবং বাঙালীরা এই সব আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোতে থাকে। দু-তিন ফুটের একটা পরিত্যক্ত জমির ফালিতে, কোথায় একটা জামগাছ আছে, এখানকার অধিবাসীদের চোখেও পড়ে না বোধহয়। পাশেই নিউ মার্কেট। সেখানে মরসুমের সময় ধুয়ে মুছে রঙীন ডালিতে জাম রাখা হয়, তাই হয়তো চোখে পড়ে। ইচ্ছে হলে কেনে।

জানালা দিয়ে, আশেপাশে, কতরকমের পরিবার, দম্পতী, মেয়ে পুরুষ শিশুদের যে দেখতে পায় শুভা। মনে হয়, শুধু ভারতবর্ষ না, গোটা পৃথিবীর সব রকমের মানুষ এখানে আছে। রুশ, আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, সব রকম। এ পাড়াটাই তো সেইরকম। তবে, একটা কথা খালি মনে হয়, জামা কাপড় শাড়ি ফ্রক যা কিছুরই তফাত থাক, যাদের যেমনই খাবার হোক, তবু যেন সব মিলিয়ে, এরা সব এক রকম। এদের দেখলেই মনে হয়, এরা এক আলাদা জগতের মানুষ। এরা পাশাপাশি থাকে, কথাবার্তা তেমন বলে না, পাশাপাশি মেলামেশা নেই, তবু এরা যেন একই গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন পরিবার।

কেবল একটা বাড়িকেই, আগে আগে খুব রহস্যময় মনে হত। পশ্চিমের জানালা খুললে, চারতলা প্রকাণ্ড বাড়িটার পিছন দিক দেখা যায়। শুভা শুনেছিল, ওটা একটা হোটেল। এখন জানতে পেরেছে, ওটা হোটেলের নামে চলে বটে, আসলে লুকিয়ে মেয়েদের দেহের ব্যবসা-বাড়ি। বে-আইনী ব্যবসা, শহরের এমন জায়গায়, এতবড় বাড়িতে, দিনে রাত্রে চলে, অথচ পুলিস নাকি কিছুই জানে না। ভাবলে, শুভার মত মেয়েরও, ঠোঁট বেঁকে যায়। সত্যিই তো, অপরাধীরা লুকিয়ে পাপ করে। পুলিস কেমন করেই বা জানবে। এই সব অপরাধীরা তো দিনের বেলা মিছিল করে অপরাধ করে না। পুলিস এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেমন করে!

প্রথম প্রথম শুভা দেখত, বাড়িটার যে-কোন জানালাই যখন খোলে, সব জানালাতেই আলাদা আলাদা মেয়ের মুখ। আবার, কয়েকদিন যাকে দেখা গেল এক জানালায়, কয়েকদিন পরে, আবার অন্য মেয়ের মুখ সেখানে। হয়তো, শ্যামাঙ্গিনীর জায়গায়, এক গৌরাঙ্গী ফুক্ ফুক্ করে সিগারেট খাচ্ছে। আর শ্যামাঙ্গিনীকে দেখা গেল, অন্য জানালায়, গেলাসে করে কী যেন চুমুক দিচ্ছে। প্রথমে অবাক কৌতূহল, তারপরে চমক। দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রে, আলাদা আলাদা পুরুষের চেহারা হঠাৎ দেখা যেত। জানালাগুলো অধিকাংশ সময় তো বন্ধই থাকে। হঠাৎ হঠাৎ খুলে যায়, আর হঠাৎ হঠাৎই ওরকম দেখা যায়। তারপর আরো কিছু চোখে পড়তে আরম্ভ করেছিল। মেয়ে পুরুষের নানান আচরণ। শরীরের নগ্নতা, আচরণের নগ্নতা চোখে পড়েছিল।

প্রথম দিনটা ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল, যখন দেখেছিল, উলঙ্গ মেয়ে পুরুষ, রাস্তার কুকুরের মত খেলা করছে। মুহূর্তের জন্যেই। মুহূর্তের জন্যেই হয়তো তাদের খেলার আবেশে, জানালা খোলা ছিল। তারপরই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তারপরেও যেটুকু বুঝতে অসুবিধে ছিল, সেটুকুও বুঝিয়ে দিয়েছিল একদিন এক শক্ত হাত। শুভার ঘাড় চেপে ধরে, পশ্চিমের জানালাটার কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

জানালাটা খুলে, চারতলা বাড়িটার দিকে দেখিয়ে বলেছিল, 'বেশি তেড়িবেড়ি করলে, ওই বাড়িটায় ঢুকিয়ে দিয়ে আসব। সতীর যত সতীত্বপনা, বিলকুল ওখানে মিলে যাবে। সতীর বিচার যারা করে, কাজীরা সব ওই বাড়িতে আছে। ছেনালি!'

তারপরে আর কিছু বোঝবার ছিল না। কিন্তু তারপরে, পশ্চিমের জানালা খুলে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িটা যতবার চোখে পড়েছে, শুভার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠেছে। সেই কেমন করাটা কেবল ভয় না। কল্পনায় যেন ও বাড়ির খোপে খোপে মেয়েদের সে দেখতে পায়। কল্পনায় নিজেকেও যেন সেখানে দেখতে পায়। আর তৎক্ষণাৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে, শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

শুভা পশ্চিমের জানালাটা খুলতে এখন ভুলেই গিয়েছে। তাছাড়া, এই শীতের সময়ে তো খোলবার কোন দরকারও নেই।

শীতের রাত্রি। চারিপাশেই নিঝুম। মাঝে মাঝে গ্যারেজে এসে গাড়ি ঢুকছে। তাও শব্দ শোনা যাচ্ছে। চারপাশের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর শত শত জানালা। যেন শত শত আলো-ঝলসানো চোখ। বাতি জ্বালানো ব্যালকনিগুলো যেন ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের শূন্যে দোলানো দোলনা। কোন কোন বিল্ডিংয়ের এলিভেটর-এর ওঠা-নামা কাঁচের শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু নিঝুমতা যতই ঘনিয়ে আসে, জানালাগুলো ততই অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে, ব্যালকনির দোলনাগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। ঘরে ঘরে বাতি নিভতে থাকে, তাই সবই অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। যেন যক্ষপুরীর ঘরে ঘরে ঘুম নেমে এসে, বাতি নিভিয়ে দিতে থাকে। বন্ধ কাঁচের ঝিকিমিকিও চোখে পড়ে না। কেবল সিঁড়ি বা বারান্দার দু'-একটা আলো জ্বলতে থাকে। বিশাল ইমারতগুলোকে এখন মনে হয়, ঋজু বাঁকা বা বৃত্তের নানা আকারে, অতিকায় জীবগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

চারপাশের আলো যত নিভে যায়, আকাশের তারাগুলো যেন ততই জেগে ওঠে। নক্ষত্রেরা যেন অনেক নীচে নেমে আসে, উঁচু বাড়িগুলোর ছাদের কাছাকাছি। শহরের আলো যতক্ষণ জ্বলে, ততক্ষণ নক্ষত্র কাছে আসে না। চারপাশে যতই নিঝুমতা নেমে আসে, গ্যারেজে গাড়ি আসার শব্দও ততই কমে আসে। আর শুভার বুকের মধ্যেও উদ্বেগ থরথরানি বাড়তে থাকে।

বাইরের অন্ধকার যত বাড়ে, শব্দ যত কমে, ততই যেন এক ভয়ঙ্কর পায়ের শব্দ দূর থেকে ওর কানে এসে বাজতে থাকে। বুকের মধ্যে বিঁধতে থাকে, একটা উৎকণ্ঠা ভয় আর যন্ত্রণা পাক দিয়ে উঠতে থাকে। জানালার ধারে দেওয়ালের গায়ে, আরো চেপে ধরে নিজেকে। যেন আড়াল করতে চায়। শরীরটা রক্তশূন্য মনে হতে থাকে। নিশ্বাস ঘন হয়ে আসে, যেন হাঁফ লাগে।···

হঠাৎ আটতলা বাড়িটার, কয়েকটা জানালায় আলো ফুটে উঠতে থাকে। দু'-একটা গলার উঁচু স্বর শোনা যায়। হয়তো কিছু একটা ঘটেছে। কেন না, গলার স্বর ক্রমেই বাড়তে থাকে। শুভা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। প্রথমেই ওর মনে

অশুভ চিন্তা জাগে। কেউ কি মারা গেল। না কি, বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আলোগুলো জ্বলে ওঠা আর গলার স্বরের ডাকাডাকিগুলো শুনলে, একটা অশুভ ঘটনার মতই মনে হয়।

ভাবতে ভাবতেই, শুভা চমকে আটতলা বাড়িটার ছাদের দিকে তাকাল। ও কি সত্যিই দেখতে পাচ্ছে, আলসেহীন ছাদের ওপর দিয়ে, একটা মানুষের মূর্তি এক দিক থেকে, আর এক দিকে ছুটে যাচ্ছে! তাহলে কি চোর নাকি! লোকটা ওখানে উঠল কী করে। কে লোকটা। বাড়িরই লোক, নাকি বাইরের লোক। বাইরের অচেনা লোক দরোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকবে কেমন করে। ঢুকলেও, সিঁড়ি বেয়ে, দরজা খুলে ছাদে উঠবে কোন সাহসে!

ইতিমধ্যে চারপাশের গোলমাল আরো বেড়ে উঠতে থাকে। জানালায় জানালায় নানা মুখের উঁকি-ঝুঁকি। এ জানালা থেকে, ও জানালায় নানান জিজ্ঞাসাবাদ, 'কোন্ দিকে গেল? পালিয়েছে? নীচে নেমে যায় নি তো! ছাদে গেছে বোধ হয়।'···

নানান জনের নানান কথা। নানা দিকে ছুটোছুটি। দশতলা ছ'তলা গুলোতেও আলো জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। চারদিক থেকে শত শত চোখের মত জানালাগুলোতে আলো জ্বলে উঠছে। আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

অন্ধকার ঘর থেকে, শুভাই একমাত্র পলাতককে দেখতে পাচ্ছে। মূর্তির ভাব-ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, সে-ই পলাতক। তার পিছনেই লোক ছুটছে। কিন্তু কোন্ সাহসে লোকটা ছাদে উঠেছে। এইবারই তো সবাই ওকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু শুভার বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে গেল। দুই চোখে ওর আতঙ্ক। আটতলা বাড়িটার দুটো অংশ, দুটো ব্লক। মাঝখানে দশ-বারো ফুটের মত ফাঁক। দুই অংশেরই ছাদে, বড় বড় জলের ট্যাঙ্ক। একটা দুই ইঞ্চি ডায়ামেটারের পাইপ, ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে আর এক ছাদের ট্যাঙ্কে জোড়া লাগানো। শুভা দেখল, লোকটা সেই পাইপ ধরে ঝুলে পড়েছে। প্রাণে বাঁচবার চেয়ে, ধরা পড়ার ভয় কি এত বেশি? লোকটা তো পড়ল বলে! শুভা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মসৃণ পাইপটা, লোকটার ভারে ডোঙা হয়ে পড়ছে, বেশ জোরে জোরে দুলছে। কিন্তু লোকটা থামছে না।

ইতিমধ্যে কয়েকটা টর্চের আলো লোকটার গায়ে পড়ল। ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর নীচে, ওপরে, জানালায় জানালায় চিৎকার শোনা গেল, 'ওই যে, পাইপ বেয়ে যাচ্ছে। অন্য ব্লকে চলে যাচ্ছে।'

কয়েকটা টর্চের আলো, লোকটাকে যেন সঙ্গীনের মত বিঁধে আছে। সেই আলোতেই শুভা দেখতে পেল, কয়েকটা ঢিল এবং জুতো নীচের থেকে কারা ছুঁড়ছে। তার মধ্যে একটা মাত্র ঢিলই লোকটার প্যান্ট-পরা হাঁটুর কাছে স্পর্শ করল।

কিন্তু লোকটা না থেমে, একটু একটু করে এগিয়েই চলেছে। পাইপের মাঝামাঝি যখন এসেছে, তখন পাইপটাকে প্রায় ধনুকের মত বাঁকা দেখালো। আর লোকটা হঠাৎ যেন থেমে গেল। শুভা নিশ্বাস বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত টিপে

রইল। নিশ্চয়ই লোকটা আর ঝুলে থাকতে পারছে না। হাত নিশ্চয়ই ঘেমে ভিজে উঠেছে। শরীরের ভার আর ধরে রাখতে পারছে না। পড়বার পর, ওকে আর কারুর মারবার দরকার হবে না। আটতলা উঁচু থেকে পড়ে, এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে।

পড়ে যাবার দৃশ্যটা সহ্য হবে না বলে, শুভা জানালার পাশ থেকে সরে আসতে গেল। আর লোকটা তখনই, বন্ধ মেশিন চালু হয়ে যাওয়ার মত, আবার চলতে আরম্ভ করল। শুভা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি লোকটার এত জোর! না কি মরার ভয়েতেই, এরকম শক্তি পাচ্ছে। কোথায় চুরি করতে এসেছিল লোকটা! এমন কী চুরি করতে এসেছিল, যে জন্যে এমন ভয়াবহ বিপদে পড়তেও ভয় পায় নি।

ইতিমধ্যে, যে ব্লকের দিকে লোকটা চলেছে, সেই ব্লকের ফ্ল্যাটগুলোর জানালায় জানালায় আলো জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। পালাবার কোন উপায় নেই। লোকটা কি তা বুঝতে পারছে না। যদি বুঝতে পেরে থাকে, তবে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে জীবন-সংশয় করে, পাইপ বেয়ে পালাতে গেল কেন।

লোকটার জন্যে, শুভার উদ্বেগের কোন কারণই থাকতে পারে না। একটা চোরের জন্য, কারুর কোন উদ্বেগ হয় না। কিন্তু, নিজে সে একলা একলা ব্যাপারটা দেখছে। লোকটাও একলা একলা এভাবে পালাবার চেষ্টা করছে। সেই জন্যেই বোধহয়, এরকম একটা উদ্বেগে ওর বুকের মধ্যে ধ্বক ধ্বক করছে। সকলের সঙ্গে থেকে, হৈ-চৈ করলে এরকম হয়তো মনে হত না। তাছাড়া, লোকটা এমন একটা দুরত্বে, ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে রয়েছে, তাতে চোরের ভয়টাও ঠিক হচ্ছে না। বরং লোকটা হয় মরবে, না হয় ধরা পড়বেই, একথা ভেবে কেমন যেন বেচারী বেচারীই মনে হচ্ছে। সব চোরের যা হয়, এরও তাই হবে।

এ ধরনের চোরেরা যে কেমন হয়, শুভা জানে না। চোরেদের সম্পর্কে তার একটা সাধারণ ভীতি আছে। যেটা, অধিকাংশ মেয়েদেরই বা মানুষদেরই থাকে। এখন যে-ভয়টা ঠিক লাগছে না।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা যে সত্যি অন্য ব্লকের ছাদে গিয়ে পেঁছিল! ইতিমধ্যে, যে ব্লকের ছাদ থেকে লোকটা পাইপে ঝুলে পড়েছিল, সেই ছাদে কয়েকজন লোক এসে পড়েছে। তাদের এক জনের হাতে টর্চ। টর্চের আলো পড়ল লোকটার গায়ে। লোকটা অন্য ব্লকের ছাদে পেঁছেই, জলের ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, শুভা দেখতে পেল না।

যেখানেই যাক, এবার লোকটা ধরা পড়বেই। নিশ্চয় অমন উঁচু ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। আর সিঁড়ি দিয়ে, এতক্ষণে, অবধারিত ভাবে, লোকজন ছাদে উঠে আসছে। অথচ পাশের ছাদ থেকে যারা টর্চের আলো ফেলছে, তারা যেন কেমন দিশেহারা। টর্চের আলো যেন বিভ্রান্তের মত, চারদিকে হাতড়ে ফিরছে। কে একজন চিৎকার করে উঠল, 'শিগগির পাশের ছাদে উঠে পড়। কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। চোর ব্যাটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।'

সেই চীৎকার শেষ হবার আগেই, পাশের ব্লকের ছাদেও কয়েক জনের মূর্তি ভেসে

boiRboi.net

উঠল। তাদের কাছেও দুটো টর্চ লাইট। তারা ছুটোছুটি করে, চারপাশে আলো ফেলে দেখছে। জলের ট্যাঙ্কের আশেপাশে, তলায়, সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। কিন্তু পাচ্ছে না।

অন্য ছাদ থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'পাওয়া যাচ্ছে না ?'

পাশের ছাদ থেকে জবাব গেল, 'না, কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'

'ভাল করে দেখ, নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। ভূত তো না, এভাবে হাওয়া হয়ে যেতে পারে না।'

অন্ধকার একলা ঘরে, গরাদহীন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, শুভাও অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য, কোথায় পালাতে পারে লোকটা! বোধহয়, এক বা দেড় মিনিট সময় পেয়েছে লোকটা। এইটুকু সময়ের মধ্যে, পাইপ বেয়ে ছাদে নেমেই, কোথায় অদৃশ্য হতে পারে!

একজনের গলা শোনা গেল, 'পাইপ বেয়ে ঠিক এ ছাদেই এসেছিল তো ?'

অন্য ছাদ থেকে জবাব এল, 'নিশ্চয়ই। সবাই দেখেছে ওকে পাইপ বেয়ে যেতে। ওই হুদা ম্যানসনটার দিকে দেখেছ ?'

'দেখেছি।'

'নরম্যান কোর্টের দিকে ?'

'তাও দেখেছি।'

'তবে ওই বাজপেয়ী বিল্ডিংয়ের দিকে দেখ।'

'ওদিকে তো আগেই দেখেছি।'

হঠাৎ সবাই যেন কী রকম চুপচাপ হয়ে যায়। অন্যান্য মেয়ে-পুরুষদের গলা শোনা যায় জানালায় জানালায়, ব্যালকনি, বারান্দায়। কয়েকবার পুলিসের হুইশলও বেজে উঠেছে। নীচের রাস্তায় হয়তো পুলিসের গাড়িও এতক্ষণে এসে গিয়েছে।

শুভা অবাক হয়ে ভাবে, কোথায় যেতে পারে লোকটা! সে তো নিজের চোখে দেখেছে লোকটাকে পাইপ বেয়ে নামতে।

আরো খানিকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি চলল। কিন্তু দূরের এই অন্ধকার ঘরের কোণ থেকেই, শুভা বুঝতে পারল, তার সন্ধানীদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। তাদের উৎসাহে ভাঁটা এসে পড়েছে। চোরকে তারা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে, দরজা জানালা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া যেতে লাগল। একটা করে ফ্ল্যাটের আলো নিভে যেতে লাগল। বোঝা গেল, চোরের আশা সবাই আস্তে আস্তে ত্যাগ করছে। যে যার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকছে। একমাত্র, ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দরোয়ান আর পুলিসের সেপাইরাই বোধ হয়, নীচে, রাস্তায়, বাগানে, উঠোনে, সিঁড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরো প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যাবার পর, আবার আগের মতই নিঃশব্দ হয়ে আসতে লাগল সব। ফ্ল্যাটগুলো অধিকাংশই অন্ধকার হয়ে এল। এমন কি, শুভার কানে ঝিঁঝির ডাক পেঁছিল।

শুভার এখন আর সেই উদ্বেগটা নেই। মনে মনে খানিকটা ভয়ই পেল। কী

boiRboi.net

সাংঘাতিক লোক! এমন চোরকে কে ভয় না পায়! কোথায় পালিয়ে গেল লোকটা! ও কি জাদু জানে?

হঠাৎ কোথায় একটা, কিসের শব্দ হল। শুভার বুকটা ধ্বক করে উঠল। সে আবার তার নিজের চিন্তায় ফিরে এল। যে শব্দের জন্যে সে প্রতি রাত্রের নিশীথে, রুদ্ধশ্বাস ভয়ে ও যন্ত্রণায় অপেক্ষা করে থাকে, হয়তো সেই শমন এল। এখনই, প্রচন্ড জোরে, দরজায় আঘাত পড়বে। সেই সঙ্গেই ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর মত্ত গলা তার মন ও শ্রবণকে রক্তাক্ত করে, সেই ভাষায় চিৎকার করে উঠবে। শুভা, অন্ধকারেই, পাশের ঘরের অন্ধকারে তাকাল। দু ঘরের মাঝখানের দরজার পর্দাটা সে সরিয়েই রেখেছে। দরজায় শব্দ হলেই যাতে খুলে দেবার জন্যে আলো জ্বালিয়ে ছুটে যেতে পারে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেও দরজায় কোন আঘাত বাজল না। অথচ, আবার সামান্য একটা শব্দ পেতেই শুভা চমকে জানালার দিকে তাকাল। তাকিয়েই, তার বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে এল। গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে দেখল, জানালার কাছে, নীচের দিক থেকে আস্তে আস্তে একটা মানুষের মাথা যেন উঠে আসছে।

শুভা জানালার ধারে ছিল। চকিতে দেয়ালের আড়ালে সরে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছে। কে লোকটা! কে হতে পারে? চোর! সেই চোরটা নাকি! কী সাংঘাতিক ব্যাপার। জানালায় তো গরাদ নেই, গ্রীল নেই। এ পাড়ার এই এক আপদ, জানালায় গরাদ গ্রীল কিছুই থাকে না, কেবল কাঁচের পাল্লা ছাড়া। মোটা পর্দা সব সময়ের জন্যেই ঢাকা থাকে। রাত্রের এই অন্ধকার নিরালায়, শুভা পর্দাটা সরিয়ে দেয় রোজ। দিয়ে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, চারপাশের দৃশ্য দেখে। আজও যেমন দেখছিল।

কিন্তু এমন ভয়ংকর অভাবিত ঘটনা সে কল্পনাও করতে পারে নি। দেয়ালের আড়ালে সরে গেলেও, আবছায়াতে ও পরিষ্কার বুঝতে পারে, একটা মানুষ জানালায় উঠে এসেছে। চারদিক নিঝুম, স্তব্ধ। বাইরে চোরের পিছনে ছোটা মানুষদের গোলমালও আর নেই। শুভা চিৎকার করে ডাকলে যে কেউ শুনতে পাবে, তাও মনে হয় না। ওর কেবলই মনে হতে লাগল, এ কি সে চোরটাই নাকি! একটু আগেই যাকে আটতলা বাড়ির ছাদে দেখা গিয়েছিল, ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সে-ই কি এখন এ ঘরে চুরি করতে ঢুকছে!

জানালার কাছে হঠাৎ জোনাকীর মত একটা ক্ষীণ আলো চকিতে জ্বলল, চকিতে নিভল। পর পর কয়েকবারই জ্বলল, নিভল। একটা বিন্দুর মত আলোর ইশারা, ঘরের মধ্যে যতটা সম্ভব, আশেপাশে ঘুরে গেল। শুভা সরতে সরতে, দেয়ালের শেষে, একটা আলমারির পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। ও নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতে চাইছে, পারছে না। এতক্ষণ ভয়েই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এখন ভয়েই যেন, ঘন ঘন নিশ্বাস, স-শব্দে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোরের কাছে, চুরি করে, নিজেকে লুকিয়ে রাখাটাই এখন ওর কাছে সব থেকে নিরাপদ উপায় বলে মনে হচ্ছে।

জানালাটা একটু উঁচুতে, প্রায় শুভার বুকের কাছাকাছি। একটুও শব্দ না করে, জানালা থেকে একটি মূর্তি নেমে এল ঘরে। শুভার মনে হল, লোকটার পরনে

boiRboi.net

একটা প্যান্ট, গায়ে কালো রঙের একটা জামা। সেটা শার্ট বা পুরো-হাতা সোয়েটার, বোঝা যায় না। মূর্তি ঘরে নামতেই তার হাতে বিন্দু মত একটা আলো জ্বলে উঠল। অনেকটা যেন সিগারেটের আগুনের মতই, একটু হয়তো বড়। সেই আলোটা ঘরের চারপাশে একবার ঘুরে গেল। আলমারির পাশে, প্রায় শুভার গা ছুঁয়ে গেল। তারপরে, আলোটা পাশের ঘরে যাবার দরজায়, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। পরমুহূর্তেই মূর্তি সেই দরজার দিকে গেল।

শুভা একটু সরে এসে দেখতে চাইল, লোকটা কী করে। এখন শুভা মনে মনে নিশ্চিত হয়েছে, এ সেই পলাতক চোরই। কী ভাবে লোকটা আটতলার ছাদ থেকে নেমে আসতে পেরেছে, ও কল্পনা করতেও পারে না, তবে ওদিক দিয়ে নিশ্চয় পালাবার উপায় ছিল না। লোকজন এবং পুলিশ রাস্তার ওপরে ঘোরাঘুরি করছে। সেই জন্যেই, এদিকে চলে এসেছে। কোনরকমে গ্যারেজের চালে এসে, এ বাড়ির পিছনের সরু গলিতে নেমে, স্যানিটারি পাইপ বেয়ে ওপরে চলে এসেছে। সম্ভবত, এই খোলা জানালাটা লোকটার নজরে পড়েছিল। সরু গলি দিয়ে বেরুতে গেলেও ধরা পড়ে যাবার ভয়। তাই ঘরের ভিতরে কোথাও আশ্রয় নিয়ে, বোধহয় সময় কাটাবার মতলব।

কিন্তু তা-ই কী? চোরের মতলব চুরি করা ছাড়া আর কী থাকতে পারে! কোন এক ফ্ল্যাটের অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নিয়ে, সময় কাটাবার সাহস কোন চোরের থাকতে পারে না। আর পাশের ঘরেই, এদিককার দেওয়াল ঘেঁষে, এ ঘরের যে মালিক তার আয়রন লকার রয়েছে। সেই আয়রন লকারের ওপর শুভার বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা নেই। বরং ঘৃণাই আছে। কিন্তু লকারে যে প্রচুর টাকা থাকে, তা ও জানে। যদি শুভার সামনেই লোকটা লকার খুলে টাকা নিয়ে যায়, তবে সর্বনাশ। তাহলে শুভার নিস্তার নেই। ভয়ঙ্কর শাস্তি এবং অপমান ওর ওপর নেমে আসবে।

শুভা আরো একটু সরে এসে দেখতে চাইল লোকটা কোন দিকে যায়, কী করে। দেখল লোকটার অস্পষ্ট মূর্তি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্ষীণ আলোর বিন্দু চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক জোনাকীর মত বারে বারে নেভে, বারে বারে জ্বলে। লোকটা এবং আলোটা লকারের দিকে গেলেই শুভা আলো জ্বালিয়ে চিৎকার করে উঠবে। তাতে যা হয়, তা-ই হবে। লোকটা যদি তাকে গলা টিপে ধরে মেরেও ফেলে, তাও ভাল। সেটাও একটা মুক্তি। তবু সামনা-সামনি চুপচাপ এ চুরি সে দেখতে পারবে না। কারণ সে-পরিণতি বেঁচে থাকার চেয়েও নিদারুণ।

কিন্তু শুভা দেখল, আলোর বিন্দুটা, বাইরের বন্ধ দরজার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। মূর্তি ক্রমেই সেই দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে আলোর বিন্দুটা পড়ল দরজার মাথ্যর ছিটকিনির ওপর। সেই আলোর বিন্দুতেই, শুভা দেখতে পেল, লোকটা ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে। দরজা খোলার উদ্যোগ করছে। তাহলে, এদিক দিয়ে পালাবারই মতলব।

ঠিক এই মুহূর্তেই, বাইরে থেকে, দরজায় আঘাত পড়ল। আলোর বিন্দু নিভে গেল। চকিতের মধ্যেই, মূর্তি ঘরের মধ্যেই কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওদিকে বাইরে থেকে, দরজার আঘাত, ক্রমাগত প্রচন্ড হয়ে উঠল। এক মুহূর্তও

boiRboi.net

থামবার নাম নেই। সেই সঙ্গেই, মত্ত ক্রুদ্ধ গলা শোনা গেল, 'কী হল কী। এ যে বাবা মালের খোয়ারির থেকেও বেশি দেখছি। নাকি বিষ টিষ গিলে মরে পড়ে আছে। দরজা খোলা হবে, না কী?'

শুভা তবু যেন স্থির করতে পারছে না, ও কী করবে। ও কি আলো জ্বালবে। না কি, অন্ধকারের মধ্যেই গিয়ে দরজাটা খুলে দেবে। কারণ, আলো জ্বলে উঠলে, চোরকে যদি এই মত্ত মাতঙ্গ দেখতে পায়, তাহলেও চোরের পরিচয়ে বিশ্বাস করবে না। জঘন্য নোংরা কোন অপবাদ দিয়ে, অন্য কিছু বলবে।

দরজায় সমানে করাঘাতের পর, পদাঘাত। নেহাত ওপরে আর কোন ফ্ল্যাট বা বাসিন্দা নেই। তাহলে, এতক্ষণ বাইরের বারান্দায় লোকের ভিড় জমে যেত। তারই সঙ্গে, চিৎকার শোনা গেল, 'এই হারামজাদি, দরজা খুলবি, না ভেঙে ফেলব? তাহলে জানবি, তোকেও আমি ভাঙব, আস্ত রাখব না?'

শুভা আর স্থির থাকতে পারে না। সে ঘরের আলো জেবলে দেয়। পাশের ঘরে গিয়ে, দরজার পাশ থেকেই, সুইচ টিপে আলো জ্বালায়। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। তবুও বাইরের দরজার বাঁ পাশে, পুরনো সেকালের একটা খাটো কিন্তু বিরাট, টানা দেরাজের, আলমারিটার দিকে চকিতে একবার ওর চোখ যায়। সহসা যেন, দুটো তীক্ষ্ন চোখের সঙ্গে ওর দৃষ্টি মিলে যায়। তার সঙ্গে আরো একটা কিছু। একটা সরু সুচিবিদ্ধ তীক্ষ্ন চকচকে কিছু।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সেদিকে ফিরে তাকালো না শুভা। ও গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিল। দিতেই ঝড়ের বেগে, একটি মূর্তি ঢুকল। লোকটার বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, যে-কোন একটা অঙ্কের হতে পারে। তার বেশি কম নয়। পাতলা চুল উসকো খুসকো। গলা-বন্ধ কোটের বোতামই শুধু খোলা নয়, ভিতরের সিল্ক পাঞ্জাবীর, পাথর বসানো সোনার বোতামগুলোও খোলা। ফুল কোঁচকানো ধুতি, চটকানো। কোঁচা মাটিতে লুটোচ্ছে। লোকটির কলেবর দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থেই বেশি। রঙ ফরসা। ঠোঁটের কষ বেয়ে, রক্তের মত পানের পিক লেগে আছে। চোখ দুটো যেন আগুনে তাতানো লাল ছুরির মত।

শুভা দরজাটা খুলে দিয়েই সরে আসছিল। তার আগেই ফরসা আংটি পরা মোটা থাবা ওর ঘাড়ের কাছে আঁচলটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। শুভা পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল। লোকটি আর এক হাতে দরজাটা বন্ধ করতে করতেই, কুৎসিত ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'এত তাড়া কিসের, অ্যাঁ? দরজা খুলতে কোন তাড়া নেই, অথচ পালাবার তাড়া। কেন, ভেতরে কোন্ নাগরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে?'

শুভা আঁচলে টান দিয়ে বলল, 'ছাড়ো, বাজে কথা বকো না।'

'বাজে কথা? আমার খালি বাজে কথা, উম্?'

বলেই, আঁচল টেনে, একটা ঝটকা দিল। তাতে, শুভার গোটা গা থেকেই প্রায় আঁচল সরে গেল। লাল জামার ওপরে, বুকের কাছে, ও হাত চাপা দিল। লোকটি আবার বলে উঠল, 'তা এতক্ষণ হচ্ছিল কী? দরজা খুলতে এত দেরি কিসের? কেউ জুটেছে টুটেছে বুঝি? পীরিতের নাগরকে পার করতে সময় লাগছিল?'

boiRboi.net

একদিকে এই আক্রমণ আর অপমান। আর একই সঙ্গে, শুভার মস্তিষ্কের সীমা জুড়ে বেঁটে ঢাউস আলমারিটার পাশে, লুকিয়ে থাকা লোকটা বিঁধে আছে। কিন্তু লোকটার কথা এখন ও বলতে পারছে না। অথচ লোকটা এই ঘটনা দেখছে, ওর এই লাঞ্ছনা আর অপমান, সেটাও ভুলতে পারছে না। তবু বলল, 'তুমি তো দিন রাত্তির ওসবই দেখছ। আমার ঘুম পেয়েছিল, তাই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! তুমি কাপড় ছাড়।'

'এ্যাত্ তো ঘুম!'

'হ্যাঁ, তোমার জন্যে সারা রাত জেগে বসে থাকতে পারি না আমি। কাপড় ছাড়।'

শুভার গলায় ঝাঁজ। কাপড় ধরে টান দিল। কিন্তু ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

'আহা ছাড়ছি ছাড়ছি। জানি, তুই হচ্ছিস্ খাঁটি সতী। কাপড় ধরলেও তোর সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায়। তা, এসব করে আর কতদিন চলবে? আমার কাছে এক ঘরে থেকে, এখনো কি লোককে বোঝাতে পারবি, তোর গোটা অঙ্গটি একেবারে পবিত্তির আছে?'

বলতে বলতে সে আবার শুভাকে নিজের দিকে জোরে টানল। শুভাও নিজের কাপড় টেনে ধরে রাখল। যদিও তাতে আরো যেন এলোমেলো হয়ে উঠল। ওর শিথিল করে বাঁধা খোঁপা ঘাড়ের পাশে ভেঙে পড়ল। জোর করে কাপড় টানতে গিয়ে, ওর শ্যাম উদ্ধত স্বাস্থ্য যেন বুকের জামার কাছে অলজ্জ বে-আবরু হয়ে উঠতে চাইল। গোলের মধ্যেই ঈষৎ লম্বা ভাবের সমস্ত মুখখানি এই শীতেও যেন ঘেমে উঠল। কোন প্রসাধনের ছাপ নেই মুখে। কপালে একটা টিপও নেই। সিঁদুর-হীন সাদা সিঁথি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। কানে গলায় হাতে, কোথাও সামান্য একটি অলঙ্কার পর্যন্ত নেই।

থাকার মধ্যে আছে একটি সাধারণ স্বাস্থ্যের দীপ্তি। চোখ-মুখেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। তবু ওর চোখের দৃষ্টিতেই যেন, চোখ দুটিতে একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। করুণ অথচ কঠিন। বাংলাদেশের আর দশটা সাধারণ মেয়ের মুখের মতই মুখ। তবু, চরিত্র ও মানসিকতার একটা বিশেষ ছাপ পড়ে, কোথায় যেন একটা অসামান্যতা আয়ত্ত করেছে। ওকে হঠাৎ দেখলে, একটি স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী এবং গভীর প্রকৃতির মেয়ে বলে মনে হয়। যদিও, তার মধ্যে কোথাও শহর নগরের ঝলক নেই। একটু বরং দূরান্তের গ্রামীণ ভাবই লক্ষিত হয়। তবে ওর চোখ দু'টি বেশ আয়ত এবং কালো। বয়স অনুমান করতে অসুবিধা হলেও সম্ভবতঃ চব্বিশ-পঁচিশের কম নয়।

এবার হঠাৎ শুভার চোখ দু'টি জ্বলে উঠল। বলল, 'লোককে বোঝাবার আমার কিছু নেই। আমি সতী কী অসতী, সে পরীক্ষা আমি কারুর কাছে দিতে চাই না। কিন্তু তুমি আমার কাপড় ধরলেও আমার ঘেন্না হয়। ছাড় বলছি।'

'বটটে! আমি কাপড় ধরলেও ঘেন্না হয়?'

বলেই, আচমকা কাপড়টা ছেড়ে দিয়ে, বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে শুভার গালে একটা থাপ্পড় মারে। শুভা ছিটকে খানিকটা সরে যায়। অপরিসীম ঘৃণায় আর রাগে

boiRboi.net

ওর দুই চোখ ধ্বক ধ্বক করে। কাপড় ঠিক করে, বুকের ওপর দিয়ে টেনে দিতে দিতে বলে, 'এই না হলে পুরুষ! একটা মেয়ে দুরবস্থায় পড়ে তোমার কাছে রয়েছে, তাও নিজের ইচ্ছেয় নয়। তোমার নিজের বউ নয়, মেয়েও নয়। তার গায়ে হাত না তুললে আর পুরুষ কিসের?'

'চোপ্!'

'কিসের চোপ। তোমার জ্বালা তো, কেন তোমার কথা শুনছি না, তোমার ঘর করছি না। কিন্তু তোমার ঘর করতে তো আমি আসিনি, আমাকে—'

'তোকে তোর পীরিতের লোক ঠাকুর ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। তারপরে, বন্ধুর হেফাজতে রেখে, সে-ই যে শালা কেটেছে, আর তার টিকির দেখা নেই। এর মানে কি, আমি জানি না ভেবেছিস? ওসব ছেনালী সতীগিরি অন্য জায়গায় দেখাস।'

হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, একবার টলে উঠে আবার বলল, 'তোর সেই তারকদাদাটি আর কোনদিনই আসবে না, জেনে রাখিস।'

শুভা বলে উঠল, 'আর সেই সুযোগটাই তুমি নিতে চাইছ।'

ক্ষিপ্তের মত লোকটা আরো দু'পা এগিয়ে গেল, গর্জে উঠল, 'সুযোগ কিসের, আঁ? কিসের সুযোগ?'

'খবরদার, তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে এস না আর!'

একেবারে দেয়াল ঘেঁষে, এমন ভাবে দাঁড়াল শুভা, যেন সমস্ত শক্তি সংহত করে, প্রত্যাঘাতের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। লোকটি থমকে দাঁড়াল। হিংস্র কিন্তু ভীরু দাঁতাল শুয়োরের মত শুভার দিকে তাকালো। গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'আমার ঘরে আমাকেই চোখ রাঙানো হচ্ছে?'

শুভাও যেন দাঁত চেপে বলল, 'একে চোখ রাঙানো বলে না। কিন্তু পড়ে পড়ে তোমার মার খেতে পারব না আমি। দরকার হয়, রাত পোহালেই আমি তোমার এখান থেকে চলে যাব।'

লোকটা শব্দ না করে, ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, চকিতে একবার শুভার চোখ পড়ল, আলমারিটার পাশে। সেই চোখ, আর সেই সরু সূচিবিদ্ধ তীক্ষ্ন চকচকে জিনিসটা। মনে হল, কপালের কাছে রুক্ষ চুলের গোছা এসে পড়েছে। চকিতে একবার চোখোচোখি হল মাত্র। চোখ দুটো শুভার দিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু, মুখটা যে কেমন, কী রঙ, কিছুই বুঝতে পারল না ও।

অন্য দিন অনেক লাঞ্ছনাতেও, এতটা কঠিন হয়ে ওঠে না শুভা। আজ, এই পলাতক চোরের সামনে যেন ওর আত্মসম্মানবোধ সহসা খাপ-খোলা অস্ত্রের মত ঝলসে উঠল। অন্য দিন তৃতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না। তা-ই যতটা সম্ভব আত্মরক্ষাটাই ওর কাছে বড় হয়ে ওঠে। আজ, আর একজন, সে যে-ই হোক, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, যা-ই হোক, কিন্তু একটা মানুষ। আর একটা মানুষের সামনে, এই অপমান আর লাঞ্ছনায় কেবল আত্মরক্ষা করতে যেন ওর লজ্জা করছে। এতটা হীনতা যেন মেনে নিতে পারছে না।

boiboi.net

এই লোকটা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে হেসে উঠে বলল, 'কোথায় যাবি ? বর্ধমানে, তোদের বাড়িতে নাকি ?'

শুভা সেই ভঙ্গিতেই বলল, 'সে যেখানেই যাই, তোমার আশ্রয় থেকে আর খারাপ কিছুই হবে না। বাড়িতে গেলেও না হয়, বাপ-মা মেরে ফেলবে, তবু—'

'মেরে ফেলবে না, তাতে তাদের হাতেই হাতকড়া পড়বে। মুখে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।'

'দেয় দেবে। তাদের লাথি খেয়ে যদি আমাকে অন্য কোন আঁস্তাকুড়েতেও যেতে হয়, তাও ভাল। তবু তোমার কাছে থাকতে চাই না।'

'কেন, তোর তারকদার জন্যে অপেক্ষা করবি না ? পিতিক্ষে যাকে বলে। অমন তোদের স-স্বর্গীয় পিরীত, ভালবাস্‌সা। সে তোকে নিতে আসবে। তোকে নিয়ে সংসার পাতবে, সুখের সংসার।'

'তারকদার বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার কিছু নেই। তুমি তার ছেলেবেলার বন্ধু। তুমিই ভাল জান, সে কী করবে না করবে।'

'আমি ?'

লোকটা হাসতে হাসতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। পায়ে ভর করে, এমনিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। টলটলায়মান অবস্থা। হাসির বেগে পড়ে যেতে গিয়ে, কোনরকমে টাল সামলে নিয়ে বলল, 'প্রেম করলি তোরা। ঘর ছেড়ে পালিয়ে এলি তারকের সঙ্গে, সে তোর ভাবী সোয়ামী, আর আমি ওকে ভাল চিনব ?'

শুভা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চুপ করে রইল। লোকটির কথার মধ্যে যে নিষ্ঠুর সত্যি ছিল, কুৎসিত আর বীভৎস সত্যি ছিল, তা যেন ওর মুখের কথায় ওপরে আঘাত করল। তথাপি, একটি তৃতীয় ব্যক্তির সামনে, এই অপমানকর কথাগুলো, ওর বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ন জ্বালাও ধরিয়ে দিল। ভিতরটা পুড়তে লাগল। কোন কথা বলতে পারল না।

লোকটি হঠাৎ তর্জনী তুলে, এক চোখ বুজে, হেসে, একটা নোংরা ভঙ্গি করল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আর আমার কথাই যদি মানিস, সে তো আমি বহুদিন আগেই বলে দিয়েছি সুন্দরী, তারকদা নামে চিড়িয়াটি ফুড়ুৎ কেটেছে। সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। এবার এই নরেশ নামক চিড়িয়াটিকে নিয়ে থাক। দানাপানী খাওয়াও। তা নয়, তোর সতীত্ব—'

'চুপ কর, নোংরা ইতর ছোটলোক !'

শুভা আবার ফুঁসে উঠল। এবং চকিত মুহূর্তের জন্যে, ওর দৃষ্টি প্রকাণ্ড বেঁটে আলমারিটার কোণ ঘুরে এল। লোকটা তেমনি করেই, শুভার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু, শুভার মনে হল, সূচিবিদ্ধ সেই চকচকে জিনিসটা আর মুখের সামনে তোলা নেই। তাতে যেন লোকটার রোগা রোগা মুখটা পুরোপুরি দেখা গেল। মনে হল, লোকটার বয়স বেশী নয়। পঁচিশ-তিরিশের মধ্যেই হবে। একজোড়া সরু গোঁফ আছে যেন। মুখে ভয়ের ভাব তেমন নেই। বরং যেন, কেমন শক্ত রাগ রাগ ভাব।

এদিকে নরেশের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার ঘরে

boiRboi.net

দাঁড়িয়ে, আমার খেয়ে, এত বড় কথা ! আজ লাশ ফেলে দেব।'

বলেই, একটা দাঁতাল শুয়োরের মত সে শুভার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। শুভা যেন এটা অনুমানই করেছিল। তাই, চকিতে সরে যেতেই দেওয়ালে নরেশের মাথা ঠুকে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে, কোঁচায় কাপড় বেঁধে, মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ ওঠবার চেষ্টা করলেও, ভারী শরীর নিয়ে সম্ভব হল না। তবু সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। শুভা ততক্ষণে, ঘরের প্রায় মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নরেশ আর ও, দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। দু'জনেরই চোখে, ঘৃণার জ্বলন্ত আগুন ঝরছে।

নরেশের চোখে তবু একটু বিস্ময়। সে আর এগিয়ে এল না। ওখান থেকেই বলল, 'হুম্। এত সাহসের পেছনে কী আছে, আমাকে দেখতে হবে। সারাদিন বাড়ি থাকি না। বোধহয় নতুন কোন নাগর জুটেছে, দিনের বেলা আসা-যাওয়া চলছে। তাই খুব মেজাজ দেখিয়ে চলে যাবার হিড়িক দেওয়া হচ্ছে, আর গালাগাল ফুটছে।'

শুভার চোখে আগুন থাকলেও, নরেশের দেওয়ালে আঘাত বা পতনটা বোধহয় চায় নি। তবু কোথায় যেন একটা তৃপ্তিও বোধ করছে ও। সম্ভবতঃ তৃতীয় মানুষটা আছে বলেই। তৃতীয় মানুষটা আছে বলেই, ওর মেয়ে মনের বিদ্বেষ এবং ঘৃণাটা এখন এমন ভাবে ঝলকে উঠেছে। তৃপ্তিটাও বুঝি সেই কারণেই। ও বলল, 'তুমি যা খুশি তা-ই ভাবতে পার, আমার কিছুই যায়-আসে না। তবে তুমি জেনে রেখো আমি এখনো বিশ্বাস করি, তারকদা ফিরে আসবে। সে তো তোমার মত জোচ্চুরি করে টাকা রোজগার করে না। সে নিশ্চয় টাকা-পয়সার ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ফিরে এলে, তখন তাকে এসব বোল।'

কথাগুলো বলতে বলতে, শুভার বুকের মধ্যে যেন যন্ত্রণা করে উঠল। চোখের রাগ আর ঘৃণার মধ্যেও, একটু জলের আভাস ফুটে উঠল। ওর মনে হল, তৃতীয় লোকটিকে শোনাবার জন্যেই যেন, নিজের এই অসংশয় বিশ্বাস ঘোষণা করল। অথচ ওর ভিতরে এই বিশ্বাসের কোন সাড়া পাচ্ছে না। বরং একটা কষ্ট যেন বুকে বিঁধে গেল।

নরেশ বলে উঠল, 'বটে ? সেই ফিরে আসাটা কবে, জানতে পারি কী ?'

আবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলাল সে। শুভা বলল, 'যত দিনেই আসুক, তোমাকে তা দেখতে হবে না।'

নরেশ মাথা নাড়িয়ে, খানিকক্ষণ টলতে লাগল। তারপরে সোজা পাশের ঘরে চলে গেল। এ ঘরের আলো যতটুকু পড়েছিল, তাতে পাশের ঘরের খাটটা দেখা যায়। সেই খাটে গিয়ে নরেশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কী যেন সে বিড়বিড় করছে। কোন কথাই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল হাত দুটো এগিয়ে দিয়ে, একটা মরা ব্যাঙের মত উপুড় হয়ে পড়ল। শুভা জানে, আজ রাত্রের মত এখানেই শেষ। নরেশ আর উঠবে না। নেশা আর ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যাবে।

সহসা শুভার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ঘরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে ওর মনে পড়ে গেল, আলমারির পাশে, সেই লোকটা রয়েছে।

boiRboi.net

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গিয়েও, ও আড়ষ্ট হয়ে রইল। নরেশের সঙ্গে ঝগড়ার সময়, তবু দু'-একবার তাকাতে পেরেছিল। এখন আর কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে দেখতে সাহস পেল না। এমন কি, ঘরের মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন, গা শিরশির করে উঠছে। এবার কী করবে লোকটা? এই মুহূর্তেই বা কী করবে? নিশ্চয়ই শুভার অসহায় অবস্থাটা সে বুঝতে পেরেছে। জানে, এসময়ে মেয়েটিকে সাহায্য করবার কেউ নেই। যে ব্যক্তি আছে, সে মেয়েটির রক্ষক নয়। আলমারির পাশ থেকে লোকটা উঠে আসছে না তো!

ভাবতে ভাবতেই, শুভা পাশের ঘরের দরজার কাছে চলে যায়। হঠাৎ বলে উঠল, 'তোমার খাবার কি দেব?'

কথাটা নিতান্ত ছলনা নয়। নরেশ বাড়ি এসে কোনদিনই খায় না। তবু শুভা রোজই জিজ্ঞেস করে। রোজই এক জবাব পায়, কোনদিন বা, 'তোর হাতে আমি খেতে চাই না।'

আসলে, প্রতি রাত্রেই নরেশ ফিরে আসার পরে, যে পরিস্থিতি দাঁড়ায়, তারপরে আর খাওয়ার কথা কোন পক্ষ থেকেই ভাবা যায় না। তবু রোজই জিজ্ঞেস করতে হয়।

আজ নরেশের কাছ থেকে কোন জবাবই পাওয়া গেল না, কেবল নাক ডাকার শব্দ ছাড়া। সেই শব্দ যেন শুভাকে আরো অসহায় করে তুলল। নরেশকে ঘুমন্ত ভেবে লোকটা হয়তো আরো সাহসী হয়ে উঠবে। আশ্চর্য, যে-নরেশের সঙ্গে ও এভাবে ঝগড়া করল, তৃতীয় লোকটার উপস্থিতিতেই, এখন সেই নরেশ ঘুমিয়ে পড়াতে ভয় পাচ্ছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই পিছনে একটা সামান্য শব্দ হল। শুভা চমকে পিছনে ফিরে তাকাল। দেখল লোকটা দরজা খুলে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে! আর একবার শুভার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। লোকটা যেন বেরিয়ে যাবার আগে, ইচ্ছে করেই শব্দ করল, এবং শুভার দিকে ফিরে তাকাল।

লোকটার মুখের ওপর তখন আলো পড়েছে। রোগা রোগা কিন্তু চোখা মুখ একটা ছেলে যেন। চোর ডাকাত বলে ঠিক মনে হল না। যেন ভদ্র ঘরেরই ছেলে। মাথার চুলগুলো উসকো-খুসকো। গায়ে একটা কালো রঙের, কলারওয়ালা, ফুল-হাতা পাতলা পুলওভার। ভিতরে কোন জামা আছে কি না বোঝা যায় না। পরনে সেই রঙেরই একটা প্যাণ্ট। নাক চোখ মুখ সব মিলিয়ে একটা তীক্ষ্ণতা। কিন্তু হাতে যেটা চকচক করে ঝিলিক দিচ্ছিল, সেটা দেখা গেল না।

চকিতের মধ্যেই এই দেখাদেখি। শুভার চোখে ভয় ও উদ্বেগই ফুটে উঠল। লোকটার ঠোঁট দুটো যেন একবার নড়ল। কোন শব্দ হল না। পরমুহূর্তেই নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুভা তখনো স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হতে পারল না, লোকটা চলে গিয়েছে, নাকি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে, চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যদি কোন শব্দ পাওয়া যায় বা দরজা নড়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে পারবে, লোকটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

boiRboi.net

তারপরে হঠাৎ শুভার মনে হল, এত ভয় পাবারই বা কী আছে। শুভার কিসের এত ভয়। লোকটা যদি তাকে আক্রমণ করে, তবে ও চিৎকার করবে। আর যদি ছুরিটা বিঁধিয়ে দেয়, তাহলে তো সব যন্ত্রণার শেষ। শুভার জীবনে, আর কোন্ ভয় অবশিষ্ট আছে? এবং এই মুহূর্তে, সহসাই ওর মনে হল, লোকটাকে ও এতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে দিল কেন। ওর তো উচিত ছিল, নরেশ ঘরে ঢোকা মাত্র, লোকটার কথা বলে দেওয়া।

কিন্তু মত্ত নরেশের কি চোর ধরবার মত শরীর বা মনের অবস্থা ছিল? হয়তো মনের অবস্থার পরিবর্তন হত। হয়তো, সহসা চোরের উপস্থিতিতে, নরেশ চমকে উঠত। এমন কি, একটু আগেই এই ইতর বিবাদের ঘটনাটা চোর ধরার উত্তেজনাতে আর ঘটতে পেত না।

ভাবতে ভাবতেই শুভার ঠোঁটের দুই কোণ বেঁকে উঠল। বৃথাই এসব ভাবনা। তবু যদি নরেশকে চিনতে বাকী থাকত শুভার। লোকটা চোর ডাকাত, যা-ই হোক, নিরস্ত্র মাতাল নরেশকে ধাক্কা দিয়েই পালিয়ে যেত। মাঝখান থেকে, নরেশ সমস্ত ব্যাপারটার অপব্যাখ্যা করত। সে অপব্যাখ্যার বচনও শুভা জানে। গোটা পাড়াটাকে জাগিয়ে নরেশ ঘোষণা করত, শুভারই কোন প্রেমিক ঘরে এসে লুকিয়ে ছিল।

তা ছাড়া, আরো একটা ভয় ছিল শুভার। লোকটার হাতে যে জিনিসটা ও দেখেছিল, সেটা যদি নরেশকে আঘাত করত, সেটা হত, আর এক দুর্দৈব। লোকটা যদি মানে মানে পালিয়ে বিদায় হয়, এটাই চেয়েছিল।

শুভা দেখল, দরজাটা একটুও নড়ছে না। কোন শব্দও নেই। ও ঘরের এক পাশে সরে গিয়ে, দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে, দরজার কাছে গেল। দরজা খুলে দেখবার সাহস হল না। কোনরকমে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে আগে ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিল। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, দরজায় কান পাতল, যদি কিছু শোনা যায়। কিছুই শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে শুভা শান্ত হল। ওর নিশ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। ক্লান্ত ভাবে, দরজায় হেলান দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইল। যেন, সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করে, এই মাত্র ঝড় থামল। ওর ভিতরের অবস্থাটা সেই রকমই। ভিতরের সব কিছু, এলোমেলো, ছড়ানো ছিটানো। তার মাঝখানে, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে, বিস্রস্ত এলোমেলো শুভা একলা দাঁড়িয়ে আছে। মনের ভিতরের চারদিকে বিশৃঙ্খলা। কোন একটা ভাবনাও যেন, সারি সারি, পাশাপাশি সাজানো নেই।

এই বিশৃঙ্খলার ভিতর থেকে, প্রথমেই জেগে উঠল, পলাতক লোকটি। কে লোকটা। আটতলার ছাদ থেকে পালানো, সেই লোকটাই নাকি। তা-ই যদি হয়, এ ঘরে এল কেন। এলই বা কেমন করে। কেবল কি পালাতেই এসেছিল, নাকি চুরির মতলবও ছিল। কিন্তু চোরদের চেহারা কি ওরকম হয়। ওদের দেশের ছোট মফঃস্বল শহরে বা গাঁয়ে কখনো যে চোর দেখেনি, তা নয়। তার সঙ্গে, এ-লোকটার কোন মিল নেই। তাদের চেহারা ভাব-ভঙ্গি, সবই আলাদা।

কিন্তু এ-লোকটাই যদি ছাদ থেকে পালানো লোকটা হয়, তবে এ-চোরও আলাদা

জাতের। শুভার গায়ে যেন আবার কাঁটা দিয়ে উঠল। এই লোকটাই তাহলে, পাইপ বেয়ে, এ-ছাদ থেকে ও-ছাদে যাচ্ছিল। সেই লোকটাই এতক্ষণ ঘরে ছিল।

পাশের ঘরের দরজা দিয়ে, পিছনের সেই জানালাটার দিকে ওর চোখ পড়ল। এখনো জানালাটা তেমনি খোলা। না, এভাবে আর কোনদিন জানালাটা খুলে রাখবে না শুভা।

এ-কথাটা মনে হতেই, নতুন চমক দেখা দিল ওর চোখে। সেই সঙ্গে উদ্বেগ। কী সর্বনাশ, এখনো দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা ও খুলে রেখেছে। একটা ভয় গিয়েছে। সেটা অপরিচিতের ভয়। কিন্তু পরিচিত ভয়ঙ্কর ভয়টা তো এখনো, একই ছাদের তলায়, পাশের ঘরের খাটে, মরা ব্যাঙের মত পড়ে আছে। জেগে উঠলে একটা অতিকায় সরীসৃপের থেকেও সে ভীষণ। বিশেষ, রাত্রে কোন সময়ে ঘুম ভেঙে গেলে নিস্তার নেই।

শুভা তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে, মাঝখানের দরজাটা টেনে, এদিক থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল। দিয়ে, এই রাত্রির, আপাততঃ কয়েক ঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত হল। এ ঘরেও একটা খাট এবং বিছানা রয়েছে। সংলগ্ন বাথরুমও আছে। পাশের ঘরেও তাই। দরজা বন্ধ করে দিলে, কোন অসুবিধা নেই। এই সব বাড়ির, এরকম ব্যবস্থায়, শুভা রোজ স্বস্তিতে একবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। এ ব্যবস্থা না থাকলে, একটা রাত্রিও হয়তো এ-বাড়িতে বাস করা যেত না।

নরেশ এ ঘরেই শোয়। এটা তারই ঘর, এই খাট বিছানাও তারই। এ ঘরেরই আর এক পাশে রয়েছে একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। সেটাকে ঘিরে, গোটা কয়েক চেয়ার। এখানেও নরেশের কাজকর্ম হয়। লোকজন এলে বসে, কথাবার্তা বলে। কিন্তু মত্ত নরেশের কোন কিছুরই ঠিক নেই। সে যে কোন্ দিন, কোন্ ঘরের বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে, কিছুই বলা যায় না। তার তো নির্লজ্জ পরিষ্কার উক্তি শুভা শুনেছে, 'শোয়া-শুয়ির কোন ঠিক ঠিকানা নেই বাবা আমার। কখন কোনদিন কোথায় শুই, তার কিছু ঠিক আছে! এ ঘরেই বা আমার কটা রাত্রি আর কাটে। কিসের টানেই বা রাত্রে এ ঘরেই ফিরে আসব। তার চেয়ে কোন মেয়ের ঘরে গিয়ে কাটিয়ে আসব। তবে এখন তুমি একটা মেয়েছেলে রয়েছ, তাই আসি। তাও তো বাবা, নেউলের মত ফ্যাঁস ফ্যাঁস করেই আছ। পাবার আশা লবডঙ্কা।'...

যেদিন নরেশ পাশের ঘরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সেদিন রাত্রে শুভা এ-ঘরেই শোয়। কিন্তু নরেশের বিছানায় কোনদিনই নয়। সে আলাদা একটা মাত্র মাদুর মেঝেয় পেতে শোয়। সে জন্যে মাদুরটা শুভা বড় ঢাউস আলমারিটার পিছনে লুকিয়ে রাখে, নরেশ যাতে টের না পায়। টের পেলে হয়তো কোনদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

শুভা এগিয়ে গেল ঢাউস আলমারিটার কাছে। মাদুরটার জন্যে, কোণের দিকে হাত বাড়াবার আগেই আবার সেই লোকটির কথা ওর মনে পড়ে গেল। আলমারিটার গায়ে হাত রেখে ও ভাবল, কে হতে পারে লোকটা? সম্ভবতঃ চোরই, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুভার মনে একটা অদ্ভুত কৌতূহল জাগে। লোকটা

boiRboi.net

কী ভেবে গেল। এইরকম মাতাল নরেশ, তার মুখের সেই নোংরা কথা, আর শুভাকে দেখে, লোকটা কী ভেবেছে। মনে মনে বিদ্রূপ করে নিশ্চয় ভেবেছে, একটা দুশ্চরিত্রা জঘন্য মেয়ে। কথা থেকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, তারকদা নামে কোন একজনের সঙ্গে প্রেম করে সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। আর তারকদা ওকে এখানে রেখে সরে পড়েছে। এখন ও একটা দুশ্চরিত্র লম্পট মাতালের আশ্রয়ে রয়েছে। এ-লোকটাও নিশ্চয় নরেশের চোখেই শুভাকে দেখেছে এবং ভেবেছে। একে পুরুষ, তায় চোর। এ-ছাড়া আর কী-ই বা লোকটা ভাবতে পারে।

তবু শুভার মনে হয়, অন্য কিছুও লোকটা ভাবতে পারে। শুভাকে দেখে, শুভার কথাবার্তা শুনে কি, খুব খারাপ মেয়ে বলে মনে হতে পারে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পাশ ফিরে, নীচু হয়ে, শুভা মাদুরের জন্য হাত বাড়ায়। হঠাৎ ওর চোখে পড়ে, নীচে যেন কী একটা পড়ে আছে। চিকচিক করছে। লোকটা তো ওখানে ঢুকেই বসেছিল। বোধহয় সেই ছুরিটা।

শুভা আরো নীচু হয়ে, সেটা কুড়িয়ে নিল। অবাক হয়ে দেখল, সেটা ছুরি নয়। একটা অদ্ভুত জিনিস। ছ' ইঞ্চি একটা লোহার পাতের হাতলের ওপর, দু'ইঞ্চি ডায়ামেটারের গোল রিং। যেন অনেকটা আইগ্লাসের মত। একটা লোহার পাতেই গোটাটা তৈরি। রিঙের মাঝখানটা ফাঁকা। কিন্তু রিঙের গায়ে তিন দিকে তিনটে, অদ্ভুত আকারের লম্বা লম্বা চাবির মত রয়েছে। কোনটাই আলাদা নয়, একই লোহার পাত থেকে কেটে তৈরি করেছে। কোন জোড় নেই। তিনটেই তিনরকমের। একটা চ্যাপ্টা, বাকী দুটো গোল চাবির মত।

শুভা অবাক হয়ে ভাবে, কী জিনিস এটা। কী হতে পারে? নরেশের কোন জিনিস, না লোকটাই ফেলে গিয়েছে? বস্তুটি চোখের সামনে ঘুরিয়ে দেখল ও। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। জিনিসটা শক্ত লোহার পাতের এবং একেবারে হালকা নয়। কে জানে কী হতে পারে। শুভার স্নায়ু সমূহ যেন শিথিল হয়ে আসতে থাকে। তার আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

হাতের জিনিসটা যা-ই হোক, আবার আলমারির পাশে ফেলে রেখে দিয়ে লাভ নেই। এই ঢাউস আলমারিটাতে কিছুই প্রায় থাকে না। টাকাগুলো সবই এমনি বন্ধ করা আছে। ওপরের টানা খুলে, লোহার জিনিসটা ও রেখে দিল। কোণ থেকে মাদুরটা বের করে নিয়ে এসে দেওয়ালের একপাশে পাতল। তারপরে বাথরুমে গেল। শীত করছে না ওর। তার পরিবর্তে, চোখ মুখ কান ঘাড়ের পিঠ যেন জ্বালা করছে।

বেসিনের কল খুলে, চোখে মুখে জল দিল। আঁচলেই মুছল। ঘরের মধ্যে এসে, নরেশের খাটের কাছে ছোট ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়াল। মুখ মুছতে মুছতে, নিজেরই চোখের দিকে তাকিয়ে, নিজের সঙ্গেই দৃষ্টিবিনিময় করল। নিজের চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, এক সময়ে ওর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল।

চোখের কোণ বেয়ে, জলের ফোঁটা গড়িয়ে এল। দাঁত দিয়ে, ঠোঁট কামড়ে ধরে, মনে মনে বলে উঠল, 'কী হবে আমার? কী আছে আমার কপালে? তারকদা কি সত্যি আর কোনদিন আসবে না?'···

এই অবস্থাতেই, তাড়াতাড়ি সরে এসে, আলো নিভিয়ে দিয়ে, অন্ধকারে মাদুরের ওপর মুখ চেপে, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সমস্ত কিছুর পরে, ওর ভিতরে, ঝড়ে ছত্রখান জীবনটার শোকে, কান্না বাধা মানল না। এখন শুধু ওর একলার কাঁদবার পালা।

তারপরে কখন এক সময় কান্না শেষ হয়। কিন্তু ঘুম আসে না। চোখের সামনে, পিছনের দিনগুলো ভেসে ওঠে। যে-দিনগুলোর প্রতিটি উদয়াস্ত ছিল সুন্দর উজ্জ্বল, সুখে দুঃখে মেলানো একটু আশা আরো দশটি সাধারণ মেয়ের মতই। কিন্তু কী অপরাধে কে জানে, আজ রাত্রে সে এখানে শুয়ে আছে। সেখানে ওর জন্যে স্থূল সুখের সকল দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। ও হাত বাড়িয়ে নিতে পারছে না। এমন জায়গায় বাধছে, যেখান থেকে হাত বাড়াতে গেলে, হাতটাই হয়তো বা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এর কি একমাত্র কারণ, একমাত্র অপরাধ, তারকদাকে শুভা ভালবেসেছিল?

*

কলকাতা থেকে, এমন বেশী কিছু দূরে নয়, কাছাকাছি জেলারই এক মফঃস্বল শহরের প্রান্তে, গ্রামের পাশ ঘেঁষে শুভাদের বাড়ি। মফঃস্বল শহরের যতটুকু সুবিধা, সেটুকুও পাওয়া যায়। গ্রামের সান্নিধ্যটুকুও আছে। ধানক্ষেত, মাঠ, বন, সবই কাছাকাছি।

একদা নিশ্চই শুভাদের বাড়ির অবস্থান গ্রামের মধ্যেই ছিল। যুদ্ধ আর দেশ-বিভাগের পর, সবখানেই যেমন শহর বিস্তৃত হয়েছে, এ শহরও তেমনি হয়েছে। বিস্তৃত হতে হতে, যা ছিল গ্রাম থেকে দূরে, তা এসে পড়েছে গ্রামের হাতায়।

আর দশটা সাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের মতই, শুভাদের বাড়ি। শুভার বাবা নিজে সেই বাড়ি তৈরি করেন নি। ওর বাবার ঠাকুরদার আমলের বাড়ি। একতলা পুরনো, বড় বড়, কোঠাওয়ালা সেকালের বাড়ি। পুরনো বাড়ির ইঁটে শ্যাওলা ধরেছে। নোনা লাগতে শুরু করেছে, শুভার জন্মের আগে থেকেই। সেই পুরনো দেওয়ালেরই পাশ ঘেঁষে উঠেছে, মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের ঘর। অথবা পাতলা ইটের দেওয়াল, মাথায় টালির চাল।

একলা শুভাদেরই তো সব নয়। কাকা-জ্যাঠারা আছেন। সকলেরই বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, অতএব ঘর দরজা বাড়াতে হয়েছে। একান্নবর্তী পরিবার নয়। সকলেই আলাদা, বিচ্ছিন্ন। একই বাড়িকে নানাভাগ ভাগাভাগি করে, নতুন করে ঘর তুলে যে যার নিজের সীমানা ঠিক করে বাড়িয়ে নিয়েছে।

কিন্তু ঠাকুরদার আমলটা আর কোনদিনই ফিরে আসে নি। বাবা কাকা জ্যাঠাদের জন্য যতখানি ধান-জমি ঠাকুরদা রেখে গিয়েছিলেন, তাতে সমস্ত পরিবারগুলোর তিন মাসের বেশি খোরাকি জুটত না। অতএব সবাইকেই, জীবিকার জন্যে বাইরে পা বাড়াতে হয়েছিল। তবু পুরনো দিনের সেই লক্ষ্মীশ্রী আর ফেরেনি। কোনরকমে জীবন-যাপনের একটা ঠেকে জোড়াদেওয়া অবস্থায়, দিনগুলো চলেছে। আধা-গ্রামীণ, আধা-শহুরে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর দিন যেমন কাটে, চেহারা যেমন হয়, সেইরকমই।

boiRboi.net

কাকা-জ্যাঠারা তবু বাইরে চাকরির ধান্দায় গিয়েছিলেন। শুভার বাবা, সেকালের একজন ম্যাট্রিকুলেট, চিরদিন গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারি করেই কাটিয়েছেন। এখনো কাটাচ্ছেন। শুভাদের পরিবারে যেটা সব থেকে বড় অসুবিধে, তা হল, ওর ভাইয়েরা সকলেই ছোট। বোনেরা সকলেই বড়। ষষ্ঠীর দয়াটা নেহাত কম নয়। শুভারা চার বোন তিন ভাই।

সেকালের একজন ইস্কুল মাস্টার, যার কোন ডিগ্রি নেই, বি-টি পাস তো অনেক দূরের কথা, তাঁর পক্ষে এত বড় পরিবার চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওর বাবার আমলে, গ্রামে একটি ম্যাট্রিক পাস ছেলের তবু কিন্তু কদর ছিল। এখন কথায় কথায় বি-এ, এম-এ পাস করা ছেলেদের ভিড়। এখন কলকাতার ছেলেরা পর্যন্ত গ্রামে যায় পড়াতে। শুভার বাবা এখন বাতিলের পর্যায়ে। নিতান্ত অনুগ্রহ করে ইস্কুলে রাখা হয়েছে। তবু মাস গেলে, যা হোক কিছু ঘরে আসে। সেই সঙ্গে আছে কিছু বাড়িতে ছাত্র পড়ানোর আয়। সকালে বিকালে চট আর মাদুর বিছিয়ে অনেক ছেলে পড়ে। ইস্কুলের থেকে সেই আয়টাই বেশি।

কিন্তু দিনকালের অবস্থায়, কিছুই না। সাত ভাই বোন, বাবা মা। এতগুলো মানুষের জীবন-যাপন সহজ কথা নয়। অভাবটা প্রত্যহের। একটু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শুভা এটা প্রতিদিন অনুভব করেছে। তবু তারই সঙ্গে, একটা আশা, অতি সঙ্গোপনে প্রতিদিন মনে মনে লালন করেছে। একটি বিয়ে। ওর একটি বিয়ে, ওর পরের বোনের একটি বিয়ে, তার পরের বোনের একটি বিয়ে…। না, খুব বেশিদিন আর সে আশা লালন করতে পারেনি।

ওর বড় হয়ে ওঠার পিছনে, যেন দৌড়তে দৌড়তে ধাওয়া করে পরের বোনটি বড় হয়ে উঠেছিল। তখনো আশা করত, একটি বিয়ে, একটি বিয়ে হবে। তারপরে যখন তৃতীয় বোনও পেছন থেকে ক্রমে ছুটে আসছিল, তখনো আশা ছিল, কিন্তু নিরাশাও সমান তালে বেড়েছিল। শুভার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মাও বিয়ের কথা বলত। বাবা-মা আলোচনা করত। নিতান্ত যদি টাকার যোগাড় না হয়ে ওঠে, তাহলে, অংশের ধান-জমিই বিক্রী করে বিয়ে দিতে হবে। মেয়ের বিয়ে তো কোনরকমে আটকে রাখা যায় না! খুব সাধারণ কথা, সত্যি কথা, যদিও দুঃখের কথা, অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু কতখানি জমি আছে। কয়টি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় সেই জমি বিক্রী করে। পিঠোপিঠি বোনেরা বড় হয়ে উঠতে, এ চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই শুভার মনে এসেছিল। অবিশ্বাস আর নিরাশা, তখন থেকেই শুরু। তখন থেকেই, স্বাভাবিকভাবে আরো মনে হয়েছে শুভার, ভাল করে লেখাপড়া শিখলেও, একটা স্বাধিকারের কথা ভাবা যেত। কিন্তু বাবা ইস্কুল মাস্টার হলে কী হবে, মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। গ্রামের পাঠশালাতেই যতটুকু হয়েছে। তারপরে আর কেউ সে কথা চিন্তা করেনি। সেদিক থেকে, ওদের পরিবার যেমন গ্রামীণ, তেমনি অশিক্ষা আর কুসংস্কারেই ভরা।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে, সব কিছুরই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। সমাজে পরিবারে ভাবনায় চিন্তায়। তার ঢেউ এসে লেগেছে ওদের পরিবারে, মূলে কোথাও ভাঙতে

boiRboi.net

পারে নি। কেবল আর্থিক ধাক্কাটাই প্রতিদিন বড় বেশি করে বেজেছে। চিন্তা ভাবনার জগতে, একটু আঁচড়ও কাটে নি। এই দূর জেলায়, নতুন শহরের গ্রামের সীমানায়, যদি বা কিছু আবর্জনা এসে পেঁছেছে, আসল কিছুই নিয়ে আসে নি। আবর্জনাগুলো এসেছে, নানান ঝলক নিয়ে। তার মধ্যে ভোগের ইন্ধন ছিল। আত্মপ্রকাশের শক্তি নয়। তাই দল বেঁধে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সিনেমা দেখেছে। বাবার আয়ের সঙ্গে মিলিয়ে, শাড়ি জামা কিনতে পারে নি, বুকের মধ্যে হু হু করেছে, তবু যতটুকু পারা গিয়েছে, তা-ই সংগ্রহ করেছে। জীবনের আর যা কিছু সব তো একটি জায়গাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। একটি বিয়ে। যদিও আর বিশ্বাস করতেও পারছিল না। তবু, বাবার পরিচর্যা, মায়ের কনিষ্ঠ সন্তানের দেখাশোনা করার অবসরে, আর কী-ই বা করার ছিল। আর কী-বা ভাববার ছিল।

ছিল, কিছু ছিল বৈকি। প্রেম করার ছিল, প্রেম ভাববার ছিল। করেছেও, ভেবেছেও। সেই রকমই প্রেম করেছে, সেই রকমই ভেবেছে। কখনো কখনো, কোন ছেলের হাতছানিতে মন ভুলেছে। চোখে দেখা, একটু হাসাহাসি। তার চেয়ে বেশি, দু'-একখানি চিঠির আদান-প্রদান। নেহাত কাছাকাছি হলে, একটু স্পর্শ। এ সবের মধ্যে জীবনের কোন যোগ নেই। একটা খেলা। হয়তো, অবচেতনের অবিশ্বাস নৈরাশ্য, আর আপাততঃ বয়সের একটা স্বধর্ম লীলা। একটু ভাল লাগা, একটু ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছা। ভেবে চিন্তে কিছু নয়। আপনা থেকেই যতটুকু আসে আর যায়। ভোরের কুয়াশার মত। যতক্ষণ শিশির, ততক্ষণই রোদের আলোয় একটু রঙ-বেরঙের ঝিকিমিকি। তারপর প্রখর কিরণে, সবই মিলিয়ে যাওয়া।

তার মধ্যে, মনে রাখবার মত কিছু নেই, কেউ নেই। তার মধ্যে গভীরতাও কিছু ছিল না। সে রকম কোন অঙ্গীকারই কেউ নিয়ে আসে নি। শুভার নিজের মধ্যেও, কোন অঙ্গীকারের সৃষ্টি হয় নি। তেমন গম্ভীর ভাবে, মূল্য দিয়ে, কিছু ভাবে নি। ও রকম হয়েই থাকে। একটি ডাগর মেয়ে। তাকে ঘিরে, পাড়ার দশটি ডাগর ছেলে, একটু হাসি একটু কটাক্ষ, এমনি সব নানান উপহার তাকে দিতে চায়।

তবু, যত দিন গিয়েছে, যত আশা গিয়েছে, ততই অবিশ্বাসের সঙ্গে একটা বিক্ষুব্ধ ধিক্কার শুভার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। ভেবেছে, বাবার প্রাণে কি একটু ভয় হত না। নিজের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে, এতগুলো ভাই-বোনকে সংসারে আনতে, একটু কি বুক কাঁপত না বাবার। সব কি এতই সহজ। ভবিষ্যতের ভাবনা কি একটুও হত না।

ভেবেও, বাবার ওপর বেশিক্ষণ রাগ বিদ্বেষ নিয়ে থাকতে পারত না শুভা। বাবাকে দেখলে, ভারী অসহায় মনে হত। বাবার জন্যে কষ্টই হত। আসলে, বাবার মনের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা নিরলস ভাই-বোনের সৃষ্টি করেছে, তা একটি ছেলের জন্য। শুভার বদলে যদি একটি ছেলে হত, কিংবা মেজবোনের বদলে, তাহলেও সে এতদিনে বড় হয়ে উঠত। বাবার একজন সাহায্যকারী সহকারী জুটত।

এ কথা মনে হলেই, শুভা বার বার বলেছে, কেন ছেলে হলাম না। তাহলেও বাবার কষ্ট কিছু ঘোচানো যেত।

★

এমনি যখন মনের অবস্থা, বয়স যখন বাইশের কোঠা ছাড়িয়ে গিয়েছে, তখনই এসেছিল তারকদা। তার আগেও যে তারকদা আসে নি, তা নয়। পাড়ার ছেলে, প্রতিবেশী। ছেলেবেলা থেকে অনেকবারই দেখেছে তারককে। তারকদের অবস্থা তেমন ভাল না হলেও, কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ। তারকদা নিজেও বলত, লোকেরাও জানত, কলকাতায় সে চাকরি করে। সপ্তাহে একদিন করে বাড়ি আসত। অন্যান্য ছুটিতেও, গ্রামে যাওয়া-আসা লেগেই ছিল।

চাকরিটা যে তারকদা ভালই করত, সেটা বোঝা যেত তাকে দেখে। তার পোশাক-আশাক, চাল-চলন, খরচের বহর দেখেই অনুমান করা যেত, কলকাতায় সে বেশ ভালই আছে। তারকদা গ্রামে এলে, গ্রামের বন্ধুরা খুশি হয়ে উঠত। গ্রাম তো ঠিক বলা যায় না আর। শহরই বলতে হবে। তবু, পুরনো অধিবাসীদের কাছে, শহরের পরিচয়ও গ্রামই। গ্রাম বলতেই তাদের ভাল লাগে। তাতে যেন নিজেদের অধিকারটা অনেক বেশি অনুভূত হয়। শহর বললে নিজেদের অধিকার ঠিক তেমন করে প্রতিপন্ন হয় না।

তারকদা দেশে এলে, শুধু তার ছেলেবেলার বন্ধুরাই খুশি হত না। কলকাতা থেকেও তার সঙ্গে দল বেঁধে বন্ধুরা আসত। তখন পাড়ায় রীতিমত সাড়া পড়ে যেত। তারকদার কলকাতার বন্ধুরা খাওয়া-দাওয়া, পুকুরে সাঁতার কাটা, হৈ হল্লা করে মাতিয়ে তুলত। সবাই খুশি হত না। কেউ কেউ বিরক্ত হত। সেটা নিতান্তই ঈর্ষা। গ্রাম্য নীচতা। কাউকে একটু স্বচ্ছল সুখী দেখলেই, যাদের চোখ টাটায়, মন পীড়িত হয়, তারাই বিরক্ত হত। তারা বলাবলি করত, 'বে-থা হয়নি, আইবুড়ো বয়সের রোজগার। এ সবই দু'দিনের। চাপ পড়লেই বাপ বলতে হবে এর পরে। তখন কোথায় যাবে এত সব র‍্যালা।'...ইত্যাদি।

একটু দুর্নামও যে না ছিল, তা নয়। শোনা যেত, তারকদা মদ খায়। হয়তো খেত। অনেকেই তো খায়। কিন্তু অনেকের মত তারকদাকে কেউ কখনো মাতলামি বা অভদ্র আচরণ করতে দেখেনি। আরো একটা দুর্নাম ছিল তার নামে। কোন কোন বাড়িতে নাকি, তারকদার যাতায়াত বেশি এবং সেই সব বাড়িতে, তারকদা রীতিমত টাকা-পয়সা খরচ করে। তাদের অর্থসাহায্য করে। বিনা স্বার্থে নয়। উপলক্ষ সেই সব পরিবারের মেয়েরা।

এ-সংবাদের কতখানি রটনা, কতটা সত্যি মিথ্যে, হলপ করে বলবার কেউ ছিল না। কথাটা শোনা যেত, এই পর্যন্ত। যে-সব বাড়ির বিষয়ে শোনা যেত, সে-সব বাড়িতে মেয়েরাও ছিল, যাদের খুব সুনাম ছিল না। তাদের সঙ্গে তারকদাকে এখানে সেখানে বেড়াতে বা সিনেমায় যেতেও দেখা গিয়েছে। তার থেকেই যতটুকু আন্দাজ মেলে। এ-ই যদি অন্যায়, তবে অন্যায়। এর বেশী কেউ কোনদিন চাক্ষুষ করে নি।

সব মিলিয়ে, তারকদার মধ্যে নানান আকর্ষণ ছিল। তার কলকাতার জীবন,

boiRboi.net

টাকা-পয়সা, পোশাক-আশাক, ব্যবহার, সেই সঙ্গে চেহারাও। তারকদা দেখতেও খারাপ নয়। কেবল, তার চোখ দুটোর ভাবের যেন কোন হদিস পাওয়া যেত না। বড় বড় চোখ দুটিতে, সেই দৃষ্টিকে যে কী বলে, শুভা কোনদিন বুঝতে পারত না। যখন মনে হত, তারকদা মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে, শুভা লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরাতে যেত, তখনই মনে হত, দৃষ্টিটা যেন অন্য কোথায় চলে গিয়েছে। অনেক দূরে, অন্য কোথাও। কেমন একটা অন্যমনস্কতা চোখে।

কখনো মনে হত, শুভাকে এক মুহূর্ত না দেখলে থাকতে পারবে না। যেন কোন একটা আকাঙ্ক্ষায়, মানুষটা জ্বলে যাচ্ছে। সে সময়ে, মানুষটাকে প্রায় খারাপ বলে মনে হত। যেন সব কিছুতেই, একটা লোভের নেশায় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সে জন্যে যে একটা ভীষণ আকৃতি, গভীর কষ্ট, তা মনে হত না। কিংবা নিজের অধিকারবোধে, সমস্ত কিছু ছিঁড়ে দিয়ে, গ্রাস করবে সেরকমও নয়। একটা অন্য ভঙ্গি। তারিয়ে তারিয়ে, খাবার মতই, তারিয়ে তারিয়ে দেখা। খুব খারাপভাবে বললে, শ্মাশানের কুকুরের মত চোখ।

কিন্তু, সেই চোখেই হঠাৎ এমন নিরাসক্তি দেখা দিত, যেন সব কিছুর ব্যাপারেই, সে একেবারে নির্বিকার হয়ে গিয়েছে। তখন তাকে অন্যরকম মানুষ বলে মনে হত। এই দুয়ে মিলিয়ে, তারকদা সম্পর্কে কেমন যেন একটা কৌতুহলের সৃষ্টি হত। যেন মানুষটাকে ঠিক চেনা হয় নি। কী যেন রয়ে গিয়েছে, কখনোই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার চলা-ফেরার সীমানা যেন অন্তঃহীন। যে অন্তঃহীন সীমানা পিছনে ফেলে, শুভাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এসব চিন্তা অনেক পরে এসেছে। যখন মেলামেশা বেড়েছে। প্রথম প্রথম তো কেবল দেখা-শোনাই ছিল। হঠাই বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে দু'-একটি জিজ্ঞাসা, 'কেমন আছেন শৈলেনকাকা ?···হ্যাঁ, যা দিনকাল পড়েছে। কলকাতায়ও জিনিসপত্রের দাম খুব। চালের কথা আর বলবেন না।...ওই চলে যাচ্ছে কোন রকমে···আচ্ছা চলি।'··· এমনি কথার পৃষ্ঠে দু-একটি কথা।

কখনো হয়তো শুভার সঙ্গেও এখানে সেখানে দেখা হয়ে গিয়েছে। সেইরকমই দু'-একটি কথা, 'কোথায় যাচ্ছ শুভা ? কেমন আছ ? শৈলেনকাকা ভাল আছেন ?'···

তারপরে সেই ঘোর সন্ধ্যায় একদিন দেখা। বাড়ির বাইরে, রাস্তার দিকে, বারান্দায় থাম ধরে দাঁড়িয়েছিল শুভা। মা গিয়েছিল গা ধুতে। ভাই-বোনেরা সবাই, কেউ খেলায়, কেউ গল্পে নিজের নিজের ব্যাপারে মেতে ছিল। কিন্তু আশেপাশে কেউ ছিল না। শুভা সবে মাত্র সন্ধ্যা বাতি দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাইরের দিকের ঘরটার দরজা খোলা, অন্ধকার। একটু পরেই, সেখানে বাবার ছাত্ররা আসতে আরম্ভ করবে। চট মাদুর পাতাই আছে। ছেলেরা এলে শুভা বাতি জ্বালিয়ে দেবে। বাবা একটু বেরিয়েছিল। ফিরে আসবার সময় হয়ে এসেছিল প্রায়।

সেই ফাঁকেই, শুভা ওদের সেকালের বাড়ির, পলেস্তারা খসে যাওয়া পুরানো

boiRboi.net

ইঁট বের করা থামের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। চারদিকটা অসম্ভব নিঝুম লাগছিল। ওদের বাড়ির সামনে তখনো কিছু ফাঁকা জমি ছিল। দু-চারটি গাছপালা সেই ফাঁকা জমিতে। তার ওপারেই, নতুন নতুন কয়েকটা বাড়ি উঠেছে। একটু দূরেই, শহরের বড় রাস্তাটা কতগুলো বাড়ির আড়ালে ঢাকা। সেখান থেকে মাঝে মাঝে সাইকেল-রিক্সার ভেঁপু বেজে উঠছিল।

ওদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো আসে নি। আশেপাশে দু'-একটা বাড়িতে এসেছিল। সেখানে আলো জ্বলছিল। কিন্তু শুভার চারপাশেই, ঘোর সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার। তখন ওর মনের অবস্থাটা যেন কোন এক অতল গভীরের অন্ধকারে ডুবে গিয়ে, থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সেইদিনই নতুন নয়। প্রায়ই ওরকম হত। বিশেষতঃ সন্ধ্যার ঝোঁকে, যখন চারদিক চুপচাপ হয়ে যেত, কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যেত না, তখন যেন, সংসারের সব কিছুর নীচে, সহসা ও ডুবে যেত। কোথায় তলিয়ে যেত। তারপরে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হঠাৎ থমকে দাঁড়াত। কোথায় এল, কেন এল, কোথায় যাবে, কিছুই বুঝতে পারত না। একটা শিরশির করা ভয় ওর শিরদাঁড়ার কাছে যেন তিরতির করে কাঁপত। বুকের কাছে কেমন একটা যন্ত্রণার মত হত। মনে হত, কেঁদে ফেলবে কিন্তু কান্না পেত না। তার ভিতরটাই যেন একটা বাতাসহীন অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে থাকত।

বারান্দার সামনে রাস্তাটায় দূর থেকে কে যেন হেঁটে আসছিল। চোখ না ফিরিয়েও একটা মূর্তির হেঁটে চলা টের পাচ্ছিল। পাড়ারই কেউ হবে, এই ভেবেছিল। হয়তো হালদারদের বাড়ি পুজো করতে যাচ্ছে গাঙ্গুলী-খুড়ো। সে সময়েই তার যাবার কথা। নারায়ণ মিত্তির হয়তো বাড়ি ফিরছে। এমনি দু'-একটা কথা ভাসা ভাসা মনে হয়েছিল। তার বেশী কিছু না। মূর্তির দিকে সে ফিরেও চায় নি।

মূর্তি শুভাকে পার হয়ে, কয়েক পা গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে শুভা নাকি?'

শুভা চমকে উঠেছিল। কেন যে এত চমকে উঠেছিল, শুভা জানে না। ও যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। আর সেই যে একটা শিরশির করা ভয়ের ভাব, সেই ভাবটা যেন ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছিল। যেন ওর গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। গলার স্বরটা সেই মুহূর্তে ওর চেনা মনে হয় নি। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে চলে যাবার জন্যেই, একবার নড়ে উঠেছিল।

তখন গলার স্বর আর একবার শোনা গিয়েছিল, 'শুভা নাকি রে?'

শুভা বুঝতে পারছিল গলার স্বরটা তারকদার। তবু, এমন অপরিচিত অচেনা মনে হয়েছিল, জবাব দিতে পারে নি। হঠাৎ এত ভয় পেয়েছিল কেন, অবাকই বা হয়েছিল কেন, আজও শুভা বুঝতে পারে না। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই গলার স্বরের মধ্যে, ওর বর্তমানের নিয়তির ডাক শোনা গিয়েছিল। তখন বুঝতে পারে নি। কিন্তু সেই ঘোর সন্ধ্যায়, তার নিয়তিই, সেই অস্পষ্ট এক মূর্তিকে সামনের রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাকে ডাক দিয়ে, প্রথম এই জীবনের

boiRboi.net

হাতছানি দিয়েছিল। হাতছানির ভাষা আর ভঙ্গিটা ছিল অন্যরকম। তাকে ঠিক চেনা যায় নি।

তারক আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'শুভাই তো মনে হচ্ছে, না কী ?'

শুভা তখন জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ আমি।'

'আমি ভাবলাম, এমন অন্ধকারে কে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। শৈলেনকাকা বাড়ি নেই ?'

'না, একটু বেরিয়েছে। বাবা এখুনি ফিরবে। কিছু বলছিলে ?'

'না। এমনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ, তাই।'

তারক চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। শুভার মনে হয়েছিল, একটু বসতে বলতে হয়। কিন্তু বলতে পারে নি। বাবা নেই, মা গা ধুতে গিয়েছিল। তারকদাকে বসতে বলে, সে কী করবে ? কী কথা বলবে ? মা-ও হয়তো অসন্তুষ্ট হবে। কী না কী ভেবে বসে থাকবে।

কিন্তু তারকদা যায় নি। যাবার জন্যে ফিরেও আবার দাঁড়িয়েছিল। অনেকটা নিজের মনেই বলেছিল, 'কত বাড়ি যে হয়ে যাচ্ছে এ-পাড়ার দিকে। আমাদের এদিকটাও রীতিমত শহর হয়ে গেল।'

শুভা যেন সে কথার কী জবাব দেবে, ভেবে পায় নি। অথচ চলে যেতেও পারছিল না। সে সময়েই মায়ের গলা শোনা গিয়েছিল, 'কে রে ওখানে. কার সঙ্গে কথা বলছিস ?'

শুভা জবাব দেবার আগে, তারকই বলেছিল, 'আমি কাকীমা, আমি তারক।'

মা-র গলায় সঙ্গে সঙ্গেই আপ্যায়নের স্বর বেজে উঠেছিল, 'অ। তা বাবা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? উঠে এস, বস। কলকাতা থেকে কবে এলে ?'

'আজ সকালেই। কাল সকালেই আবার যাব।'

তারকদা উঠে এসেছিল। শুভার মনে হয়েছিল, তারকদা অন্ধকারেও তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। মা বলেছিল, 'শুভা, বাতি জ্বেলে দে।'

শুভা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে বাইরের ঘরে এসেছিল। সেখানে তারক বসেছিল। বাতিই আলোয়, তারকের চোখের দিকে তাকিয়েই. হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠেছিল। তারকদা ওর দিকে, অপলক চোখে তাকিয়েছিল ঠোঁটের কোণে একটু হাসি, চোখে মুগ্ধতা। সে চাউনি একেবারে অচেনা নয় শুভার কাছে।

কিন্তু তারকদার কাছ থেকে কোনদিন, সে দৃষ্টি আশা করে নি। সেই মুহূর্তে মনটা গুটিয়ে বিমুখ হয়ে উঠেছিল। লজ্জাও পেয়েছিল। তারকদা বলে উঠেছিল, 'তুমি কি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলে ?'

শুভা অবাক হয়ে বলেছিল, 'না তো।'

'আমি ভাবলাম, তুমি কারুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ। যে ভাবে চুপ করে ছিলে, যেন ভয় পেয়েছিলে বা লজ্জা হয়েছিল···"

কথাটা যেন শেষ করে নি। একটা জিজ্ঞাসা, কথার সুরে উহ্য ছিল। তখনো তারকদা তাকিয়েছিল শুভার দিকে। মুগ্ধতার মধ্যে একটা অনুসন্ধিৎসাও ছিল চোখে।

boiRboi.net

কথাটা শুনতে শুনতে, হঠাৎ যেন লজ্জাতেই শুভার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কথাটা ভেঙে না বললেও, ও বুঝতে পেরেছিল, তারকদার আসল প্রশ্নটা কী। কোন ছেলের অপেক্ষায়, শুভা দাঁড়িয়েছিল কি না, সেটাই তার জিজ্ঞাস্য ছিল। শুভা হঠাৎ মুখে আঁচল চেপেছিল। হাসি পায় নি। যেন মুখটাই ঢাকতে চেয়েছিল। একটু পরে বলেছিল, 'না কারুর অপেক্ষায় দাঁড়াই নি।'

কথাটা বলার পরে, তারকদার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আর একই সঙ্গে, ওর মনের কোথায় একটা স্তব্ধ ধারার উৎসমুখ যেন সহসা খুলে যাচ্ছিল। তারকদার চোখের দিকে চেয়ে, যত অবাক হচ্ছিল, কৌতূহল বোধ করছিল ততই যেন, একটা খুশির ধারা গলতে শুরু করেছিল।

মায়ের কথায়, তারকদাকে চা করে দিয়েছিল শুভা। একটু পরে বাবা এসেছিল। বাবার সঙ্গে দু'-চার কথা বলে, চলে যাবার সময়ে, শুভার দিকে কেমন একরকম করে যেন তাকিয়েছিল তারকদা। যেটা বিশ্বাস করতে বাধছিল, অবাক লাগছিল। অথচ ছেলেদের সেই চাহনিটা মেয়েরা কখনো ভুল বোঝে না।

পরের দিন দুপুর ঘেঁষে, আবার তারকদাকে আসতে দেখে, শুভা চমকে উঠেছিল। অবাক যত হয়েছিল, একটা সন্দেহও মনের মধ্যে কূট প্রশ্ন তুলেছিল। আর একই সঙ্গে লজ্জাজড়িত সংশয়ে কেমন যেন থমকে গিয়েছিল। প্রশ্নটা মনে জেগেছিল, কারণ সেইদিন সকালেই তারকদা কলকাতা চলে যাবে বলেছিল। অথচ যায় নি। আগের দিন রাত্রি থেকে, অনেকবারই তারকদার সেই মুগ্ধ কৌতূহলিত দৃষ্টির কথা শুভার মনে পড়েছে। পরের দিন, দুপুর ঘেঁষে, তারকদার আসবার কয়েক মুহূর্ত আগেও সেকথা মনে পড়ছিল।

সে জন্যেই শুভা চমকে উঠেছিল। কেঁপে উঠেছিল বলা যায়। একটা লজ্জাজড়িত সংশয়ের কারণ ছিল এই ভেবে, শুভার দিকে আবার তেমনি করে তাকাবার জন্যেই কি তারকদা, কলকাতায় না গিয়ে ফিরে এসেছিল।

তখনকার মত, সেকথা জানবার উপায় না থাকলেও, আগের দিনের মতই তারকদা তাকিয়েছিল। আবার শুভার বুকের মধ্যে রক্ত চলকে উঠেছিল। অবাক হয়েছিল। ইচ্ছে করে, মনে মনে খুশি হওয়া যায় না। ও চাক বা না চাক, মনে মনে খুশির ঢেউও লেগেছিল।

তারকদা জানিয়েছিল, প্রায় দুপুরে অসময়ে আসার কারণ আর কিছু নয়। বলেছিল সকালেই কলকাতা চলে যাবে। যায় নি। তাই বলতে এসেছিল। মিথ্যে কথার যুক্তিটা তেমন প্রবল হয় নি। কারণ, তার মত লোক যদি একটা কথা বলেই থাকে, কৈফিয়ৎ দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে যে, কলকাতায় যায় নি বলে, আবার দেখা করতে এসেছে, তাতেই শৈলেন মাস্টারের পরিবার অনেকখানি কৃতার্থ হয়েছিল। এবং শুভার মা যে বেশ খুশি হয়েছিলেন, তাও বোঝা গিয়েছিল। মা তারকদাকে বাবা বাছা করে বসিয়েছিল। শুভাকে চা করে দিতে বলেছিল। বাবা তখন ইস্কুলে গিয়েছিল।

তারকদা বাড়ির সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে বোনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও সে একই দৃষ্টিতে অনেকবার শুভার দিকে তাকিয়েছিল। ব্যাপারটা

boiRboi.net

নতুন বলেই বিস্ময়ের। বিস্ময়ের সঙ্গে, থেকে থেকেই লজ্জার ছটায়, শুভার মুখের রং বদলে যাচ্ছিল। অথচ কেমন যেন একটা বিরক্তি এবং রাগে, মনে মনে হাসিও পাচ্ছিল। এ আবার কী অদ্ভুত রঙ্গ! এরকম মনে হয়েছিল শুভার। কখনো বা একটা উদাসী ভাবও সমস্ত ব্যাপারটাকে যেন তুচ্ছ করে দিচ্ছিল। কত ছেলেই তো এমন মুগ্ধচোখে তাকিয়েছে, হেসেছে, কৌতূহলিত হয়ে শুভার ভিতরটা দেখতে চেয়েছে। তারকদাও সেইরকমই। এতেই বা কী আসে যায়।

এসে গিয়েছিল। সেবারে তারকদা সাতদিন গ্রামেই ছিল, কলকাতায় যায় নি। প্রতিদিন শুভাদের বাড়ি যেত। কোন কোনদিন দু'বেলাই। এবং সেবারেই শেষ দিনে, রাত্রে শুভাদের বাড়ি থেকে চলে আসার সময়, তারকদা অন্ধকার আড়ালে পেয়ে, শুভাকে শুধু বলেছিল, 'আমার যে কী হল, তা জানি নে। এবার আর কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করছে না। কেন বল তো?'

শুভা অনেকটা অবুঝের মতই বলেছিল, 'কেন?'

তারক শুভার হাত ধরেছিল। বলেছিল, 'তুমি জান না, কেন?'

আর জবাব দিতে পারে নি শুভা। কিন্তু তারকদার হাত ধরা, গলার স্বর ও সুর কোন বোঝা-ই বাকী রাখেনি। তারকদা তখনই শুভাকে কাছে টেনে মুখ নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। শুভার পক্ষে, তারকদার সঙ্গে এতটা পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে, ও ঘাড় হেঁট করে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

★

কিন্তু সে মুখখানি তুলতে, শুভার বেশি দেরি হয় নি। তারপরে, তারকদা প্রতি সপ্তাহেই কলকাতা থেকে এসেছে। এলেই, শুভাদের বাড়ি। তারকদার আসাটা যেন ছিল, গঙ্গার বান ডাকা জোয়ারের মত। প্রবলবেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাসিয়ে দেবার মত। সব দিক থেকে, সকলের দিক থেকেই। বাবা মা খুশি হত। ভাইবোনেরাও। কারণ তারকদার হাতটা দরাজই ছিল সকলেরই জন্যে। প্রথম প্রথম শুভার লজ্জা করত। কোথায় যেন আটকাত। কিন্তু ব্যাপারটা, সবটুকুই তার নিজের হাতে ছিল না। অন্যদের ইচ্ছাটাও কম ছিল না।

আর তারকদার চলে যাওয়াটা ছিল, ভাঁটার টানে ঢল নেমে যাবার মত। যেন, দু'পার জুড়ে কেবল পলি পাঁকে জল নেমে যাওয়া শূন্যতা।

এই জোয়ার-ভাটার টানের অনুভবটা, শুভার মনে এসেছিল বেশ কয়েক মাস পরে। তার মধ্যে অনেক জল এসেছিল, গিয়েছিল। কবে যেন, সেই যাওয়া আসার মধ্যে, নিজের ইচ্ছা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষাগুলো মেশামেশি হয়ে গিয়েছিল। দু'-জনের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সেই ঘনিষ্ঠতার প্রতিটি মুহূর্তেই, শুভার চোখের সামনে কলকাতার হাতছানি ভেসে উঠেছে।

হাতছানি শুধু চোখে নয়। হাতছানি নানা সুরে বেজেছে মনে মনে। নানা তরঙ্গে ঢেউ দিয়েছে রক্তে রক্তে। কলকাতায় চল, কলকাতায় চল। সেখানে অনিশ্চয়ের সকল নিশ্চয়তা। সব কিছুরই মুশকিল আসান। বিবাহ, সংসার। শান্তি, ভালবাসা, নিজের ঘর, প্রেমিক স্বামী। অভাব অনটনের কোন প্রশ্ন নেই।

তখনই কেন বিয়ের কথা তারকদা বলছিল না?

boiRboi.net

বলা সম্ভব ছিল না। সেটাই সব থেকে আশ্চর্য। মানুষের কত যে মন। যতই দিন যাচ্ছিল, শুভা যতই তারকদার ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, ততই বাড়ির আবহাওয়া যেন বদলাতে আরম্ভ করেছিল। তলে তলে, কোথায় যেন একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। অথচ প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, তারকদাকে নিয়ে কারুর মনে কোন দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নেই।

কিন্তু ছিল। জাতের কথা উঠেছিল। শুভারা কায়স্থ, তারকদা তার চেয়েও ছোট। যদিও, জাতের কথাটা, আগে কখনো কারুর মনে হয় নি। শুধু তার টাকা, কলকাতার অদৃশ্য আশ্চর্য জীবনের কথাই মনে হয়েছিল। তা হোক, তবু তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো যায় না। অতএব প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। বাবা মায়ের মুখে ক্রমে তারকদার সম্পর্কে কটু কথা শোনা যাচ্ছিল। বাড়িতে আসা অপছন্দ হয়ে উঠছিল।

কিন্তু, শুভা যে তখন অনেক দূর ভেসে গিয়েছে। তারকদাকে কতখানি ভালবেসেছিল, সেটা যাচাই করতে পারে নি। জীবনের একটা স্বাদ বদল হয়েছিল। অন্তঃহীন নিরাশার মধ্যে, আশা পেয়েছিল। বাবা-মা সংসার, কোন কিছুর প্রতিই ওর আর সে মূল্যবোধ ছিল না। নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত জীবনের চিন্তাই, রঙীন স্বপ্নের মত ওকে ঘিরেছিল। তার নামই ভালবাসা ওর কাছে। জাতের বিচার করে কী লাভ। বাড়ি থেকে যদি বিয়ে দেওয়া না হয়, তবে পালিয়ে গিয়েই করতে হবে।

নদীতে টান ছিল। ঘাটের খুঁটিতে যার জোর নেই, মাঝি নেই যে নৌকোর, একটা অশক্ত দড়ির টানে কতদিন আর সে-নৌকা ঘাটে থাকে। একদিন তার নোঙর ছিঁড়ে যায়। যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার সঙ্গেই ভাসে। শুভার ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকমই। তবু তো এক কূল ভেঙে, আর এক কূল গড়ে উঠবে। কোন কূল না-থাকার থেকে, যে-কোন একটা কূল থাকা ভাল। শুভা তারকদার সঙ্গে পালানোই স্থির করেছিল। কারণ, পালানো মানেই বিয়ে। বিয়ে মানেই, স্থিতি। একটি মেয়ের, একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ের সকল উদ্বেগের অবসান। ঘর, সংসার, নিরাপত্তা। তাও, তারকদার মত লোকের সঙ্গে, কলকাতার সেই আশ্চর্য নায়কটি।

নরেশও শুভাদের গ্রামেরই মানুষ। তবে, নরেশের দেখা পাওয়া যেত কালে ভদ্রে। সেখানে সে পারতপক্ষে যেতই না। তারকদার সঙ্গেই তাকে কয়েকবার গ্রামে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তারকের সঙ্গে যে নরেশের সম্পর্কটা কী, কেউ-ই সঠিক জানত না। নরেশের সম্পর্কে সবাই জানত, সে কলকাতায় বড় ব্যবসা করে। গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। গ্রামের লোক কাউকে কখনো সে ডেকে কথাও বলত না। গ্রামে সে অনেকটাই বিদেশী। এখানকার মানুষেরা, অনেকে তাকে চেনেই না।

শুভাও সেরকম কিছু চিনত না। তারক তাকে যখন এখানে এনে তুলেছিল, তখনই একমাত্র জানতে পেরেছিল, দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শুধু তাই-ই নয়। তারক নরেশের ঘাড়ের বোঝা।

boiRboi.net

বিয়ে? স্বামী ঘর সংসার নিরাপত্তা? দাঁড়া, ওরে মুখপুড়ি মেয়ে, একটু দাঁড়া, একটু থাম্। এক নিশ্বাসে, ওই শব্দগুলো এমন করে উচ্চারণ করিস নে। সংসার কি তোকে এটুকু শিক্ষাও দেয় নি? শব্দগুলো যত সহজে উচ্চারণ করা যায়, জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রাপ্তি একেবারে কানাকড়ি।

★

কোথায় যেন পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে, এক দুই তিন। বাইরে ঠাণ্ডার রাত্রি হিমে জড়োসড়ো, কাঁপে। অনেকে ঘরে, গরম বিছানার ঢাকায় ওম্ করে। পাশের ঘরে, কেবল মাত্র দ্রব্যের উষ্ণতায়, নরেশও ঘুমায়। আর এঘরে, একটা সামান্য মাদুরের ওপরে শুয়ে, শুভা এপাশ ওপাশ করে। ওর শীত করে না। কঠিন মেঝেতে লাগে না। পুরানো চিন্তা, নতুন জীবন, পিছনে অন্ধকার, সামনে অন্ধকার, সব মিলিয়ে ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকে।···

এখানে এসে, মাত্র সাত দিনের মধ্যে ও জানতে পেরেছিল, তারক একটা শূন্য, তার কিছুই নেই। নানান জনের, নানান ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে, তার বৃত্তি একমাত্র উঞ্ছবৃত্তি। বন্ধুদের করুণা আর দয়াই তার সম্বল। এমন কি, একটা বাঁধা মাইনের চাকরি পর্যন্ত নেই লোকটার। জামা কাপড় বাসস্থান, সবই পরের করুণা।

কলকাতায় আসার পরে, কয়েকদিন বন্ধু-বান্ধব পরিচয়, খানাপিনা, গাড়ি চড়া, বেড়ানো, সিনেমা থিয়েটার দেখা, সবই বন্ধুদের দয়ায়। সে সব বন্ধুরাও, বিচিত্র অস্পষ্ট সব লোক। কার যে কী কাজ, কার যে কী ব্যবসা, কিছুই বুঝতে পারত না শুভা। আজও বোঝে না। এমন কি, এতদিন হয়ে গেল, ও আজও জানে না, নরেশের কী কাজ, কীসের ব্যবসা। এত টাকা তার কোথা থেকে কী উপায়ে আসে।

তবে, এইটুকু শুভা বুঝেছিল, ন্যায়ের পথে, পরিষ্কার কিছু নেই ওদের। ওরা সবাই কলকাতা শহরের, এক ভিন্ন জগতের লোক। কিন্তু, তারকদা পুরোপুরি সেই জগতের লোকও ছিল না। তার জগৎটা, সবটাই পরের মুখাপেক্ষী। একেবারে সম্পূর্ণ দায়দায়িত্বহীন, এক ধরনের বেকার ভবঘুরে বলা যায়।

তবু যেন, একটু ভাল। অন্য জগতের পুরোপুরি বাসিন্দা হাওয়ার থেকে, তাও যেন ভাল। নরেশদের সঙ্গে, কোন সম্পর্ক না থেকে, যদি সাধারণ একটা বেকার ভবঘুরে লোক হত, তাতেও যেন ভাল ছিল। কিন্তু, তারকদাকে যতটুকু শুভা চিনতে পেরেছে, তাতে বুঝতে পেরেছে, এ জগৎ, কোন কিছুরই প্রতি, তার সঠিক কোন টান নেই। কখনো কখনো এক একটা ঝোঁক আসে। সেই ঝোঁকের টাল খেয়ে, যেদিকে যতক্ষণ গড়িয়ে চলে। ঠেকে গেলেই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, আবার অন্য আর একদিকে যাত্রা শুরু। শুভাও তেমনি একটা ঝোঁকের টানে গড়িয়ে যাবার সীমা।

তবু একটু থমকে যেতে হয় শুভাকে। এ কথা কি, সবটুকু সত্যি? তারকদা কি ওকে একটু ভালবাসে নি? কতদিনের কত কথাই যে মনে পড়ে যায়। ছোটখাটো অনেক ঘটনা। সে সবই কি মিথ্যা? এমন তো কখনো মনে হয় নি, তারকদা ওকে ছেড়ে যেতে চায়। তাকে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। নরেশ ক্রমে ক্রমে বিরক্ত

boiRboi.net

হয়ে উঠছিল। প্রথম প্রথম, হেসে বিদ্রূপ করত তারকদাকে, 'রাজকন্যে তো নিয়ে এলি, তোর রাজত্ব কোথায় ?' তারপরে হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা। বিদ্রূপ ক্রমে রাগে পরিণত হয়েছিল। রাগের সঙ্গে বিদ্বেষ। বিদ্বেষের মধ্যে ঈর্ষা। ঈর্ষার সঙ্গে ঘৃণা।

তারপরে আর তো কোন ঢাকাঢাকি আড়াল থাকতে পারে না। নিজেকে একবার প্রকাশ করে ফেললে, আর কোন কিছু দিয়েই তা গোপন করা যায় না। নরেশ সে জাতের লোকও নয়। তখন তারকদাকে একটা শর্তে আসতে হয়েছিল। সে চলে যাবে চাকরির খোঁজে। মাসখানেকের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করে, বাসা ভাড়া করে, শুভাকে নিয়ে যাবে।

শুভা ভয় পেয়েছিল। তবু রাজী হয়েছিল থাকতে। রাজী না হয়েই বা কী উপায় ছিল ওর। তারকদা চলে গিয়েছিল। একমাস কবেই পেরিয়ে গিয়েছে। তারকদা আসে নি। একটা খবরও পাঠায় নি। আর কোনদিন ফিরে আসবে বলেও বিশ্বাস হয় না।

তবে আর শুভার মন থমকায় কেন? তারকদার সবটুকু মিথ্যা বা সত্যি এ বিষয়ে ভেবে লাভ কী। আগাগোড়াই যার মিথ্যা, তার সম্পর্কে কিছু ঘটনা নিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। অসহায় ভেবে হয়তো একটু করুণার উদ্রেক হয়। কিন্তু তারকদা অসহায় নয়। ওটাই তার চরিত্র। দায়-দায়িত্বহীন ভেসে চলা মানুষ। নিজের জীবনের প্রতিও বোধহয় তার কোন টান নেই। মানুষে কোন কিছুরই স্থিরতা নেই। নরেশের অপমানে, তার যদি সে আত্মসম্মানবোধ থাকত, শুভার প্রতি টান থাকত, শুভার অসম্মানের উদ্বেগ থাকত, তাহলে যেখানেই হোক শুভাকে নিয়ে যেত। এ ভাবে ফেলে যেতে পারত না।

না, তারকদা পর্বটা শুভার জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুভার আর কোন আশা নেই। বরং আজ শুভা নিজেকে ভয়ে ও দ্বিধায়, মনে মনে জিজ্ঞেস করে, সে নিজে কি তারকদাকে ভালবেসেছিল? বাবা মা ভাই বোন সব ছেড়ে চলে আসার মধ্যে কি ভালবাসাই ছিল? না কি, চারদিকে হতাশার অন্ধকার থেকে, ছুটে এসেছিল একটা ঠিকানাহীন আলোর পিছনে। যে আলো আলেয়া কী না, সেটা পর্যন্ত লোভী অবুঝ মন, পরখ করে দেখবার অবকাশ পায় নি।

এখন নিজেকেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। এমন করে, নিজের মুখ সে কী করে পোড়াল। এখন, এই অন্ধকার ঘরে, চোখের জলের কী মূল্য। সামনে অথৈ অন্ধকার পাথার। চোখ ভিজে, বুক ভেসে গেলেও, দুঃসীম পাথারের কোন কিনারা মিলবে না। মুখে যতই তর্জন-গর্জন করুক, নরেশের এই আস্তানা ছেড়ে বেরুবার আগে, ওকে আরো হাজার-বার ভাবতে হবে।

নরেশের নাক ডাকার শব্দ এখনো সমানে চলেছে। শুভা জানে, নরেশের এটা ঠিক ঘুম নয়। নেশায় অচেতন হয়ে আছে সে। নেশা ভেঙে গেলে, একবার সে জাগবে।

তার মুখটা মনে করে, শুভা আবার ঘৃণায় শক্ত হয়ে ওঠে। না হাজার বার ভেবেও, এখানে শুভার সম্ভব নয়।

boiRboi.net

অথচ, এ কথা সত্যি, তারকদা চলে যাবার পরে, এক মাস পর্যন্ত নরেশ শুভার সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার করে নি। এক মাস ধরে, সে-ও যেন তারকদার ফিরে আসবার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। তারপর যতই দিন গিয়েছে, ততই নরেশের চেহারা বদলেছে। ভাব ভঙ্গি ভাষা বদলেছে। শুভা জানত, নরেশ কী চায়। নরেশের বিষয়ে কিছু কিছু কথা সে শুনেছিল। নরেশের নিজের মুখ থেকেই শুনেছিল। এমনি স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। মাতাল অবস্থায়, নরেশ দুঃখ করে জানিয়েছিল, তার বউ তাকে কী ভাবে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। বলেছিল, 'দেখ শুভা আমাদের কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়। আমার না, তারকেরও না। তারকের হয়তো পয়সা-কড়ি নেই। আমার তো তা বলা চলবে না। বাড়ি হয়তো করি নি। করতে পারি যে-কোন সময়েই, সে টাকা আমার আছে। গাড়ি আছে আমার। এ পাড়াতে ভাল ভাড়া দিয়েই থাকি। তবু বউ থাকল না। থাকবে কেন বল? সৎভাবে ব্যবসা করি না, সব সময়েই একটা লুকোচুরির খেলা। কখন কী ভাবে কোথায় ধরা পড়ে যাই। অবিশ্যি, সে জন্যে লোকজন সবই আছে। তবু একটা ভয়ে ভয়ে থাকি। তাতে যে ধকল যায়, মদ না খেয়ে পারি না। তাও কি একটু আধটু। দেখতেই তো পাচ্ছ। আমাদের বন্ধু-বান্ধবও ভাল নয়। সবাই সবাইকে টেক্কা মারবার জন্যে সব সময়ে চেষ্টা করছে। আমাদের মত লোকদের ঘরে কখনো বউ থাকে? আমরা কি সংসার করতে পারি? বন্ধুরাই ফুসলে ফাসলে, বউকে বের করে নিয়ে গেল। বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু করবার কিছুই ছিল না।'...

কথাগুলো শুনে শুভার কষ্টই হয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছিলে তো সাবধান হও নি কেন? কেন ভাল করে সংসার করলে না? চোর-ডাকাতেরও তো বউ-ছেলেমেয়ে থাকে।'

'থাকে, সেরকমই থাকে। তবে হ্যাঁ, আমাদের থেকে চোর-ডাকাতেরাও ভাল। রাহাজানি ফেরেববাজী তার চেয়ে খারাপ। যাদের মাল চুরি করি, তাদেরই আবার বিক্রি করি। ফলে অফিসারদের ঘুষ তো দিতেই হয়, যা চায়, তা-ই দিতে হয়। মদ মেয়েমানুষ পর্যন্ত। নিজেকেও ঘেন্না লাগে, ওদেরও ঘেন্না করি। সবাইকে শুধু ঘেন্নাই করি।'...

এরকম করে বললে, সে মানুষকে খানিকটা চেনা যায়। বোঝা যায়। নরেশের সেই চেহারাটা কিছুটা জানে শুভা। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, তারকদার ফিরে আসার আশা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, ততই সে অন্যরকম হয়ে যেতে লাগল। সে জন্যে যে নরেশকে খুব একটা দোষী ভাবা যায়, তা নয়। নরেশ যে রকম মানুষ তার যা চরিত্র, তাতে সে যে একমাসের ওপর ভাল ব্যবহার করেছে, সেটাই অনেকখানি। তারকদা চলে যাবার পরদিনই যদি সে শুভার ওপরে হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলেই বা বলার কী ছিল। সে ব্যবসায়ী হিসাবে দুষ্কৃতকারী, মাতাল, পাপের পরিবেশে ঘোরাফেরা করে, বউ পালিয়ে গিয়েছে। এমন লোক রাত্রে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে, রোজই একটি যুবতীকে দেখবে, অথচ তাকে পাবে না, এতখানি সহ্যসাক্তি তার নেই। বিশেষ, যে মেয়ের অবস্থা শুভার মত।

boiRboi.net

ক'জনেরই বা সে শক্তি আছে। মুখের কথা তো নয়। প্রতিদিনের ঘর করতে গিয়ে, সে শক্তির পরিচয় হয়তো অনেকেই দিতে পারবে না। নরেশ তো কোন ছার।

কিন্তু শুভা তা কোনদিনই হতে দিতে পারবে না। তারকদা হয়তো তাকে ঠকিয়েছে। কিংবা, তার হতাশার বেড়াজাল থেকে, ভুল ঠিকানায় দৌড় দেবার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। তবু, নিজেকে তো সে একটা দেহোপজীবিনী মাত্র ভাবতে পারে না। নরেশের দাবি সে কোনরকমেই, কোনদিন মেটাতে পারবে না। অতএব—

'এই শুভা, শুভা!'

পাশের ঘর থেকে নরেশের গলা শোনা যায়। ঘুম ভাঙা মোটা গলা। কিন্তু মত্ততা তেমন নেই। নেশার ঘোর কাটল এতক্ষণে। কখন তার নাক ডাকানো থেমেছে, টের পাওয়া যায় নি।

দরজায় শব্দ হল। জোরে নয়, আস্তে আস্তে। এ নরেশ, ঠিক সে নরেশ নয়। ডাকল, 'শুভা, আমি জল খাব, দরজা খুলে দাও।'

শুভা উঠল না। কোন জবাবও দিল না। নরেশ যদি বুঝতে পারে, শুভা জেগে আছে, তাহলে দরজা খোলাবেই। ও ঘরেও জল আছে। বাতি জ্বাললেই জল পাবে।

কয়েকবার দরজায় ধাক্কা পড়ল। ডাকাডাকি করল। তারপরে নিজের মনেই বলল, 'ধ্যাৎ, আমার আর এসব ভাল লাগে না। কিছু শালা মনেও করতে পারছি না। এবার আমিই চলে যাব এখান থেকে...।'

পাশের ঘরে গলার স্বর থেমে যায়। আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। যাবেও না। এখন নরেশ শুয়ে পড়বে। এবং আবার আগামীকাল রাত্রের আগে, কোন গোলমাল চিৎকার মাতলামি কিছুই হবে না। নরেশ সকালবেলা চা খেয়ে সেই যে বেরিয়ে যাবে, আর ফিরবে রাত্রে। সকালবেলা সে বিশেষ কোন কথা বলবে না। বড় জোর, 'তারকের কোন খবর পেলে?' এ কথা জিজ্ঞেস করবে। কিংবা, গম্ভীর হয়ে বলবে, 'কী যে করা যায়, আমার মাথায় কিছু আসছে না।' অথবা, 'আরে আমি তো একটা মাতাল লোক, আমার কাছে এ ভাবে দিনের পর দিন থাকবেই বা কেমন করে!'

ঠিক চলে যেতে বলে না। অথচ, একরকম তাই বলে! তার কথার ভাবের মধ্যে, ইঙ্গিত পরিষ্কার। হয় নরেশের রক্ষিতা হয়ে শুভা থাকুক, না হয় চলেই যাক। তবে, সকালবেলা নরেশ একেবারে শান্ত গম্ভীর ভদ্রলোক।

শুভা এখন একটা ব্যাপার বুঝতে পারে। প্রতিটি সকালেই, ওই ধরনের কথা বলে, নরেশ যখন বেরিয়ে যায়, সে একটা আশা নিয়ে যায়, শুভা হয়তো তার কথায় সম্মত হয়েছে। এই আশা নিয়ে যায়, সারাদিন সেই আশা, নানান কল্পনায়, আকাঙ্ক্ষাকে আরো উদগ্র করে তোলে। পেটে মদ পড়ে, সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে, মত্ত হাতীর মত এসে দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ অবস্থায়, নরেশের বাসা ছেড়ে চলে যাওয়াই সব দিক থেকে উচিত। উচিত—

boiRboi.net

কিন্তু, কোথায় ? সত্যি কি বাড়ি ফিরে যেতে পারে শুভা।

নিজের মনেই ঘাড় নাড়তে থাকে ও। না না, আর কোনদিনই না। তারকদা ওকে বিয়ে করে, আধপেটা খাইয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে রাখলেও, বাবা-মাকে মুখ দেখাবার একটা সম্ভাবনা ছিল। তাতেও সম্মান ছিল। আজ যদি ও বাড়ি ফিরে যায়, কী পরিচয় নিয়ে যাবে ? ও কে ? ওর কী পরিচয় ? শৈলেন মাস্টারের মেয়ের পরিচয় অনেকদিন আগেই হারিয়েছে। অথচ নতুন কোন পরিচয়ে ওর নবজন্ম হয়নি। ও কি একটা স্বেচ্ছাচারিণী মাত্র ? স্বৈরিণী ? তবে বাড়িতেই বা ঠাঁই হবে কেন ?

তবে কোথায় যাবে শুভা। ঘরের অন্ধকার যেন দুলে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে, আর একটা অন্ধকারের হাঁ যেন ওকে গিলতে আসে। মৃত্যু। তারই হাতছানি সেখানে। গলায় দড়ি দিয়ে, গায়ে আগুন লাগিয়ে, যেভাবে হোক, সেই একটা জায়গাই এখন আছে। সেখানে গিয়ে, শুভার সব কিছু শেষ হতে পারে। সেটা কি এমনই কঠিন।

দু'হাত দিয়ে মাদুরটাকে আঁকড়ে ধরে, বুক চেপে, অন্ধকারের গভীরে, নিজেকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় যেন ঝুলতে দেখে। ওর শেষ ছবি।...তবু জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে, চোখের কোল ভেসে যায়। একটা কোন মুখও যেন ওর এখন আর মনে পড়ে না।

★

কলিং বেল বেজে উঠতেই, শুভার ঘুম ভেঙে গেল। এত সত্ত্বেও, এ পোড়া চোখে, এখনো ঘুম আসে। মরার কথা ভাবতে ভাবতেই, কখন ঘুম এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তবু যদি একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, আর ঘুম না ভাঙত। তেমন ঘুম কি আসে না একবার।

কিন্তু বসে থাকা চলে না। ঝিটা এসেছে। সে-ই কলিং বেল বাজিয়েছে। অবাঙালী ঝি। সকালে বিকালে দুবার আসে। মধ্যবয়স্কা ঝিয়ের নাম বিহানী। কী তার মানে, কে জানে।

শুভা উঠে, মাদুরটা গুটিয়ে আলমারির কোণে রাখতে গিয়ে, আবার সেই রাত্রের পলাতকের কথা মনে পড়ে যায়। এখন যেন ও বিশ্বাস করতেই পারছে না, গত রাত্রে সত্যি একটা অচেনা লোক, একটা চোর ওখানে, ওর চোখের সামনেই লুকিয়ে ছিল। অথচ এখনো চোখের সামনে, লোকটা ভাসছে। কুড়িয়ে পাওয়া সেই অদ্ভুত লোহার জিনিটার কথাও ওর মনে পড়ে যায়। আবার কৌতূহলিত হয়ে ওঠে। জিনিসটা দেখতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু এখন আর সে সময় নেই। নরেশ চলে যাবে, ঝিও চলে যাবে, তারপরে আর একবার সেই জিনিসটা ও দেখবে। যদিও সত্যি জানে না, জিনিসটা কী বা ওটা কার। নরেশের না সেই লোকটারই।

শুভা মাদুরটা রেখে দরজা খুলে দেয়। বিহানী চকিতে একবার শুভার আপাদমস্তক দেখে নেয়। তারপরে, এ-পাড়ার আদব অনুযায়ী, কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করে। বলে, 'সেলাম মেমসাব।'

সম্বোধনটা শুনতে খুবই খারাপ লাগে শুভার। মেমসাহেব আবার কী! ছি! প্রথম প্রথম এরকমই মনে হত। অবাক লাগত, লজ্জা হত। ভাল তো লাগতই না, বরং শুভার চিরদিনের অন্য মনে, একটা সংশয় হত, এই ডাকের মধ্যে কোথায় একটা ইতরতার ইঙ্গিত রয়েছে যেন। এটা ওর কুসংস্কার বা যা-ই হোক, ভাল লাগত না। কিন্তু এখানকার আদব-কানুন আলাদা। শুভা শুনে গিয়েছে, মুখ ফুটে বলে নি কিছু। এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে শুনে। মনোভাবটা সেরকমই আছে। ও কেবল বলে, 'এস।'

ঝি ঘরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। যেন চোখের দৃষ্টিতে আর গন্ধে, সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে চায়! প্রথম যখন শুভা এসেছিল তখন এই বিহানী, কেমন একটা সন্দিগ্ধ কৌতূহলে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত। শুভার চোখে চোখ পড়ে গেলেই, চোখ ফিরিয়ে নিত। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। বিহানীর কথার মধ্যে, তখন একটা অশ্রদ্ধা থাকত। যদিও স্পষ্টভাবে নয়। কথাবার্তার ধরণ-ধারণ ছিল আলাদা। নোংরা ইঙ্গিতপূর্ণ। ঠিক শুভাকে নয়, অপরের তুলনা দিয়ে। যেমন সে বলত, 'আমার আর কী করবার আছে মেমসাব, খাঁচায় যখন যে চিড়িয়া আসবে, আমি তারই সেবা করব।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে ছিল না। শুভার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করত, নরেশের এই খাঁচায় কত পাখী বিহানী দেখেছে। কিন্তু কেনই বা জিজ্ঞেস করবে। শুভা তো নরেশের খাঁচার পাখী নয়।

তারপরে বিহানী, অনেকটা শুভার সইয়ের ভূমিকা নিতে চেয়েছিল। নানা রকম ঠাট্টা তামাশা হাসির গল্প বলত। অধিকাংশই এই পাড়ার গল্প, যে গল্প-গুলোর মধ্যে পরিবারের কেচ্ছা, মেয়েদের নোংরামি, পুরুষদের বদমাইসি। শুভা গা দিত না, এড়িয়ে যেত।

কয়েক মাস দেখে দেখে, বিহানী এখন অনেকটা সহজ হয়েছে। শুভার সম্পর্কে তার ধারণাটা কিছু পালটেছে। এখন সে জিজ্ঞেস করে, তারকদার কোন খবর এল কী না। আর নিজের পরিবারের কথা বলে। ছেলে মেয়ে—স্বামী সংসার। মাঝে মাঝে মেমসাবের জন্য তার মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে যায়। একটু ভয় ভয়ও লাগে। মেমসাব একটু হাসেও না। বিহানীর নিজেরও তো বড় বেটী আছে। সে এ পাড়ার আরো নানান গল্প বলে। পারিবারিক কেচ্ছা নয়। অন্যান্য গল্প। কার ছেলে হয়েছে, কে মারা গেল, কার বিয়ে হল। কাদের মারামারি, কোথায় গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে, এমনি বহুতর গল্প।

এখন বিহানীকে অনেক সহজ লাগে। শুভা নিজেও অনেকটা সহজ। সকালে বিকালে, দুবেলা সে আসে। বাসনপত্র পরিষ্কার করে, ঘর দরজা সাফ করে। ধোয়া কাচার কিছু থাকলে, ধুয়ে দিয়ে যায়।

বিহানী ঘরে ঢুকে, প্রথমেই দেখে নেয়, পাশের ঘরের দরজা এদিক থেকে বন্ধ। সে জানে, ভিতরে নরেশ আছে। এবার তাকেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে হবে। নরেশ যতক্ষণ এ ঘরে না আসছে, ততক্ষণ শুভা পাশের ঘরে যাবে না।

boiRboi.net

দরজাটা খোলবার আগেই, বিহানী বলে ওঠে, 'মেমসাব, কাল রাতে চোর এসেছিল জানেন ?'

'জানি।'

শুভা নিজের চোখে চোর পালানোর যে দৃশ্য দেখেছিল, বিহানীর কাহিনী তার চেয়ে অনেক বেশি লোমহর্ষক, আরো ভয়ঙ্কর। কারণ, চোরটা নাকি পিস্তলের গুলি ছুঁড়েছিল, এবং হাওয়া হয়ে যাবার মন্ত্রও জানে। শুধু হাওয়া হয়ে যাবার নয়, চাবি ছাড়াই, যে-কোন আলমারি খোলার মন্ত্রও জানে লোকটা। কলকাতার সেই চোরের নাম সবাই জানে। ওকে বলে 'তালাগুণীন'। অর্থাৎ সব তালাকেই যে গুণ করতে জানে। আজ পর্যন্ত তালাগুণীন মাত্র একবার ধরা পড়েছে। কিন্তু কলকাতায়, এখনো যে সব বড় কোম্পানির চাবি খুলে চুরি হয়, সবই তার কাজ, অথচ ধরা পড়ছে না। হাতেনাতে ধরা খুবই মুশকিল। চুরি হচ্ছে, অথচ চোর ধরা পড়ছে না। এতেই বোঝা যায়, লোকটা মন্ত্র জানে। তোমার সামনেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে, অথচ তুমি তাকে দেখতে পাবে না। বিহানীর মতে, চোরটা নিশ্চয়ই বিড়াল বা ইঁদুর বা চুঁহায় রূপান্তরিত হতে জানে। তা নইলে, একবারও ধরা পড়ছে না কেন। গতকাল রাত্রে তো সে স্রেফ চিড়িয়া হয়ে, আটতলা ছাদ থেকে উড়ে গিয়েছে।

গতকাল রাত্রে সে, 'ভোরা' ফ্ল্যাটে এসেছিল। ভোরারা খুব বড়লোক, তাদের সিন্দুকে মেলাই টাকা। কিন্তু তালাগুণীন একটা খবর জানত না, ভোরাদের সিন্দুকে চাবি ঘোরালেই টুং টাং করে বাজনা বেজে ওঠে। তাইতেই টের পেয়ে গিয়েছিল। সিন্দুক খোলাই পড়েছিল, কিছু নিতে পারে নি। তার আগেই পালিয়েছে।

বিহানী আরো খবর দিল এই চোর নাকি বছরে দু'বার চুরি করে। কখন কোথায় চুরি করবে, কেউ বলতে পারে না। কোথায় সে থাকে, তাও কেউ জানে না। সব থেকে মজা হচ্ছে, পুলিস কিছুতেই তার নামে কোন কেস দিতে পারছে না। প্রমাণ দিতে না পারলে, সাজা হবে কেমন করে।

অতএব, মেমসাব যেন খুবই সাবধান থাকে। দেবের কথা কিছুই বলা যায় না। শুভাকে সাবধান করে সে মাঝখানের দরজা খুলে দেয়। দেখা যায়, নরেশ তখনো শুয়ে আছে। শুভার চোখের ওপর ভেসে ওঠে, কাল রাত্রে দেখা সেই মুখ। সে কি তবে সেই তালাগুণীনের নাকি! লোকটা মন্ত্র জানুক বা না-জানুক, হাওয়া হতে জানে ঠিকই। যদি, এ লোকটাই সেই কাল রাত্রের পলাতক চোর হয়ে থাকে!

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার অবসর পাওয়া যায় না। বিহানীর কাজকর্মের সাড়া-শব্দে নরেশের ঘুম ভেঙে যায়। শুভা জানে, বিহানী ইচ্ছা করেই, কাজে কর্মে, জোরে শব্দ করে, যাতে তার সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। নরেশ উঠে বসে। একটু সময় চুপ করে বসে থাকে। তারপরে সোজা এ ঘরে চলে আসে। ঘরের এক পাশে দাঁড়ানো শুভার দিকে একবার মাত্র তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, বাথরুমে ঢুকে যায়।

boiRboi.net

শুভা জানে, এখন আর কোন সমস্যা নেই। সে পাশের ঘরে চলে যায়। নরেশ এখন স্নান করে, জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে যাবে। তার গাড়ির গ্যারেজ অন্য জায়গায়। একটু পরেই তার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে। আগে, বিহানীই সাহেবের চা-জলখাবার দিত। আপাততঃ শুভাই দেয়। শুভা সেই ব্যবস্থাই দেখতে যায়।

কিন্তু মনের ভিতরের, পথহীন অনির্দিষ্ট অন্ধকার পাক খেতেই থাকে। যদিও দিনের বেলা একরকম, রাত্রি আসে আর এক রকম ভাবে, তবু তার যোগসূত্রটা ছিঁড়ে যায় না। দিনের বেলা যা স্তব্ধ, রাত্রে তা-ই ভয়ঙ্কর শব্দে আছড়ে পড়ে। কোনটাই শুভার কাম্য নয়, সহ্যও হয় না আর। অথচ একটা ভয় যেন দূর থেকে স্থিরদৃষ্টি অজগরের মত ওকে সম্মোহিত করতে থাকে। নড়তে পারে না, পালাতে পারে না, ভিতরটা কেবল থরথর করতে থাকে। কী করবে, বুঝতে পারে না।

★

জলখাবার খেয়ে, বেরুবার আগে, নরেশ যেন একটু কৌতুহলিত গাম্ভীর্যে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, তারক কি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে?'

শুভা বলে, 'না।'

নরেশ শক্ত মুখে, চুপ করে ভাবে। তারপরে বলে ওঠে, 'তবু এত সাহস কী করে হয়।'

কথাটা যে কার সম্পর্কে বলে, কথার সুরে ঠিক বোঝা যায় না। যেন নিজের মনেই বলে। তারপরে মাথা নাড়ে নিজের মনে। চলে যেতে যেতে বলে, 'এভাবে আর চলে না।'

ঘরের কাজ-কর্মের পর, বিহানী বাজার করে দেয়। একলা শুভা রান্না করে, খায়ই কতটুকুই বা দরকার। ভাতে-ভাত হলেই চলে যায়। বিহানী আবার সেটা মেনে নিতে পারে না। সে একটু আনাজপাতি, মাছ, সবরকমই এনে দেয়। রাত্রে, নরেশের খাবারও তো করতে হয়। খাওয়া হোক বা না-হোক।

তারপরে সারাদিন ফাঁকা। ঘর দুটো প্রকাণ্ড। এত বড় ঘর এর আগে শুভা দেখে নি। আজকাল এরকম দুটো ঘরের মত জায়গায়, ছ' কামরার দশতলা বাড়ি করা যায়। এঘর থেকে ওঘর যেন অনেক দূর, দুটো আলাদা বাড়ির মত। শুভা রান্না করে, স্নান করে। যতটুকু ইচ্ছা করে, খায়। শুয়ে ঘুম আসে না। বাইরে যাবার কোথাও নেই। কোন জায়গা চেনে না। তারকদা থাকতে বেরিয়েছে। বেড়িয়েছে, সিনেমা থিয়েটার দেখেছে। নরেশের সঙ্গে কোনদিন তা যায় নি। বিহানী হয়তো কখনো কখনো বলেছে, তার সঙ্গে পার্কে ময়দানে বেড়াতে যেতে। তাও যায় নি। শুভার ভয়, বাইরে বেরুলেই অনেক চেনা লোকের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবে। কে কী বলবে, কোন জবাব দিতে পারবে না। নিজেকে সব সময়ে ওর লুকিয়ে রাখতেই ইচ্ছা করে। চেনা অচেনা, কাউকেই যেন এ মুখ আর দেখানো যায় না।

বিকালে এসে বিহানী কাজ করে চলে যায়। তারপরে, শুভা গিয়ে দাঁড়ায় সেই জানালায়।। সেখান থেকে উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িগুলোকে দেখা যায়। জানালায়

boiRboi.net

বারান্দায় লোক জন, অনেক দৃশ্য। কোন কোনদিন, বাইরের দরজা খুলে, বাঁ দিকে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ছাদেও ওঠে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। নিজেকে যেন হাটের মাঝে এসেছে বলে মনে হয়। তখন আশেপাশের সবাই তাকে দেখতে পায়। সেই হোটেল বাড়িটার নানা দৃশ্য চোখে পড়ে। আসলে, হোটেল নয়, মেয়েদের দেহ-ব্যবসায়ের আড্ডা। তাছাড়া আশেপাশের লোকজন এমন করে তাকিয়ে থাকে, যেন গিলে খাবে। তাই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে।

শুভা গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। শীতের দিন, অনেক আগেই বেলা চলে যায়। সব জায়গায় বাতি জ্বলে উঠেছে। ছবির মত নানা দৃশ্য দেখতে থাকে। আবার সেই মধ্যরাত্রের প্রতীক্ষা। সেই মার্তণ্ডের আবির্ভাব। দু'হাত বাড়িয়ে, শুভাকে অন্য জীবনে টেনে নিয়ে যাবার সেই বীভৎস আকাঙ্ক্ষা হাঁ করে আসবে। কিন্তু কই, রাত পোহালো, দিন যেমন যাবার, চলেও গেল, শুভা তো কোথাও গেল না। এভাবে কতদিন সে, এই পরিস্থিতিকে ঠেকিয়ে রাখবে। তারকদা কি আর আসবে। সে কি বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে। বাড়ি ফিরে গেলে, বাবা-মা কী বলবে? শুভা কি যেতে পারবে। না কি, সত্যি অপঘাত মৃত্যুই আছে ওর কপালে।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে। শুভা চমকে ওঠে। একটু অবাক হয়। কে হতে পারে? এখন তো মোটে, রাত্রি আটটার মত হবে। এ সময়ে তো নরেশ আসে না। সে এলেও, কলিং বেল বাজায় না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়। বিহানীও চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। অবিশ্যি, মাঝে মাঝে নরেশের ড্রাইভার আসে। নানারকম জিনিসপত্র রেখে যায়। তাও কালে-ভদ্রে।

শুভা সামনের ঘরে গিয়ে, দরজার কাছে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। এ সময়ে ভয়ের কিছু নেই। রাত্রি কিছুই হয় নি। সে ছিটকিনিটা খুলে দেয়। কিন্তু দরজা খোলবার সময় পায় না। বাইরের থেকে, কেউ যেন, ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা নিজেই আটকে দিয়ে, শুভার দিকে ফিরে তাকায়।

শুভার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে ওঠে। যে মূর্তি ওর সামনে, যার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়, সে আর কেউ নয়, গতকাল রাত্রের সেই পলাতক লোকটা। শুভা চমকে উঠে, আরো কয়েক পা পেছিয়ে দাঁড়ায়। লোকটার চোখ থেকে, চোখ নামাতে পারে না। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করতেও, ওর গলায় কথা সরে না।

গতকালের সেই পোশাকই লোকটার গায়ে। গাঢ় সবুজ রঙের গোটা হাত ঢাকা, গলা পর্যন্ত সোয়েটার। কালো রঙের প্যাণ্ট, পায়ে জুতো। মাথার চুলগুলো কপালের কাছে রুক্ষ হয়ে এসে পড়েছে। দরজাটা বন্ধ করেই, শুভার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। সে-ও চোখ নামায় না শুভার চোখ থেকে।

কয়েক মুহূর্ত পরে, লোকটা বলে ওঠে, 'ভয় নেই, আমি কিছু করব না।'

কথাগুলো যেন ধারালো আর স্পষ্ট। বলে সে এক পা এগোয়। শুভা তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছে ছুটে যায়। লোকটা চকিতে একবার

চারদিকে দেখে নেয়। আবার বলে, 'ভয় নেই।'

শুভার মনে হয়, ওর প্রাণটা বোধহয়. গলার কাছে এসে ঠেকেছে। এখুনি মুখ দিয়ে, একটা তীব্র শব্দে বেরিয়ে যাবে। লোকটা ইতিমধ্যে, পাশ ফিরে সেই ঢাউস আলমারিটার কাছে চলে যায়। যেখানে গত রাত্রে লুকিয়েছিল, সেখানে গলা বাড়িয়ে দেখল। মাদুরটা হাতে নিয়ে, আরো নীচু হয়ে দেখল। তারপরে যেন খুবই হতাশ হয়েছে, এমনি ভাবে, মাদুরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কোণে। মেঝেতে একেবারে মাথা পেতে, আলমারির তলাটাও দেখল।

সেই মুহূর্তেই, শুভার চোখের সামনে, সেই লোহার পাতের অদ্ভুত জিনিসটা ভেসে উঠল। যন্ত্রের মত সেই জিনিসটা। লোকটা কি তাহলে সেটাই খুঁজতে এসেছে? সহসা যেন ওর ভয় একটু কমে গেল, আর ঠোঁটের কোণ দুটো শক্ত হয়ে উঠল। লোকটা যদি নিজের থেকে ড্রয়ার খুলে খুঁজে না পায়, তাহলে কিছুতেই ও বলবে না।

লোকটা দাঁড়িয়ে, শুভার দিকে ফিরে তাকাল। লোকটা নয়, একটা ছেলে। তারকদাদের থেকে ছোট। ছাব্বিশ আটাশ হতে পারে। বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। কাল আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমি একটা দরকারে এসেছি।'

কথা স্পষ্ট, কিন্তু খুব দ্রুত। শুভার চোখে অবিশ্বাস, ভয়। কথা বলল না। বিহানীর সেই কথা ওর মনে পড়ে গেল, তালাগুণীন। এই কি সেই লোক! এই লোকই গত রাত্রে ওভাবে পালিয়েছিল?

সে জিজ্ঞেস করল, 'আলমারির ওখানে কিছু পাওয়া গেছে?'

প্রথমেই শুভার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'জানি না।'

লোকটা জুতোর ওপর চাপ দিয়ে, শরীরটাকে একটু একটু দোলাতে থাকে। বলে, 'বললাম তো, ভয়ের কিছু নেই। আমি একটা জিনিস খুঁজতে এসেছি খালি। মনে হয়, ওটা আমি এখানে ফেলে গেছি।'

অবিশ্বাস আর ভয়ের মধ্যেও, শুভা জিজ্ঞেস করে, 'কী জিনিস?'

লোকটা বাঁ হাতের তালুটা একবার ঘোরায়। বলে, 'এই, একটা লোহার পাতের যন্ত্রের মত। গোল পাতের ওপর তিনটে মুখ। একটা হাতল আছে। এরকম কিছু পাওয়া গেছে? এই আলমারিটার পাশে?'

শুভা যেন হঠাৎ জবাব দিতে পারে না। এক লহমায়, একটা মিথ্যে কথা বলতে, কেমন আটকে যায়। সেই ফাঁকেই, সে বলে ওঠে, 'পাওয়া গেছে, না? কোথায় সেটা?'

এতক্ষণ ধরে, লোকটার উপস্থিতি ও চোখের দিকে চেয়ে থেকে, শুভার ভয়টা যেন অনেকখানি কমে আসে। যদিও বিশ্বাস করতে পারে না কিছুতেই। কিন্তু ওর কৌতূহলের মাত্রা একটু বাড়ে। বলে, 'জিনিসটা কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

লোকটা কথা বলে না। কিন্তু শুভার চোখ থেকে চোখ সরায় না। যেন শুভার ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চায়। একবার যেন লোকটার চোখের কোণ দুটো কুঁচকে উঠল। মুখটা শক্ত দেখাল। শুভা ভয় পেল আবার। পাশের

boiRboi.net

ঘরে ঢুকে, দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই, ওর নিরাপদ হওয়ার একমাত্র রাস্তা। সেইজন্যে ও দরজার কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল।

লোকটার দৃষ্টি চারপাশে আর একবার ঘুরে গেল। বলে, 'তাহলে পেয়েছেন?'

'না।'

'তবে জিনিসটা কী তা জানতে চাইলেন কেন?'

এমন ভাবে কথা বলছে, যেন লোকটা চোর বা ডাকাত নয়। যেন কাল রাত্রে পালিয়ে এখানে আসে নি। এমনি এসেছিল। কিছু ফেলে গিয়েছে, তারই খোঁজে এসেছে। শুভার মুখ থেকে, আপনিই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, 'তুমি কে?'

লোকটার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির ঝিলিক দেখা গেল। বলল, 'আমাকে আপনি চিনবেন না।'

শুভা বলে ওঠে, 'তুমি চোর, আমি জানি।'

লোকটা একবার ভুরু কোঁচকায়। শুভা আবার বলে, 'কাল রাত্রে তুমি এ-পাড়ায় ঢুকেছিলে. ভোরাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে। তারপর পালিয়েছিলে।'

লোকটার ভুরু আর চোখের মণি যেন জোড়া লেগে যায়, এমন ভাবে তাকায়। তবু কোন কথা বলে না। শুভা ধারণা করে, লোকটা ধরা পড়ে যাচ্ছে বলে, কথা বলতে পারছে না। সাহস পেয়ে ও আরো বলে ওঠে, 'তুমি তালাগুণীন।'

লোকটার ঘাড়টা আর একটু বেঁকে ওঠে। বলে, 'সে আবার কে?'

'তুমি জান না?'

লোকটা ঘাড় নাড়ে। আর মুহূর্তেই শুভা দেখতে পায়, লোকটা যেন চোখের নিমেষে, ভিতর ঘরের মাঝখানের দরজায় এসে পড়ে। শুভা ভয় পেয়ে, চিৎকার করতে যেতেই, একটা শক্ত হাত ওর মুখ চেপে ধরে। পিছনে ঘাড়ের কাছেও তেমনি শক্ত থাবা।

শুভা হাত দিয়ে, মুখের থেকে হাত সরাতে যায়। সাঁড়াশির মত সে হাত একটুও সরাতে পারে না। চকিতে একবার লোকটার মুখের দিকে চায়। লোকটা বলে ওঠে, 'আগেই বলেছি, ভয়ের কিছু নেই। বাজে কথা শুনতে আসিনি আমি এখানে। কোথায় আছে সেটা?'

শুভা সমস্ত শক্তি দিয়ে, মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। লোকটার স্পর্শ যেন তাকে আরো শিউরে তোলে।

লোকটা বলে, 'চেঁচাবেন না, ছেড়ে দিচ্ছি। চেঁচালে, ব্যাপারটা খুব সুবিধের হবে না।'

ছেড়ে দিয়েই, পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় সে। বলে, 'বলুন, সেটা কোথায়?'

শুভা ততক্ষণে, অনেকখানি সরে গিয়ে, ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে, লোকটার দিকে তাকায়। ওর চোখে ভয় আছে, কিন্তু রাগের উত্তেজনা তার থেকে কম নয়। এবং সব থেকে আশ্চর্য, তবুও ভেঙে পড়ে না। বললে, 'আমি কী করে জানব, কোথায় কী ছিল। আমি কি এ ঘরে ছিলাম নাকি?'

boiRboi.net

'তবে কে ছিল ?'

'যার ঘর, সে-ই ছিল।'

'ও. সেই মাতালটা, যে কাল আপনাকে নিয়ে টানাটানি করছিল ?'

সত্যি কথাটা শুনতে যে এত খারাপ লাগে, আগে যেন শুভার জানা ছিল না। ও বলে ওঠে, 'সে যেই হোক, তাতে তোমার কী ?'

'আমার কিছুই না। তবে, লোকটা আপনার স্বামী নয়, তা বুঝতে পেরেছি। আপনি তো—'

হঠাৎ থেমে যায় লোকটা। গলার স্বর বদলে বলে, 'যাক গে, ওসবে আমার দরকার নেই। তবে, লোকটা বদমাইস। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কী যেন নাম, নরেশ, হ্যাঁ নরেশ। তাহলে, সে-ই ছিল এ ঘরে ?'

বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে আসে সে। ঢাউস আলমারিটা দেখিয়ে বলে, 'এর চাবি কোথায় ?'

'যার জিনিস, তার কাছে।'

'হুম্। আর এই আয়রন সেফ্‌টার চাবি ?'

'তার কাছেই।'

লোকটা হঠাৎ নরেশের বিছানাটা টেনে একেবারে উল্টে দেয়। বালিশের তলায় দেখে। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার টেনে খোলে, আবার বন্ধ করে। তারপর শুভার দিকে একবার তাকিয়ে, বাথরুমের দরজাটা খুলে রেখে, ভিতরে ঢুকে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ফিরে আসে। শুভা মনে মনে ভেবেও মুহূর্ত ক'টির সুযোগ নিয়ে, কোনদিকে যেতে পারল না। বরং মনে মনে লোকটার কথা ভেবে অবাক হচ্ছিল, নরেশকে মাতাল বদমাইস বলতে শুনে। নরেশের ওপরে লোকটার রাগের কথা শুনে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই বলল, 'পাশের ঘরে চলুন, একবার দেখব।'

শুভা বলে, 'তুমিই দেখ না !'

'আপনি তাহলে বাইরে গিয়ে চেঁচাবেন। আসুন আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন, আমার সময় নেই।'

একে স্পর্ধা বলে না। যেন কতই স্বাভাবিক একটা কথা বলছে। কিংবা যেন শুভার চেনা লোক। শুভা বলে ওঠে, 'আমি আবার পালাব কোথায় ?'

লোকটা থমকে যায়। বলে, 'তাও তো বটে। আপনার তো আবার পালাবারও উপায় নেই। চোরের থেকেও খারাপ অবস্থা।'

একটু যেন হাসির ঝিলিক দেখা যায় লোকটার মুখে। তাও বাঁকা ঝিলিক। যেন বিদ্রূপ করছে। আবার বলে, 'নিজের দোষেই তো ফাঁদে পড়েছেন। কাল যা শুনলাম, তাই মনে হল। তা সে যাক গে, অন্য কোথাও না পালান, ঘরের বাইরে গিয়ে চেঁচাতে পারেন। ওসব ঝুট ঝামেলা বাড়াতে আমার ভাল লাগে না। চলুন।'

শুভা যেন ভুলে যায়, ও কার সঙ্গে কথা বলছে। একটা অপমানবোধ ওকে হঠাৎ জ্বালিয়ে দেয়। ঝেঁজে বলে ওঠে, 'আমার কথায়, তোমার মত একটা

boiRboi.net

চোরের কোন দরকার নেই ! কী দেখতে চাও, দেখে নাও ।'

শুভা রাগে ও উত্তেজনায়, দ্রুত পাশের ঘরে যায় । এই মুহূর্তে ভয়ের কথাও ওর মনে থাকে না যেন ।

কিন্তু লোকটা অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন আর সতর্ক । শুভা পাশের ঘরে ঢুকে পাছে দরজা বন্ধ করে দেয়, সেই জন্যে প্রায় শুভার গায়ে গায়ে ঘেঁষে পাশের ঘরে যায় । পাশের ঘরে গিয়েও, শুভা যত সরে যেতে চায়, লোকটা ততই ওর পাশ ঘেঁষে থাকে । বলে, 'উঁহু, অতটা দূরে দূরে থাকবেন না । আমার কাছে কাছে থাকুন ।'

শুভা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন ?'

'বলা যায় না, ছিটকে ও ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন । আর আমিও আটকা পড়ে গেলাম ।'

শুভা রাগে ও বিদ্রূপে, ঝলসে ওঠে, 'তাতেই বা তোমার কী । কাল রাত্রে জানালা দিয়ে যে ভাবে ধরা পড়ার ভয়ে এসে ঢুকেছিলে, সেই জানালা দিয়েই পালাবে ।'

লোকটা যেন ভারী নিশ্চিন্ত হয়ে, এমনি একটা কথার কথা বলে, 'সেটা ঠিক হবে না । সবাই দেখতে পাবে, আর—'

শুভা বলে ওঠে, 'অমনি ধরা পড়ে যাবে, আর সবাই ইঁদুর পেটা করে তোমাকে মেরে ফেলবে, সেই ভয় ।'

লোকটা ঘাড় কাত করে একবার তাকাল শুভার দিকে । শুভার মনে হল, লোকটার মুখটা কী রকম বদলে গিয়েছে । ঠিক এরকম মুখ একবারও দেখে নি । রাগ বা গম্ভীর না, একটা অন্যরকম ভাব । যেটা ও বুঝতে পারে না, কিন্তু ওর বুকের মধ্যে, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত একটা চমক লেগে যায় । ভয়ে ওর শিরদাঁড়ার কাছটা কী রকম শিরশিরিয়ে ওঠে ।

লোকটা বলে, 'স্টীলের আলমারিটা খুলুন ।'

শুভা বলে, 'খোলাই আছে ।'

ওর গলায় আর তেমন ঝাঁজ নেই । লোকটা মুখ ফিরিয়ে নেয় । শুভার নতুন করে সন্দেহ বাড়তে থাকে । লোকটা কি খালি সেই জিনিসটাই নিতে এসেছে । নাকি আর কোন মতলবে । চাউনিটা যেন কী রকম বিচ্ছিরি লাগল । শুভার গা-টা এখনো যেন ছমছম করছে ।

লোকটা আলমারিটা খুলে, তন্ন তন্ন করে দেখল । হাত দিয়ে যত দেখে, তার চেয়ে চোখ দিয়ে, অনেক তাড়াতাড়ি দেখে নেয় । আলমারিটাতে শুভার জামা কাপড়, ব্যবহারের দু'-চারটে অন্যান্য জিনিস ছাড়া কিছুই নেই । আলমারিটা দেখা হয়ে যেতেই, এ ঘরের খাটের বিছানা উলটে, বালিশের তলা, সবই দেখল । তারপরে ডাক দেয়, 'আসুন, বাথরুমে আসুন ।'

'বাথরুমে ?'

'হ্যাঁ ।'

'কেন ?'

boiRboi.net

ও লোকটার চোখের দিকে প্রায় ভয়ার্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। লোকটা তা লক্ষ্য না করে বলে, 'বললাম তো, আপনাকে দূরে রাখলে চলবে না। আপনি বাথরুমে দাঁড়ান, আমি একটু দেখে নিই।'

শুভা তবু খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবে, বলে দেয় কোথায় আছে জিনিসটা। কিন্তু লোকটার কথার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। ও আবার লোকটার চোখের দিকে তাকায়। তারপর বাথরুমে ঢুকে, দরজার পাশেই দাঁড়ায়।

এখানে বিশেষ কিছু দেখবার জায়গা ছিল না। দু'-একটা তাক, একটা ডালা-বন্ধ কাঠের বাস্কেট। তাও দেখল সে। তার মধ্যেই দু'বার শুভার দিকে দেখে নিয়েছে। আশ্চর্য, এই লোকটাই কি সত্যি, গতকাল পাইপ বেয়ে পার হচ্ছিল! আর, শুভাকে নিয়ে তার এত ভয়! আসলে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ওরা কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কোন কারণও নেই। শুভা যদি পারত, তাহলে নিশ্চয়ই বাথরুমের দরজাটা চকিতে টেনে, বন্ধ করে দিত। কিন্তু ওর সাহসে কুলোল না।

লোকটা বেরিয়ে এল। এ ঘরের চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে পাশের ঘরে গেল। শুভা মাঝখানের দরজায় দাঁড়াল। লোকটা আর একবার ঢাউস আলমারিটার পাশে, কোণের দিকে উঁকি দিল। তারপরে নিজের মনেই বলল, 'তাহলে, কী যেন নাম, নরেশ না কী, কালকে রাত্রের সেই মাতালটা, ওর হাতেই পড়েছে। আর এতক্ষণে, পুলিসের কাছে হয়তো জমাও দিয়েছে। এবার আপনাকেই ধরবে। পুলিস এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।'

শুভা আবার ভয়ের কথা ভুলে যায়। বলে, 'আমাকে?'

লোকটা একটা চিরুনী বের করে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, 'হ্যাঁ। নরেশবাবু তো সব সময় বাড়ি থাকে না। ওটা কী করে এ ঘরে এল, জিজ্ঞেস করবে না? আপনিই তো সব সময় এই ফ্ল্যাটে থাকেন। কিছু একটা হলে, আপনার জানবার কথা।'

শুভা কোন জবাব দিতে পারল না। কথাটা সেদিক থেকে একেবারে মিথ্যে নয়। যদিও ওর সে ভয় নেই। নরেশ কোনদিনই সে জিনিসটা দেখতে পাবে না, জানতেও পারবে না।

লোকটা পুলওভারটা টেনে টেনে দিয়ে বলে, 'তবে, আমি এসে খুঁজে গেছি, এ-কথা বললেও আমার কিছু যাবে আসবে না। আচ্ছা, চলি।'

লোকটা শুভাকে অবাক করে দিয়ে, সত্যি দরজার কাছে গিয়ে, ছিটকিনিতে হাত দেয়। শুভার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে যায়, 'এমন কী জিনিস সেটা, যার জন্যে পুলিস পর্যন্ত এসে পড়বে?'

লোকটা ফিরে বলে, 'বললাম তো কি জিনিস।'

'কী হয় ওটা দিয়ে?'

'চিচিং ফাঁক।'

বলতে বলতে, লোকটার ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসির রেখার ঝিলিক দেখা

boiRboi.net

যায়। হাতের ভঙ্গিতে চাবি ঘোরাবার মত করে বলে, 'সব রকমের তালা-চাবি খোলা যায়। সবাই তাই বলে পারে না। হাতের গুণ থাকা চাই।'

শুভা বলে ওঠে, 'চোরের হাতের গুণ।'

লোকটা ঘাড় নেড়ে বলে, 'হুম্।'

শুভা আবার বলে, 'কাল রাত্রেই জানতাম, তুমি একটা চোর।'

'তবু নরেশবাবুকে বললেন না কেন?'

'সে অবস্থা থাকলে, নিশ্চয়ই বলতাম। তোমার হাতে ছুরি ছিল। বললে তুমি কী করতে, তা জানি। চোর-ডাকাতদের বিশ্বাস কী।'

লোকটা ছিটকিনি খোলবার জন্যে মুখ ফেরাল। হঠাৎ আবার এদিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমি চোর। আর নিজে কী?'

'মানে?'

কথাটা বুঝে ওঠার আগেই, শুভার গায়ে যেন আগুনের ঝাপটা লেগে যায়। শুধু মুখ নয়, ওর চোখেও রক্ত ছুটে আসে।

লোকটা ছিটকিনি খুলে ফেলল। বেরিয়ে যাবার আগে বলে, 'মানে, নিজেরই তো ভাল জানা আছে।'

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়। শুভা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ওর মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। অসহায় রাগে, দাঁতে দাঁত চেপে, ও যেন নিশ্চল পাথরের মত শক্ত হয়ে থাকে। তারপরে, দুঃসহ প্রতিকারহীন রাগই যেন, একটা অসহ্য কষ্টে পরিণত হতে থাকে। বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয়। দরজার চৌকাঠ শক্ত করে ধরে। এক সময়ে হঠাৎ ওর শরীরটা কাঁপতে থাকে। মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে যায়, খেয়াল থাকে না শুভার। এক সময়ে নিজেরই দীর্ঘশ্বাসে, নিজেই চমকে ওঠে, সংবিৎ ফিরে পায়। ও নড়ে চড়ে ওঠে। লোকটার কথাগুলো আবার ওর মনে পড়ে। লোকটার ওপর এখন ওর আর তেমন রাগ হয় না। কিন্তু একটা চোর হয়ে, লোকটাও তাকে এভাবে নোংরা ইঙ্গিত করে গেল! তারপর আস্তে আস্তে, নিজের জীবনের ভাবনাই, ওকে আর এক পাথারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

লোকটা চোর বলে হয়তো, শুভার এতখানি লেগেছে। কিন্তু চোর ছাড়াও যে কেউ-ই জানবে, সে-ই তো তাকে এই ইঙ্গিত করবে। ইঙ্গিত কেন, মুখ ফুটেই বলবে। নরেশ তো বলছেই। কোন কথাই তো তার মুখে আটকায় না।

কিন্তু লোকটা যেন শুধু চোরের মত কথা বলে নি। চোরেরা কি অমনি করে কথা বলে। লোকটার কথা যেন তার চেয়েও বেশি। কথা বলার ভাব-ভঙ্গি, সব কিছুর মধ্যে একটা অবহেলা, অথচ তীব্রতা। নরেশ চেঁচিয়ে চিৎকার করে যত উত্তেজিত করতে না পারে, লোকটা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি পারে। লোকটা—লোকটা বলা ঠিক নয়। একটা ছেলেই, হয়তো শুভার থেকে খুব বেশি বড় হবে না, বা কমবয়সীই। এ ঠিক চোর তো?

boiRboi.net

তা হলে চোর বলাতে এত রাগ কিসের ?

শুভারই বা এত রাগ কিসের। চোরকে না হয় চোর বললে রাগ হয়। শুভাও কি তা-ই। শুভা হাঁটতে হাঁটতে সামনের ঘরের মাঝখানে আসে। আসলে চোরটা ঠিক চোরের মত আচরণ করে নি। শুভা যে সব ভয় পেয়েছিল, তার কিছুই ঘটে নি যেন, খুব সহজ ভাবে এল, গেলও সহজ ভাবেই। শুধু নিজের প্রয়োজনটা মেটাবার জন্যে।

ওর সহসা খেয়াল হয়, বাইরের দরজাটা খোলা। শুভা তাড়াতাড়ি লাগাতে গিয়ে থমকে যায়। আস্তে আস্তে দরজাটা খোলে। সামনের বারান্দায় আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই নীচের দারোয়ান সন্ধ্যাবেলাতেই জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। শুভা বারান্দায় যায়। সামনের রেলিংয়ের সামনে দাঁড়ালে, নীচে দিয়ে যে রাস্তাটা গেটের দিকে গিয়েছে সেটা দেখা যায়। গেটের পাশ দিয়ে রাস্তায় লোক-চলাচল করছে, তাও দেখা যায়।

রেলিংয়ের কাছে যেতে গিয়েও, শুভা থমকে যায়। ও তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। দিয়েই ঢাউস আলমারিটার টানা খুলে, সেই অদ্ভুত জিনিসটা বের করে। কী বলছিল যেন লোকটা ? চিচিং ফাঁক ! কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা শুভার কথায় বিশ্বাস করল কেমন করে। শুভা বলল, আর তা-ই মেনে নিল, সত্যি আলমারিটা বন্ধ আছে ! চোরের আবার এমন মতিগতি হয় নাকি। তার তো অবিশ্বাস করে, সবই টেনে টেনে দেখা উচিত ছিল।

শুভা লোহার পাতের অদ্ভুত অবয়ব বস্তুটি চোখের সামনে এনে দেখতে থাকে। খুব যে একেবারে মিহি করে কাটা তা নয়। হয়তো লোকটা নিজেই তৈরি করেছে। এবার শুভার লক্ষ্য পড়ে, চাবির মত লম্বা লম্বা তিনটি ডাঁটি ছাড়া, গোল অংশের-বাদবাকী ভয়ঙ্কর ধারালো। তেমন করে মারলে দেহের ছোটখাটো অংশ কেটে ফেলা যায়।

কিন্তু এটা দিয়ে কি সত্যি সব রকমের আলমারি আর তালাচাবি খোলা যায় ? ভাবতেই, শুভার দৃষ্টি পড়ে নরেশের বিখ্যাত কোম্পানির তৈরি আয়রন সেফে। কৌতূহলিত হয়ে ও সত্যি এগিয়ে যায় আয়রন সেফের কাছে। তিন দিকের তিনটি চাবিই ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করে। দুটো ঢুকলই না। একটা ঢুকেই আটকে গেল। শুভা বলে উঠল, 'মিথ্যুক ! চোর !'

নিতান্ত কৌতূহল বশেই ও একবার পরখ করল। তারপরে ধারালো জায়গা, গলার কাছে একবার ছোঁয়ালো। চোখ বুজে চুপ করে রইল। তারপরে নামিয়ে নিয়ে এল। মনে মনে বলল, 'আমি যদি নরেশের সিন্দুক ভেঙে চুরি করি বা গলা কেটে মরি, কিছুতেই কিছু যায় আসে কী ?'

ভাবতে ভাবতে ওর চোখে আবার আসন্ন মধ্যরাত্রের সেই অসহায় উদ্বেগ ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে, বিছানায় এলিয়ে পড়ে। হাতে থাকে সেই অদ্ভুত জিনিসটা, যার নাম চিচিং ফাঁক। কিন্তু ওর মন চলে যায় অন্যখানে। বাবা মা ভাই বোন আর—আর তারকদা। তারকদা কি সত্যি আর কোনদিন আসবে !···

boiboi.net

পরদিন দুপুরবেলা, বারোটার সময় কলিংবেল বেজে ওঠে। শুভা তখন ভিতরের ঘরে, খাটের ওপর এলিয়ে শুয়ে ছিল। বিছানার ওপরেই, এক পাশে কাগজ আর কলম পড়ে রয়েছে।

ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এখনো খায় নি। স্নান করেছে সকালেই। চুলে তেল দেয় নি। খোলা চুল ওর মুখের দু'পাশে ছড়ানো। চোখ দুটো লাল। চোখের কোল বসা। অসহায় দুশ্চিন্তা ছাড়া, চোখে-মুখে আর কিছু নেই।

গতকাল রাত্রে নরেশের সেই একই মূর্তিতে আবির্ভাব হয়েছিল। আরো মত্ত, আরো নিষ্ঠুর আরো ক্রূর। ভাষা কত কুৎসিত হতে পারে, নরেশের কথা না শুনলে বোঝা যায় না। শুভারও আত্মরক্ষার সেই একই পদ্ধতি। কিন্তু কতদিন, আর কতক্ষণ সে একটা মত্ত কামুক পশুর সঙ্গে এ লড়াই চালিয়ে যাবে। এখন বরং একটা আশঙ্কা জাগে শুভার মনে, কোনদিন কী ভাবে, কী দিয়ে নরেশকে সে আঘাত করে বসবে। পরিণামে নরেশ হয়তো নিহত হবে। আক্রমণের মুখে, আত্মরক্ষায় ওর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যেভাবে পারে, তখন নরেশকে আঘাত করার জন্য, ওর ভিতর থেকে যেন একটা বিশেষ শক্তি জেগে ওঠে। গতকাল রাত্রে, নরেশকেও এত জোরে ধাক্কা দিয়েছে, খাটের গায়ে লেগে নরেশের কপাল ফুলে গিয়েছে। সেই অবস্থায়, শুভা পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

যদি এমন হত, মধ্যরাত্রে নরেশকে দরজা খুলে দেবার কেউ থাকত, তাহলে আর কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু আর কেউ এখানে নেই। আর, লোকচক্ষে, শুভার এই আশ্রয়ের মূল্যে, এ কাজটুকু সে কেন পারবে না।

এখন বরং মনে হয়, নরেশ প্রচুর মদ খেয়ে আসে বলেই দুর্বল। তার হাতে-পায়ে শক্তি হয়তো থাকে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রতিপদে। মত্ত চোখের দৃষ্টি তার নির্দেশ মানে না। হাত-পা তার বশে থাকে না। যদিও আক্রমণের তীব্রতা, ভয়ঙ্করতা বাড়ে বৈ কমে না।

গতকাল রাত্রেই, শুভা মনে মনে স্থির করেছিল, কপালে যা-ই থাক, লজ্জার মাথা খেয়ে, রাত পোহালে, সমস্ত কথা জানিয়ে, মাকে চিঠি লিখবে। কলঙ্ক নিয়ে যে কোন মেয়ে, গ্রামে আর কোনদিন ফিরে আসে নি, পরিবারের সঙ্গে বাস করে নি, এমন তো নয়। তাদের নিয়ে হয়তো, শুভা, শুভাদের বাড়ির লোকেরা অনেক নিন্দা কুৎসা করেছে। সেই পাপেরই শাস্তি এসব। ভেবেছিল, মাকে লিখে জানাবে, নতুন শহরে যে হোসিয়ারি কারখানা হয়েছে, যেখানে এখন অনেক মেয়েরাই কাজ করে, শুভা না হয় সেখানেই কাজ করে, নিজের ভরণপোষণ করবে। কেন না, বিয়ে তো আর কোনদিন হবে না। ওর সব কথা জানবার পরে, কেউ-ই আর কোনদিন ওকে বিয়ে করতে চাইবে না। তবু, মা যেন বাবাকে বলে, রাজী করায়। তবু শুভা আর এভাবে, আত্মীয়-স্বজনহীন, এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে, প্রতি মুহূর্তের ভয়ে সংশয়ে থাকতে পারছে না। কলকাতায় ওর এমন কেউ নেই যে, একটা কোন কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। একটা নির্ভয় নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দেয়। তাহলে হয়তো ও কলকাতাতেই থাকত। কিন্তু আর এভাবেও থাকতে পারছে না। মায়ের পায়ে মাথা কুটে বলছে, মা যেন বাবাকে রাজী করায়। বাবাকে যেন মা বলে, এখনো

boiRboi.net

সেরকম কিছু শুভার ঘটে নি, যাতে গ্রামে ফিরে গেলে, লোকে আঙুল দিয়ে কিছু দেখাবে। শুভার কোন ছেলেপিলে হয় নি। আর যদি মা এই কথা না রাখতে পারে, তারা যদি রাজী না হয়, তবে দুটো পথই ওর সামনে খোলা থাকবে। মরণ অথবা নরেশের রক্ষিতা হওয়া।

সবই ভেবে রেখেছিল শুভা রাত পোহালে, নরেশ যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি বেরিয়ে গিয়েছে। বিহানী ঝি যেমন আসে, তেমনি এসেছিল। শুভার কথা না শুনে, বাজার করে এনেছে। শুভাকে নানারকম সান্ত্বনা সাহস দিয়ে, রান্না করিয়েছে। বিহানী সমস্ত ব্যাপারটাই অনুমান করতে পারে এখন। তা-ই বলে, 'দুনিয়াতে বহুত কিসিম বিপদ আছে, কিন্তু ভুখ সব সে বড়া দুখ। যতক্ষণ জুটবে, ততক্ষণ, মেমসাব, পেটকে কষ্ট দেবেন না।'

এখন বিহানীকেই তবু যা হোক একটু ভাল লাগে। শুভা তার সঙ্গেই একটু কথা বলে। আজ সে বিহানীকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে তালাগুণীনের চেহারা কেমন, সে জানে কী না।

বিহানী চোখ বড় করে, ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'কভি তো দেখিনি মেমসাব। ও তো মন্তর গুণ জানে। ওকে কেউ দেখতে পায় না।'

শুভা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবে যে তুমি বলছিলে, খবরের কাগজে ওর ছবি বেরিয়েছিল।

'বাহার হইয়েছিল তো। আমি দেখি নাই। যারা দেখেছে তাদের মুখে শুনেছি, আমার আদমির উমর হবে।'

শুভা হতাশ ও অবাক হয়েছিল। বিহানীর আদমির উমর হলে, সে-মানুষ আর যে-ই হোক, কাল সন্ধ্যারাত্রের সেই লোক কখনোই নয়। কিন্তু লোকটা তো প্রায় স্বীকারই করেছে, সে চোর। পরশু রাত্রের পলাতক যে সে-ই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে কি তবে, বিহানীর সেই তালাগুণীন নয়? যে সমস্ত তালাকেই গুণ তুক করতে জানে।

তারপরেও শুভা জিজ্ঞেস করেছিল, 'চিচিং ফাঁক কী, জান?'

বিহানী হেসে, সোজা আলিবাবা হিন্দী ছবির গল্প বলেছিল। সে কথা শুভারও জানা ছিল। কিন্তু 'চিচিং ফাঁক' বস্তুটি তাকে সাহস করে দেখাতে পারে নি। তবে, গল্পটার প্রসঙ্গ আসবার পর, শুভার মনের মধ্যে চকিতে একটা ঝিলিক হেনে গিয়েছিল। 'চিচিং ফাঁক' মানে কি তাহলে, যা দিয়ে সব খোলা যায়? লোকটা কি সেই ইঙ্গিতই করেছিল?

বিহানী চলে যাবার পরে, আর সে সব কথা শুভার মনে ছিল না। মাথায়ও ছিল না। নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়েছিল। নেহাত• বিহানীর কথায় রান্নায় হাত দিয়েছিল। নইলে মাছ আনাজ নষ্ট হত। তেমন অচেল তো জীবনে দেখে নি, যে কোন কিছু নষ্ট করবে। তা-ই কোনরকমে রান্নাটা করেছিল, খেতে আর ইচ্ছে করে নি। রান্না শেষ করেই, গতকাল রাত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাগজ কলম নিয়ে বসেছিল, মাকে চিঠি লিখবে বলে। কিন্তু একটি লাইনও লিখতে পারেনি। কাগজে একটি আঁচড়ও লাগে নি। মায়ের মুখ মনে পড়তেই, ওর সমস্ত

boiRboi.net

মন লজ্জায় ধিক্কারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। হাত গুটিয়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল ভেবেছে। অনেক চেষ্টা করেছে, কিছু লিখবে বলে। একটি কথাও লিখতে পারেনি। মনে হয়েছিল, ওর চোখের সামনেই যেন, সেই চিঠি ছিঁড়ে পায়ের তলায় মাড়িয়ে, বাবা, মা রাগে অপমানে জ্বলছে।

শুভার এই ভাবনার অবকাশেই কলিংবেল বেজে ওঠে। শুভা উঠে, এগিয়ে যেতে গিয়েও, মাঝখানের দরজায় থমকে দাঁড়ায়। গতকালের সেই লোকটা নিশ্চয়ই। লোকটা জানে, এসময়ে ও একলা থাকে। খবর রাখে ঠিক। কিন্তু আজ ও দরজা খুলবে না।

বিজলি ঘণ্টা আবার বেজে ওঠে। এবার একটু বেশী সময় ধরে বাজে। এই দিন দুপুরে লোকটার এত সাহস। এখনো বেল বাজাচ্ছে। যে কোন দিকের জানালা খুলে ও যদি লোকজন ডাকে, কেউ না কেউ এসে পড়বে। লোকটার সে খেয়ালও নেই।

কিন্তু বেল আবার বেজে এঠে ঘন ঘন। শুভা তথাপি নড়ে না। তারপরে দরজায় ধাক্কা পড়ে, একটা গলার স্বরও যেন শোনা যায়। এবার আর শুভা না এগিয়ে পারে না। সে লোকটার নিশ্চয় এতখানি সাহস হবে না, দরজা ধাক্কা দিয়ে গলার আওয়াজ করবে। তবু দরজা খোলবার আগে ও এক মুহূর্ত ভাবে, তারপরে খুলে দেয়।

নরেশের ড্রাইভার। চামড়ার একটা বড় ব্যাগ তার হাতে। দেখেই মনে হয় খুব ভারি। বলে, 'বাবু এটা ঘরে রেখে যেতে বললেন।'

শুভা সরে দাঁড়ায়। বাঙালী ড্রাইভার লোকটা তেমন খারাপ নয়। মাঝারি বয়স, দৃষ্টি ভদ্র, চালচলনও শালীন। আসে, জিনিস রাখে, চলে যায়। আজও তেমনি ঘরে ঢুকে ব্যাগটা ঘরের দেওয়ালের এক পাশে রেখে, বেরিয়ে যায়। শুভা দরজা বন্ধ করে। একটা উদ্বেগ থেকে যেন নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে, বৃথাই আমি ভয়ে মরি। লোকটা নেহাত তার 'চিচিং ফাঁক' খুঁজতেই এসেছিল। এবং এই বিশ্বাস নিয়েই ফিরেছে, ওটার বিষয়ে শুভা কিছুই জানে না। লোকটার ঘুরে আসার আর কোন কারণ নেই।

আর যদি বা আসে, তাতেই বা শুভার ভয় কিসের। এখনো কি শুভার আর কোন ভয় আছে। তবে লোকটার যদি নরেশের মত কোন মতলব থাকে, তা হলে হয়তো শুভা পারবে না। কিন্তু সে রকম কিছু মনে হয় নি।

শুভা ভিতরের ঘরে এসে, খাটের ওপর কাগজ কলমের দিকে তাকায়। না, পারবে না, মাকে সম্বোধন করে, একটা কথাও ও লিখতে পারবে না। কারণ এই পোড়ামুখ, কোন রকমেই মাকে দেখাতে পারবে না। ও আবার বিছানাতেই এলিয়ে পড়তে যায়। আবার কলিংবেল বেজে ওঠে।

আবার কে? ড্রাইভারই ফিরে এল নাকি। দু'মিনিট তো গেল লোকটা। তাছাড়া, ভয়টা এখন আর তেমন নেই শুভার। হয়তো আবার কিছু বলতে এসেছে। কিংবা কিছু নিয়ে যাবার কথা, নিতে ভুলে গিয়েছে। এমন যে কখনো হয় না, তা নয়।

boiRboi.net

শুভা গিয়ে দরজা খুলে দেয়। তৎক্ষণাৎ ওর সমস্ত ভাবনাকে মিথ্যে করে দিয়ে গতরাত্রের সেই লোকটিই ঢোকে। ঢুকে একই ভঙ্গিতে, ঝটিতি ছিটকিনি বন্ধ করে দেয়।

শুভা সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গিয়ে, লোকটার দিকে তাকায়। আজ লোকটার পোশাক একটু অন্য রকম। প্যান্ট আর জামা, দুটোই আলাদা। জুতো সেই একই। একটু যেন ছিমছাম ভাব। চোখের দৃষ্টি যেন বাজের মত, অনুসন্ধিৎসু অথচ শুভার প্রতি অমনোযোগী, নির্বিকার ভাব।

প্রথম প্রশ্ন, 'সেটা পেলেন ?'

শুভার জবাব, 'না।'

'কিন্তু আমি শিওর জানি, সেটা এখানেই আমি ফেলে গেছি।'

বলেই সে ঢাউস আলমারিটার টানা ধরে টান দেয়। টানা খুলে যায়। পর পর সব টানাগুলোই সে খুলে খুলে দেখে। নিরাশ হয়ে, ফিরে বলে, 'কাল শুনেছিলাম, এ আলমারি বন্ধ।'

শুভা কোন জবাব দেয় না। লোকটা এগিয়ে আসে। শুভা সরে যায়। নরেশের আয়রন সেফের হাতল ঘোরায়। সেটা বন্ধ। শুভার দিকে চেয়ে সে বলে, 'ওটা রেখে কী লাভ ? আপনার কোন কাজেই লাগবে না।'

শুভার মুখ দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন বেরিয়ে যায়, 'তোমার কী কাজে লাগে ?'

লোকটার দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই ঠোঁটের কোণে একটু হাসির ঝিলিক খেলে যায়। বলে, 'যদি ফিরিয়ে দেন, এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি।'

শুভা হঠাৎ কোন কথা বলতে পারে না। নিজের কথাটা, ওর নিজের কানেই যেন কেমন গোলমেলে লাগে। যেন ধরা পড়ে যাবার মত কিছু বলে ফেলেছে। অথচ ওর ভিতরে, একটা কৌতূহলও তীব্র হয়ে ওঠে। কৌতূহল একান্ত মেয়েলী কি না কে জানে। কিন্তু ও নিজেও বোধহয়, মনের এই আশ্চর্য গতিবিধির কথা জানে না। যাকে দেখে ও ভয় পাচ্ছে, যার কথায় ও গতকাল তীব্র অপমানে জ্বলে উঠেছিল, সেই লোকটার কথাতেই ওর কৌতূহল জেগে ওঠে। কী দেখাবে লোকটা, সেই জিনিসটা দিয়ে ?

সত্যি কোন জাদু দেখিয়ে দেবে নাকি ! ও জিজ্ঞেস করে, 'কি দেখাবে ?

'চিচিং ফাঁক।'

কথাটার উচ্চারণের দোষে বা লোকটার একদৃষ্টে চেয়ে থাকার জন্যই, এখন কথাটা যেন কী রকম খারাপ শোনায়। জিজ্ঞেস করে, 'মানে ?'

শুভা কোন কথা বলে না। ওর মুখে ভয় বিস্ময়ে বিহ্বলতা। চোখ দুটো প্রায় ভিজে উঠেছে। লোকটার ঠোঁট দুটো বেঁকে ওঠে। আবার জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু এ টাকা তুমি কতদিন যখ্ দিয়ে আগলে রাখবে ?'

শুভা তবু কথা বলতে পারে না। এখন বিহানীর কথা তার মনে পড়ছে। এ নিশ্চয় সেই তালাগুণীন। পরশু রাত্রের সেই প্রাণ-সংশয় করে পালানোর দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিন্তু বিহানী লোকটার চেহারা চেনে না। এখন সেই মারাত্মক লোকটা ওর সামনেই দাঁড়িয়ে।

boiRboi.net

সে আবার বলে, 'এ কথা নিশ্চয়, আজ রাত্রেই নরেশকে বলে দেবে ? যাতে নিজেও বাঁচে, টাকাটাও নরেশ সরিয়ে ফেলতে পারে।'

শুভা ঘাড় নেড়ে একবার উচ্চারণ করে, 'না।'

লোকটা আবার অপলক চেয়ে দেখে শুভাকে। তারপর নরেশের খাটে গিয়ে বসে, পা দোলাতে দোলাতে আশেপাশে দেখে। হঠাৎ খাটের নীচে পা রেখে শুয়ে পড়ে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে। কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দেয়। আবার উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙে। বলে, নাঃ, খুব খিদে পেয়েছে। আছে কিছু খাবার-দাবার ?'

লোকটা শুধু ছেলে নয়, এখন তার ব্যবহারও যেন ছেলেমানুষিতে ভর্তি। শুভা এতে অবাক হয়, কোন জবাবই দিতে পারে না। কিন্তু তার ভয়টা অনেকখানি কেটে আসতে থাকে।

সে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'নেই, না ? আচ্ছা চলি।'

দরজার দিকে এগিয়ে যায়। শুভার ভিতরটা কী রকম অস্থির হয়ে ওঠে। লোকটা এভাবে সত্যি খেতে চেয়ে ফিরে যাচ্ছে, তাও কোনরকম দুর্ব্যবহার না করে, টাকা না নিয়ে, এটা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ খাবার সত্যি রয়েছে। খাওয়ালে কি খুব অন্যায় হবে !

লোকটা যখন ছিটকিনিতে হাত দেয়, তখন শুভার মুখে উচ্চারিত হয়, 'আছে।'

'খাবার আছে ?'

সে ঘুরে দাঁড়ায়। আবার জিজ্ঞেস করে, 'তোমার খাওয়া হয় নি বোধহয় ?'

শুভা ঘাড় নাড়ে। লোকটা বলে, 'না। মুখের খাবার খেতে চাই না। এমনি কিছু আছে ? পাঁউরুটি বিস্কুট, যাহোক, তা হলেই হবে।'

'ভাতই আছে।'

'তোমার ভাত ?'

এমনিতেই শুভা হয়তো খেত না। খেলেও, বেশীই আছে। বলে, 'বেশী আছে।'

বলতে বলতেই শুভা পাশের ঘরে গিয়ে, সংলগ্ন রান্নাঘরে, ভাত বেড়ে ফেলে। রান্নাঘরটা খুব ছোট নয়। নরেশের একলার মত ব্যবস্থা সবই আছে। একপাশে খাবার টেবিল-চেয়ারও আছে। সেই টেবিলের ওপরেই শুভা তাকে ভাত বেড়ে দেয়। আলুভাতে কাঁচালঙ্কা আর মাছের ঝাল।

লোকটা এক মুহূর্ত দেখেই, বসে পড়ে। শুভা ভেবেছিল, লোকটা বোধহয় হাতটা ধোবে। সে-সবের ধারে-কাছেও নেই। সোজা ভাতে হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করে। মুখে ভাত নিয়ে বলে, 'অনেকদিন এত তরিবত করে খাওয়া হয়নি মাইরি। বাজারটা খারাপ যাচ্ছে কি না, বিজনেস হচ্ছে না, টানাটানি চলছে।'

বলে, বিশ্রীভাবে হেসে, চোখ কোঁচকায়। আবার বলে, 'রোজ শালা ভাল করে জুটছেই না।'

শুভা কোন জবাব দেয় না। লোকটার খাওয়া দেখতে থাকে। তিন থাবাতেই প্লেট খালি। তাতে শুভা একেবারে অনভ্যস্ত নয়। প্লেটে খাওয়া বা খাবার বেড়ে দেওয়া, কোনটাতেই ও অভ্যস্ত নয়। কটা ভাতই বা এক প্লেটে ধরে। ও আবার

boiRboi.net

ভাত দেয়। সে খেতে খেতে আবার বলে, 'তবে, কাজ হাসিল হয়ে যাবে। লেগে যাবে ঠিক কোথাও না কোথাও।'

শুভা ভাবে, তার মানে চুরির দাঁও। অনেক দিন কোন লকার সিন্দুক ভাঙতে পারে নি। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরশু রাত্রের সেই দৃশ্য। ও সেই কথা বলবার জন্যে, মুখ খোলবার আগেই, কলিংবেল বেজে ওঠে। ও থতিয়ে গিয়ে চমকে ওঠে। আর একজনেরও খাওয়া থেমে যায়। চকিতে উঠে দাঁড়ায়। দুজনেরই চোখাচোখি হয়।

একজনের চোখে কুটিল সন্দেহ। আর একজনের চোখে আতঙ্ক। শুভা ভাবে, কে হতে পারে এ সময়ে? বিহানীর আসবার সময় তো এখনো হয়নি। সে চারটের সময়।

লোকটার নীচু সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ন গলা শোনা যায়, 'কে?'

আবার কলিংবেল বেজে ওঠে। শুভা আর দেরি করতে পারে না। সে চট করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, দরজা টেনে বন্ধ করতে যায়। লোকটা হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, 'না, আমাকে বন্ধ করা চলবে না।'

শুভা অবাক হয়ে বলে, 'না করলে দেখে ফেলবে যে! আগে দেখি, কে।'

লোকটার বাঁ হাতে একটা স্প্রিং-এর ছুরি চিক্‌চিক্ করে ওঠে। বলে ওঠে, 'কিন্তু যদি—'

কলিংবেল আবার বেজে ওঠে। শুভা প্রায় ধমকে ওঠে, 'চুপ করে বসে থাক। যা বলছি তাই কর, না হলে বিপদে পড়বে।'

দরজাটা টেনে শিকল বন্ধ করে ও তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে যায়। পাশের ঘরে গিয়ে, ছিটকিনি খুলে দেখে, নরেশের ড্রাইভার। শুভা মুখ-চোখ স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে বলে, 'কী হল আবার?'

ড্রাইভার বলে, 'ব্যাগটা আবার নিতে এলুম। আবার নিয়ে যেতে বললেন।'

শুভা সরে দাঁড়ায়। ড্রাইভার যেখানে ব্যাগটা রেখেছিল, সেখান থেকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ও দরজাটা বন্ধ করে ফিরে আসে। ওর বুকের মধ্যে তখনো ধক্ ধক্ শব্দ হচ্ছে যেন। বুঝতে পারে, ব্যাগের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যেটা কোন কারণে হঠাৎ লুকোবার দরকার হয়েছিল। বিপদ কেটে গিয়েছে, তখনই আবার নিতে পাঠিয়েছে।

ও ফিরে এসে রান্নাঘরের শিকলটা খুলে, দরজা ঠেলতেই দেখে, লোকটা দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। খাবার পড়ে আছে। দুজনের চোখাচোখি হয়। শুভা বলে, 'চলে গেছে।'

'কে?'

'নরেশবাবুর ড্রাইভার। একটা ব্যাগ নিতে এসেছিল।'

লোকটা আর একবার শুভার দিকে চেয়ে খেতে বসে। ভাত মুখে তুলে বলে, 'শালা খেতে বসেও শান্তি নেই।'

শুভার ঠোঁট দুটো আপনা থেকেই একটু বেঁকে ওঠে। বলে, 'এইসব যারা করে, তাদের কোথাও শান্তি আছে নাকি?'

boiRboi.net

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা জবাব দেয়, 'যারা অন্য কিছু করে, তাদের বুঝি খুব শান্তি আছে ?'

কথাটার হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না শুভা। প্লেট খালি দেখে ও আবার ভাত দেয়। সে আবার বলে, 'ও সব শান্তি-টান্তি দুনিয়া থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। খালি লড়াই আর লড়াই। একটু কাই পাওয়া যাবে ?'

শুভার লজ্জা করে ওঠে। লোকটা শুকনো ভাত খাচ্ছে, লক্ষ্যই করে নি। তাড়াতাড়ি মাছের সব ঝোলটা ঢেলে দেয়। এখনো ওর মধ্যে, পাড়াগাঁ মফস্বলের, সেই ইস্কুল মাস্টারের মেয়েটাই আছে। কাকে খেতে দিচ্ছে সেটা মনে থাকে না। খেতে দিয়ে, লক্ষ্য না রাখতে পারলে, এখনো লজ্জা পায়।

যে-খায়, তার ওসব নেই। পাওয়া গিয়েছে, খেয়ে নিচ্ছে। শুভা ওর খাওয়া দেখতে দেখতে বলে, 'সে লড়াইয়ের নমুনা তো সেদিন রাত্রে দেখলাম। ওভাবে যে পাইপ বেয়ে যাচ্ছিলে, যদি নীচে পড়ে যেতে ?'

'তুমি দেখেছিলে নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কী আবার হত, মাংস তালগোল পাকিয়ে যেত। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আবার কী। মরার বাড়া তো কিছু নেই।'

শুভার গায়ের মধ্যে শিউরে ওঠে। কোন কথা বলে না। লোকটা আবার বলে, 'রিস্ক না নিলে চলে ? কেল্লা ফতে হোক বা না হোক।' রিস্ক বাবা সবাইকেই নিতে হয়। তুমিও তো নিয়েছিলে, বাড়ি থেকে পালিয়ে। ফসকে গেল তাই।'

বলতে বলতে লোকটা শুভার দিকে একবার তাকায়। ঠোঁটের কোণে হাসি। শুভার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। লোকটাকে এখন ওর বিশ্রী লাগে। ওর মনে মনে রাগ হতে থাকে। একটা চোরের মুখে এসব শুনতে চায় না ও।

লোকটা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে। কোণের দিকে, কল খুলে মুখ ধোয়। পকেট থেকে একটা চিটচিটে ময়লা রুমাল বের করে মুখ মুছে ঢেকুর তোলে। তারপরে পকেট থেকে শস্তা সিগারেট বের করে জিজ্ঞেস করে, 'ম্যাচিস আছে ?'

শুভা তাক থেকে দেশলাই নিয়ে টেবিলের ওপর দেয়। নিজের হাতটা কলে ধুয়ে নেয়। ওর মেজাজ রীতিমত বিগড়ে গিয়েছে।

লোকটা সিগারেট ধরিয়ে আরামসূচক শব্দ করে। দেশলাইটা পকেটেই রাখে। তারপর ঘরে এসে খাটের ওপর বসে বলে, 'সেদিন তোমার ওই নরেশকে আমি আর একটু হলেই ঝেড়ে দিতাম।'

'মানে ?'

ঘুঁষি পাকিয়ে বলে, 'হাঁকতাম।'

'কেন ?'

'তোমাকে, আমার সামনেই ও যদি যা-তা আরম্ভ করত, মানে কামড়ে ছিঁড়ে যদি কিছু করত, তাহলে মারতাম।'

'কেন, তোমার তাতে কী ?'

boiRboi.net

'আমার আবার কী। এক এক সময় হয় না, ব্যাপার দেখলে, মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। তখন তোমাকে দেখে নরেশের ওপর রাগ হচ্ছিল। একটা মেয়েকে বাগে পেয়ে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে, মাল খেয়ে এসে—শালা!'

গালি দিয়েই সে থেমে যায়। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখ শক্ত করে। আবার বলে, 'তখন তোমাকে ভালই মনে হচ্ছিল। মানে তুমি যে ওর কেউ নও, একটা ভাল মেয়ে বেকায়দায় পড়েছ, তখন মনে হচ্ছিল।'

কথাগুলো যে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে বলছে, ওকে দেখে তা মনে হয় না। যেন নিজের মনেই বকবক করছে। এর মধ্যেই, একবার আস্তে একটু শিস্ দিল। শুভার ইচ্ছা করল, জিজ্ঞেস করে, এখন কী মনে হচ্ছে ওকে? এখন কি খারাপ মেয়ে মনে হচ্ছে?

'তবে নরেশ তোমাকে ছাড়বে না।'

বলতে বলতে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'যা দেখলাম সেদিন, ও তো একটা শালকুত্তা। কাল রাত্রেই গোলমাল করে দেয় নি তো?'

বলে, এমন বিশ্রী চোখে তাকায়, শুভার মনটা আবার দপ করে জ্বলে ওঠে। বলে ওঠে, 'দিলেই বা, তোমার কী?'

লোকটা বাইরের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, 'আমার আবার কী! দেখে শুনে যা মনে হল, তা-ই বলছি। ও তোমাকে খেয়ে ফেলে দেবে।'

'দিক। তুমি যাও এখন।'

সে কথায় যেন লোকটার কানই নেই। বলে, 'তোমার সেই কী, তারকদাটি কি সত্যি আর কোন দিন আসবে, যার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েছ?'

'আসুক বা না-আসুক, তাতেই বা তোমার কী?'

'কতগুলো লোচ্চা বাটপাড়ের পাল্লায় পড়েছ, তা-ই বলছি।'

'ভূতের মুখে রাম নাম! চোরের আবার বড় বড় কথা! তুমিই বা কী? বেরোও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

শুভার দুচোখ ধক্ ধক্ জ্বলে। ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। লোকটা নরেশের আয়রন সেফের কাছে দাঁড়ায়। বলে, বেরিয়ে যাব না তো কি তোমার বাবুর হয়ে থাকব? তুমি বা মেয়ে, ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছ। তা নইলে আর জোচ্চোরের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েছ?'

'তুমি যাবে কি না?'

শুভা এত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে যে, শুধু লোকটাই নয়, শুভা নিজেও চমকে ওঠে। তবু ও থামতে পারে না। আবার তেমনি গলাতেই বলে, 'তুমি না গেলে, আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব। নীচে দরোয়ানকে ডাকব।'

লোকটা হঠাৎ ওর কাছে চলে আসে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'তার আগে তোমার গলাটিপে শেষ করে দেব। চুপ!'

শুভা সত্যি চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, আমি চুপ—'

কথা শেষ করবার আগেই, ওর মুখে শক্ত থাবা চেপে বসে। একটা শক্ত থাবা মুখে চেপে বসে, আর একটা থাবা ঘাড়ের কাছে চেপে ধরে। চাপা গলায় শাসানি

boiRboi.net

শোনা যায়। 'চুপ বলছি।'

শুভা হাত দিয়ে মুখের থাবাটা খুলতে চেষ্টা করে। পারে না। জোর করে সরে যাবার চেষ্টা করে। তাও পারে না। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। মুখের থাবাটাও সরে যায়। কিন্তু ঘাড়ের হাতটা তখনো সরে না দেখে, ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করে, লোকটার মুখ দেখবার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ লোকটার মুখটাকে ও ওর নিজের মুখের সামনেই দেখতে পায়। তার গরম নিঃশ্বাস ওর মুখে লাগে। তার চোখে তীক্ষ্ন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। কী করবে লোকটা? কী চায়?

সহসা যেন পাথর হয়ে যায় শুভা। নড়তে চড়তে পারে না। ওর শিরদাঁড়ার কাছে, সেই ভয়ের কাঁপুনিটা যেন আবার অনুভব করে। আর ঠিক তখনই লোকটা ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে যায়। ঠিক যেন একটা রাগী ছেলে, এমনি ভাবে, ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে, নাকের পাটা ফুলিয়ে কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে সরায়। বলে, 'দুটো খেতে দিয়েছ তাই ছেড়ে দিলাম। বল তো পয়সাও দিয়ে দিতে পারি। হীরা সরকারের এখনো এত পোকা-পড়া অবস্থা হয় নি, বুঝলে?'

শুভা চুপ করে থাকে, কোন কথা বলে না। লোকটাকে ওর এখন একটা রাগী বোকা ছেলের মত লাগছে। কেন, ও তা নিজেও জানে না। ও যে রকম ভয়ঙ্কর একটা কিছু আশঙ্কা করেছিল, সে রকম ঘটল না বলেই বোধহয় এরকম মনে হয়। এবং এই প্রথম ও লোকটার নাম শোনে, হীরা সরকার। হীরা কি পুরুষের নামও হয় নাকি? হবে হয়তো, হীরালাল বা ওইরকম কিছু। কিন্তু শুভা হীরা নামে একটা মেয়েকে, ওদের দেশে চিনত।

হীরা পকেট থেকে একটা চিরুনী বের করে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার বলে, 'এতদিন ধরে বিজনেস্ নেই, তবু এত চোরাই টাকা থাকতেও ছেড়ে দিলাম, আবার বড় বড় কথা! আমিও দেখব, ওই তারকদাটি গেছে, এবার নরেশ মাক্ষীচুসের পাল্লায় পড়তে কতদিন লাগে। তারপরে কত পাল্লাতেই পড়তে হবে। তখন কোথায় এসব বুকনি থাকে ছুকরির, দেখে নেব।'

বলতে বলতে সে দরজার কাছে চলে যায়। আর শুভা অবাক হয়ে মনে ভাবে, ওর যাই হোক, এ লোকটার তাতে কী যায় আসে। হীরা তো একটা চোর। ওর যন্ত্র ফিরে পেয়েছে, খেতে পায় নি, খেতে চেয়েছে, শুভা দিয়েছে। শুভার নিজের ভাতও খেয়ে নিয়েছে। এখন শুভাকে নিয়ে ওর মাথাব্যথা কিসের! তারকদা আসবে কি না, নরেশ কিছু করেছে কিনা, সে খোঁজ নিয়ে ওর কি হবে! আর জিজ্ঞেস করার যা ছিরি, তাতে যে-কোন মেয়েরই খারাপ লাগবে।

অবিশ্যি ওর কাছে ভাল-মন্দর আশাই বা কী থাকতে পারে? হীরা যে ওকে কী চোখে দেখছে, সে তো হীরার কথাবার্তা ভাব ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে। শুভা একটা নোংরা খারাপ মেয়ে, জোচ্চোর লোচ্চাদের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে, থাকে। আর ও নিজে যে একটা চোর, সে কথা যেন ভুলেই যাচ্ছে। শুভাকে নোংরা খারাপ ভাববার লোকের অভাব নেই সমাজে। এ কেন, এই হীরা সরকার, নাকি তালাগুণীন, যে-ই হোক।

ছিটকিনি খোলার শব্দে শুভা দরজার দিকে ফিরে চায়। হীরা শক্ত মুখে

boiRboi.net

তাকিয়ে, বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে বলে, 'আমার কাঁচকলা, তুমি মরগে। কিন্তু আমি এসেছিলাম, লকার খুলেছিলাম, এসব যদি বলে দাও, তাহলে তোমাদের কারুরই ভাল হবে না বলে দিলাম। তারপরে আমার পেছনে ফেউয়ের মত পুলিস লেগে থাকবে, মাল কড়িও হাতালাম না, ওসব ঝুট-ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।'

বলেই সে দরজাটা খুলে বেরিয়ে যায়। শুভা তেমনি এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে ও যেন আস্তে আস্তে অবাক হয়ে, নরেশের স্টিল সেফের দিকে চায়। সত্যি লোকটা টাকা নিল না। শুভাকেও কোনরকম শারীরিক আঘাত বা অপমান করল না। মানুষের লোভের ক্ষেত্রে, এ-ঘটনাকে, শুভা ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে না। অথচ লোকটা একটা চোর। মানুষের টাকার আকাঙ্ক্ষা, তার জন্যে অন্যায়, ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছে, মেয়েদের প্রতি পুরুষের লোভের নীচতা। কলকাতায় এসে তার ভয়াবহ রূপ দেখেছে। এখন সেই পরিবেশেই ওর বাস। তার কোনটার সঙ্গে এ ঘটনা মেলাতে পারে না।

পূর্বাপর, সমস্ত ঘটনাই আবার ওর মনে পড়তে থাকে। হীরা সরকার নামক একটা চোরের কথা ভেবে, ও যেন কোন কিছুরই থৈ পায় না। তারপর এক সময়ে, সামান্য বাতাসে দরজাটা নড়ে উঠতে খেয়াল হয়, দরজাটা খোলা রয়েছে। ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, ভিতরের ঘরে গিয়ে, রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। এঁটো থালা বাসনের দিকে তাকিয়ে দেখে। লোকটা সত্যি খেয়ে গিয়েছে। লোকটাকে নিজের হাতেই শুভা খাইয়েছে।

কেন যেন, শুভার সমস্ত মন জুড়ে সহসা ছায়ার মত, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। একটা অচেনা-অজানা কষ্টে, ওর চোখে জল এসে পড়ে। খাটের ওপর এসে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে। নিজের খাওয়ার কথা ওর আর মনে থাকে না।

বিকালে বিহানী আসে। শুভাকে ঠাট্টা করে বলে, তবে যে মেমসাহেব বলেছিল রান্নাই করবে না। আজ তো দেখা যাচ্ছে একটু কিছু খাবার পড়ে নেই, সব খাওয়া হয়ে গিয়েছে। শুভা উপবাসী মুখ তুলে, বিহানীর দিকে চেয়ে হাসে। বলে, এত খেয়েও ওর খিদে যায় নি। এখন আবার একটু চা রুটি খাবে। বিহানী বলে, 'সে-ই তো ভাল। মেমসাহেবের শরীর ভাল হবে।'

বিহানী চলে যায়। আবার—আবার সেই রাত্রের প্রতীক্ষা। সে-ই ভয়ঙ্কর রাত! তবু, সন্ধ্যা রাত্রে বারে বারেই শুভা চমকে উঠেছে। যেন ও কোন শব্দের জন্যে উৎকর্ণ। কিন্তু রাত গড়িয়ে যায়। কোন শব্দই হয় না। তারপরে থাকে শুধু মধ্যরাত্রের সেই কুৎসিত আক্রমণ আর আত্মরক্ষার প্রতীক্ষা।...

★

পরদিন বিকালে বিহানী এসে চলে যাবার পরে, শুভা সমস্ত বাতি নিবিয়ে অন্ধকার করে দেয়। কতক্ষণ চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেরই খেয়াল থাকে না। আজ ও অন্যদিকের জানালা খুলে, হোটেলের নামে, সেই মেয়েদের বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে, এক একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে ওঠে।

boiRboi.net

কখনো নগ্ন মেয়ে, নগ্ন পুরুষ আলাদা। কখনো আলিঙ্গনাবদ্ধ। পান ভোজন আদিম রিপুর নানা লীলা, হঠাৎ হঠাৎ এ জানালায়, ও দরজায় ভেসে ওঠে, আবার ঢাকা পড়ে যায়। ও বাড়িটা, এদিকের অংশটাকে ভয় পায় না। ভয় হয়তো কোন কারণেই পায় না। তবু আড়ালে রাখার যে একটা সাবধানতা আছে বা দেহ-ব্যবসারও যে একটা গোপনীয়তা আছে, এদিক সম্পর্কে সেই সচেতনতাও যেন নেই।

শুভা ভাবে, ওরা কি সত্যি খুব দুঃখী। ওরাও হয়তো অনেকেই একদা শুভার মত কুমারী ছিল। বাপ মা ভাই বোন ছিল। কেউ হয়তো বিবাহিতা, যে স্বামী ছাড়া কিছুই জানত না। কিন্তু সব ছেড়েই তো ওরা এসেছে ওখানে। ওরা এমন কি ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া, ওরা যা পারে, শুভা তা পারে না! আসলে শুভা হয়তো মিথ্যে ভয় পায়।

মিথ্যে ভয়। শুধু কি তাই! ভয় তো আছেই এবং তা মিথ্যা ভয়ও নয়। তার সঙ্গেও আরো অনেক বাধা, বীভৎস চিন্তা ওকে যেন শিউরে তোলে। অথচ, ওই বাড়িটার কোন কোন দৃশ্য, ওর রক্তের মধ্যে একটা উত্তেজনাও এনে দেয়। ওর রক্ত-মাংসের শরীরের মধ্যে, একটা সুপ্ত বাসনা আপনা থেকেই জেগে ওঠে। ওর মনকে অসুস্থ করে, ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ করে তোলে।

শুভা জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যায়। তখনই কলিংবেল বেজে ওঠে। শুভা থমকে যায়। একটু থেমে আবার বেল বেজে ওঠে। শুভা যেন যন্ত্রচালিতের মত এ ঘরের বাতি জ্বালায়। সামনের ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে দরজার ছিটকিনিটা খুলে দেয়।

হীরা ঢোকে। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ওর হাতে কিসের একটা ছোট প্যাকেট। প্রথমেই বলে, 'এসে পড়লাম। রাগ হচ্ছে না তো?'

বলেই ও যেন চমকে ওঠে। বলে ওঠে, 'আরে, গালে কিসের দাগ? কেটে গেল কী করে?'

এমন পরিচিতের মত কথা বলে, যেন ওর নিজের পরিচয়টাও ভুলে গিয়েছে। শুভার অনেকখানি কাছে এসে বলে, 'নিশ্চয় নরেশের কীর্তি? ছুরি-টুরি চালিয়েছিল নাকি?'

শুভা বলে, 'না। কিন্তু তুমি কি মনে করে?'

'আমি?'

হীরা ঠোঁট বাঁকিয়ে হাত উল্টে বলে, 'আমি কাজেই বেরিয়েছি। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। আর একটু ইয়ে নিয়ে এলাম—মানে খাবার। তুমি কাল আমাকে খাওয়ালে। আমিও একটু নিয়ে এলাম।'

শুভা অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শুভার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। হীরা আবার বলে, 'আর দেখেও মনে হচ্ছে, আজ সারাদিন খাওয়া হয় নি। কালও হয় নি। দুপুরেরটা তো আমিই সেঁটে গেছি। রাত্রে তো নরেশ খুবই খাইয়েছে। কিন্তু কী দিয়ে মারল বল তো?'

বলে, খাবারের প্যাকেটটা খাটের কাছে টেবিলের ওপর রেখে, চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে। যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। ওর নির্বিকারত্বও তেমনি।

boiRboi.net

শুভা বলে, 'নরেশের ঘড়ির সোনার ব্যাণ্ডে লেগেছে।'

'তার মানেই শালা হাত চালিয়েছিল। এবার একদিন মটকে দেব ওর সোনার ঘড়ি পরা হাতের কব্জি।' হীরা শক্ত মুখে বলে।

শুভা বলে, 'কেন, তুমি ওর হাতের কব্জি ভাঙবে কেন?'

'ও মারবে কেন?'

'তোমাকে তো মারেনি। তোমার কী?'

'আমার আবার কী, আমার কিছুই না। কিন্তু হাতে পেয়ে একটা মেয়েকে এরকম করবে কেন?'

'তুমি ওকে মারলে, আমার কী হবে?'

হীরা কোন জবাব দিতে পারে না। তারপরে হঠাৎ প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'তোমার কী হবে, তা আমি কী জানি!'

শুভা না-হেসে পারে না। এবং হেসে ও নিজেই অবাক হয়। সত্যি, এখনো ওর হাসি আছে তাহলে। এখনো হাসি পায়। কিন্তু হীরার রাগের ভঙ্গি আর কথা শুনলে না হেসেও পারা যায় না। অথচ ওর দুর্গতি দেখে একটা ছেলে রেগে উঠছে দেখে শুভার ভিতরে একটা খুশির ভাবই শুধু আসে না, চোখ দিয়ে যেন জল এসে পড়তে চায়।

গতকাল রাত্রে নরেশের সঙ্গে রীতিমত হাতাহাতি হয়েছে। নরেশ ওকে মারতে পর্যন্ত দ্বিধা বোধ করে নি। যেদিন থেকে নরেশ শুভাকে পাবার সঙ্কল্প করেছে, সেদিন থেকেই সে সব কিছু করতেই প্রস্তুত, প্রয়োজন বোধে শুধু মারা না, তার চেয়ে বেশি কিছু করতেও রাজী। বিশেষ, মদ খেয়ে যখন আসে, তখন সে একেবারে বেপরোয়া পশু।

নরেশ গত রাত্রে শুভার মুখে ঘুষি মারবার জন্যেই হাতটা তুলেছিল। শুভা চকিতে সরে যাবার সময়, খুব জোরে ঘড়ির ব্যাণ্ড গালে ঘষে গিয়েছিল। শুভাও অন্ধের মত নরেশের টেবিলের ওপর থেকে স্টীলের কলম আর পেন্সিল রাখবার পাত্রটা সজোরে ছুঁড়ে মেরেছিল। নরেশের গায়ে সেটা লাগে নি। কিন্তু শুভার গালে রক্ত দেখে সে একটু থমকে গিয়েছিল। সেই ফাঁকেই শুভা পাশের ঘরে ছুটে গিয়েছিল। তাও ওর একমুঠো চুল অন্তত নরেশের হাতে থেকে গিয়েছিল। দরজা বন্ধ করে দেবার পরে, অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কা দিয়ে, আঁচড়ে, চিৎকার করেছে নরেশ।

গতকাল শুভা খায়নি, তবু বিহানীর কথায় রান্না করেছিল! আজ তাও করেনি। আজ মনস্থির করতে ওর সারাদিন গিয়েছে। তাই আজও নরেশের সঙ্গে ওকে মোকাবিলা করতে হবে। আগামীকাল সকালে, যেমন করে হোক হাওড়ায় গিয়ে, বাড়ি ফিরে যাবেই। এই ওর শেষ সিদ্ধান্ত। আত্মহত্যা যদি করতে হয়, তবে সেখানে গিয়েই। তবু একবার সবাইকে দেখতে পাবে। রাগ করুক, ঘৃণা করুক, তাড়িয়ে দিক, মারুক-ধরুক তবু তো একবার সবাইকে দেখতে পাবে। সবাইকে দেখে মরতে পারবে।

কিন্তু শুভার মনটা বিস্ময়ে ভরে যায় হীরার কথা শুনে। পৃথিবীতে এখনো

boiRboi.net

যে ওর জন্যে কারুর করুণা হয়, ওর প্রতি অত্যাচারে কারুর রাগ হয়, এটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, এখনো ওর মুখের দিকে চেয়ে কেউ যে ওর উপবাসের কথা ভাবে, বিশ্বাস করা যায় না। আর সে লোকটা একটা চোর। গতকাল চেয়ে খেয়ে গিয়েছিল বলে, সেই লোক আবার আজ হাতে করে খাবার নিয়ে এসেছে। কী অদ্ভুত ভাগ্য শুভার। হাসতে গেলে, রেগে নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। ধিক্কার দিতে গিয়ে কান্না পায়!

হয়তো এ মানুষ, আর দশ জনের মত গলা নরম করে, মিষ্টি করে কথা বলতে পারে না। লোকটার ভিতরে আরো নিগূঢ় শয়তানি কিছু আছে কি না কে জানে! আপাতত, এ অবস্থায়, লোকটাকে কেন যেন খারাপ ভাবা যায় না কিছুতেই। বরং অনেক মানুষের থেকে, অনেক বেশি অন্য মানুষ বলে মনে হয়। এখন বুঝতে পারে শুভা, এ লোকটা আসুক মনে মনে যেন এরকম ও চেয়েছিল। অন্য কোন কিছুর জন্যে নয়, তবু একটা লোকের সঙ্গে ভয়ে রাগে সন্দেহে কথা বলা যায়। এমন কি ঝগড়াও করা যায়। অথচ সে কোন ক্ষতিই করে যায় না।

হীরা আবার বলে, 'তবে আমি ভালভাবেই জানি, নরেশ তোমাকে ছাড়বে না।'

'তার জন্যে আমি আর ভাবি না। কাল সকালেই আমি বাড়ি চলে যাব।'

হীরা অবাক হয়ে বলে, 'বাড়ি মানে তোমাদের দেশে?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়িয়ে দেবে না? তুমি তো পালিয়েছিলে।'

'তাড়িয়ে দিক, তারপরে মরব। তবু তো সবাইকে দেখে মরতে পারব।'

হীরা হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলে, 'যাঃ বাবা! দেখে যাবে, সবাইকে দেখে তারপরে মরে যাবে?'

আগাগোড়া ব্যাপারটা সে হৃদয়ঙ্গমই করতে পারে না যেন। তারপরে হাত উল্টে দিয়ে বলে, 'কি জানি বাবা, তোমাদের সব ব্যাপারই আলাদা। আমি ওসব বুঝি না।'

হীরার মুখ দেখে, এমন দুঃসময়ে দুঃখেও, শুভার হাসি পায়। হীরা শেষ পর্যন্ত এর একমাত্র উপায় হিসাবে বলে, 'বড্ড শীত করছে, একটু চা খাওয়াবে?'

শুভা বলে 'দেব।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল। যে যার নিজের কাজ কর বাবা। তুমি মরতে যাও আমি আমার কাজে যাই, ফুরিয়ে গেল ল্যাটা।'

'তোমার কাজে যাওয়াও তো মরতে যাওয়াই।'

'তা মানুষের কখন মরণ আছে কেউ বলতে পারে?'

'তুমি মরতে যাও জেনেশুনে।'

হীরা কোন জবাব দেয় না। শুভা আবার বলে, 'এতে সুখ কিসের? অন্য কোন কাজ করতে পার না?'

'তুমিই বা তারকদার সঙ্গে পালাতে গেলে কেন? বাড়ি থেকে বিয়ে দিত না?'

শুভা থমকে যায়। হীরার দিকে চেয়ে আজ তার রাগ হয় না। ওর উপবাসী ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে, লাল লম্বা কাটা ক্ষতের চিহ্ন যেন সমস্ত মুখটাকে বদলে দিয়েছে।

boiRboi.net

বলে, 'যদি দিত, কোন আশা থাকত, তবে কি এই ছলনায় ভুলি ?'

'আমারও তাই ভাবনা কেন। পরের সিন্দুক ভাঙতে কি আর এমনি শিখেছি ? আপনি বাঁচলে বাপের নাম ; কিছু না হোক ভাত তো জুটবে।'

সুভা বলে ওঠে, 'না তো, মাংসের দলা পাকিয়েও মরা যাবে।'

'তাহলে তো সব ল্যাটাই চুকে যায়।'

শুভা কয়েক মুহূর্ত হীরার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার তুলনা চলে না। আমি মেয়ে, তুমি পুরুষমানুষ।'

হীরা অদ্ভুত ভাবে ঘাড় দুলিয়ে হাত নেড়ে বলে, 'তবে আর কী, পুরুষ হলে দশটা হাত-পা বেশি গজায়।'

'তোমাদের কত সুযোগ-সুবিধা।'

'ওসব ছেঁদো কথা ছাড় দিকিনি। সুযোগ-সুবিধেই যদি থাকবে তাহলে তো লোকের আর কষ্ট থাকত না। দেখছি তো, চারদিকে সুযোগ-সুবিধের ছড়াছড়ি !'

তারপরে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'যাকগে, ওসব বলতে আমার ভাল লাগে না। জীবনে সুযোগ-সুবিধের পেছনে অনেক ঘুরেছি। যাদের ষোল বছর বয়স থেকে পেটের ধান্দায় ঘুরতে হয় তাদের আর ওসব শেখাতে হবে না। তার ওপরে যদি আবার কাঁড়ি খানেক ভাই-বোন থাকে। সুযোগ-সুবিধে কাকে বলে, তা আর জানি না ? টাকা থাকলে, ফেরববাজী বদমাইসি কালোবাজারি ফাটকা, এই যা সব করে তোমার নরেশ, সে সব সুযোগ-সুবিধে থাকলেও কাজ হয়। আর আমি না হয় তালা ভাঙি। তাবলে, আমি কুলিগিরি করতে পারব না।'

শুভা বলে, 'চুরির থেকে, তাও ভাল।'

হীরা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে চায়। মুখটা শক্ত দেখায়। বলে, 'এই দ্যাখ, তোমার বক্তিমে শুনিও না মাইরি আমাকে। ওসব আমি অনেক শুনেছি। আরে বাবা, কিছু না হোক ক্লাস টেন পর্যন্ত তো পড়েছি। তারপরে বাবা মরে গেল বলে, আর হল না। কুলিগিরি করব কেন। যত হেঁজি পেঁজি মাল, হাজার দু'-হাজার টাকা লুটবে, আর আমি কুলিগিরি করব ? চাকরির ব্যাপার আমার জানতে বাকী নেই, ওখানে কী হয়, সব জানি।'

'কী আবার হবে। তুমি একটা চাকরি যোগাড় করতে পারবে না ?'

'যখন দরকার ছিল, তখন পারিনি। এখন আর ওসব হবে না।'

'কেন ?'

হীরা বিরক্ত ক্রুদ্ধ মুখে তাকায়। বলে ওঠে, 'ধুত্তোরি তোর নিকুচি করেছে, এ দেখছি একেবারে গোঁসাই ঠাকরুণ। বেশ্যাকে সতী না করে ছাড়বে না। আমি এখন একটা চোর, বুঝেছ ? একটা চোর ! ষোল বছর বয়স থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত মরতে মরতে চেষ্টা করেছি, তারপরে আমি আমার পথ পেয়েছি। এবার তুমি বকবক কর, আমি চললাম। আজ আমার রাত্রের যাত্রাটাই খারাপ।'

সত্যি সে দরজার দিকে যায় দেখে শুভা বলে ওঠে, 'চা খাবে না ?'

'কোথায় আর দিচ্ছ, খালি তো ঠাকুরালি হচ্ছে।'

boiRboi.net

শুভা ভিতর ঘরের দিকে চলে যায়। লোকটার কথাবার্তা ওর খুব অদ্ভুত লাগে। ওর অনেকগুলো ভাই-বোনও আছে। কথাবার্তা ঠিক চোরের মতও নয়। কিন্তু 'পথ পেয়েছি' মানে কী। চুরি কি কারুর পথ হতে পারে। তা-ই যদি হয়, সে পথই বা তারা পায় কেমন করে। হিটার জেবলে চায়ের জল গরম করতে করতে, ওর এসব মনে হতে থাকে।

'শুভা!'

শুভার বুকের মধ্যে একেবারে ধক্ করে ওঠে। পুরুষের গলায় এরকম ডাক ও বহুকাল শোনে নি। নরেশে ডাক আলাদা। অনেকদিন পরে যেন একটা সুস্থ পরিচ্ছন্ন গলায় নিজের নামটা শুনতে পেল। পিছন ফিরে দেখে, হীরা দাঁড়িয়ে। হাতে খাবারের প্যাকেট। সে বলে, 'এটার কথা ভুলেই গেছলাম। আর তুমিও সত্যি খাও নি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এটা খেয়ে নাও, মাংসের রোল আছে।'

শুভা ওর চমকানোটা কাটিয়ে, অবাক হয়ে বলে, 'রোল?'

'হ্যাঁ, ওই আর কি পরোটা মাংস মেশানো।'

'কিসের মাংস?'

'খাসীর।'

একটু যেন আশ্বস্ত হয় শুভা। তবু বলে, 'তুমি খাও না, আমার দরকার নেই।'

'খুব দরকার আছে। আরে বাবা চোর হতে পারি, নজরটা তো খাই নি। দরকার আছে কী না, তাতো দেখতেই পাচ্ছি।'

বলতে বলতে হীরা একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। টেবিলের ওপর খাবারের প্যাকেটটা রেখে, সে শুভার দিকে তাকায়। শুভা তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে। হীরা শুভার গালের ক্ষতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একেবারে গালে হাত দিয়ে বলে, 'দেখি।'

শুভা মনে মনে ভীষণ চমকে যায়, শরীরটা শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে হীরা হাত দিয়ে গাল ফিরিয়ে ক্ষতটা দেখতে থাকে, প্রতিবাদ করাও যায় না। অথচ মনে মনে অবিশ্বাস, সঙ্কোচ, ভয় সবই আছে।

গালটা ছেড়ে দিয়ে, এক পা সরে যায় হীরা, তার মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি কঠিন। বলে, 'আমি হলে, শালার দুটো গালের মাংস ঝুলিয়ে দিতাম!'

শুভা ততক্ষণে হীরার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গরম জলে চা ঢালে। কিন্তু ওর মুখে একটা লাল ছোপ পড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। হীরার আচরণটা হয়তো খুবই সহজ। শুভা যেন লজ্জায় কেমন গুটিয়ে যায়। অথচ একটা রাগ রাগ ভাবও যেন ভিতরে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গেই, ওর মনে হয়, গালে যেন হীরার হাতের স্পর্শটা লেগেই আছে। ভারি সাহস তো ছেলেটার। অসভ্য! একথা মনে মনে বলে ওঠে শুভা। তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

কিন্তু যার সম্পর্কে শুভা এসব ভাবে, সে তখন রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, শুভার খাটে বসে বলতে থাকে, 'কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। আর ক'দিন চালাবে তুমি এভাবে। নরেশ তো কুকুরের মত ক্ষেপে আছে। অবিশ্যি আমার কিছু নয়, আমার আর কী। একটা খুন খারাপি হয়ে যাবে কখন…।'

boiRboi.net

তার কথা শেষ হবার আগেই, শুভা চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয়। হীরা অবাক হয়ে বলে, 'কী হল ?'

'কী হবে ?'

'তোমার মুখটা কীরকম রাগ রাগ দেখাচ্ছে।'

শুভা গম্ভীর ভাবেই বলে, 'তোমাকে বাজে কথা কে বকবক করতে বলেছে। আমি তো বললামই, কাল সকালে আমি বাড়ি চলে যাব।'

হীরার যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বলে ওঠে, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো দেশে গিয়ে, তারপরে মরবে। ভুলেই গেছলাম।'

শুভা ভুরু কুঁচকে তাকায় হীরার দিকে। হীরা খুব স্বাভাবিক মুখেই, চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মনে হয় না যে, কথাটা কোনরকম বিদ্রূপ করে বলেছে। সে চায়ের কাপ নিয়ে উঠে, পাশের ঘরে যেতে যেতে বলে, 'অদ্ভুত ব্যাপার বাবা, এরকম যে কেউ করতে পারে, ভাবতেই পারি না, মাইরি।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে 'আচ্ছা সত্যি বলছ, তুমি দেশে গিয়ে বাবা মাকে দেখে, তারপরে সুইসাইড করবে ?'

শুভা জবাব দিতে গিয়ে, অবাক হয়ে দেখে, হীরার মুখে একটা গভীর উদ্বেগ আর বিস্ময়। হীরার মুখ দেখে, বিষয়টা শুভার যেন নতুন করে মনে হয়। নিজেকেই মনে মনে প্রশ্ন করে, 'সত্যি কি আমি তা পারব ?' একটু আগেই ওর মনের মধ্যে, লজ্জার সঙ্গেই যে বিরূপতা এসেছিল, তা কেটে যায়। বলে, 'তাছাড়া আর কী করব বল। বাবা মা যদি তাড়িয়ে দেয়, আর আমার কী গতি আছে। কিন্তু এখানে আর একটা রাত্রিও থাকতে পারছি না। আজকের রাতটা কেমন করে কাটাব, তা-ই ভাবতে পারছি না।'

হীরার দৃষ্টি এখন নরেশের লকারের ওপর পড়ে। বলে, 'দেখ বাপু, আমি একটা কথা বলি, শুনবে ?'

'কী ?'

'শঠে-শাঠ্যংই ভাল। মরবার দরকার কী। লকার খুলে দিচ্ছি, কিছু না হোক সত্তর-আশি হাজার টাকা নিশ্চই আছে। টাকাটা নিয়ে কেটে পড় না তার চেয়ে।'

শুভা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। হীরা আবার বলে, 'আর তোমার কাছে এত টাকা আছে জানলে, দেখবে বাবা মা হয়তো তাড়িয়ে দেবে না। চাই কি, টাকার জোরেই একটা ভাল বিয়েও হয়ে যেতে পারে।'

কথাগুলো এমন বিশ্রী জঘন্য সত্যের মত শোনায় যে, শুভার আজন্মের ভিতটাই ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। শোনা মাত্রই ও বুঝতে পারে, হীরার প্রত্যেকটা অনুমানই অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেতে পারে। পারে নয়, ফলেই যাবে। কিন্তু—কিন্তু একজনের লকার থেকে, এতগুলো টাকা, হাজার হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাবে শুভা !...না অসম্ভব, ওর দ্বারা তা হবে না। একটা লোকের সঙ্গে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে। নিজেকে ও ভাল ভাবে না। এমন কি, যার সঙ্গে এসেছিল, তাকে যে ভালবেসে এসেছিল, তাও ঠিক নয়।

boiRboi.net

একটা চোখ ধাঁধানো ঝলকে চলে এসেছিল। এক সঙ্গে সংসার করলে, কী হত, ও জানে না। নিজের সম্পর্কে শুভার কোন ভাল ধারণা নেই। তবু লকারের টাকা চুরি করে, এভাবে ও পালাতে পারবে না। শুভা মাথা নেড়ে বলে, 'না, পারব না।'

হীরা বলে, 'কেন? তুমি তো আর চুরি করছ না। করছি তো আমি। আমি তোমাকে চুরি করে দিচ্ছি।'

শুভা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'না না, কিছুতেই পারব না। তার থেকে মরা সহজ।'

'তার থেকে মরাও সহজ?'

হীরা যেন রাগতে গিয়ে, অবাক হয়ে হেসে ফেলে। চায়ের শূন্য কাপ রেখে দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। তুমি কাল চলে গেলে, পরশু রাত্রে এসে আমি টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে যাব। নরেশ আমার টিকিটিও ধরতে পারবে না। তাছাড়া, আমি হলপ করে বলতে পারি, এত টাকা ঘরে রাখা মানেই কালো টাকা। তা নইলে নির্ঘাত ব্যাংকেই রাখত। তাই, পুলিসকেও বলতে পারবে না।'

শুভার দিকে চেয়ে আবার বলে, 'এখনো ভেবে দেখ।'

শুভা ঘাড় নেড়ে বলে, 'দেখেছি। পারব না।'

'বোকার মরণ হলে যা হয়, তা-ই হবে। তোমার তারকদা কোনদিন আসবে না, নরেশ রোজ রাত্রে এসে মারপিট করছে, আর এখন তুমি দেশে যাচ্ছ মরতে, কোন মানে হয়? আরে বাবা, এ উৎপাতের টাকা তো চিৎপাতেই যাবে। তুমি নিয়ে গিয়ে যদি নিজের একটা হিল্লে করতে পারতে, তাহলে একটা ভাল কাজে লাগত।'

শুভা কোন জবাব দেয় না। কথাগুলো যে তার মধ্যে কোন আলোড়ন তোলে না, তা নয়। টাকা থাকলে জীবনের হিল্লে হয়। অন্তত শুভার বর্তমান অবস্থায়। এবং সম্ভবত এ টাকা চুরি গেলে নরেশ কাউকে প্রকাশ করতে পারবে না। শুভার পিছনে ধাওয়া করেও সে বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

তবু মূলে তো সে-ই এক। তারকদার সঙ্গে পালিয়ে ওর কোন হিল্লে হয় নি। নরেশের টাকা নিয়ে পালানোও, আর একটা অন্যায় লোভ। প্রতি মুহূর্তে একটা উদ্বেগ থাকবে। ভিতরে ওর কোথাও কোন সমর্থন নেই।

কিন্তু হীরার ওপর ওর রাগ হতে থাকে। হীরার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোর খণ্ডন করতে পারে না বলেই ওর রাগ হয়। তার ওপরে, ও চলে গেলেই হীরা টাকাগুলো নিয়ে যাবে, একথা ভেবে, হীরার ওপর যেন বিদ্বেষ অনুভব করতে থাকে। একটু পরে বলে ওঠে, 'আমার হিল্লে না হোক, চোরের হিল্লে তো হবে।'

হীরা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'যা খুশি তাই বল, তোমাদের ওসব সতীগিরি আমি বুঝি না বাবা।'

শুভার চোখ জ্বলে ওঠে, মুখ শক্ত। বলে, 'চোরেরা শুধু চুরিই বোঝে। খুব আসকারা দেওয়া হয়েছে একটা চোরকে। এখন তুমি যাও।'

হীরার মুখে তীক্ষ্ন বাঁকা হাসিতেও রাগের ঝিলিক হানে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'আসকারা কে কাকে দিয়েছে, ভেবে দেখো। তোমার এত ছাট আর ঠাট অনেক আগেই আমি ভেঙে দিতে পারতাম। নেহাত—।'

boiRboi.net

'নেহাত্ কী ?'

'কী জানি শালা, সেই রাত্রে কী চোখে দেখে ফেললাম, মনটা একটু ইয়ে হয়ে গেল।'

'চোরের আবার মন।'

'ওসব তোমাদের মত ছুঁড়িদেরই থাকে, কী বল, অ্যাঁ? যাকগে বাবা, আজ রাত্রের যাত্রাটাই আমার খারাপ মনে হচ্ছে। চলি···হ্যাঁ খাবারটা খেলে না?'

শুভা তৎক্ষণাৎ ভিতর ঘরে গিয়ে, রান্না ঘর থেকে খাবারের প্যাকেটটা এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেয়, 'নিয়ে যাও তোমার খাবার, বেরিয়ে যাও এখুনি।'

কয়েকটা রোল ছড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। মোড়ক খুলে, মাংস বেরিয়ে পড়ে। গন্ধ ছড়ায়! সেদিকে তাকিয়ে হীরা বলে, 'হ্যাঁ, এ খাবার তো ফেলে দেবেই! বড়লোক নরেশের ভাল খাবার খেয়ে খেয়ে—।'

কথা শেষ হবার আগেই, দরজায় শব্দ বাজে। সেই শব্দ, সেই উন্মত্ত, অন্ধ প্রচণ্ড করাঘাত। হীরা থেমে যায়। দু'জনেরই মুখের ভাব বদলে যায়। দু'জনেই অবাক হয়ে চোখাচোখি করে। হীরা চকিতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা হাত ঘড়ি বের করে সময় দেখে। মাত্র দশটা! এ সময়ে নরেশ আসে না। অথচ শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে, সে-ই এসেছে।

দু'জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু দরজায় সমানে শব্দ হয়ে যেতে থাকে। হীরা ভিতর ঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে, আবার ফিরে প্রথম দিনের মত ঢাউস আলমারিটার পাশেই লুকিয়ে পড়ে। শুভা তখনো বিমূঢ়ভাবে হীরার দিকেই চেয়ে রয়েছে। হীরা দরজা খুলে দেবার ইশারা করে।

সেই ইশারাতেই যেন শুভার সম্বিত ফিরে আসে। ও প্রায় একটা অন্যমনস্কতার ঘোরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়! নরেশ ঝড়ের বেগে ঢোকে এবং চকিতে শুভাকে আঘাত করে গর্জে ওঠে, 'কোন নাগরের সঙ্গে শুয়েছিলে, যে এতক্ষণ লাগে দরজা খুলতে।'

আঘাতটা শুভার কান ঘেঁষে গালের ওপরেই পড়ে। আজ যেহেতু ও তেমন সচেতন ছিল না, তাই প্রস্তুত ছিল না, সেজন্যেই আঘাতটা এড়িয়ে যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, নরেশ মুহূর্তের মধ্যে, ওর ঘাড়ের কাছে জামাটা শুদ্ধ চেপে ধরে। এক হ্যাঁচকা টানেই, শুভাকে একেবারে বুকের কাছে আছড়ে ফেলে।

শুভার গলায় অস্ফুটে একবার শোনা যায়, 'খবরদার!'

তারপরে ও দু'হাত দিয়ে নরেশকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। নরেশের বুকের জামাটা চেপে ধরতে, জামাটা খানিকটা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু নরেশের আর এক হাত তখন কঠিন পাশে শুভাকে বেষ্টন করেছে। তার গলায় শোনা যায়, 'কত তোমার তেজ আর জোর, আজ আমি দেখব। দরকার হয়, গলা টিপে নিকেশ করে দেব।'

বলতে বলতে সে তার বীভৎস ভয়ংকর মুখটা শুভার মুখের ওপর নামিয়ে নিয়ে আসে। শুভার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ওর দুই চোখে আতঙ্ক, আর আত্মরক্ষার দুঃসহ চেষ্টা। কিন্তু কিছুতেই নরেশের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে

boiRboi.net

পারে না। ওর জামায় এত জোরে টান পড়ে, বেআবরু হয়ে যাবার মত হয়। নরেশের সর্বগ্রাসী ঠোঁট ঝাঁপিয়ে পড়ে শুভার গালের ওপর।

শুভার গলায় একটা আর্তধ্বনি শোনা যায়, 'না না।'···

সেই মুহূর্তেই ঘরটা অন্ধকারে হঠাৎ ডুবে যায়। নরেশ এত ত্রস্ততার মধ্যেও, চমকে ওঠে। বলে ওঠে, 'কে?'

তার আলিঙ্গনও একটু শিথিল হতেই, শুভা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। নরেশ আবার চিৎকার করে ওঠে, 'কে বাতি নেভালে, কে?'

ইতিমধ্যে, শুভার হাতে একটা হাত এসে পড়ে। ও কিছু বুঝে ওঠবার আগেই, সেই হাত ওর হাত চেপে ধরে। বাইরের দরজার দিকে টেনে নিয়ে যায়। শুধু একবার চুপিচুপি স্বর শুনতে পায়, 'চুপ কথা নয়।'

মত্ত নরেশ যখন টলতে টলতে, অন্ধকারে সুইচের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে, শুভা দেখতে পায়, ততক্ষণে সে হীরার হাত ধরা অবস্থায় ঘরের বাইরে। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই এত চমক। এত দ্রুত চকিত যে, কী ঘটতে যাচ্ছে বোঝবার আগেই, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, এ বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে একেবারে রাস্তার ওপরে এসে পড়ে।

রাস্তা লোকজন গাড়ি, সমস্ত কিছু দেখে, শুভা যেন থতিয়ে যায়। একবার বলে ওঠে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কোন কথা নয়। রাস্তায় গোলমাল হয়ে যাবে। চুপ করে চলে এস আমার সঙ্গে।'

শীতের রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে। লোকজন গাড়ি সবই কম। হীরা শুভাকে নিয়ে বড় রাস্তা থেকে, একটা ছোট নির্জন রাস্তায় ঢুকে পড়ে। শুভার মনে হয়, একবার যেন ও নরেশের ডাক শুনতে পায়, 'শুভা!'

শুভা আর একবার জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি আমাকে?'

'যেখানেই হোক, নরেশের থেকে ভাল জায়গায়।'

আরো কয়েক পা যাবার পরেই, শুভা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে যায়। ওর ভিতরটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। একটা মাতাল লম্পটকে ছেড়ে একটা চোরের সঙ্গে! ও হাত টেনে নেবার চেষ্টা করে। বলে, 'ছেড়ে দাও তুমি।'

'কোথায় যাবে? নরেশের কাছে?'

'তা জানি না, তুমি ছেড়ে দাও।'

'দেব না। জোর করলে, শেষ পর্যন্ত পুলিস তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে। আর আমি ঠিক কেটে পড়ব। ইচ্ছে হয়, কাল তুমি দেশে মরতে যেও, আটকাব না। আজ রাত্রের মত বেঁচে থাক। এই ট্যাকসি!'

হীরা ডাক দিয়ে একটা খালি ট্যাকসি দাঁড় করায়। শুভা হঠাৎ কোন কথা বলতে পারে না। হীরা দরজা খুলে, ওকে ঠেলে নিয়ে ট্যাকসিতে উঠে বলে, 'টালিগঞ্জ।'

ট্যাকসি চলতে থাকে। হীরা শুভার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে বসে, তবু লক্ষ্য রাখে। শুভার চোখে অস্থিরতা, কিন্তু মুখে ও দেহে একটা আচ্ছন্নতার ঘোর।

boiRboi.net

এই অস্থির ও আচ্ছন্নতার ঘোর আর একদিন ওর জীবনে এসেছিল। কিন্তু, সেদিন একটা অন্য অনুভূতিও ছিল ওর মনের মধ্যে। সেদিন ও তারকদার সঙ্গে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল। সেদিন অবিশ্যি ওকে কেউ ঠেলে তোলে নি। ও নিজের থেকেই স্টেশন অবধি হেঁটে গিয়েছিল, গাড়িতে উঠেছিল। সেদিনও ছিল এক অপরিচয়ের যাত্রা। আজ রাত্রেও এক অচিন যাত্রা।

হীরা যেন নিজের মনেই বলে ওঠে, 'চোখে দেখে, ওভাবে রেখে আসা যায় না। নরেশ তো একটা পাগলা কুকুরের চেয়েও মারাত্মক হয়ে আছে। কী করে রেখে আসব আমি।'

সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আজ না পালাতে পারলে কী ঘটত কে জানে। কিন্তু কার সঙ্গে পালাচ্ছে শুভা। এই লোকটাই বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। টালিগঞ্জ, একটা কানে শোনা জায়গা মাত্র। সেখানে আরো কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করে আছে, কে জানে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। তবু, কী জানি, হীরাকে সেরকম ভয়ঙ্কর খারাপ বলে তো মনে হয় না। কিন্তু কতটুকুই বা জানে শুভা। তারকদাকেই বা কতটুকু চিনতে পেরেছিল। অথচ তাকে তো কতকাল দেখেছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের সামনে কিছু বলতে সংকোচ হয়। কিছু বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কী বলতে হবে, তাও যেন জানে না।

★

গাড়িটা যেন শহর পেরিয়ে চলে আসে। রাস্তা ক্রমেই ছোট আঁকাবাঁকা গলি হয়ে ওঠে। হীরার নির্দেশেই এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা ঘিঞ্জি গলির মুখে, গাড়িটা দাঁড়ায়। হীরা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, শুভাকে নিয়ে নামে। এদিকটা যেন নিশুতি। শীতও যেন এখানে বেশী।

গলির মধ্যে খানিকটা গিয়ে ডান দিকে বেঁকে কয়েক পা যেতেই, চোখের সামনে প্রকাণ্ড একটা দোতলা ভুতুড়ে বাড়ি দেখা যায়। অন্ধকার চারদিকে। আশেপাশে কিছু বস্তি, পোড়ো জমি জঙ্গল ছড়ানো।

হীরা শুভাকে নিয়ে সেই প্রকাণ্ড দোতলা ভুতুড়ে বাড়িটার দিকেই যায়। শুভার গাটা কী রকম ছম্ ছম্ করে ওঠে। শুভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হীরা জিজ্ঞেস করে, 'কী হল ?'

'কোথায় নিয়ে এলে এখানে ?'

'এখানেই তো থাকি।'

'এটা তো একটা পোড়ো বাড়ি, কেউ নেই।'

হীরা যেন একটু বিদ্রূপ করে জবাব দেয়, 'কলকাতায় আজকাল আবার পোড়ো খালি বলে কিছু আছে নাকি ? এ বাড়িতে ষোল সতেরোটা ঘর আছে, প্রত্যেকটা ঘরে লোক থাকে।'

কথা শেষ হতে না হতেই, শিশুর কান্না শোনা যায়। মায়ের কান্না থামানোর, সান্ত্বনা দেবার স্বর বেজে ওঠে। কোথায় যেন এক বৃদ্ধ কেশে ওঠে খক্ খক্ করে। হীরা শুভার হাত ধরে। বাড়িটার দরজাবিহীন সদর দিয়ে ঢোকে।

boiRboi.net

সেকালের পুরনো বাড়ি। মাঝখানে উঠোন, চারপাশে ঘর। একটা ঘরে আলোর রেশ দেখা যায় জানালা দিয়ে।

হীরা বাঁ দিকের বারান্দায় উঠে, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠে শুভাকে নিয়ে। পুরনো ইঁট আর শ্যাওলার গন্ধ লাগে শুভার নাকে। দোতালায় উঠে, একটা বাঁক নিয়ে, বারান্দার একদিকে এগিয়ে, একেবারে এক পাশে চলে যায়। আবার বাঁক নিয়ে, বাড়িটার বাইরের দিকের বারান্দার এক কোণে গিয়ে হীরা দাঁড়ায়। এদিকটায় একেবারে ভুতুড়ে নির্জনতা। একটা গাছের ঝুপসি ডাল এদিকেই হেলে পড়েছে।

হীরা পকেট থেকে ওর সেই যন্ত্রটা বের করে, তালা খোলে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতে, একটা আলো জ্বলে। আলো এত কম যে, নরেশের আলোকিত ঘরের তুলনায় অন্ধকার বলে মনে হয়। লাল টিমটিমে আলো। ইলেকট্রিকের আলো যে এত কম হয়, শুভা জানত না। হীরার ডাকে শুভা ঘরে ঢোকে।

ঘরে আসবাব বলতে কিছুই নেই। একটা তক্তপোশ, তাতে একটা পাতলা ময়লা বিছানা। আর একটা পুরনো সেকালের কাঠের ভারী আলমারি। মনে হয়, বাড়িটার মতই, এটাও পুরনো। হীরা দরজাটা বন্ধ করে, তক্তপোশের ওপর বসে পড়ে! বলে, 'নাও, রাত্তিরটা কোনরকমে কাটিয়ে সকালবেলা দেশে চলে যেও। সে সব আর আমি দেখতে যাব না। কিন্তু—।'

শুভা ফিরে তাকায়। হীরার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়। হীরা বলে, 'খাবারগুলো তো তেজ করে ফেলে দিলে, এখন খাবে কী? দেখেই তো মনে হচ্ছে ধুঁকছ।'

শুভা বলে, 'কোন দরকার নেই।'

হীরার চোখ দুটো হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'এ কি, তোমার কানের কাছে, ঘাড়ে রক্ত লেগে আছে।'

শুভা আঁচল দিয়ে কান আর ঘাড়ের কাছে, আস্তে করে মুছে বলে, 'একটু লেগেছে।'

হীরা জিজ্ঞেস করে, 'কামড়ে টামড়ে দেয় নি তো। যে রকম করছিল।'

কথা শুনে লজ্জা করে ওঠে। ও চুপ করে তক্তপোশের ওপর গিয়ে এক পাশে বসে পড়ে। কিন্তু ও বিস্মিত উৎকর্ণ হয়ে, বারে বারেই কি যেন শুনতে থাকে। ওর মনে হয় কাছেই যেন কারা কথা বলছে। চুপি চুপি ফিসফিস করে কথা বলছে। ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, এ ঘরের আর একটা বন্ধ দরজার দিকে। হঠাৎ শুভার মনে পড়ে যায় একটা কথা। জিজ্ঞেস করে, 'তোমার যে ভাইবোন আছে বলেছিলে?'

'বলেছি তো।'

'কোথায় তারা?'

হীরা উঠে দাঁড়ায়। বন্ধ দরজাটার গায়ে টোকা দিয়ে ডাকে, 'নমি—এই নমি।'

দরজাটা দুই ডাকেই খুট্ করে খুলে যায়। ভিতরটা অন্ধকার, কিন্তু শুভা একটি মেয়ের মূর্তিকে দেখতে পায়। হীরা বলে, 'আলো জ্বাল্ তো।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জ্বলে ওঠে। এই ঘরের মতই টিমটিমে রক্তিম আলো।

boiRboi.net

সেই আলোয়, শুভা দেখতে পায়, দরজার কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বয়স কুড়ি বাইশ হবে। অন্যদিকে দেওয়ালের কাছে, যেখানে সুইচ, সেখানে আর একটি মেয়ে, ষোল সতেরো বছর বয়স হতে পারে। মেঝেয় পাতা ময়লা বিছানা। কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে আরো দু'জন। মুখ দেখে মনে হয়, একটি ছেলের বয়স বারো তেরো। আর একটি ছেলে আট ন'।

মেয়ে দুটি যে জেগেই ছিল, তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায়। তাদের চোখে মুখে বিস্মিত কৌতূহল, তীব্র অনুসন্ধিৎসা, তীক্ষ্ন দৃষ্টি। অথচ, যেন ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসিরও আভাস। দেখতে শুনতে মোটামুটি। হয়তো, ভালভাবে থাকতে পেলে, আরো ভাল লাগত। নিতান্ত শস্তা, বাড়িতে কাচা শাড়ি, জামাও সেই রকম। দু'জনের কারুরই হাতে কাঁচের চুড়ি ছাড়া কিছুই নেই।

হীরা বলে, 'দেখে নাও, এরা আমার ভাইবোন।'

শুভা যেন এক নতুন জগতে চলে এসেছে। বহুদিনের ফেলে আসা একটা জগৎ, যা ওর পরিচিত, অথচ মনে করত, আর কোনদিন এমন একটা জগৎ, ও আর দেখতে পাবে না। শুভা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মেয়ে দুটির সঙ্গে ওর যতই দৃষ্টি বিনিময় হয়, ততই যেন ওদের মুখে চোখে হাসি ফুটতে থাকে। শুভার মুখ দিয়ে প্রশ্নমেই বেরিয়ে আসে, 'তোমার মা নেই ?'

হীরা ঠোঁট উলটে বলে, 'নাঃ, সে পটল তুলেছে বছর পাঁচেক। সব আমার ঘাড়ে ফেলে, বুড়ীটা সটকেছে।'

দেওয়ালের দিকের ছোট মেয়েটি ফিক্ করে একবার হেসে ওঠে, মুখে হাত চাপা দেয়। হীরা জিজ্ঞেস করে, 'হাঁরে নমি, কিছু আছে ?'

বড় মেয়েটি জবাবে বলে, 'খাবার ?'

'হাঁ'।

'ছ-সাতটা রুটি আছে, আর কালকের সেই তরকারি একটুখানি।'

'সে তো নষ্ট হয়ে গেছে।'

'না, শীতের দিন তো, রাত্রে গরম করেছিলাম।'

'তাহলে একে একটু দে, দ্যাখ খেতে পারে কি না।'

শুভা বলে ওঠে, 'না না, আমার দরকার নেই।'

হীরা বলে, 'সে কথা তো অনেকবার শুনেছি। দেখ না, খেতে পার কি না। আর কানের কাছে রক্তটা ধুয়ে ফেল গে! হ্যাঁরে সবি, ওদিকের বারান্দায় জল আছে তো ?'

ছোট মেয়েটি জবাব দেয়, 'আছে।'

হীরা শুভাকে বলে, 'নাও ওদের সঙ্গে যাও, ওদের সঙ্গেই রাতটা কাটিয়ে দাও। আমার তো রাতটাই খারাপ হয়ে গেল!'

নমির দিকে ফিরে বলে, 'যা, নমি নিয়ে যা একে। এর নাম শুভা।'

নমি হঠাৎ বলে ওঠে, 'একে আবার কোথাকার লকার ভেঙে নিয়ে এলি দাদা ?'

'কী ?'

হীরা খেঁকিয়ে উঠে বোনের দিকে তাকায়। নমি আর সবি, দু'জনেই তখন

boiRboi.net

হাসতে আরম্ভ করেছে। হীরা বলে ওঠে, 'না না ফাজলামি করিস না।'

শুভার লজ্জা করে ওঠে। তবু, এ পরিবেশটা যেন অনেক সহজ আর বিশ্বাসযোগ্য লাগে ওর কাছে। ও যে একটা তালাভাঙা চোরের বাড়িতে এসেছে, একথা মনেই থাকে না। হীরাকেও এখানে অন্যরকম লাগে। হীরা সত্যি একটা দাদা, বোন এবং ভাইদের দাদা।

সবি—সবিতা যার নাম, সে খুব সহজ ভাবেই ডেকে ওঠে, 'এস শুভাদি।'

ডাক শুনে শুভার বুকের ভিতরটা চমকায় যত, বিস্ময়ে আর একটা বিচিত্র অনুভূতিতে যেন ততই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠতে চায়। মনে হয়, ও যেন চেনা আপন মানুষের কাছে এসে পড়েছে। এই দারিদ্র্য জীর্ণতা, তার মধ্যেই হাসি ঠাট্টা, এ সবই ওর চেনা গম্ভীর বিষয়। ওর নিজেরই পরিবেশের চেহারা। সবির ডাক শুনে, শুভাও সহজেই পাশের ঘরে যায়। নমি আবার বলে ওঠে, 'দেখিস দাদা, এ চোরাই মাল নিয়ে আবার বিপদে পড়তে না হয়।'

নমির সঙ্গে শুভার চোখাচোখি হয়ে যায়। নমি হাসে। শুভার চোখে লজ্জা ফুটে উঠে। তবু সে হাসে। বলে, 'চোরাই মাল নই। বিপদে পড়ে এসেছি।'

হীরা নিজের মনেই বলে, 'বিপদ! খুন হয়ে যেত আজ আর একটু হলে।'

নমি বলে, 'তাই নাকি?'

হীরা জবাব দেয়, 'তবে? দ্যাখ্ না, এত জোরে মেরেছে, কানের নীচেটা বোধ হয় ফেটে গেছে।'

'কে মেরেছে?'

'কী জানি, নরেশ না কী নাম, এদের দেশের লোক। যাকগে, সে-সব বলে কোন লাভ নেই।'

নমি মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সবি পাশের ঘরের আর একটা দরজা খুলে শুভাকে নিয়ে যায়। সেখানে অন্ধকার। সবি বালতি থেকে মগে জল তুলে দেয়। শুভা ভাল করে কাঁধ ঘাড় ধুয়ে নেয়। বারান্দাতেই হাত পা ধোবার জায়গা। আর এক পাশে একটু রান্নার ব্যবস্থা।

ঘরে আসার পর নমি থালায় করে শুভাকে রুটি তরকারি খেতে দেয়। ঘুমন্ত ভাইদের নাম ধরে বলে, ধীরু আর বিশু। কথায় কথায় কৌতূহল প্রকাশ করে শুভার সম্পর্কে। শুভা জানায়, তার সমস্ত কথাই এত লজ্জার যে মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছা করে না। কোনদিন যদি সে সুযোগ আসে তো বলবে। তবে, নমি আর সবিকে ওর যে খুবই ভাল লাগছে, সে-কথা জানায়।

ওরাও জানায় শুভাকে ওদের খুব ভাল লাগছে। শুভা কেন রাত পোহালেই চলে যাবে? দু'-একদিন বাদে গেলে ক্ষতি কী? যদিও কাউকে থাকতে বলতে ইচ্ছে করে না, তাহলেও শুভা থেকে গেলে ওরা খুব খুশি হবে।

এমনি সব নানান কথায় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। তারপরে ওরা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দেয়। শুভা জানতে পারে, ওরা ওদের দাদার জন্যে, প্রতিটি রাত উদ্বেগে কাটায়। কখন কোনদিন কী দুঃসংবাদ আসবে, সেই ভয়ে ওরা কাঁটা হয়ে থাকে। কোনদিন যে ওদের কী বিপদ ঘনিয়ে আসবে, ওরা

boiRboi.net

কিছুই জানে না। দাদা জেলে গেলেও ওরা না খেয়ে মরবে। জেলে না গিয়ে, শারীরিক ক্ষতি হলেও তাই হবে। দাদাকে বলে ওরা থামিয়ে রাখতে পারে না। অবিশ্যি দাদাকেও বলার কিছু নেই। সে সৎ থাকতেই চেয়েছিল, পারে নি। চোখের সামনে পিতৃহীন ভাইবোন, বিধবা মাকে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি। আজ আর দাদাকে ফেরাতে পারে না ওরা।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, শুভার বিস্ময় যেন ঘোচে না, সত্যি নিরাপদে নিরুপদ্রবে ওর রাত্রিটা কেটেছে। ধীরু আর বিশু অবাক হয়ে শুভাকে দেখে।

হীরা মিথ্যা বলে নি। গোটা বাড়িটাতে মেলাই লোক। সকলেই গরীব। কারখানার দরিদ্র শ্রমিক, সামান্য ফেরিওলা, এই রকম বিভিন্ন পেশার লোক বাস করে। হীরাদের অংশটা এক পাশে হওয়ায়, অনেকটা নিরিবিলি।

সকালবেলা, সাধারণ পরিবারের মতই এখানে উনুন জ্বলে, চা হয়। দু'-এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে সবাই চা খায়। শুভা লক্ষ্য করে, হীরা নিজের ঘর ছেড়ে প্রায় নড়েই না। পাশের ঘরেও আসে না। তার দরজাটা প্রায় সব সময়ে বন্ধই, যেন এ অংশের সে কেউ নয়।

সকালবেলাই শুভার চলে যাবার কথা। নমি আর সবির কথাতেই যে শুভা থেকে যাওয়ার কথা ভাবে, তা নয়। নিজের মধ্যেও তার একটা দ্বিধা দেখা দেয়। বাড়ি যাবার আগে, আরো দু'-একটা দিন, ওর ভাবতে ইচ্ছে করে। এ ভাবে বাড়ী যাবার কথা ভাবলেই ওর মনের মধ্যে প্রত্যাখ্যান ও অপমানের ভয় জেগে ওঠে। পায়ে যেন বেড়ি লাগে।

চা খাবার পরেই হীরা জিজ্ঞেস করে, 'কী, তোমাকে এখুনি হাওড়ায় পেঁছে দিয়ে আসতে হবে ?'

নমি জবাব দেয়, 'শুভাদি আজ যাবে না। তুই তাড়া দিচ্ছিস কেন দাদা।'

হীরা অবাক হয়ে বলে, 'আমি আবার তাড়া দিচ্ছি কোথায়। ও নিজেই বলেছিল চলে যাবে।'

হীরার সঙ্গে শুভার চোখাচোখি হয়। শুভা তাকিয়ে থাকতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়।

হীরা বলে, 'থাকুক না। কাল রাত্রে তো আসতেই চাইছিল না। আমিই তো জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। চোরের ভয়েই মরল যে!'

নমি বলে, 'তা ভয় তো হবেই। কাল তো শুনলাম, কী ভাবে তুই গিয়ে লুকিয়েছিলি।'

হীরা বলে, 'না না, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না।'

তারপরেই ধুপুস করে শুয়ে পড়ে বলে, 'তাহলে বাবা আমি খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। আমার এখনো চোখের ঘুম কাটে নি।'

শুভা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। নমি চলে যায় দরজাটা টেনে দিয়ে। হীরা চোখ বুজে থাকে। শুভা হীরার দিকে চেয়ে থাকে। এ লোকটার সঙ্গে, ওর মনের কল্পনাকে যেন মেলাতে পারে না।

boiRboi.net

হীরা হঠাৎ বলে ওঠে, 'কী হল ?'

শুভা একটু চমকে ওঠে। বলে, 'না কিছু না।'

তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা একটা কথা—।'

'কী ?'

'শুনতে পাই, তালাগুণীন খুব সাংঘাতিক লোক, অনেক টাকা তার। তার ঘরের এ দুরবস্থা কেন ?'

'দূর, কোথায় টাকা। কোনরকমে দিন চলে যায়। বড় দাঁও সেই কবে মেরেছি, সেই টাকা ভাঙিয়েই চলছে। আর মাঝে মধ্যে ছুটকো ছাটকা চলে, ওতে কিছু হয় না।'

'তার মানে ছিঁচকেমি।'

'হ্যাঁ, বড় কাজ অনেকদিন হয় নি। সেই ফেঁসে গেল বলেই তো তোমার ঘরে লুকিয়েছিলাম। এখন বেকার।'

'কিন্তু এ ভাবে কি সত্যি চালানো যায় ?'

'কেন যাবে না ? নরেশরা কী করছে। ওরা ব্যবসার নাম করে দাঁও মারছে, ওদের অনেক লোকজন, দল অফিস সব আছে। আমার ওসব নেই। মেরে নিয়ে আসি, যদ্দিন চলে। চলে যায়, তারপর আবার বেরিয়ে পড়ি।'

'নরেশ এক রকমের চোর, তুমি আর এক রকমের চোর। তবু চোর তো।'

হীরা লাফ দিয়ে উঠে বসে। বলে, 'এই দ্যাখ, মা গোঁসাইয়ের মত বক্তিমে আরম্ভ করো না বলে দিচ্ছি, ওসব আমার ভাল লাগে না।'

শুভা চুপ করে চেয়ে থাকে, কিছু বলে না। সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়। বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। হীরা আবার শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে শুভা হঠাৎ বলে ওঠে, 'কতকাল বাইরে বেরুইনি।'

হীরা তড়াক করে উঠে বলে, 'বেরুবে ?'

শুভা অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় ?'

'যেখানেই হোক, একটু ঘুরে আসবে।'

'এখুনিই ?'

'কী হয়েছে ?'

হীরা নমিকে ডেকে বলে। নমি ওর একটা ধোয়া কাপড় দেয়। তাই পরে হীরার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে শুভা। হীরা ট্যাকসিতে তুলে, শুভাকে ময়দানে নিয়ে যায়। গঙ্গার ধারে ঘোরে। শীতের সকালবেলা, মিষ্টি রোদে বেড়াতে ভালই লাগে। তারকদার সঙ্গেও শুভা বেড়িয়েছে, কিন্তু সেটা ছিল আলাদা। এটা অন্যরকম। মনের মধ্যে একটা দ্বিধা, ভবিষ্যতের নানান সংশয়ের ভার, অথচ কোথায় যেন একটু মুক্তির স্বাদও অনুভূত হয়। তারকদার সঙ্গে যখন বেড়িয়েছে, ঘুরেছে, তার মধ্যে ছিল একটা নতুন মদের মত নেশা। অমৃতের বদলে যা গরল হয়ে উঠেছে, সেই গরলেরই খোয়ারি কাটছে এখন।

গঙ্গার ধারে বসে, হীরা বলে, 'এভাবে বেড়াতে ভুলেই গেছি, সত্যি।'

'এরকম বেড়িয়েছ কখনো ?'

'হ্যাঁ, একটা মেয়ের সঙ্গেই বেড়াতাম মাঝে মাঝে। প্রেম করতাম।'

বলে হো হো করে হেসে ওঠে হীরা। শুভা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। হীরা বলে, 'তখন অবিশ্যি চোর হইনি। মেয়েটাও বলত, আমাকে নাকি ভালবাসে। কিন্তু একটা বেকার ছোঁড়ার সঙ্গে মেয়েরা ক'দিন প্রেম করতে পারে বল। তাই কেটে পড়ল।'

'কোথায় গেল?'

'ভাল রাস্তায় যায় নি শুনেছি। তবে টাকা করেছে মেলাই।'

ইঙ্গিতটা শুভা বুঝতে পারে। হীরার কথা আর হাসির মধ্যে তিক্ততার ঝাঁজটা পায় ও। তারপরে কথায় কথায় হীরা ওর প্রথম চুরির কাহিনী বলে! কীভাবে এক ব্যবসায়ীর কাছে ও চাকরির জন্যে গিয়েছিল। লোকটা তার নিজের আলাদা ঘরে বসে হীরার সঙ্গে কথা বলেছিল। লোকটা আসলে ছিল স্মাগলার। হীরাকে বলেছিল, নানান জায়গায় নানা ধরনের মাল চালাচালি করতে সে রাজী আছে কী না। তাহলে ভাল মাইনে আর কমিশন দু-ই দেবে। অথচ হীরা গিয়েছিল, একটা সাধারণ চাকরির আশাতেই।

লোকটার সঙ্গে এই সব কথা যখন হচ্ছিল তখনই ফোন বেজে ওঠে। ফোনের কথা শুনেই লোকটা আঁতকে ওঠে। রিসিভার রেখে দিয়ে হীরাকে বলে, 'তুমি একটু বস, আমার ড্রাইভার কাছেই কাকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। আমি আসছি।'

লোকটা চলে যেতেই, বিদ্বেষ আর তিক্ততায় ওর মন ভরে ওঠে। হঠাৎ ওর লক্ষ্য পড়ে, লোকটার স্টিল আলমারির দিকে। তৎক্ষণাৎ ওর মনে হয়, আলমারিটা খুলতে পারলে কেমন হয়? সবই তো জোচ্চোরির টাকা। নিশ্চয় আলমারিতে কিছু আছে। তাড়াতাড়ি উঠে ও হাতল ঘোরায়। চাবি বন্ধ ছিল। সামনেই টেবিলের ওপর একটা কাগজকাটা ছুরি পড়েছিল। সেটা চাবির ঘরে ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। তাতে খোলে নি। তখন হন্যে হয়ে ও একটা পেরেক খুঁজেছিল। ওর মনে হয়েছিল, একটা তিন ইঞ্চি পেরেক ঢুকিয়ে, কোনরকমে ডানদিকে মোচড়াতে পারলে, ওটা খুলে যাবে।

পেরেক ও খুঁজে পেয়েছিল দেওয়ালে গাঁথা অবস্থায়। সেটাকে খুলতে পেরেছিল। পেরেকটা চাবির গর্তে ঢুকিয়ে পিন গাঁথার যন্ত্র দিয়ে চেপে ধরে চাড় দিতেই, সত্যি সত্যি লক্‌টা খুলে গিয়েছিল। আলমারি খুলেই, ও আর কিছু লক্ষ্য করে নি, শুধু দেখেছিল, বেশ কিছু নোট সাজানো রয়েছে। কোন চিন্তা না করে, টাকাগুলো পকেটে পুরেছিল। তাও সব টাকা নিতে পারে নি। ওর হাত পা কাঁপছিল, ঘাম ঝরছিল, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। লক্‌টা বন্ধ করতে পারে নি। এমনি হাতল ঘুরিয়ে বন্ধ করে, ঘরের বাইরে চলে এসেছিল। গদীতে যে দু'তিনজন কর্মচারী ছিল, তাদের বলে এসেছিল, দেরী হয়ে যাচ্ছে, পরে আবার একদিন আসবে।

সেই ওর প্রথম চুরি, যে চুরির জন্যে ও ধরা পড়েনি। ওকে কেউ দীক্ষা দেয় নি। ও নিজেই নিজেকে দীক্ষিত করেছিল, এবং সেই থেকে এটাকেই ধ্যান-জ্ঞান, করেছিল, আজ পর্যন্ত দু'বার ধরা পড়েছে। একবার ছ'মাস, আর একবার দশ মাস জেল খেটেছে। কিন্তু চুরি ধরা পড়ে নি কখনো। তবে ও যত বড় চোর নয়,

boiRboi.net

নামটা তার চেয়ে বেশী। দলের সঙ্গে না থাকার জন্যে, ওর শত্রুও বেশী।

বলে, হীরা ধপাস করে গঙ্গাধারের দূর্বায় শুয়ে পড়ে। বলে, 'কেরানীর ছেলে চোর হয়ে গেলাম।'

কথাটা এমনভাবে বলে যেন ও মজা করছে। কিন্তু ওর মুখে তার কোন চিহ্নই নেই। শুভা গঙ্গার বুকে দৃষ্টিপাত করে। তখনই সাইরেন বেজে ওঠে। ভাঁটার শেষ, জোয়ার আসছে।...

শুভা কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ওর খেয়াল হয়, হীরা কখন যেন ওর হাতটা ধরেছে। হীরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শুভা ওর হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। হীরা জোরে হেসে উঠে বলে, 'বেকার আর চোর সমান। কোন মেয়েই তাকে চায় না। তবে দোহাই বাবা, আমি প্রেম করতে চাই নি। এমনি একটু হাতটা ধরেছিলাম। তোমাকে দেখে ভারি অবাক লাগে আমার। তোমার ভাগ্যটা অদ্ভুত।'

তারপরেই লাফ দিয়ে উঠে বলে, 'চল।'

★

টালিগঞ্জে ফিরে শুভা যখন শোনে, ধীরু আর বিশু ইস্কুলে গিয়েছে, তখন ওর খুব অবাক লাগে। আবার নমির মুখে এ কথাও শোনে, 'ইস্কুলে না ছাই, গিয়ে দেখ, কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের আবার লেখাপড়া হবে?'

কয়েকদিন এরকম কাটে। শুভা লক্ষ্য করে, ধীরু আর বিশু যে কেবল ইস্কুল পালিয়ে, উচ্ছৃংখল দুর্বিনীত হয়ে উঠছে তাই নয়। নমি আর সবির সঙ্গেও, এই প্রকাণ্ড বাড়ি এবং পাড়াটার যে সব ছেলে আড্ডা মারতে আসে তারা কেউ ভাল নয়। দেখলেই বোঝা যায়, তারা অন্ধকারের জীব। তাদের ভাব, ভাষা, ভঙ্গি অত্যন্ত নিচু শ্রেণীর। সেই সঙ্গে নমি সবির আচরণও কদর্য লাগে। শুভা নেহাত নতুন বলে, ওদের সামনাসামনি চক্ষুলজ্জা হয়। অন্যথায় ওরা একেবারে বেহেড বেলাজ।

কোনরকমে রান্নাটা করে দু'জনে। তাছাড়া যখন খুশি দু'জনে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। শুভাকে পেয়ে ওদের আরো সুবিধা। রান্না ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দু'জনে আড্ডায় মেতে যায়।

তথাপি, শুভাকে ওরা ভাল না বেসে পারে না। ওদের মনে কোথায় যেন একটা সমীহ বোধও আছে শুভার প্রতি। শুভার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে গেলে, ওদের যেন কোথায় আটকে যায়। শুভাও গম্ভীর হয়ে ওঠে। ধীরু বিশুও একটু ভক্ত হয়ে পড়ে শুভার। যদিও তাতে ওদের এতদিনের জীবনে কোনই পরিবর্তন হয় না।

প্রায় পনের দিন হীরাও কোথাও বেরোয় নি। ও যেন অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। প্রায় একটা সংসারী চরিত্রের মানুষ যেন। শুভার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে। একটু আধটু খিটিমিটিও লাগে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই, একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ওদের মধ্যে কোথায় একটা কী ঘটছে, ওরা নিজেরাও জানে না। ওদের চোখের মুখের ভাবে ফুটে ওঠে। পরস্পরের সান্নিধ্যকে ওদেরও ভাল লাগে।

তারপরে একদিন বিকেল থেকেই, হীরার চোখ মুখ বদলাতে থাকে। ঘোর সন্ধ্যায় সে যখন বেরুবার উদ্যোগ করে, শুভা এসে সামনে দাঁড়ায়। হীরার চোখের দিকে তাকায়। হীরা ফিরেও চায় না। সে দরজার দিকে যায়। শুভা বলে, 'না বেরুলে হত না ?'

হীরা থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'দিলে তো অযাত্রা করে। খামকা একটা বাধা।'

শুভা বলে, 'কী দরকার এসব করার। একটা কাজকর্মের ফিকির দেখ না '

হীরা রুখে ওঠে, 'এই দ্যাখ, ন্যাকামি করো না। তুমি আমাকে খাওয়াবে, না ?'

শুভা চুপ করে যায়! হীরা আবার বেরুবার উদ্যোগ করে। শুভা বলে, 'এভাবে চিরদিন কি চালিয়ে যেতে পারবে।'

'কেন, চালিয়ে আসিনি ?'

'যে কোনদিন তো তোমার জেল হতে পারে, একটা বিপদও হতে পারে।'

'হয় হবে।'

'তখন তোমার এ সব কে দেখবে, ভাই বোনদের ?'

'যতক্ষণ নিজে আছি, ততক্ষণ ওরাও আছে। তারপরে আর জানি না।'

'সেই জন্যেই ওরাও এরকম হয়ে গেছে। কারুরই কোন ভবিষ্যৎ নেই। এও তোমারই জন্যে।'

'আমার জন্যে ?'

'হ্যাঁ। কেবল খাইয়ে পরিয়ে রাখলেই হয় ? একবার দেখছ না, ওদের কি অবস্থা হয়েছে ?'

হীরা এবারে অনুরাগে আর ক্ষোভে ফিরে তাকায়। চিৎকার করে ওঠে, 'দুত্তোরি তোর নিকুচি করেছে ভাল মন্দর! পেটে জুটছে, এই যথেষ্ট। বাকি ন্যাকামো রেখে দাও। ফের যদি আমাকে এসব বলবে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।'

বলেই সে চলে যায় বাইরে। শুভা অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে, হীরা নরেশের ঘরে গিয়ে স্টীল সেফ্ খুলছে। ওদিকে পাশের ঘরে তখন ধীরুর সঙ্গে সবির ঝগড়া মারামারি চলছে।

কিন্তু রাত্রি ন'টার মধ্যেই হীরা ফিরে আসে। তার মুখ থমথমে। এসেই শুয়ে পড়ে। শুভা ঘরে আসতেই খিঁচিয়ে ওঠে। ও বাধা দেওয়াতেই, হীরা যেতে পারে নি। এরকম বাধা পড়লে সে কোথাও যায় না।

আবার তর্কাতর্কি লাগে, ঝগড়া বেধে যায়। হীরা অত্যন্ত অপমানকর কথা বলে শুভাকে। প্রায় মারতে ওঠে। শুভাও পেছিয়ে থাকে না। কিন্তু ও ভীষণ ক্লান্ত আর বিষণ্ন হয়ে পড়ে। একটা উদ্বেগ হয়তো গিয়েছে। এ পরিবেশ ওকে থাকতে দিচ্ছে না।

তারপরে আস্তে আস্তে, নমি সবির সঙ্গেও শুভার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ওদের আচরণের বিরুদ্ধে কথা বললেই, ওরা শুভাকে অপমান করে। তীব্র বিদ্রূপে জ্বালিয়ে দেয়। শুভা ওদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া করে। ওরা ধীরু আর বিশুকে লেলিয়ে দেয়। ওদের পুরুষ বন্ধুদের সামনেই ঝগড়া করে।

পরে আবার শুভার সঙ্গে ওরা হেসে কথা বলবার চেষ্টা করে। শুভা একলা অবাক হয়ে বসে ভাবে, এরা তার কে? কেন সে এদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে। নেহাৎ এক ঘরে আছে বলেই তো। ও নিজেই বা ওদের থেকে কত তথাৎ, কতটুকু ভাল।

তবু শুভা যখন যেখানে আছে, সেখানে ছায়ার মত কী একটা চিন্তা ওর পায়ে পায়ে ফেরে। মনের মধ্যে প্রতি পদে পদে বিরুদ্ধ ভাব জেগে ওঠে। হীরার চুরির জীবিকা, তার ভাইবোনদের আচার-আচরণ সব মিলিয়ে, এই গোটা সংসারটার সঙ্গে ওর একটা সংগ্রাম চলতে থাকে।

অথচ শুভা একটা বাইরের মানুষ। একটা অবিশ্বাস্য অদ্ভুত অবস্থায় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আবার এই সংঘর্ষ সংগ্রামের মধ্যেই, কখনো কখনো, একটু হালকা হাওয়া ভেসে আসে। কিন্তু তা অহর্নিশ গুমোটের মধ্যে, সামান্য এক পলকের বাতাস মাত্র। এভাবে থাকা যায় না। ওকে সেইখানেই ফিরতে হবে। দেশে, বাবা মায়ের কাছে, এবং সেই শেষ পরিণতির দিকে।

একদিন বিকালের আগেই, হীরার সঙ্গে শুভার ঝগড়া লেগে যায়। এখন শুভা নিজেকেই কোন এক মাস্টারমশায়ের মেয়ে বলে চিনতে পারে না, এত কটু ইতর কথাবার্তা বলে ঝগড়া করে। আজ হীরাও শুভাকে বলে, শুভা যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোজগার করে এনে খাওয়ায়, তাহলে সে আর চুরি করতে যাবে না।

শুভাও জবাব দেয়, 'সে ভাত খাবার আগে, হীরালাল চোর যেন গলায় দড়ি দিয়ে মরে।'

হীরা রেগে গিয়ে শুভাকে থাপ্পড় মেরে বসে। সেই শুভার শেষ। সেই মুহূর্তেই ওর সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একটি কথাও না বলে, হীরার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কেমন করে যে হাওড়ার বাসে ওঠে, কন্ডাক্টারকে করুণভাবে পয়সা না-থাকার কথা বলে, নিজেরই চৈতন্য থাকে না। ট্রেনে উঠে, হাওড়া থেকে দেড় ঘণ্টার পথ পেরিয়ে, যখন ওদের স্টেশনে নামে, তখন বিকাল গড়িয়ে গিয়েছে।

স্টেশনের বাইরে একবার ও থমকে দাঁড়ায়, তারপর আরো দ্রুত নতুন শহরের ভিতর দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে যায়। চেনা পরিচিত কেউ ওকে দেখছে কি না দেখছে, সে চিন্তা ওর মাথায় একবারও আসে না।

কিন্তু শহরটা যতই শেষ হয়ে আসে, ততই ওর গতি শ্লথ হয়ে আসে। বাড়ির কাছাকাছি এসে, ওর পা আর সরতে চায় না। একটা অর্ধেক তোলা বাড়ির সামনে, ঘোর সন্ধ্যার কাল আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু দূরেই ওদের বাড়িটা, অন্ধকারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। শুভার মনে পড়ে যায়, একদিন এসময়েই প্রথম তাকে বাড়ির বারান্দায় দেখে তারকদা থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারকদার কথা আর তেমন মনে পড়ে না। বরং অনেক বেশী যন্ত্রণা কষ্ট অথচ যেন একটা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে, একটা অন্য লোকের কথা বেশী মনে পড়ে। যে লোকটার চোখের দৃষ্টি বুঝতে ওর ভুল হয় নি। যে লোকটির জন্যে ওর নিজের মনেও এক আশ্চর্য

পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। যে লোকটির কাছে, একটা আত্মসমর্পণের আবেগে কখনো কখনো মনে মনে ব্যাকুল হয়েছে। যে আবেগ ব্যাকুলতা, জীবনে আর কখনো ও অনুভব করে নি।

কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান কখনো ঘুচল না। তারই চিহ্ন গালে নিয়ে ফিরতে হয়েছে আজ। ওরা সবাই কেবল নিজেদের মত করে চায়। অপরের মনটা দেখতে চায় না।

শুভা পায়ে পয়ে এগিয়ে যায়। সামনের বারান্দা দিয়ে না গিয়ে, শুভাদের নিজেদের ভাগে পুরনো বাড়ির যে অংশ পড়েছে, ওর ঠাকুরদার আমলের সেই বাড়ির অংশের দিকে এগিয়ে যায়। সেই অংশের, অন্ধকার অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে।

শুভা অলিন্দে দাঁড়াতেই, ওর বাবার গলা শোনা যায়, 'কে, ওখানে কে?'

বাতি হাতে শুভার মা বেরিয়ে আসে। জীর্ণ, রুগ্ন স্বাস্থ্য মায়ের। ভূত দেখার মত চমকে, থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বাবা ঘরের ভিতর থেকে আবার জিজ্ঞেস করে 'কে গো?'

শুভা কথা বলতে ভুলে যায়। কাঁদবার কথাও ওর মনে আসে না। খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে কুঁজো হয়ে ওর বাবা বেরিয়ে আসে। চোখ তীক্ষ্ন করে দেখে। তারপরেই চমকে, যেন ভয় পেয়ে ওঠে, 'কে?'

কারুর মুখে কোন কথা নেই। দেখতে দেখতে ওর ভাই বোনেরাও এসে পড়ে। ওরা যেন কেউ শুভাকে চেনে না, কোনদিন দেখে নি। অথচ বিস্ময়ে একটা ভয় পাওয়া চোখে চেয়ে থাকে।

শুভার বাবা, হঠাৎ শক্ত গলায় বলে ওঠে, 'আর এদিকে না, ওখান থেকেই বিদেয় হও। বিষের হাওয়া আর ঢুকতে দেব না।'

তবু শুভা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ও তো জানতই, কোথায় যাবে এবার। এই পরিণতি ওর জানাই ছিল। চোখে জল এসেছে, আসুক। তবু ওর কী রকম কষ্ট হচ্ছে সবাইকে দেখে। অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। একবার যেন ওর গলা দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে, 'যাচ্ছি।'

শুভা অলিন্দ থেকেই নেমে আসে। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। পিছনে যেন মায়ের গলার ক্ষীণ একটা শব্দ শোনা যায়। কার যেন নিশ্বাস পড়ে। শুভা বাইরে বেরিয়ে আসে।

বেরিয়ে এসে, দরজার কাছেই একটা মূর্তি দেখে, থমকে যায়। অন্ধকারেও চিনতে পারে, হীরা। প্রথমেই বলে, 'পরের ট্রেনটা ধরেই ছুটে এসেছি…।'

শুভা শোনে না, এগিয়ে যেতে থাকে।

হীরা বলতে থাকে, দ্বিধায় লজ্জায় ভয়ে ভয়ে, 'তুমি চলে এলে। মুখটা চেপে বসেছিলাম। হঠাৎ নমিটা ছুটে এল কাঁদতে কাঁদতে। পিছনে সাবি, ভাই দুটোও।'…

শুভা চলতেই থাকে। ওর গন্তব্য শহর পেরিয়ে রেল লাইন। হীরার গলাটা যেন রুদ্ধ শোনায়। বলে, 'নমিটা বলে উঠল, তুই এখনো বসে আছিস দাদা?

boiRboi.net

শুভাদি যে বেরিয়ে গেছে, শীগ্‌গির যা, দ্যাখ্‌ কোথায় গেল। শুভাদির হাতে যে একটা পয়সাও নেই।'

'আমি যেন বুঝতেই পারছিলাম না, কী করেছি। অথচ যে হাত তোমার গায়ে তুলেছি…।'

হীরা আর কথা বলতে পারে না, স্বর বন্ধ হয়ে যায়। শুভা এগিয়ে যেতে থাকে। ওদের আশপাশ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। ওদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ওরা অন্য জগতের মানুষ যেন।

হীরা আবার গলাটা পরিষ্কার করে বলে, 'তারপরে সবি আর ভাই দুটো কেঁদে উঠতেই খেয়াল হল, তাড়াতাড়ি ছুটলাম। জানতাম, তুমি কী করবে, কোথায় যাবে। কী ভাবে যে ট্রেনের পথটা চুপচাপ এসেছি। শুভা—শুভা তুমি কোনদিকে যাচ্ছ। এদিকে স্টেশন নয়, শুভা।…'

শুভা ক্রমে শহরের বাইরে অন্ধকারে, রেল লাইনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। হীরা শুভার হাতটা ধরতে চায়, পারে না। ওর মুখে উদ্বেগ ব্যাকুলতা। শুভার দৃষ্টি রেল লাইনের সিগন্যাল পোস্টের লাল আলোর দিকে।

হীরা আবার বলে, 'শুভা আমি দেখেছি, ঘরের বাইরে থেকেই তুমি ফিরে এলে। সেখানে তোমার বাবা মা ভাই বোন…'

শুভা সহসা ঘাড় ঝাঁকিয়ে দ্রুত চলতে থাকে। এসব কথা ও আর শুনতে চায় না। হীরা ব্যাকুল স্বরে বলে, 'শুভা, এরা তোমাকে নেয় নি, আমার ভাইবোনদের কাছে চল। ওরা তোমাকে সত্যি ভালবাসে।'

শুভার অস্ফুট কান্না জড়ানো গলায় কেবল শোনা যায়, 'না না, আর এসব শুনতে চাই না।…'

শুভা প্রায় ছুটতে থাকে। হীরা ওর হাত চেপে ধরে। লাল আলো নীল হয়। হীরা বলে, 'ওরা তোমার কাছে থাকবে, তুমি যেমন বলবে…'

গাড়ির শব্দ পাওয়া যায় দূরে। শুভার গলায় এক শব্দ, 'না না, আর না…'

হীরা চিৎকার করে ওঠে, 'আমিও, আমিও তাই শুভা। আমি আর আগের রাস্তায় চলতে চাই না। আমি—তুমি যা বলেছ—আমি জানি, একটা মানুষ চিরদিন এসব করতে পারে না। কিন্তু তুমি না থাকলে—।'

শুভা থমকে দাঁড়ায়। হীরার চোখের দিকে চায় তারপর সহসা মাঠের ওপর মুখ ঢেকে বসে পড়ে।

গাড়িটা তখনো অনেক দূরে। তার ক্ষীণ আলো এসে ওদের গায়ে পড়ে। হীরা আবার বলে, 'তুমি কাছে থাকলে সব পারব। ওরাও, আমার ভাই বোনেরাও—'

কথা শেষ না করে, হীরাও শুভার কাছে নত হয়ে বসে। গাড়ির আলোটা আরো তীব্র হয়। একবার বাঁশি বেজে ওঠে।

———

boiRboi.net

চৈতি

boiRboi.net

কান্ত চার বছর সাত মাস বাদে, তার সেই পুরনো পৈতৃক ভিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার পুরো নাম রাধাকান্ত কর্মকার। চলতি কথায় কামার বলতে যা বোঝায়। কান্তর আগে রাধা নামটি, স্বয়ং সে নিজেও ভুলে গিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে কান্ত ডাক শুনে সে অভ্যস্ত। বড় হয়ে, কান্ত কামার, এই নামেই সে আশে-পাশের দশটা গ্রামে গঞ্জে পরিচিত। নিজেকেও সে তাই ভাবে। কামার শব্দেও তার মনে কখনো কোনোরকম বিরূপতা জাগে নি, নিজেকে অসম্মানিত বোধ করে নি। সে তার ছেলেবেলা থেকেই, নিজেদের বাড়ি সম্পর্কে শুনে এসেছে—কামারবাড়ি। তার বাপ পিতামহ কামারের কাজ করতো। সে নিজে ছেলেবেলা থেকে বাপ দাদার সঙ্গে কামারের কাজ করেছে।

কান্ত লেখাপড়া যে একেবারেই শেখে নি, এমন না। আশা অনেক সময় মরীচিকা প্রতীয়মান হয়। কান্তর বাবা আশা করেছিল, তার ছোট ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে, যাদের বলে ভদ্রলোকের ছেলে, তাই করবে। সদ্‌গোপ পাড়ার অসম্পন্ন চাষী পরিবারের ছেলেরাও অনেকে ইস্কুলে যেতো, জেলা সদর শহরের কলেজে পড়তে যেতো। বর্ণাশ্রমের বিচারে, তাদের থেকে নীচু সম্প্রদায়ের ছেলেরাও ইস্কুলে যেতো। কান্তর ছেলেবেলায় এই গ্রামে মেয়েদেরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। গ্রামের সব পাড়া থেকে, সব সম্প্রদায়ের মেয়েরা সেই ইস্কুলে পড়তে যেতো। তবে কামারবাড়ির একটা ছেলে কেন লেখাপড়া শিখবে না ?

কালের হাওয়া বলে একটা কথা আছে। হাওয়াটা বোধ হয় পরাধীন ভারতের বাঙলাদেশে প্রথম লেগেছিল। লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। হাওয়াটা কেবল বর্ণহিন্দুদের ঘরে ঝড় তোলে নি, তুলেছিল সব সম্প্রদায়ের মধ্যে। হয়তো তার সবটুকু ফল আজ মিষ্টি আর সুরসে পরিণত হয় নি। কিছু কিছু বিষবৃক্ষের জন্ম দিয়েছিল, ফলও ফলেছিল বিষাক্ত।

এসব শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের বিষয়। কান্তর বেলায় বিষাক্ত কিছু ঘটে নি। গ্রামের প্রাথমিক পাঠশালার শেষ বছর পর্যন্ত সে বই শেলেট বগলে ইস্কুলে গিয়েছিল। জলপানি পাওয়া দূরের কথা, শেষ পরীক্ষাও দিয়ে উঠতে পারে নি। কারণ কান্তর মন কখনো লেখাপড়ার দিকে টানে নি। তার বাবা যদিও বলতো রক্তের দোষ, কিন্তু কান্ত ছেলেবেলা থেকেই কামারশালাকে ভালবেসেছিল। আসলে সে লেখাপড়া শিখে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ার থেকেও, একজন বড় কামার হতে চেয়েছিল। আর এই স্বপ্নটা তার প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছিল তার ঠাকুর্দা।

ইস্কুলে পড়ার সময়েই সে ঠাকুর্দার কাছে নিজেদের পরিবারের গল্প শুনতো। যে-সব কথা বাবা মা দাদার কাছে ও কখনো শুনতে পেতো না। ওর ঠাকুর্দা মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞেস করতো, 'ইস্কুলের বইয়েতে সাহেব-সুবোদের কথা এতো পড়িস, এ দেশের নাম, লোকের কথাও পড়িস, কিন্তু আমাদের কথা তো কিছু পড়িস না। আমাদের কথা কি কিছু লেখা থাকে না ?'

boiRboi.net

কান্ত যখন পাঠশালায় পড়তো, তখনো এ দেশ ছিল পরাধীন। কান্ত পাঠশালা ছাড়ারও অনেকগুলো বছর বাদে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কান্ত ওর ঠাকুর্দাকে বলতো, 'হ্যাঁ, কামার কুমোর তাঁতী জেলে জোলাদের কথাও লেখা আছে।'

কান্তর ঠাকুর্দা বলতো, 'ওরকম করে বললে, আমাদের কথা মোটেই বলা হয় না।'

কান্ত ওর ঠাকুর্দার মুখেই প্রথম শুনেছিল, ওরা কামার বটে, আসলে আগারিয়া। অনেক পুরুষ আগে, কোম্পানির ইংরেজ সাহেবরা ওদের সারা দেশে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বিলাতের কারখানা থেকে লোহার জিনিস এনে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে, আর আগারিয়ারা বেগার হয়ে, যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। ঢাকা আর মুর্শিদাবাদের মসলিন তৈরির তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে নেবার মতোই, আগারিয়াদের লোহা গলানো বড় বড় কারাখানাগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে।

লোহা গলানো কারখানা! কান্তর কাছে স্বভাবতই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। দেশীয় কামারেরা লোহা গলিয়ে ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ জানতো, এ কথা সে কখনো শোনে নি। ঠাকুর্দা হেসে বলতো, 'তুই শুনবি কি, তোর বাপ কখনো শুনেছে কী না সন্দেহ। ওটা হলো ভগবানের মার। এ দেশের লেখাপড়া জানা, বড়বাবুরাই চুপ করে থাকে, তোরা কি করে জানবি? আমিই কি জানতে পারতাম? আমিও আমার ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, নিজে কখনো লোহা গলানো ঢালাইয়ের কাজ করি নি। কিন্তু আমরা আগারিয়ারা সেই কাজ জানতাম। চিরকালই এমনি, কোম্পানির কারখানা থেকে, লোহার তাল কিনে নিয়ে, হাপরের আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে শুধু ঘর-গেরস্থালির কাজ করি নি। শাবল, কোদাল, কুড়োল, গাঁইতি, জাঁতি, দা আর কাস্তে বানানোই আমাদের কাজ ছিল না। ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, লোহার ঢালাইয়ের বড় বড় ইমারত আর কেল্লা বানাতাম আমরা। আমরা আগারিয়ারা খাঁটি ময়দানবের বংশধর।'

ঠাকুর্দার মুখে কথাগুলো শুনে, কান্ত একটা আশ্চর্য শিহরণ বোধ করলেও, কিছুটা সংশয় থেকে যেতো। ঠাকুর্দা বলতো, 'আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা কখনো মিছে কথা বলতো না।'

কান্ত জিজ্ঞেস করতো, 'আমরা তা ভুলে গেলাম কেমন করে?'

ঠাকুর্দা বলতো, 'যেমন করে অনেক কিছুই আমরা ভুলে গেছি। কারিগরি কাজ হলো এমন কাজ, হাতে কলমে শিখতে হয়। আমরা তো আর বই পড়ে শিখি নি, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারাও কেউ বই লিখে রেখে যায় নি। দেশ জুড়ে যতো বড় বড় লোহা-গলানো কারখানা ছিল, কারিগর ছিল, ইংরেজ কোম্পানি সব নষ্ট করে দিয়ে, লোকদের বেকার করে দিয়েছে। কাজ বন্ধ হয়েছে, কেউ আর শিখতে পারে নি। সাহেবরা ওদের দেশ থেকে লোহার হালকা জিনিস সস্তায় বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে। সবই তো পয়সার ব্যাপার। লোকে সস্তা খোঁজে। কোম্পানি সস্তায় মাল দিয়েছে। আগারিয়ারা পড়তায় পোষাতে পারতো না। হেরে গেল।'

'হেরে গেল? দেশের লোকেরা কিছু বললো না?' কান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতো।

boiRboi.net

ঠাকুর্দা ফোকলা দাঁতে বিষণ্ণ হাসতো.'কোম্পানির দাপটের সামনে, নবাব-বাদশা-রাজা-মহারাজা সব কুপোকাত! লড়বার যারা লড়েছিল। বাকীরা কেবল কুর্নিশ করেছে, আর সাহেবদের জুতি সাফ করেছে। মরতে মরেছি আমরা। আমার ঠাকুর্দা বলতো, সোনার লঙ্কাই বল্, আর ওই দিল্লীর কুতুবমিনার বল্, সবই আমরা ময়দানবের বংশধর, এই আগারিয়ারাই গড়েছি। আর এখন, কোদাল কুড়োলের কাজও আমাদের হাতে নেই। দূরমুশ থেকে যা কিছু, সবই বিলিতি কারখানা থেকে বাজারে আসে। আমরা কেবল দা-কাস্তে-গজাল বানাই। এখন শুনি, হিন্দুস্থানের লোকেরা নাকি ঢালাইয়ের কাজ কোনোকালেই জানতো না।'

কান্ত অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করতো, 'আমরা তাহলে কামার নই, আগারিয়া?'

'আগারিয়ারাও তো আসলে কামারই।' ঠাকুর্দা হেসে বলতো, 'তবে আগারিয়ারাই ঢালাইয়ের কাজ ভালো জানতো।'

কান্ত জিজ্ঞেস করতো, 'আমরা তা হলে কোথা থেকে এসেছিলাম?'

'এসেছিলাম আগ্রা দিল্লী কোথাও থেকে। সেসব কিছুই মনে নেই।'

'আমরা তাহলে বাঙালী নই?'

'এখন আমরা বাঙালীই হয়ে গেছি। এখন সব কিছুই আমাদের এখানে। আমরা নিজেরাই ভুলে গেছি, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে এসেছি। সোজাসুজি তো আর এ দেশে আসি নি। কয়েক পুরুষ ধরে, অনেক দেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি, আর বাঙালী হয়ে গেছি।'

কান্তর বাবা এসব শুনলে বিরক্ত হতো, আর নিজের বাবাকে বলতো, 'পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা ছাড়ো তো। কবে কি ছিলাম, সেসব ভেবে আর কি হবে।'

কান্ত দেখতো, ঠাকুর্দা বাবার কথায় কোনো প্রতিবাদ করতো না, কেবল নিঃশব্দে হাসতো। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারতো না। বালক কান্তরও বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠতো। কেন, তা সে জানে না। তবে নিজের সম্পর্কে সে একটা গৌরব বোধ করতো। ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনানগর, স্বর্ণলংকার মতো বড় বড় পুরী তাদের বংশধরেরা তৈরি করেছিল। কুতুবমিনার এখনো তার বড় প্রমাণ। ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতো, সে বিগত যুগের আগারিয়াদের একজন হবে। বুঝতো না, আজকের আগারিয়ারা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে বেরোয়। ইংরেজরা জানতো, কাজের খুঁটিনাটি সবই নথিগ্রস্ত করে রাখতে হয়। অন্যথায় পরবর্তী বংশধরদের হাতে তা তুলে দিয়ে যাওয়া যায় না। যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবই একদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আগারিয়ারা তাদের কাজের বিষয় নথিভুক্ত করে যায় নি। যদিও পুরাণের ব্যাখ্যাকারের কাছে সবই সুস্পষ্ট। পুরাণের প্রকৃত পাঠ যাঁরা জানেন, তাঁরা ভারতীয় কারিগরি বিষয়ের সম্পর্কেও জানেন। কান্তর পক্ষে সে-রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব না। ভারতের বহু পণ্ডিত ব্যক্তির কাছেই তা আজও রহস্যময় দুর্বোধ্য। তাঁরা জানেন, বৃহৎ শিল্প সৃষ্টি সাহেবদের একচেটিয়া কীর্তি। অতএব, বলতে হয়, আজকের আগারিয়ারা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে, ঢালাই শিখতে যায় ইওরোপ আর আমেরিকায়। লৌহ-রহস্য জানতে হলে, সাহেবদের বই পড়তে

boiRboi.net

হয়। কান্তর পক্ষে কখনোই তা সম্ভব ছিল না। আগারিয়া হওয়ার স্বপ্ন তার সফল হয় নি। কিন্তু সে দশটা গ্রামে গঞ্জে নামকরা কান্ত কামার হয়েছিল। তার হাতের কাজে সবাই খুশী ছিল। দূরান্তর থেকে গ্রামীণ লোকেরা তার হাতের তৈরি লোহার সামগ্রী কিনতে আসতো। ফরমায়েশ দিতো। তবে কান্তর জীবনে সুখ বেশীকাল স্থির থাকে নি।

★

শুভাশুভ কিছুই অবিমিশ্র না। জীবনের বৈপরীত্য বিস্ময়কর। অন্যথায়, কান্ত তার মাত্র বিশ বছর বয়সের মধ্যে, একেবারে স্বজনহীন হয়ে যেতো না। ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন ওর কৈশোরেই। ঠাকুরদাকে ওর মনে ছিল না। মা বাবা দাদা মারা গিয়েছিল গ্রামের এক অদ্ভুত মড়কে। হাত-পা ফোলা, ঘাম আর আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস বন্ধ এবং বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গ্রামের অনেক লোকই মারা গিয়েছিল। একটি বোন ছিল, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই। সকলে মরলেও কান্ত মরে নি। কিন্তু বিশ বছরের কামার জোয়ানটি তখনই গৃহত্যাগের কথা ভেবেছিল। মৃত্যু ও মড়কের আকস্মিকতায়, শূন্য গৃহে একাকী সে অনেকদিন বাস করতে পারে নি। বারোয়ারী পূজামণ্ডপে গিয়ে পড়ে থাকতো। কামারশালায় ছাগল ভেড়া চরতো। কুকুর বাস করতো।

অবিশ্যি এভাবে বেশীদিন চলে নি। তার প্রতি গ্রামের লোকের নজর ছিল। বিশেষ করে, চাষী মৎস্যজীবী তাঁতী জোলাদের। বারোয়ারী পূজামণ্ডপে পড়ে থাকার সময়ে, তারাই তাকে ডেকে নিয়ে খাওয়াতো। সান্ত্বনা দিতো। শূন্য গৃহ এবং কামারশালায় তারাই আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এমন কি, কান্তর একটা বিয়েথার জন্যও অনেকে উদ্যোগ নিয়েছিল। কান্ত রাজী হয় নি।

রাধাকান্ত নামের কারণ, তার গায়ের রঙ ছিল ফরসা। এখন অবিশ্যি পোড়া তামাটে। কান্তর মা বলতো, ছোট ছেলের জন্য সে টুকটুকে ফরসা বউ আনবে। বলতো, 'ছেলে তো আমার কেবল গোরাচাঁদ নয়, কোন্‌ কামারের পোয়ের কাজ এমন নিখুঁত, আমায় দেখিয়ে দাও।'

মায়ের কথাগুলো মনে পড়লে বুকের মধ্যে কেমন টনটনিয়ে উঠতো। কেউ তার বিয়ের কথা তুললে, টনটনানি আরো বেড়ে যেতো। সে বলতো, 'এ পোড়া বাড়িতে আর কোনোদিন বউ আনবো না। যার সাধ ছিল, সে-ই যখন আমাকে ছেড়ে গেছে, আমার বউয়ের মুখ দেখবে কে? আমি? আমার সে-সাধ নেই।'

কান্ত তার এই অ-সাধটা অনেককাল বজায় রেখেছিল। কিন্তু মানুষের মন। মেয়ে-পুরুষের কথা বললেই যে-সব বেলকাঠ ব্রহ্মচারী পণ্ডিতদের মনে হয়, 'সংসারে কি স্ত্রী-পুরুষ জাতীয় জন্তু ছাড়া আর কিছু নেই,' মানুষের মনের কথা তাদের কাছে চিরকাল জলের তলের রহস্যে ঢাকা পড়ে থাকে। কান্ত বিয়ে করে নি বটে, তার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সে-কথা পরে।

কান্ত এই চার বছর সাত মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, তার সেই পুরনো পৈতৃক ভিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়ির সামনেই ছিল কামারশালা। তার তিন দিকে মাটির পাঁচিল। মাঝখানে উঠোন, দক্ষিণমুখো দুটো মাটির ঘর।

পিছনে একটি ডোবাকে ঘিরে ফণীমনসার বেড়া। দেওয়ালবিহিন একটি চালা, উঠোনের পশ্চিমে। এই হলো কামারবাড়ি।

কান্ত দেখলো, কামারশালার সামনের খোলা জায়গায় ঝাঁপটা আর নেই। আগুয়ার খড়ের চাল অনেকখানিই নেই।

★

কামারশালা বলতে যা কিছু, তার সব কিছুই অবর্তমান। মাটির মেঝেয় বড় বড় গোটাকতক গর্ত। ঘাস জঙ্গল গজিয়েছে ভিতরে। ঘাস জঙ্গল কামারশালার বাইরেও। শেষ ফাল্গুনে বনগাঁদার ঝাড়ে সামনের চত্বরটা ভরতি। বেলগাছটাও কবে কেমন করে কামারশালার সামনে জন্মালো, এতো বড় হলো, কে জানে? বেলগাছটাকে জড়িয়ে ধরে আছে সবুজ সোনালী লতাপাতায়। লতাগুল্মের গায়ে গায়ে ঝিঙে ফুলের মতো ফুল ধরেছে। মৌমাছিরা গুনগুন করছে। বনশিউলির পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়েছে চারদিকে। ঝাড় এখন শুকনো কাঠির মতো। তবু এই পোড়ো ভিটা ঝাড়জঙ্গল আর ঘাসের মধ্যে পায়ে চলা একটি সরু পথের অস্পষ্ট রেখা।

এখন ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র দুপুর। গ্রাম নিঝুম। পাড়ার লোকের চলাফেরা নেই। কান্ত আশেপাশে একবার দেখলো। কেউ কোথাও নেই। কামারশাল পুবমুখো, আর পুবেই সদ্‌গোপ বিশ্বাসদের মস্ত বড় বাগান। বাগানের ওপাশে তিন ঘর সৎচাষীর বাস। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে সেই বাড়ি কয়টি চোখে পড়ে। লোকজন কারোকে দেখা যায় না। ভেসে আসে না কারোর স্বর। দক্ষিণে উঁচু পাড় ঘিরে আম তেঁতুলের ঘন ছায়া। মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরটা উত্তরের ব্রাহ্মণ পাড়ার চক্রবর্তীদের।

শেষ ফাল্গুনের এই ঝাঁ ঝাঁ রোদের তেজে ভারী জ্বালা। মাটি থেকে তাত উঠছে। বাতাসও উত্তপ্ত। রবিখন্দ শেষ। নতুন বৃষ্টির অপেক্ষা। গ্রামের মানুষের ব্যস্ততা এখন কম। তা ছাড়া গ্রামের দুপুর, শীতকাল ছাড়া সব সময়েই নিঝুম আর অলস। নিরলস কেবল বাতাস। আর কোকিলের ডাক। আশেপাশের ঝোপে-ঝাড়ে মাঝে মাঝেই দোয়েল টুনটুনি ডেকে উঠছে। খেজুর গাছের পাতার ডগায় ফিঙে ল্যাজ ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে। এ সময়টায় ফড়িং দেখা যায় না। প্রজাপতি উড়ছে খাপছাড়া, জোড়ায় বা একাকী। আর একটা কুকুর, সাদায়-কালোয় মেশানো, সেই গ্রামে ঢোকা ইস্তক পিছনে ঘেউঘেউ করে এতোখানি এসেছে। নেহাত শেষ ফাল্গুনের নিঝুম দুপুর। না হলে কুকুরের ডাকে এতোক্ষণে দশ বিশটা কুচো কাঁচা কুকুরটার সঙ্গেই কান্তর পিছনে লাগতো। আর তার এই অচেনা ঝাঁকড়া-চুলো, গোঁফদাড়ি গজানো মুখটা দেখে হয়তো পাগল বা চোর ডাকাত, নিদেন ছেলে-ধরা ভেবেই মাটির ঢ্যালা ছুঁড়তে আরম্ভ করতো।

কান্তকে চুপ করে এমন একটা পোড়ো ভিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুকুরটার কী হলো কে জানে, ওর প্রবল চিৎকারের মাত্রাটা কমে গিয়েছে। পরিবর্তে একটা কৌতূহল যেন জানোয়ারটার দু চোখে দেখা দিয়েছে। এমন কি দু একবার কান্তর গায়ের কাছে এসে নাক তুলে শুঁকে শুঁকে, আবার কয়েক পা সরে গিয়ে অলসভাবে দু একবার ঘেউঘেউ করে আবার থেমে গিয়েছে। কুকুরটাকে নিয়ে

boiRboi.net

কান্তর মনেও কৌতূহল এখন। গ্রামের দক্ষিণের প্রবেশপথ থেকে কুকুরটা উত্তরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসেছে। কোনো বাড়ির কুকুর হলে বাড়ির সীমানার কাছেই থেমে যেতো। তা যায় নি। কেন, ও কি কোনো বাড়ির পোষা কুকুর না?

কান্ত ঝোপ-জঙ্গল আর ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে-হাঁটা অস্পষ্ট সরু রেখা পথের ওপর দিয়ে পায়ে পায়ে কামারশালে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে যা চোখে পড়ে নি, এখন পড়লো। ঘরটার পশ্চিমের মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। চালাটা পড়েছে ধসে। ওদিকেই একটা দরজা ছিল, বাড়ির ভিতরে যাবার। সেই দরজাটার কাঠের পাল্লা চৌকাঠ কিছুই নেই। চালায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। লক্ষণীয়, কুকুরটার আচরণে এখন আর আক্রমণের কোনো লক্ষণই নেই, বরং জানোয়ারটা এদিকে ওদিকে শুঁকে বেড়াতে বেড়াতে, দু এক জায়গায় ঠ্যাঙ তুলে মূত্রত্যাগ করলো, আর কৌতূহলিত পশুর চোখে কান্তকে দেখতে লাগলো।

কান্ত দেখলো ছাগল-গরুর নাদি আর গোবর শুকিয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে। ভেঙে পড়া চালায় ধুঁদুলের লতাপাতা ভাঙা ফাঁকের মাঝখান দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। তারপরেই তার চোখে পড়লো বাঁ দিকেও একটা পায়ে-চলা অস্পষ্ট সরু রেখা। দেখে বোঝা যায় মানুষেরই পায়ে চলার দাগ। কান্ত সেই দাগ ধরে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বাড়ির আগাছা-গজানো উঠোনে এসে পড়লো। ভিতরের আবরু বাঁচানোর জন্য যে মাটির দেওয়াল ছিল, তিন দিকেই তার প্রায় সবটা ভেঙে পড়েছে। স্বাভাবিক। বৃষ্টিতে গলে পড়েছে। মাটির দেওয়াল নিয়মিত দেখাশোনা না করলে এমনিই হাল হয়। তা ছাড়া, রক্ষক না থাকলে যা হয়, যখনই যার মাটির দরকার হয়েছে কামারদের পোড়ো বাড়ির দেওয়াল ভেঙে নিয়ে গিয়েছে।

কামারশালের সামনে যেমন মাঝারি আকারের একটা বেলগাছ দাঁড়িয়ে উঠেছে, উঠোনে সে রকম কিছু হয় নি। বড় বড় ঘাস আর আগাছা, আর মাটি কামড়ে ধরা লতাগুল্ম। হোক তা আগাছা আর জঙ্গল আর অপ্রয়োজনীয় লতাপাতা, বসন্তের ফুল সেখানেও ফুটেছে। এখানে ওখানে কৃষ্ণকলির ঝাড়ে মেলাই লাল কুঁড়ি, ফোটবার জন্য বিকালের অপেক্ষায় আছে। লাউ শিমের মাচা-টাচা কিছু নেই। তবু মা বেঁচে থাকতে যেখানে লাউ শিমের মাচা করতো, সে-সব জায়গায় এখনো দু একটা পোকায় খাওয়া বাঁশের খুঁটি।

কান্ত দেখলো, বাড়ির ভিতরের উঠোনেও পায়ে-হাঁটা পথের একটি অস্পষ্ট সরু রেখা ঘরের দরজা বরাবর এগিয়ে গিয়েছে। রেখা দেখলে বোঝা যায়, অল্পস্বল্প হলেও নিয়মিত না চললে এমন একটি রেখা জাগে না। সে আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলো দক্ষিণমুখো একটা ঘরের দরজা চৌকাঠ না থাকলেও বড় ঘরটির দরজা অটুট। ভিতর বা বাইরে থেকে বন্ধ নেই, এমনিই ভেজানো রয়েছে। একটু ফাঁকও রয়েছে।

ঘরটার মধ্যে কেউ থাকে নাকি? কান্তর কেমন সন্দেহ হলো। মানুষের আনাগোনার প্রমাণ তো পায়ে-চলা পথের আবছা চিহ্নেই স্পষ্ট। কেউ থাকাটাই বা আশ্চর্যের কী? কুকুরটাও ইতিমধ্যে উঠোনের চারপাশে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে

boiRboi.net

আরম্ভ করেছিল। কান্তর আগেই সে বড় ঘরের ভেজানো দরজাটার কাছে শুঁকে একেবার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ করে ফিরে এলো। সোজা গিয়ে ঢুকলো দরজাবিহীন অন্য ঘরটার ভিতরে। কান্ত তার অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করলো, ভিতরে হয়তো কেউ নেই। থাকলে, কুকুরটাকে তাড়া করতো। অবিশ্যি নাও করতে পারে। একটা কুকুরের আবির্ভাবে অনধিকারী বাসিন্দার কী যায় আসে?

তবু কৌতুহলটা না মিটালে নয়। কান্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে ঠ্যালা দিয়ে খুললো। দুপুরের আলো ঘরে ঢুকলো, লোকজন কারোকে দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না। মাটির ধাপ কাটা সিঁড়ি ছিল। এখন আর তা নেই। সে ঘরের মধ্যে পা দিল। ডাইনে বাঁয়ে উঁকি দিল। দেখলো, তার আগেই কুকুরটা ঘরের মধ্যে ঢুকে চারপাশে শুঁকতে আরম্ভ করেছে। বোধহয় মাকড়সার ঝুলের জন্যই, মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ করছে।

কান্ত দেখলো, ছোট ঘরটার চালা ধসে পড়েছে। মাঝখানের দেওয়াল অনেকখানি নেই। বড় ঘরটার একপাশে একটা হোগলা চাটাই পাতা। কাছে গিয়ে দেখলো, দু তিনটে খালি বোতল। দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না, ধানেশ্বরীর বোতল। লাল কাপড় জড়ানো একটি গাঁজার কলকে, একখণ্ড ইঁটের ওপর বসানো। দু পেটি তাস। একটি কেরোসিনের লম্ফ। এর পরে আর ব্যাপার বুঝতে অসুবিধা হবার কথা না। স্থায়ী বাসিন্দা কেউ এখানে আস্তানা নেয় নি। মদ গাঁজা আর তাসের আড্ডা বসে। হয়তো আরো কিছু ঘটে। আপাতত কান্তর চোখে সেরকম কিছু পড়লো না।

এমন একটি মুহূর্তেও, কান্তর গোঁফদাড়ির ভাঁজে কিঞ্চিৎ কৌতুকের হাসি ফুটলো। চার বছর সাত মাস আগে গাঁয়ের মাতাল গেঁজেলদের অনেককেই চিনতো। তারা সকলেই ছিল কান্তর থেকে বয়স্ক লোক। এমন একখানি নিরালা ঘর পেয়ে কে আর গাছতলায় পুকুরপাড়ে গিয়ে নেশা-ভাং করে। তবে তাসের পেটি দুটো দেখে একটু অবাক হলো। পেটি দুটো জুয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়। জুয়াড়ুয়া গঞ্জেই চলতো, গ্রামে কখনো বিশেষ চলতে দেখা যেতো না, একমাত্র পৌষ সংক্রান্তির দিনে সুবচনীতলার মেলায় ছাড়া।

কিন্তু এ ব্যাপারে বেশীক্ষণ অবাক্ হয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। কান্ত ঘরের চারপাশে তাকালো। গোবরমাটি দিয়ে দেওয়াল লেপা মোছার কোনো চিহ্ন নেই। তবু এ ঘরটার দেওয়াল তিনদিকেই দাঁড়িয়ে আছে। যদিও কোথাও ইতিমধ্যে উই ধরেছে। একদিকে ভাঙা দেওয়াল আর ছোট ঘরটার চালার আড়াল পড়েছে। কুলুঙ্গি দুটো আছে। আয়না নেই। কালী আর লক্ষ্মীর পট নেই। পূর্বদিকের দরজার মাথায় বিশ্বকর্মার পটও নেই।

প্রায় পাঁচ বছরের সরকারী খাজনা বাকী। কান্ত তার বাড়ির অধিকার হারায় নিতো? সে ঘরের বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই দেখলো কুকুরটা তার কোমরের দিকে তাকিয়ে, নাসারন্ধ্র কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শুঁকছে। কান্তর খেয়াল হলো, তার কোমরের কোঁচড়ে কিছু মুড়ি মুড়কি রয়েছে। খেতে খেতে আসছিল। গ্রামে

boiRboi.net

ঢোকবার পরে আর খাবার কথা মনে ছিল না। যে দু একজন তাকে দেখেছে, এই ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফদাড়ি ভেদ করে চিনতে পারে নি। সেও তাদের চিনতে পারে নি। এখন কুকুরটাকে তার কোঁচড়ের দিকে তাকিয়ে শুঁকতে দেখে সে হাসলো। বললো, 'এখন কেন রে? চোর তাড়াবার জন্য খুব যে ঘেউঘেউ করছিলি। কী করে বুঝলি আমি চোর নই, এ বাড়ির মালিক?'

কুকুরটা আশ্চর্যরকমভাবে কান্তর কথার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় কাত করে কান নাড়লো। কান্ত জামা তুলে কোঁচড়ে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে মুড়ি মুড়কি মেঝেয় ছড়িয়ে দিল। কুকুরটা ক্ষুধার্তের মতো খেতে লাগলো। কান্ত হাসলো, একটা নিঃশ্বাসও পড়লো। ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, 'বাঁচবার রাস্তা সবাই খোঁজে।'

কান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। রান্নাঘরের চালাটার সামনে এসে দেখলো, চালা, বাঁশের খুঁটি কিছুই নেই। দেওয়াল আগেও ছিল না। যে দিকটায় কাঠের উনোন ছিল, সেদিকটা ছ্যাঁচা বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। বৃষ্টিবাদলার হাত থেকে উনোন বাঁচাবার জন্য। এখন সেই ছ্যাঁচা বেড়াও নেই। আছে শুধু মাটির মেঝেটা। তাও কয়েক বছরের বৃষ্টির জলে ধুয়ে অনেক জায়গায় গলে গিয়েছে। উনোনের কোনো চিহ্নই নেই।

কান্ত আরো পশ্চিমে গেল, ডোবার ধারে। ডোবাটা প্রায় তেমনি আছে। নেই চারপাশের ফণীমনসার বেড়া। আমগাছ দুটো, আর কাঁঠাল গাছ এখনো কেউ কেটে নিয়ে যায় নি। এমন কি, এই শেষ ফাল্গুনে কাঁঠালের এঁচোড় ঝুলছে, ধাড়ি লোমশ ইঁদুরের মতো। আমগাছ দুটোতে অজস্র বোল ছেড়েছে। দুটো সজনে গাছে এখনো কিছু সজনে ঝুলছে। ডোবার পশ্চিমে কয়েক কাঠা জমির পরেই। আর এক সম্পন্ন সদ্‌গোপ পরিবারের বাগান আর পুকুর। তার ওপারে চাষের মাঠ। যে-মাঠে এখন হয়তো কিছু কিছু পটল ঝিঙের আর বেগুনের চাষ হয়েছে।

শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ শব্দে কান্ত ফিরে তাকালো। সেই কুকুরটা। কান্ত জামাটা তুলে কোঁচড় উজাড় করে সব ঢেলে দিল। কুকুরটা ঘাসের মধ্যে জিভ ঢুকিয়ে খুঁটে খুঁটে খেতে আরম্ভ করলো। কান্ত ডোবার জলের দিকে তাকালো। মা এই ডোবায় বাসন মাজতো। বাড়ির সবাই চান করতো। দক্ষিণের বামুন-পুকুর থেকে খাবার জল আসতো।

চার বছর সাত মাস। কান্তর আবার মনে পড়লো। পাঁচ বছরের মেয়াদ হয়েছিল। আট মাস আগেই ছুটি পেয়েছিল। তার কাজকর্ম আচরণবিধির দ্বারা আট মাস মেয়াদ মকুব হয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েই গ্রামে আসতে পারে নি। কেউ তাকে বাধা দেবে এমন ভাবে নি। বাধা তার নিজের মনে ছিল। লজ্জা আর সংকোচ আর মর্যাদাবোধ। কারণ সে চুরি করে নি, ডাকাতি করে নি। কিন্তু কাজলকালো ডাগর চোখের তারা দেখে ভুলেছিল। ভুলেছিল আরো বেশী কিছু দেখে। আর সেই ভোলানো এমন, এত দূরে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, কান্ত পটু হাতে একটি কামারের কাজ করেছিল। কামারের ছেলে, কামারের কাজ করেই অপরাধ করেছিল। সেই অপরাধেই সাজা খাটতে জেলবাস।

boiRboi.net

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চার মাস নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। গায়ের এই জামাকাপড় জেল থেকেই দিয়েছে। পায়ে কিছু জোটে নি। জেলে থাকাকালীন গায়ে কয়েদীর পোশাক ছিল। যে-জামাকাপড় পরা অবস্থায় জেলে গিয়েছিল, সে-সবই ফেরত পাবার কথা ছিল। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তা দিতে পারে নি। হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার শরীরে কোনো সোনারুপো ছিল না। সামান্য কয়েকটি টাকা ছিল। সেই টাকা ছাড়াও জেল থেকে আরো কিছু রাহা খরচ দিয়েছিল। আর এই মোটা ধুতি আর পাঞ্জাবি।

কান্ত গত চার মাস নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কামারশালা খুঁজেছে। যেখানে পেয়েছে, কাজ করেছে। যারা তাকে পেয়েছিল, কেউ ছাড়তে চায় নি। কিন্তু কান্তরই মন টেকে নি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে গিয়েছে। চার মাস ধরে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কাটিয়ে আজ সে ভিটায় এসে দাঁড়ালো। মনে পড়লো, সেই কাজলকালো ডাগর চোখের ঝিলিক। ভাবতে ভাবতে মুখ শক্ত হলো। চোখের দৃষ্টি জ্বলে উঠলো। ঝাঁকড়া চুল, গোঁফদাড়ি-ভরা মুখ, তামাটে বর্ণের মানুষটিকে সহসা ডাকাতের মতোই দেখালো। ভাবলো, ভিটায় থিতু হয়ে বসা যাবে কী না, কে জানে? সে সব চেষ্টার আগে, একবার দক্ষিণ পাড়ায় যেতে হবে। গ্রামে এসে যখন ঢুকেছে, তখন একবার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। তার সঙ্গে ফয়সালা না করে এ গ্রামে বাস করা যায় না। তার জন্য যদি আবার একবার জেলে যেতে হয়, যেতে হবে। কান্ত তার ভবিতব্যের কথা কী-ই বা জানতো? এখনো জানতে চায় না। সে বাড়ির পিছন দিয়েই, দক্ষিণে বামুন-পুকুরের খাড়া পাড়ের দিকে চললো।

★

গ্রামের দক্ষিণ পল্লীর একাংশকে গোপপল্লী বলা যায়। দক্ষিণের প্রত্যন্ত অংশে বাউরীদের বাস। উত্তরের অংশে প্রধানত ব্রাহ্মণদের বাস। পূর্ব পশ্চিম এবং সমস্ত গ্রাম মিলিয়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থর তুলনায় গোটা গ্রামে সদ্‌গোপদেরই আধিপত্য বেশী।

কান্ত গোপপল্লীর একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। সব বাড়িরই মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। এই নিঝুম দুপুরে লোকজনের তেমন সাড়াশব্দ পাওয়া না গেলেও, ট্রানজিসটারের গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। কান্ত যে বাড়িটির সামনে দাঁড়ালো, সেই বাড়িটি পাঁচ বছর আগের মতো আর ছিমছাম নেই। তার নিজের বাড়ির মতো আগাছা জঙ্গলে ভরে গিয়ে একটা পোড়ো ভিটার মতো না হলেও অনেকটা জীর্ণদশা। দুটি ঘরের মাঝখান দিয়ে বাড়ির ভিতরের উঠোনে যাবার পথ। ঘরের দরজা উঠোনের দিকে। পাঁচিল নেই। দরজা জানালাহীন ঘরের মাটির দেওয়ালই ভিতরের উঠোনকে আড়াল করে রেখেছে।

কান্ত আশেপাশে তাকালো। একটু দূরের তেঁতুল গাছের নিচে এক বৃদ্ধ বসে আছে। তার দৃষ্টি দূরের মাঠের দিকে। সম্ভবত পাড়ার গরুর পাল নিয়ে রাখালের দল দূরের মাঠে এখন গাছপালার ছায়ায় শুয়ে আছে। কান্ত এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো, তারপরে দুই ঘরের মাঝখান দিয়ে উঠোনে ঢুকলো। কোনো ঘরে

boiRboi.net

ট্রানজিসটারে গান হচ্ছিল। হঠাৎই একটি মেয়ে-গলার খিলখিল হাসি ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এলো। কান্তর বুকের মধ্যে ছাৎ করে উঠলো। মনে হলো, অনেক দিনের চেনা হাসি শুনছে। যেন তার বুকে এক রাশ চুল ছড়িয়ে, এক উজ্জ্বল শ্যামলী মুখ, তরঙ্গিণীর মতো খিলখিল করে হাসছে।

কান্তর আচ্ছন্নতাকে চকিত ঝংকারে ভেঙে দিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে একটি পুরুষ গলা ভেসে এলো, 'কী খালি পাগলের মতন হাসো। একটু গান শুনতে দাও না।'

রমণীর হাসির সঙ্গে কথা শোনা গেল, 'তা গানের কথা শুনে আমার হাসি পেলে কী করবো। ওকি গানের ছিরি!'

কান্তর ভুরু কুঁচকে উঠলো। এতো সেই তারই গলা! একটুও বদলায় নি। যেন বেহালার মধ্য তারে নতুন করে রজন ঘষা ছড়ের টানে বাজছে। সেটা হলো স্বর। হাসি যেন দোতারার কষে বাঁধা তারের ঝংকার, ঠিক তেমনিই আছে। পুরুষটি কে? নিশ্চয়ই নতুন কেউ জুটেছে। অবিশ্যি এই গোপ রমণীটির চারপাশে, চিরদিনই পেখম-ধরা ময়ূরেরা ঘুরে বেড়িয়েছে। এখনো বেড়াচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে কান্তর মুখ শক্ত হলো। আর এই মুহূর্তেই তাকে চমকিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরের ট্রানজিসটারের শব্দ ছাপিয়ে একটি শিশুর কান্না শোনা গেল। রমণীর স্বরও তখনই ভেসে এলো 'তোমার ও ছাইয়ের গান বন্ধ করো তো। আমার ছেলে ঘুমোতে পারছে না।'

কান্ত এবার গলা খাকারি দিল, আর ঘরের দরজার দিকে আরো দু' পা এগিয়ে গেল। মনে মনে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো, 'মাগী এই বয়সে আবার ছেলে বিইয়েছে!'

ঘরের ভিতর থেকে পুরুষ স্বর শোনা গেল, 'কে গো? কে ওখানে?'

কান্তর ছায়াটা কিছু দীর্ঘতর হয়ে ঘরের দরজার কাছে পড়েছিল। সূর্য এখন কিছুটা পশ্চিমে ঢলেছে। ঘরের ভিতর থেকে দরজার সামনে একটি খালি গা যুবক এসে দাঁড়ালো। কালো, স্বাস্থ্যবান শক্তপোক্ত চেহারা, ধুতির খুঁট দিয়ে কোমরে কষে ফেট্টি বাঁধা, আঁট কাছা। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে। কান্তর থেকে বছর চার পাঁচেক ছোট হবে। মেয়েমানুষটির গুণ অনেক। এখনো এই বয়সের জোয়ানকে নিয়ে ঘর করছে। বয়স হিসাব করলে সেই সর্বনাশী কান্তর থেকে ছোট না, বরং এক আধ বছর বেশীই হবে।

দরজায় দাঁড়িয়ে যুবক কান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে, স্বাভাবিক সরল অবাক্ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কে? কাকে চাই?'

'নয়ন গয়লানীকে চাই।' কান্ত শক্ত মুখে, কঠিন নীচু স্বরে উচ্চারণ করলো, 'একটু ডেকে দাও তো।'

কান্তর কথা শেষ হবার আগেই, ঘরের ভিতর থেকে রমণীর স্বর ভেসে এলো, 'কে গো? কী বলছে?'

যুবকের চোখ কান্তর গোঁফদাড়ি-ভরা শক্ত মুখ, জ্বলন্ত এক জোড়া চোখের দিকে। বললো, 'চিনতে পারছি না, কী বলছে, তাও বুঝতে পারছি না।'

যুবকের কথার মাঝখানেই, এঁটো হাতে, মুখে ভাত চিবোতে চিবোতে একটি

boiRboi.net

বাইশ-তেইশ বছরের তরুণী যুবকের পাশ দিয়ে উঁকি দিল। খোলা চুল কাঁধের ওপর ছড়ানো। সামান্য একটি জলে কাচা লাল পাড় শাড়ি তার পরনে। মুখের খাবার গিলে নিয়ে, ভুরু কুঁচকে কান্তর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কে? কে তুমি? কাকে চাইছো?'

কান্তর মুখে অবাক অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি। যে রমণীর কথা ভেবেছিল, স্পষ্টতই এ সে নয়। এর বয়স অনেক কম। কিন্তু চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য সামঞ্জস্য। ঠিক তেমনিই উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, কাজল কালো ডাগর চোখ, চোখা নাক, কিন্তু উন্নত নাসা বলতে যেমনটি বোঝায়, ঠিক তা না। চোখে-মুখে, সেই আর একজনের মতোই ধারালো ভাব। যুবকের পাশ থেকে যতটুকু শরীর দেখা যাচ্ছে, সেই তারই মতো। মেদহীন শরীর, উদ্ধত বুক, ক্ষীণ কটি, অনতিস্থূল কোমর।

যুবক বললো, 'বলছে, নয়ন গয়লানীকে চাই।'

'নয়ন গয়লানী?' তরুণী অবাক্ স্বরে বলে উঠলো, 'আমার মাকে খুঁজছো তুমি? তুমি কে?

কান্তর বিস্মৃতির অন্ধকারে বিজলি হেনে গেল। মনে পড়ে গেল নয়নের একটি মেয়ে ছিল। বালবিধবা নয়নকে দেখলে কেউ ভাবতো না, তার একটি মেয়ে আছে। বালবিধবা হলেও, সে কখনোই বিধবার বেশ ধারণ করে থাকতো না। তাম্বুলরঞ্জিত থাকতো তার ঠোঁট, পায়ে আলতা। কেবল সিঁথেয় সিঁদুর ছোঁয়াতো না। রঙীন ডুরে বা চওড়া পাড় অথবা ছাপা শাড়ি, বিবি জামা, নিটোল পায়ের গোছায় রুপোর মোটা মল, গলায় রুপোর হার, কানে ঝুমকো, হাত ভরতি বেলোয়ারি চুড়ি। চোখ কাজল কালো ছিল, এই মেয়েটির মতোই, তবু সে চোখে কাজল পরতো, তার ফলে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো, পুরুষের প্রাণ ধাঁধানো খরতা। গ্রামের উচ্চ নীচ সকল সম্প্রদায়ের পুরুষের ওপরেই তার দাপট ছিল অসাধারণ। সে ছিল ঘোষিত স্বৈরিণী।

কান্তর কঠিন স্বর কিঞ্চিৎ নরম হলো. বললো, 'তুমি আমাকে চিনবে না। তোমার মা কোথায় বলো, আমি তার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চাই।'

নয়নের মেয়ে আর যুবক পরস্পরের দিকে অবাক্ দৃষ্টিবিনিময় করলো। মেয়েটি বললো, 'মা তো আমার অনেককাল হলো মরে বেঁচেছে, আমাদেরও বাঁচিয়েছে।'

'মরে বেঁচেছে?' কান্ত স্খলিত বিস্মিত স্বরে উচ্চারণ করলো, 'অনেক কাল হলো? কতো কাল? কী হয়েছিল?'

মেয়েটি তার ডাগর চোখে তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কান্তর মুখ দেখছিল। বললো, 'তা হবে বছর তিনেক। হয় নি কিছুই। সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল।'

'গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী!' কান্তর স্বরে আশাতীত বিস্ময়, 'নয়ন—নয়ন আত্মঘাতী হয়েছিল? কেন?'

মেয়েটি এবার মুখ ঝামটা দেবার মতো করে বললো, 'এত কথা এখন বলতে পারবো না বাপু। আমার বাড়া ভাত পড়ে রয়েছে। খেতে খেতে উঠে এসেছি। তুমি কোথাকার কে, চেনা নেই, শোনা নেই, এই ভরদুপুরে তোমাকে মায়ের

boiRboi.net

সাতকাহন কেচ্ছা বলতে পারবো না।'

মায়ের মতোই মেয়েটির কথাবার্তার ধরন ধারণ। কিন্তু দেখে মনে হয়, মায়ের স্বভাব পায়নি। বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে মনের মিল আছে, সংসারটি সুখের। মেয়েটির বিমুখ প্রত্যাখ্যানে কান্ত বিব্রত আর লজ্জিত হলো। বললো, 'না না, তোমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। আমার যা শোনার তা শোনা হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষ্যামা করে দিও।'

কান্ত পিছন ফিরে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো। যুবক বলে উঠলো, 'তা আপনি কে মশাই, তা তো বললেন না? আমার শাশুড়ীর খোঁজ করছেন, অথচ আপনাকে চিনতে পারলাম না।'

যুবকের সম্বোধন আর কথাবার্তার ধরনে সহবত ফুটে উঠলো। ইতিমধ্যেই কান্তর মন বিস্ময় আর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। এখন তার মুখ আর শক্ত নেই। চোখে জ্বলা নেই। বুকের মধ্যে যে একটা অপমান আর প্রতিশোধের জ্বালা দাউদাউ করে জ্বলছিল, সেই জ্বলাটা থেকেও যেন অন্য এক অনুভূতির পর্যায়ে পেঁছিুলো। সে পিছন ফিরে হাসলো, বললো, 'আমাকে তুমি চিনবে না বাবা। তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে আমার চেনাশোনা ছিল। প্রায় বছর পাঁচেক আগে তাকে দেখেছি। তারপরে আর গাঁয়ে ছিলাম না। ফিরে এসে একবার খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

নয়নের মেয়ে তখন ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছিল। কান্ত আবার পিছন ফিরে যাবার উদ্যোগ করতেই, মেয়েটি ঈষৎ দরজার বাইরে এক পা বেরিয়ে এসে বললো, 'অই গ, অ লোকটা শোন শোন। তুমি কি কামারবাড়ির কান্ত কামার?'

কান্ত মেয়েটির দিকে ফিরে হাসলো। মেয়েটিকে মা বলে সম্বোধন করতে গেল, পারলো না। যেখানে আটকালো, সেখানে এক চির-পুরুষের চোখের সামনে, মেয়েটি সেই রমণীর রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। কান্তর হাসিটা এমনিতেই করুণ দেখায়, সামনের দুটি দাঁত না থাকায় পড়ে যায় নি। জেলে একদিন কয়েদীদের গোলমালের মাঝখানে পড়ে, মেট্-এর আর ওয়ার্ডারের মার খেয়ে, ওপর আর নিচের পাটির দুটি দাঁত পড়ে গিয়েছিল। সে বললো, 'চিনেছ ঠিকই, তবে ঘরে তোমার বাড়া ভাত, আর এখন কথা বাড়াবো না, চলি। যার খোঁজে এসেছিলাম, সে-ই যখন আর নেই, তখন আর কথা কিসের? চলি।'

কান্ত আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। দুটি অবাক্ কৌতূহলিত মুখ পিছনে রেখে সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে দেখলো, সেই কুকুরটি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়াচ্ছে। কান্ত তেঁতুলতলার দিকে তাকালো। সেই বৃদ্ধ লোকটি তখনো মাঠের দিকে মুখ করে বসে আছে।

ঘরে ট্রানজিসটারের গান ছাড়াও, বাতাসে মাইকের মারফত হিন্দী গান ভেসে আসছে। হয়তো পাশের গ্রামে বা এ গ্রামের অন্য কোনো প্রান্তে বিয়ে বা উপনয়ন-টয়ন গোছের কিছু আছে। আজকাল শহরে গ্রামে সবখানেই মাইক বাজে। শহরের সঙ্গে এখানে তফাত হলো, এখানে গাছপালা ঘেরা বাগান পুকুর আর বাতাসের সঙ্গে মাইকের চিৎকার কেমন যেন সংগতিহীন। এখানে এখন শিমুল

boiRboi.net

গাছগুলো লাল হয়ে আছে। এখনো কিছু কিছু পলাশ, ন্যাড়া ডালের এখানে ওখানে আকাশমুখো। আমগাছগুলোতে বোল ধরেছে। বকফুল ফুটেছে গাছে। বাতাবি লেবু গাছে ফুল ফুটেছে বিস্তর। ঘুঘু চরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে ছায়ায়। বুনো পায়রা বলা যায়, এমন ভালবাসার জোড় কম দেখা যায়। কোকিলের ডাকের তো কথাই নেই। তার মাঝখানে হঠাৎ হাম্বা রবে, দুপুর কেমন আতুর হয়ে ওঠে। এ সবের মধ্যে মাইকের গান অনেকটাই বেমানান। হয়তো বেমানান শহরেও। কিন্তু মানুষ তার স্বভাবের দ্বারা মানিয়ে নেয় সব কিছুই।

গ্রামের কাছাকাছি প্রত্যেকটি হাট বাজার, গঞ্জেই আজকাল বায়স্কোপ ঘর খুলেছে। বর্ষাকালটা নিতান্ত প্রাকৃতিক আর চাষের কারণে বন্ধ থাকে। অন্যথায় সব দিনগুলোতেই খোলা। মেয়ে বউরা রান্নাবান্না করে, পুরুষদের খাইয়ে নিজেরা খেয়ে, সিনেমা দেখতে যায়। গ্রামের বড় বড় গাছের আর বারোয়ারী তলার বা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরের বেড়ায় সিনেমার পোস্টার পড়ে। রাজনৈতিক পোস্টারও পড়ে। আর সব গ্রামেই, নিদেন একটি করে লাল ত্রিকোণ ছাপ মারা সাইনবোর্ড চোখে পড়বেই। জন্মনিয়ন্ত্রণের সরকারী সাইনবোর্ড। অধিকাংশ গ্রামের কাছাকাছি একটু উন্নত অঞ্চলেই সিনেমা আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটি অনিবার্য দৃশ্য।

এসব সত্ত্বেও মনে হয়, গ্রাম কোথায় যেন গ্রামই রয়ে গিয়েছে। কেবল শ্রীহীন, কিছুটা রিক্ত মনে হয়।

★

কান্ত আস্তে আস্তে তেঁতুলতলার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। অদূরেই গ্রামের কালো রক্ত চক্ষু খোদাই (মুক্ত) ষাঁড়টি বসে বসে ঝিমোচ্ছে। শুকনো পাতায় কান্তর পায়ের শব্দ পেয়ে তেঁতুলতলার খালি গা বৃদ্ধ লোকটি ফিরে তাকালো। কান্ত তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো, বঙ্কিম ঘোষ। গ্রামের লোক বাঁকা গোয়ালা বলেই জানে।

কান্তর চোখে বাঁকা গোয়ালার চেহারার তেমন পরিবর্তন ধরা পড়লো না। কেবল চোখ জোড়া কেমন একটু ঘষা ঘষা দেখাচ্ছে। বাঁকা গোয়ালাও কান্তকে দেখলো। তার চোখের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা থেকেই বোঝা যায়, সে কান্তকে চিনতে পারে নি। কাঁধ থেকে গামছাটা নিয়ে বিশেষ করে চোখ দুটো মুছে, বাঁকা ঘোষ আবার কান্তর দিকে মুখ তুলে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে? দ্বারিক বাবাজী নাকি?'

কান্ত দ্বারিক বাবাজী নামে গ্রামে কারোর কথা মনে করতে পারলো না। আরো কয়েক পা এগিয়ে চললো, 'না বাঁকা খুড়ো, আমি দ্বারিক বাবাজী নই। আমাকে দেখে বোধ করি তুমি চিনতে পারবে না।'

বাঁকা ঘোষ চোখের ওপর হাতের পাতা দিয়ে ঢাকা দিল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললো, 'দেখে চেনার দিন কি আর আমার আছে বাবা? চোখের মাথা খেয়েছি, চোখে ছানি পড়েছে। তা তুমি কে হে, ধরতে পারছি নে তো।'

কান্ত এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো. তারপরে বললো, 'আমি কান্ত।'

boiboi.net

বাঁকা ঘোষের কপালে অনেকগুলো রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঠলো। মুখটা হাঁ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক চোখে তাকিয়ে, হঠাৎ যেন চমকিয়ে উঠে বললো, 'কান্ত—মানে আমাদের কামার কান্ত তুমি ?'

'হ্যাঁ বাঁকা খুড়ো, আমি কান্ত কামার বটে।' কান্ত বাঁকা ঘোষের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলো।

বাঁকা ঘোষ ভালো করে কান্তর দিকে ফিরে বসলো, বললো, 'তুমি জেলে ছিলে না ?'

'ছিলুম। কিন্তু চিরকাল তো আর জেলে রাখে না, ছুটি হয়ে গেল, তাই গাঁয়ে ফিরে এলুম।' কান্তর চোখে সংশয়।

বাঁকা ঘোষ মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'তা বটে। এসো, বসো এখানে, তোমার কথা শুনি।'

কান্ত এগিয়ে গেল আরো দু পা, বসবার আগে বললো, 'আমার আর নতুন কথা কী থাকবে খুড়ো ? তোমরা তো সবই জানো। আমি মহাপাপ করেছিলাম।'

বাঁকা ঘোষ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়ে বললো, 'কখ্খনো না। গাঁয়ের কেউ মনে করে না তুমি মহাপাপ করেছিলে। যে করেছিল, তার সব ভরাডুবি হয়েছে। মেয়েমানুষ বলে কথা, সাধু ঋষিদের মতিভরম্ ঘটায়। তোমারও তেমনি মতিভরম্ ঘটেছিল, কিন্তু তুমি তো জেনেশুনে নিজে কোনো পাপ করো নি।'

কান্ত বাঁকা ঘোষের কাছেই, তেঁতুল গাছের গুঁড়ির ওপর বসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'খুড়ো, গাঁয়ের সব লোকে কি তোমার মতো এমনটা বিশ্বেস করে ?'

বাঁকা ঘোষ তার শির পরিস্ফুট ঘাড়ে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবি বাবা। আমি কেন তোকে মিছে বলবো ? তোর কথা এখনো সবাই বলে। যার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, সেই মাগীর নাম কেউ মুখেও আনে না।' বাঁকা ঘোষ একবার মুখ তুলে অন্য দিকে দেখে বললো, 'কার কথা বলছি, বুঝতে পারছিস তো কান্ত ?'

কান্ত বুঝতে পারছে, বাঁকা খুড়ো নয়নের কথা বলছে। তার 'তুই' সম্বোধন থেকে প্রাণের সরল আন্তরিকতাও বুঝতে পারছে। বললো, 'বুঝতে পারছি বৈ কি বাঁকা খুড়ো। কিন্তু আমি তো মুনিঋষি নই, লোকে আমাকে খারাপই ভাববে।'

'তা খারাপের সঙ্গে মিশে একটা কাজ করলে লোকে তো বাবা খারাপই বলবে। বাঁকা ঘোষ সরল স্বীকারোক্তি করলো, 'কিন্তু কে কতোটা খারাপ, সেটা লোকে বোঝে। ঘরে বউ থেকেই কতো লোকে কতো নটঘট করেছে ওই মাগীর সঙ্গে। আর তুই ছিলি একটা মরদ জোয়ান, ঘরে বউ নেই। মাগী তোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, তুই জেনেশুনে সে কাজ করিস নি।'

'কেমন করে জানলে খুড়ো ?' কান্তই অবাক্ চোখে তাকালো।

বাঁকা ঘোষ বললে, 'কেমন করে আবার। উকিলের কাছে শুনেছি, কোর্টে জজের সামনে দাঁড়িয়েও তুই বলেছিস্ জেনেশুনে তুই ও কাজ করিস নি। কিন্তু স্বীকার পেয়েছিস ওই মাগীকে তোর ভালো লাগতো। জজের কাছে একথা স্বীকার পেয়েছিলি তো ?'

boiRboi.net

কান্তর বুকের মধ্যে চকিতের জন্য একটা আবেগ আর কষ্ট যুগপৎ দোলা দিয়ে উঠলো। তার কোর্টের স্বীকারোক্তির কথা যে গ্রামের লোকের কানে এসেছে, এ কথা সে ভাবতে পারে নি। গত সাড়ে চার বছরের মধ্যে একটিও চেনা মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয় নি, কথা হয় নি। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ খুড়ো, যা সত্যি, আমি স্বীকার পেয়েছিলুম। পুলিসে আমাকে কম মারটা মারে নি, মিথ্যা কথা আদায় করার জন্য। আমি স্বীকার করি নি। কিন্তু নয়নের সঙ্গে যে আমার মেলামেশা ছিল, সে কথা সবার কাছে স্বীকার করেছি।'

'তবেই দ্যাখ্ বাবা, আমি খবর রাখি।' বাঁকা ঘোষ মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'গোটা গাঁয়ের লোকেও সে কথা শুনেছে। সত্যি কখনো চাপা থাকে না, বুঝলি? আর পাপও কখনো চাপা থাকে না। তুই বলে ও মাগীর নাম নিলি। কিন্তু খবর রাখিস কি, মাগীর কি গতি হয়েছে?'

কান্ত বললো, 'রাখতুম না। এইমাত্তর শুনে এলুম।'

বাঁকা ঘোষ অবাক্ হয়ে ছানি পড়া চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় শুনলি?'

'ওর মেয়ের মুখেই শুনে এলুম।' কান্ত বললো।

বাঁকা ঘোষ অধিকতর বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই ও বাড়িতে গেছিলি?'

'গেছিলাম খুড়ো।' কান্ত বললো, 'গাঁয়ে ঢুকে প্রথমে নিজের ভিটায় একবার চোখ বুলিয়ে, তারপরেই তোমাদের পাড়ায় এসে ও বাড়িতে গেছলুম। ভেবেছিলুম এ গাঁয়ে আর কোনদিন বাস করি কি না করি, সেটা পরের কথা। আগে নয়নের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করবো। মোকাবিলা করতে গিয়ে যদি খুনের আসামী হয়ে আবার আমাকে জেলে যেতে হতো, তাও যেতুম, কিন্তু ওকে ছাড়তুম না। ওর ভালবাসার সবটাই যে ছলচাতুরি, আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু শুনলুম সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।'

বাঁকা খুড়ো ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, 'যাক্, রাক্ষুসী গলায় দড়ি দিয়ে তোকে খুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছে। কিন্তু কেন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে, সে খবর পেয়েছিস?'

'না খুড়ো, সব খবর শোনা হয় নি।' কান্ত পা ছড়িয়ে বসে বললো, 'খুড়ো, আদেশ করো তো একটা বিড়ি খাই।'

বাঁকা খুড়োর হাসিটি বিস্তৃত হলো, কুঞ্চিত চামড়ায় ঢেউ লাগলো, 'খাবি বৈকি বাবা, তুই খা। আমাকেও একটা দে। তারপরে বেত্তান্ত সব বলি।'

কান্ত পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করলো। নিজে নিয়ে বাঁকা ঘোষকে দিল, দেশলাই জ্বালিয়ে দুজনের বিড়িই ধরিয়ে নিল। বাঁকা ঘোষ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'একে বলে ধম্মের কল, বুঝলি বাবা। যেমন ধম্মের কল তোকেও জেল ঘুরিয়ে আনলো। রাগ করিস্ না। এমন নামকরা কামারের বেটা কামার তুই, জোয়ান বয়সে বে থা না করে, যখনই ওই মাগীর সঙ্গে ঢলাঢলি শুরু করেছিলি, তখনই ধম্মের কল বাতাসে নড়েছিল। আরে বাবা, অই করে কি আর যৈবন জুড়োয়? যৈবন জুড়োয় ঘর সংসারে থিতু হয়ে বসলে, বউ সন্তান

নিয়ে ঘর করলে। আর কুটনী ছেনালদের সঙ্গে মিশে, বুকে কেবল আগুন জ্বলে, জ্বলে আর জ্বলে, জ্বালিয়ে মারে। ওরা জ্বালাতেই পারে।···তা সে যাক, তোর যা কপালের লিখন ছিল, তাই হয়েছে। কিন্তু বুলবুলি তো চিরকাল ধান খেয়ে পালাতে পারে না। আবার একটা চুরি করলো। পাড়ার বড় চক্কোত্তিদের বাড়িতে মাগী গিয়ে সিন্দুকের কুলুপ খুলে রেখে এসেছিল। চোরেরা রাতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। তারাই বলেছিল, গোটা বাড়ির চাবি এই মাগী দিয়েছে। সিন্দুকের চাবিও তার কাছেই ছিল। সেই সিন্দুক খুলে রেখে এসেছিল। পুলিস একেবারে হারামজাদীর বাড়িতে আচমকা এসে হাজির। তখনো ভালো করে রাত পোয়ায় নি। তাই আর সাবধান হতে পারে নি। চাবির গোছসুদ্ধ ধরা পড়লো। আর দুঃখের কথা কী বলবো বাবা, চাবিগুলো নাকি তোরই হাতে গড়া, পুলিসকে বলেছিল। তখন তুই জেলে। হারামজাদীর ঘর তালাস করে পাওয়া গেল আরো কিছু চোরাই মাল। যেমন তোর কামারশালায় কিছু মাল লুকিয়ে রেখেছিল। আর কখনো পুলিস ছাড়ে? উঠোনে চেপে বসে, মাগীকে বললো, কাপড়চোপড় পরে নাও, থানায় যেতে হবে। ওইখানেই পুলিস ভুল করলে। মাগী ঘরে গেল কাপড় পরতে। কিন্তু কাপড় দিল গলায়। দিয়ে বাঁশের বাতায় ঝুলে পড়লো।··· আবে, বিড়িটা নিভে গেল।'

নিভে যাওয়াই স্বাভাবিক। বাঁকা খুড়ো একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিল। কান্ত দেশলাই জেলে তার বিড়িটা ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?'

বাঁকা ঘোষ ঘন ঘন বিড়িতে টান দিয়ে, গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'উঠোন জোড়া দারোগা পুলিস আর পাড়ার লোক ভাবছে, বেটির কাপড় পরতে কতোক্ষণ লাগে? ঘরের একটাই মাত্তর দরজা। সেটা বন্ধ করে কাপড় পরতে ঢুকেছিল। পুলিস নিশ্চিন্ত ছিল, পালাতে পারবে না। তাই কখনো হয়? রাক্ষুসী যে তখন চিরকালের জন্য পালাচ্ছে। পুলিস অনেক হাঁক-ডাক করে। শেষে ওরা যখন দরজা ভেঙে ফেললো, তখন ওদিকে সব শেষ। তবু পুলিস তাকে সদরের হাসপাতালে নিয়ে গেছলো, বাঁচাতে পারে নি। যেটুকু প্রাণ ছিল, তা হাসপাতালে যেতে যেতেই শেষ।'

কান্ত নয়নের সেই আত্মহত্যার ছবিটা যেন দেখতে পাচ্ছে। বাঁকা ঘোষ তারপরেও অনেক কথা বলে গেল। কিছুই তার কানে গেল না। কিন্তু একটা কথা নয়ন মিথ্যা বলে নি। চাবিগুলো সবই সত্যি কান্তর হাতে গড়া ছিল। নয়ন যখন যে রকম চাবি গড়িয়ে দিতে বলেছে, কান্ত দিয়েছে। অন্তত চার পাঁচটি চাবি সে নয়নকে বানিয়ে দিয়েছিল। কখনো অবিশ্বাস করে নি। মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি। নয়ন বলতো, তার তালা-চাবি পালটাবার একটা বাতিক আছে। সে-কথা নিয়ে দু'জনের মধ্যে অনেক হাসিঠাট্টাও হয়েছে। হাসিঠাট্টা তাকে বলে না, কান্তর রক্তে তুফান লাগা বলে। নয়নের সব কথাই সে শুনতো। কিন্তু তার পরিণতি এই রকম?

'কী রে কান্ত, একেবারে যে চুপচাপ মেরে গেলি।' বাঁকা ঘোষ বললো, 'তোর কি এই মাগীর জন্য দুঃখ হচ্ছে নাকি?'

boiRboi.net

কান্ত সংকোচ বোধ করলো, অপ্রস্তুত হলো। একটু হাসবার চেষ্টা করলো। বললো, 'খুড়ো মানুষের কী গতি হয়, তাই ভাবছি।'

'মানুষের না বাবা, পাপীর গতি।' বাঁকা ঘোষ বললো, 'তাই বলছিলাম, পাপ কখনো চাপা থাকে না।'

কান্ত ভাবে, এসব কথাই হয়তো সত্যি। সে ভয়ংকর মনোভাব নিয়েই নয়নের সঙ্গে মোকাবিলা করতে এসেছিল। নয়ন স্বৈরিণী ছিল। নয়ন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে জেল খেটে এলো। এমন স্ত্রীলোকের প্রতি করুণা হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবু, কান্তর প্রাণে যেন গভীর ভার চেপে বসছে, ঘিরে আসছে একটা তীব্র কষ্ট।

নয়ন হয়তো কান্তকে কখনো ভালবাসে নি, কয়েকটা বছর কেবল বঞ্চনাই করেছে। কিন্তু অবিবাহিত কান্তর কখনো বহু স্ত্রীতে আসক্তি ছিল না। তার প্রাণ ছিল অসহায়। সে জেনেশুনেই ভালবেসেছিল এক স্বৈরিণী গোপ রমণীকে। সে কেন তার কাছে এসেছিল, কী মতলব নিয়ে কয়েকটা বছর তাকে সঙ্গ দিতো, সে কিছুই অনুমান করতে পারে নি। নিজের যৌবনের ওপর, কাজের ওপর তার বিশ্বাস ছিল। তার প্রতি রমণীর আকর্ষণের আর কোনো কারণ থাকতে পারে, সে ভাবতে পারতো না।

নয়নের প্রেম ভালবাসা, দেহের মত্ততা, মাতানো, সবই মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা হতে পারে। কান্তর তা নয়। তার প্রেম ছিল অসহায়, প্রাণে ছিল কষ্ট আর নালিশ। সে এসেছিল নয়নের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। তার পরিণতির কথা শুনে, একটা বুক চাপা কষ্টের অনুভূতি সে কিছুতেই রোধ করতে পারছে না।

কান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'খুড়ো চলি। গাঁয়ে যদি থাকি আবার আসবো।'

'আরে অ কান্ত, শোন্ শোন্।' বাঁকা ঘোষও উঠে দাঁড়ালো, 'যদি থাকি কীরে? গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে থাকবি না তো যাবি কোথায় বাবা? ভিটেটাকে একটু গোছগাছ করে কামারশালাটা আবার খোল্।'

কান্তর উদাস প্রাণে আপাতত সেরকম কোনো বাসনা নেই। সে মুখ ফেরাতে গিয়ে চোখ পড়লো নয়নের বাড়ির দিকে। দেখলো নয়নের মেয়ে জামাই, দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। কান্ত পা বাড়াতে বাধা পেলো। কেমন একটা কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলো, 'খুড়ো নয়নের মেয়েটির সঙ্গে কথা বললাম। কথার ধরন তো দেখলাম—।'

'একেবারে মায়ের মতন।' বাঁকা ঘোষ হেসে বললো, 'তবে এই মুখেই যা ধার। মেয়েটা ভালো। রাক্ষুসীর কপালটা ওখানেই যা একটু ভালো। কোন্ পুণ্যিতে যে এমনটা হলো। জামাইটা ভালো পেয়েছিল।'

কান্তর বুক-চাপা কষ্ট যেন কিঞ্চিৎ লাঘব হলো। নয়নের এ মেয়েকে সে দেখেছে কম। ভুলেও গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি দেখতে হয়েছে অবিকল মায়ের মতো। এমন কি গলার স্বর, হাসির শব্দ, শরীরের গঠন, চাহনি, সবই মায়ের মতো। অথচ মায়ের মতো স্বৈরিণী হয় নি। পাপের পথে যায় নি। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী নাম মেয়েটির?'

boiRboi.net

'মেনকা।' বাঁকা ঘোষ বললো, 'জামাইয়ের নাম ভুপতি। কালো ছেলে। দুটিতে গাই গরুর সেবা করে, দুধ বেচেই সংসার চালায়। রোজ সাইকেলে করে গঞ্জে গিয়ে দুধ দিয়ে আসে।'

কান্ত মুখ ফিরিয়ে আর একবার নয়নের বাড়ির দিকে দেখলো। মেনকা আর ভুপতি বিশেষ কৌতুহলিত উৎসুক চোখে তাকেই দেখছে। মেনকার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা যেন কেমন ধক্‌ধক্‌ করে ওঠে। একটা আবেগের ঢল নামতে চায়। কান্ত দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারে না। মনে মনে নিজেকে শক্ত করবার চেষ্টা করে, বলে, 'না না, এ প্রাণে আর মায়া-মমতার লেশও রাখবো না। এ জীবনে আর ভালবাসায় জড়াবো না।' মুখ ফিরিয়ে বাঁকা ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললে, 'খুড়ো, এখনকার মতো চলি।'

'শোন্‌ কান্ত।' বাঁকা ঘোষ কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'তোর ভিটেয় সদ্‌গোপ পাড়ার কতগুলো ঘুঘু বাসা বেঁধেছে। গাঁয়ের কতকগুলান লক্ষীছাড়া হতভাগা সেখানে নেশাভাঙ করে, জুয়া খেলে। ওদের তাড়িয়ে তুই বাবা আবার থিতু হয়ে বোস। বয়স আর তোর এমন কি হয়েছে। একটা বে থা কর, ঘরসংসার কর।'

কান্ত সে-কথার কোনো জবাব দিল না। কারণ জবাব দেবার কিছু নেই। আর একবার 'চলি' বলে সে দক্ষিণের প্রান্ত সীমার দিকে এগিয়ে চললো।

★

দক্ষিণের প্রান্তে গ্রামের শেষে মস্ত বড় একটা ঝিল। হঠাৎ দেখলে কাটানো ঝিলের মতো মনে হয়। আসলে শতাব্দী পূর্বে যমুনা নাকি এই গ্রামের প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত ছিল। যমুনা এখন সরে গিয়েছে বেশ কয়েক মাইল দক্ষিণে। নামেই যমুনা, দেখলে মজা খাল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

ঝিলের দু দিকের পাড়ে বাউরীদের বাস। কান্ত নিজেও জানে না, কেন সে বাউরীপাড়ায় এসে ঢুকলো। আসলে তার অবচেতন মনে এখনো একটা দ্বিধাজড়িত হীনমন্যতা রয়েছে। গ্রামের অন্য কোনো পাড়ার থেকে বাউরীপাড়াতে সে নিজেকে অনেকটা সহজ মনে করছে। এক সময়ে এই বাউরীপাড়ার প্রতি কান্তর মনে ছিল বিরূপ-বিতৃষ্ণা। মদ চোলাই থেকে, চুরি ছ্যাঁচড়ামির নানান ঘটনা এ পাড়ার দৈনন্দিন বিষয়। পুলিসের আনাগোনাও এ পাড়ায় যখন তখন। বিশেষ করে আবগারি পুলিসের এ পাড়ায় ঘরে ঘরে মদ চোলাই হয়। আরো অনেক কীর্তি কান্ড ঘটে। এ পাড়ায় অনেক নয়ন গোয়ালিনী আছে, যদিও নয়নের খ্যাতি তাদের কারোরই নেই। আসলে তো হতদরিদ্র উঞ্ছ, ঘরে ঘরে হা অন্ন হা অন্ন কাতরতা। স্বভাবে না, এ পাড়া অভাবে নষ্ট। অথচ কান্ত আজ এত কাল বাদে গ্রামে ঢুকে এ পাড়াতেই এলো। সঙ্গে অবিশ্যি কুকুরটাও ঠিক পিছু নিয়েছে।

কান্তর মনে পড়লো গণেশ বাউরীর কথা। এ পাড়াতে একমাত্র তাকেই সবাই সজ্জন বলতো। কান্ত নিজেই তাকে গণেশদা বলে ডাকতো। গোটাকয়েক তালগাছ ঘেরা, দুটো নিমগাছের ছায়ায় গণেশ বাউরীর চালার সামনে এসে সে দাঁড়ালো। তেমন কোনো আবরু নেই। ঝিলের দিকে ঘরের মুখ আর ছোট একটু উঠোন। বাড়ির সুমুখ ওদিকটা, যদিও প্রবেশপথ পিছন দিকে। কান্ত সেদিক

দিয়েই ঢুকলো। ডাকলো, 'গণেশদা আছো নাকি ?'

ভিতরে হঠাৎ দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। কে যেন দৌড়ে গেল উঠোনের ওপর দিয়ে। আর একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে তেড়ে এলো। কান্তর পিছু পিছু আসা কুকুরটা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধং দেহি হয়ে, তেড়ে আসা কুকুরটার মুখোমুখি হলো। আর একজন খালি গা, প্রায় লেংটি-পরা পুরুষ বেরিয়ে এলো। বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। কালো কুচকুচে শরীরে এখনো শক্ত পেশী, পেটা গড়নে টোল খায় নি। মুখে কয়েকদিনের আকাটা গোঁফদাড়ি। মাথায় ঘন ধূসর, ভেড়ার লোমের মতো কোঁচকানো চুল। কান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ?'

কিন্তু কুকুর দুটের চিৎকারে কথা বলা দায়। কান্ত তার পিছু নেওয়া কুকুরটাকে ধমক দিল। বাড়ির কুকুরটাও হঠাৎ কেমন চুপ করে গেল, আর এগিয়ে এসে অন্য কুকুরটার দিকে মুখ তুলে শুঁকলো। কান্তর পিছু নেওয়া কুকুরটাও এগিয়ে এসে শোঁকাশুঁকি শুরু করলো। কান্ত দেখলো, বাড়ির কুকুরটা মাদী, আর তার পিছু নেওয়াটা মদ্দা। অপরিচয়ের প্রথম বিবাদটা তাই এক ধমকেই অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কান্ত লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেমন আছো গো গণেশদা ?'

'ভাল।' গণেশ বাউরী সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললো, 'বাবুকে চিনতে পারলাম না তো ?'

কান্ত হেসে নিজের ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি দেখলো, বললো, 'আমাকে বাবু বলছো কী গো গণেশদা। আমি কান্ত, কামারবাড়ির কান্ত।'

গণেশের চোখে এক মুহূর্তের দ্বিধা ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। তারপরেই কয়েকটা দাঁতবিহীন হাসি হেসে এগিয়ে এলো। চোখের ভাঁজেও হাসি ছড়িয়ে পড়লো। বললো, 'অ, তুমি আমাদের কান্ত ? তা তোমার যে মেয়াদ হয়েছিল, তার —।'

'ছুটি হয়ে গেছে।' কান্ত বললো, 'পাপের প্রাচিত্তি করে এলাম।'

গণেশ দু হাত তুলে দিল কান্তর কাঁধে, বললো, 'আরে ধু-র. তোমার প্রাচিত্তির নিকুচি করেছে। কান্ত কামার কেমন ব্যাটা, গাঁয়ের সব লোকে তা জানে। এসো এসো, দাওয়ায় এসে বসবে। এখানে বড় রোদ।' বলে গণেশ নিজেই কান্তর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

কুকুর দুটোর মধ্যে ভাব করার খেলা চলছে। গণেশ উঠোনে ঢুকে স্বর চড়িয়ে বললো, 'অই গ, দরজা খোল্। এ বাইরের কেউ না, আমাদের কান্ত এসেছে।'

ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতর থেকে আগুনের ভাপ বেরোচ্ছে। কান্ত গন্ধে টের পেলো, ঘরের মধ্যে মদ চোলাই হচ্ছে। দরজা খুলে যে দাঁড়ালো, সে একটি কালো যুবতী। তার অঙ্গের সামান্য বস্ত্রটি নিতান্ত লজ্জা নিবারণ করেছে, কেন না, মেয়েটি অধরা যৌবনা, অমন সামান্য বস্ত্রে ধরা দিয়ে থাকবার মতো না। ছোট চোখ, কিন্তু টানা। সিঁথেয় সিঁদুর কপালে টিপ নেই। রুক্ষ চুলের মাথায় ঘোমটা নেই। গণেশ বলল, 'এটি আমার বড় ব্যাটার বউ।

boiRboi.net

দু ব্যাটাই বে করেছে। ছোটটি ঘরের মধ্যে আছে। বসো ভাই কান্ত।'

কান্ত নিকানো খড়ের চালঢাকা দাওয়ায় বসলো। দ্বিধা করে বললো, 'জাওয়া বসিয়েছ বলে মনে হচ্ছে ?'

গণেশ দরজার দিকে দেখিয়ে বললো, 'অই বউ বেটিরা বসিয়েছে। তোমার বউঠান তো কখনো ও কাজ করে নি।'

কান্ত দরজার দিকে বড় বউয়ের দিকে তাকালো। সে একটু হেসে ভিতরে চলে গেলে কান্ত অবাক্ হয়ে বললো, 'কিন্তু তোমার ঘরে তো কখনো এসব হতো না।'

'হতো না, এখন হচ্ছে।' গণেশ বললো, 'এখন ছেলেদের হাতেই সব। আমি বুড়ো হয়েছি। তা ছাড়া, এইটি যে বড় দায়।' বলে নিজের পেট দেখালো, 'এই মহাপেরাণীটিকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে তো। দিনকাল বড় খারাপ। জমি জিরেত কোনকালেই ছিল না। পরের জমিতে আর ঘরামির কাজ করে চলতো। তাও আজকাল পাওয়া যায় না। ছেলেরা এ পথ ধরেছে। তা এখন কোথা থেকে এলে ? বাড়ি গেছলে ?'

কান্ত মোটামুটি তার বাড়ির চেহারার কথা বললো। গণেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলো, 'আ ছি ছি, সে-কথা বলতে হয়! অ গ, অ বউ বেটিরা, ঘরে কী আছে, কান্তকে একটু কিছু খেতে-টেতে দাও।'

কান্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে কিছু বলে ওঠবার আগেই বড় বউ আবার দরজায় দেখা দিল। বললো, 'এ বেলা তো ভাত হয় নি বাবা। মুড়ি তেলেভাজা দিচ্ছি।'

'আহা, থাক না ওসব।' কান্ত বড় বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললো।

বড় বউ হেসে বললো, 'থাকবে কেন, খুড়োকে আমরা খাওয়াতে পারি না ?' বলে ভিতরে চলে গেল।

কান্ত আর গণেশ, দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। দুজনেরই ফোকলা দাঁত। কান্তর কিছু কম। গণেশ বললো, 'আরে ভাই, জীবনটাকে অত বেশী খতিয়ে দেখলে আমাদের চলে না। কীই বা আছে, কী-ই বা খতিয়ে দেখবো। কোনোরকমে চলে গেলেই হলো। আর জানলে, মা-বেটিরা কিছু দিলে তা ফেরাতে নেই।'

একটু পরেই বড় বউ একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় মুড়ি, পেঁয়াজকুচি, কাঁচা লঙ্কা, আর কয়েকটা আলুর চপ কান্তর সামনে এনে রাখলো। পিছনে পিছনে এলো ছোট বউ। বয়স কম, চেহারায় ধার বেশী। অঙ্গের শাড়িটিও নতুন। সে একটি মদের পাঁট কান্তর সামনে রেখে বললো, 'খুড়োকে আমি এটা দিলাম।'

'আহা হা, এসব কেন ? এত পয়সা আমার কাছে নেই।' কান্ত ভারী বিব্রত হয়ে বলে উঠলো।

ছোট বউ জিভ কেটে বললো, 'ছি, ছি, খুড়ো হয়ে এমন কথা। আমি বাড়ির বউ হয়ে একটু হাতে বানানো দ্রব্য দিয়েছি, তার জন্য পয়সার কথা কেন ?'

কান্ত বিব্রত হলো। খুশী আর লজ্জিতও হলো। বহুকাল সে মদ খায় নি। অভ্যাসও নিয়মিত কখনো ছিল না। নয়নের পাল্লায় পড়ে কখনো কখনো খেয়েছে।

গণেশ বললো 'খুড়াশ্বশুরকে দিয়েছে, খেয়ে নাও।'

boiRboi.net

'তা হলে গণেশদা, তুমিই উচ্ছুগ্‌গুটা করে দাও' কান্ত পাটটা গণেশের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

গণেশ নির্বিকারভাবে বোতলটি নিয়ে কাঁচা মদে একটা চুমুক দিল। ছোট বউ ইতিমধ্যে জলের কলসী আর একটা কলাইয়ের গেলাস এনে দিল। গণেশ নিজের হাতে গেলাসে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে কান্তর দিকে বাড়িয়ে দিল। কান্ত গেলাস নিয়ে চুমুক দিতেই, গলা বুক জ্বলে গেল, গাটা গুলিয়ে উঠলো। গণেশ হেসে বললো, 'অনেককাল খাওনি তো। এক গাল মুড়ি খাও, ঝাঁজ কেটে যাবে।'

কান্ত মুড়ি মুখে দিল, মদে চুমুক দিল। আস্তে আস্তে সয়ে গেল। নেশা ধরলো, আর ক্রমেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলো। ঝিলের কালো জলের রৌদ্র চলকানো ছটার দিকে তাকিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো নয়নের মুখ।

কান্ত মনে করতে পারে না, কবে কী ভাবে নয়ন তার কাছে এসেছিল। কেবল এইটুকু মনে পড়ে, হঠাৎ একদা এক সন্ধ্যার ঝোঁকে সে কামারশালে এসে পা ছড়িয়ে বসে বলেছিল, 'অই গ কামার। আমার ভাই অঙ্গ পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে। তোমার অই হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে একটু গড়ে দিতে পারো?'

নয়নের পা ছড়িয়ে, কোমরে মোচড় দিয়ে বসার মধ্যে এমন একটা ভঙ্গী ছিল, যে-কোন পুরুষের বুকেই রক্ত চলকিয়ে ওঠার মতো। কান্তরও উঠেছিল। ঠোঁটের কোণে আর চোখের তারায়, হাসি আর বিদ্যুতের এমন একটা ছটা ছিল, যা চকিত করে তুলেছিল এক ঘুমন্ত বাসনাকে। কিন্তু কান্ত বোকার মতো বলেছিল, 'শরীর অঙ্গার? কই, তা দেখতে পাচ্ছি না তো?'

নয়ন গোটা শরীরে ঢেউ তুলে হেসে বলেছিল, 'পোড়া কপাল, শরীরের অঙ্গার কি চোখে দেখা যায় নাকি হে কামার। হাত দিয়ে দেখতে হয়।'

কান্ত বিভ্রান্তের মতো তাকিয়েছিল। হাতে তার কাজ ছিল না। কামারশালা গোটাবার তালে ছিল। কামারশালায় লোকও কেউ ছিল না। কান্ত হঠাৎ কেমন একটু লজ্জা পেয়েছিল, 'তাই আবার কখনো হয় নাকি নয়নদিদি। গায়ে হাত দিয়ে কি অঙ্গার টের পাওয়া যায়?'

নয়নের শরীর ধনুকের মতো বেঁকে উঠেছিল, তার চোখের তারায় তীর। বলেছিল, 'গায়ে হাত দিয়ে জ্বর জ্বালা টের পাওয়া যায়, আর অঙ্গার টের পাওয়া যায় না? একবার হাত দিয়েই দেখ না।' বলে হঠাৎ কান্তর একেবারে গায়ের কাছে এসে তার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের বক্ষান্তরে চেপে ধরেছিল, 'কী মনে হয়, দেখ তো?'

হ্যাঁ, অঙ্গারই বটে। কান্তর রক্তেই আগুন ধরে গিয়েছিল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়েছিল, কথা খসে নি মুখ থেকে। নয়নের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। নয়ন একমুহূর্তও তার কার্যসিদ্ধিতে বিলম্ব করে নি। চোখের তীর দিয়ে কান্তকে বিদ্ধ করেছিল। কানের কাছে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল, 'দেখছ তো। এবার আমাকে একটু পিটিয়ে গড়ো, যেমন তোমার কাস্তে কাটারি গড়ো। তোমার হাতের কাজ বড় ভালো।'

নয়নের তপ্ত নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাসের সঙ্গে পানের জর্দার সুগন্ধ, সবই যেন কান্তকে

একদিক থেকে অবশ করে তুলেছিল। আর একদিকে তার অনাস্বাদিত পুরুষালি ভুখ অগ্নিময় তেজে দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। নয়নের নিপুণ কামকলা আয়ত্তে ছিল। অগ্নিময় তেজকে বেপরোয়া করে তোলার কারুনৈপুণ্য ছিল তার প্রতিটি অঙ্গের ভঙ্গিতে। ফিসফিস করে বলেছিল, 'শোন হে প্রাণ, এ নেহাইয়ে ফেলে পিটলে তো আমাকে গড়তে পারবে না। তোমার ভেতরের ঘরে চলো।'

বলতে গেলে নয়নই সম্মোহিত কান্তকে নিয়ে বাড়ির ভিতরের ঘরে গিয়েছিল। সেই থেকে শুরু। কম করে আজ থেকে সাত বছর আগের ঘটনা। তারপর থেকে কামারবাড়িতে নয়নের আনাগোনা নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। এ সব ঘটনা কখনো গোপন থাকে না। বিশেষত গ্রামে ঘরে। কান্তর কার্যকলাপে অনেকেই অবাক্ হয়েছিল। কেউ কেউ যেচে উপদেশ দিতেও এসেছিল। কিন্তু বাঘ তখন রক্তের স্বাদ পেয়েছিল। বিয়ে? না হয় না-ই হলো। সংসারে একা পুরুষ। সারাটা জীবন যদি নয়নের মতো রমণীকে নিয়ে কেটে যায়, সুখ ছাড়া তাতে দুঃখ নেই। চরিত্রের সুনাম দিয়ে কান্তর কী দরকার? কাজকর্ম করবে, জীবনটা যেমন চলার চলবে। তার সঙ্গে নয়নও থাকবে।

কান্ত এ ভাবেই তখন নিজের বিবেককে বুঝিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে নয়নের ছলা-কলার বিষয় তেমন খতিয়ে ভাবে নি। নয়নকে সে বিশ্বাস করেছিল। সেই থেকে নয়নের নতুন নতুন চাবি গড়াবার বাতিক আর আবদার শুরু হয়েছিল। কান্ত ভাবতেও পারে নি, জমিদারবাড়ির গোমস্তা থেকে অনেকের প্রাণ-প্রেয়সী আর পাপের সঙ্গিনী ছিল নয়ন। যখন জানতে পেরেছিল, তখন আর ফেরবার পথ ছিল না।

পড়ে থাকা দড়ি যদি হঠাৎ সাপের মতো ফণা তুলে দংশনে উদ্যত হয়, ঠিক সেই রকম ভাবেই পুলিস সাত-সকালে তার কামারশালায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। সামান্য তল্লাশীতেই তার চুল্লীর কাছে পাতা চটের আসনের তলা থেকে পুলিস বের করেছিল কিছু চোরাই সোনার গহনা, আর একটি চাবি। চাবিটি দেখিয়ে দারোগা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ চাবি তোমার তৈরি?'

কান্ত অবাক্ হয়ে চাবিটা দেখে সরলভাবে ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ চাবি আমি নয়নকে গড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

'ওসব নয়ন-টয়নের কথা ছাড়ো।' দারোগা হুমকিয়ে উঠেছিল, 'চাবি গড়েছো তুমি, আর জমিদারবাড়ির এই চোরাই গহনা তোমার এখানে এলো কী করে?'

কান্ত তথাপি সরলভাবে বলেছিল, 'আজ্ঞে তা তো জানি না।'

দারোগা ঠাস করে তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়েছিল। খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'মনে করেছো, আমরা খবর না নিয়ে তোমার কাছে এসেছি? জমিদারবাড়ির শ্রীহরি পালমশাই তোমার সব জারিজুরি ভেঙে দিয়েছেন। উনি নিজের চোখে তোমাকে চুরি করতে দেখেছেন, তারপরে আমাদের খবর দিয়েছেন। কিন্তু বাকী গহনা কোথায় রেখেছো, সে-কথা বলো। এ তো সামান্য।'

কান্ত সেই মুহূর্তে তার সর্বনাশটা অনুমান করতে পেরেছিল। তার পায়ের তলায় ধস নামতে শুরু করেছিল। কিন্তু মিথ্যাকথা সে বলতে পারে নি। পুলিস

boirboi.net

তাকে চালান দিয়েছিল। পরে শুনেছিল, নয়নের ঘরেও পুলিস তল্লাশ করেছিল, কিছুই পায়নি। কান্ত তাকে কোনো চাবি গড়িয়ে দিয়েছিল, সে-কথা নয়ন একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল।

এতকাল জেলে থাকাকালীন মনে যেটুকু বা সংশয় ছিল, আজ বাঁকা ঘোষের কাছে শুনে, তাও দূর হলো। তবু, প্রাণ কেন পোড়ে? মন কেন জ্বলে? নয়ন কী রেখে গিয়েছে তার শরীরে? আর কেনই বা নয়নকে এমন করে আত্মঘাতিনী হতে হলো। জীবন কেন তাকেও শান্তিতে মরতে সুযোগ দিল না?

'অই, অহে কান্ত ভাই।' গণেশ কান্তর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো, 'এখন আর চোখের জল ফেলে কী হবে রে ভাই।'

চোখের জল! কান্ত তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে ভেজা চোখ আর গাল মুছলো। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'না না, চোখের জল কোন্ দুঃখে ফেলবো?'

'অই, সেই কথাটা বলে কে?' গণেশ বিচিত্র হাসলো, বললো, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ওসব ভুলে যাও। ঘর-দরজা সামলে থিতু হয়ে বসো, কাজকর্ম শুরু করো।'

সবাই এক কথাই বলে। কিন্তু কার ঘর, কিসের ঘর? অন্তরে তো কোথাও সে সাধের কণা অনুভূতিও নেই। কান্ত কোনো জবাব দিল না। বড় বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'খুড়ো যে মুড়ি তেলেভাজার কিছুই খেলে না। যে-দ্রব্য খাবে না বলেছিলে, তাই খেয়ে ব্যোম্ হয়ে বসে রইলে।'

কান্ত লজ্জা পেলো, বললো, 'খিদে তেমন নেই।'

'তেষ্টা আছে।' বড় বউ হেসে বললো।

কান্ত চোখ ফিরিয়ে গণেশকে বললো, 'গণেশদা, চলি।'

'কেন, রাত্রে চারটি ভাত খেয়ে যেও।' গণেশ বললো।

কান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'না, পরে একদিন হবে।' বড় বউয়ের দিকে ফিরে বললো, 'বউমা, দুটো মুড়ি আমার ওই সঙ্গীটিকে দাও।'

দাওয়ার নিচে পিছু নেওয়া কুকুরটা উৎসুক চোখে মুড়ির পাত্রের দিকে তাকিয়েছিল। বড় বউ দুটো কুকুরকেই কিছু মুড়ি ছড়িয়ে দিল। গণেশ বললো, 'গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই এটিকে যোগাড় করলে কোথা থেকে?'

'যোগাড় করি নি গণেশদা।' কান্ত হাসলো, 'গাঁয়ে ঢুকতেই এ ব্যাটা ঘেউঘেউ করে আমাকে তাড়া করেছিল। তারপরে দেখছি আর পেছন ছাড়ছে না।'

বড় বউ হেসে বললো, 'ওটাই পীরিতের লক্ষণ গ খুড়ো। ও আর তোমাকে ছাড়বে না।'

'আর সোমসারে এদের থেকে বিশ্বাসী জীব আর কারুকে পাবে না।' গণেশ বললো।

★

কান্ত নিজের ভিটায় যখন ফিরে এলো, তখন সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। সে ইচ্ছা করেই গ্রামের বাইরে দিয়ে এসেছে। কারোর চোখে পড়তে, আর কথা বলতে

boiRboi.net

সংকোচটা কাটে নি। কামারশালা থেকে ভিতরের উঠোনে পা দিয়েই বড় ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে আলো জ্বলতে দেখলো। কথাবার্তার শব্দও শুনতে পেলো।

কান্ত আস্তে আস্তে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিতর থেকে রসালো স্বর ভেসে এলো, 'খগেন এলি নাকি রে? বোতল এনেছিস?'

কান্ত ঘরের মধ্যে ঢুকলো। দেখলো দুজন লোক হোগলার চাটাইয়ের ওপর বসে। একটা শালপাতায় পেঁয়াজ আদা লেবু। একটি দেশী মদের বোতলে মদ। দুটি মাটির ভাঁড় পাশে। তার মধ্যে মদ ঢালা রয়েছে। একজন ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুচোচ্ছিল। দুজনেরই বয়স তিরিশের বেশী না। কিন্তু কারোকেই বেশ স্বাস্থ্যবান বা সচ্ছল মনে হলো না। দুজনেই অবাক্ চোখে কান্তর দিকে তাকালো। নিজেদের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে, একজন রোখা স্বরে বললো, 'কে বাবা তুমি? এখানে সাধু সন্নিসির জায়গা নেই।'

'তোমরা কারা?' কান্ত জিজ্ঞেস করলো।

অন্য একজন ঝেঁজে বললো, 'আমরা যে-ই হই, তুমি এখন কাটো তো বাপু। মৌতাতের সময় এসব উটকো ঝামেলা ভালো লাগে না।'

'আমি তো দেখছি উটকো ঝামেলা তোমরাই।' কান্ত শান্তভাবেই বললো, 'ঘরটাকে গুলি-গাঁজা মদের আর জুয়ার আড্ডা করে ফেলেছো? তা না হয় করলে, একটু সাফসুরোত্ রাখতে পারো নি? আবার বলছো উটকো ঝামেলা?'

যার হাতে ছুরি ছিল সে বললো, 'এ শালা তো বড় বেশী বাক্যি ঝাড়ছে রে গদা। দেবো নাকি ভুকিয়ে?'

'তোর ভোকাতে হবে না। ওর ব্যবস্থা আমিই করছি।' গদা উঠে দাঁড়ালো, 'এ ঝামেলা নিশ্চয় বিপিন শালা পাঠিয়েছে। ঘরটা দখলের অনেকদিনের ইচ্ছা তো সেই শালার। কী করে এই ঝামেলা হঠাতে হয়, আমি দেখছি।' গদা কান্তর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

কান্ত গদার চোখে চোখ রেখে বললো, 'মারবে নাকি?'

গদা কোনো জবাব না দিয়ে সোজা হাত তুললো। কিন্তু তার আগেই কান্তর হাত উঠলো বিদ্যুৎবেগে, প্রচণ্ড আঘাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো গদার মুণ্ডুর ওপর। গদা খানিকটা ছিটকে গিয়ে আওয়াজ করলো, 'উহ্!'

ইতিমধ্যে আর একজন ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে এলো। কান্ত তার তলপেট লক্ষ্য করে একটা লাথি কষালো। সে গিয়ে পড়লো একেবারে মদের বোতলের ওপরে! গদা ততক্ষণে চিৎকার জুড়েছে, 'কে আছো, বাঁচাও। খুন করে ফেললে, মেরে ফেললে।'

কান্ত এগিয়ে গিয়ে গদার গালে একটা থাপ্পড় কষালো, চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'মদ্দ বড় তেজী! খুব তো রোয়াব দেখানো হচ্ছিল, এখন আবার চেঁচামেচি কিসের? আয়, লড়বি?'

গদার ঠোঁটের কষ ফেটে রক্ত চুইয়ে এলো। আর একজন শুয়ে শুয়েই কঁকিয়ে বললো, 'আমার তলপেট ফেটে গেছে। এ মাইরি মানুষ না, কেল্লো

boiRboi.net

দানো-টানো হবে।'

ইতিমধ্যে আরো দুজন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। একজনের হাতে একটা ছিপি আঁটা বোতল। তারা দুজনেই ঘরের অবস্থা দেখে, হতবাক্ হয়ে কান্তর দিকে তাকালো। গদা হঠাৎ আবার আর্তনাদ করে উঠলো, 'ওরে পালা, এ মাইরি দত্যি! আমাকে আর হারাকে মেরে ফ্যালবার যোগাড় করেছে।'

'মারতে তো তোমরাই এসেছিলে হে।' কান্ত বাকী দুজনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বললো, 'কিন্তু মনে রেখো, আমি উটকো ঝামেলা নই। আমার নাম কান্ত কামার।'

নামটা উচ্চারণ মাত্র, ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাতের পরের মুহূর্তের স্তব্ধতা নেমে এলো। তারপরেই ভোজবাজির মতো সবাই দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। কিন্তু পালিয়ে গেল না। উঠোন থেকে সন্দিগ্ধ ভীরু বিস্ময়ে কান্তকে দেখতে লাগলো। কান্ত হেসে বললো, 'কী হলো হে তোমাদের?'

ইতিমধ্যে কান্তর নতুন সঙ্গীটিও ঘেউঘেউ করে চারজনকে তাড়া করতে আরম্ভ করেছিল। কান্ত ঘরের বাইরে পা বাড়াতেই, চারজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। কুকুরটাও তেড়ে গেল, রাস্তা থেকে তার ক্রুদ্ধ ডাক শোনা গেল। তারপরেই কিছু লোকজনের গলাও শোনা গেল। বোঝা গেল, আশেপাশে একটা রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছে। কান্ত আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে, কামারশালার ঝোপজঙ্গলের মাঝখান দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখা গেল, দু-তিনটি হারিকেন হাতে কিছু লোকের ভিড় হয়েছে।

কান্ত ভিড়ের মধ্যে বর্ষীয়ান তারাপদ বিশ্বাসকে দেখেই চিনতে পারলো। কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, 'কেমন আছেন বিশ্বেস খুড়ো? আমাকে চিনতে পারছেন?'

একজন কান্তর মুখের কাছে হারিকেন তুলে ধরলো। তারাপদ বিশ্বাস বললো, 'গলাখানি তো চেনা চেনাই লাগছে। তবে যা চুল দাড়ি করেছো, চেনবার উপায় রাখো নি।'

'আমি কিন্তু কান্তকে এক নজরে দেখেই চিনতে পেরেছি।' রোগা লম্বা মতো একজন হাসতে হাসতে বললো, কান্তর কাছে এলো, 'কী রে কান্ত, আমাকে তুই চিনতে পারছিস তো?'

কান্ত হেসে বললো, 'বদ্যিনাথ তো। তোকে চিনতে পারবো না কেন? মাথার চুলগুলো এত পাকিয়ে ফেললি কি করে?'

এবার অনেকেই হেসে উঠলো। বদ্যিনাথ—অর্থাৎ বৈদ্যনাথ যার নাম, সে বললো, 'আমি না হয় চুল পাকিয়েছি, তুই যে ফোগলা হয়ে গেছিস?'

কান্তর মুখ গম্ভীর আর বিষণ্ণ হলো। বললো, 'আমি ফোগলা হইনি বদ্যিনাথ, পুলিস আমাকে ফোগলা করেছে। জেলের ভেতরে কয়েদীদের দাঙ্গার মাঝখানে পড়ে ছেলাম। রুলের গুঁতোয় আমার দুটো দাঁত ফেলে দিয়েছিল।'

কান্তর কথায় সবাই কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। কেউ হাসলো না, বরং সবাইকে একটু বিমর্ষ দেখালো। কান্ত আবার বললো, 'বিশ্বেস খুড়ো, আমি তো পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম। তবু গাঁয়ে ঢুকতে বড় লজ্জা করছিল।'

বর্ষীয়ান তারাপদ বিশ্বাস এবার কান্তর সামনে এসে, তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'ওকথা বলিস না কান্ত। সবাই জানে, তুই চোর নোস্, ডাকাতও নোস্। একটা নষ্ট মেয়েমানুষের খপ্পরে পড়ে তোর কপাল ভেঙেছিল। তা সেই মেয়েমানুষের যা গতি—।'

'জানি বিশ্বেস খুড়ো।' কান্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'গোয়ালপাড়ার বাঁকা খুড়োর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তার মুখে সব শুনেছি।'

তারাপদ বিশ্বাস বললো, 'তবেই বুঝে দ্যাখ, কোন্ পাপের কী ফল। তোর যা হবার তা হয়ে গেছে। তোর কেন গাঁয়ে ঢুকতে লজ্জা করবে? তুই হলি আমাদের গাঁয়ের ছেলে।'

অনেকেই আওয়াজ দিয়ে তারাপদ বিশ্বাসকে সমর্থন জানালো। কান্ত আবার বললো, 'ওই গদা হারা, কারা সব কয়েকটা ছেলে আমার ঘরে বসে মদ খাচ্ছিল, আবার আমাকেই চোখ পাকাচ্ছিল, মারবে বলে শাসাচ্ছিল। তা আমিই তাদের দু'ঘা দিয়ে দিয়েছি।'

সবাই হেসে উঠলো। তারাপদ বিশ্বাস বললো, 'বেশ করেছিস, খুব ভালো করেছিস। ওই শয়তানগুলোর দৌরাত্মে পাড়ায় টেকা দায় হয়েছে।'

'পাড়ার ভেতর মদ জুয়ার আড্ডা এবার ঘুচলো।' বৈদ্যনাথ বললো, 'কান্ত, এসে গেছিস, এবার ঘরদোর গুছিয়ে বোস্। আমরা পুরনো বন্ধুরা তোর সঙ্গে আবার আগের মতন কামারশালায় বসে আড্ডা জমাবো।'

আবার সবাই আওয়াজ দিল, হেসে উঠলো। তারাপদ বিশ্বাস বললো, 'ওই গদা হারা শয়তানগুলোর চেঁচামেচিতেই জানা গেল, ডাকাত পড়েছে। আসলে বাড়ির খোদ মালিক এসেছে, হারামজাদারা তাও বুঝতে পারে নি।'

আবার সবাই হেসে উঠলো। বৈদ্যনাথ বললো, 'কান্ত, ওই ভুতের বাড়িতে তো রাত্রিবাস করতে পারবি না। আজ আমার বাড়িতেই খাবি থাকবি। তারপর কাল থেকে দেখা যাবে কী করা যায়।'

কান্ত হেসে বললো, 'তোর বাড়িতে খাবো বটে, কিন্তু রাত্রিবাস আমি এ বাড়িতেই করবো, ভুত তাড়াবার জন্য।'

আবার সবাই হেসে উঠলো। তারাপদ বিশ্বাস বললো, 'সেই ভালো।'

কান্ত সকলের এই আন্তরিক অভ্যর্থনায় অনেকটা স্বস্তি বোধ করলো।

কান্ত যা চায় নি, পুরোপুরি না হলেও ঘটলো সেই রকমই। একরকম থিতু হয়েই বসতে হলো তাকে। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সাহায্যে, কামারশালা আর ঘরে চাল দেওয়াল ঠিক করেছে। বনজঙ্গল কেটে ভিটার চেহারা বদলিয়েছে। কামারশালার চুল্লিতে আবার আগুন জ্বলেছে। হাপরে টান পড়েছে। নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটাবার ঠং ঠং শব্দে, ধ্বংসপ্রাপ্ত কামারবাড়ি আবার আগের কামারবাড়ি হয়েছে। গ্রামের চাষী, তাঁতী জোলাদের আনাগোনা, কেনাকাটা বায়না চলেছে। কান্ত নিজে তেমন হাটে গঞ্জে না গেলেও তার হাতের তৈরি লোহার কাজ অন্য লোকেরা বিক্রি করতে নিয়ে যায়। তার একলা জীবনে কোনো

boiRboi.net

ভাবনাই নেই। পুরনো বন্ধুবান্ধবরা, পাড়ার বয়স্করাও আসে।

এসব সত্ত্বেও, একলা মানুষের সংসার যেমন হতে হয়, তেমনি একটা খাপছাড়া বাউন্ডুলে ভাব। বাউরীপাড়ার টানটা বেড়েছে। অন্য কোনো কারণে না। কান্ত আজকাল রাত হলেই মদ খায়। কোথাও গানবাজনা যাত্রা হলে সেখানে গিয়ে বসে থাকে। স্বামীপুত্রহীনা এক মাঝবয়সী তাঁতী বউ তার রান্না করে। খেতে দেয়, সংসার দেখে। কান্ত তাকে তাঁতী খুড়ী বলে ডাকে।

কিন্তু সকলের অনুরোধ উপরোধেও সে আর বিয়ে করে নি। তার স্পষ্ট কথা, সে আর কোনোরকম মায়ায় জড়াবে না। নয়নের মেয়ে মেনকা তার ছেলে কোলে করে মাঝে মধ্যে কামারকাকার কাছে আসে। কান্ত হেসে কথা বলে, বসতে দেয়। ছেলেটাকে মুড়কি জিলিপি কিনে এনে খাওয়ায়। তবে এই পর্যন্তই। মেনকাকে দেখলে বুকের মধ্যে এখনো ধক্‌ধক্ করে ওঠে। করুক, নিজেকে সে শক্ত করে রাখে। সে সব সময়েই বলে, 'এই বেশ ভালো আছি। হাত-পা ঝাড়া মানুষ। মন চাইলে একদিন যেদিকে চোখ যায়, চলে যাব। তবে ঘরসংসার বউ ছেলেমেয়ে ওসবে আর সাধ নেই।'

কথাটা বলবার সময় বুকের কাছে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। ভারীই থেকে যায়। একটু নেশা করে, দুটো গান করে। খানিকটা নেচে-হেসে, হাসিয়ে হালকা হয়ে নেয়। আর, সব সময়ের সঙ্গী কালো আছে। সেই কুকুরটার সে নাম দিয়েছে কালো। একবার ভেবেছিল কুকুরটার নাম দেবে নয়ন। তারপরে নিজেই জিভ কেটে, কান মুলে, মনে মনে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, এমন হীনতা যেন তার মনে না আসে।

এ ভাবেই বছরখানেক কেটে গেল। ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্র। চৈত্রের গাজনের মেলা হয় ক্রোশ তিনেক দূরের এক গ্রামে। গ্রামের নাম শিবগঞ্জ। গাজন উপলক্ষে যাত্রাগান ছিল। কান্ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যেতে বললো। কেউ গেল না। সে একলাই বেরিয়ে পড়লো।

খনার বচনে আছে, চৈত্রে ঝর ঝর, ঝড় পাথর। যাত্রা পালার মাঝখানেই, বিজলি হেনে বজ্রপাতের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পালা ভাঙতে দেরি হলো না। লোকজন যে যেদিকে পারলো আশ্রয়ের জন্য ছুটলো। শিবগঞ্জের শিবমন্দিরের মাঠে যাত্রা হচ্ছিল। কান্ত অনেকের সঙ্গে নাটমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল। সবাই বলাবলি করলো, গাছের আম সব গেল। কেউ বললো, অকাল বৃষ্টি, লক্ষণ ভালো না।

ঝড় বৃষ্টি থামলে, কান্ত নিজের গ্রামের পথে হাঁটা ধরলো। রাত্রি তখন তিন প্রহরের কম না। বৃষ্টি এখনো সামান্য ঝরছে। আকাশে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার পরমুহূর্তেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠছে। কান্ত খানিকটা পথ কিছু লোকের সঙ্গ পেয়েছিল। তারপরে একেবারে একলা হয়ে গেল। ভয়ের তার কিছুই নেই। বিপদ করেছে, এক এক জায়গায় রাস্তার ওপরে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে গাছের ডালে দুবার পড়তে হলো। চোট তেমন লাগেনি। রাস্তাও বৃষ্টির

boiRboi.net

জলে কর্দমাক্ত।

কান্ত আর একবার থমকিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখে পড়লো বড় একটা গোটা গাছই প্রায় পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু শিশুর কান্না এই গাছের ঝোপ থেকে কী করে ভেসে আসছে? না কি আশপাশে কোনো বাড়িতে শিশু কাঁদছে? এ কথা ভাববার মুহূর্তেই, ঝোপের একপাশে কান্ত দেখলো কতগুলো চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তার অভিজ্ঞ চোখ চিনতে ভুল করলো না, ওগুলো শেয়ালের চোখ। শিশুর কান্না এবার খুব কাছে শোনা গেল। চকিতে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। কান্তর চোখে মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠলো, গাছের ডালপালা পাতার মধ্যে একটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা সাদা কাপড় জড়ানো শরীর। শিশুর কান্না আবার শোনা গেল। কান্তর এবার আর ভুল হলো না, শিশুটি রয়েছে সাদা কাপড় জড়ানো শরীরের কাছেই।

কান্ত এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপরে পকেট থেকে দেশলাই বের বরে এগিয়ে গিয়ে কাঠি জ্বাললো। বাতাসের তেমন জোর না থাকলেও কাঠি একটু জ্বলেই নিভে গেল। তার মধ্যেই এলানো চুলের রাশি আর শরীর দেখেই বুঝলো, যে পড়ে আছে সে একটি স্ত্রীলোক। পর পর কয়েকটি কাঠি জেবলে সে দেখে নিল সব! স্ত্রীলোকটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী না। কাপড়টা সাদা বটে, পাড় লাল। গায়ে কোন অলংকার নেই। রঙ বেশ ফরসা। তার পাশেই পাতা ঝোপের ওপর একটি সাত-আট মাসের শিশু হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছে। গলার স্বর স্তিমিত হয়ে এসেছে। দেখে মনে হয়, এভাবে থাকলে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কি ব্যাপার!

কান্ত নীচু হয়ে স্ত্রীলোকটির নাকের কাছে হাত রাখলো। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। বুকে হাত রাখলো। নীরব স্তব্ধ। হাত তুলে নাড়ি টিপলো। স্পন্দনহীন। তার মানে মারা গিয়েছে। কি ভাবে! গাছের ডাল ভেঙে পড়ে? তাহলে শিশুটি বাঁচলো কেমন করে?

কান্ত সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে আশেপাশে তাকালো। নিজের জীবনের অতীতের কথা মনে পড়লো, তার তৎক্ষণাৎ মনে হলো, নতুন কোনো বিপদ যেন তাকে ঘিরে ধরতে আসছে। সে তাড়াতাড়ি উপড়ে পড়া গাছের পাশ কাটিয়ে, রাস্তা ধরতে পা বাড়ালো। শিশুটি আবার কেঁদে উঠলো!

কান্ত থেমে গেল। ইচ্ছে করে নয়, কেউ যেন তার পা দুটো ধরলো। মৃতকে বটেই, জীবন্ত শিশুটিকেও শেয়ালেরা রেহাই দেবে না। কিন্তু বিপদ কখন কোথা দিয়ে আসে, তা কি বলা যায়? জীবনে অনেক শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। আর না। সে পা বাড়ালো।

শিশুটি আবার কেঁদে উঠলো, এবার যে কান্নার সঙ্গে কাতর গোঙানি। শেয়ালে দাঁত বসালো নাকি? কান্ত থেমে পড়লো, আর সম্মোহিতের মতো পিছনে ফিরে শিশুটির কাছে এগিয়ে গেল। কার শিশু? কী পরিচয়? আবার কোন্ বিপদ তার জন্য ওঁৎ পেতে আছে? সে দেখলো, জ্বলজ্বলে চোখগুলো একটু সরে গিয়ে, তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

boiRboi.net

কান্ত কী করবে? কান্ত, কান্ত কামারের মতো কাজ করবে। ভালবাসার ছলনায় সে জেল খেটেছে। কিন্তু একটি অসহায় শিশুকে এভাবে মরতে দিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, অজ্ঞাত পরিচয় শিশুটিকে কোলে তুলে নিলো। বুকে জড়িয়ে চারপাশে একবার দেখলো। ফিসফিস বৃষ্টি পড়ছে। কান্ত তার গায়ের জামা খুলে, শিশুটিকে ঢাকা দিল, তারপরে নিজের গ্রামের পথের দিকে চললো। শিশুটি শরীরের তাপ পেয়ে, বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেয়ে, কান্তর গায়ের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো। শিশু মায়ের স্তন খুঁজছে। এ ক্ষেত্রে কান্ত অসহায়। হয়তো শিশুটি ক্ষুধার্ত। কতোক্ষণ ধরে পেটে কিছু যায় নি, কে জানে? বাড়িতে গেলে হয়তো কিছু জুটতে পারে। তাঁতী খুড়ী কান্তকে প্রায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতোই মনে করে। রাত্রে খাবার জন্য রোজ এক পো দুধ রেখে দেয়। এক পো দুধের যোগান দেয় নয়নের মেয়ে মেনকা। তাঁতী খুড়ী সে-কথা কান্তর কাছে বলে না। কিন্তু কান্ত তা জানে। অথচ কান্ত অধিকাংশ রাত্রেই দুধ খায় না। তাঁতী খুড়ীকে বোঝানো যায় না, বাউরীপাড়ার চোলাই খেয়ে, তারপর দুধ পেটে গেলে তা ছানা কেটে যায়। ছানাও কাটে না, আসলে অম্বল হয়ে যায়। সে-কথা তাঁতী খুড়ীকে কে বোঝাবে?

শিশুটি কান্তর জামা ঢাকা বুকের মধ্যে উসখুস করে, গলা দিয়ে গোঙানো মতো দু একবার শব্দ করলো। অপটু অনভিজ্ঞ কান্ত শিশুকন্যাটিকে মৃদু চাপ দিয়ে, দোলা দিল। এ ছাড়া আর কী করবে, তার জানা নেই। শিশুটি কিন্তু চুপ করলো। শিশুটি যে কন্যা, তা সে আগেই দেখে নিয়েছিল।

কান্তকে সাবধানে চলতে হচ্ছিল। কাদামাটির রাস্তা রীতিমতো পিছল। ফিসফিস বৃষ্টি সেই পিচ্ছিলতাকে বাড়িয়ে তুলছিল। তবু সে মনে মনে ভাগ্য মানছিল, বৃষ্টিপাতের প্রবল ধারা নেই। তা হলে শিশুটিকে ভেজবার হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন হতো। যদিও ইতিমধ্যেই শিশুটি বেশ খানিকটা ভিজেছে। কিন্তু কেমন করে একজন স্ত্রীলোক, এতো রাত্রে ঝড়ের মধ্যে বাইরে এলো? স্ত্রীলোকটি কি ঝড়ের সময় গাছ চাপা পড়ে মরেছে? না কি নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার? মানুষেরই ষড়যন্ত্র নাকি?

মানুষেরই ষড়যন্ত্র যদি হবে, স্ত্রীলোকটিকে যদি কেউ হত্যা করেই এখানে ফেলে গিয়ে থাকে, তবে শিশুটিকে হত্যাকারী বাঁচিয়ে রেখেছিল কেন? এইরকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, যার কোনো প্রকৃত জবাব পাওয়া অসম্ভব, কান্ত তার বাড়ি এসে পৌঁছলো। রাত্রে তাঁতী খুড়ী থাকে না। ঘরে তালা দিয়ে চলে যায়। সেই তালার একটি চাবি কান্তর নিজের কাছেও থাকে। কান্ত অবিশ্যি অনেক রাত্রে ঘরের তালাও খোলে না, বাউরীপাড়া থেকে আকণ্ঠ গিলে, কামারশালেই পড়ে থাকে। পরের দিন তাঁতী খুড়ী গজগজ করে।

শিশুটিকে এবার জামার নিচে থেকে বের করে, এক হাতে বুকে চেপে ধরে, পকেট থেকে চাবি বের করে, এক হাতে তালা খুললো। কালো এসে ল্যাজ নাড়িয়ে ফোঁসফোঁস করে, কান্তর পা চেটে দিল। কয়েকবার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে, কোলের শিশুটিকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হলো, আর কুঁইকুঁই শব্দ করে উঠলো। কান্ত

boiRboi.net

বললো, দাঁড়া রে ব্যাটা, ব্যস্ত কিসের? দেখবি, সবই দেখবি। তারপরে আমার কপালে কি আছে, তাও দেখবি।'

কান্ত দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। কালোরও প্রবেশে কোনো বাধা ছিল না। যদিও খাওয়া-শোয়ার ঘরে কালোর প্রবেশ, তাঁতী খুড়ীর মোটেই পছন্দ না। কিন্তু কান্ত জেল থেকে ফেরার প্রথম দিনের সঙ্গীটিকে কোনো দিক থেকেই বঞ্চিত করতে পারে নি। কালোর এ বাড়িতে সর্বত্র অবারিত দ্বার।

ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের সলতে কমানো ছিল। কান্ত আগে সলতে উসকিয়ে দিয়ে ঘর আলোকিত করলো। শিশুটির দিকে এবার ভালো করে দেখলো। কালো কুঁইকুঁই শব্দে শিশুটির দিকে তার মুখ এবং নুলো বাড়িয়ে দিতে লাগলো। যেন সে একটি নতুন খেলা ও খেলনা পেয়েছে, আর এখনই খেলা শুরু করতে চায়। কিন্তু শিশুটি ভয় পেয়ে ডুকরে উঠলো, কান্তকে জোর করে আঁকড়িয়ে ধরলো। কান্ত কালোকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, চোখ পাকিয়ে বললো, 'যা, চুপ করে ওদিকে গিয়ে বোস্।'

কালো তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলো। একটু সরে গিয়ে দু পা ছড়িয়ে মুখ তুলে বসলো। তার জ্বলজ্বলে চোখে একটি সকাতর স্নেহ ভালবাসা দৃষ্টি শিশুর দিকে। কান্ত ভালো করে শিশুটির দিকে তাকিয়ে দেখলো। শিশুর গায়ের জামাটি, নিতান্ত গ্রাম্য দরিদ্র শিশুর না। লাল রেশমী কাপড়ের, শহুরে দর্জির হাতের কাজের বেশ মুনশীয়ানা আছে। আর সেই প্রথম চোখে পড়লো, শিশু-কন্যাটির দু হাতে দুটি সোনার বালা। দেখেই কান্ত চমকিয়ে উঠলো। এ শিশু যে কোনো সম্পন্ন ঘরের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি শিশুর গায়ের গন্ধেও তার প্রমাণ। অথচ মৃত স্ত্রীলোকটির অঙ্গে একটিও কোনো অলংকার চোখে পড়েনি।

কান্তর মনে উদ্বেগ বেড়ে উঠলো। অসহায়, ক্ষুধার্ত জানোয়ারের দ্বারা বেষ্টিত শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে, সে নিজেই কোনো অপরাধের অংশীদার হয়ে পড়লো না তো? সে যে ঘরপোড়া গরু। যে মায়া-মমতাকে মন থেকে সে একেবারে ত্যাগ করেছিল, কে জানতো, সেই অনুভূতি এবং বোধ তার অবচেতন মনের গভীরে, নিবিড়ভাবে আশ্রয় করেছিল। অন্যথায় এ শিশুকে কেন সে, বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচাবার মতো, ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে বুকে করে নিয়ে আসবে?

শিশুটির রঙ ফরসা, চোখ মুখ সুশ্রী, মুখখানি মিষ্টি। মাথায় পাতলা পাতলা কোঁকড়ানো চুল। ডাগর চোখ দুটিতে এখনো কাজল আঁকা। নজর না লাগে, সেইজন্য কপালের ডান পাশে, কাজলের ছোট টিপটিও পরিষ্কার ফুটে আছে। দেখে মনে হয় সাত-আট মাসের বেশী না। সে তার কালো অপলক চোখে মাঝে মাঝে কান্তর মুখের দিকে দেখছে। কখনো কালোর দিকে! আর গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ করে, কালোর দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকাচ্ছে। কান্তর মুখের দিকে দেখছে। কান্ত সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, 'ও তোমাকে কিছু বলবে না মা। ও তোমার সঙ্গে খেলা করতে চাইছে।

শিশু অপলক দু চোখ ভরা কৌতুহল নিয়ে কান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন

boiRboi.net

তার কথা বোঝবার চেষ্টা করছে। আবার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে, ম্মা ম্মা শব্দ করছে। যেন মাকে খুঁজছে, ডাকছে। কান্ত বলছে, 'ও রে মা, তোর মা যে জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। কেমন করে তোর এ সর্বনাশ হলো, কে জানে? আমাকেই বা তুই কোন্ সর্বনাশের মধ্যে টেনে নিয়ে চললি, কে জানে?'

অবোধ শিশু, অবোধ চোখে তাকিয়ে কান্তর কথা শুনে ছোট ছোট রক্তিম আঙুল দিয়ে, কান্তর গালে চিবুকে স্পর্শ করে, যেন তাকে বুঝতে চায়। কান্তর মস্তিষ্কে বিদ্যুৎচমকের মতোই একটি কথা বারে বারে ঝিলিক দিয়ে উঠতে থাকে, এখনো সময় আছে। রাত্রি থাকতে থাকতে যেখানকার শিশু, সেখানেই রেখে আসা যায়। তাহলে আর কোনো দুশ্চিন্তাই থাকে না। সেখান থেকে সোজা বাউরীপাড়ায় গিয়ে, বোতলখানেক গিলে ব্যোম্ হয়ে পড়ে থাকা যাবে। কিন্তু—।

কিন্তু সেই অন্ধকারে ক্ষুধার্ত জ্বলজ্বলে চোখগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এতক্ষণে মৃত স্ত্রীলোকটির, যে-হয়তো এই শিশুরই মা, তার কী গতি হয়েছে, কে জানে? শেয়ালেরা এতক্ষণে বোধ হয় তাকে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছে। এই শিশুকে সে কেমন করে সেখানে ফেলে রেখে আসবে?

কান্ত তক্তপোশের ওপর থেকে এক হাতে তার সামান্য বিছানা মাটিতে নামিয়ে শিশুকে শোয়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শিশু বসে থাকতে চাইলো। কান্ত বললো, 'ওরে তাই থাক মা, আমি তোর দুধটা গরম করি।'

শিশুটি কী বুঝলো কে জানে। একবার কান্তর মুখের দিকে তাকালো। তারপরে কালোর দিকে। অমনি কালোর চোখ দুটো ঝলকিয়ে উঠলো। কান দুটো নড়ে উঠলো। কান্ত বললো, 'ও তোকে কিছু করবে নারে বেটি। কোথাকার রাজকন্যে তুই হাড়-হাভাতের ঘরে এসে জুটলি? দেখি তোকে একটু খাওয়াতে পারি কী না।' বলে কালোর দিকে ফিরে বললো, 'কালো, নজর রাখ্!'

কান্ত ঘরের কোণে, যেখানে তাঁতী খুড়ী তার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে, সেখানে গেল। ঢাকা দেওয়া বাসনপত্র খুলে দেখলো, একটি নতুন কলাইয়ের বাটিতে দুধ রয়েছে। ধোয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে তার মুখ ঢাকা। পাশেই রাখা আছে কয়েক খণ্ড পাটকাঠি আর দেশলাই। নিয়মিত রাখা থাকে, দুধ গরম করার জন্য। তাঁতী খুড়ীর সব কাজেরই ভারী গোছ। যদিও অধিকাংশ দিনই পাটকাঠি জেলে দুধ গরম করা হয় না, খাওয়াও হয় না। আজ তাঁতী খুড়ীর প্রতি কান্ত ভারী কৃতজ্ঞতা বোধ করলো।

কান্ত দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, পাটকাঠির গোছা ধরালো। সাঁড়াশি দিয়ে দুধের গেলাস চেপে ধরে, আগুনের ওপর ধরলো। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ কালোর কুঁইকুঁই শব্দে, কান্ত পিছন ফিরে দেখলো শিশুটি হামা দিয়ে তার পিছনে এসে পড়েছে। কান্ত তাড়াতাড়ি, জ্বলন্ত পাটকাঠির গোছা মাটিতে রেখে, শিশুকে কোলের কাছে তুলে নিল, বললো, 'কী হয়েছে? ভয় পেয়েছো? কোনো ভয় নেই।'

শিশু কান্তর কোলের ওপরেই মূত্র ত্যাগ করলো। কান্ত বলে উঠলো, 'যাহ্ শালা, জীবনে যা কোনোদিন হয়নি, তাই হলো। শেষটায় আমার দশা কি না-বিইয়ে

boiRboi.net

কানাইয়ের মা হলো ? বোঝ ঠ্যালা।'

শিশুকে কোলে নিয়েই, কান্ত দুধ গরম করলো। বাটিতে ঢাললো। চিনির কৌটা টেনে নিয়ে, কসরত করে ঢাকনি খুলে দুধে চিনি মেশালো। তারপরে ভাবনা হলো, দুধ খাওয়াবে কী করে ? এ শিশু কি এখন গেলাসে চুমুক দিয়ে দুধ খেতে পারবে ? চোখের সামনে ভেসে উঠলো, বাউরীপাড়ায় সাত আট মাসের শিশু দিব্যি ভাত চটকে দিলে খেতে পারে। এই শিশু কন্যাটির মাড়ির সামনে, ওপরে দুটি দুধের দাঁত ইঁদুরের দাঁতের মতো ঝিকিমিকি করছে। নিশ্চয়ই অন্নপ্রাশন হয়ে গিয়েছে।

কান্ত দুধের বাটি শিশুর মুখের কাছে ধরলো। শিশু হাত বাড়িয়ে থাবা মারতে গেল। কান্ত চমকিয়ে বাটিটা সরিয়ে নিল। দুধ খানিকটা চলকিয়ে পড়লো। আর শিশুটি তার দুটি দাঁত দেখিয়ে গোঙানো স্বরে হাসলো। আবার দুধের বাটির দিকে হাত বাড়ালো। কান্ত বললো, 'বোঝ ঠ্যালা। একেই বলে অবলা জীব। শেয়ালের মুখ থেকে নিয়ে এলাম। মা মরে পড়ে রয়েছে। আর এ কান্ত কামারের ঘরে হাসছে। শালা এই জগৎসংসারের বেবাক উলটো। কিন্তু খাওয়াই কী করে ? হাত বাড়াচ্ছে মানে খেতেই চাইছে।'

কালোটা আদুরে আবেগে গুঙিয়ে উঠলো। কান্ত ধমক দিল, 'তোর আবার হারামজাদা কী হলো ? খিদে পেয়েছে, না খেলায় পেয়েছে ?'

কালো এক জায়গায় বসে, ঘন ঘন ল্যাজ আর কান নাড়তে লাগলো। এমন কি কান্তর কথার সময়, কথা শোনবার ভঙ্গিতে ঘাড়ও কাত করলো।

কান্ত ইতিমধ্যে একটু ভাবলো। তারপরে ভাতের পাত্রের ঢাকনা খুলে, সামান্য ভাত দুধের বাটিতে দিয়ে চটকালো। চটকে হাতে একটু তুলে, শিশুর মুখের কাছে নিতেই সে হাঁ করলো। কান্ত মুখে দুধভাত দিল। শিশু মুখ বুজে গাল নাড়িয়ে নাড়িয়ে খেতে লাগলো। কিন্তু বারে বারেই বাটির দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করলো। বাটির দিকে হাত বাড়াবার রহস্যটা কি, বোঝবার জন্য বাটিটা শিশুর সামনে আনতেই, সে তার ছোট থাবা বাটির মধ্যে ঢুকিয়ে কিছু ভাত ছড়িয়ে দিল। তারপরে দুটি দাঁত দেখিয়ে, কান্তর দিকে তাকিয়ে হাসলো। কান্ত বলল, 'বোঝ ঠ্যালা। এটাই হলো এ মেয়ের খেলা। খাবে, আবার হাতে করে নিয়ে ছড়াবে।'

দেখা গেল, শিশুটি বেশ কয়েক গাল দুধ ভাত খেলো। এমন কি, বাটি কাত করে মুখের কাছে ধরতে, একটু দুধও খেল। কিন্তু বারে বারেই বাটিতে থাবা মারবার চেষ্টা করলো, তার সেই দাঁত দুটি দেখিয়ে হাসলো। সেই হাসি দেখে, কান্ত নিজেও না হেসে থাকতে পারলো না। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'ওরে মেয়ে, দুষ্টুমি শিখেছিস তুই ?'

কালো ওদিকে অস্থির হয়ে উঠলো। ও বুকে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে এলো। কান্ত জানে, কালো দুধ ভাতের লোভে এরকম করছে না। শিশুকে আদর করা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করছে। তার কুঁইকুঁই গলার আওয়াজে আসলে আবদারের কান্না। কিন্তু ভয় পাবে, তাই কান্ত এবার জোরে ধমক দিল,

boiRboi.net

'দেখবি হারামজাদা ?'

কালো ধমক খেয়েই পেছিয়ে গেল। কিন্তু শিশুটি হঠাৎ ভুল বুঝে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো। কান্ত তাড়াতাড়ি তাকে বুকের কাছে চেপে, দোলা দিয়ে বললো, 'তোমাকে কিছু বলি নি মা, তোমাকে কিছু বলি নি। কালোকে বকেছি।'

তবু তখনই শিশু থামলো না, খানিকক্ষণ কেঁদে, আস্তে আস্তে শান্ত হলো। আবার কান্ত আর কালোকে কয়েকবার দেখে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, 'মুমা মুমা' বলে ডেকে উঠলো।

কান্তর দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তার চোখের সামনে সেই ভেঙে পড়া গাছের ডালপালা। পাতার মাঝে মৃত রমণী মূর্তি ভেসে উঠলো। কার ঘরনী, কী বৃত্তান্ত, কে জানে। মনে মনে বললো, 'ওরে বেটি, তুই অভাগী, না অভাগীর বেটি, আমি জানি না। মা মা বলে যাকে ডাকছিস, তার শরীরটা নিয়ে এখন জানোয়ারেরা ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। তুই সেখানে থাকলে—।' কান্ত মনের কথাটাও মনে মনে শেষ করতে পারলো না। এই শিশুর এতক্ষণে কী দশা হতো, কল্পনা করেই তার গায়ের মধ্যে শিউরে উঠলো।

কান্ত এই ভাবনার মধ্যে শিশুটিকে বুকের ওপর চেপে দোলা দিচ্ছিল। দেখা গেল, শিশুটির চোখে ঘুম নেমে এসেছে। ক্রমে গভীর ঘুমে ওর হাত পা এলিয়ে পড়লো। কান্ত ঘুমন্ত শিশুকে কোলের ওপর রেখে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ দেখলো। তারপর আপন মনেই বলে উঠলো, কি করবো ? একে নিয়ে আমি কী করবো এখন ? যেখান থেকে এনেছি, সেখানেই রেখে আসবো ? এই দুধের শিশুকে আমি কেমন করে বাঁচাবো ? নিজেই কি বাঁচবো ? আমি এক চিরকালের হতভাগ্য। কী আপদে পড়বো কে জানে ?'

কান্তর কথার সঙ্গে সঙ্গে কালো ঘাড় নেড়ে কান নেড়ে নানা রকম ভঙ্গি করছিল। যেন তার প্রভুর কথা বুঝতে চেষ্টা করছিল। তারপরে হঠাৎ কুঁইকুঁই করে আবদারের সুরে ডেকে উঠলো। কান্ত ঠোঁটে আঙুল রেখে বললো, 'চুপ কালো! মেয়ে এখন ঘুমিয়েছে, উঠে পড়বে।'

কালো কী বুঝলো, কে জানে। সে চুপ করে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। কান্ত মেঝের ওপর ছড়ানো বিছানায় আস্তে আস্তে শিশুটিকে শুইয়ে দিতেই, সে খুঁত খুঁত করে উঠলো, হাত ছুঁড়লো। কান্ত আস্তে আস্তে শিশুর গায়ে চাপড়ে দিতে সে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। কান্ত তার গায়ে একটি পাতলা কাঁথা ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কালোর দিকে ফিরে বললো, 'তোরা যে কী করে আমার কপালে জুটিস, তা তোরাই জানিস। চল, তোকে খেতে দিই।'

কালো যেন পরিষ্কার কথা বুঝে, এবার উঠে দাঁড়ালো। কান্ত একটা থালায় ভাত তরকারি যা ছিল, প্রায় সবই তুলে নিয়ে, ঘরের দরজার বাইরেই কালোর মাটির খাবার পাত্রে ঢেলে দিয়ে বললো, 'যা, খেয়ে নিয়ে আজ সারা রাত ভালো করে বাড়ি পাহারা দে। আমার মনে শান্তি নেই।'

কালো তথাপি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

boiRboi.net

স্বাভাবিক, কারণ কালো জানে, প্রভুর খাওয়া হলে সে খায়। ব্যতিক্রম দেখেই সে কান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কান্ত হাতের ইশারা করে কালোকে বাইরে যাবার নির্দেশ দিল। ফিসফিস করে বললো, 'আমার খেতে ইচ্ছা নেই, যা, তুই খেয়ে নিগে যা। আজকের রাতটা কেমন করে পোহায়, তাই দেখি।' বলে নিজেই কালোকে ঠেলে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। ফিরে তাকালো ঘুমন্ত শিশুর দিকে। তার সারা মন জুড়ে, একটা করুণ আবেগ, অথচ অস্বস্তি।

কান্ত ঘরের এক পাশে সরে গিয়ে, ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিজের কাপড়েই মুছলো। তক্তপোশ থেকে মশারি নামিয়ে নিচের বিছানায় টাঙালো। হারিকেনটা নেভাতে গিয়েও নেভালো না। একটু কমিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালো। ঘরের এক কোণের কুলুঙ্গি থেকে একটা দেশী মদের বোতল বের করলো। ছিপি খুলে গলায় মদ ঢালতে গিয়ে থমকিয়ে গেল। মশারির বাইরে থেকে ঝুঁকে পড়ে ঘুমন্ত শিশুকে দেখলো। তারপরে আবার ছিপি বন্ধ করে মদের বোতল তুলে রাখলো। বিছানার কাছে বসে বসে সিগারেটটা শেষ করলো। মশারি তুলে ভিতরে গিয়ে, ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখতে দেখতে তার নিজের চোখও বুজে এলো। শিশুর পাশে শুয়ে পড়লো।

★

ভোরবেলা শিশুর কান্নায়, বাইরে তাঁতী খুড়ীর চিৎকারে, কালোর হঠাৎ হঠাৎ ডেকে ওঠায়, কান্তর ঘুম ভাঙলো। চোখ তাকিয়ে দেখলো, শিশু তার বুকের ওপর পড়ে, ছোট থাবা দিয়ে মুখের ওপর চাপড়াচ্ছে। চকিতে মুহূর্তের জন্য সে অবাক্ আর বিভ্রান্ত হলো। পরমুহূর্তেই তার সব কথা মনে পড়ে গেল। সে শিশুকে বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মশারির বাইরে এলো। কানে এলো, তাঁতী খুড়ী বাইরে থেকে চিৎকার করছে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা লোক কাল রাতে গেল শিবগঞ্জে গাজনের মেলায় যাত্রাগান শুনতে, আর এই সাত সকালে ঘরের মধ্যে বাচ্চা কেঁদে মরছে। একি ভুতুড়ে কাণ্ডরে বাবা! অহে অ কান্ত, ঘরে বাচ্চা এলো কোথা থেকে? কাকে এনে তুললে?'

কান্ত তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'আহ্, তাঁতী খুড়ী একটু আস্তে কথা বলো, এতো চেঁচামেচি কিসের? আমি পড়েছি এক ফৈজতে, সব বলছি।'

শিশুর কান্না ইতিমধ্যে থেমেছে, সে অবাক্ কৌতূহলে তাঁতী খুড়ী আর কালোকে দেখছে। মুখে পুরে দিয়েছে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর চুষছে। তাঁতী খুড়ীর চোখেও শিশুর মতোই অবোধ বিস্ময়। এতো যে তার সহবত জ্ঞান, খুড়ী হয়েও সে কান্তর সামনে কখনো ঘোমটা ছাড়া থাকে না। এখন তার সে-ঘোমটার বালাই নেই। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে, জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। এই ফাঁকে কালো ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে, ফ্যাঁচফ্যাঁচ শব্দ করে, লুটিয়ে পড়ছে কান্তর পায়ের কাছে, অথচ নজর শিশুর দিকে।

'অ মা আমি কোজ্জাবো গ!' তাঁতী খুড়ী গলা নামিয়েই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'এ যে দেখছি, কুঁদ ফুলের মতন একটা জ্যান্ত মেয়ে!'

boiRboi.net

কান্ত বিরক্ত হতে গিয়ে হেসে ফেললো, বললো, 'তবে তুমি কি ভেবেছো আমার কোলের মেয়েটা মরা ?'

'আ ছি ছি, আমাকে যমে নিক !' তাঁতী খুড়ী আর্তস্বরে বলে উঠলো, 'তাই আমি কখনো বলতে পারি ? কিন্তু অ বাবা কান্ত, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কাল তুমি চোত্ সংক্রান্তির গাজনের মেলায় গেলে, এখন তোমার কোলে সন্দেশমণির মতন এই মেয়ে ! কোথায় পেলে ?'

কান্ত বললো, 'বলবো, সবই বলবো। এখন তুমি একটা কাজ করো দিকিনি তাঁতী খুড়ী। কাল রাতে কোনরকমে মেয়েকে একটু দুধভাত খাওয়াতে পেরেছি। এখন একটু দুধের যোগাড় দ্যাখো।'

কান্তর কথা শেষ হবার আগেই তাঁতী খুড়ী বলে উঠলো, 'কান্ত তাড়াতাড়ি বসো, মেয়ে এ্যা করছে।'

তাঁতী খুড়ী সাবধান করার আগেই শিশু তার প্রাকৃতিক কাজ, কান্তর জামা-কাপড়ের ওপরেই করতে আরম্ভ করেছে। তাঁতী খুড়ী দ্রুত ঘরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে বললো, 'দাও, মেয়েকে আমার কাছে দাও। এসব কি ব্যাটাছেলের কাজ ?'

কান্ত মেয়েকে তাঁতী খুড়ীর দিকে বাড়িয়ে দিতেই, সে দু' হাত দিয়ে কান্তর বুকের জামা আঁকড়িয়ে ধরে, কান্নামিশ্রিত প্রতিবাদের ধ্বনি করলো। কান্তর গায়ে জামা-কাপড়ে তখন শিশুর বিষ্ঠা-মূত্র। বাধ্য হয়ে তাকে মাটিতে বসতে হলো। অস্বস্তি আর বিরক্তি, দুইই তার মুখে। বললো, 'কী যন্ত্রণায় যে আমি পড়লাম ! তাঁতী খুড়ী, তুমি আগে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসো।'

তাঁতী খুড়ী বাইরে ছুটে যেতে যেতে বললো, 'আমিও তো তাই ভাবছি, এ যন্তোন্না তুমি কোথা থেকে নিয়ে এলে ?'

'যমালয় থেকে।' কান্ত প্রায় দাঁতে দাঁত চিবিয়ে নীচু স্বরে বললো। মেয়েটিকে মেঝেতে বসালো। গতকাল রাত্রে গায়ের জামা না খুলেই শুয়ে পড়েছিল। মাথা গলিয়ে জামাটা কোনরকমে খুলে, দূরে ফেললো। তক্তপোশের কাছে, দেওয়ালের গায়ে দড়িতে ঝোলানো ধোয়া কাপড় টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে, ময়লা কাপড় খুলে লুঙ্গির মতো জড়ালো। শিশু নির্বিকার। সে তখন কালোর দিকে তাকিয়ে দুটি দাঁত বের করে হাসছে। কালো যতো ল্যাজ নাড়ে, কান নাড়ায়, লম্ফঝম্ফ করে, ততোই সে মজা পেয়ে হাসে।

কান্ত বললো, 'যাক, কালোটার ওপর থেকে ভয় গেছে।

তাঁতী খুড়ী জলের বালতি আর ঘটি নিয়ে এলো। নিজেই এগিয়ে গেলো শিশুটিকে পরিষ্কার করার জন্য। শিশু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের গোঙানি তুলে, হামা দিয়ে কান্তর দিকে এগোলো। কান্ত তাড়াতাড়ি কাছে এসে শিশুকে দুহাতে তুলে দাঁড় করালো। বললো, 'তাঁতী খুড়ী, তুমি জল ঢালো। আমি মেয়েকে ধুয়ে পরিষ্কার করি।'

'এ কী কান্ড বাবা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' তাঁতী খুড়ী ঘটি ভরে জল এনে শিশুর কোমরের কাছে ঢাললো, 'এ কি ভোজবাজি বাপু ! এক রাতের মধ্যেই কোথা থেকে বা এ মেয়ে এলো, আর গায়ে হাত দিতে গেলেই কামারের পোকে

boiRboi.net

জড়িয়ে ধরছে। যেন জন্মোকালের চেনা।'

কান্ত অতি দুঃখেও হাসলো। তাঁতী খুড়ীর কথা মিথ্যা না। মেয়ে কান্তকে ছাড়া যেন কিছুই জানে না। সে নিজের হাতে মেয়েকে পরিষ্কার করলো, তার গায়ের জামাটিও খুলে দিল। দিগম্বর কন্যাকে নিজের কাপড় দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নিয়ে বললো, 'তাতী খুড়ী, তুমি আমার আর মেয়ের জামাকাপড় ঘাটে নিয়ে যাও। তারপরে দুধের ব্যবস্থা দ্যাখো।'

'কিন্তু একে পেলে কোথায়, তা তো বললে না?' তাঁতী খুড়ীর পেট ফুলছে, বোঝা গেল।

কান্ত সংক্ষেপে ঘটনা বললো। তাঁতী খুড়ীর দুশ্চিন্তা বাড়লো। চোখেমুখে উদ্বেগ নিয়ে, ময়লা জামাকাপড় তুলে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'কী জানি বাপু, কিসের থেকে কী ঘটবে, কে জানে? আমার মন মোটেই ভালো গাইছে না।'

কান্তরও মনের অবস্থা প্রায় একই রকম, কিন্তু সে নিরুপায়। ইতিমধ্যে রাম এলো। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে, কান্তর সঙ্গে কামারশালে কাজ করে। রাম জাতে কামার না, সে বাউরীপাড়ার ছেলে। কান্তর শাগরেদ। কিছু কাজকর্ম'ও শিখেছে, কান্তই হাতে ধরে শিখিয়েছে। অন্যান্য দিন ইতিমধ্যে কান্ত কামারশালে বসে যায়। রাম এসে চুল্লিতে আগুন দিয়ে হাপর টানতে আরম্ভ করে। আজ তারও দেরি। সে কান্তর কোলে ফুটফুটে মেয়ে দেখে অবাক হয়ে বললো, 'আমি ভাবলাম, আমার দেরি দেখে তুমি রাগ করবে। হয়তো নিজের হাতেই চুলোয় আগুন দেবে। তা, কে এসেছে বাড়িতে? মেয়েটি কে?'

কান্ত বললো, 'এখন অতশত কথা বলতে পারবো না। তুই ভেতরে এসে মেঝে থেকে বিছানা তুলে তক্তপোশে রাখ দিকিনি। তারপরে একবার গঞ্জে যা। টাকা দিচ্ছি, মেয়েটার গায়ের মাপে গোটা দুই জামা কিনে নিয়ে আয়।'

রাম অবাক্ হলেও আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলো না। মেঝে থেকে বিছানা মশারি তক্তপোশের ওপর গুছিয়ে রাখলো। কান্ত তাকে কুলুঙ্গিতে রাখা ছোট কাঠের বাকসো থেকে কয়েকটা টাকা বের করে দিয়ে বললো, 'দেরি করবি না। আর কারোকে কিছু বলতে হবে না। ঘুরে আয়, তারপরে দেখি, আজ কাজে বসা যাবে কিনা।'

রাম ঘাড় বাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল। তাঁতী খুড়ী জামাকাপড় কেচে রোদে মেলে দিয়ে ছুটলো দুধের সন্ধানে। গ্রামে এ সময়ে দুধ পাওয়া মুশকিল। বলে না রাখলে এক ফোঁটা দুধও পাওয়া যাবে না—গঞ্জ হয়ে শহরে চলে যায়।

গত রাত্রের মেঘ কেটে, সকালের আকাশ পরিচ্ছন্ন। রোদ উঠেছে। কিন্তু পয়লা বৈশাখের সকালটিতে আজ কেমন যেন গা শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গত রাত্রের ঝড় জলের জন্যই এই ঠাণ্ডা। কান্ত নিজেরই একটা শুকনো জামা দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে নিয়ে, উঠোনে এসে দাঁড়ালো। কালো পায়ে পায়ে ঘুরছে, লাফালাফি করছে। শিশুটির এখন আনন্দ ধরে না। কালো লাফ দিলেই সে খিলখিল করে হেসে, কান্তকে আরো জোরে আঁকড়িয়ে ধরছে। আবার নিজে থেকেই

boiRboi.net

ঝুঁকে পড়ে কালোর দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

কান্ত এই খেলা দেখছে, আর সকালের রোদে কচি কচি সজনে পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক্ অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে, জীবনের এইসব ঘটনা অজ্ঞাত রহস্যে ভরা, অবাস্তব, অথচ অতি বাস্তব বৈপরীত্যের লীলা।

★

মাস তিনেক কেটে গেলো। কিন্তু মেয়েটির সন্ধানে কেউ এলো না। কান্ত ঘটনার তিন চার দিন পরেই শিবগঞ্জের পথে গাছ ভেঙেপড়া ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। গিয়ে দেখেছিল, ভেঙে-পড়া গাছটাকে কয়েকজন কুড়োল দিয়ে কাটছে। কান্ত তাদের নিতান্ত অচেনা না। সকলেই তার কুশল জিজ্ঞেস করেছিল, বিড়ি খাইয়েছিল। কিন্তু মৃত রমণীর উল্লেখ কেউ করে নি। কান্ত অবিশ্যি মেয়েটিকে কোলে করে নিয়েই গিয়েছিল। প্রথমত মেয়ে কারোর কাছে থাকবার পাত্র না। দ্বিতীয়ত কান্ত ভেবেছিল, যদি খোঁজখবর কিছু মেলে, মেয়েটির আপনজনের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাদের হাতে তাকে তুলে দিয়ে আসবে।

আশ্চর্য, একটি লোকও মৃত রমণীর কথা বলে নি। বরং তার কোলে ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে সবাই কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়েটি কে? কান্ত সাত-পাঁচ কথা বলে শেষ পর্যন্ত বলেছে, 'কুড়িয়ে পেয়েছি।' সবাই হেসেছে, বিশ্বাস করে নি। বরং ঠাট্টা করে বলেছে, 'মেয়ের নাম তা হলে কুড়োনি রেখেছো বলো? কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে যখন!'

কান্ত হেসে আরো স্পষ্ট করে বলেছিল, 'না। চোত সংক্রান্তির রাতে কুড়িয়ে পেয়েছি, তাই ভেবেছিলাম, নাম রাখবো গাজনবালা। কিন্তু তাঁতী খুড়ী চৈতে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে চৈতি বলে ডাকে।'

কান্তর কথা শুনে সবাই আবার অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল। চৈত্র সংক্রান্তিতে কুড়িয়ে পাওয়ার কথাটা কেউ বিশ্বাস করে নি। তা না করুক, কান্ত গভীর বিস্ময় নিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছিল। সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে নি, তা হলে মৃত স্ত্রীলোকটির দেহ কোথায় গেল? সবই কি ভেলকি, আর ভোজবাজি? একশোটা শেয়ালে কুকুরে টেনে নিয়ে গেলেও এক রাত্রের মধ্যে একটা মানুষকে হাড়ে মাংসে খেয়ে ফেলতে পারে না। একমাত্র তাঁতী খুড়ীকেই সে কথাটা বলতে পেরেছিল।

তাঁতী খুড়ী কেঁপে উঠে বলেছিল, 'বলো না বাপু, আমার কেমন ভয় করে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো দানো দত্যির ব্যাপার আছে।'

দানো দত্যি না হোক, মানুষের হাত আছে বলেই কান্তর সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু কে সে মানুষ? কী ঘটনা ঘটেছিল? একটি স্ত্রীলোক নিজের কোলের মেয়েসহ মরে পড়ে রইলো, তার কোনো খোঁজখবরই হলো না? কোথাও কিছু জানাজানি হলো না?

কান্তর এই বিস্মিত জিজ্ঞাসার মধ্যে গ্রামের লোকেরা সবাই নির্বিকার চুপচাপ ছিল না। গোপনে বা প্রকাশ্যে খোঁজখবর তারাও কিছু কম করে নি। তারপর একদিন পুলিসও এসেছিল। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক কেউ খবর দিয়েছিল। কান্ত

boiRboi.net

এসব অনুমান করে, পুলিসকে কী বলতে হবে, তাঁতী খুড়ীকেও শিখিয়ে রেখেছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা ছাড়া তার উপায় ছিল না। সত্যি ঘটনা বললে, আবার একটা খুন-খারাপির ঘটনায় তাকে টানাটানি করতো। সে স্পষ্ট বলেছিল, চৈত্র সংক্রান্তির রাত্রে ঝড়বৃষ্টিতে শিবগঞ্জের ভাঙা যাত্রাপালা থেকে ফিরে এসে কামারশালার দরজার সামনে মেয়েটিকে সে দেখেছিল। আশেপাশে শেয়াল ঘুরছিল। নেহাত তার কুকুর কালো পাহারা দিচ্ছিল বলে মেয়েটাকে শেয়ালে খেতে পারে নি। পুলিস যদি ইচ্ছা করে, মেয়েকে নিয়ে যেতে পারে। সে পুলিসকে মেয়ের হাতের সোনার বালা দুটোও দেখিয়েছিল।

পুলিস খানিকটা রোখপাক করে, খোঁজ-খবর করে আবার আসবে বলে সেই যে গিয়েছে, আর আসে নি। কিন্তু কান্তর অন্য দিক থেকে বিপদ হয়েছে। তার অবস্থা সত্যিই সেই না-বিইয়ে কানাইয়ের মায়ের মতো হয়েছে। মেয়ে এখন ম্মা ম্মা বুলি ছেড়ে ব্বা ব্বা বুলি ধরেছে। কান্তর একলা কোথাও যাবার উপায় নেই। মেয়ে তাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না। তাঁতী খুড়ীকে এখন কিছুটা মেনে নিয়েছে। খুব ভাব জমেছে কালোর সঙ্গে। ভয় একেবারেই ঘুচে গিয়েছে।

চৈতি বললেই মেয়ে এখন ফিরে তাকায়, সাড়া দেয়। তাঁতী খুড়ীর রাখা নামটাই থেকে গিয়েছে। অথচ তাঁতী খুড়ীর সঙ্গে থাকবে না, তার হাতে খাবে না। সব কান্তকে করতে হবে। এমন কি কাজের সময়ও, চৈতি কামারশালা ছাড়া নড়ে না। কিন্তু সেখানে আগুনের কাজ। তাতানো লোহা পেটাবার সময় ফুলকি ছিটকে যায়। কান্তকে অতএব বাধ্য হয়েই কামারশালের এক পাশে নিরাপদ দূরত্বে একটি খুঁটি পুঁততে হয়েছে। মেয়ের কোমরে দড়ি জড়িয়ে সেই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়।

চৈতি তাতেই খুশী। হাতের সামনে নানান খেলনা খাবার ছড়ানো থাকে। মেয়ে খাওয়ার থেকে খাবার ছড়ায় বেশী। খেলনা ছুঁড়ে মারে কান্তর দিকে, খলখল করে হাসে। আর দিনে দিনে তার বুলি স্পষ্ট হতে থাকে, 'বাবা বাবা, আয়।

কান্ত সেই ডাক শুনে আর স্থির থাকতে পারে না। হাতে যতো কাজই থাক, ফেলে রেখে উঠে পড়ে। চৈতির কোমরের বাঁধন খুলে কোলে তুলে নেয়। রাম বলে, 'ব্যস, হয়ে গেল। লোহা আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে, কান্তদা এখন মেয়ে নিয়ে খেলা শুরু করলো।'

কান্ত ধমক দেয়, 'চুপ কর হারামজাদা আমার মেয়ে নিয়ে কোনো কথা বলবি তো পিঠ ভেঙে দেবো।'

রাম দাঁত বের করে হাসে। আসলে কিন্তু কান্তর মুখ থেকে গালাগালগুলো শোনবার জন্যই সে ও রকম করে বলে। জেনে শুনেই বলে। জানে, কান্তদার মেয়ে অন্তঃ প্রাণ। মেয়ে হাত দেখিয়ে বাইরের দিকে দেখায়। অর্থাৎ, বেড়াতে চলো। কান্ত অমনি মেয়ে নিয়ে পাড়া বেড়াতে চললো। সে এখন আর প্রতি সন্ধ্যায় বাউরীপাড়ায় যেতে পারে না। রামকে দিয়ে মদ এনে বাড়িতে বসেই খায়। বৈদ্যনাথ বা আরো দুচার বন্ধুও বাড়িতে এসে জোটে। তবে মজলিসে

banglabooks.net

বসবার আগে মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কান্তর এখন যতো হাসি নাচ গান, অর্থাৎ যতো নেত্যকেত্য সবই মেয়েকে নিয়ে।

আর এক চৈত্র সংক্রান্তি যখন ঘুরে এলো, চৈতি তখন গোটা বাড়ি হেঁটে বেড়ায়। এই দিনটির জন্য কান্তর বিশেষ অপেক্ষা ছিল। তার সামান্য আয় থেকে বাঁচিয়ে স্বর্ণকারের কাছে একটি সরু সোনার চেন হার গড়িয়ে রেখেছিল। সংক্রান্তির দিন সকালে মেয়ের গলায় পরিয়ে দিল। হার পেয়ে চৈতি খুব খুশী। এখন বেশ স্পষ্ট কথা বলতে শিখেছে। গলার হারটি বারে বারে দেখে বললো, 'আমাল হাল্ ? ছোঁনার হাল ?' উঠোন জুড়ে মেয়ের কী নাচ।

বিকেলের দিকে কী খেয়াল হলো, মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে চললো শিবগঞ্জের গাজনের মেলায়। সঙ্গে নিল রামকে। এবারেও যাত্রার পালা গান ছিল। কিন্তু কান্ত মেয়েকে নিয়ে রাত জাগবে না। একবার শিব দর্শন করে, মাথায় জল বেলপাতা দিয়ে চলে আসবে। আর মেয়েরও মেলা দেখা হবে। আসলে কান্তর অবচেতন মনে হয়তো কোনো একটা প্রত্যাশা ছিল। এক বছর বাদে আবার সেই সংক্রান্তি। আবার নতুন কিছু কি ঘটবে ? অবিশ্যি মেয়েকে নিয়ে সেই পথে যেতে কান্তর মনে একটা ভয়ের ভাবও ছিল। রামকে সঙ্গে নেবার কারণও তাই।

কান্ত মেয়েকে আর রামকে নিয়ে প্রায় সাঁঝবেলায় শিব মন্দিরের বিশাল চত্বরে পৌঁছুলো। নাটমন্দির আর চত্বর ছাড়িয়ে মেলার জায়গা। চত্বরে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে, যাত্রার আসর করা হয়েছে। এ বছরই শিবগঞ্জের গাঁয়ে প্রথম বিজলিবাতি এসেছে। চারদিকে দিনের আলোর মতো ফটফট করছে।

নাটমন্দিরে আর মূল মন্দিরের কাছে মেয়েদের ভিড়ই বেশী। পুরুষের পক্ষে মেয়েদের ভিড় ঠেলে এগোনো প্রায় অসম্ভব। তার ওপরে এই ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে কান্ত যেতে সাহস পেলো না। হঠাৎ নাটমন্দিরের এক পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, 'আরে, ওহে, তুমি শালফুলি গাঁয়ের কান্ত কামার না ?'

কান্ত পাশ ফিরে তাকালো। নাটমন্দিরের একটি থামের পাশে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের ধোপদুরস্ত পোশাক-আসাক দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা বিশেষ সম্পন্ন মান্যগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু কে যে কান্তকে ডাকলেন, সে বুঝতে পারলো না। অবাক্ চোখে সকলের মুখের দিকেই তাকালো।

একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক, গরদের পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি-পরা যুবা পুরুষকে দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের খোকাবাবু তোমাকে ডাকছেন, এদিকে একবার এসো।'

কান্ত অবাক্ হলো। খোকাবাবু। মানে শিবগঞ্জের জমিদার বাড়ির ছেলে বলে যে পরিচিত ? যুবককে তার চেনা চেনা লাগলো। অনেকবারই দেখেছে। কিন্তু অনেক কাল আগে। সে কেন একজন সামান্য কামারকে ডাকছে ? নামটাই বা মনে রাখলো কেমন করে ?

কান্ত পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল। মেয়েকে কোলে জড়িয়ে রেখেই দুহাত এক করে সকলের উদ্দেশে কপালে ছোঁয়ালো। যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো,

boiRboi.net

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি শালফুলির কান্ত কামার।'

কান্ত জানে, গোটা শিবগঞ্জ শিবের দেবোত্তর গ্রাম। জমিদারি নেই বটে, শিবগঞ্জের চাটুয্যেদের এখনো বিস্তর ধনসম্পত্তি। আর এই খোকাবাবুই এখন একমাত্র বংশধর, যে সব কিছুর অধিকারী। বললো, 'তোমাকে অনেককাল আগে দেখেছি বটে, তবে আমার ঠিক মনে আছে, তাই না?'

কান্তকে সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বীকার করতে হলো, 'আজ্ঞে তাই তো দেখছি বাবু। আপনার দয়া।'

যুবকের বিস্মিত কৌতূহলিত এবং তীক্ষ্ণ চোখ, কান্তর কোলের মেয়ের দিকে। চৈতির সেদিকে বিশেষ নজর নেই। ও দেখছে চারদিকের আলো, লোকজনের ভিড়। যুবক বললো, 'মিথ্যে অভিযোগে তোমার একবার জেল হয়েছিল না?'

কান্ত সরলভাবেই বললো, 'আজ্ঞে। শাস্তি যখন হয়েছে, তার আর সত্যিমিথ্যা কী বলবো বাবু?'

'তা বটে, তা বটে।' যুবক বললো, 'আমি খবরটা শুনেছিলাম। তা তুমি বে থা করলে কবে?'

কান্ত বললো, 'বেথা আমার হয় নি বাবু।'

'সে কি হে, তবে এমেয়ে কার?' যুবক অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কান্ত পুলিসকে যা বলেছিল, যুবককেও সংক্ষেপে তাই বললো। যুবক কান্তর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কান্ত কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলেও চোখ মুখের অভিব্যক্তি নির্বিকার রাখলো। সেও যুবকের চোখে চোখ রেখে কথা বললো।

যুবককে দেখে বয়স তিরিশের বেশী মনে হয় না। হেসে বললো, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! কার মেয়ে, কিছুই হদিস করতে পারলে না?'

'আজ্ঞে না।' কান্ত বললো, 'পুলিসও চেষ্টা করেছিল, পারে নি।'

যুবকের আশেপাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু বর্ষীয়ান একজন বলে উঠলেন, 'কার পাপের বোঝা কে কামারের দরজায় ফেলে গেছে, কে বলবে?'

সবাই হেসে উঠলেন, যুবক ছাড়া। তার ফরসা মুখ হঠাৎ যেন উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে হেসে চৈতিকে দেখে, কান্তকে বললো, 'মেয়েটি পেয়ে তা হলে তুমি খুশী বলো?'

'খুশীর কথা আর কী বলবো বাবু?' কান্ত বললো, 'আমার অবস্থা না-বিইয়ে কানাইয়ের মায়ের মতন। প্রথম প্রথম ভারী ঝামেলা মনে হতো। তারপরে মায়া পড়ে গেল। এখন আর আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারি না। মেয়েও আমাকে আড়াল করতে পারে না।'

যুবক চৈতিকে বারে বারে দেখলো। কান্ত গর্বভরে মেয়েকে দেখলো, আর এই মুহূর্তে মেয়ের দিকে তাকিয়েই তার মনটা হঠাৎ কেমন চমকে উঠলো। সে শিবগঞ্জের খোকাবাবুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। খোকাবাবুও তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো। এই দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে চকিতেই যেন দুজনের চোখে একটা রহস্যের ঝিলিক খেলে গেল। যুবক হঠাৎ হেসে বললো, 'তা যাত্রার

পালা দেখে যাবে তো ?’

‘আজ্ঞে তা এসেছি যখন, পালা দেখেই যাবো।’ কান্ত নিমেষের মধ্যে মিথ্যা কথা তৈরি করে বললো।

কান্তর পাশ থেকে রাম কিছু বলে ওঠার উদ্যোগ করতেই, কান্ত তার দিকে ফিরে বললো, ‘চল্ রে রাম, আগে থেকে ভালো জায়গা নিয়ে বসে যাই। নইলে সামনে বসতে পাবো না।’

রাম স্বভাবতই অবাক্ হলো। কারণ সে জানে, শিব দর্শন করে মেলা ঘুরে ফিরে যাওয়া হবে। যাত্রা দেখার কোনো কথাই ছিল না। বাবুদের একজন বলে উঠলেন, ‘তবে যেই তোমার ঘাড়ে মেয়েকে চাপিয়ে রেখে যাক, মেয়েটি দেখতে ভারী সুন্দর। বয়সকালে রূপসী হবে।’

কান্ত কৃতজ্ঞ হেসে বললো, ‘আপনারা দশজনে আশীর্বাদ করুন বাবু, মেয়ে যেন আমার বেঁচে থাকে। তবে কামারের ঘরের মেয়ে বাবু, বেশী রূপ থাকা ভালো না।’

যুবক বললো, ‘এখন না হয় কামারের ঘরের মেয়ে, হয়তো কোনো বড় ঘরেই জন্মেছিল।’

‘তা হতে পারে বাবু।’ কান্ত বললো, ‘ঘর বড় হোক আর ছোট হোক, তাদের মন হলো পিশাচের। নইলে এমন দুধের শিশুকে কেউ অমন করে ফেলে যায় ? এ তো মারবার ফাঁদ আর ফন্দি ছাড়া কিছু না।’

শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির ছেলের মুখে, জমিদারী রক্তের ঝলক লাগলো। ঝলক লাগলো চোখেও, কিন্তু হেসে বললো, ‘তা যা বলেছো।’

কান্ত আবার দু হাত কপালে ছুঁইয়ে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বললো, ‘যাই বাবুরা। একটু বাবাকে দর্শন করে যাত্রার আসরে জায়গা নিয়ে বসবো।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।’ যুবক ছাড়া সকলেই সম্মতি দিলেন।

কান্ত মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার মনের ভিতরে যেন একটা ঝড় চলছে। সে যেন নতুন চোখে চৈতির মুখের দিকে বারে বারে দেখতে লাগলো। রাম বললো, ‘হ্যাঁ গ কান্তদা, মেয়ে নিয়ে বসে তুমি সারা রাত যাত্রা দেখবে ?’

কান্ত ভিড়ের মাঝখানে ভিড়ে গিয়ে একবার পিছন ফিরে বাবুদের দিকে দেখলো। যুবক তখনো তাকেই লক্ষ্য করছিল। যদিও ভিড়ের মধ্যে কান্তকে সঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। কান্ত মন্দিরের জমাট ভিড়ের মধ্যে ঠেলে ঢোকবার আগে মেয়েকে কাঁধে তুলে নিয়ে রামকে বললো, ‘যা মনে এলো, তাই বলে দিলাম। যাত্রা-টাত্রা কিছুই দেখবো না। একবার বাবাকে দর্শন করে মেলা থেকে চৈতির জন্য দু একটা খেলনা কিনে এখুনি গাঁয়ে ফিরে যাবো।’

চৈতি কান্তর ঘাড়ের ওপর দোল খেয়ে, হেসে, শূন্যে হাত ছুঁড়ছিল। ওর মজা লেগেছে। যথেষ্ট কষ্ট করে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে শিবলিঙ্গের কাছে গিয়ে পয়সা দিয়ে স্পর্শ করে, চৈতির মাথায় আর নিজের মাথায় ছুঁইয়ে বেরিয়ে এলো। নাট-মন্দিরের এক পাশের ভিড় থেকে বাবুদের দিকে তাকালো। দু একজন বাবু ছাড়া যুবকসহ সকলেই তখন চলে গিয়েছে।

boiRboi.net

কান্তর মনে কেমন একটা উদ্বেগ বোধ জাগছে। সে চৈতিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি মেলার দিকে এগিয়ে গেল। গ্যাস বেলুন থেকে শুরু করে ন্যাকড়ার তৈরি রঙীন হাতিঘোড়া, চৈতির পছন্দ অনুযায়ী সব কেনা হলো। তারপরে এক ঠোঙা গরম জিলিপি কিনে শিবসাগর নামে সরোবরের পাড়ের গাছপালা ঘেরা অন্ধকার পথ দিয়ে গ্রামের পথে ফিরে চললো।

রাম এতক্ষণ পরে না জিজ্ঞেস করে পারলো না, 'কী হয়েছে বলো তো কান্তদা? তুমি এত তাড়াহুড়ো আরম্ভ করে দিলে কেন?'

'এমনি, ভালো লাগছে না।' কান্ত নিচু স্বরে জবাব দিল। কিন্তু তার স্বরে উদ্বেগ চাপা থাকলো না।

★

কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর রাত। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার। ছায়া-পথ আর নক্ষত্ররাজি কালো আকাশের পটে উজ্জ্বলতর। গত বছরের মতো মেঘের কোনো লক্ষণ নেই। গাছপালা বাতাসে দুলছে, পাতায় ঝরঝর শব্দ। কোথায় একটা রাতজাগা পাখি ডেকে চলেছে।

শিবগঞ্জের বাইরে কিছুদূর আসার পরেই পথের কিছু দূরে কয়েকটি মানুষের ছায়া দেখা গেল। কান্ত থমকিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে তীক্ষ্ন চোখে লক্ষ্য করে দেখলো, গোটা চারেক ছায়ার মতো মানুষ। দুজনের হাতে লাঠি। কান্ত দাঁড়িয়ে পড়তে ছায়াগুলো এগিয়ে আসতে লাগলো।

কান্ত যেন এরকমই একটা আশঙ্কা করেছিল। তবু সংশয় নিয়ে সেও কয়েক পা অগ্রসর হলো। ছায়া কয়টি কাছাকাছি হতেই একজন বলে উঠলো, 'শোন কান্ত কামার, আর এক পাও এগোবে না, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও। মেয়েটাকে আমাদের হাতে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো গাঁয়ে ফিরে যাও।'

কথাগুলো যে বলছিল, তার হাতে একটা লাঠি। কান্ত ঝটিতি পিছন ফিরে রামের কোলে চৈতিকে দিয়ে বললো, 'ধর তো মেয়েটাকে।'

রাম মেয়েকে ধরতেই ছায়ার হাতের লাঠি শূন্যে উঠলো। কান্ত কোনো অবকাশ না দিয়েই লোকটার ওপর ক্ষ্যাপা মোষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা লাঠিসুদ্ধ রাস্তার ধারে ছিটকে পড়লো। এক পলকও না থেমে, কান্ত বাকী তিনজনের একজনের তলপেটে লাথি, আর একই সঙ্গে আর একজনের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুষি মারলো। তার পরেই অন্যজনের হাতের লাঠিটা, তার বিভ্রান্তির অবকাশে ছিনিয়ে নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে সবেগে ঘুরিয়ে এনে কাঁধের ওপর আঘাত করলো। চিৎকার করে বললো, 'রাম, তুই মেয়ে নিয়ে গাঁয়ের দিকে দৌড়ো, ভয় পাস নে।'

চৈতি ততক্ষণে ভয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। হাত পা ছুঁড়ে 'বাবা বাবা' বলে ডাকছে। রাম কান্তর নির্দেশ মতো চৈতিকে নিয়ে ছুটলো। কান্ত লাঠি ঘুরিয়ে হাঁক দিলো, 'আয়। কে মায়ের দুধ খেয়েছিস, কতো বড় বাপের ব্যাটা। সব ক'টাকে আজ শেষ করবো।' সে বিদ্যুৎবেগে লাঠি ঘুরিয়ে চারজনের দিকে ছুটে গেল। একটা মাথায় আঘাত লেগে ছিটকে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলো।

boiRboi.net

যার হাতে লাঠি ছিল, সে আবার উঠে আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই কান্ত সোজা তার কনুইয়ের ওপর আঘাত করলো। কিন্তু লাঠিটা ছিটকে পড়লো সপাটে তার ঘাড়ের ওপর। আঘাত সহ্য করে লাঠি ঘুরিয়ে সে বাকী দুজনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কনুই ভাঙা লাঠিধারী লাঠিহীন হয়ে বসে পড়েছিল। একজন শিবগঞ্জের দিকে দৌড় লাগাতেই বাকীরাও সে উদ্যোগ করলো। কান্ত তাড়া করে হাঁকলো, 'শালারা যাচ্ছিস কোথায়? মেয়ে নিবি, আয়?'

মেয়ে নেবার থেকে প্রাণে বাঁচবার তাগিদই তাদের বেশী ছিল। অতএব তারা নিমেষে অন্ধকারে মিশে গেল। কান্ত জানে, ওরা মেয়ে নিতে আসে নি। নিয়ে প্রাণে মেরে ফেলবার মতলব নিয়ে এসেছিল, কিন্তু একলা লাঠি হাতে সে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস পেলো না। রাম আর চৈতিকে ধরার জন্য গ্রামের পথে ছুটে গলা চড়িয়ে ডাকলো, 'রাম। অরে রাম!'

দূর থেকে চৈতির কান্নার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে রামের জবাব ভেসে এলো, 'হ্যাঁ গ কান্তদা।'

'ভয় নেই, আমি এসে পড়েছি।' কান্ত ছুটতে ছুটতে বললো, 'থামিস না, দৌড়ুতে থাক।'

কান্ত লাঠি হাতে ছুটতে ছুটতে রামকে ধরে ফেললো। আগে হাত বাড়িয়ে চৈতিকে কোলে নিল। চৈতি ভয়ে কান্তর গলা জড়িয়ে ধরে আরো জোরে কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু ওর গলা শুকিয়ে গেছে, কেবল কান্নার হিক্কা উঠছে। কান্ত চৈতির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'এই তো আমি এসে পড়েছি মা, আর তোর কোনো ভয় নেই। ডাকাতগুলোকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

রাম বললো, 'কিন্তু বেলুন খেলনাগুলো বেবাক পড়ে গেছে গ কান্তদা।'

'যাগ গিয়ে।' কান্ত বললো, 'মেয়েকে আমি আবার কালই বেলুন আর খেলনা এনে দেবো।' বলে মেয়েকে মুখে মাথায় চুমো খেয়ে আদর করতে লাগলো, 'চুপ করো মা, আর কিছু ভয় নেই।'

চৈতি কথঞ্চিৎ ধাতস্থ হলো। রাম বললো, 'শালারা কারা গ কান্তদা? ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার কী কে জানে?' কান্ত গম্ভীর স্বরে বললো, 'তবে এ সব কথা এখন যেন পাঁচ কান করিস না। ব্যাপারটা আগে আমি বুঝে নিই, তারপরে দেখা যাবে।'

কান্তর চোখের সামনে ভাসতে লাগলো শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির ছেলের মুখ। অন্ধকারের বুকে শালফুলি গ্রামের গৃহস্থদের ঘরের আলোর বিন্দু ফুটে উঠলো।

☆

ঘটনার পরের দিনই সকালে কান্ত রামকে পাঠালো শিবগঞ্জে। বলে দিল, হাতে মুখে মাথায় চোটলাগা কোনো লোক দেখতে পেলে, তার পরিচয় জানবার চেষ্টা করবে। কিন্তু রাম নিজে যেন ধরা না পড়ে। কান্ত নিজে হয়ে উঠলো সাবধানী আর সচেতন, বাঘিনীর মতো সন্তানের পাহারায় অতন্দ্র। তার চোখের সামনে বার বার জেগে উঠতে লাগলো চৈতির মায়ের মৃতদেহ। এলোকাল তার মনে

boiRboi.net

একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, চৌতির মা হয়তো কোনো কলঙ্কের কারণে আত্মহত্যা করেছিল। অথবা কোথাও মেয়ে কোলে পালাতে গিয়ে ঝড়ের মধ্যে গাছ চাপা পড়ে মরেছিল। হত্যার সন্দেহও যে ছিল না, এমন না। কিন্তু বছর ঘুরে যাওয়ায় এবং চৌতির মায়ের বা চৌতির কেউ সন্ধান না করায় সে-সন্দেহ অনেকটা কেটে এসেছিল।

কান্ত এখন সন্দেহের উর্ধ্বে,—চৌতির মাকে হত্যা করাই হয়েছিল। চৌতিও মরে যাবে, শেয়াল কুকুরে মেরে ফেলবে, এটাই হত্যাকারীর আশা ছিল। আশায় বাদ সেধেছিল কান্ত। হয়তো হত্যাকারী সেই ঝড়ের রাত্রের অন্ধকারে কান্তকে আসতে দেখে ভেঙে পড়া গাছেরই আশেপাশে কোথাও লুকিয়েছিল। দেখেছিল কান্তর কাজ। অবিশ্যি এটা কান্তর অনুমান মাত্র। চৌতির মায়ের হত্যাকারী কান্তকে মেয়ে নিয়ে চলে যেতে দেখলে, এক বছর কি চুপ করে থাকতো ?

বোধ হয় না। তা হলে সে কান্তর ওপর আগেই হামলা করতো। কিন্তু হত্যাকারী শিবগঞ্জের মানুষ হয়ে শালফুলি গ্রামের এমন একটা খবর জানবে না, তা-ইবা কেমন করে হয় ? খবর হয়তো জানতো, একটা ভালো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আজকেই তার বা তাদের পক্ষে সব থেকে ভালো সুযোগ ছিল। তবে তারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। কান্ত চৌতিকে নিয়ে শিবগঞ্জে যাবার পরেই তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। কান্তর মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, চৌতিকেও তারা এই জগৎ থেকে সরাতে চায়।

কান্ত দূরে খেলারত চৌতির দিকে তাকাতেই তার বুকটা প্রথমে ভয়ে কেঁপে উঠলো। তারপরে একটা অসহনীয় কষ্টে বুকটা টনটনিয়ে উঠলো এবং কষ্টের ভিতর দিয়েই তার দুই চোখ ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলে উঠলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, 'কান্ত কামার বেঁচে থাকতে চৌতিকে এক ভগবান ছাড়া কেউ সংসার থেকে সরাতে পারবে না। আমার চৌতিকে যে এ জগৎ থেকে কেড়ে নিতে চায়, আজ থেকে আমি তাকে ছায়া হয়ে খুঁজে ফিরবো।'

তাঁতী খুড়ী দেওয়ালহীন রান্নাঘরের চালা থেকে কান্তকে লক্ষ্য করছিল। কঠিন মুখে তাকে বিড়বিড় করতে দেখে তাঁতী খুড়ীর চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠলো। আজ পয়লা বৈশাখ। কামারশালায় এখনো কোনো কাজ শুরু হলো না। রামও সাত সকালেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে। এখনই কামারশালায় লোকজন আসবে। ঠাকুরমশাই পুজো করতে আসবেন। সেই রাত্রের অন্ধকার থাকতে তাঁতী খুড়ী আজ কাজে এসেছে। অবিশ্যি কামারের ঘরে এটা বড় কোনো উৎসব না। সামান্য গদিপুজো মাত্র। বিশ্বকর্মা পুজোই আসল। কিন্তু কান্তর ভাবসাব তাঁতী খুড়ীর মোটেই ভালো লাগছে না। মনের মধ্যে অস্বস্তিতে ভরে উঠছে।

তাঁতী খুড়ীর গত বছরের এই দিনটির কথা মনে পড়ছে। গত বছরে এই দিনটিতে রাত পোহাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল এই চৌতিকে নিয়ে। অনেক বেলায় নামে মাত্র গদিপুজো হয়েছিল। তাঁতী খুড়ী চুপ করে থাকতে পারলো না, কাছে এসে বললো, 'হ্যাঁ বাবা কান্ত, কী হয়েছে বলো দিকিনি বাপু ? তোমার

boiRboi.net

ভাবসাব আমার মোটে ভালো লাগছে না। কিছু গোলমাল টোলমাল হয়েছে নাকি ?'

কান্তর চমক ভাঙলো, যেন আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠে বললো, 'না না, গোলমাল আবার কিসের ?'

'গোলমাল যদি না থাকবে তো, এখনো কামারশালায় গেলে না ?' তাঁতী খুড়ী সন্দিগ্ধ স্বরে বললো, 'সাত সকালে রামকে কোথায় পাঠিয়ে দিলে। চুল্লীতে আগুন পড়লো না। ঠাকুরমশাই আসবেন গদি পুজো করতে।'

কান্ত বললো, 'রামকে একটা কাজে এক জায়গায় পাঠিয়েছি। আমিই যাচ্ছি কামারশালে।'

উঠোনের এক প্রান্তের ছায়ায় চৈতি তখন কালোর ঘাড়ে চাপবার চেষ্টা করছে। কালোর অস্বস্তি, তাই বারে বারে ল্যাজ নাড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ছে। চৈতিও সেই সঙ্গে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। আবার সেই হাত দিয়েই কাছে রাখা কাঁসার বাটিতে আখের গুড়ের রস দিয়ে মাখা মুড়ি মুঠি ভরে মুখে পুরছে, কালোকেও দিচ্ছে।

চৈতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কান্তর চোখের সামনে আবার শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির ছেলের মুখটি ভেসে উঠলো। তার দুই চোখের পাতা নিবিড় হয়ে উঠলো। বারে বারে দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ঝিলিক হেনে গেল। মনে মনে ভাবলো, এও কি সম্ভব ?

কিন্তু কান্ত আপাতত মনের বিস্ময় দমন করে কাজে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলো। যদিও তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সদা সতর্ক জাগ্রত হয়ে রইলো। সে ডাকলো, 'চৈতি।'

'বাব্বা!' চৈতি আদুরে স্বরে জবাব দিয়েই টালমাটাল পায়ে কান্তর কাছে ছুটে এলো।

কান্ত তাকে কোলে তুলে নিল। বললো, 'চল্ মা, আমরা কামারশালে যাই। অনেক কাজ। তুই আমার কাছে থাকবি।' বলে সে এগিয়ে কাঁসার মুড়ির বাটি তুলে নিয়ে ডাকলো, 'কালো, আয়।'

কালো এক পায়ে না, চার পায়ে খাড়া। কান্ত কামারশালায় গিয়ে চৈতিকে এক জায়গায় বসিয়ে কালোকে বললো, 'কালো, বোনকে ছেড়ে কোথাও এক পা নড়বি না।'

কালো কান খাড়া করে প্রভুর কথা শুনলো। তারপরে চৈতির পাশে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসলো। কান্ত আগেই কাঠকয়লার ঝুড়ি টেনে নিয়ে হাপরের চুলোয় আগুন দিতে বসলো। ইতিমধ্যে লোকজনও আসতে আরম্ভ করলো। তাঁতী খুড়ী ফুল বেলপাতার সাজি, সিঁদুরগোলা আর দইয়ের পাত্র এক কোণে রেখে গেল। আবার ফিরে এলো একটি বঁটি, কলাপাতা আর শসা নিয়ে। সেসব রেখে, নিয়ে এলো বাতাসা আর নকুলদানার ঠোঙা। চুল্লীতে ধোঁয়া দেখা দিল। কান্ত হাপরে টান দিল।

ঠাকুরমশাইয়ের আসতে দেরি হলো না। আজ পাইকারী হারে ঘরে ঘরে

boiRboi.net

পুজো। যৎসামান্য সময়ের মধ্যেই পুজো শেষ। প্রসাদ বিতরণ পর্বের সময়েই রাম ফিরে এলো শিবগঞ্জ থেকে। কান্ত তাকে চোখের ইশারায় চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিয়ে বললো, 'নে, পুজোর পেসাদ পেয়ে কাজে লেগে পড়।'

তখনো কয়েকজন কামারশালে বসেছিল। কান্তকে নিবিষ্ট হয়ে কাজ করতে দেখে একে একে সবাই বিদায় নিল। এ সময়টা কৃষকদের সময় কিছুটা ফাঁকা যায়। সেচের জলের থেকেও বৃষ্টির ওপরেই সকলে বেশী নির্ভরশীল। যতোদিন বৃষ্টি না হচ্ছে ততোদিন মাঠের দিকে যাবার তেমন তাড়া নেই।

সবাই চলে যাবার পরে কান্ত রামের দিকে তাকালো। রাম বললো, 'কান্তদা, তুমি ঠিক সন্দেহ করেছিলে গ। কালকে রাতের ডাকাতগুলো শিবগঞ্জের লোকই বটে।'

'কী করে জানলি?' কান্ত ব্যগ্র ব্যস্ততায় তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রাম বললো, 'তোমার কথা মতন তো শিবগঞ্জে গেলোম। কিন্তু তুমি বলে দিয়েছিলে, কারোকে যেন কিছু জিজ্ঞেস না করি। আমিও কারোর কাছে মুখটি খুলি নি। মেলা দেখতে গেছি, এমনি করে চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। সকালবেলার মেলা ফাঁকা। বাইরের যতো লোক এসেছে, সব শিবদীঘিতে চান করে মন্দিরের সামনে ভিড় জমিয়েছে। তা, আমার কেমন মনটা শিবগঞ্জের বাগদীপাড়ার দিকে টানলো।'

'কেন বল্ তো?' কান্ত অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রাম বললো, 'শিবগঞ্জের বাগদীদের লেঠেল বলে খুব নামডাক আছে না? কাল রাতের লোকগুলানও তো লাঠি নিয়েই এসেছিল!'

'বাহ্! বাহ্ রে রাম! তোর এতো বুদ্ধি?' কান্ত চমৎকৃত হয়ে, রামের পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তারপর?'

রাম বললো, 'বাগদীপাড়ায় ঢুকতে একটু ভয় ভয় লাগছিল। কিন্তু এখন তো শিবগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় বাইরের লোকের ভিড়। মেলা এখনো দুদিন থাকবে। আমি একটা অচেনা আন্কা বাইরের ছেলে, বাগদী পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। ঢোকার মুখেই পাড়ার শেতলা ঠাকুরুনের তলায় দেখি জটলা হচ্ছে। কান খাড়া করে তাদের কথা শুনলাম। কথা শুনেই বুঝলাম, পাড়ার কয়েকজন নাকি কাল রাত্রে ডাকাতের হাতে পড়ে মার খেয়েছে। নিজেদের মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেছে। কথাবার্তায় বেজায় গরমাগরমি। একদল বলছে, ডাকাতিটা হলো কোথায় যে, হাত পা ভেঙে, মাথা ফাটা নিয়ে ফিরে এসেছে? অন্য দল বলছে, ওসব নিজেদের মধ্যে আকচা-আকচির ব্যাপার। বাগে পেয়ে পিটিয়ে মেরেছে। যারা মার খেয়েছে, তাদের দুজনের নামও কানে এলো। একজন কেতু, আর একজন ভোলা। তাদের হাসপাতালে পাঠাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শিবগঞ্জের বাবুদের বাড়ির ডাক্তারই নাকি কাল রাত্রে তাদের দেখেছে।'

'শিবগঞ্জের বাবুদের বাড়ির ডাক্তার?' কান্তর দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'মানে কালকের নাটমন্দিরে যে খোকাবাবুর সঙ্গে দেখা হলো, তেনাদের বাড়ির

boiRboi.net

ডাক্তার ?'

রাম বললো, 'শিবগঞ্জের বাবু বলতে তো তেনাদেরই বোঝায়।'

কান্তর মুখ শক্ত হলো, চোখের পাতা নিবিড়তর। কপালে কতগুলো ভাঁজ পড়লো। বললো, 'শোন রাম, আজ থেকে তুই আমার কাছেই থাকবি, আর বাড়িতে থাকবি না। দিনের বেলা এক আধবার গিয়ে দেখা করে আসবি। তুই তো আর বে থা করিস নি, বউ ছেড়ে থাকতে হবে না। থাকবি তো ?'

রাম হেসে বললো, 'গুরুর হুকুম কখনো অমান্যি করতে আছে ?'

কান্ত রামের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'তুই-ই আজ গুরুর কাজ করে এসেছিস। তুই বলেই পেরেছিস, আমার দ্বারা হতো না।'

ইতিমধ্যে চৈতি কামারশালের এক পাশে মাটির মেঝেয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে কালোও চোখ বুজে পড়ে আছে। কান্ত বললো, 'যাই, মেয়েটাকে চান করিয়ে খাইয়ে শুইয়ে দিয়ে আসি।'

★

কান্ত বুঝলো, একটা লড়াই আসন্ন। আক্রমণটা কখন কোন্ দিক দিয়ে আসবে, সেটাই ভাবনার কথা। কিন্তু চৈতির দিকে বাঘিনী-তীক্ষ্ন-দৃষ্টি, সজাগ সে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। রাত্রে কামারশালে রাম ঘুমায়। সে নিজে চৈতিকে নিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে শোয়। কালো সারা রাত্রি পাহারায় থাকে। কালো একবার ডেকে উঠলেই তার ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে জেগে থেকে উৎকর্ণ হয়ে বাইরের প্রতিটি শব্দ শোনে।

কান্ত এমনও আশঙ্কা করে, রাত্রে তার ঘরে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হতে পারে। যে কারণে সে একটা ঘরের দরজায় শিকল রাখলে, নিজের ঘরের দরজার শিকল খুলে দিয়েছে। পাছে কেউ বাইরে থেকে শিকল এঁটে বেরোবার পথ বন্ধ করে দেয়। কান্তর মনে কোনো সন্দেহ নেই, গভীর রাতে তার বাড়ির আশেপাশে একাধিক লোক ঘোরাফেরা করে। কালোর ক্ষিপ্ত আক্রমণোদ্যত চিৎকারেই তা বোঝা যায়। কালোকে মারবার চেষ্টাও যে হয়েছে, সে অনুমান করতে পারে। কিন্তু কালো যেমন চতুর, তেমনি ক্ষিপ্র। সাধারণ দেশী কুকুর হলেও সে শত্রুর প্রতি নেকড়ের থেকেও হিংস্র।

কিন্তু এভাবে দিন যাপন করা কঠিন। অথচ, কান্ত সহসা দশজনের কাছে মুখ খুলতেও পারছে না। পরিণতিতে নানা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। পুলিসও নিশ্চয় তার মধ্যে আবির্ভূত হবে। পুলিসের আবির্ভাবের অর্থই হলো টাকার খেলা। গরিব কামারকে নিয়ে টানাটানি। বিশেষ করে যে-কামার একবার নকল চাবি গড়িয়ে চুরির দায়ে জেল খেটে এসেছে।

তথাপি কয়েকটা মাস বেশ নিরুপদ্রবেই কাটলো। যদিও কান্ত সদা সতর্ক, কারণ তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সর্বদাই যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। এ অবস্থায় আষাঢ় মাসের এক সকালে শিবগঞ্জের বাবুদের বাড়ি থেকে একটি মাঝবয়সী লোক কান্তর সঙ্গে দেখা করতে এলো। লোকটিকে দেখে নিরীহ, ভদ্রগোছের কর্মচারী মনে হলো। লোকটি কোনো রকম ভণিতা না করেই কামারশালার সামনে দাঁড়িয়ে কান্তকে

বললো, 'আমি শিবগঞ্জের চাটুয্যেবাড়ি থেকে আসছি। আগে হলে জমিদারবাড়ি বলতাম, কিন্তু এখন তো আর জমিদার নেই। ধরো গিয়ে বাবুদের বাড়ি থেকে আসছি।'

কান্ত লোকটির চোখের দিকে তাকিয়েছিল। সে তখন রামকে নিয়ে গরুর গাড়ির চাকার লোহার পাত পেটাচ্ছিল। রামের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে বললো, 'তা, কার খোঁজে এসেছেন, তা তো বললেন না?'

ধুতি আর ফতুয়া পরা লোকটি হেসে বললো, 'তোমার দরজার সামনে এসে যখন দাঁড়িয়েছি, তখন তোমার খোঁজেই নিশ্চয় এসেছি। আমার নাম ভবতারণ চক্রবর্তী। অম্বরবাবুর খাস কাজ করি, হিসাবপত্র দেখাশোনার কাজ।'

'অম্বরবাবু কে?' কান্ত জিজ্ঞেস করলো।

ভবতারণ হাসলো। একটু যেন অবাক্ হয়ে বললো, 'সে কি হে কান্ত! তুমি শালফুলির লোক, আর শিবগঞ্জের অম্বরনাথ চাটুয্যের নাম শোনো নি? চাটুয্যে-বাড়ির উনিই তো এখন একমাত্র বংশধর, সবাই খোকাবাবু বলে ডাকে।'

কান্ত তা অনুমান করেই নিয়েছিল। রামের দিকে ফিরে বললো, 'চক্কোত্তিমশাইকে একটা বসবার জায়গা দে।'

চৈতি তখন কামারশালারই এক পাশে, কান্তর বন্ধু এবং প্রতিবেশী বৈদ্যনাথের তিন বছরের ছেলের সঙ্গে খেলা করছিল। তাদের সঙ্গী ছিল কালো। কান্ত লক্ষ্য করে দেখলো, এবং মনে মনে অবাক্ হলো, ভবতারণ চৈতির দিকে তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখলো না। নির্বিকারভাবে এক আধবার দেখলো মাত্র। কালো গায়ের লোম ফুলিয়ে গরগর করে উঠলো। কান্ত বললো, 'চুপ কর কালো।'

কামারশালায় ভদ্রগোছের লোকদের বসতে দেবার জন্য দুটি বাঁশের কাঠির মোড়া ছিল। রাম তারই একটি ভবতারণকে বসতে দিল। ভবতারণ কামারশালার ভিটায় উঠে মোড়ায় বসলো। কান্ত ঔৎসুক্য, উৎসাহ বা নির্বিকারত্ব, কিছুই দেখালো না। রামকে বললো, 'হাতুড়ির কাজ এখন রাখ্, কথা সেরে নিই।'

'কথা এমন বিশেষ কিছু না।' ভবতারণ বললো, 'আমাকে খোকাবাবু পাঠালেন তোমার কাছে। উনি তোমার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চেয়েছেন।'

কান্ত অবাক্ হবার ভান করে বললো, 'কেন বাবু শিবগঞ্জের খোকাবাবু আমার মতন লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান কেন? কাজের জন্য?'

'কাজের জন্য?' ভবতারণের কপালে চিন্তার রেখা ফুটলো, 'হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই কোনো কাজের জন্য ডেকেছেন, তা নইলে আর তোমাকে ডাকবেন কেন?'

কান্ত অবাক্ হেসে বললো, 'কাজের মধ্যে তো কামারের কাজ ছাড়া কিছু জানি না। শিবগঞ্জে আমার থেকে ভালো কামার আছে।'

ভবতারণও হাসলো। 'সেটা ঠিক কথা বললে না হে কান্ত! শালফুলির কামারদের কাজের কথা সবাই জানে। তোমার হাতের কাজের বেশ নাম আছে।'

কান্ত জিজ্ঞেস করলো, 'তা হলে আমাকে দিয়ে কামারের কাজ করাবেন বলেই খোকাবাবু আপনাকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছেন?'

ভবতারণের কপালে আবার সর্পিল রেখা ফুটে উঠলো, বললো, 'তা তো আমি

boiRboi.net

বলতে পারবো না। আমাকে তোমার কাছে পাঠালেন, বলতে বললেন, পারলে তুমি আজই আমার সঙ্গে একবারটি চলো। উনি তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চেয়েছেন। এর বেশী আমি কিছু জানি না। আর এর বেশী আমাদের মতন লোকের জানতেও নেই।'

কান্ত ভবতারণের চোখের দিকে তাকালো। লোকটি হয় নিরীহ ভালো মানুষ, কিছুই জানে না। অন্যথায় শয়তানের শিরোমণি। চোখমুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। আবার রামের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, খোকাবাবু আর একটা কথাও বলে দিয়েছেন। খবরটা পাঁচ কান না হলেই ভালো হয়। কথাবার্তা যা কিছু, তোমাতে খোকাবাবুতেই হবে।'

কান্ত মনে মনে ভাবলো, তা না হলে আর কান্ত কামারকে ডেকে গুম খুন করা যাবে কেমন করে? হেসে বললো, 'তা বাবু, পাঁচ কানের মধ্যে দু কান তো হয়েই গেল। আপনার আর আমার এই রামের।'

ভবতারণও হাসলো, 'তা একরকম ভালোই বলেছো। কিন্তু আমি হলাম খোকাবাবুর লোক। আর ও হলো তোমার নিজের লোক। পাঁচ কান বলতে বোঝায়, বাইরের লোকদের কথা।'

কান্ত এক মুহূর্ত ভাবলো। পিছন ফিরে একবার চৈতিকে দেখলো। তারপরে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে বললো, 'শিবগঞ্জের বাবুদের বাড়ির খোকাবাবু ডাকলে আমার না বলা চলে না। চোত সংক্রান্তির দিন বাবার নাটমন্দিরে ডেকে নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'তাই নাকি?' ভবতারণের অভিব্যক্তি ও স্বরে বিস্ময়।

কান্ত আবার তীক্ষ্ন চোখে ভবতারণের মুখের দিকে দেখে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনুন বাবু, আমি আপনার সঙ্গে রওনা হতে পারবো না। আপনি এগোন, আমি যাচ্ছি। যদি আজ না গিয়ে উঠতে পারি—বুঝতেই পারছেন, ঘরে আমি একলা লোক, তা নইলে কাল সকালে ঠিক যাবো।'

ভবতারণ অবাক্ হয়ে বললো, 'ও বাবা, তুমি যে কিছুই ঠিক করে বললে না হে। আজ যাবে, না কাল যাবে, কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'আজও যেতে পারি, কালও যেতে পারি।' কান্ত বললো, 'খোকাবাবুকে বলবেন, কথা যখন দিচ্ছি, তখন যাবোই। হয় আজ, না হয় কাল। আজ তৈয়ের হতে পারলে, আজ আপনার পিছু পিছুই যাবো। নয় তো কাল।'

ভবতারণ বললো, 'তোমার আবার তৈয়ের হবার কী আছে?'

কান্ত হাসলো। বললো, 'তা বাবু, আমাদেরও ঘরসংসার কাজকর্ম আছে। হুট্ করে বেরোব ভাবলেই কি বেরোন যায়? তবে যাবো। আপনি গিয়ে খোকাবাবুকে বলুন, আজ না হয় কাল যাচ্ছি।'

ভবতারণ গম্ভীর হলো। পরে একটু হেসে বললো, 'আগেকার দিনকাল হলে শিবগঞ্জের চাটুয্যেবাড়ির ডাক শুনলে লোকে মুখের ভাত ফেলে ছুটতো।'

'ভগবানের মার আর কাকে বলে বাবু।' কান্তও হাসলো, 'সে-অযোধ্যাও নেই, সে-রামও নেই। তবে দুঃখ করবেন না। আমি খোকাবাবুর অসম্মান করবো না।

boiRboi.net

বলেছি যেমন, ঠিক তেমনি যাবো। কিন্তু কোথায় যাবো? কোথায় ওঁর সঙ্গে দেখা হবে?'

ভবতারণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তা হলে তাই বলি গে খোকাবাবুকে। তুমি বাবুদের বাড়িতেই বারবাড়ির মহলে গিয়ে কারোকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।' কান্ত উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো।

ভবতারণ ছাতা হাতে নেমে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। কান্ত রামের দিকে ফিরে নীচু স্বরে বললো, 'বাড়ির পেছন দিয়ে বামুনপুকুরের পাড়ে গিয়ে দ্যাখ্ তো, লোকটি যায় কোন দিকে। যদি শিবগঞ্জের দিকে যায়, এ গাঁয়ের সীমানা অবধি দেখে আসবি। আর দেখবি, সঙ্গে আরো কেউ আছে কী না।'

রাম নিমেষে উধাও হলো। কান্ত ঝটিতি চৈতিকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে রান্নাঘরের চালায় তাঁতী খুড়ীর কাছে বসিয়ে দিয়ে বললো, 'চৈতি, খুঁয়ির কাছে (তাঁতী খুড়ীকে চৈতি আজকাল খুঁয়ি বলে ডাকে) একটু বোস তো মা, এখুনি আসছি।' বলে পিছনের ডোবার দিকে গিয়ে উত্তরদিক ঘুরে নিজের বাড়ির চারপাশে একবার পরিক্রমা করলো। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য করা যে ভবতারণের সঙ্গে আর কেউ এসে বাড়ির আশেপাশে ওঁত পেতে আছে কি না।

সন্দেহজনক কারোকেই চোখে পড়লো না, দু একজন প্রতিবেশী ছাড়া। কান্ত আবার কামারশালা হয়ে বাড়ির ভিতরে রান্নাঘরের চালায় ফিরে এলো। বৈদ্যনাথের তিন বছরের ছেলে বেলু আর কালোও সেখানে এসে গিয়েছে। আর রাজ্যের যতো উদ্বেগ আর ভয় তাঁতী খুড়ীর চোখে। উনুন থেকে রান্নার কড়া নামিয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে। কান্ত ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে কী?'

কান্ত হেসে বললো, 'ও কিছু না তাঁতী খুড়ী। মাঝে মাঝে ভুতে ঠ্যালা মারছে। ঝাড়ার দরকার।'

তাঁতী খুড়ী মোটেই আশ্বস্ত হলো না, বললো, 'কী জানি বাপু তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

কান্ত হাসতে হাসতে চৈতিকে ডাকলো, 'আয় রে বেটি। বেলু আয়, কালো আয়।'

কান্ত কামারশালার দিকে গেল, আর দুটি শিশু ও একটি কুকুর তার পিছনে চললো। কান্তর মুখ এখনো চিন্তাচ্ছন্ন। কামারশালায় এসেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। রামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। চৈতি বেলু নিজেদের খেলায় ব্যস্ত হলো। কালোও তাতে যোগ দিল।

রাম কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে জানালো, ভবতারণ শিবগঞ্জের দিকে চলে গিয়েছে। তার সঙ্গে কোনো লোক ছিল না।

কান্ত তৎক্ষণাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে চৈতিকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, 'ওরে বেলু, চল্ তোদের বাড়ি যাই। কালো তুই চল্। রামও চল্। বাড়ির ভেতর দিয়ে চল্, উত্তর দিক দিয়ে যাবো। খুড়ীকে বলে যাই, আর গায়ে জামাটা চাপিয়ে নিই।'

রাম ছাড়া অবাক হবার কেউ নেই। কিন্তু ও জানে, কান্তদাকে কিছু জিজ্ঞাসা

boiRboi.net

করা নিরর্থক। চৈতি বেলু বরং খুশী। কালো কুকুর হলেও প্রভুর আচরণে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। কান্ত সদলবলে ভিতরে গিয়ে ঘরে ঢুকে একটা জামা নিয়ে কাঁধে ফেললো। রান্নাঘরের চালার কাছে এসে বললো 'তাঁতী খুড়ী, কিছু ভেবো না। আমি এক জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসছি। ততক্ষণ চৈতি বৈদ্যনাথের বাড়ি থাকবে। রামও সেখানেই থাকবে। আমাকে যদি কেউ খোঁজখবর করতে আসে, বলে দেবে আমি কোথায় গেছি, তুমি জানো না। মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেছি।'

তাঁতী খুড়ী উদ্বেগে কিছু বলবার আগেই কান্ত সদলবলে পিছনের ডোবার ধার দিয়ে উত্তর দিক ঘুরে পুবের পাড়ায় বৈদ্যনাথের বাড়ি গেল। বৈদ্যনাথ বাড়িতেই ছিল! কান্ত গায়ে জামা চাপাতে চাপাতে বললো 'বৈদ্যনাথ, মেয়ে আর রাম, এরা তোমার ঘরে রইলো। কেউ কোথাও যেও না, আমি ঘুরে না আসা ইস্তক। চৈতি এখন তোমার বাড়িতেই খেলা করুক।'

চৈতি বায়না ধরবার উপক্রম করতেই কান্ত তাকে আদর করে ভুলিয়ে বললো, 'আমি একটা কাজ সেরে এখুনি আসবো মা। তুমি বেলু, কালো, রামের সঙ্গে খেলা করো।'

চৈতি ঘাড় কাত করে সম্মতি দিল, 'ঝপ্ কয়ে এচো।' অর্থাৎ 'ঝপ করে এসো।' চৈতি এখন এ রকম কথা বলতে শিখেছে। কান্ত মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বললো, 'আসবো মা, যদি প্রাণে বাঁচি।'

★

আষাঢ়ের আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। বাতাসও সামান্য আছে। তবু যেন মাটি থেকে এখনো উত্তাপ নির্গত হচ্ছে। কান্ত ঘামতে ঘামতে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে শিবগঞ্জের প্রাক্তন বিশাল জমিদারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। রোদের ঝাঁজ কিছু কম ছিল না। ঘামে ভিজে ওঠা ছাড়াও তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

কান্ত বারবাড়ি, কাছারিবাড়ি, সবই চেনে। এসব ছেলেবেলা থেকে চেনা। সে আশা করেছিল, পথের মাঝেই ভবতারণকে ধরে ফেলতে পারবে। পারে নি। ভবতারণকে সে পথে দেখতে পায় নি। বারবাড়ি মহলের দরজায় একজন গাট্টাগোট্টা চেহারার লোক বসেছিল। বিড়ি টানতে টানতে সে কান্তর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

কান্ত বললো, 'ভবতারণবাবুকে একটু খবর দেবে ভাই? বলবে শালফুলির কান্ত কামার এসেছে।'

লোকটা ভুরু কুঁচকে কান্তকে দেখে বললো, 'ভববাবু অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে! তোমার কী দরকার বলে যাও, তেনাকে বলে দেবো।'

কান্ত এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললো, 'উনি আমাকে খবর দিতে শালফুলি গেছলেন, খোকাবাবু নাকি আমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

লোকটা যেন হঠাৎ একটু চমকে উঠলো, আপন মনেই অবাক স্বরে উচ্চারণ করলো, 'খোকাবাবু!' তারপরে কান্তর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললো, 'কী নাম বললে তোমার? কান্ত?'

boiRboi.net

নিয়ে বসেছেন। কান্ত দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো।

অম্বরনাথ অনড় থেকেই বললো, 'বসো।'

কান্ত দরজা থেকে আর একটু ভিতরে ঢুকে, না বসে দাঁড়িয়েই বললো, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন খোকাবাবু?'

'তা ডেকেছি তো বটেই।' অম্বরনাথ হাসলো, যেন আঙুলের আংটি আর হীরের বোতামের মতোই হাসির ঝিলিক, 'তবে ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো আসবে না। এসেছো দেখে খুব খুশী হলাম। বসো তুমি, গালচেয় না, সোফাতেই বসো।'

কান্ত অম্বরনাথের ঈষদারক্ত চোখের দিকে দেখে ব্যস্তভাবে গালিচার ওপর বসে বললো, 'ওসবের ওপর বসতে পারবো না বাবু, ক্ষ্যামা করবেন। যার যেখানে জায়গা, সে সেখানে বসবে।'

অম্বরনাথ এবার একটু সোজা হয়ে বসে বললো, 'বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছা। তুমি যে এসেছো, এতেই আমি খুব খুশী। তা, যাকে দিয়ে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, সেই ভবতারণবাবুটি কোথায়?'

'আজ্ঞে তেনাকে আমি পথে দেখতে পাই নি।' কান্ত বললো, 'উনি আমার একটু আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন।'

অম্বরনাথকে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তিত দেখালো। বললো, 'তাই নাকি? কোন্ পথ দিয়ে আসছে, কে জানে?' সে গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে কান্তর দিকে তাকালো।

অম্বরনাথের ফরসা ঈষৎ লাল মুখ আর চোখের দিকে তাকিয়ে কান্তর মনটা প্রথম দিনের মতো আবার বারে বারে চমকে উঠলো। অম্বরনাথ বললো, 'তোমাকে কেন ডেকেছি বলতে পারো?'

'আজ্ঞে তা কী করে জানবো?' কান্ত দুটি দাঁতহীন হাসি হাসলো।

অম্বরনাথ স্থির অপলক চোখে কান্তর দিকে কয়েক মুহূর্ত দেখলো। তারপরে হঠাৎ একটু হাসির ঝিলিক দিয়ে বললো, 'অবিশ্যি আমার জিজ্ঞেস করাটাই ভুল হয়েছে। তুমি অনেক চালাক লোক। শুধু চালাক নও, তুমি বেশ তেজী আর ক্ষমতাবান পুরুষ, তাও আমি জানি।'

কান্তর ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হলো, হেসে বললো, 'আপনি কিছু বললে তার ওপরে আমি কথা বলতে পারি না খোকাবাবু।'

অম্বরনাথ গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা কবুল করবে?'

'বলেন। কবুল করবার হলে নিশ্চয় করবো।' কান্ত শান্তভাবেই বললো।

অম্বরনাথ কান্তর চোখে চোখ রেখে বললো, 'ওই বাচ্চা মেয়েটিকে তুমি কোথায় পেয়েছিলে?'

'আজ্ঞে সে-কথা তো আপনাকে চোত সংক্রান্তির দিন বলেছি।'

'মিথ্যা কথা বলেছো।' অম্বরনাথ হঠাৎ আরো সোজা হয়ে বসে, নীচু গর্জিত স্বরে বললো।

কান্ত জেনেশুনেই এখানে এসেছে। সে অম্বরনাথের আচরণে তেমন অবাক্

boiRboi.net

হলো না। বললো, 'তা হলে সত্যি কথাটা আপনিই বলেন খোকাবাবু।'

'তুমি নিজেকে দেখছি খুবই চালাক ভাবছো। আমার মুখ থেকে কথা বের করতে চাও?'

'ছি ছি, তা কেন? আপনি বললেন, আমি মিথ্যা বলেছি, তাই বললাম।'

'হ্যাঁ মিথ্যা বলেছো, তুমি তা ভালোই জানো।'

কান্ত কোনো জবাব দিল না। অম্বরনাথ বললো, 'কী, কথা বলবে না ভেবেছো?'

'বলার কিছু নেই খোকাবাবু। এখন আপনার যা মরজি, তাই করুন।'

'তোমাকে যদি এখান থেকে আমি আর ফিরতে না দিই, তোমার মেয়েকে কে বাঁচাবে?'

'খোকাবাবু, সে ব্যবস্থা না করে কি আমি এখানে এসেছি?'

'ব্যবস্থা? কী ব্যবস্থা করে এসেছো?'

'সে কথা আপনাকে বলতে পারবো না। তবে আমার মন বলেছিল, মেয়ের একটা ব্যবস্থা করে আমাকে এখানে আসতে হবে। তাই করে এসেছি।'

'কান্ত, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো।' অম্বরনাথ বাঘের মতো গরগর করে উঠলো।

'তা হলে আমাকে পুড়ে মরতে হবে বাবু। তবে জেনে রাখবেন, ও মেয়ের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।'

অম্বরনাথ যেন ঈষৎ অন্যমনস্ক হলো। একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটিকে তুমি খুব ভালবাসো, না?'

'তা বাসি বই কি খোকাবাবু। ওর কপাল ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, আমার কপাল, ওকে আমি পেয়েছি। ওকে তো মরণের মুখেই পেয়েছি। তাই নিজে মরতে পারি, ওকে মরতে দিতে পারবো না।'

'তোমার এসব মনে হচ্ছে কেন, তোমার মেয়ে মরতে পারে?'

'মরতে পারে বলছি না খোকাবাবু, মেয়েকে আমার কেউ মেরে ফেলতে পারে। মেরে ফেলতে চাইছে।'

'কে সে?' অম্বরনাথ রুদ্ধ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার তো মনে হয় সে মানুষের মতন দেখতে কোনো পিশাচ। নিশ্চয়ই সে কোনো মহাপাপ করেছে।'

অম্বরনাথ তেমনি রুদ্ধ উত্তেজনায় রক্তাভ অপলক চোখে তাকিয়ে বললো, 'কী করে তুমি তা বুঝলে?'

'পিশাচ ছাড়া, মহাপাপী ছাড়া, আর কে অমন ফুটফুটে মেয়েকে শেয়াল কুকুরের হাতে ফেলে দিয়ে আসে?'

অম্বরনাথের স্বর যেন হঠাৎ ডুবে গেল। ফিসফিস করে বললো, 'শুধু কি ফুটফুটে মেয়েটিকেই ফেলে এসেছিল? আর কেউ ছিল না?'

কান্তর ষষ্ঠেন্দ্রিয় চমকিয়ে উঠলো। অম্বরনাথের জিজ্ঞাসার মধ্যেই প্রকৃত ঘটনা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তথাপি সে বললো, 'আর কে থাকবে বাবু?'

boiRboi.net

'শয়তান!' অম্বরনাথ চিৎকার করে সহসা গেলাসটা তুলে কান্তর মুখের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

কান্তর শক্ত চোয়ালে শৌখীন কাঁচের গেলাসটা আঘাত করে ভেঙে চুরমার হলো। পানীয় ছিটকে পড়লো, আর কান্তর চোয়ালের কাছে কাঁচ বিঁধে হয়ে রক্তের ধারা নামলো।

অম্বরনাথের লাল চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলছে। গলার স্বর হঠাৎ নেমে গেল, 'তুমি এখনো মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছো?'

কান্ত সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে, চোয়ালের চামড়া টান করে ধরে কাঁচের কুঁচি টেনে বের করলো। রক্তের ধারা দ্বিগুণ হলো। সে তার নিজের কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরলো। অম্বরনাথ নিচু স্বরে গর্জন করলো, 'এখনো যা জানো, সব বলো।'

'আর একটা কথাও বলবো না।' কান্ত নীচু কঠিন স্বরে বললো।

'একটা কথাও বলবে না?' অম্বরনাথ গর্জন করে উঠলো।

'না। আর একটা কথাও না।' কান্ত বললো, 'তবে একটা কথা না বলে পারছি না। তুমি যতো তেজই দেখাও, তুমি খাঁচার বাঘ, এটা মনে রেখো।'

অম্বরনাথ ক্ষিপ্ত হতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, 'খাঁচার বাঘ।'

'হ্যাঁ। মনে করছো তুমি খোলা হাত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো? তা মোটেও না।'

'তার মানে?'

'বলবো না। বাঘ হলেও তুমি খাঁচার। আমাকে মেরে ফেললেও শীগগিরই তা টের পাবে।'

অম্বরনাথ অস্থিরভাবে বোতল তুলে চুমুক দিতে গিয়েও থমকে গেল। মদে চুমুক দিল না। বোতল তুলে কান্তর দিকে ছুঁড়তে উদ্যত হলো। এমন সময় দুজন শক্তসমর্থ লোক, ঘেমে হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। অম্বরনাথ থমকে গেল, জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?'

লোক দুটি কান্তর দিকে একবার দেখলো। একজন কান্তকে দেখিয়ে বললো, 'খোকাবাবু, এ গাঁ ছাড়বার পরেই আমরা ওর বাড়ি গেছলাম। তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেই মেয়েকে পাই নি। বাড়িতে একটা বুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই।'

'আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা শুয়োরের বাচ্চারা।' অম্বরনাথ চিৎকার করে উঠলো।

লোক দুটো ভয় পেয়ে পেছিয়ে, আড়ালে চলে গেল। অম্বরনাথ ছুটে দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলো, 'হরি! হরি কোথায় গেলে?'

যে প্রথম কান্তকে এ ঘরে নিয়ে এসেছিল, সে ছুটতে ছুটতে এলো, 'হ্যাঁ খোকাবাবু।'

'শীগ্গির ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আয়। বলবি কাঁচে কেটে গেছে, যেন তৈরি হয়ে আসে।'

অম্বরনাথের আদেশ পাওয়া মাত্র হরি নামক লোকটি ছুটলো। অম্বরনাথ কান্তর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মাতাল মুখের অভিব্যক্তি এখন অসহায় এবং

boiRboi.net

বিভ্রান্ত, কিছুটা উদ্বিগ্ন ও অপ্রস্তুত। ডাকলো 'কান্ত।'

কান্ত রক্তপাতে দুর্বল বোধ করছিল। বললো, 'বলেন। তবে বলে রাখছি, আপনার ডাক্তারের চিকিৎসা আমি নেবো না। এর আগে যতো রক্তই খেয়ে থাকুন, আপনি এখন খাঁচার বাঘ।'

'আমি এর আগে রক্ত খেয়েছি, এর মানে কী?'

'সে-জবাবও আপনার কাছেই আছে।'

অম্বরনাথ মুহূর্তের মধ্যেই আবার রুদ্র হয়ে উঠলো, এবং কান্তর দেহের ওপর সবেগে পদাঘাত করলো। কান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায়, বেশ খানিকটা দূরে, একটা সোফার গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়লো। অম্বরনাথ নীচু স্বরে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'আবার সেই শয়তানি কথা? আবার সেই আমার মুখ থেকে কথা বের করার চালাকি? আমি এর আগে রক্ত খেয়েছি, এর মানে কি, তোকে বলতেই হবে। বল্!' অবার আঘাত করার জন্য সে পা তুললো।

কান্ত আঘাতে আর রক্তপাতে যেন আরো কঠিন হয়ে উঠলো এবং এক ধরনের মানসিক তিক্ততায় সে হেসে উঠে বললো, 'বলবো না, ওহে খোকাবাবু খাঁচার বাঘ, বলবো না। তুমি নিজের মুখেই আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে, জগতের লোক শুনবে। তুমি মারো, আমাকে আরো মারো, মেরে ফ্যালো তাড়াতাড়ি। আমার থুড়ি, আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বড় হয়ে তোমার গলায় ফাঁসি পরাবে। তার হাতের সোনার বালা দুটি আমি রেখে দিয়েছি, স্যাঁকরাকে খুঁজে পেয়েছি, এইটুকু শুধু মনে রেখো।'

অম্বরনাথের উদ্যত পা নেমে এলো, তার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়লো। সে যেন ভূতগ্রস্তের মতো স্বগতোক্তি করলো, 'সোনার বালা! স্যাঁকরা!…তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বড় হয়ে আমার গলায় ফাঁসি পরাবে? কী মানে এই সব কথার?'

কান্ত কোনো জবাব দিল না। অম্বরনাথের আতঙ্কিত মুখে সহসা একটা ব্যাকুল আবেগ ফুটে উঠলো, যেন গভীর অনুশোচনায় ভেঙে পড়লো। কান্তর পাশে বসে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলো, 'কান্ত, তুমি আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলো।'

কান্ত কাঁধ কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করে বললো, 'আমাকে তুমি তোমার এই হাতে ছুঁয়ো না। আমার মেয়ের অকল্যেণ হবে।'

'তোমার মেয়ে।'

'হ্যাঁ, আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, কিন্তু নিজের মেয়ের থেকে অনেক বেশী, অনেক বড়। তোমার হাতের ছোঁয়া আমার গায়ে লাগলে, ছোঁয়া তার গায়েও লাগবে। তার অকল্যেণ হবে।'

অম্বরনাথের হাত যেন অবশ হয়ে কান্তর কাঁধ থেকে স্খলিত হয়ে পড়লো। সে নিজের রক্তাভ সুন্দর একাধিক আংটি-পরা হাতের দিকে অবাক চোখে তাকালো। তাকিয়ে কেমন অন্যমনস্ক চোখে কী সব বিড়বিড় করতে করতে অন্যদিকে সরে গেল। হাত নামিয়ে নিয়ে কান্তর দিকে ফিরে, প্রায় কান্তর কোমল স্বরে বললো, 'আমার অনুরোধ কান্ত তুমি প্রাণ খুলে কথা বলো।'

'প্রাণ খুলে কথা?' কান্ত যেন খুবই অবাক হলো, 'কোথায়, কার কাছে হে খোকাবাবু? তোমার কাছে। যেটুকু খোলবার খুলেছি আর না।'

অম্বরনাথের মুখ চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হয়ে উঠলো। বললো, 'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো?'

'সে-কথা আর কতোবার বলবো? যা বলবার, তা তো বলেই দিয়েছি।'

'জানো, তোমাকে আমি গুলি করে মারতে পারি?'

'তা তুমি পারো। মারা বোধহয় তোমার কাছে কিছুই না।' কান্ত মুখ থেকে কাপড় নামিয়ে অম্বরনাথের দিকে তাকালো। তার সারা মুখ এখন রক্তাক্ত, কিন্তু কঠিন, 'তবে এটাও জেনে রেখো, কান্ত কামার তোমার গায়ে হাত তোলে নি। সেটুকু সম্মান তোমার রেখেছি। নইলে তুমি আমার সামনে এখনো দাঁড়িয়ে থেকে এ রকম ফুঁসতে পারতে না।'

অম্বরনাথের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে গিয়েও মুহূর্তেই করুণ হয়ে উঠলো। বললো, 'জানি, তোমার সেই ক্ষমতা আছে। আমি জানি। তার প্রমাণও—।' সে হঠাৎ থেমে গেল।

কান্ত জানে, কেন অম্বরনাথ চুপ করে গেল। তাদের দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হলো। কান্তর ক্ষত থেকে রক্তপাত এখনো থামে নি। অম্বরনাথ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'তোমার মুখটা ঢাকো কান্ত, কাপড় দিয়ে চাপা দাও। আমি এতো রক্ত দেখতে পারি না।'

কান্ত রক্তাক্ত মুখে হাসলো, 'নিজে যা করেছো, নিজেই তা দেখতে পারো না খোকাবাবু? বলিহারি তোমার দয়া।'

অম্বরনাথ আবার ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে কান্তর দিকে ফিরতেই, বাইরের দরজার কাছে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল, চশমা চোখে, রোগা লম্বা, মাথায় টাক, প্যাণ্ট শার্ট পরা এক ভদ্রলোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছনে চামড়ার ব্যাগ হাতে হরি। মুহূর্তের মধ্যেই অম্বরনাথ ভিন্ন মানুষে পরিণত হলো। ব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে বললো, 'ডাক্তারবাবু, এসে গেছেন, আমি আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি। এ লোকটির চোয়াল কেটে রক্ত পড়ছে, একটু দেখুন।'

ডাক্তারবাবু লোকটি মাঝবয়সী হবেন। তীক্ষ্ন ভ্রূকুটি চোখে একবার গালিচার ওপরে কাঁচের গ্লাসের ভাঙা টুকরো দেখলেন, তারপরে অম্বরনাথের মুখের দিকে। যেন কিছু অনুমান করে, তাকালেন কান্তর দিকে। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কই হে ওভাবে বসে থাকলে তো কিছু দেখতে পাবো না। সোফায় উঠে বসো।'

কান্ত উঠে দাঁড়ালো। মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বললো, 'কোথাও বসতে পারবো না ডাক্তারবাবু। আপনি এ বাড়ির ডাক্তার, আপনার কাছে আমি চিকিচ্ছে করাতে চাই না।'

ডাক্তার অবাক্ চোখে একবার অম্বরনাথের দিকে দেখলেন, কিন্তু কান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠলো। বলে উঠলেন, 'এতো

boiRboi.net

সাংঘাতিকভাবে কেটেছে, প্রফিউজ ব্লিডিং হয়েছে। একে এক্ষুণি অ্যান্টি-টিটেনাশ ইনজেকশন দিয়ে চোয়ালে স্টিচ করতে হবে।' তিনি কান্তর আরো কাছে এগিয়ে গেলেন।

কান্ত দু পা সরে গিয়ে বললো, 'আমাকে মাফ করেন ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে হাতজোড় করে বলছি, এ বাড়ির ডাক্তারের হাতে আমি চিকিচ্ছে করাতে পারবো না।'

ডাক্তার আবার অম্বরনাথের দিকে তীক্ষ্ন চোখে দেখলেন। কান্তর দিকে ফিরে কোমল স্বরে বললেন, 'আমার গায়ে কী ভাই এ বাড়ির ডাক্তার বলে ছাপ দেওয়া আছে? আমি হলাম শিবগঞ্জের সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার। আর জানবে, রোগের চিকিৎসা করা ডাক্তারের ধর্ম। এখন আমি তোমার ডাক্তার।' বলেই তিনি এক হাত কান্তর কাঁধে রেখে আর এক হাতে তার চিবুক ধরে মুখ তুলে বলে উঠলেন, 'ইস্ এখনো যে কাঁচের বেশ কিছু ছোট ছোট টুকরো বিঁধে আছে। বসো তুমি এখানে।'

ডাক্তারের কথার মধ্যে এমন একটি আন্তরিকতা ছিল, কান্ত প্রতিবাদ করার বা বাধা দেবার তেমন জোর পেলো না। ডাক্তার নিজে তাকে জোর করে একটা সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কারোর ঘর জ্বলতে দেখলে কি তুমি কখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে পারো? পারো না। আমিও তেমনি এভাবে কারোকে কষ্ট পেতে দেখলে, চুপ করে থাকতে পারি না।' বলে তিনি দরজার দিকে ফিরে হরির উদ্দেশে বললেন, 'ওহে, তুমি ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে এসো।'

হরি ব্যাগ হাতে ছুটে এলো। ডাক্তার ব্যাগ নিয়ে মুখ খুলে, আগেই একটি বড় শিশি আর তুলো বের করলেন। শিশির তরল পদার্থে তুলো ভিজিয়ে, গালিচার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে, কান্তর ক্ষতস্থান দ্রুত হাতে পরিষ্কার করলেন। কান্ত একটা তীব্র জ্বালা বোধ করলো, যা আঘাতের সময় অনুভব করে নি।

ডাক্তার ক্ষিপ্র হাতে সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম বের করে, প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'কম করে চারটি সেলাই দিতে হবে। ক্ষত তো বেশ গভীর হয়েছে দেখছি।' বলে হরিকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি এর মাথাটা দু হাতে চেপে ধরো তো, যেন নড়াচড়া করতে না পারে।'

কান্ত নিজেই বললো, 'আপনার যা খুশী করেন ডাক্তারবাবু, আমি নড়াচড়া করবো না। যেমনটি বলবেন, তেমনটি বসে থাকবো।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'বাহ্, তোমার মনের জোর আছে দেখছি।' তিনি কান্তর চোয়ালে সেলাই শুরু করলেন।

মাত্র এক পলকের জন্য কান্তর মুখ বিকৃত হলো, দাঁতে দাঁত চাপলো। তারপরে অবিকৃত শান্ত মুখে সেলাই নিল। দশ মিনিটের মধ্যেই সেলাই শেষ। সেলাইয়ের পরেই কান্তকে ডানায় একটি ইনজেকশন দিলেন। বললেন, 'ব্যস, আমার কাজ শেষ। এবার তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। তবে কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি, এগুলো তোমাকে আনিয়ে নিয়ে খেতে হবে। আর রোজ সকালে ব্যান্ডেজ খুলে সেলাইয়ের ওপরে একটু ওষুধ লাগাতে হবে।'

ডাক্তার একটি সোফায় বসে খস্‌খস্‌ করে প্রেসক্রিপশন লিখলেন। অম্বরনাথ বললো, 'ওটা আমাকে দিন ডাক্তারবাবু, আমি ওষুধগুলো আনিয়ে নিচ্ছি।'

'ওষুধের কাগজটা আমাকেই দিন ডাক্তারবাবু, আমার ওষুধ আমি নিজেই কিনে নিতে পারবো।' কান্ত বললো।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে, অম্বরনাথের দিকে একবার তাকিয়ে কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন কান্তর দিকেই, 'যাকে ওষুধ খেতে হবে তাকেই দিই। হ্যাঁ, তোমার নামটা তো লেখা হলো না?'

'আমার নাম কান্ত কামার।'

ডাক্তার নাম লিখে কাগজটা কান্তর হাতে দিয়ে, ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোন কান্ত, দিন সাতেক পরে আমার কাছে এলে আমি তোমার সেলাই কেটে দেবো। এর মধ্যে যদি বেগতিক বোঝ, যে কোনোদিন সকালবেলায় হাসপাতালে চলে এসো, দেখে দেবো।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, একবার তো জিজ্ঞেস করলেন না, আমার গাল কেমন করে কাটলো?' কান্তর স্বরে বিদ্রূপ, ঠোঁটে বক্র হাসি।

ডাক্তার আর অম্বরনাথের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হলো। ডাক্তারের মুখ রুষ্ট গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললেন, 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, এতোটা বলবো না, তবে আমি জানি কেমন করে তোমার গালটা এভাবে কেটেছে, তাই আর কিছু জিজ্ঞেস করি নি। কারণ জানি, জিজ্ঞেস করে লাভ নেই।' বলে অম্বরনাথের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কাজ শেষ, আমি চলি খোকাবাবু।'

অম্বরনাথ কিছু বলবার আগেই ডাক্তার ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলেন। হরি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে সঙ্গে গেল। কান্ত সোফা থেকে নেমে, আগের মতোই নিচে বসলো। আপাতত তার কিছু বলার নেই, বলবার প্রবৃত্তিও নেই। অম্বরনাথ কান্তর দিকে দেখলো, সেও কোনো কথা বললো না। কিন্তু স্পষ্টতই তার চোখে মুখে নেমে এসেছে গভীর অস্বস্তির ছায়া। চোখে মুখে মদের রক্তাভ ঝলকে কেমন একটা বিমর্ষতা, অথচ ব্যাকুলতা। সে সুদীর্ঘ ঘরে কয়েকবার পায়চারি করে, হঠাৎ কান্তর সামনে থামলো, বললো, তোমার অনেকটা রক্তপাত হয়েছে, কিছু খাওয়া দরকার।'

'সে চেষ্টা আর করো না খোকাবাবু।' কান্ত হাত জোড় করে বললো, 'এ বাড়ির কিছু আমি মুখে দেবো না। কেন যে ডাক্তার ডাকালে, তা তুমিই জানো। এখন আমাকে নিয়ে যা করতে চাও, তাড়াতাড়ি করো।'

অম্বরনাথের মুখে আবার কাঠিন্য ফুটলো, 'কেন, মেয়ের কাছে যাবার জন্য মন কেমন করছে?'

'সে কথা তোমাকে বলতে চাই না।'

'তোমাকে যদি আর কখনো এ ঘর থেকে না যেতে দিই?'

কান্তর বুকের মধ্যে চমকিয়ে উঠলেও, মুখের অভিব্যক্তিতে তা প্রকাশ করলো না। বললো, 'যা তোমার ইচ্ছা। তুমি ডেকেছিলে, আমি এসেছি। আসলে তুমি আমাকে ডেকে এনেছিলে, সেই ফাঁকে মেয়েকে তোমার লোকজন দিয়ে চুরি

boiRboi.net

করে নিয়ে আসবে বলে। তোমার সে-মুখ ভোঁতা হয়েছে। আমাকে চিরদিন এ ঘরের মধ্যে আটকে রাখলেও, মেয়েকে কোনোদিন পাবে না।'

অম্বরনাথের মুখ কঠিনতর হয়ে উঠতে উঠতে, আবার গাঢ় অস্বস্তি আর অস্থিরতা নেমে এলো, 'একটা কথা বলো তো কান্ত, তুমি আমাকে কতোটুকু চেনো?'

'তোমাকে আমি চিনবো কী করে? তুমি হলে শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির খোকাবাবু। তোমাকে আমি চিনতে যাবো কোন্ সুবাদে?'

'তবে তুমি আমার সম্পর্কে ওসব কথা বলছিলে কেন? আমি খাঁচার বাঘ, আমি অনেক রক্ত খেয়েছি—এসব তুমি কেন বললে?'

'সে জবাব তো তোমাকে দিয়েছি। যা যা বলেছি, তুমিই সব থেকে তা ভালো জানো।'

অম্বরনাথ ঠোঁটে ঠোঁট টিপে কান্তর দিকে দেখলো, তারপরে হঠাৎ কাতর স্বরে বললো, 'কান্ত তুমি আমার একটা কথা রাখবে?'

কান্ত চোখ তুলে তাকালো। অম্বরনাথ বললো, 'তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে আমাকে দাও, আমি তাকে এ বাড়িতে রেখে মানুষ করবো।'

কান্তর চোখেমুখে তীব্র বিদ্রূপ ঝলকিয়ে উঠলো, বললো, 'খাঁচার বাঘের কাছে মেয়েকে দেবো?'

অম্বরনাথের দুই চোখ মুহূর্তেই আবার বাঘের মতো জ্বলে উঠলো। কিন্তু চকিতেই সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, 'কেন তোমার এ কথা মনে হচ্ছে?'

'বলেছি তো বাবু, সে কথা আমি বলতে পারবো না।' কান্ত বললো, 'কিন্তু তুমি একটা কথা বলো দিকিনি খোকাবাবু, আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে নিয়ে, তোমার এতো মাথাব্যথা কেন?'

অম্বরনাথ কান্তর মুখের দিকে তাকালো। কান্তও তার চোখে চোখ রাখলো। কেউ কোনো কথা বললো না, কেবল পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। অম্বরনাথ চোখ নামিয়ে সরে গেল। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'মেয়েটির জন্য যদি তুমি টাকা চাও, আমি দিতে পারি। অনেক টাকা, সারা জীবন ভালো করে খেয়ে পরেও, তোমার অনেক থেকে যাবে। এতো টাকা আমি তোমাকে দেবো।'

'শেষটায় টাকার লোভ দেখালে খোকাবাবু?' কান্ত সত্যি করে হাসলো, 'ও বস্তু তোমার বিস্তর আছে জানি। কিন্তু তার থেকে আমার মেয়ে, আমার অনেক বেশী।'

'তোমার মেয়ে!' অম্বরনাথ ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

কান্ত বললো, 'কুড়িয়ে পাওয়া বটে, মেয়ে তো আমারই। সত্যিকারের দাবিদার কে আছে? যদি কেউ থাকে, সে এসে আমাকে বলুক, প্রমাণ দিক।'

অম্বরনাথের সঙ্গে কান্তর আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হলো। এ যেন দুই জহুরির দৃষ্টি বিনিময়। অম্বরনাথ আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। কান্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অদ্ভুত মুখে, নিঃশব্দে হাসলো, আপন মনে ঘাড় ঝাঁকালো।

অম্বরনাথ আবার হঠাৎ কান্তর দিকে ফিরলো, তার দুই চোখে তীব্র কৌতূহল।

boiRboi.net

জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ, তুমি যেন তখন কী বলছিলে, মেয়ের হাতের বালা যে-স্যাকরা গড়িয়েছিল, তার খোঁজ তুমি পেয়েছো। তাই বলছিলে না ?'

কান্ত অন্তরে জানে, অম্বরনাথকে যাচাই করার জন্য সে ভেবেচিন্তে এই মিথ্যা কথাটি বলেছিল। এখনো আবার বললো, 'বলেছি বই কি? খোঁজ পেয়েছি সে স্যাকরার, কথাও বলেছি।'

'মিথ্যা কথা।' অম্বরনাথ দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো, 'তুমি সেই স্যাকরার খোঁজ পেতে পারো না।'

কান্ত অম্বরনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে কথা তুমি কী করে জানলে খোকাবাবু, আমি সেই স্যাকরার খোঁজ পেতে পারি না ?'

'আমি জানি, তুমি তার খোঁজ পেতে পারো না।' অম্বরনাথের স্বরে ঝাঁজ এবং জেদ, 'তুমি মিথ্যুক, তুমি সত্যি কথা বলছো না। তুমি গোড়া থেকেই মিথ্যা কথা বলছো। মেয়েকে তুমি তোমার বাড়ির দোরগোড়ায় কুড়িয়ে পাও নি, অন্য জায়গা থেকে পেয়েছো।'

কান্ত চোখ না নামিয়ে বললো, 'সবই যদি জানো খোকাবাবু তবে তুমিই সব বলো না।'

'শোন তা হলে কান্ত' অম্বরনাথ কঠিন মুখে বললো, 'তখন তুমি বলছিলে, মেয়ে বড় হলে সেই মেয়ে আমার গলায় ফাঁসি পরাবে। কিন্তু জানো, আমিই তোমার গলায় ফাঁসি পরাতে পারি ? আমি তোমাকে খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে দিতে পারি ? বাচ্চা মেয়ে চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে দিতে পারি ?'

কান্তর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি. দু' চোখ জ্বলজ্বলিয়ে উঠলো। হাত জোড় করে বললো, 'তাই দাও খোকাবাবু। তাতে যদি চৈতি বাঁচে হাজারবার ফাঁসি যেতে পারি।'

'চৈতি! চৈতি কে ?' অম্বরনাথ মুহূর্তেই অন্যমনস্ক কৌতূহলে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার মেয়ে—আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের নাম।'

'কে তাকে ও নাম দিয়েছে ?'

'আমাদের তাঁতী খুড়ী। চোত্ সংক্রান্তির রাতে মেয়েটাকে পেয়েছিলাম কিনা, তাই সে মেয়েকে চৈতি চৈতি বলে ডাকে। আমিও চৈতি বলে ডাকি।'

অম্বরনাথের মুখে গভীর অন্যমনস্ক আচ্ছন্নতা নেমে এলো। বিড়বিড় করতে করতে সে সরে গেল, পায়চারি করতে লাগলো।

এই সময়ে হরি ফিরে এলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অম্বরনাথকে বললো, 'ডাক্তারবাবু এই ওষুধপত্তর ওকে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।' বলে কান্তকে দেখালো।

অম্বরনাথ অনুমতি দিল, 'পাঠিয়েছেন দিয়ে দাও।'

হরি ঘরের মধ্যে ঢুকে, বড় একটা কাগজের মোড়ক কান্তর সামনে গালিচায় রেখে বললো, 'ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন, দেখে শুনে খেও। সাতদিন বাদে সেলাই কাটাবার জন্য হাসপাতালে যেও।' বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

boiRboi.net

অম্বরনাথ বললো, 'তা হলে তুমি আমার কোনো কথাই রাখবে না ?'

কান্ত দেখলো, অম্বরনাথের মুখে ক্রোধ বা ঘৃণা নেই, বরং একটা করুণ হতাশা জেগে উঠেছে।

কান্ত বললো, 'কথা তো বাবু একটাই। কিন্তু মেয়ে আপনাকে আমি দেবো না।'

'কার মেয়ে ? কোন্ অধিকারে তুমি মেয়েকে তোমার কাছে রাখবে ? অম্বরনাথের স্বরে আবার ফুঁসে ওঠা স্বর।

কান্ত নির্বিকার স্বরে বললো, 'কার মেয়ে তা আমি জানবো কি করে ? কিন্তু তোমারই বা কি অধিকার খোকাবাবু, তুমি কেন মেয়েকে চাও ?'

'তুমি একটা আস্ত শয়তান!' অম্বরনাথ আবার চিৎকার করে উঠলো, এবং অসহায় ক্রোধে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'যাও, বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। বেরিয়ে যাও।'

কান্ত বললো, 'যেচে তো তোমার কাছে আসি নি। ভগবান করুন যেন তোমার কাছে আর কখনো না আসতে হয়।' সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অম্বরনাথ দ্রুত পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে বললো, 'শোন!'

কান্ত দরজার ওপর পা রেখে দাঁড়ালো। অম্বরনাথ দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মুখের এই ব্যাণ্ডেজ নিয়ে পুলিসের কাছে যাবে ?'

'না বাবু, যাবো না।' কান্ত শান্ত দৃঢ় স্বরে বললো, 'পুলিস কখনো গরিবের মুখ চায় না। তা ছাড়া, কি করে প্রমাণ করবো তুমি আমাকে মেরেছো ? আমার সাক্ষী কে ? ডাক্তারবাবু হলে হতে পারেন, কিন্তু উনি তো মারতে দেখেন নি। না, আমি পুলিসের কাছে যাবো না। তবে হ্যাঁ, মেয়েকে নিয়ে আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। রাত-দিন যখের ধন আগলে রাখার মতন মেয়েকে আমি কতোদিন বাঁচিয়ে রাখবো ? যমের হাত থেকে বাঁচাতে হলে মেয়েকে নিয়ে আমার চলে যেতে হবে।' সে দরজার বাইরে পা দিল।

অম্বরনাথ তৎক্ষণাৎ ছিটকিয়ে কান্তর পথরোধ করে দাঁড়ালো। তার চোখে-মুখে এক উদ্বেগ কাতরতা, প্রায় রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবে মেয়েকে নিয়ে ? কোথায় ? কোথায় ?'

কান্ত বললো, 'তা কি করে এখন বলবো খোকাবাবু ? যেখানে গেলে মেয়েকে বাঁচাতে পারবো, সেখানেই যাবো। সে-জায়গা কোথায়, আমিও এখন জানি না।' সে অম্বরনাথের পাশ কাটিয়ে সুদীর্ঘ থাম-ঘেরা দালানের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। দুর্বল বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে, মাথাটা টলছে, পা ঠিক মতো পড়ছে না। দুধ খাবার-দাবার দরকার নেই, পেটে একটু তাজা চোলাই মদ পড়লেই শক্তি পেতো। পকেটে যৎসামান্য যা আছে, তাতে একটা পাঁট কেনা যাবে। শিবগঞ্জের সব সুলুক সন্ধানও তার জানা আছে, কোথায় কি পাওয়া যায়। একটু মদ না খেলে চলবেও না। কারণ, পথের ওপর আবার কারা ওৎ পেতে আছে, কে জানে ? বিনা লড়াইয়ে মার খেয়ে মরার পাত্র কান্ত কামার না।

কান্ত বাইরে এসে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলো। আকাশে মেঘ জমেছে,

চারদিকে ছায়া। বৃষ্টি আসবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিছুটা হাওয়াও আছে। সজল হাওয়া বোধ হয়, কোথাও হয়তো বৃষ্টি হয়েছে। কান্ত শিবগঞ্জের মাহাতো পাড়ার দিকে চললো। পাড়াটা যাবার পথেই পড়ে, চোলাইও পাওয়া যায়।

★

কয়েকটা দিন আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। কিন্তু কান্ত আরো সজাগ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়েছে। চৌতিকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকে না। চোয়ালের ঘায়ে নিয়মিত ওষুধ লাগায়, ওষুধ খায়। ঘা শুকিয়ে আসছে। কান্ত মনে মনে অনেক ভেবেছে। এখন আর তার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অম্বরনাথ মহাপাপী। কিন্তু সেই পাপের পঙ্কিল পথের ঠিকানা তার জানা নেই। সে আরো ভেবে দেখেছে, চৌতিকে নিয়ে দেশ ছাড়ার অর্থ, এক গভীর অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি দেওয়া। কি তার সম্বল আছে? কোথায় কবে সে কাজ পাবে, সেই ভরসায় চৌতিকে নিয়ে পথে ভেসে যাওয়া চলে না। চৌতিকে কোলে নিয়ে সে পথে পথে, লোকের দোরে ভিক্ষাও চাইতে পারবে না। কথায় বলে ভিখারীর হাল। কান্তর কাছে সেটা বড় হীনমন্যতা।

একটি উপায় আছে। বাড়িঘর কামারশালা বিক্রি করে দিয়ে কোথাও চলে যাওয়া। সেটাও তার মন চায় না। অথচ সে বুঝতে পারে, আনকা অচেনা লোক তার বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘুরে যায়। দেখলেই সন্দেহ হয়, ওরা কান্ত আর চৌতির ওপর যেন নজর রাখছে।

কান্ত তার বন্ধু বৈদ্যনাথকে সব ভেঙে না বললেও, মোটামুটি জানিয়েছে মেয়েকে একদল লোক চুরি করবার তালে আছে। বৈদ্যনাথও এখন অত্যন্ত সজাগ। সে সম্পন্ন সদগোপ পরিবারের সন্তান। ভূমিহীন কৃষক, ভাগচাষী এবং সাঁওতালদের দিয়ে জমি চাষ করায়, নিজেও মাঠে নামে। চারদিকে সে নজর রাখে। কান্ত যখন যেরকম পথ বাতলায়, সেইভাবে চৌতিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। রাম তো একেবারে টিকটিকি হয়ে উঠেছে। তাঁতী খুড়ীও একটা অশুভ ছায়া দেখতে পেয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে। বাড়ির চারপাশে সে গোসাপের মতো ঘুরে বেড়ায়।

ঠিক চার দিন পরে, সন্ধ্যার ঘোর লাগা আঁধারের ঝোঁকে কামারশালার নিচে, গরুর চাকার চুল্লির ছাঁচ তৈরি করছিল রাম। কান্ত চৌতিকে কাছে নিয়ে বসে দেখছিল। কামারশালায় একটা হারিকেন জ্বলছে। একটা চৌকো কাঁচের লণ্ঠন রামের পাশে।

কান্ত ভূত দেখার মতো চমকিয়ে উঠলো, দেখলো, কামারশালার সামনে অম্বরনাথ এসে দাঁড়িয়েছে। অস্পষ্ট ঝাপসা মূর্তিকে চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না। পিছনে আর একটি মানুষের ছায়া। অম্বরনাথের দৃষ্টি চৌতির ওপরে। কান্ত তৎক্ষণাৎ চৌতিকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কে এখানে? খোকাবাবু!'

অম্বরনাথ কয়েক পা এগিয়ে এলো। তার গায়ে লণ্ঠন আর হারিকেনের আলো পড়লো। অপ্রস্তুত হাসি তার মুখে। বেশবাস তেমন পরিপাটি

boiRboi.net

বললো, 'হ্যাঁ? তোমার ভয় নেই। একবার তোমার সঙ্গে দেখা না করতে এসে থাকতে পারলাম না। দিনের বেলা আসার তো উপায় নেই। নানা লোকে নানা কথা জিজ্ঞেস করবে, ভিড় করবে। তাই এ সময়েই এলাম, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে।'

কান্ত ইতিমধ্যে পিছনের লোকটিকেও চিনে নিয়েছিল। ভবতারণ চক্রবর্তী। কান্ত নিচু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি কথা?'

অম্বরনাথ যেন একটু বিষণ্ণ হাসলো, বললো, 'তোমার কাছে এলাম। একটু বসতে দাও। এখানে দাঁড়িয়ে কি কথাবার্তা চলে?'

কান্তর চোখে অবিশ্বাস আর সন্দেহ। সে ডাকলো, 'রাম বাবুদের দুটো মোড়া দে বসতে।'

'বাবুদের না, আমাকে একলাই একটু বসতে দাও।' অম্বরনাথ বললো, 'ভবতারণবাবু দূরেই দাঁড়াবেন। তোমার আমার কথাবার্তার সময় আর কেউ এখানে থাকবে না।'

কান্ত বললো, 'তা হলে তুমি বসো খোকাবাবু, মেয়েকে আমি বাড়ির ভেতরে রেখে আসি।'

'ভয় নেই কান্ত, মেয়েকে নিয়েই তুমি বসতে পারো। আমি তোমার বা মেয়ের কোনো ক্ষতি করবো না।' অম্বরনাথ আন্তরিক সহজ স্বরে বললো।

রাম ইতিমধ্যে মোড়া পেতে দিয়েছে। কান্ত ওকে চোখের ইশারা করতেই, সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। রাম এখন কান্তর ইশারাতেই বুঝতে পারে সে কি নির্দেশ দিচ্ছে। বাড়ির আশপাশে কোনো দল জুটেছে বা ছড়িয়ে আছে কি না, কান্ত তা দেখবার ইশারা করেছে। সে বললো, 'বসেন, গরিবের ঘরে এর থেকে ভালো কিছু বসতে দেবার নেই।'

অম্বরনাথ একবার ভবতারণের দিকে পিছন ফিরে দেখে বললো, 'আপনি আশপাশেই থাকুন, আমি খানিকক্ষণ কথা বলেই আসছি।' সে মোড়ায় বসলো।

ভবতারণ সরে গিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। অম্বরনাথ কান্তর কোলে মেয়ের দিকে দেখলো, বললো, 'বসো কান্ত। না বসলে কথা হয় কেমন করে? আহা, এতো দূরে বসলে হয়? একটু কাছে এসেই বসো না।'

কান্ত দূরেই বসতে যাচ্ছিল। সন্দিগ্ধ চোখে একবার অম্বরনাথকে দেখে তার মোড়ার দু হাত দূরে বসলো। অম্বরনাথের চৈতির প্রতি অপলক দুই চোখে তীব্র কৌতূহল, যেন গভীর একটা ব্যাকুলতা। কিন্তু কান্তর প্রত্যাশিত ক্রোধ বা ঘৃণা চোখে পড়লো না। অম্বরনাথ জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়ে নিয়ে তা হলে এখনো যাও নি?'

'যাবো শীগ্গিরই।' কান্ত নির্বিকারভাবে মিথ্যা বললো।

অম্বরনাথ বললো, 'আমি খবর রাখছিলাম, তুমি কি করছো।'

'জানি।' কান্তর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হলো, ঠোঁটে হাসি, 'তোমার পাঠানো প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনি। তুমি বললে, এবার থেকে তাদের গায়ে লোহা পুড়িয়ে দাগ করে দিতে পারি।'

boiboi.net

অম্বরনাথ দুই মুহূর্ত কান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপরে একবার চৈতিকে। বললো, 'কান্ত, তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে।'

'বলেছি তো খোকাবাবু, রাখবার মতন কথা হলে রাখবো।' কান্ত হাত জোড় করে বললো, 'কিন্তু দোহাই বাবু, মেয়েকে চেও না যেন।'

চৈতি কথাটা শুনেই তার আয়ত কালো চোখে ঘাড় কাত করে অম্বরনাথের দিকে তাকালো। তাকিয়েই ছিল। এবার একটু ভিন্ন ভাবে। এবং কান্তর বুকের মধ্যে নিবিড়তর হলো। 'মেয়ে চেও না' শুনেই চৈতির এই প্রতিক্রিয়া। অম্বরনাথ দেখছিল চৈতিকে। কান্ত যুবক আর শিশু, দুজনের মুখই দেখছিল। সে যেন জীবন রহস্যের কিনারায় দাঁড়িয়ে অন্তর্যামীর মতো ঠোঁট টিপে হাসছে।

অম্বরনাথ বললো, 'না, মেয়েকে চাইবো না। আমার অনুরোধ, মেয়েকে নিয়ে তুমি কোথাও চলে যেও না। তুমি এখানেই থাকো, এই শালফুলিতে।'

'ভরসা কি খোকাবাবু?' কান্ত বললো, 'মুখ ফুটে মেয়ের সামনে বলতে পারবো না, কারণ মেয়ে আমার ছেলেমানুষ হতে পারে, সে বোকা না। কথা ধরে ফেলবে। শমন যে ছায়ার মতন ওর পেছু নিয়েছে।'

অম্বরনাথের ফরসা মুখে রক্তের ঝলক লেগে গেল। চৈতিকে একবার দেখলো। বললো, 'আমি তোমাকে ভারসা দিচ্ছি, তুমি ওকে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। ঘরদোর দেশ গাঁ ছেড়ে চলে যেও না।'

কান্ত অম্বরনাথের চোখের দিকে দেখলো। অম্বরনাথ চৈতির দিকে তাকালো। চৈতি উসখুস করে উঠে অম্বরনাথের দিকে একটি তর্জনী দেখিয়ে বললো, 'ও কে বাবা?'

কান্তর সঙ্গে অম্বনাথের চোখাচোখি হলো। অম্বরনাথের মুখে আবার রক্তের ঝলক লাগলো। কান্ত বললো, 'উনি কে, তা উনিই জানেন মা।'

অম্বরনাথ একবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। একটু পরে আবার মুখ ফেরালো, বললো, 'আমার কথার জবাব তো দিলে না কান্ত?'

'কি জবাব দেবো খোকাবাবু?' কান্ত বললো, 'নিশ্চিন্ত যে থাকবো, তার বিশ্বাস কি?'

'আমার কথা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ওর ক্ষতি কেউ করতে আসবে না।' অম্বরনাথের নিচু স্বরে প্রত্যয়ের ধ্বনি।

কান্তর মুখ চকিতের জন্য একবার করুণ হয়ে উঠলো। বললো, 'খোকাবাবু, সময়ের মতন ওষুধ নেই। আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'বেশ।' অম্বরনাথ বললো, 'আর একটা কথা। মেয়েকে তুমি ভালোভাবে মানুষ করো।'

'কেন, আমার মেয়েকে কি খারাপভাবে মানুষ করি?' কান্ত মুহূর্তে রুষ্ট হয়ে উঠলো।

অম্বরনাথ শান্তভাবে বললো, 'সে কথা বলি নি। তোমার যতখানি সাধ্য মেয়েকে তুমি তার চেয়ে বেশীই যত্ন কর। আমি বলছিলাম কি, মেয়েকে মানুষ করার জন্য তুমি আমাকেও কিছু দায়দায়িত্ব দাও।'

boiRboi.net

'তোমাকে কি দায়দায়িত্ব দেবো খোকাবাবু ?'

'আমি মাসে মাসে টাকা দিতে পারি। ওর যখন যা দরকার, তখনই তা পে'ছিুতে পারি। জামা, কাপড়, গহনা, ওর শখ মেটাবার জন্য যখন যা প্রয়োজন, সব দায়দায়িত্ব তুমি আমাকে দিতে পারো।'

কান্ত হাসলো, বললো, 'কেন বলো তো খোকাবাবু? শুনেছি ঘরে তোমার ভাগ্যবতী বউ, যমজ ছেলে আছে তোমার,দেখতে নাকি তারা রাজপুত্রের মতো সুন্দর, নাম দেওয়া হয়েছে লব কুশ। তাদের বয়সও এক বছর হতে চললো। তোমার তো সবই ভরা ভরতি, তবে আমার এই মেয়েটার ওপর তোমার এত দরদ কেন ?'

অম্বরনাথ জবাব দিল না, কান্তর চোখের দিকে তাকালো। কান্তও তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। যেন দুটি ধারালো অস্ত্রে নিঃশব্দে সংঘর্ষ হলো। অম্বরনাথ আবার মুখ ফিরিয়ে নিল, বললো, 'এর কোনো জবাব আমার জানা নেই।'

'তবে আমিও তোমার কথা রাখতে পারবো না।' কান্ত দৃঢ়স্বরে বললো।

অম্বরনাথের মুখ রক্তাভ হয়ে উঠলো, বললো, 'আবার তোমার সেই জেদ ?'

'জেদ নয় খোকাবাবু, ধর্ম সাক্ষী, আমি আমার মেয়ের ধর্ম রক্ষা করতে চাই।' কান্ত বললো, 'তা ছাড়া তুমিই ভেবে দ্যাখো, কামারের মেয়ে কখনো শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির মেয়ের মতন মানুষ হতে পারে? লোকে বলবে কি? তুমি লেখাপড়া শিখেছো, এটা বোঝ না ? আমার নিজেরো তো একটা ইজ্জৎ থাকতে আছে গ, না কি বলো ?'

অম্বরনাথ তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না, চৈতির দিকে তাকালো। চৈতি আবার কান্তর বুকের কাছে উসখুস করে উঠে বললো, 'উম্‌ম্‌ বাবা, ও কে ?'

কান্ত এবার বললো, 'উনি মস্ত বড়লোক মানুষ মা। বড় হলে বুঝবি, উনি হলেন শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির একমাত্র ছেলে, রাজপুত্তুর।'

অম্বরনাথ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, আপন মনেই ক্ষুব্ধ আহত স্বরে উচ্চারণ করলো, 'অসহ্য!'

কান্ত অবাক্‌ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি অসহ্য খোকাবাবু? আমি কি মিথ্যা কিছু বলেছি ?'

'মিথ্যা বলো নি ?' অম্বরনাথ উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বললো, 'তোমার প্রত্যেকটা কথার ভঙ্গি আমার অসহ্য লাগছে। ওর কাছে কেন তুমি আমাকে রাজপুত্তুর বলে পরিচয় দিচ্ছ, তা কি আমি বুঝি না ? এ সবই আমাকে ব্যাং খোঁচানো হচ্ছে। কিন্তু এখন বলো, আমার কথা কি রাখবে ?'

কান্ত বললো, 'তবে শোন খোকাবাবু, তোমার কাছ থেকে ভরসা পেলে, মেয়ে নিয়ে আমি কোথাও যাবো না। কিন্তু সত্যিকারের ভরসা চাই, আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমাকে কথা দিতে হবে না, আমি নিজেই বুঝবো, ভরসা আছে কী না। আর একটা কথা, তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়ে আমি ওকে মানুষ করতে পারবো না। ও আমার ঘরে আমার মেয়ের মতোই মানুষ হবে। খোকাবাবু, জানবে, আমার মেয়ে তাতে ছোট হবে না। ওর বুকে আমি ইজ্জতের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যাবো। ওকে

boiRboi.net

শিখিয়ে দিয়ে যাবো, কোথাও যেন কোনো দিন মাথা হেঁট না করে ।

'মুখের কথায় ভরসা আমিও দিতে চাই না। তবে তুমি মেয়ে নিয়ে যে-ভয় পাচ্ছো, তা আর কখনো হবে না। কারণ—' অম্বরনাথ কথা শেষ না করে চৈতির দিকে তাকালো। তার চোখের দৃষ্টি স্নেহ-ব্যাকুল করুণ। চোখ ফিরিয়ে আবার বললো, 'কিন্তু তোমার মেয়ে তো অজ্ঞাতকুলশীলা। কে ওর ইজ্জৎ দেবে ?'

কান্তর দুই চোখ জ্বলে উঠলো, 'খোকাবাবু, কথাটা যখন বললে, তখন শুনে যাও। ভদ্দর বামুনদের কুলশীলের কথাও এই কান্ত কামার কিছু কম জানে না। সে কথা মেয়েকে আমি বোঝাবো। কুলের থেকে যে মানুষ বড়, কুলের থেকে খাঁটি মানুষের ইজ্জৎ বড়, এটাই আমি ওকে বুঝিয়ে যাবো।'

অম্বরনাথ কথা বলতে পারলো না। তার মুখে ফুটে উঠলো হতাশা আর বিষণ্ণতার অভিব্যক্তি। সে নীচু স্বরে বললো, 'তোমার কাছে আমাকে দেখছি হার মানতেই হবে। তবে তোমার কাছে আমি বারে বারে বলছি, যদি কখনো মেয়ের জন্য কোনো কিছু দরকার হয়, আমাকে একবারটি বলো। তোমার তো ধর্মজ্ঞান আছে, আমার এই কথাটা রেখো।' বলে পকেট থেকে একটি লাল রঙের বাকসো বের করে আবার বললো, 'আজ আঠারোই আষাঢ়, শুক্লপক্ষের আজ ত্রয়োদশী। এতে দুটি জড়োয়ার বালা আছে, মাপে ঠিক হবে কী না জানি না। মেয়েকে একবার পরিয়ে দাও, আমি দেখে যাই।' সে বাকসো খুলে হীরা বসানো দুটি সোনার বালা সামনে মেলে ধরলো।

কান্ত বালা দুটির দিকে দেখলো। অম্বরনাথের দৃষ্টি চৈতির দিকে। সে বাকসোসুদ্ধ বালা দুটি চৈতির সামনে বাড়িয়ে দিল। চৈতি ভীরু পাখির মতো, কান্তর বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠলো, 'বাবা, না না। নেই না, নেই না।'···

অর্থাৎ 'নেবো না, নেবো না।' কান্তর সঙ্গে অম্বরনাথের করুণ চোখের দৃষ্টি বিনিময় হলো। অম্বরনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে, কান্ত মেয়েকে টেনে সামনে ফিরিয়ে আদর করে বললো 'অ গ, অরে মা আমার, আয় আমি তোকে পরিয়ে দিই, লক্ষ্মী মা আমার।'

চৈতির চোখে কেমন সন্দেহ, এবং শিশুর বিচিত্র অনীহা। কান্তর কথায় হাত ছাড়িয়ে দিল। কান্ত চৈতির দু হাতে, বালা দুটি পরিয়ে দিয়ে বললো, 'একটু বড় হয়েছে। কিন্তু খোকাবাবু এ বস্তু আমার মেয়ের অঙ্গে দেখলে, লোকে যে আমাকে চোর বলবে ? হীরে যে আমি চোখে দেখিনি গ !'

অম্বরনাথ চৈতিকে দেখছিল। শিশু যতোই অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু নিতে অনিচ্ছুক হোক, তবু মেয়ে তো। হীরার ঝলক দেখে, সেও হাত তুলে দেখলো। অম্বরনাথ বললো, 'এই দিনটি মনে রেখো কান্ত, আঠারোই আষাঢ়, শুক্লা ত্রয়োদশী। প্রতি বছর এ দিনটিতে আমি আসবো, ওকে কিছু দিয়ে যাবো। এ কথার ওপর তুমি আর কিছু বলো না।'

কান্ত সহসা কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না। অম্বরনাথ অপলক চোখে চৈতিকে দেখতে দেখতে, তার দৃষ্টি অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো। হঠাৎ সে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো। পরমুহূর্তেই বললো, 'চলি।' বলেই কামারশালা

থেকে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কান্ত আচ্ছন্নের মতো বসে রইলো। রাম বাইরের অন্ধকার থেকে ঘরের ভিতরে এলো, বললো, 'কান্তদা, চারপাশে সবখানে ঘুরে দেখলাম, কেউ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে নেই। খালি ওই বুড়ো মতন বাবুটা রাস্তায় পায়চারি করছিল।'

কান্তর আচ্ছন্নতা ভাঙলো। বললো, 'ওহ্! ঠিক আছে, মেয়েটাকে নিয়ে এবার ভেতরে যাই।'

★

কান্ত একদা উচ্চারণ করেছিল, 'সময়ের মতন ওষুধ নেই।' এ কথা সে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিল, সেই কারণেই অম্বরনাথকে কথাটি বলেছিল। কেবল কথার কথা না, কান্তর গভীর বিশ্বাস, সময় হলো জীবনের মহৌষধ। সকল ব্যাধির বৃদ্ধি আর আরোগ্য আর পরিণতি নিরূপিত হয় সময়ের দ্বারা।

অতঃপর আরো চৌদ্দটি আঠারোই আষাঢ়, শুক্লা ত্রয়োদশী নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে গিয়েছে। চৈতি এখন শালফুলি গ্রামের, সপ্তদশী উজ্জ্বল একটি কন্যা। না, কান্ত মনে মনে কখনো নিঃসংশয় নির্ভর হতে পারে নি। অম্বরনাথ কথা দিলেও, তাকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি। নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। তার অবচেতন মন অর্থাৎ ষষ্ঠেন্দ্রিয় এই চৌদ্দ বছর নিরন্তর সজাগ থেকেছে, এখনো আছে। স্থানান্তরে না গিয়েও, সে চৈতিকে বাঘিনীর শাবকের মতো প্রতি মুহূর্ত চোখে চোখে রেখেছে। তবে সময় তাকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছে। অম্বরনাথ কথা রক্ষা করেছে।

অম্বরনাথ কি কেবল কথাই রক্ষা করেছে? বোধ হয় না। তার জীবনের গভীর পরিবর্তন, তার চোখে খুশির অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে। সে প্রতি বছরের আঠারোই আষাঢ়ের সন্ধ্যার ঝোঁকে, একটি করে গহনার উপহার নিয়ে এসেছে চৈতির জন্য। প্রতি বছরেই, চৈতির দিকে তাকিয়ে, তার চোখে স্নেহ ব্যাকুলতা, এক আবেগের ধারায় বিগলিত হয়েছে। এক অসহায় ব্যথা আর যন্ত্রণায়, ক্রমে সে অধিক কাতর হয়ে উঠেছে। চৈতির সামনে এসে দাঁড়ালে, তার প্রৌঢ়ত্বের ম্লানিমায় যেন এক রুদ্ধ কান্নার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। সে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অক্ষমতার জন্য কয়েক মুহূর্তের বেশি চৈতির সামনে দাঁড়াতে পারে না। এক গভীর আর গোপন যন্ত্রনায় তার মুখ অবিকৃত রাখা কঠিন হয়ে ওঠে।

সময়ের নাম মহাকাল, তার ধাবমান আলোর কিরণে, পৃথিবীর জল ও বায়ুর স্পর্শে, চৈতিও কেবল দেহে বাড়ে নি। বেড়েছে মনে ও প্রাণে। অম্বরনাথের সম্পর্কে এখন ওর কৌতূহল তীব্রতর। ও অম্বরনাথের পরিচয় জানে, তিনি শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির একমাত্র ধনী বংশধর। ও ছেলেবেলা থেকেই, বছরের বিশেষ একটি দিনে, এই বিচিত্র ব্যক্তিটির দেখা পায়। ও ওর বাবার কাছে জেনেছে, এই দিনটি নাকি ওর জন্মদিন। এখন আর ওর কাছে গোপন নেই, ও কান্ত কামারের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। সে-কথা গ্রামের সবাই জানে, সে-কথা ও জানবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু না। এ বিষয়ে ওর মনেও যে কৌতুহলিত জিজ্ঞাসা নেই, তা না।

কিন্তু যে-জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কেউ নেই, যা চির অন্ধকারের অতলে হারিয়ে গিয়েছে, সেই জবাবের প্রত্যাশায় ওর মধ্যে কোনো কাতরতা নেই। যারা ওকে এই সংসারে এনেছিল, তারা যদি ওকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে যেতে পারে, তা হলে আর কৌতূহল বা জিজ্ঞাসার ক'ী থাকতে পারে। বরং কান্তকে ও পালক পিতা রূপে ভাবতে পারে না। ও জানে, কান্তই ওর বাবা। পিতারও অধিক যিনি, তিনি যদি ঈশ্বর হন, তা হলে কান্ত ওর কাছে তা-ই। সেই বোধের উপলব্ধি এখন ওর হয়েছে। কান্ত কামারের মেয়ের পরিচয়ে ও কেবল মাত্র সুখী না, গর্বিত।

কিন্তু এই অম্বরনাথকে নিয়ে চৈতি মন থেকে কৌতূহলকে নিরস্ত করতে পারে না। তিনি কেন ওর প্রতি জন্মদিনে একটি করে মূল্যবান উপহার দিয়ে যান? তিনি বছরের সেই দিনটিতে কখনো দিনের বেলা সকলের সামনে আসেন না। আসেন সন্ধ্যার পরে। ব্যক্তিটির আচার আচরণকে ওর খুব স্বাভাবিক লাগে না। মনে হয়, তিনি যেন গোপনে লুকিয়ে আসেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে থাকে একটা অসহায় বোবা ব্যথার অভিব্যক্তি। অথচ বাবার পর্যন্ত বিশেষ নিষেধ আছে, চৈতি যেন এ কথা কারোর কাছে প্রকাশ না করে। চৈতির বিস্ময়ও সেই কারণে অধিকতর। বাবার মতো উদার নির্ভিক প্রাণখোলা মানুষের এমন নিষেধ কেন? স্বভাবতই অম্বরনাথের কাছ থেকে প্রতি জন্মদিনে মূল্যবান উপহার নিতে, ওর দ্বিধা হয়। আড়ষ্টবোধ করে। সম্পর্কহীন একজন ব্যক্তি কেন ওকে উপহার দেবেন?

চৈতি বাবাকে প্রশ্ন না করে পারে নি। বাবার একটিই জবাব, 'অ রে মা, জীবনের সব কথা, সব সময়ে জানা যায় না। আমার নাম কান্ত কামার, অন্যায় কিছু হলে, নিজের বেটিকে তা আমি কখনো করতে বলবো না। যখন বলবার সময় আসবে, তখন ঠিক বলবো। এইটুকু জেনে রাখ, উনি তোকে ভালবাসেন। ভালবেসে দিচ্ছেন, নে। ওকে ফেরাস্ না। পন্নাম কর।'

চৈতি বাবার নির্দেশ কখনো অমান্য করে না। উপহার গ্রহণ করে, অম্বরনাথকে প্রণাম করে। অম্বরনাথ যেন ভালবেসে কেমন অস্থিরচিত্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর বয়সের ভার নামা প্রৌঢ় মুখে, অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা ফুটে ওঠে। চৈতির সামনে তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না, বা চান না। বাবাকে এবং অম্বরনাথকে, সেই সময়ে উভয়কেই ওর কেমন রহস্যজনক মনে হয়। তখন যেন তাঁদের দুজনের চোখে, নির্বাক কিন্তু রহস্যময় বার্তা বিনিময় হয়।

চৈতি সামনে থেকে চলে গেলে কান্ত অম্বরনাথকে না জিজ্ঞেস করে পারে না, 'খোকাবাবু, এ খেলা আর কতোকাল চলবে? মেয়ে বড় হয়েছে, ভাবতে শিখেছে। নানা কথা জিজ্ঞেস করে। নেহাত আমার কথায় চুপ করে থাকে। কিন্তু জবাব তো তাকে দিতেই হবে।'

অম্বরনাথ তার কাঁচা-পাকা চুলের মুঠি টেনে অসহায়ভাবে বলে, 'কোনো উপায় নেই কান্ত। জবাব কোনো কালেই মিলবে না।'

কান্ত মনে মনে বলে, 'তা বললে তো হবে না। মেয়ের কাছে চিরকালের জন্য মিথ্যেবাদী হয়ে থাকতে পারবো না। বেঁচে থাকতে না বলতে পারি, মরণকালে

boiRboi.net

সাধ্য মতন মেয়েকে সব কথাই বলে যাবো।'……

সময় ও দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে, এই শালফুলি গ্রামেরও বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে মানুষেরও। তাঁতী খুড়ী মারা গিয়েছে। জীবনের শেষ কয়েক বছর সে আর নিজের বাড়িতে থাকে নি। কান্তর বাড়িতেই সে শেষ শয্যা নিয়েছিল। চৈতির জন্যই বিশেষ করে সে কান্তর বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছিল। কারণ, কান্তর মতো তারও শেষ জীবনে, স্নেহ ভালবাসার অবলম্বন একমাত্র চৈতিই ছিল। তার নিজের তিন কুলে কেউ না থেকেও, সাতকুলের ধন হয়ে উঠেছিল কান্তর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটি। তার বড় সাধ ছিল, চৈতির বিয়ে দেখে যাবে। সে-সাধ মেটেনি।

গ্রামের পরিবর্তনের মধ্যে ছোট একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন আট বেডের একটি হাসপাতাল হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, দুটি বিষয়ে শালফুলি গ্রামের অধিবাসীরা বিশেষ অভাব অনুভব করছিল। একটি নিয়মিত হাসপাতাল, একজন ভালো চিকিৎসক আর একটি ছেলে ও মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দুটি বিষয়ের জন্যই শালফুলির অধিবাসীদের শিবগঞ্জের মুখ চেয়ে থাকতে হতো। এখন সে-অভাব মিটেছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন একটিই। সকালে মেয়েদের ক্লাস হয়। বেলায় ছেলেদের।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, না কি যুগের বাতাস অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, কে জানে। কান্ত আর বৈদ্যনাথের মধ্যে পূর্বের সেই বন্ধুত্ব নেই। দুজনেরই বয়স হয়েছে। কান্তর চুল ধূসর আর পাকানো, মুখে অনেক রেখা পড়েছে। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়, তার পেশীবহুল শরীর এখনো যথেষ্ট শক্ত ও অটুট আছে। সেই জেলে মার খেয়ে যা দুটি দাঁত পড়েছিল। আর একটিও দাঁত পড়ে নি।

বৈদ্যনাথ আগের তুলনায় ক্ষীণজীবী হয়েছে। দাঁত সব বাঁধানো, মাথায় সাদা-কালো পাতলা কিছু চুল। সে নানারকম গ্রাম্য রাজনীতি নিয়ে থাকে, এবং সে এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। একদা সে ভূমিহীন ছিল। এখন সে কিছু জমির মালিক হয়েছে। শালফুলি গ্রামে, বৈদ্যনাথ একমাত্র ভূমিহীন কৃষক ছিল না। কিন্তু রাজনীতি এমন জাদু, গদীতে আসীন নেতা মন্ত্রীরা এমন জাদুকর, তাঁরা বহু রকমের ভেল্কি দেখাতে পারেন। শালফুলির যেখানে যতো পতিত আর বেনামা জমি উদ্ধার করা হয়েছিল, তার ভাগ জুটেছে, দলের দলী বৈদ্যনাথ এবং আরো কয়েকজনের। এই দল করতে গিয়েই, বৈদ্যনাথের প্রথম সূচনা। সে বক্তৃতা করতে শিখেছিল, দল তৈরি করতে শিখেছিল, এবং তা থেকে সুযোগ গ্রহণের পদ্ধতিগুলো আশ্চর্যরকমভাবে আয়ত্ত করেছিলন। এসব সকলে পারে না, সকলের দ্বারা হয় না। বৈদ্যনাথ গ্রামের একজন কেষ্টবিষ্টু ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। সে আর আগের মতো হেলে চাষা নেই। এখন সে ধুতি পাঞ্জাবি পরে, একজন মুখ্য ব্যক্তি, গ্রাম সেবক, এবং তার সেবকও অনেকে।

কান্ত ওসব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু বৈদ্যনাথ চৈতিকে ইস্কুলে ভরতি হতে বাধা দিয়েছিল। সে ইস্কুল কমিটিতেও জায়গা করে নিয়েছিল। কান্তর

boiRboi.net

সঙ্গে সে মেলামেশা আস্তে আস্তে বন্ধ করেছিল। তাতে কান্তর কিছু যায় আসে নি। সেটা অহংকারবশত না, বৈদ্যনাথের পরিবর্তনটা তার চোখে আদৌ ভালো লাগে নি। মনের ভাব সে মনেই রেখেছিল। কিন্তু বৈদ্যনাথ যে চৈতির ইস্কুলে ভরতির ব্যাপারে বাধা দিতে পারে, কান্তর কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। সেই থেকেই দুজনের ঝগড়ার সূত্রপাত। শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তারাপদ বিশ্বাস, ব্রাহ্মণপল্লীর ইস্কুল প্রতিনিধিরাও বৈদ্যনাথের কথা রাখেন নি। চৈতিকে তাঁরা ইস্কুলে ভরতি হতে দিয়েছিলেন।

সময়ের এটাও একটা সর্বব্যাপ্ত পরিণাম, অথচ কোথাও তা বিপরীতগামী। অন্যথায় বৈদ্যনাথের পরিবর্তন সত্ত্বেও সে চৈতির ইস্কুলে ভরতির বিরোধিতা করতো না। আর যাঁদের কাছ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল, তাঁরা করেন নি।

কান্ত চৈতিকে নিতান্ত কামারবাড়ির মেয়ে করে গড়ে তুলতে চায় নি। চৈতির মধ্যেও একটা স্বাভাবিক বুদ্ধির দীপ্তি এবং প্রতিভা ছিল। অল্প বয়স থেকে ও কেবল লেখাপড়াতে মনোযোগ দেয় নি, ফলাফল দিয়ে, গ্রামের সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল। আচরণের মধ্যে চোখে পড়ার মতো, চৈতির সততা, সাহস, ইস্কুলে এবং গ্রামবাসীদের কাছে ওর জনপ্রিয়তা। যদিও হুড়ে আর ডাকাবুকো মেয়ে বলে ওর নাম আছে, সেটা প্রশংসার্থে। স্পষ্ট কথায় ওর জুড়ি নেই, কিন্তু গুরুজন আর মানীদের মান খোয়া যায় না। কিন্তু সংসারের রঙ যেহেতু নিতান্ত এক বর্ণের না, সেই হেতু চৈতিকে সকলে পছন্দ করবে, এমন হতে পারে না। স্পষ্ট কথা কারোর কাছে মন্দ চোপা। ডাকাবুকো মেয়েটি দস্যি আর বেহায়া, কোনো কোনো চোখে।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র তখন, যখন তার আচরণ হয় সহজ অকুণ্ঠ সাবলীল। অহংকার আর কুট কচালি সুন্দর মুখের বিকাশ ঘটায় না। রূপসী চৈতি সেই হিসাবেও সকলের মন জয় করেছে। কিন্তু শ্বাপদ সরীসৃপ কোথায় নেই? তাদের থাবা ও ফণা সর্বত্র উদ্যত। চৈতিকে নিয়ে কান্তর সেটাও একটা ভয়। ভয় নেই স্বয়ং চৈতির। ওর স্বভাবজাত একটা শক্তিও আছে, যা ওকে দিয়েছে একটা দৃঢ়তা, গভীর অনুভূতিবোধ। ওর মধ্যে যে ক্রমে নারীর স্বাভাবিক লজ্জা ও ব্রীড়ার সঞ্চার ঘটছে, তার আর এক নাম ভীরু অসহায়তা না।

বৈদ্যনাথের সঙ্গে কান্তর বিবাদের একটি অন্তর্নিহিত কারণ, চৈতির এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। বৈদ্যনাথেরও একটি মেয়ে আছে, চৈতির সমবয়সী, নাম নমিতা। স্বভাবতই দুই পিতার বিবাদ, দুই কন্যার মধ্যেও আশ্রয় করেছিল। চৈতি বিবাদে যায় না। ও ক্লাসের সেরা ছাত্রী। নমিতা কখনোই চৈতিকে টপকিয়ে প্রথম হতে পারে নি। নমিতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন গৃহশিক্ষক আছেন। চৈতি একাই নিজের পড়াশোনা করে। ওই একটি কারণে, ও শিক্ষিকাদেরও স্নেহ পেয়েছে। ইস্কুল চিরদিনই কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের হীন রাজনীতির স্থান। চৈতিকে তা স্পর্শ করে নি।

বৈদ্যনাথের মন এতোই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, সে চৈতির অজ্ঞাত কুলশীলতা নিয়ে নানা কটু কথা বলে বেড়ায়। কান্তর একটিই কথা, 'বদ্যিনাথ পঞ্চায়েত প্রধান

boiRboi.net

হোক আর ইস্কুল কমিটির লাটের বাটই হোক, আমার মেয়ের বিষয়ে যদি কোনোদিন কিছু বলে, তা হলে ওর মুণ্ডুটা উনুনে গুঁজে দিয়ে নেহাইয়ে ফেলে পিটবো।'

বৈদ্যনাথের প্রাণে সে-ভয়ও আছে। নিতান্ত নিরুপায় না হলে সে কখনোই কান্তর মুখোমুখি আসে না। কান্তকে চিন্তিত করেছে একটি কারণ। গত পনেরো বছরে অম্বরনাথ যে-সব গহনা, প্রতি আঠারোই আষাঢ় শুক্লা ত্রয়োদশীতে দিয়েছে, এখন তার মূল্য কম করে চল্লিশ হাজার টাকা। এসব সে ঘরে রাখতে সাহস পায় না, তবু রাখতে হয়েছে। শিবগঞ্জের মতো শালফুলিতে এখনো কোনো ব্যাঙ্কের শাখা খোলে নি। খুললে, সেখানেই রেখে দিতো।

●

চৈতির জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে চলেছে, যে-ঘটনা বদ্যিনাথ আর কান্তর সম্পর্ককে তিক্ততার চরমে তুলেছে। অথচ তার জন্য কান্ত বা চৈতির কোনো হাত ছিল না। চরম তিক্ততার কারণ, বদ্যিনাথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

ঘটনার প্রথম সূত্রপাত বছরখানেক আগে। চৈতি তখন সবে মাত্র একাদশ শ্রেণীতে উঠেছে। জেলার মেয়েদের আন্তঃবিদ্যালয় কাবাডি খেলার শুরু হয়েছিল শালফুলির মাঠে। খেলতে গিয়ে অঘটন। চৈতি প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে, ছিটকে পড়েছিল দূরে। দম রেখে, আক্রমণ থেকে মুক্ত করেছিল নিজেকে, কিন্তু ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা এক টুকরো, মরচে পড়া এবড়ো-খেবড়ো লোহার হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি বাঁ হাতের কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত। লম্বা আর গভীর রেখায় ছেঁচড়ে কেটে গিয়ে অঝোরে রক্তপাত শুরু হয়েছিল।

শালফুলির স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতালের নবীন ডাক্তার অবনীশ মিত্র সেই সময়ে, অন্যান্য মাননীয় অতিথিবর্গের সঙ্গে বসে খেলা দেখছিল। খেলা দেখতে তার ভালোই লাগছিল, আসলে সে ছিল শালফুলিতে বনবাসের নির্বাসনে। এম. বি. বি. এস. পাস করে, মাত্র পঁচিশ বছরেই কলকতার ঘরবাড়ি পরিবার সমাজ সংসার বন্ধুবান্ধব ছেড়ে শালফুলি গ্রামের ডাক্তার হয়ে আসতে হয়েছে। কলকাতার ডাক্তারি জগতের নোংরা রাজনীতির তথাকথিত প্রতিযোগিতায়, এম. এস. করার সুযোগ পায় নি। অথচ কর্তা ব্যক্তিদের পিঠ চাপড়ানো কপালে জুটেছিল বিস্তর। বেকার বসে থাকার মতো পাপ আর কিছু নেই। এই চিন্তাই তাকে সব ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল গ্রামের চিকিৎসা কেন্দ্রে। কিন্তু বনবাস—বনবাসই। নীতিকথা আর আদর্শবাদ দিয়ে, পরিস্থিতি আর পরিবেশের তারতম্যকে রাতারাতি দূর করা যায় না।

খেলা দেখার উত্তেজনার মধ্যেও, রক্তাক্ত চৈতিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে, মুহূর্তেই তার কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ছুটে গিয়েছিল উদ্বিগ্ন হয়ে। খেলা ভাঙা হৈচৈ-এর মধ্যে কান্ত ব্যাকুল আর্তনাদে ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছিল। অবনীশ নিজেই দায়িত্ব নিয়ে, কান্ত এবং আরো কয়েকজনসহ, চৈতিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। তার মধ্যে চৈতির কয়েকজন বন্ধুও ছিল। অবনীশ ইস্কুল কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়ে, খেলা চালিয়ে যেতে বলেছিল।

boiRboi.net

অবনীশ আদৌ বিভ্রান্ত হয়নি। ক্ষতের গভীরতা আর রক্তপাত তাকে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন করেছিল। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে সে বিলম্ব করে নি। ক্ষত পরিষ্কার করে লম্বা একটা সেলাই দিতে হয়েছিল। ভেবেছিল চৈতি নিশ্চয়ই যন্ত্রণায় চিৎকার কান্নাকাটি করবে। কিন্তু ওকে দাঁতে দাঁত টিপে থাকতে দেখে, মনে মনে অবাক হয়েছিল। যথাবিহিত ইনজেকশনের সময়েও চৈতির মুখ ছিল নির্বিকার। বরং নেহাইয়ের ওপর জ্বলন্ত লোহা পিটিয়ে যে কাজ করে, এখনো এক গণ্ডা জোয়ান লেঠেলের মহড়া একলা নিতে পারে, উদ্বেগে আর ভয়ে বিকৃত হয়েছিল সেই কান্তর মুখ। চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল। চৈতি হেসে বলেছিল, 'বাবা, আমার কিছু হয় নি, ভালো হয়ে গেছি।'

চৈতি হেসেছিল, তরুণ ডাক্তারের গম্ভীর অবাক মুখের দিকে তাকিয়েও। সেই হাসিই ছিল বোধহয় অঘটনঘটন-পটীয়সী। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কেন হেসেছিল চৈতি ? চৈতি তা জানে না, হাসি পেয়েছিল ওর। সেই থেকে আর এক পটের শুরু। সময় তার আপন প্রবাহে, আহত চৈতির মুখে হেসেছিল। অবনীশের মনে হয়েছিল, তার বনবাসের দুঃখ ম্লানতা গেল ঘুচে, নির্বাসিতের প্রাণে লেগেছিল মুক্তির বাতাস। কিন্তু বুঝতে পারছিল না, রুগীটির সেবায় সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নার্স লুকিয়ে হেসেছিল, সেই সঙ্গে চৈতির বন্ধুরা।

অতঃপর কিছুদিন, প্রত্যহ সকালে, চৈতির হাসপাতালে ড্রেস করাতে আসতে দেরি হলে, স্বয়ং অবনীশ ব্যাগ হাতে কান্ত কামারের বাড়ি উপস্থিত হতো। কান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতো। বাড়ির ভিতরে চৈতির মুখে লেগে যেতো রঙের ছটা। অকারণ খুশি চলকিয়ে উঠতো বুকে, কিন্তু গম্ভীর হয়ে অবনীশকে বলতো, 'আমি তো যাচ্ছিলাম, আপনি কেন শুধু শুধু এলেন।'

মেয়েরা শাড়ি পরলেই বড় হয়ে যায়। বয়সের হিসাবে সপ্তদশ, যদিও কিছু কম না। নারী জীবনের অনেক রহস্যই তার কাছে এখন উন্মোচিত। তবু ডাক্তার যখন চৈতিকে 'আপনি' সম্বোধন করে বলতো, 'ভাবলাম, আপনি যা মেয়ে, হয়তো ড্রেস করার কথা ভুলেই গেছেন।'

ডাক্তারের কথা শুনে মুখের দিকে তাকিয়ে, লজ্জার মধ্যেও, চৈতি খিলখিলিয়ে হেসে উঠতো, তারপরে প্রায় ঝেঁজে উঠেই বলতো, 'আপনাকে তো প্রথম দিনই বলে দিয়েছি, আমাকে মোটেই আপনি করে বলবেন না।'

কথাটা মিথ্যা না। অবনীশ অপ্রস্তুত হতো, যদিও 'তুমি' সম্বোধনে দেরি হয় নি। অবনীশও সহজ হয়ে উঠেছিল। বলতো, 'ভেবেছি, এ রুগীকে ড্রেস করতে আমি নিজেই আসবো।'

চৈতি সকৌতুক লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতো, 'কেন ?'

অবনীশ জবাব দিল, 'ডাক্তারদের কখনো কিছু জিজ্ঞেস করতে নেই, কেবল তাদের কথার জবাব দিয়ে যেতে হয়।'

চৈতির আরোগ্য হতে বেশি সময় লাগে নি। ওর মেদহীন চামড়ায় ঘা শুকিয়েছিল তাড়াতাড়ি। সেলাইয়ের দাগটা অবিশ্যি চির অক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

boiRboi.net

কিন্তু কামারবাড়িতে অবনীশের সময়ে অসময়ে আসার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। দায়টা কেবল অবনীশের তখন একলার না। চৈতির চোখের তারায়ও প্রতীক্ষা উন্মুখ হয়ে থাকতো। নারী জীবনের কোনো কোনো রহস্য উন্মোচিত হলেও নিজের ভিতরেও পরিবর্তন কখন ঘটেছিল, চৈতি নিজেও টের পায় নি।

চৈতি অবনীশের মেলামেশার কথাটা না জানাজানি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। গোপন করার চেষ্টা করে নি কেউ।

বৎসর ঘুরে আসতে না আসতেই দেখা গেল, চৈতি তার মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে মাঝে মঝে হাসপাতালেও যায়। হাসপাতালের চারপাশের পরিবেশটি সুন্দর। বড় বড় গাছপালায় ঘেরা, অনেকখানি চৌহদ্দি। অবনের ব্যাচেলার কোয়ার্টারেও সে ঝড়ের মতো মাঝে মধ্যে হাজির হয়। অবনেরও কামারবাড়িতে আনাগোনা ক্রমে বাড়তে থাকে। ছেলেটিকে কান্তর ভালো লাগে। কিন্তু বৃদ্ধ কান্ত, গোপনে দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারে না। এও যে এক সর্বনাশের খেলা! মেয়েকে শাসন করবে ভেবেও করতে পারে না।

অবন কায়স্থ সন্তান। বৈদ্যনাথ তার কানে বিষ ঢেলে দেয়। নিজের মেয়ে নমিতাকে এগিয়ে দেয় অবনের কাছে। যদিও সে নিজে সদ্‌গোপ বংশজাত। কান্ত-বদ্যিনাথের সম্পর্কের তিক্ততার এ হলো সব থেকে বড় কারণ।

★

আজ হায়ার সেকেন্ডারির ফল বেরোতে দেখা গেল, মেয়েদের মধ্যে চৈতি গোটা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কান্ত সবাইকে ডেকে মিষ্টি খাওয়ালো। আর নিজে বোতলে চুমুক দিয়ে হেঁহে নৃত্য। বোতল যাদের চলে, তারাও বাদ গেল না। অবন তো এ দিনটিতে ভালো করে রুগীদের দিকে মনোযোগই দিতে পারলো না। এক ফাঁকে এসে চৈতিকে আড়ালে ডেকে সে বললো, 'আজ তোমাকে আমি কোনো উপহার দেবো না। আগামীকাল তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াবে। আর তোমার বাবার সঙ্গে কালই আমি কথা বলতে চাই। সব ব্যবস্থা পাকা করে তোমাকে আমি কলকাতায় কলেজে পড়তে পাঠাবো।'

চৈতি লজ্জা পেয়ে বললো, 'আপনাকে রেঁধে খাওয়াতে পারি। কিন্তু আমার বাবাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।'

অবন বলল, 'বাঃ, তা কি করে হয়? মেয়েরা বিয়ে হলে স্বামীর কাছেই থাকে।'

'তাহলে আমি বিয়েই করবো না।' চৈতি হেসে অবনের কাছ থেকে পালাবার উদ্যোগ করে।

অবন চৈতিকে ঝটিতি ধরে ফেলে, নিজের কাছে টেনে নিল, আবেগ স্খলিত স্বরে বললো, 'চৈতি, তুমি কি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিতে চাও?'

চৈতি আরক্ত মুখে আনত চোখে বললো, 'যা বলার আপনি বাবাকে বলবেন। তবে আমার বাবার কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমি করতে পারবো না।'

অবন বললো, 'বেশ, তাই হবে। তোমার বাবা যা বলবেন, আমি তাই করবো।'

অবন পরের দিন দুপুরের যেচে নেওয়া নিমন্ত্রণে চৈতির হাতের রান্নায় ভুরিভোজন সেরে, কামারশালায় কান্তর পায়ের কাছে বসে, তার মনোবাসনা নিবেদন

boiRboi.net

করলো। কান্ত একেবারে অপ্রস্তুত ছিল না। সে পরিষ্কার বললো, 'তুমি বাবা কলকাতার ভদ্র বাড়ির সন্তান। শুনেছো তো, এ মেয়ে আমার কুড়িয়ে পাওয়া। এতে গোপন কিছু নেই। চৈতি সুখী হোক, আমি চাই। কিন্তু তোমার বাবা মা রাজী হবে কেন ?

অবন বললো, 'সে দায়িত্ব আমার! আমি তো চুরি করে কিছু করছি না। দশজনকে জানিয়ে, পুরোহিত ডেকে মন্ত্র পড়ে, আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। আপনি দয়া করে সম্মতি দিন। চৈতি বলেছে, আপনিই ওর সব। আপনাকে কষ্ট দিয়ে ও বিয়ে করতে পারবে না।'

'বলেছে ?' কান্তর বৃদ্ধ চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে উঠলো, 'আচ্ছা, আমি মেয়ের সঙ্গে একবারটি কথা বলি তারপরে তোমাকে যা বলবার বলবো।'

অবন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল। সন্ধ্যার কোল আঁধারে এলো অম্বরনাথ। চৈতিকে বিশেষ আশীর্বাদ জানাতে এসেছে, পরীক্ষায় প্রথম হবার জন্য। আজ আঠারোই আষাঢ় নয়, তথাপি সে একটি মুক্তার হার উপাহার নিয়ে এসেছে। হারটি চৈতির হাতে তুলে দিয়ে, সে যেন প্রণাম নেবারও অবকাশ পেলো না। চৈতি আর কান্তকে অবাক করে দিয়ে, দু হাতে মুখ ঢেকে, প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। কান্তই একমাত্র বুঝলো, অম্বরনাথের প্রাণে কোথায় বিষের জ্বালার প্রতিক্রিয়া ঘটছে। কিন্তু এই একটি বিষয়ে তার কিছুই করার নেই। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অভাগী রমণী মূর্তি, যে মৃত অবস্থায় পড়েছিল, ঝড়ে উৎখাত গাছের ঝাড়ে।

বৈদ্যনাথের মনে শান্তি ছিল না। সে প্রায় ক্ষিপ্ত উন্মাদ হয়ে উঠেছে, যখন শুনতে পেলো, চৈতির সঙ্গে অবনের বিবাহ ঘটতে চলেছে। যুগ পরিবর্তনের ধারা সবাইকে বদলাতে পারে না। কুয়ার ব্যাঙ কুয়াতে থেকেই ত্রাহি চিৎকার করে। আবার অনেকের পরিবর্তন ঘটে। যাঁদের ঘটেছে, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে, সকলেই অবন আর চৈতির বিবাহে সম্মতি দিলেন।

বৈদ্যনাথ নিজে ছুটলো কলকাতায়, অবনের বাবা দাদাকে খবর দিতে, এবং তাঁদের নিয়ে সদলবলে ফিরে এলো। গোটা শালফুলি গ্রাম জুড়ে দ্বন্দ্ব আর জটলা। অবনের বাবা অহীন্দ্র মিত্র স্বয়ং কান্তর কামারশালায় এসে ঘোষণা করলেন, কোনো অজ্ঞাতকুলশীলার সঙ্গে তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে পারবেন না। এর ফলে, পুত্র আত্মহত্যা করতে পারে, অথবা উনি নিজেই বিবাহ-বাসরে আত্মঘাতী হবেন। কান্তর বাড়িতে যখন এই নাটকের পালা চলছে, তখন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে উঠলো। স্বয়ং অম্বরনাথের আবির্ভাব হলো সেই আসরে!

কান্ত ছাড়া সকলেই অবাক হতবুদ্ধি। এই আসরে শিবগঞ্জের অম্বরনাথ চাটুয্যের আবির্ভাব কেন ? জবাব দুইটি। পাপ কখনো গোপন থাকে না। সন্তান-স্নেহ সকল মিথ্যার, কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে। অম্বরনাথ ঘোষণা করলো, চৈতি তার ঔরসজাত কন্যা। স্বীকার করলো নিজের মুখে, চৈতির মাকে সে লোক দিয়ে হত্যা করেছে। মেয়েকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। এই কান্তর জন্য তা সম্ভব হয় নি।

boiRboi.net

বৈদ্যনাথ যখন পুলিস ডেকে এনে হাজির করলো, অম্বরনাথ তখন সেই পাপ-রহস্যের উন্মোচন করলো। বর্তমান স্ত্রীকে বিবাহের আগে, সে একটি গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শিবগঞ্জের পূর্বাঞ্চল গ্রাম, কালীনগরের অধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে সতীকে সে ভালোবেসেছিল। দরিদ্র বিপত্নীক অধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং গোপনে পুরোহিত ডেকে তাঁর কন্যাকে দান করেছিলেন। সতী ছাড়া অধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু শিবগঞ্জের চাটুয্যে বাড়ির অর্থের প্রতি তাঁর লোভ ছিল, যে-কারণে এমন একটি গর্হিত কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁকে বঞ্চিত করেছিল তাঁর ভাগ্য। অম্বরনাথকে কন্যাদান করার পরে তিনি বেশি দিন বাঁচেন নি। থাকলে হয় তো সতী-হত্যার বিষয় গোপন করা যেত না। অম্বরনাথ এসব কথা তার পরিবারের কাছে কখনো প্রকাশ করতে পারে নি। বরং লোভে পড়ে, অন্য কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য, সতী ও তার কন্যাকে সে পৃথিবী থেকে সরাতে চেয়েছিল।

অম্বরনাথ প্রতিটি কথা অকম্পিত স্বরে ঘোষণা করে বললো, 'আমি ইতিমধ্যেই আমার উইল তৈরি করেছি, চৈতি আমার কন্যা, স্বীকারোক্তিসহ, আমার দুই ছেলের সঙ্গে, ওকে সমান অংশে সম্পত্তি লিখে দিয়েছি।'

অম্বরনাথ শিবগঞ্জ থানার ও সি-র দিকে তাকিয়ে বললো, 'অফিসার, আমি আপনার সঙ্গে থানায় যাচ্ছি। মেয়েকে একবারটি আশীর্বাদ করে যেতে চাই। কান্ত, আমার মেয়েকে একবার ডাকো।'

কান্তর দুই চোখ বাষ্পাকুল। বাড়ির ভিতর ছুটে গিয়ে চৈতিকে ধরে নিয়ে এলো। চৈতি সবই শুনেছে, এবং একটা আচ্ছন্নতা নিয়ে ও অম্বরনাথের সামনে এসে দাঁড়ালো। অম্বরনাথ পকেট থেকে একটি ছোট বাকসো বের করে বললো, 'চৈতি, সব কথা শুনেই আমি ছুটে এসেছি। দিনক্ষণ দেখেছি, আগামীকাল সন্ধ্যালগ্নে বিয়ের লগ্ন আছে। এই বাক্সে তোমার মায়ের হাতের নোয়া চুড়ি আর হার আছে, রেখে দাও। আমি বলবো না, এ পাপীকে তুমি বাবা বলে একবার ডাকো। তবে বিয়ে যেন কালকের লগ্নেই হয়।' বলে পকেট থেকে একটি হীরের আঙটি বের করে কান্তকে দিয়ে বললো, 'কান্ত, আমার হয়ে ছেলেকে তুমি এই আঙটি দিয়ে আশীর্বাদ করো।' কথা শেষ করেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

কান্ত তার জীবনে এই প্রথম ব্যাকুল আর্তস্বরে অম্বরনাথকে ডাকল, 'অ গ খোকাবাবু, খোকাবাবু গ, একবারটি শোন।'

অম্বরনাথ ফিরলো না। স্বয়ং থানার ও, সি. উদ্বিগ্ন মুখে সদলবলে ছুটলেন অম্বরনাথের দিকে। চৈতি যেন নির্বাক প্রতিমা। সারা গ্রামের তোলপাড় আলোড়ন থেকে ও নিজেকে ঘরের কোণে আড়াল করে রেখেছিল। বিশেষ করে, কলকাতা থেকে অবনীশের বাবার আগমন, তাঁর অপমানকর কথাবার্তায়, লজ্জায় ঘৃণায় রাগে শক্ত হয়ে বসেছিল। এখন ওর এলো চুল, লালপাড় শাড়ি পরা। হাতে মৃত মায়ের গহনার বাকসো। আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ও ডাকলো, 'বাবা!'

'না না না, আর আমাকে বলিস না চৈতি।' কান্ত ছেলেমানুষের মতো উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে বললো, 'আমি যে এ দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

boiRboi.net

কিন্তু সে যে এমন চেহারা নিয়ে আসবে, তা জানতাম না। যে-তোর সত্যিকারের বাপ, তাকে একবার বাবা বলে ডাক।'

চৈতি কান্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললো, 'বাবা, আমি সবই শুনেছি। অম্বরনাথ চাটুয্যে আমাকে জন্ম দিতে পারেন, কিন্তু তুমিই আমার বাবা, আমার ভগবান, আমার রক্ষাকর্তা। আমি তোমাকে ছাড়া সংসারের কিছুই জানি না।'

'অরে চৈতি, অমন করে বলিস না।' কান্ত হাহাকার করে উঠলো।

অবনের বাবা অহীন্দ্র মিত্র এ সময়ে এগিয়ে এসে চৈতিকে বললেন, 'তুমিই ঠিক বলেছো মা…'

'আপনি চুপ করুন।' চৈতি দৃঢ় শান্ত স্বরে বললো, 'আমি কামারের মেয়ে বলে, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়েতে অরাজী হয়েছিলেন। নিজের ছেলেকে আত্মহত্যা করতে বলেছেন, নয়তো নিজেই আত্মঘাতী হতে চেয়েছেন। আপনারা দয়া করে ফিরে যান। আমি আপনার পুত্রবধূ হতে পারি না।'

কান্ত চিৎকার করে উঠলো, 'না না, অমন কথা বলিস না চৈতি। অবনের কথা ভুলে যাস নে মা।'

অবন কাছে এসে বললো, 'চৈতি, আমি তো তোমাকেই চেয়েছি, তোমার জাত চাই নি। আমাকে কেন বঞ্চিত করবে?'

'না না অবন, তোমাকে চৈতি কখনো বঞ্চিত করবে না।' কান্ত তার হাত ধরে বললো, 'তুমি তো কান্তর মেয়েকেই বিয়ে করছো। কালকের লগ্নেই বিয়ে হওয়া চাই।'

★

চৈতির চোখের জলের মধ্যেই শুভকাজ সম্পন্ন হলো। কান্তর ইচ্ছানুসারেই বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল তারাপদ বিশ্বাসের বড় পাকা কোঠা বাড়িতে। রাত্রে বাসরে ঢুকে, চৈতি প্রথমেই খোঁজ নিল, 'আমার বাবা কোথায়?'

বিবাহের উৎসব কোলাহলে, কান্তর কথা সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। এখন চৈতির কথায় খোঁজ পড়লো। চারদিকে কান্তর খোঁজ পড়ে গেল। কোথাও কান্ত নেই। চৈতি বাসর ঘর ছেড়ে, অন্ধকারে একলা ছুটলো কামারবাড়ির দিকে। অবনও ছুটলো। ছুটলো অনেকেই। চৈতি বাড়ি ঢুকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, 'বাবা! বাবা! ওগো আমার বাবা!'

নানা জনে নানা পাড়ায় ছুটলো। কিন্তু কান্ত তার বাড়ির পিছনে, ডোবার পাশ থেকে ঘোর মাতাল অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। দু চোখ জলে ভাসছে। চৈতি কান্তর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলো, 'বাবা, বাবা, কোথায় চলে এসেছো?'

কান্ত কন্যার বিচ্ছেদব্যথা গোপন করে বললো, 'কোথাও নয় মা, বাড়িতেই এসেছি।'

চৈতি কেঁদে বললো, 'কেন তুমি আমাকে ফেলে এসেছো? আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।'

কান্ত অস্ফুট স্বরে বললো, 'তা কি হয় মা?'

boiRboi.net

'তাই হবে বাবা !' চৈতি কান্তর পায়ে লুটিয়ে বললো, 'বাবাগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে কোথাও পাঠিও না !'

অবনও চৈতির সঙ্গে বসলো, ওর মাথায় হাত রেখে বললো, 'তোমার বাবার কাছ থেকে, তোমাকে কোথাও ছিনিয়ে নিয়ে যাবো না। যখন তোমার ইচ্ছে হবে, তখন তুমি আমার সংসারে আসবে।'

কান্ত মাথা নেড়ে বললো, 'তা হয় না। চৈতি, যদি আমাকে বাবা বলিস, তবে বাবার কথা শোন। স্বামীর ঘরে তোকে যেতেই হবে। চল্, আমিই আজ রাত্রে তোকে অবনের ঘরে দিয়ে আসি।'

অবনের চোখে জল। ওর বাবা দাদার চোখেও জল। তারাপদ বিশ্বাস বলে উঠলেন, 'শালফুলিতে এমন পুরুষসন্তান আর জন্মাবে না।'

কান্ত বুকের দু দিকে চৈতি আর অবনকে নিয়ে চললো। কে যেন চিৎকার করে বললো, 'সানাই কোথায়, ঢাক ঢোলক কোথায় ? বাজাও, বাজাও !'......

সানাই বেজে উঠলো। চোখের জলের মধ্যে, এক অনির্বচনীয় আনন্দ সুধায়, সেই সুর বেজে উঠলো।

boiRboi.net

অন্ধকারে আলোর রেখা

boiRboi.net

তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে আমি কখনো রত হইনি। অতএব সে-হিসেবে আমি নিজেকে একজন অভিজ্ঞ তান্ত্রিক বলতে পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি কয়েকজন হিন্দু তান্ত্রিক এবং সহজিয়া তন্ত্রসাধক-সাধিকার সঙ্গলাভ করেছি। তাঁদের ধর্মীয় বৈঠকে, আলোচনামূলক নানা কথা শুনেছি। এমন কি তাঁদের চক্রে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সৌভাগ্য বলছি এই কারণে, তন্ত্রসাধনার সমস্ত বিষয়ই অত্যন্ত গুহ্য এবং গোপনীয়। সাধক সাধিকাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়, যা একমাত্র তাঁরা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সহজিয়া সাধকরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে, এক ধরনের প্রতিজ্ঞাসূচক শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন, যা আমি তাঁদের কাছেই শুনেছি, "আপন সাধন কথা/না কহিবে যথা তথা।"

বর্ধমান জেলার প্রত্যন্তদেশের একটি গ্রামে—যার একটি সীমা বীরভূম জেলা ও গঙ্গার অপরপারে মুর্শিদাবাদ, এক কৌলমার্গী সাধক তান্ত্রিক তাঁর চক্রে আমাকে, এমন কি বাহ্যিক অংশগ্রহণেও অনুমতি দিয়েছিলেন। সে-বিষয়ে আমি পরে সবিস্তর বর্ণনা দেবো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "এই সাধনার এক নাম ভোগমোক্ষ। অর্থাৎ ভোগের দ্বারা মোক্ষলাভ। অথবা বলতে পারো, ভোগের মধ্য দিয়ে যোগ। এই 'ভোগ' বিষয়টি সাধনার এমন একটি অঙ্গ, অনেকেই একে সহজ ভেবে ব্যভিচার মনে করতে পারে। 'অনধিকারী' ব্যক্তিকে আমরা 'পশু' জ্ঞান করি। অতএব তাদের কাছে আমাদের সাধন বিষয় অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। কারণ, পঞ্চ'ম' কারে তারা নিজেরাই প্রলুব্ধ হতে পারে। নিজের হীন প্রবৃত্তিকে আশ্রয় দিতে পারে। মানুষ মাত্রেই মদ মাংস মৎস্য মুদ্রা আর মৈথুনে লুব্ধ হতে পারে। কিন্তু তারা গুরুর দ্বারা শোধন সাধন কিছুই পায় না। গুহ্যাতিগুহ্য কঠিন সাধনার মর্ম বা মন্ত্রও তারা কিছুই জানে না। সেই জন্যই, বাইরের লোকের কাছে শক্ত নারকেলের খোলের মধ্যে শাস এবং জলের মতোই আমাদের সাধন বিষয়কে গোপন রাখি।"·· এই বয়স্ক অথচ স্বাস্থ্যবান ব্রাহ্মণ সাধক আমাকে আরও বলেছিলেন, "তোমাদের হয় তো ধারণা, তন্ত্রশাস্ত্র বেদ বা উপনিষদ বহির্ভূত ধর্ম। আদৌ তা নয়। তন্ত্র আরও প্রাচীন, তারই নিদর্শন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে 'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তয় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।' পরাকল্পে বেদান্তে যে গুহ্য পরমতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা, প্রশান্ত নয়, ছেলে বা শিষ্য নয়, তাকে দেবে না।"

যে-সাধন বিষয়ে এই প্রকারের নিষেধ এবং গোপনীয়তা মেনে চলা হয়, তার কিছু কিঞ্চিৎ সাক্ষী থাকতে পারা, সাধকদের কাছ থেকে তাঁদের সাধন প্রণালী ও তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানতে পারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলে, একজন হিন্দু তন্ত্র সাধকের এবং তাঁর উত্তরসাধিকা ভৈরবী এবং আসন্ন অভিষেকের জন্য

boiRboi.net

প্রতীক্ষামনা একজন কুমারী সাধিকার সাক্ষাৎ ও সাহচর্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম ১৯৪৭-এর নভেম্বরে, আসামের কামাখ্যা পাহাড়ে। বস্তুত তন্ত্র সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যা আমি সেই তান্ত্রিক সাধক এবং তাঁর সাধিকার কাছেই শুনেছিলাম, যা আমাকে বিস্মিত এবং বিহ্বল করেছিল। আমি তাঁদের বিশ্বাস স্নেহ এবং ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাঁদের বাহ্যিক পোশাক-আশাক বসনভূষণ আচার ব্যবহার আমাদের মতো সাধারণের থেকে আলাদা হলেও, যে-কদিন তাঁদের সঙ্গলাভ করেছিলাম, মনে হয়েছিল, আমি যেন একটি পবিত্র স্নেহকোমল পরিবারের আশ্রয়ে আছি। কোনো সন্দেহ নেই, সেই সাধক পুরুষ, আমরা যাকে আধুনিক জ্ঞান বা শিক্ষা বলি, তা তাঁর যথেষ্ট আয়ত্তে ছিল। তিনি কেবল তন্ত্র বিষয়ে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নি, আমরা মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে, তাঁর অনুকম্পাতেই আমি আশাতীত চক্রানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। বর্ধমানের সেই সাধকের মতো তিনি আমাকে কোনো বাহ্যিক অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করতে দেননি, কিন্তু আমার জীবনের বিরলতম, এবং প্রথম চক্রানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিরলতম বলছি এই কারণে, পঞ্চ'ম' কারের যেটি শেষ ও প্রধান ক্রিয়া মৈথুন, যাকে তাঁরা বলে থাকেন, "শিব স্বরূপ সাধকের সঙ্গে শিবস্বরূপিনী সাধিকার সংযোগ" শুধু তারই সাক্ষী ছিলাম না। সেই উজ্জ্বল প্রভাময়ী কুমারী সাধিকা যিনি দীক্ষান্তে, নিজেকে পূর্ণ অভিষেকের জন্য কঠিন সাধনার দ্বারা প্রস্তুত করেছিলেন, এক উজ্জ্বলকান্তি যুবাপুরুষ সাধকের সঙ্গে, সেই চক্রে তাদের মিলন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অবিশ্যি সেই চক্রে, সেই সাধক তান্ত্রিক পুরুষ এবং তাঁর সাধন সঙ্গিনী অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন চক্রটিকে পরিচালনা করছিলেন, এবং তাঁর নবীন শিষ্যশিষ্যার পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেই চক্রানুষ্ঠানের তিন দিন আগে, নবীন সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল। নবীন সাধকের আবির্ভাব আকস্মিক কোনো ঘটনা না, আগে থেকেই দিনক্ষণ অনুযায়ী সব যোগাযোগ এবং ব্যবস্থা ছিল। তন্ত্রের সাধন সঙ্গিনী বিষয়ে আমার কতকগুলো অস্পষ্ট ধারণা ছিল। তন্ত্র সাধকরা তাঁদের সাধনসঙ্গিনীদের 'শক্তি' বা 'ভৈরবী' আখ্যা দিয়ে থাকেন, আর সেই ভাবেই তাঁকে পুজো ও বরণ করেন। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মধ্যে যে এক শ্রেণীর বিবাহের প্রচলন আছে, এ কথা আমি আগে কখনো শুনিনি।

আগে কখনো শুনিনি বলার কারণ, আমি নিজে শাক্ত পরিবারের সন্তান। তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলার আগে, ভূমিকা হিসাবে আগেই সে-কথাটা বলে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমার এই পরিচয়ের দ্বারা এ কথা বলা যায় না, শাক্ত পরিবারে জন্মালেও, আমাদের গৃহে আমি কখনো তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। আমার বাবা এবং মায়ের যিনি গুরুদেব ছিলেন, তাঁকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি, আমাদের প্রাক বিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা শহরের বাড়িতে। মাস কয়েক আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আজানুলম্বিত বাহু সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বড় বড় চোখ দুটো লাল। দুই হাতের ডানায় রুদ্রাক্ষের তাগা, গলায় রুদ্রাক্ষের ও প্রবালের মালা। তাঁর মাথা ছিল মুণ্ডিত, কিন্তু শিখার সঙ্গে একটি জটা মাথায় জড়ানো থাকতো। গেরুয়া বস্ত্র কচ্ছহীন আর গায়ে এক টুকরো

boiRboi.net

চাদরের মতো ব্যবহার করতেন। কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। গায়ের নানাখানে ভস্মের প্রলেপ। পায়ে খড়ম। তাঁর গম্ভীর মোটা স্বরের হাঁক শুনলে ভয় পেতাম, অট্টহাসি শুনলে ভয়ে পালিয়ে যেতাম। অথচ আমার বাবার শ্যামাসঙ্গীত শুনতে শুনতে তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়াতো, এবং একরকমের ভাবাবেশ হতো। তিনি সব সময়েই সদলবলে চলাফেরা করতেন। বাবা মায়ের সঙ্গে একাধিকবার তাঁর গৃহে গিয়েছি, দেখেছি একটি ঘরের বড় এক কুলুঙ্গিতে লাল বস্ত্রের ওপর রক্ষিত একটি সিন্দুর চর্চিত নরকরোটি, আর সিন্দুর মাখানো একটি ত্রিশূল। পাশেই পটে আঁকা কালীর মূর্তি এবং কাপড়ের ওপর আঁকা তিনটি 'যন্ত্র'। আসলে সেগুলো যে 'যন্ত্র' তা আমি তখন মোটেই বুঝতাম না। বড় হয়ে জেনেছি, তান্ত্রিক কল্পনায়, দেহের অভ্যন্তরে কল্পিত বিভিন্ন নাড়ির অঙ্কিত সংকেত চিহ্নই যন্ত্র। মূলতঃ এই যন্ত্রের কল্পনা পুরুষের লিঙ্গ ও নারীর যোনিকে ও পায়ুস্থানকে কেন্দ্র করে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষয়টিকে হিন্দু তান্ত্রিকেরা নানা যন্ত্র আর ক্রিয়ার দ্বারা অত্যন্ত জটিল করে তুলেছেন। আসলে বিষয়টি অতিমাত্রা কামকালা বিষয়ক। সহজিয়া সাধকবৃন্দ আমাকে বিষয়টি অনেক বেশি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে হিন্দু ও সহজিয়া সাধকদের বক্তব্য আমি আরও বিস্তারিত ভাবে বলবো।

যাই হোক, শাক্ত পরিবারের সন্তান বলেই, আমার এই মধ্য বয়সেও তন্ত্র সম্পর্কে বিশদ জানবার একটা কৌতূহল রয়ে গিয়েছে কী না জানি না কিন্তু আমি অনেক সাধকের দ্বারস্থ হয়েছি, বা আমাকে যেন কেউ হাতছানি দিয়ে তাঁদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অথচ প্রথম যৌবনেই আমার বাবার মুখে "ঊর্দ্ধরেতঃ সিদ্ধপুরুষের" কথা শুনে অবিশ্বাস বশতঃ হেসে উঠে, বেশ শক্ত হাতের একটি চড় খেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমি সাধকদের সঙ্গলাভ করে আর অবিশ্বাস বশতঃ হেসে উঠতে পারিনি।

অনেক বস্তুতান্ত্রিক তাত্ত্বিক অবিশ্যি "সাধন" বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে আদি মানব গোষ্ঠীর জমির উর্বরতা, ফসলের ফলন বৃদ্ধি সেই কারণে নানা জাদুমন্ত্র ও যৌনক্রিয়াকেই, তন্ত্রের মূল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক জগতের অনেক বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার উল্লেখ করেছেন। এ কথা ঠিক, জন্মরহস্য অজ্ঞাত আদিম মানুষ নারীকে এক অপার রহস্যময়ী মহাশক্তি বলেই বিশ্বাস করতো। পরবর্তী বহুকাল পরেও, সব জেনেও, নারীর প্রাধান্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, এবং তন্ত্রের সঙ্গে এ বিষয়ের যোগাযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যানুযায়ী তন্ত্র একটি ধর্মীয় বিকৃতি মাত্র। এটা বিশ্বাসযোগ্য না। বস্তুতপক্ষে এই তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের "যৌগিক" ক্রিয়াকান্ডের কোনো মূল্যই দিতে চান নি। কেবল আদিম উর্বরা শক্তির জাদু যৌনক্রিয়ার ওপর একটি আরোপিত আধ্যাত্মিক ধর্মীয় রূপ দিতে চেয়েছেন।

তন্ত্র—তা হিন্দু, বৌদ্ধ, সহজিয়া যে-কোনো মতেরই হোক, সাধকদের সিদ্ধিলাভের প্রথম ও প্রধান ক্রিয়া যোগ সাধনা। বলতে গেল, যোগ সাধনা ছাড়া, এ পথে কেউ অগ্রসর হতেই পারে না।

আমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রকাশের আগে, তন্ত্রে বিবাহের প্রচলন বিষয়টির

boiRboi.net

উল্লেখ করে নিই। কামাখ্যা পাহাড়ের সেই তান্ত্রিক আশ্রমে, আমি জেনেছিলুম, কুমারী সাধিকার সঙ্গে যুবা পুরুষ সাধকের বিশেষ একটি মতে বিবাহ হয়েছিল। আমাদের সনাতনধর্মী সমাজে প্রচলিত বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহের পত্নী গৃহেশ্বরী। আর তান্ত্রিক কুলচক্রে শৈব বিবাহের বিহিত আছে। এ বিবাহও দুই রকম। এক, চক্রানুষ্ঠানকালের জন্য। দুই, সারাজীবনের জন্য। সেই কুমারী সাধিকার সঙ্গে সাধকের প্রথমোক্ত মতে বিবাহ হয়েছিল, এবং এই বিবাহের স্ত্রীকে ভৈরবীচক্রে গ্রহণ করা যায়, এবং তাকে পরশক্তি বা পরকীয়া শক্তি বলা হয়। বলাবাহুল্য বিবাহের পৌরোহিত্য করেছিলেন সেই তত্ত্বজ্ঞানী তান্ত্রিক সাধক এবং তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, ব্রাহ্মবিবাহের স্ত্রীকে যদি শৈববিবাহের দ্বারা সংস্কৃত করা হয়, তবে তাকে ভৈরবীচক্রে গ্রহণ করা যায়। সাধনসঙ্গিনী দুই রকম, স্বকীয়া আর পরকীয়া। এটি পরকীয়া।"

*

আমার আঠারো বছর বয়সে, কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। স্থানটিকে সাধুঘাট বলা হয়। সেখানে বট আর অশ্বত্থ গাছের নিবিড় ছায়াতলে বিস্তৃত বেদীতে দু তিনটি ছোটখাটো মাটির ঘর ছিল। সেই ঘরগুলোতে কয়েকজন জটধারী সাধুর বাস ছিল। তাঁদের সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না, এবং সঠিক জানতাম না, তাঁরা কোন্ সম্প্রদায়ের। মুখ চেনা ছিল অনেকেরই। অধিকাংশই ছিলেন ভস্মাচ্ছাদিত কৌপীনধারী। আশপাশ অঞ্চল থেকে ভক্ত নরনারীদের আগমন ঘটতো। অনেক সময় সাধুদের কেউ কেউ আমার কাছে 'দান' চাইতেন। দান মানেই পয়সা, যা দিয়ে আমার পুণ্য লাভের উপায়।

একদিন সাধুঘাটে বেড়াতে গিয়ে, হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। আমি সাধুদের আস্তানায় ঢুকে পড়ি। প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ নেই। কিন্তু একটি ঘরের দরজা খোলা ছিল এবং সেই ঘরে একজন গোঁফদাড়িওয়ালা মাথায় জটা সাধু বসেছিলেন। আমাকে দেখ তিনি ভিতরে ডাকলেন, "আও বেটা, অন্দরমে আকে বৈঠো।"

মাথার ওপরে গাছ আমাকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে পারছিল না। আমি ঘরের ভিতরে গিয়েছিলাম। গঙ্গার দিকে একটি ছোটো ফোকর ছাড়া আর কোনো জানলা ছিল না। দরজাও একটিই। সাধু আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন, তারপরে বললেন, "আমি তোমাকে যোগ দেখাতে চাই, দেখবে ?"

আমি তাঁর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারিনি। খানিকটা অবিশ্বাস এবং হাস্যকর কিছু দেখবার আশায় বলেছিলাম, "দেখবো"।

সাধুর গায়ে গেরুয়া কাপড় জড়ানো ছিল। সেটা খুলে তিনি দরজার সামনে থেকে সরে এক পাশে বসলেন। আমি কিছু ভেল্‌কি দেখার আশায় কৌতূহলিত। কিন্তু আমি হতচকিত বিস্ময়ে দেখলাম, সাধু তাঁর একমাত্র পরিহিত কৌপীনটি কোমর থেকে খুলে ফেললেন। তিনি একেবারেই নগ্ন, এবং আমি অধিকতর বিস্ময়ে দেখলাম, সাধু একজন লিঙ্গহীন পুরুষ ! লিঙ্গস্থানে একটি গোল দেড় ইঞ্চি ডায়মেটারের তামার পাত !! অথচ তাঁর অণ্ডকোষদ্বয় বর্তমান। আমার সঙ্গে সাধুর চোখাচোখি হলো।

তিনি হাসলেন, কিন্তু আমি লজ্জা ও সংকোচবোধ করেছিলাম। ভাবছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো কী না।

কিন্তু সাধু সেই মুহূর্তেই আমার কৌতূহল ও বিস্ময়কে তুঙ্গে তুলে, লিঙ্গস্থান থেকে তামার পাতটি খুলে ফেললেন, আর যেন একটি ছিদ্রের ভিতর থেকে টেনে বের করলেন একটি শিথিল পুরুষ লিঙ্গ যা প্রায় মাটি স্পর্শ করলো। ব্যাপারটা সম্যক বুঝে ওঠার আগেই, তিনি তাঁর শিথিল লিঙ্গটি কয়েকবার নড়াচড়া করলেন, এবং জোরে নিশ্বাস টেনে দম বন্ধ করলেন। আমি তাঁর তলপেট কেঁপে উঠতে দেখলাম, এবং আরও দেখলাম লিঙ্গটি উচ্ছ্রিত ও শক্ত হয়ে উঠলো। এখন আর তাঁর হাত দিয়ে অঙ্গটি ধরা নেই। অথচ অঙ্গটি একবার ডাইনে ফিরলো, তারপর বাঁয়ে, তারপরে ঊর্ধ্বে, তারপরে নিম্নে। এরকম কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে ঊর্ধ্বে নিম্নে চালিত হবার পরে, অঙ্গটি চক্রাকারে কয়েকবার পাক খেলো। এই সময়টা প্রায় দেড় মিনিট সাধু বারেবারেই নিশ্বাস টেনে নিচ্ছিলেন, এবং আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করার পরে, অঙ্গটি পূর্বাবস্থা ফিরে পেলো। তখন তিনি তাঁর শিথিল অঙ্গটি আবার চেপে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, সেই তামার পাতটি জুড়ে দিলেন, এবং কৌপীন পরে, হেসে আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখলে তো ?"

দেখেছি নিঃসন্দেহেই, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তাই তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারিনি। সাধু তাঁর গেরুয়া কাপড়টি গায়ে চাপিয়ে হেসে বললেন, "বেটা, আমি তোমাকে যোগ দেখালাম তুমি আমাকে কিছু দর্শনী দাও।"

দর্শনী মানেই পয়সা, এবং তার জন্যও সেই মুহূর্তে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সেই বয়সে আমি বেকার ছিলাম। আমার পকেটে সামান্য পয়সা ছিল। আমি পকেট থেকে তাই নিয়ে সাধুকে দিলাম। সাধু আরও বেশী দর্শনীর আশা করে বলেছিলেন, "ব্যাস, আর নেই ?"

আমি বিনীতভাবে বলেছিলাম, "আর একটি পয়সাও নেই।"

আশাহত হলেও, সাধু হেসেই বলেছিলেন, "বহুত আচ্ছা, এতেই হবে। সাধু সজ্জনে ভক্তি আছে, তোমার এমন বন্ধুদের এ বিষয়ে বলো, অন্য কারোকে নয়।"

বাইরে বৃষ্টি তখনো ধরেনি, কিন্তু আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরেছিলাম। সমস্ত দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল, আর এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আমি আর কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। ঘটনাটা বেশ কিছুদিন আমার মস্তিষ্কে বিঁধে ছিল। সাধু কেন আমাকে "সাধু সজ্জনে বিশ্বাসী" ভেবেছিলেন, জানি না, কিন্তু আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে ঘটনাটা বলেছিলাম। জানি না, তারা কখনো সেই যোগ প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিল কী না। আমি তারপরেও অনেকবার 'সাধুঘাটে' গিয়েছি, কিন্তু সেই বিশেষ সাধুকে দেখলেই, অন্যদিকে সরে পড়তাম। এবং কিছুকালের মধ্যেই ব্যাপারটা ভুলে না গেলেও এ নিয়ে আর ভাবিনি।

কামাখ্যা পাহাড়ের সেই তান্ত্রিক সাধক, যাঁকে সবাই "প্রাণতোষবাবা" নামে উল্লেখ করতো তাঁর কাছে আমি সাধুর যোগ দেখানো ঘটনাটির কথা বলেছিলাম। প্রাণতোষবাবা আমাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের দ্বারা যে ওরকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া সম্ভব, তাঁর ব্যাখ্যায় আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার

boiRboi.net

হয়েছিল। অবিশ্যি সম্ভব যে বটে, তা তো আমি নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু কী করে মানুষ এরকম অদ্ভুত ক্ষমতা আয়ত্ত করে, সেটাই আমি তাঁর কাছ থেকে কিছুটা বুঝে নিয়েছিলাম, এবং অবিশ্বাস করাও সম্ভব ছিল না।

প্রাণতোষবাবার যোগ বিষয়ে ব্যাখ্যার আগে, মাত্র বছরখানেক আগের আর একটি ঘটনার কথা আমি এখনই বলে নিতে চাই। কলকাতার থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরের শিল্পাঞ্চলে সেই অদ্ভুত ঘটনাটি আমি দেখেছিলাম। দিনটি ছিল শনিবার, চটকলের সাপ্তাহিক বেতন দিবস। গ্রীষ্মকালের বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। ঘটনার স্থান একটি চটকলের কাছাকাছি। কিছু শ্রমিককে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে, আমিও কৌতূহলিত হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, অনধিক তিরিশ বছর বয়সী একটি খালি গা যুবক ভিড়ের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে। কোমরে সামান্য একটি কাপড় জড়ানো। মেদবর্জিত শক্ত শরীর যুবকের মাথায় জটা, গায়ে ছাইভস্ম মাখা, মুখে কোঁকড়ানো গোঁফদাড়ি। কিন্তু কোনোরকম তিলক ত্রিপুণ্ড্র কিছুই আঁকা নেই। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল, দৃষ্টি যেন অন্যমনস্ক আচ্ছন্ন। তার চোয়াল দুটো শক্ত। নাসারন্ধ্র স্ফীত। তার নাভিস্থল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে যেন নিশ্বাস ভিতরে টেনে নিয়ে একটা কোনো প্রক্রিয়া করছিল। তার হাত দুটোর পেশি শক্ত। এবং পাখির ডানার মতো খানিকটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সে কোন কথাই বলছিল না।

সচরাচর কলকারখানার বেতন দিবসে নানা পেশার বিচিত্র সব ভেকধারী লোকদের এসব অঞ্চলে দেখা যায়। টোটকা ওষুধ বা মন্ত্রসিদ্ধ মাদুলি তাবিজ ব্যবসায়ীদের কথা বলছি না। ধর্মীয় ভেকধারীর আরও নানা শ্রেণীকেই, বেতন দিবসে মধুলোভীর মতো এসব জায়গায় উপস্থিত হতে দেখা যায়। যুবকটিকে আমি সেইরকমই কিছু ভেবেছিলাম।

কিন্তু সচরাচর এ শ্রেণীর লোকেরা যা করে বা বলে থাকে, তার পরিবর্তে যুবকটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো। সে সকলের সামনেই, তার কোমরের ছোট কাপড়ের টুকরোটি এক টানে খুলে নীচে ফেলে দিল। দেখলাম যথারীতি যৌনকেশ এবং অণ্ডকোষদ্বয় ছাড়া অস্বাভাবিক বৃহৎ আকারের একটি শিথিল লিঙ্গ। সে আরো সজোরে নিশ্বাস টেনে দু হাতে তার অঙ্গটি মর্দন করতে লাগলো এবং সেটি যথেষ্ট শক্ত আর উচ্ছ্রিত না হলেও, আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠলো। তারপরেই সে নীচু হয়ে, পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল এক কে. জি. ওজনের বেশি একটি কংক্রিটের টুকরো। মনে হয় কংক্রিটের টুকরোটি আগে থেকেই যোগাড় করে রাখা হয়েছিল। সে তার সুবৃহৎ পুরুষাঙ্গের দ্বারা, অবিকল একটি মোটা দড়ির মতো সেই কংক্রিটের টুকরোটিকে এক পাকে বেঁধে, প্রায় পাঁচ থেকে সাত সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এই সময়টা সে নিশ্বাস বন্ধ করেছিল, আর তার সারা গায়ের পেশীগুলো যেন কাঁপছিল। তারপরেই কংক্রিটের টুকরোটা বন্ধনমুক্ত করে ফেলে দিল, এবং কাপড়ের টুকরোটি তুলে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো। ইতিমধ্যে তার সারা গায়ে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার পেশির কম্পন স্থির হয়েছে।

সেই কয়েক মুহূর্ত সময়, আমিও নিশ্বাস বন্ধ করেই ছিলাম, অথবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যারা ভিড় করেছিল, তাদের চোখে মুখে আদৌ কোনো বিকারের লক্ষণ

ছিল না। বরং তারা যেন অজাগতিক কিছু দর্শন করে সম্মোহিত হয়েছিল। তারপরেই সকলে সাধ্যমতো টাকা পয়সা সেই যুবকটির পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। তখনই লক্ষ করলাম। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ছাইভস্ম মাথা জটাজুটধারী সাধু বেরিয়ে এসে টাকা পয়সাগুলো দু হাতে সংগ্রহ করলো, আর সবাইকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠলো, "জয় বাবা মহাদেও কি জয়, জয় বাবা পশুপতিনাথ কি জয়।" ···তারপরেই সে যুবকটির হাত ধরে দ্রুত ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। পিছনের লোকেরাও তখন মহাদেবের জয়ধ্বনি করছে। আমি সাধু এবং যুবকটির অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। শিল্পাঞ্চলের রাস্তায় তখন যানবাহন আর মানুষের অত্যন্ত ভিড়। আমি দুজনের পিছনে পিছনে স্টেশনে এসে, তাদের হারিয়ে ফেললাম। সব কয়টি প্ল্যাটফরমে যাত্রীদের ভিড়ে ঘুরেও, তাদের দুজনকে আর দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম না, তারা আদৌ রেলওয়ে স্টেশনে ঢুকেছে কী না, অথবা অন্যদিকে চলে গিয়েছে।

তাদের দেখা পেলেও, আমার কোনো লাভ হতো কী না জানি না। তখন আমার একটাই আপ্‌সোস হচ্ছিল; একটা ফিলম্‌ ভরতি ক্যামেরার জন্য। একটা ক্যামেরা থাকলে, আমি যুবকের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের ফটো তুলে রাখতে পারতাম। তবে আমি একবারে আশা ছাড়িনি। শিল্পাঞ্চলের বন্ধুবান্ধবদের ঘটনাটা জানিয়ে, সেই যুবক ও সাধুর সন্ধান রাখতে বলেছিলাম। প্রায় মাসখানেক পরে খবর পেয়েছিলাম, সপ্তাহখানেক আগে, দুজনকে এক বেতন দিবসে টিটাগড়ে দেখা গিয়েছিল, এবং সেই একই প্রক্রিয়ার দ্বারা যুবকটি সমবেত দর্শকদের সম্মোহিত করে, টাকা সংগ্রহ করে চলে গিয়েছিল। আমি আর কখনো তার দেখা পাইনি।

যুবকটির সেই অস্বাভাবিক আকারের অঙ্গ এবং তার প্রক্রিয়া যে একটি যৌগিক ব্যাপার, তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। অনেকটা সেই সাধুঘাটের সাধুর মতোই। তাই আমি খুব অবাক হইনি, কেন না কামাখ্যা পাহাড়ের প্রাণতোষবাবার যোগ বিষয়ের নানা ব্যাখ্যা আমার মনে ছিল। তা ছাড়া, আমার মতো অনেক ভারতীয় নিশ্চয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি বড় শহরেও দেখে থাকবেন, তথাকথিত যোগী সাধক, রাস্তার একপাশে মাটিতে গর্ত করে, গলাসহ মুণ্ড সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে। দর্শকরা দেখে যাচ্ছে, আর যার যা সাধ্য মতো টাকা পয়সা তার চাপা দেওয়া মুণ্ডের কাছে রেখে যাচ্ছে।

এ সব ব্যাপারগুলো সহজ না মোটেই, যদিও যাদের কথা আমি বললাম, তাদের এক শ্রেণীর পেশাজীবী বলতে হবে। এই যোগের খেলা দেখাবার পিছনে নিশ্চয়ই তাদের অতীতের পরিশ্রম আছে। এদের সাধারণ ভিক্ষাজীবী কোনোরকমেই বলা যায় না। কিন্তু এরা কি উচ্চ মার্গের যোগ সাধক?

কখনোই না। প্রাণতোষবাবার ব্যাখ্যা থেকে যা বুঝেছি, তাতে বলা যায়, যারা পথে ঘাটে এই সব যোগের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, তারা এক সময়ে নিশ্চয়ই কঠিন যোগাভ্যাসে রত হয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধিলাভের জন্য যতোদূর পৌঁছানো দরকার, ততোদূর পর্যন্ত তারা যেতে পারে নি। ক্ষমতার অভাবেই হোক, বা যে কোনো কারণেই হোক, তাদের পতন ঘটেছে। এক কথায় এদের বলা যায়, "যোগভ্রষ্ট"।

boiRboi.net

আমি যে-সব ঘটনার কথা বললাম, প্রাণতোষবাবার ব্যাখ্যানুযায়ী এসব হলো হঠযোগ। যোগীদের কল্পনার, "হ" সূর্য, "ঠ" চন্দ্র। কিংবা একটি প্রাণবায়ু, অপরটি অপানবায়ু। উভয়ের সংযোগে হঠযোগ। যে-কোনো সাধনার প্রধান হলো শরীর। শরীর সুস্থ সমর্থ না থাকলে, সবই ব্যর্থ। আর হঠযোগ শরীরকে সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় করে। হঠযোগের সাধনা প্রধানতঃ স্থূল শরীরকে নিয়ে। গুরু তাঁর যোগী শিষ্যকে প্রথমে হঠযোগের শিক্ষাই দেন।

এই স্থূল শরীরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে, সূক্ষ্ম শরীরের ও মানস ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ হতে পারে।

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "তুমি যে সাধুর কথা বললে, সে স্থূল শরীরের সাধনায় অনেকটা সিদ্ধিলাভ করেছিল। অর্থাৎ হঠযোগের সাধনায় অনেকখানি এগিয়েছিল। তারপরে আর এগোতে পারে নি। ফলে ম্যাজিকের মতো ওই সব অঙ্গের প্রক্রিয়া দেখিয়ে বেচারীকে এখন উপার্জনের ফিকির করতে হচ্ছে। কিন্তু এটা তো সহজেই অনুমান করা যায়, এ সব লোককে এক সময়ে কঠিন প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়েছে, অর্থাৎ পূরক রেচক আর কুম্ভক। এই প্রাণায়ামের দ্বারাই কুণ্ডলিনীকে জাগানো সম্ভব। আর কুণ্ডলিনী জেগে উঠলেই সুষুম্না নাভির বন্ধ দরজা খুলে যায়। যেটা আমাদের সাধনার সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। এসব ম্যাজিক দেখানো যোগীরা নিশ্চয়ই সুষুম্নার বন্ধ দরজার খিল পর্যন্ত খুলতে পেরেছিল, তারপরে আর তাকে আরোও ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পারে নি। স্থূল আর সূক্ষ্ম শরীরের যোগ সাধনার, সেখানেই সংকট। কিন্তু যোগের ওই দুই সিদ্ধি না হলে, কোনো সাধনাই সম্ভব না, আর তার জন্য এই শরীরই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।' শরীরই আদি ধর্মসাধন।"

এ কথা আমি আগেই বলেছি, তন্ত্র—তা হিন্দু বৌদ্ধ সহজিয়া, যে-মতেই হোক, যোগ সাধনা তার প্রথম ধাপ, এবং মানুষের শরীরই তার একমাত্র সম্বল। দেহের সাধনাই তন্ত্র সাধনা, দেহ ছাড়া এ সাধনা সম্ভব না, এবং তা নর নারীর মিলিত দেহ সাধনা। এ কথা আমাকে প্রাণতোষবাবাই বিশদ বুঝিয়ে বলেছিলেন, এ তত্ত্ব সাধতে হলে, যোগের দ্বারা দেহ শোধন প্রাথমিক। সেইজন্যই আমি প্রাণতোষবাবার যোগের ব্যাখ্যাটা সেরে নিতে চাই। তা হলে মূল বিষয়ে প্রবেশের অনেক সুবিধা হবে।

*

১৯৪৭-এর নভেম্বরের কামাখ্যায় যাবার আগে, ১৯৪৬-এ কালীপূজা উপলক্ষে আমি বীরভূমের এক গ্রামে গিয়েছিলাম। বীরভূমের সাঁওতাল পরগনার সীমান্তে প্রায় একটি বিচ্ছিন্ন বাঙালী গ্রাম এবং গোটা গ্রামটাই ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত, কিছু সাঁওতাল এবং অন্ত্যজশ্রেণীর কৃষিকাজের লোক ছাড়া। সাঁওতাল পরগনার সীমান্তে এরকম একটি সম্পন্ন বাঙালী ব্রাহ্মণদের গ্রাম গড়ে ওঠার পিছনে কয়েকশো বছরের পুরনো ইতিহাস আর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে তা নিয়ে আলোচনার কোনো দরকার নেই। গ্রামটির অধিকাংশ প্রজাই সাঁওতালি।

আমার থেকে সামান্য কয়েক বছরের বড় এক যুবকের বাড়ি সেই গ্রামে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রেই আমি জানতে পারি, সেই গ্রামের কালীপূজা বহুকালের প্রাচীন,

boiRboi.net

এবং তন্ত্র মতে সেই পূজা হয়। বাদশাহী আমলে রাজা উপাধিপ্রাপ্ত, ছয়টি পরিবারে ছয়টি কালীপূজা হয়। সকলেই শাক্ত ধর্মাবলম্বী। আমার যুবক বন্ধুটিও এরকম একটি পরিবারের সন্তান। কিন্তু তন্ত্র মতে কালীপূজা কী রকম, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না, বা সেই গ্রামে গিয়ে পূজা দেখে আমি কিছু বুঝতেও পারিনি। বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্য আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে নিজে ছেলেবেলা থেকেই শহরবাসী, বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ওসবে তার কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না। সে আমাকে তাদের পরিবারের একজন অভিজ্ঞ শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

তন্ত্রমতে পূজা কী, আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে, সেই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন, "বিষয়টি তোমার পক্ষে সহজে বোঝবার নয়।" বলে তিনি আমাকে কালী প্রতিমার পিছনে, চালচিত্রের বাঁ দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "ওই যে দশটি কাগজের চৌকো টুকরো লম্বা হয়ে ঝুলছে, তার একেবারে নীচেরটি লক্ষ কর, আর বাকি গুলোও দেখ।"

আমি দেখেছিলাম, অনেকটা তুলোট কাগজের মতো সেই দশটি চৌকো টুকরো চালচিত্রের সঙ্গে ঝোলানো। প্রত্যেকটি টুকরোই আলাদা, একটার সঙ্গে আর একটা সুতো দিয়ে গ্রথিত। একেবারে নীচের কাগজটিতে অদ্ভুত কতগুলো রেখাচিত্র আঁকা। মাঝখানে ত্রিকোণ মধ্যে একটি লাল গোল বিন্দু। বাকি নয়টির সব-গুলোতেই একটি করে পদ্মফুল আঁকা। শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বলেছিলেন, "একেবারে নীচে যেটি দেখছো, এটিকে বলে শ্রীযন্ত্র। ওটিকে তুমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বলতে পারো, অথবা মানবদেহও ভাবতে পারো। আর যে নয়টি পদ্ম দেখছো, ওগুলো বিভিন্ন নামে মূলাধার—অর্থাৎ মানুষের শরীরের লিঙ্গমূলের নীচে, অকুল বা কুলস্থান থেকে ওপরের দিকে উঠেছে। যথা ঃ অকুল, কুল, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, তালু (গলার), ভ্রূমধ্য। কিছু বুঝলে?"

আমি সবিনয়ে বলেছিলাম, "আজ্ঞে না।"

বৃদ্ধ হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "আমি তো আগেই বলেছি, সহজে এসব বোঝবার নয়। বোঝানো যায়ও না। একমাত্র সাধক গুরুরাই এসব বুঝতে পারেন, তাঁদের শিষ্যদের শেখাতে পারেন। তোমার আমার কারোরই সে অধিকার নেই। তবে এই যন্ত্র ছাড়া, আমাদের পূজা যে তন্ত্রমতে হয়, তার আর একটি হলো, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা এই পূজা হয়। পঞ্চতত্ত্ব হলো, মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা, মৈথুন। এখন তুমি যদি ভাবো, পূজায় বাস্তবে সবই ব্যবহার করা হচ্ছে, তা হলে ভুল হবে। মদ অবিশ্যিই রয়েছে, কিন্তু বলির আগে মাংসের অনুকল্প হলো লবণ আদা জাফরান তিল গম মাষকলাই আর রসুন। সিদ্ধি আর ছোলা বেটে মাছের আকারের বড়া হলো মৎস্য, মুদ্রা হলো ঘিয়ে ভাজা অন্ন। এর পরে মৈথুন। রক্তকরবী ফুল হলো লিঙ্গ পুষ্প, নীল অপরাজিতা যোনিপুষ্প। দুইয়ের মিলনে মৈথুন, আর এক্ষেত্রে চন্দনকে বীর্য আর কুঙ্কুমকে রজঃ রূপে মেলাতে হবে। এইভাবে মৈথুন ভাবনা করে দেবীকে পূজা দেওয়া হবে। এই হলো তন্ত্রমতে পূজা। কিছু বুঝলে?"

আমি বলেছিলাম, "একটা অস্পষ্ট ধারণা হলো।"

boiRboi.net

বৃদ্ধ বলেছিলেন, তার বেশী কিছু সম্ভব নয়। একজন তান্ত্রিক সাধক পূজো করলে, তার রূপ একরকম। এ হলো গৃহের তন্ত্র মতে পূজো। প্রতীক আর অনুকল্প দিয়ে এখানে পূজো হয়। এর বেশি বোঝানো সম্ভব নয়।"

প্রকৃতপক্ষে পূজো দেখার উপলক্ষে এত জটিল বিষয় জানবার মতো মানসিক অবস্থা আমারও ছিল না। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক চেহারার উঁচু নীচু লাল মাটির সেই গ্রামটিকে আমার ভালো লেগেছিল! কোনো একটি গ্রামে এমন শতাধিক শিবমন্দির আমি আর কোথাও আগে দেখিনি। এবং প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরেই পোড়া ইঁটের কারুকার্য ছিল। সেই হিসাবে আমার ধারণায় গ্রামটিকে তো শৈব গ্রামই বলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই শুনেছি, গ্রামটি ঘোর শাক্তদের অর্থাৎ শক্তি পূজারীদের। অবিশ্যি গ্রামের প্রান্তে একটি ছোট নদীতীরে এক শক্তি দেবীর মন্দির আছে। দেবীর নাম মৌলীক্ষ্মা।

যতোই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, ততোই যেন গ্রামটার চেহারা বদলিয়ে যাচ্ছিল। আমি গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, বিশেষ করে পূজাবাড়িগুলো পূজামণ্ডপের প্রাঙ্গণে শত শত সাঁওতাল পুরুষ রমণীরা এসে জড়ো হচ্ছিল। তাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই একটি করে পাঁঠা। পাঁঠা ছাড়াও, প্রত্যেক পূজা বাড়িতেই একটি করে মাঝারি গঠনের মোষের ষাঁড় বাঁধা ছিল। প্রত্যেক প্রাঙ্গণেই এক বা একাধিক পশুবলির জন্য সাময়িক যূপকাষ্ঠ স্থাপিত ছিল।

আমার মনে হয়েছিল, রাত্রে কেউ ঘুমোতে যায়নি। মহানিশাযোগে পূজো যতোই শেষ হয়ে আসছিল, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সাঁওতাল সকলেই মদ্যপানে উল্লসিত হয়ে উঠছিল। রমণীরাও বাদ যাচ্ছিল না। এমন কি, মাঝে মাঝে মোষগুলোকেও মদ্য পান করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আর হঠাৎ হঠাৎ দেবীর জয়ধ্বনিতে ঢাকের বাজনায়, বা ফুলঝুরির আলোয় পশুগুলো রক্ত চোখে দাপাদাপি করছিল।বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

অমাবস্যার নিকষ কালো রাত্রে, পূজামণ্ডপে এবং অন্যান্য বাড়ির আলোগুলোকে দেখাচ্ছিল রক্তিম। নরনারীদের ছায়াগুলো কম্পিত। আসন্ন বলির প্রতীক্ষায় পশুগুলো আর্তনাদ করছিল। তার মধ্যেই নরনারীর হাসি উল্লাস ও মাতন। কালী প্রতিমার আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু যেন অপলক চোখে সবই দেখছেন। আমার চোখে সমস্ত পরিবেশটা যেন কোনো এক আদিম উৎসবের মতো মনে হচ্ছিল।

মহানিশায় কালী পূজো অন্তে, শেষ রাত্রে বলি শুরু হয়েছিল। তখন চারদিকে কেবল রক্তের বন্যা। ছিন্ন মুণ্ড বলির পশুগুলো নিয়ে, সকলেই লোফালুফি করছিল। কপালে রক্তের ফোঁটা মাখাচ্ছিল। বিশেষ করে মহিষের রক্তের ফোঁটা কপালে লাগাবার জন্য সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। রক্তের জোয়ার যেন সবাইকে একটা নতুন উন্মাদনা দিয়েছিল। কখন সকাল হয়ে গেল, দিনের আলো ফুটলো, রোদ উঠলো, কিছুই টের পেলাম না। অনেক বেলা পর্যন্ত চলেছিল বলির পর্ব। কম করে হলেও পাঁচশো পাঁঠা নিশ্চয়ই বলি হয়েছিল। গ্রামের লাল মাটির পথে পথে মাটি রঙের থেকেও গাঢ় রক্তের দাগ।

কিন্তু এসবের মধ্যেই আমার বন্ধু আমাকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়েছে। আমি

boiRboi.net

স্নান করেছি, খেয়েছি, কিন্তু সবই যেন একটা ঘোরের মধ্যে। সাঁওতাল রমণী পুরুষরা ক্রমেই সুরাপানে মত্ত হয়ে উঠছিল, আর গ্রামের পথে পথে, পুজোবাড়িগুলোর মণ্ডপ প্রাঙ্গণে, এমন কি ভিতর বাড়ির উঠোনেও মাদল বাজিয়ে নেচে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল। আমি তাদের গানের ভাষা বুঝতে পারছিলাম না। তারা যে আদিম উল্লাসে মত্ত, এবং নাচের ছন্দ ভেঙে মেয়ে পুরুষ জড়াজড়ি করছিল, তা দেখতে পাচ্ছিলাম।

বেলা পড়ে আসতেই, সমস্ত কালী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নদীর ধারে মৌলীক্ষ্যা দেবীর মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং ঢাকের বাজনার তালে তালে প্রতিমা নিয়ে সারা মাঠে ঘুরে ঘুরে নাচ চলছিল। তার মধ্যেই মাঠ জুড়ে সহস্রাধিক সাঁওতাল রমণী পুরুষের নাচ গান চলছিল। তারপরেই একটা অভাবিত দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম সাঁওতাল রমণী পুরুষরা জোড়ায় জোড়ায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে মৈথুন ক্রিয়ায় রত। অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমার চোখের সামনে আমি এক গণ-মৈথুনের জীবন্ত চিত্র দেখছিলাম। অন্ধকার নামার সঙ্গে এ ঘটনা যেন তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছিল।

আমি জানি না, মহাশক্তির পুজো, বলি, রক্ত, তন্ত্র আর সেই গণমৈথুনের সঙ্গে আদিম কালের উর্বরাশক্তি বিশ্বাসের কোনো যোগাযোগ ছিল কী না। সেই ভাবে স্বাধীন বাছাই করা জুটির সঙ্গে পরস্পরের মিলনের পরিণতি সম্পর্কে আমার বন্ধু জানিয়েছিল, সাঁওতালদের গাঁও বুড়া বা নেতৃস্থানীয় লোকেরা নাকি সকলের প্রতিই নজর রেখেছিল এবং অবিবাহিত জুটিদের মধ্যে ভবিষ্যতে বিয়ে হবে। কিন্তু বিবাহিত নরনারীদের কী গতি? তারা তো স্বামী স্ত্রী বেছে একত্রে কিছু করেনি। সেই উদ্দাম উন্মত্ত পরিবেশে তা সম্ভবও ছিল না।

তার কোনো জবাব আমি পাইনি। কামাখ্যার প্রাণতোষবাবাকে আমি উক্ত ঘটনা বলেছিলাম। জবাবে উনি বলেছিলেন, "মৈথুনকে আমরা বলি পঞ্চমতত্ত্ব, তার সঙ্গে যোগ সাধনা আছে। বীরভূমের সেই অঞ্চলের সাঁওতালরা হয় তো তাদের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের দিন হিসাবে, কালীপুজোর বিসর্জনের দিনটিকে বেছে নিয়েছে। আমি শুনেছি বছরে কোনো একটা বিশেষ দিনে, ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে এরকম একটি প্রথা প্রচলিত আছে। এর সঙ্গে ফার্টিলিটি কাল্টের যোগাযোগ থাকতেই পারে। তন্ত্র সাধনার মূলে এর কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাও বলা যায় না। তন্ত্র সাধনা মূলতঃ শক্তি সাধনা। শক্তি হলো নারী। শক্তিহীন শিব শব মাত্র। শক্তির সংস্পর্শে এলেই শিব জেগে ওঠেন, অর্থাৎ পুরুষ জেগে ওঠে। যে গ্রামে তন্ত্রমতে এরকম বিরাট পুজোর প্রচলন, সেখানে পঞ্চম তত্ত্বের বাড়াবাড়ি হতেই পারে। তবে হয়তো তুমি সাঁওতালদের সহজ ও সাবলীল ক্রিয়া দেখেছো অন্যদের দেখবার সুযোগ পাওনি। তুমি তো আর ঘরে ঘরে ঘুরে দেখনি। তবে আমি জানি পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম বা রাঢ় অঞ্চলেই এখনো তন্ত্র সাধনার কিছু অবশিষ্ট আছে।"

তাঁর কথার সত্য প্রমাণ আমি পরে পেয়েছিলাম। যাই হোক, ১৯৫৫-তে আমি আবার বীরভূমের সেই গ্রামের কালীপুজো উপলক্ষে গিয়েছিলাম। সেবার আমি একটি ক্যামেরাও নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সাঁওতালদের ভিড় কিছু কম দেখেছিলাম এবং

তাদের নাচ গান উল্লাসের সময়, হঠাৎ এক ডজন সাইকেলে চেপে, ট্রাউজার শার্ট পরে প্রায় দু'ডজন সাঁওতাল যুবক এসে তাদের ঘিরে রেখেছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, কোনোরকম ফটো তোলাই চলবে না। আমি বুঝেছিলাম, কালের স্রোতে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। সেই যুবকদের সকলের গলায় ক্রস চিহ্ন ঝুলছিল। তারা এসেছিল দুমকা থেকে।

এই প্রসঙ্গেই, এ বছরের কালীপুজোয় আমার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই। এবছর কালীপুজোয় আমি পুরুলিয়ার এক দূর গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামটিকে দেখে, আমার বীরভূমের সেই গ্রামটির কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রামটি থেকে পাঁচ মাইল দূরেই বিহার সীমান্ত, এবং গ্রামটি একটি বিচ্ছিন্ন বাঙালী ব্রাহ্মণদের গ্রাম, সকলেই ঘোর শাক্ত, শক্তির উপাসক। তার সত্যতার প্রমাণ পেলাম, কালী মন্দিরের সামনে পুজো শেষে বলির প্রাবল্য দেখে। সেই তুলনায় বীরভূমের গ্রাম কিছুই না। এই গ্রামের দু একজন বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, এক তান্ত্রিক সাধক গ্রামে কালী প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তন্ত্রমতে সাধনা করতেন। আরও জানলাম, পুজোর ঘট যেখানে স্থাপিত, তার নীচেই রয়েছে পাথরে খোদাই করা শ্রীযন্ত্র। রাত্রি বারোটা থেকে পাঁঠা ও মহিষ বলি শুরু হলেও পরের দিন দুপুর গড়িয়ে যাবার পরেও বলি শেষ হয়নি। শুনলাম বিকাল পর্যন্ত চলবে।

আমার পক্ষে বলির সংখ্যা হিসাব করে বলা কঠিন। সহস্রাধিক তো বটেই এবং এবং ডজন খানেক মহিষ। এই প্রথম দেখলাম, বিশেষ ভাবে তৈরি যূপকাষ্ঠ, যার ভিতরে এক সঙ্গে চারটি পাঁঠার মুণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে, খাঁড়ার এক কোপে চারটি বলি। যারা বলি দিচ্ছিল তাদের কবজির জোর আর খাঁড়ার ওজনটি ভাববার মতো। রক্ত ছিটকে উঠছিল, আর দুটি যূপকাষ্ঠের সামনে পায়ের পাতা ডুবে যাবার মতো রক্ত জমে উঠেছিল। যারা বলি দিচ্ছিল এবং আশেপাশে ছিল, তাদের সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ। তাদের চোখগুলো ছিল সুরাপানে আরক্ত। মনে হচ্ছিল তারা যেন এক ধরনের উল্লসিত খুনের নেশায় মেতে উঠেছে।

তন্ত্রে পশু বলি এবং রক্ত একটা আবশ্যিক বিষয়। তা ছাড়াও তন্ত্র সাধনায় রক্তের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে! সে রক্তের নাম তখন "রজঃ" হয়ে যায়। আরো নানাবিধ সাংকেতিক নামেও সেই রজঃ-এর উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য ঋতুমতী নারীই সেই রজঃ-এর উৎস।

*

ফিরে যাওয়া যাক যোগ সাধনার বিষয়ে। যোগ কী, এবং তন্ত্র সাধনায় তার কী প্রয়োজন, এটা না জানলে, তন্ত্রের মর্ম সঠিক অনুধাবন করা যায় না। অবিশ্যি এ বিষয়ে আমি তত্ত্বজ্ঞ নই। আমাকে কামাখ্যা পাহাড়ের প্রাণতোষবাবা যা বুঝিয়েছিলেন তার সবখানি বুঝেছিলাম, তাও ঠিক বলা যায় না। কারণ আমি সাধক নই, বা তাঁর শিষ্যও ছিলাম না। নিতান্ত একজন জিজ্ঞাসু যুবককে যতোখানি বোঝানো যায়, তিনি সেই ভাবেই আমাকে বুঝিয়েছিলেন। বোঝাবার জন্য তিনি আমার শরীরে নানা অঙ্গে যে-ভাবে হাত দিচ্ছিলেন, আমি রীতিমতো অস্বস্তি আর সংকোচ বোধ

করেছিলাম। তিনি তা বুঝতে পেরে আমাকে ধমক দিয়ে স্থির হতে বলেছিলেন।

প্রাণতোষবাবার যোগ বিষয়ে ব্যাখ্যার আগেই, কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমতঃ ১৯৪৮-এর নভেম্বরে আমার গন্তব্য ছিল গৌহাটি, কামাখ্যা না। দ্বিতীয়তঃ গৌহাটি যাবার পথে, ট্রেনের কামরায়, প্রাণতোষবাবার সাধনসঙ্গিনী ভৈরবী, যাঁকে সবাই "পবিত্রী মা" নামে জানে, এবং তাঁর আর এক সঙ্গিনী এক কুমারী সাধিকা, যাঁর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই দ্বিতীয় ঘটনারই পরিণতি কামাখ্যা পাহাড়ে গমন, এবং প্রাণতোষবাবার দর্শন। পবিত্রী মা আমাকে কামাখ্যার তাঁদের আশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, পবিত্রী মাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্বীকার করতে হবে, সেই মুগ্ধতার মধ্যে কোনো ধর্মবোধ ছিল না। একান্তই মানবিক। যদিও লাল চওড়া পাড়ের গেরুয়া রেশমের শাড়ি ও জামা তাঁর গায়ে ছিল, রুদ্রাক্ষ প্রবাল ঠুমরা ইত্যাদির মালা ও তাগা ছিল, কিন্তু আমার চোখে তিনি প্রথম দর্শনে ছিলেন ত্রিশ বছর বয়সের এক সুন্দরী রমণী। মধুরহাসিনী, বাকপটিয়সী, তাম্বুলরঞ্জিত বিম্বোষ্ঠা, এবং তাঁর গা থেকে একটি মিষ্টি সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। আমি তাঁর বিপরীত দিকের আসনের যাত্রী ছিলাম। তিনি খুব সহজেই আমার নাম ধাম পরিচয় জেনে নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন। কোনো রকম ধর্মীয় আবরণ না রেখেই, তিনি আমার সঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন, আর তার মধ্যেই ছোটোখাটো পরিহাস করে, এক এক সময় প্রায় বালিকার মতোই খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন।

পবিত্রী মায়ের সঙ্গিনীটির বয়স কুড়ির কিছু বেশি হতে পারে। পবিত্রীমায়ের কপালে বিভূতি ছাড়াও, ভ্রুজোড়ার মাঝখানে সিন্দুরের ফোঁটা ছিল, চুলের সিঁথায়ও সিন্দুরের রেখা ছিল। সঙ্গিনীটির তা ছিল না বলেই তাঁকে আমি কুমারী ভেবে নিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী সেই তরুণীরও গায়ে গেরুয়া রঙের লাল পাড় শাড়ি ছিল। সেও সুন্দরী, কিন্তু গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিল। যদিও তার গাম্ভীর্যের মেঘ ফুঁড়ে বিদ্যুৎচমকের মতোই মাঝে মাঝে মুখে হাসি ফুটছিল। ট্রেনের কামরায় তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। অল্প দু একটি কথা পবিত্রী মায়ের সঙ্গে বলেছিলেন, তাঁর পান সেজে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কথা শুনেই মাঝে মাঝে তিনি হাসি সংবরণ করতে পারেননি। পবিত্রী মা কুমারীকে "জগত" নামে সম্বোধন করছিলেন।

ট্রেনের কামরার কথাবার্তার মধ্যে আমি পবিত্রীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী তাঁর পরিচয়। অবিশ্যি কথাটা আমি ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, "আমি ব্রহ্মাণ্ড।"...স্বভাবতই আমি অবাক হয়েছিলাম। একজন সাধিকার পরিচয় "ব্রহ্মাণ্ড" কী করে হয়? তিনি আবার বলেছিলেন, "আমিই শিব।"....তাই বা তিনি কী করে হতে পারেন? শিব তো পুরুষ! তিনি আবার বলেছিলেন, "আমি শক্তি।"

বলাবাহুল্য আমি তাঁর সম্যক পরিচয় কিছুই বুঝতে পারিনি। কথাগুলো বলবার সময় তিনি তাঁর আয়ত চোখে অপলক স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন তাঁকে মানবীর তুলনায় প্রতিমার মতোই মনে হয়েছিল। আমি

মনে মনে অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কিছু বুঝলে?"

"না।" আমি জবাব দিয়েছিলাম।

পবিত্রী মা হেসেছিলেন, এবং আবার আগের মতোই পরিহাসপরায়ণা স্বাভাবিক রমণী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেননি। তারপরে এক সময়ে আমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনাদের ধর্ম সাধন বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন?'

"কেন? কোন্ অধিকারে তুমি তা জানতে চাও?" পবিত্রীমা যেন সহসাই দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম, আমি আমার সীমা অতিক্রম করেছি। অপ্রস্তুত লজ্জায় বলেছিলাম, "মাফ করবেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।"

পবিত্রীমা যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনিই সহসা তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। জানি না, তিনি কী ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি কামাখ্যায় আমাদের আশ্রমে এসো। তোমার যদি কিছু জানবার থাকে, বাবার কাছ থেকে জানতে পারবে।"

প্রাণতোষবাবার সান্নিধ্যে আসার এই হচ্ছে পশ্চৎকাহিনী। যদিও প্রাণতোষবাবাকে সামনে দেখে, আমি বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম। মেদবর্জিত দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাঁর বক্ষস্থল, দুই গাল এবং দুই চক্ষুই রক্তবর্ণ। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ হলেও, তাঁর মাথায় সাপের মতো বিড়ে পাকানো জটা। গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ও তাগা। নভেম্বরের মাঝামাঝি পাহাড়ি শীতেও তাঁর খালি গা, কটিতে জড়ানো ছিল একফালি গেরুয়া বস্ত্র। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব ছিল। পবিত্রীমা পরিচয় করিয়ে দেবার পরে, তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, "তুই আমাদের সাধন বিষয়ে জানতে চেয়েছিস? আয়, তার আগে তোকে আমি একবার দেখে নিই।" বলেই তিনি আমাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, এক মুহূর্তও সময় না দিয়ে, হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আমার নিম্নাঙ্গে। আমার বাধা দেবার সাহস ছিল না, কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রাণতোষবাবা একটুও না থেমে, আমার পায়ুস্থান ও লিঙ্গমূলের মাঝখানে হাত রেখেছিলেন। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে, পায়ুস্থানের থেকে শিরদাঁড়ার মূল পর্যন্ত দেখে, প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় পবিত্রীমাকে বলে ছিলেন, "মা, এ ব্যাটার ক্ষমতা আছে, চেষ্টা করলে লড়ে যেতে পারবে। তবে দমের ঘরটা বিশেষ ভালো না। কাসিতে বারো মাস ভোগে, ধূমপানও বেশি করে।"

আমি তখন আকস্মিক ঘটনার বিস্ময়ে ও লজ্জায় এতটুকু হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শরীরের মাত্র বিশেষ একটি জায়গায় আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে কী করে তিনি আমার অতিরিক্ত ধূমপান আর কাসিতে ভোগার কথা বলেছিলেন, জানি না। আমার অভিজ্ঞতায়, ওটা তো বরাবর ডাক্তারের স্টেথসকোপেই ধরা পড়ে। প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, "তুই আমার এখানে কয়েকদিন থাক, পরে তোর সঙ্গে আমি কথা বলবো।"

কয়েকদিন বলতে বেশ কিছুদিন আমি সেই আশ্রমে ছিলাম, এবং সেই দিন-

boiRboi.net

গুলোতে আমি পবিত্রী মা, জগৎ যোগিনী আর প্রাণতোষবাবার স্নেহ ও প্রীতি লাভে বেশ ভালো ছিলাম। প্রাণতোষবাবা আমার পারিবারিক পরিচয় জেনেছিলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যোগ বিষয়ে আমি কখনো, আমার বাবার গুরুর কোনো মহিমা দেখেছি কী না। বলাবাহুল্য, আমি দেখিনি, কিন্তু সাধুঘাটের সেই সাধুর কথা তাঁকে বলেছিলাম। শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন, "ও তো একরকমের নাড়ি আর পেশির খেলা। তবে যোগাভ্যাস ছাড়া ওসব হয় না। কিন্তু ও বেচারি সাধু যোগ সাধনায় বেশিদূর যেতে পারেনি। আমি একজন তান্ত্রিক সাধক, বা বলতে পারিস কুলাচারী বীর সাধক। যোগ সাধনা না হলে, তন্ত্র সাধন কখনোই সম্ভব না। তুই কি যোগ বিষয়ে কিছু জানিস?"

"আজ্ঞে না, কিছুই জানি না।"

"অবিশ্যি তোর পক্ষে জানা সম্ভবও না। এসব একমাত্র গুরুর কাছেই জানতে আর শিখতে হয়। তোর যদি ইচ্ছা থাকে, তোকে একটা মোটামুটি ধারণা আমি দিতে পারি। তার বেশি কিছু পারি না। কারণ আমি তোর গুরু নই, তুইও সাধক নোস। আমরা কেউ অনধিকার চর্চা করতে পারি না।"

আমি বলেছিলাম, "আপনি একটা ধাণা দিলেই আমি কৃতার্থ হবো।"

আশ্রম সীমানার পাহাড়ি ঢালুতে প্রাণতোষবাবার নিজস্ব একটি ঘর ছিল। সেখানে এক ধারে একটি ত্রিশূল পোঁতা ছিল। ত্রিশূলের সামনে, পাষাণের মেঝেয় একটি দুর্বোধ্য আঁকাজোকা যন্ত্র বিশেষ, যা আমি বীরভূমের গ্রামে কালী প্রতিমার চালচিত্রে তুলোট কাগজে দেখেছিলাম। সেই ঘরে ছয়টি নরকরোটিও, একপাশে লাল কাপড়ের ওপর রক্ষিত ছিল। প্রাণতোষবাবা আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলেছিলেন। নিজেও দরজা বন্ধ করে, গুলবাঘের চামড়ার ওপরে বসেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা আমাদের শরীরকে বলি ভাণ্ড বা পিণ্ড। বিশ্বাস করি, এই ভাণ্ডে যা আছে, তা ব্রহ্মাণ্ডেও আছে। তাই এই শরীরকেই আমরা মনে করি আদি ধর্মসাধন। শরীরকে সাধন উপযোগী করতে হলে, এটিকে সুস্থ দৃঢ় রাখতে হবে, আর যোগ সাধনের দ্বারা একে প্রস্তুত করতে হবে। কী করে? প্রাথমিক হলো আসন আর ব্যায়াম। এর সঙ্গে সঙ্গেই, গুরুর কাছে শিখতে হল প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন রকম, রেচক, পূরক, কুম্ভক। এতে নাড়ি শুদ্ধি হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে অসংখ্য নাড়ি আছে, তার মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করে। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুর ঘর পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু কেন?"

প্রাণতোষবাবা প্রশ্ন করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, "জানি না।"

"বেশ, তুই কাপড় খুলে, উলঙ্গ হয়ে আমার সামনে দাঁড়া।" তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়েও, কাপড় খুলে উলঙ্গ হতে সংকোচ বোধ করছিলাম। তিনি নিজেই আমার কাপড় খুলে দিতে দিতে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "আমার সামনে তোর লজ্জার কী আছে? দু পা ফাঁক করে দাঁড়া।"

আমি উলঙ্গাবস্থায় তাঁর নির্দেশমতো দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি

boiRboi.net

বলেছিলেন, "ময়না তদন্তে আমাদের প্রাণময় কোষ ছাড়াও, মনোময় কোষেরও কিছু কিছু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সব আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে একদিন হবে। যেমন, ইড়া, পিঙ্গলা বা সুষুম্না। এই নাড়িগুলো ময়না তদন্তে এখনো ধরা পড়ে না। জীবন্ত মানুষকে কেটে দেখলে কি হতো জানি না, কিন্তু এই নাড়িগুলো বাস্তবে আছে, একমাত্র সাধানার দ্বারা তা অনুভব করা যায়।"

প্রাণতোষবাবার কথা শুনতে শুনতে আমার নগ্নতার লজ্জা কেটে গিয়েছিল। তিনি নীচু হয়ে, আমার গুহ্যদ্বারে আঙুল ছুঁইয়ে লিঙ্গমূল পর্যন্ত একটি সরলরেখা টেনেছিলেন, এবং সেই সরলরেখাটিকে মাঝখানে রেখে, একটি ত্রিকোণ রেখা এঁকে বলেছিলেন, "এই এই যোনিরূপ ত্রিকোণের বাঁয়ে ইড়া, ডাইনে পিঙ্গলা, মাঝখানে সুষুম্না। আমরা যে নিশ্বাস নিচ্ছি, তা ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা মনে করি, দুটো নাকে সোজাসুজি নিশ্বাস নিচ্ছি। তা আদৌ নয়। এই দুই—দুই নিশ্বাস যখন পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়, তখনই সুষুম্নাতে অনুভব হয়। এই অনুভূতি যোগ সাধন ছাড়া টের পাওয়া যায় না।

"এই সুষুম্না নাড়ির ভিতরেই মূলাধারে আছেন কুণ্ডলিনী। ইনি ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু ঘুমন্ত মানুষের যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে, কুণ্ডলিনীরও তেমনি নিশ্বাস বহে। ব্রহ্মাণ্ডেরও কুণ্ডলিনী আছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তি, আর আমাদের শরীরে তিনি জীবশক্তি। আমি জানি, তোর কাছে এগুলো কিছু অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না, তাই নয় কি?"

আমি বলেছিলাম, "প্রায় তাই, তবে আপনার স্পর্শে আর কথায় আমার মন একটা বিশেষ জায়গায় যেন পৌঁছেছে।"

"ওটা আসলে নতুন অভিজ্ঞতার একটা অভিনবত্ব বোধ।" প্রাণতোষবাবা হেসে বলেছিলেন, "সাধনার অনুভূতি নয়। তবু এ ভাবটি তোর ধারণা করতে সাহায্য করবে। এখন এই যে যোনিরূপ ত্রিকোণ মধ্যে, সুষুম্নার গভীর কুন্ডলিনী আছেন, এখানে আছে কামবীজ, আর এই কামবীজের ওপরেই রয়েছেন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখে, কুণ্ডলিনী নিজের মুখ দিয়ে চুম্বন করে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আছেন। উভয়েই সুপ্ত। সাধকের কাজ হচ্ছে, এই কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তোলা। কুল হলো শক্তি। তিনি কুণ্ডলী প্যাঁকিয়ে থাকেন বলেই কুলকুণ্ডলিনী। ইনি মহাশক্তি।

"এখন, এঁকে জাগাতে হলে সাধককে প্রাণায়ামের সাহায্যে সুষুম্নায় বায়ুচালনা করতে হবে। সুষুম্না মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুষুম্নার বিবর থেকে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এই যাবার পথে ষটচক্র ভেদ করতে হয়। মনে কর, যেন পাঁচটি স্টেশন পেরিয়ে, ছয়ে পৌঁছুতে হবে। সেগুলো কোথায়? একটি মূলাধারে (তিনি আমার লিঙ্গমূলে স্পর্শ করলেন), তারপর স্বাধিষ্ঠান (বস্তিদেশে স্পর্শ করলেন), তারপর মণিপুর (নাভিতে স্পর্শ করলেন), এই হলো অনাহত (বুকে স্পর্শ করলেন), এইখানে বিশুদ্ধ (গলা স্পর্শ করলেন), এইটি আজ্ঞা চক্র (দুই ভ্রূর মাঝখানে স্পর্শ করলেন)। তারপর সহস্রার ব্রহ্মরন্ধ্র, সেখানে আছেন পরমশিব। এই চক্রগুলোর আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে, সে সব তুই বুঝবি না, আমি কেবল চক্রের জায়গাগুলো দেখালাম।

boiRboi.net

কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে তুলে নিলে, পরম শিবের সঙ্গে তাঁর মহামিলন ঘটবে। শিবশক্তির এই মিলনে পরমামৃত ক্ষরিত হয়, আর সাধক সেই মিলনের অনুভূতিতে সুখ আনন্দরসে মগ্ন হয়। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তিনি তখন চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু তুই যদি ভাবিস, কুণ্ডলিনীকে সাধক সহজেই চক্রভেদ করে নিয়ে যেতে পারে, তা হলে ভুল। কুণ্ডলিনী বারে বারেই তাঁর নিজের জায়গায় নেমে আসতে চান। সাধকের সেখানেই কঠিন পরীক্ষা, বারে বারেই তাঁকে জাগিয়ে টেনে তুলতে হয়। মূলতঃ কুম্ভকের দ্বারাই তা সম্ভব। এই শিব শক্তির মিলনই আমাদের মূল সাধনা।"

আমি কিছুটা অবাধ সরলভাবেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তা হলে এই সাধনার মধ্যে গোপনীয়তার কী আছে?"

প্রাণতোষবাবা অট্ট হেসে বলেছিলেন, "ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছিস। কাপড় পরে বোস্ বলছি।"

আমি তাড়াতাড়ি কাপড় পরে সাব্যস্ত হয়ে বসেছিলাম। তিনি কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে বসেছিলেন। তারপরে চোখ খুলে বলেছিলেন, "এতক্ষণ তোকে যা বলছিলাম, এগুলো সবই যোগ সাধনার বিষয়। কিন্তু এই সাধনা, সাধিকা রমণীর সঙ্গে করতে হয়। আমাদের ভিতরে শিব শক্তিকে মিলন করাতে হলে, আমাকে আর আমার সাধিকাকেও শিব শক্তি রূপে মিলিত হতে হবে। নারী হলো শক্তি, আর শক্তি সাধনার দ্বারাই, সেই পরম শিব শক্তির মিলন সম্ভব। আসলে, শিব আর শক্তি, দুই রূপে এক আর অভিন্ন। সব সাধনাই শক্তিরই সাধনা। "প্রকৃতি" সাধনাই শক্তি সাধনার স্বরূপ। বলতে কি, এই জগৎই শক্তি, সেই জন্যই আমরা বলি, নারী ত্রিলোকের জননী, তিনিই ত্রিভুবনধারা।"

আমি বলে উঠেছিলাম, "যুবতী রহিতং দেবি কুতো বিদ্যা, কুতো মনুঃ/নিগুর্ণং পরমং ব্রহ্ম প্রধানা যুবতীগণাঃ।"

প্রাণতোষবাবা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কার কাছে শুনলি এ কথা?"

আমি বলেছিলাম, "পবিত্রীমায়ের কাছে।"

তিনি হেসে বলেছিলেন, "তা হলে তো তুই আসল লোকের মুখ থেকেই সব শুনেছিস।'

"আজ্ঞে না, সব শুনিনি।" আমি বলেছিলাম, "নারীকে কি রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত, সে-কথা বলতে গিয়েই তিনি আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনিয়েছিলেন।"

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "পবিত্রী মায়ের সেই অধিকার আছে। এমনকি তিনি এখন স্ত্রীগুরুও হতে পারেন। এটা খুবই বিরল ব্যাপার, তবু আমাদের মধ্যে স্ত্রী-গুরুর কাছ থেকেও দীক্ষালাভ করা যায়। যাই হোক আমাদের বীরাচারী তন্ত্র মতে পঞ্চ 'ম' কার আবশ্যিক। মদ্য পান, মাংস মৎস্য মুদ্রা, খাওয়া আর শেষে মৈথুন। তন্ত্র মতে প্রকৃতি মিলন হলো যৌন মিলন, অর্থাৎ পঞ্চম 'ম' কার। কিন্তু এ মিলন বংশ রক্ষার্থে না। একে বলা যায় যৌন-যোগ মিলন। এর মধ্যে আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তন-মর্দন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গ ঘর্ষণ, প্রবেশ, আর স্থাপন, এগুলোকে আমরা বলি পুষ্প। অর্থাৎ পূজারই নয়টি ফুল। এর সঙ্গেই আছে, রেচক, পূরক কুম্ভক, জপ আর মন্ত্র। সেই জন্যই যৌনযোগ মিলন, আর এই মিলনের মধ্য দিয়েই,

কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে তুলে পরম শিবের সঙ্গে মিলন ঘটানো হয়। সহস্রারে এই যে শিব শক্তির মিলন, সেই সময়ে সাধক সাধিকার অনুভূতির কথা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। এখন তোর মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, আমাদের এই মিলনে কি বীর্যপাত ঘটে না ?'

আমি বলেছিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ঘটে, কিন্তু সেটা আমাদের যোগ ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন। সহস্রারে যে শিব শক্তির মিলন ঘটছে, সেই অনুভূতিতে আমরা চিদানন্দস্বরূপ থাকি, তারপরে একটি বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করে, শুক্র ত্যাগ করি। তা বলে, তুই যদি মনে করিস, এই স্খলন মানেই, সবই অশক্ত আর শিথিল হয়ে পড়লো, তা হলে ভুল হবে। কুণ্ডলিনীকে যে-ভাবে চক্রভেদ করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ভাবেই ধাপে ধাপে তাঁকে তাঁর জায়গায় নামিয়ে আনতে হবে।"

কিন্তু আমার মনে তখনো একটি জিজ্ঞাসা কাঁটার মতো ফুটেছিল। প্রাণতোষবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "বুঝেছি, ভাবছিস, এর অনিবার্য ফল, সন্তানটি কোথায় ? অর্থাৎ ভৈরবীর গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটা কী, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" আমি বলেছিলাম।

তিনি আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, "বুঝেছি। একটা কথা তার আগে বলে রাখি, আসলে এ সাধনা ভোগ মোক্ষ। আমরা যখন মিলনের মধ্যে সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলি তখন বলি, 'আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে আহুতি দিচ্ছি।' এখন তোর কথার জবাবে বলছি, 'ঋতুযুক্তলতারমধ্যে সাধয়োদ্বিধবন্মুদা।' অর্থাৎ ঋতুমতী শক্তির সঙ্গে মিলন। এ অবস্থায় সন্তানের জন্ম সম্ভব নয়, এটা সবাই জানে। অবিশ্যি ঋতুযুক্তলতা বলতে, যে কয়দিন নারী রজঃস্বলা থাকবে, সেই কদিনই বোঝানো হচ্ছে না। ঋতুস্রাবের মধ্যে, এবং আগে ও পরের কয়েকটি দিনও বোঝায়। এই মিলনকে আমরা বলি 'ভাণ্ডের' সঙ্গে 'ব্রহ্মাণ্ডের' মিলন। এত কথা শুনে কোনো ধারণা করতে পারলি কি ?"

"পারলাম, কিন্তু মর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

"তা হলে তো তুই একজন সাধক হতে পারতিস।" তিনি হেসে বলেছিলেন, "তবে মনে রাখিস, এ সাধনার বিষয় শুনতে যতো সহজ, কাজে অতি কঠিন। অনেকটা বন্য বাঘের গলা জড়িয়ে ধরার মতো, নয় তো বিষধর সাপের ফণা আঁকড়ে ধরার মতো। যা এবার উঠে দরজাটা খুলে দে।"

আমি তাঁর আদেশ পালন করেছিলাম। দরজা খুলেই দেখেছিলাম, উঠোনের বিপরীত দিকে বাঁধানো ঘরের রকে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছেন পবিত্রীমা এবং জগত। তাঁদের দুজনের খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। বোঝা যাচ্ছিল, স্নান শেষে তাঁরা জামা কাপড় পরে চুল শুকোচ্ছেন। আরও দুতিন জন রমণী তাঁদের সামনে। কেউ কুটনো কুটছে, কেউ বেল পাতা বেছে রাখছে। জগত জবাফুলের মালা গাঁথছেন, এবং সম্ভবতঃ তিনি গান করছিলেন। তিনি অপূর্ব শ্যামা সঙ্গীত করেন। আমার দরজা খোলার শব্দে পবিত্রীমা ফিরে তাকিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে হেসে বলেছিলেন, "কী, বাপ

boiRboi.net

ব্যাটায় কী এত কথা হচ্ছে ?"

আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারিনি। এখনো আমার মস্তিষ্কে প্রাণতোষবাবার যোগ ও তন্ত্র ব্যাখ্যার বিষয় অস্পষ্ট ভাবে নানাভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং পবিত্রীমাকে আমি যেন অন্য এক চোখে দেখছিলাম। পবিত্রীমা গলা তুলে বলে উঠেছিলেন, "বাবা, আপনার ছেলেটি আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে কেন ?"

প্রাণতোষবাবা ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠেছিলেন, "বোধহয় ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখছে।"

কথাগুলো শুনে আমার গায়ের মধ্যে যেন কেঁপে উঠেছিল। প্রাণতোষবাবা আবার বলেছিলেন, "মা, আমাদের দুজনকে একটু চা দিতে বলো।"

পবিত্রীমা বলেছিলেন, "পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা।" তিনি অঙ্গুলি সংকেতে আমাকে ঘরের মধ্যে যাবার নির্দেশ দিয়ে, দু'চোখের পাতা কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিল এক স্থির যৌবনা লাবণ্যময়ী যোগিনীর মতো।

আমি ঘরের ভিতর ঢুকে, আমার আসনে বসে বলেছিলাম, "আপনাদের দুজনের মা বাবা সম্বোধনের রহস্য বুঝতে পারি না।"

"ও যে আদিরূপা জননী।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ও সৃষ্টি করে, লয়ও করে। ও নানা রূপেই আমার ব্রহ্মাণ্ড। আমার ধ্যান জ্ঞান যোগ ওরই দান। আমি তো শব। ওর কল্যাণে শিবত্ব প্রাপ্ত হই। ও আমার ধাত্রী, পালিকা, আবার ও-ই আমার জন্মদাত্রী। এ আত্মোপলব্ধি সাধনায় হয়। কেবল মাত্র সংসারের বিচারে সম্পর্ক স্থির হয় না। আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জবাব দে।"

আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর জননেন্দ্রিয়র সঙ্গে প্রথম কবে নারীর জননেন্দ্রিয়র স্পর্শ ঘটেছিল ?"

আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলাম, "আজ্ঞে, আমার জীবনে অল্প বয়সেই নারী সংযোগ ঘটেছিল।"

তিনি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তবু শুনি, সেই বয়সটা কতো ?"

বলেছিলাম, "আজ্ঞে কৈশোরেই অবৈধভাবে এক আত্মীয়ার —"

"ইডিয়ট !" তিনি ধমক দিয়ে বলে উঠেছিলেন, "তোর ওসব কৈশোর বৈধ অবৈধ সংযোগের কথা শুনতে চাইনি। ভেবে দ্যাখ্ জন্ম লগ্নেই মাতৃযোনির সঙ্গে তোর অঙ্গের স্পর্শ হয়েছিল। তাই নয় কি ?" আমি হতবাক বিস্ময়ে চুপ করেছিলাম। এরকম একটি জন্মবৃত্তান্তের বাস্তবের কথা আমার চিন্তায় আসেইনি। তবু না জিজ্ঞেস করে পারিনি, "সেটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তার সঙ্গে সাধনার যোগাযোগ কোথায় ?"

"যোগ মিলন সাধন হলো সাধকের সেই অবস্থায় যখন সে ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের অনুভূতি আর জ্ঞানের অতীত।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "সেইজন্যই তিনি আমার আদিরূপা জননীও বটেন।"

বস্তুত, তাঁর ব্যাখ্যা থেকে আমি সম্যক কিছু বুঝতে না পারলেও, দূরাগত শব্দের মতো একটা উপলব্ধি ঘটেছিল। তবে সেই মুহূর্তে ম্যাকাসিম গার্কির "আত্ম-

boiRboi.net

জীবনী"-এর দাদামশাই ও দিদিমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তাঁরা বৃদ্ধ বৃদ্ধা পরস্পরকে মা ও বাবা সম্বোধন করতেন।

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "আজ তো অনেক কথা হলো। এখনই তোর আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?"

আমি বলেছিলাম, "আজ আর একটি বিষয়ই আপনার কাছে জানতে চাই।"

"বল্, শুনি।"

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই পবিত্রীমা ঘর আলো করে ঢুকেছিলেন। তাঁর এক হাতে একটি ধূমায়িত কালো পাথরের গেলাস অন্য হাতে চিনে মাটির চায়ের কাপ ডিশ। পাথরের গেলাসটি আগে নামিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণতোষবাবার সামনে, তারপরে আমার সামনে, কাপ ডিশ। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "বসো মা।"

পবিত্রী মা তাঁর আসনের পাশেই একটি লাল কাপড়ের আসনের ওপর বসেছিলেন। কিন্তু আমি বিপদগ্রস্ত বোধ করেছিলাম। প্রাণতোষবাবাকে আমার যা জিজ্ঞাস্য ছিল, তা হলো, পবিত্রীমায়ের নিজের ঘরের দেওয়ালে, আমি সাদা কালো একটি পট দেখেছিলাম। পটের বিষয়, দিগম্বরী কালী, দিগম্বর শিবের বস্তিদেশের দু পাশে দু পা ছড়িয়ে বসে আছেন। সেই কালী চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা, কিন্তু জিভ কেটেছেন।

প্রাণতোষবাবা চায়ের পাত্রে চুমুখ দিয়ে বলেছিলেন, "কী জিজ্ঞেস করবি, কর?"

আমি বিব্রত লজ্জিত চোখে পবিত্রীমায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়েছিলাম। তাঁরা দুজনে পরস্পরের দিকে অবাক দৃষ্টিবিনিময় করেছিলেন। পবিত্রীমা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী ব্যাপার, আমার সামনে কিছু বলতে লজ্জা করছে নাকি?"

"আশ্চর্য!" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "এই মাত্র কী বলে তোকে এই মহিলার পরিচয় দিচ্ছিলাম? এঁর সামনে লজ্জা করছিস্? অথচ এঁর ডাকেই তুই আমার কাছে এসেছিস!"

খুবই সত্যি কথা। আসলে আমি নারী জাতি সম্পর্কে আমার প্রচলিত ধারণা থেকেই লজ্জা পেয়েছিলাম। আমি সহজেই লজ্জা কাটিয়ে বলেছিলাম, "আমি পবিত্রীমায়ের ঘরে একটি শিব ও দ্বিভুজা কালীর পট দেখেছি। কালীর এরকম মূর্তি আমি আর কোথাও দেখিনি।"

ও'রা দুজনেই আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "মায়ের ঘরের পটের কথা মায়ের সামনে বলতে লজ্জা কী? কালীর ওই মূর্তির নাম 'বিপরীতরতাতুরা।' রতিক্রীড়ায় পুরুষের ওপরে নারী যখন ক্রিয়াশীলা, তাকে বলে বিরপীতরতিবিহার। আমরা বলি, শবরূপী শিবের ওপর শক্তিরূপিণী কালী আসীনা। শিবকে জাগিয়ে তুলছেন। অথবা, যেহেতু শিব শক্তি এক আর অভিন্ন, এক্ষেত্রে কালী স্বেচ্ছায় সানন্দে সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃতা। দেবীর এটি সক্রিয় ভূমিকা। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, মহাদেবী পুরুষকে অধোদেশে রেখে রমণ করছেন। কিছু বোঝা গেল?"

আমি পবিত্রীমায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাঁর মুখে সব সময়েই যেমন একটি হাসি লেগে থাকতো, সেইরকমই ছিল। আমি বলেছিলাম, "একটা অনুমান হলো।"

boiRboi.net

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি, কালীর বহু নামের বহু ব্যাখ্যার মতোই, একটি ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু বুঝিনি, যার কোনো সম্যক উপলব্ধি আমার ছিল না। তবে, তাঁর ব্যাখ্যা মতো, ভাণ্ডে আর ব্রহ্মাণ্ডে যদি কোনো তফাত না থাকে, এবং কালীই যদি ব্রহ্মাণ্ড হোন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই শিবের সঙ্গে বিপরীত বিহারে সঙ্গত হতেই পারেন। কারণ তন্ত্রমতে সাধক-সাধিকারাও শিব শক্তিরূপে এইরকম বিহার করেন।

"অনুমান আর ধারণা ছাড়া তোকে আমি কিছুই দিতে পারি না।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, এবং পবিত্রীমায়ের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, "মা, তুমি অনুমতি দিলে, সামনের অমাবস্যায় আমাদের চক্রে ওকে থাকতে বলবো।"

পবিত্রীমায়ের ভুরু জোড়া এক মুহূর্তের জন্য কুঁচকে উঠেছিল। আবার স্বাভাবিক মুখ করে বলেছিলেন, "বলতে পারেন, তবে জগত আর যোগেশ্বরের অনুমতি থাকা দরকার।"

"নিশ্চয়ই।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ওদের অনুমতি তো অবিশ্যিই চাই। আমি চাইলে আশা করি পাবো।"

পবিত্রীমা হেসে বলেছিলেন, "তা পাবেন, কিন্তু কি অধিকারে ও চক্রে ঠাঁই পাবে?" তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

প্রাণতোষবাবা আমার দিকে সস্নেহ চোখে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন, "ও অনধিকারী, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়। ওর কথা থেকে বুঝেছি, তন্ত্রমতে ওর আত্মোপলব্ধির একটা ব্যাকুলতা আছে।"

তিনি যথার্থই বলেছিলেন। পবিত্রীমা আমার দিকে তাকিয়ে, তাঁর সেই মধুর হাসি হেসে বলেছিলেন, "তথাস্তু!"

*

উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ দিন পরেই, সেই প্রতীক্ষিত রহস্যময় অমাবস্যার রাত্রিটি এসেছিল। প্রাণতোষবাবা পবিত্রীমাকে বলার আগে, সেই রাত্রিটির বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। হয় তো আমি কিছুই জানতাম না। হয়তো অমাবস্যার আগেই কামাখ্যা ত্যাগ করতাম। পরে প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, "এটা ঠিকই, আমাদের সাধনপ্রণালী সবই গোপন করতে হয়, কারণ পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা অধিকাংশ লোকের চোখেই নিতান্ত ভোগ বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এমন উপদেশও আছে, তন্ত্র সাধনার প্রতি যে প্রকৃত আগ্রহী, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা পোষণ করে, পশুসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ করে সাধনার অন্তর্নিহিত বিষয়কে বুঝতে চায়, তার সামনে চক্রানুষ্ঠান করা যায়। তোর সম্পর্কে আমার সেই বিশ্বাস আছে। তোকে আমি সাধন বিষয়ে বলেছি। বাস্তবে তার স্বরূপ কী, সেটাও আমি তোকে দেখাতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, এটা তোর জীবনে একটা অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।"

তিনি মিথ্যা কিছু বলেননি। আমি আগেই বলেছি, তন্ত্র সাধনপ্রণালীর বিষয় জানা ও দেখা একটি দুর্লভ সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার মতো মনের শক্তি আমার ছিল কী না, সে-বিষয়ে আমি নিজেই সন্দিহান ছিলাম। অমাবস্যার রাত্রিটি যতোই এগিয়ে আসছিল, ততোই যেন একটা দ্বিধা আর

boiRboi.net

উৎকণ্ঠা আমার মনের ওপর চেপে বসছিল। অবিকৃত সুস্থ মন নিয়ে কি আমি চক্রে উপস্থিত থাকতে পারবো? এমন কি, পালাবার কথাও আমার মনে এসেছিল।

আমার এইরকম মানসিক অবস্থার মধ্যেই, একটা বিষয় আমার চোখে বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। রোজই কিছু শিষ্যা সেবিকা এসে উষ্ণ সুগন্ধিজলে পবিত্রীমা আর জগতকে স্নান করাতো। সাবান ব্যবহার হতো কী না, জানি না। সেবিকারা রোজই পাহাড়ের নীচে ব্রহ্মপুত্রের কর্দম মৃত্তিকা নিয়ে আসতো। অগুরু ধূপের ধোঁয়ায় তাঁদের কেশচর্চা হতো। যেন বিয়ের আগে, দুটি কন্যাকে বিশেষভাবে তৈরি করা হচ্ছিল। যদিও তা অলংকারের সাজ নয়, কিন্তু দুজনেই যেন আরও রূপবতী আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলেন। রুদ্রাক্ষ আর প্রবালের মালা ছাড়াও, দেববালাদের মতোই তাঁদের কেশে ও গলায় ফুলের মালা ঝুলতো। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা দুজনে ঘরে দরজা বন্ধ করে কী করতেন আমি জানি না। মাঝে মাঝে জগতের মিষ্টি গলার শ্যামা সঙ্গীত শুনতে পেতাম, এবং দেখে মনে হতো, তাঁরা সব সময়েই যেন একটা ভাবাবেশে আছেন।

অবাবস্যার তিন দিন আগে সাধক যোগেশ্বর এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুনেছিলাম, তিনি কাছাড়ের শিলচর থেকে এসেছিলেন। বয়স তিরিশের বেশি না। কিন্তু তাঁর মাথায় ছিল কোঁচকানো বড় বড় চুল আর এক জোড়া গোঁফ। মেদবর্জিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীর্ঘদেহ। প্রাণতোষবাবা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যোগেশ্বর আলাপে ছিলেন অমায়িক আর বিনীত। তিনি আসার পরে, প্রাণতোষ-বাবার সঙ্গে, পাহাড়ী উঠোনের এক ধাপ নীচে সেই বিশেষ ঘরটিতে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ সময় কাটাতেন। তাঁরা কী করতেন, জানি না। যেমন জানতাম না পবিত্রী মা ও জগতের সম্পর্কে। দুটো দিন আমি প্রায় একলা হয়ে পড়েছিলাম।

অমাবস্যার সেই দিনটি এসেছিল। এখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, কামাখ্যার প্রকৃত নাম কামপীঠ। দেবীর মহামুদ্রা বা যোনি এখানে পতিত হয়েছিল। এর আর এক নাম কামগিরি। আশ্রমে চালাঘরে একটি আলাদা মন্দির ছিল। সেখানে মাটির মাতঙ্গী মূর্তি ছিল। মূর্তিটি দ্বিভুজা, পীনপয়োধরা শ্যামা, নাভিস্থলে ত্রিবলী, নিম্নাঙ্গ রত্নালংকারে আবৃত। হাতে ও গলায় নানা অলংকার, কিন্তু নরমুণ্ডের মালা ছিল না, জিভও বাইরে ছিল না। শিবরূপী শবের ওপর আসীনা। ইনি ষোড়শী, এবং এঁর পীঠস্থানও কামাখ্যায় অবস্থিত। আশ্রমে প্রতিদিন এই দেবীর পূজা হতো। এ ছাড়া, আশ্রমে করালী এবং ধীরু নামে দুই যোগী শিষ্যও ছিলেন। যাঁদের দেখে শিবের নন্দীভৃঙ্গির কথা মনে পড়ে যেতো। দুজনেরই শক্তিশালী বিশাল চেহারা। লাল কাপড় তাদের গায়ে থাকতো, আর বাঁশের লাঠি। আশ্রমের দেখাশোনার ভার ছিল তাঁদের ওপর। আর ছিল একটি কালো কুকুর, অপরিচিত লোকের গন্ধ পেলেই যে গর্জে উঠতো। সবাই তাকে 'কালো' বলে ডাকতো।

অমাবস্যার দিন ভোরবেলা থেকেই আশ্রমে অনেক নরনারীর ভিড় হয়েছিল। কয়েকজন পাঁচটি কচি পাঁঠা নিয়ে এসেছিল। পরে পশুগুলোকে স্নান করিয়ে, কামাখ্যার মন্দিরে বলি দিয়ে আনা হয়েছিল। প্রাণতোষবাবা আর যোগেশ্বর

boiRboi.net

সারাদিনই মাতঙ্গী দেবীর পূজায় ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁদের দুজনকে সর্বদাই সাহায্য করেছিলেন পবিত্রীমা ও জগত। প্রায় অপরাহ্নে আমি প্রায় চল্লিশ জন নরনারীর সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক আহার করেছিলাম। সেইসব খাদ্যই ছিল মাতঙ্গীর ভোগ এবং সেই আমি প্রথম জানলাম, পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি ছাড়াও কেবল হিং দিয়ে মাংস রান্না হয়, এবং ঘৃতান্নের সঙ্গে তা রীতিমতো সুস্বাদু লেগেছিল।

কিন্তু প্রাণতোষবাবা যোগেশ্বর পবিত্রীমা জগত এঁরা কেউ খাননি। তাঁদের পূজা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল। তাঁদের পূজা শেষ হবার আগেই, আশ্রম একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বাইরের লোক বলতে আমি একলাই ছিলাম। একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। এবং সেই সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে গাঢ় অন্ধকার। করালী আর ধীরু যোগী আশ্রমের সব ঘরে একটি করে হারিকেন জ্বেলে দিয়েছিল। 'কালো' ঘরে বাইরে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বিকালের দিকে মাতঙ্গীর মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে কী ঘটছিল, কিছুই জানি না। করালী এবং ধীরু যোগী, দুজনেই নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দেখেছিলাম তাঁরা দুজনে, উঠোনের ঢালুতে বিশেষ ঘরটিতে নানা জিনিষ নিয়ে রাখছিলেন। একটি ঘট, আমের পল্লব, পাথরের বড় পাত্রে রক্তচন্দন, অন্য পাত্রে সিন্দুর, নতুন প্রদীপ ইত্যাদি ছাড়াও কর্পূরের গন্ধ পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছিল। প্রাণতোষবাবা সবাইকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এসেছিলেন। করালী এবং ধীরু দুটি হারিকেন হাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সবাইকে প্রণাম করেছিলেন। প্রাণতোষবাবা মুখ তুলে আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমাকেই খুঁজছেন। আমি তাঁর সামনে গিয়েছিলাম এবং তাঁকে, পবিত্রীমা জগত এবং যোগেশ্বরকে প্রণাম করেছিলাম। তাঁরা সকলেই আমার মাথায় হাত স্পর্শ করেছিলেন। তাঁদের সবাইকেই বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। একটি নতুন ব্যাপার চোখে পড়েছিল। জগতের দুই ভুরুর মাঝখানে ও সিঁথেয় সধবার মতো সিন্দুর লাগানো ছিল। দুই হাতে শঙ্খ বলয়। তাঁর এবং যোগেশ্বরের গলায় দুটি মালা ঝুলছিল। এর একটাই অর্থ, জগতের সঙ্গে যোগেশ্বরের শৈব বিবাহ মাতঙ্গীর মন্দিরেই সম্পন্ন হয়েছিল। পবিত্রীমা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি খেয়েছো?"

"হ্যাঁ।"

"রাত্রে কি আবার খাবার দরকার হবে?"

আমি তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। প্রাণতোষবাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, "আমরা এখন চক্রে বসবো। সেখানে থাকলে, তোর আর বাইরে আসা চলবে না। যদি খেতে হয়, এখনই খেয়ে নিতে হবে।"

বিকাল প্রায় চারটেয় দুপুরের খাবার খেয়ে, সন্ধ্যায় আমার পক্ষে আবার খাওয়া অসম্ভব ছিল। রাত্রে আর খাবার ইচ্ছাও ছিল না। বলেছিলাম, "না, আমি আর খাবো না।"

"তবে আয়।" প্রাণতোষবাবা আমাকে ডেকেছিলেন, এবং আমাকে দেখিয়ে ধীরুকে বলেছিলেন, "একে একটা কম্বল দিয়ে দিস।"

boiRboi.net

আমি চারজনের পিছনে পিছনে, পাহাড়ী ঢালুর সেই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। মাপের দিক থেকে ঘরটি আঠারো বাই বারো ফুটের কম না। আমি ঘরে ঢুকতেই প্রাণতোষবাবা দরজার পাশেই ডান দিকের কোণে পেতে রাখা একটি কম্বলের আসন দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এইটি তোর বসবার জায়গা। মলমূত্র ত্যাগ করতে হলে এখনই সেরে আয়।"

আমি সেরকম কিছু অনুভব করছিলাম না। কিন্তু কেমন একটা ভয় আর সংশয় বোধ করছিলাম। আমি আমার জায়গায় বসে বলেছিলাম, "তার দরকার নেই।"

এই সময় বাইরে থেকে শৃগাল ডেকে উঠেছিল। ধীরু এসে আমার কোলের ওপর একটি ভাঁজ করা কম্বল দিয়ে গিয়েছিল। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ধীরু, তোমরা সব নিয়ে এসো।" যোগেশ্বরের দিকে ফিরে বলেছিলেন, "তুমি তোমার কাজ শুরু কর।"

ঘরের প্রান্তে যেখানে ত্রিশূল গাঁথা ছিল, এবং যন্ত্র আঁকা ছিল, প্রাণতোষবাবা সেখানেই এক পাশে একটি আসনে বসেছিলেন। অন্য পাশে পবিত্রীমা ও জগত পাশা-পাশি বসেছিলেন। আমি হারিকেনের আলোয় দেখেছিলাম, যোগেশ্বর তেলের সঙ্গে মেশানো সিন্দুরের পাত্রটি তুলে নিয়ে, স্থায়ী যন্ত্রটির পাশেই আর একটি যন্ত্র এঁকে-ছিলেন। যন্ত্রটি খুবই সাধারণ। প্রথমে একটি ত্রিকোণ, তাকে ঘিরে একটি চতুষ্কোণ ঘর এঁকেছিলেন। বাকিরা সকলেই নিবিষ্ট এবং একাগ্রভাবে যোগেশ্বরের ক্রিয়া দেখছিলেন। তারপরে যোগেশ্বর একটি সাদা রঙ করা ঘট কোলে তুলে নিয়ে সিন্দুর দিয়ে ঘটের গায়ে স্বস্তিকা চিহ্ন ও মানবদেহ এঁকেছিলেন। অন্য একটি ঘট থেকে, আঁকা ঘটে জল ঢেলেছিলেন। হাল্কা কর্পূরের গন্ধে মনে হয়েছিল, জলে কর্পূর মেশানো ছিল। ঘটের মুখের ওপর আমের পল্লব এবং একটি নারকেল রেখেছিলেন, এবং কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে, সিঁদুরের আঁকা যন্ত্রের ওপর ঘটটি রেখেছিলেন। সামনে রাখা প্রদীপ ও ধূপদানিতে ধূপ জ্বেলেছিলেন। তারপরে আবার মন্ত্র জপ; ঘটের সামনে ফুল এবং চন্দন দিয়ে পূজা করেছিলেন। ফিরে তাকিয়েছিলেন প্রাণতোষবাবার দিকে।

প্রাণতোষবাবা হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন। যোগেশ্বর পবিত্রীমা ও জগতের দিকেও তাকিয়েছিলেন। তাঁরাও মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন। সেই সময়েই করালী এবং ধীরু, কয়েকবার যাতায়াত করে, বিভিন্ন পাত্রে নানা ভোজ্যবস্তু এনে রেখেছিলেন। দেখে এবং গন্ধের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলাম, রান্না করা মাংস, মাছ ভাজা, ঘৃতান্ন, কিছু ফল মূল, মিষ্টি, এবং অনেকটা শিরস্ত্রাণের মতো দেখতে একটি পিতলের পানের কৌটো, ওটা যে আসামের বিশেষ এক ধরনের ঢাকা দেওয়া পানের কৌটো তা আমি আগেই দেখেছিলাম। খাদ্য দ্রব্যের মাঝখানে একটি মাটির কলসীও রাখা ছিল।

প্রাণতোষবাবা নিজে উঠে, যেখানে পাঁচটি নরকরোটি রাখা ছিল, তার থেকে চারটি এনে কলসীর সামনে রেখেছিলেন। তিনি কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করে, তামার পাত্রে রাখা জল নিয়ে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের ওপর ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, এবং সকলেই একাগ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সমস্ত দ্রব্যের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপরে প্রাণতোষবাবা ফুল এবং রক্ত-চন্দন নিয়ে কলসীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং চারজনেই কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যান শেষে প্রাণতোষবাবা দু হাতের বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা, ঠোঁট নেড়ে কিছু

boiRboi.net

মন্ত্র উচ্চারণ করে, আগে কলসীটি স্পর্শ করেছিলেন, তারপরে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের পাত্রগুলোও। এই ব্যাপারটি প্রায় আধঘণ্টা সময় নিয়ে হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম, সে সবই ভোজ্য ও পানীয় শোধন করার জপ ক্রিয়া।

শোধনের শেষে, প্রাণতোষবাবা সকলের হাতেই নরকরোটি তুলে দিয়েছিলেন। দুই হাতের বিচিত্র ভঙ্গিতে সকলে নরকরোটি হাতে ধরেছিলেন। প্রাণতোষবাবা কলসী তুলে, প্রত্যেকের নরকরোটিতে পানীয় ঢেলে দিয়েছিলেন, এবং নিজেও নিয়েছিলেন, গন্ধেই টের পেয়েছিলাম, পানীয় মদ ছাড়া কিছু না। সকলে একসঙ্গে করোটি পানপাত্র মুখের কাছে তুলে, এক ঢোঁকে পান করেছিলেন। জগত একবার মাত্রই নিয়েছিলেন। পবিত্রীমা তিনবার তিন পাত্র, যোগেশ্বর পাঁচবার পাঁচ পাত্র, প্রাণতোষবাবা সাতপাত্র পান করেছিলেন। তারপরে তাঁরা সকলে একই পাত্র থেকে মাংস, মৎস্য, ফল ও মিষ্টি খেয়েছিলেন। খাবার সময় তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরকে মা বাবা সম্বোধন করে, বেছে বেছে খাদ্য খেতে অনুরোধ করেছিলেন। লক্ষণীয় ছিল, চারজনের পক্ষে খাদ্যের পরিমাণ আদৌ ভূরিভোজের মতো সুপ্রচুর ছিল না।

ভোজনের পরে তাঁরা সকলেই ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আমার কী কর্তব্য, জানতাম না, অতএব বসেছিলাম। করালী আর ধীরু এসে, নরকরোটিগুলো তুলে রেখেছিলেন। খাদ্য আর পানীয় কলসী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিতলের পানের কৌটোটি যথাস্থানে রাখা ছিল। এবং কার্পেট জাতীয় কিছু আর কয়েকটি কম্বল ঘরের এক পাশে রেখে গিয়েছিলেন। বেতের একটি বড় পাত্রে ফুলের মালাও রেখে গিয়েছিলেন।

আমি যে একটা লোক ঘরের এক কোণে বসে আছি, তা যেন কারোর নজরেই পড়ছিল না। প্রায় পনরো মিনিট পরে প্রাণতোষবাবা পবিত্রীমা যোগেশ্বর ও জগত ঘরে এসেছিলেন। প্রাণতোষবাবা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করেছিলেন। যোগেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে, ঘরের মেঝেয় প্রথমে কম্বল বিছিয়েছিলেন। তারপরে অনেকটা কাশ্মীরী গাববার মতো, লাল পশমের জমির ওপরে নানা রঙের মোটা বস্ত্র পেতেছিলেন। এসব কাজে পবিত্রীমা বা জগত হাত দেননি! তাঁরা দুজনেই শয্যা বা আসন পাতা পর্যন্ত এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পাতা হয়ে গেলে আসনের মাঝখানে গিয়ে দুজনে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেই যেন অপলক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

প্রাণতোষবাবা ও যোগেশ্বর শয্যার ওপর বসে, হাতের মুদ্রা করে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, এবং তামার পাত্র থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। ফুলের পাত্র থেকে, ফুল তুলে, রক্ত চন্দনসহ সারা শয্যায় ছড়িয়ে দেয়েছিলেন। যোগেশ্বর হারিকেন দুটি নিভিয়ে দিয়েছিলেন। তখন ঘরে একটি প্রদীপ মাত্র জ্বলছিল। দরজা জানলা বন্ধ ঘরে প্রদীপের শিখা অকম্পিত। স্বভাবতই একটি মাত্র প্রদীপের আলো। অনেকটা কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের আলোর মতো, ঘরটিকে আবছা আর পীতাভ দেখাচ্ছিল।

অতঃপর প্রাণতোষবাবা এবং যোগেশ্বর পবিত্রীমা ও জগতের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে, তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে

boiRboi.net

যা অসম্ভব। কিন্তু পবিত্রীমা বা জগতের কোনো বিকার ঘটেনি, তাঁরা দুজনেই ঠোঁট নেড়ে যেন কিছু বলেছিলেন। হয় তো বা মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। তারপরেই হতবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম, তাঁরা দুজনেই বিবস্ত্র হয়েছিলেন। প্রাণতোষবাবা এবং যোগেশ্বরও নগ্ন হয়েছিলেন, এবং ফুল ও মালার পাত্র, সিন্দুরের পাত্র, রক্ত চন্দনের পাত্র সামনে টেনে নিয়েছিলেন। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, দৃশ্যটি আমি দেখছি।

ঘরের আলো যতোই ক্ষীণ হোক, দুই জোড়া রমণী পুরুষের উজ্জ্বল দৃঢ় শরীর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রাণতোষবাবা ও যোগেশ্বর দুটি ক্ষুদ্র সরু কাঠিতে সিন্দুর লাগিয়ে, পবিত্রীমা ও জগতের কপালে ত্রিকোণ রেখা এঁকেছিলেন। রক্তচন্দন নিয়ে উভয়ের পীনস্তনে লেপন করেছিলেন। উভয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন ফুলের মালা। তারপরে দুই সাধক দুই সাধিকার নাভি থেকে, বস্তিদেশে, যোনিতে, এবং প্রথমে ডান পা ও পরে বাঁ পর্যন্ত, হাতের বিভিন্ন মুদ্রার দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। সেই রকম ভাবেই, আবার স্তনদ্বয় থেকে নাভি, এবং মাথা থেকে স্তনদ্বয় পর্যন্ত আঙুলের বিভিন্ন মুদ্রা দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। আবার ডান পা থেকে মাথার ডান দিক পর্যন্ত, এবং বাঁ পা থেকে মাথার বাঁ দিক পর্যন্ত, শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করে যেন কিছু জপ করেছিলেন। জপ বলছি কারণ এই কাজটিতে অনেকটা সময় কেটেছিল। তারপরে কেবল যোনিদেশে, ডাইন বাঁয়ে, মধ্যখানে, হাতের স্পর্শে খানিকটা সময় নিয়ে জপ করেছিলেন। জপের কথা কিছুই শোনা যাচ্ছিল না, কেবল মাঝে মাঝে মন্ত্রের দুএকটি দুর্বোধ্য শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ইতিমধ্যেই সাধকদ্বয়ের পুরুষাঙ্গ উচ্ছ্রিত হয়েছিল। তাঁরা জল ও চন্দন দিয়ে দুজনে নিজেদের সেই বিশেষ অঙ্গের পূজা করেছিলেন, এবং স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলাম, তাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন, "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ"। তারপরে আবার দুই "শক্তি"র মাথায় কপালে স্তনে যোনিতে ও পায়ে ফুল ও চন্দন স্পর্শ করে পূজা করেছিলেন। প্রদীপ এবং সুগন্ধ ধূপ দিয়ে তাঁদের আরতি করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আবার বাইরে শৃগাল ডেকে উঠেছিল। আবছা পীত আলোয় পাঁচটি নরকরোটিকে জীবন্ত আর সহাস্য দেখাচ্ছিল। আমি কম্বল গায়ে না দিয়েও ঘামছিলাম। অথচ সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার আকস্মিকতায় আমি যেন জড়বৎ হয়ে গিয়েছিলাম। জানি না, আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ তাঁরা সচেতন ছিলেন কী না, অথবা আমাকে মনুষ্যপদবাচ্য জ্ঞান করছিলেন কী না।

প্রাণতোষবাবা সেই পিতলের পানের কৌটোর ঢাকনা খুলে, পানের খিলি পবিত্রী-মায়ের মুখে পুরে দিয়েছিলেন। পবিত্রীমাও প্রাণতোষবাবার মুখে পানের খিলি পুরে দিয়েছিলেন। যোগেশ্বর ও জগতও একইভাবে পরস্পরকে পানের খিলি মুখে দিয়েছিলেন। তারপর দুই পুরুষ দুই প্রকৃতির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "মা, আমার মোক্ষলাভ হোক, তুমি অনুমতি দাও।"

দুই "শক্তি" দুই "শিব" কে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছিলেন। দুই সাধক, দুই সাধিকাকে গভীর আলিঙ্গনে পিষ্ট করেছিলেন, এবং কোলে নিয়ে আসনে বসেছিলেন। শুরু হয়েছিল কামকলার নানা শৃঙ্গার চুম্বন, আলিঙ্গন, বিভিন্ন অঙ্গে পরস্পরের মর্দন,

boiRboi.net

চোষণ, ঘর্ষণ। সেই মুহূর্তে আমার একবার প্রাণতোষবাবার একটি কথা মনে পড়েছিল, "ঋতুযুক্তলতা মধ্যে···"। কিন্তু আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, সাধিকারা ঋতুমতী ছিলেন কী না। সেই সময়ে সাধকদ্বয়, সাধিকাদের "দেবী, দেবেশী, শিবানী" ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছিলেন।

কিছুকাল সেইভাবে নানা শৃঙ্গারের পরে সাধকদ্বয় মন্ত্রোচ্চারণ করে সাধিকাদের সঙ্গে মৈথুনে রত হয়েছিলেন। তখন নানা রকমের শীৎকার, হুংকার, গভীর ও দীর্ঘ নিশ্বাস টানার শব্দ হচ্ছিল। সে নিশ্বাস সাধারণ নিশ্বাস গ্রহণের ন্যায় ছিল না, বিশেষ শব্দ করে যে ভাবে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, তা পূরক বলেই আমার মনে হয়েছিল তারপরে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, যাকে কুম্ভক বলা যায় তারপরেই রেচক। রেচকের পরেই মৈথুনের তীব্রতা বাড়ছিল, এবং মাঝে মাঝেই পূরক কুম্ভক রেচক করা চলছিল। মাঝে মাঝে সাধক সাধিকার মুখের দিকে অপলক্ চোখে দেখছিলেন, তখন কুম্ভকের মতো নিশ্বাস বন্ধ থাকছিল, এবং তারপরেই উভয়ে হেসে উঠে আবার অঙ্গ চালনা করছিলেন।

আমি সেই সময় বিবাহিত ছিলাম, কিন্তু সঙ্গমক্রিয়ার ঐরকম ভাবের কোনো ধারণা ছিল না। সাধক পুরুষেরা যেন বীর বিক্রমে পূরক কুম্ভক রেচক সহযোগে, মৈথুন-ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একটা কঠোর সংগ্রাম করছিলেন। সাধারণ রমণী বা পুরুষের সেই প্রাথমিক ক্রিয়াকালের মধ্যেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু পবিত্রীমা বা জগত পর্যুদস্ত হওয়া দূরের কথা, মনে হয়েছিল, তাঁরাও যেন সাধক পুরুষদের মতো সাধন সংগ্রামের অংশভাগিনী হয়ে পড়েছিলেন। শীৎকার ও নানা প্রকারের শব্দ তাঁদের গলায়ও শোনা যাচ্ছিল।

প্রাণতোষবাবার কুণ্ডলিনী জাগরণ ও তাকে ঊর্ধ্বগামিনী করার কথা আমার মনে পড়েছিল। তাঁরা কি কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বগামিনী করছিলেন? যোগ মৈথুনের দ্বারাই তা সম্ভব। প্রাণতোষবাবা ও যোগেশ্বর যেন মাঝে মাঝে মন্ত্রোচ্চারণও করছিলেন। কতোক্ষণ সেইভাবে কেটেছিল জানি না, আমার হাতে ঘড়ি ছিল না। যদি থাকতো, দেখবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

এক সময়ে দুই সাধকই অঙ্গ চালনায় বিরত হয়ে, মৈথুনরত অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় সোজা হয়ে বসেছিলেন। সাধিকাদ্বয় দু পা দিয়ে সাধকদের কোমর বেষ্টন করেছিলেন। আর সাধক দুজন যেন নিশ্বাস বন্ধ করে, দুই হাতের বিশেষ মুদ্রায় সাধিকা দুজনের যোনিদেশে স্পর্শ করে কিছু জপ করছিলেন। অথবা কেবল নিশ্বাস বন্ধ না করে পূরক কুম্ভক ও রেচক করছিলেন। সাধিকা দুজন নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তা মনে হয়নি তাঁদের মৃদু শীৎকার শব্দের মধ্যে, শরীরের পেশী আকুঞ্চিত হচ্ছিল, এবং তাঁরাও যেন পূরক কুম্ভক রেচক করছিলেন।

ব্যাপারটা কী ঘটছিল আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, তাঁদের ক্রিয়ানুষ্ঠান বোধহয় শেষ হয়ে এলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ভাবনাকে ভুল প্রমাণিত করে পুনরায় আরও তীব্র বেগে মৈথুনক্রিয়ার অঙ্গচালনা শুরু হয়েছিল। তার সঙ্গে শীৎকার হুংকার অদ্ভুত সব শব্দ করছিলেন।

রাত্রি কতো হয়েছিল, কিছুই অনুমান করতে পারছিলাম না। এত দীর্ঘ সময়

boiRboi.net

ধরে মিলন, প্রাণায়াম, জপ ও মন্ত্রোচ্চারণ, আমার কল্পনার বাইরে ছিল। প্রাণতোষবাবার মুখে শুনেছিলাম, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। ব্যাপারটা আমার কাছে এমনই অমানুষিক কঠিন বলে বোধ হয়েছিল, নরনারীর মিলম সঞ্জাত ক্রিয়া দর্শনের স্বাভাবিক কোনো প্রতিক্রিয়াই আমার মধ্যে ঘটবার অবকাশ পায়নি। সাধারণ কোনো দম্পতির দৈহিক মিলন দেখলে, নিশ্চয়ই আমার শরীরে ও মনে প্রতিক্রিয়া ঘটতো। অথচ আমার সামনে সাধক সাধিকাদের পঞ্চম তত্ত্ব সাধনাটি অতি কামকলার ওপর নির্ভরশীল, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

সাধকদ্বয় আবার অবিচ্ছিন্ন অবস্থায়, সোজা হয়ে বসেছিলেন, এবং সাধিকা দুজন যথারীতি তাঁদের জঙ্ঘা ও দু পা দিয়ে, সাধকদের কোমর বেষ্টন করেছিলেন। সাধক দুজন তখন প্রাণায়াম সূচক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে, সাধিকা দুজনের বস্তিদেশে দু হাতের মুদ্রা করে স্পর্শ করেছিলেন, এবং জপ করেছিলেন। প্রাণতোষবাবার ষটচক্রভেদের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। যে-চক্রগুলোকে তাঁরা কল্পনা করে থাকেন, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে, লিঙ্গমূল থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত অবস্থিত। চক্রের স্থানগুলো তিনি আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব আমি অনুমান করেছিলাম, সুষুম্নার ভিতর থেকে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলে, তাঁরা ঊর্ধ্বগামিনী করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমি কিছু ভুল ধারণা করিনি। দুই সাধক, সাধিকাদের বস্তিদেশ অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চক্রে জপ করে, আবার হুহুংকার শব্দে মৈথুন শুরু করেছিলেন, এবং এক সময়ে আবার স্থির হয়ে, মণিপুরে অর্থাৎ সাধিকাদের নাভিমূলে জপ করেছিলেন। সেই ভাবে ক্রমাগত হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে চক্রগুলোকে দুই সাধক ভেদ করেছিলেন। আমি জানি না, শেষ প্রহরের শৃগাল ডেকে উঠেছিল কী না। কিংবা চক্র সাধন সময়কে আমার অতি বিলম্বিত ধারণা হয়েছিল।

ভ্রূমধ্যকে সাধকরা 'আজ্ঞাচক্র' বলেন। তারপরেই "সহস্রার" অর্থাৎ মস্তিষ্কে, যেখানে কুণ্ডলিনী অর্থাৎ মহাশক্তির সঙ্গে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ পরম শিবের মিলন হয়। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, সেই অবস্থায় সাধক তাঁর ইচ্ছা ও সাধ্যমতো সময় পরমানন্দে অতিবাহিত করেন। তারপর মন্ত্রোচ্চারণ করে শুক্রত্যাগ করেন। আমি দেখেছিলাম, জগত থরথর কাঁপছিলেন। কাঁদছিলেন বা হাসছিলেন, সঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁর পদযুগল ও দুই হাত তখন যোগেশ্বরের কণ্ঠ বেষ্টন করেছিল। তাঁকে অনেকটা বৃত্তের মতো দেখাচ্ছিল। যোগেশ্বর তাঁকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। প্রাণতোষবাবা ও পবিত্রীমা দুটি সাপের মতো জোড়া লাগা অবস্থায় অদ্ভুতভাবে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। কখনো একজন নীচে আর একজন ওপরে থাকছিলেন। সেইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে আস্তে আস্তে দুই জোড়া দেহই যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে তাঁদের গলা দিয়ে অদ্ভুত অস্ফুট শব্দ নির্গত হচ্ছিল।

আমি ভাবছিলাম, সেই কি তাঁদের ইচ্ছা ও সাধ্যমতো সময়, পরমানন্দে অতিবাহিত করা? জানি না। মাঝে মাঝে দু একটি অস্ফুট শব্দ ছাড়া, এমন কি তাঁদের নিশ্বাসের শব্দও যেন পাচ্ছিলাম না। প্রাণতোষবাবা পরে আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই অবস্থায় সাধকদের দেহ প্রায় মৃতবৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ

boiRboi.net

থাকে। তার পরবর্তী অধ্যায়, বিশেষ একটি মন্ত্রোচ্চারণ করে, শুক্রক্ষরণ। এবং তারও পরবর্তী অধ্যায়, কুণ্ডলিনীকে ধাপে ধাপে মূলাধারে নামিয়ে নিয়ে আসা।

কিন্তু তাঁরা যখন সংযুক্ত অবস্থায় অনড় নিশ্চল ছিলেন, তখন আমার চোখে যেন রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছিল। জানি না, সেই চক্রানুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কী না, অথবা অনেকক্ষণ মানসিক একটা ঝড়ের বেগে কেটেছিল বলেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম কী না, আমার আসনের ওপরেই ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম। সকালবেলা আমার যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল।

আমি কোথায় কী অবস্থায় আছি ভাববার চেষ্টা করেছিলাম, এবং গত রাত্রের কথা মনে পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বসেছিলাম। অবাক চোখে দেখেছিলাম, ঘরে কোনো শয্যা বা আসন নেই। প্রদীপ ধূপদানি ফুলের পাত্র পানের কৌটা, কিছুই নেই। ছিল না সেই ঘট, যন্ত্র পট। কেবল ত্রিশূলটি যেমন থাকে, এবং দেওয়ালের একপাশে তাকের ওপর রাখা পাঁচটি নরকরোটি, সে সবই আগের মতো ছিল। আমার নিজের মনেই যেন সংশয় জেগেছিল, গত রাত্রে আমি যা দেখেছি তা কি বাস্তবে সত্যি? কিন্তু আমার কাছে সেই চক্রানুষ্ঠানের দৃশ্য যেন স্বপ্নবৎ বোধ হয়েছিল। আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে ধীরু যোগীকে দেখেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন "হাত মুখ ধুয়ে নিন, আপনার চা প্রস্তুত।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "প্রাণতোষবাবা এবং আর সকলে কোথায়?"

ধীরু জবাব দিয়েছিলেন, "বাবা মায়েরা তো ভোরবেলাই স্নান করে নীলাচলে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে পুজো দিতে গেছেন।"

কামাখ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের নাম নীলাচল, এবং সেখানে গর্ভগৃহে ভুবনেশ্বরীদেবী আছেন। সমস্ত রাত্রের চক্রানুষ্ঠানের পরে ভোরবেলাই স্নান করে আবার তাঁরা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে গিয়েছিলেন, ভেবে আমি অবাক হয়েছিলাম। তাঁদের কি কোনো ক্লান্তি ছিল না।

না, বরং দুপুরে তাঁদের আমি বিপরীত রূপেই দেখেছিলাম। তাঁদের দেখাচ্ছিল সুখী, উজ্জ্বলতর, এবং একটি গভীর সুখের আবেশে যেন আচ্ছন্ন। তারপরেও আমি তাঁদের কাছে দুদিন ছিলাম। তখন অনেক কথার মধ্যে, প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, "ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সাধনতত্ত্ব তোকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়েছি। কিন্তু আমি আশা করবো বিষয়টি নিয়ে তুই অজ্ঞ মূর্খদের সঙ্গে কখনো আলোচনা করবি না।"

জানি না, এতকাল পরে, এই লেখার দ্বারা আমি কথার খেলাপ করলাম কী না।

*

কামাখ্যা পাহাড়ের ঘটনার সাত বছর পরে, কালী পুজো উপলক্ষে, আমি বর্ধমানের সেই প্রান্তিক গ্রামে গিয়েছিলাম, যার এক দিকে বীরভূম, এবং গঙ্গার অপর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা। যে গ্রামে আমি গিয়েছিলাম, সেই গ্রামের অধিকাংশ উচ্চকোটি হিন্দুরাই শাক্ত, শক্তির উপাসক। বস্তুতঃ বর্ধমান, বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়া, যাকে রাঢ় অঞ্চল বলে, সর্বত্রই আমি, হিন্দু বা সহজিয়া তন্ত্র সাধনার প্রাদুর্ভাব দেখেছি। বিশেষ করে বীরভূম এবং বর্ধমান। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও কম

দেখিনি।

যাই হোক, বর্ধমানের সেই প্রান্তিক গ্রামে এক কৌলমার্গী তান্ত্রিক সাধক তাঁর চক্রে আমাকে একজন 'যোগদানকারী' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেই সাধককে তখন আমি সামান্য একটি রেশমের ধুতি আর উত্তরীয় ব্যবহার করতে দেখেছিলাম, এবং সবাই তাঁকে "গোঁসাই ঠাকুর" বলে সম্বোধন করছিল। প্রকৃতপক্ষে আমি আদৌ একজন দীক্ষিত সাধক ছিলাম না, আমার কোনো গুরুও ছিল না। এমন কি, ইতিপূর্বে কামাখ্যা পাহাড়ে প্রাণতোষবাবার আশ্রমের অভিজ্ঞতার কথাও গোঁসাই ঠাকুরকে আমি কিছু বলিনি। তন্ত্র বিষয়ে আমি তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, এবং তন্ত্র সাধনার গোপনীয়তার বিষয়ে, বেদের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন। "আমাদের সাধনাকে 'বীরাচার' বলা চলে। সেই জন্যই আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, ব্যাহ্যিক ধর্মচরণে আমরা শৈবভাব অবলম্বন করবো। সামাজিক মেলামেশায় বৈষ্ণবোচিত বিনীত আচরণ করবো, আর সাধনকালে আমি একজন শক্তির উপাসক। শক্তির উপাসককে 'লজ্জা' 'ঘৃণা' 'ভয়' এই তিনটি প্রবৃত্তি সমূলে বর্জন করতে হবে। আমরা অন্তরে একরকম, লোকচক্ষে আর একরকম। এ সবই গোপনীয়তার জন্য। কেন না, তোমাকে বলছি, আমাদের পঞ্চ-মকারের সাধনা দেখলে, অজ্ঞদের চোখে তা একরকমের যৌনাচার ছাড়া কিছুই মনে হবে না।"

সে বিষয়ে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল, যদিও আমি তাঁকে তা প্রকাশ করিনি। গোঁসাই ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, "আমাদের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম, শিব শক্তির সামরস্য, কিন্তু যোগের দ্বারা সুষুম্নায় সেই মিলন ঘটে। মহাদেব দেবীকে বলেছেন, 'দেবী, আমি শুক্র, তুমি শোণিত, আমাদের দুইয়ের থেকে নিখিল জগতের উদ্ভব হয়েছে।' বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডে যা ঘটছে, আমাদের দেহেও একই লীলা ঘটছে কোনো তফাত নেই।"

তাঁর সেই কথা শুনে, প্রাণতোষবাবার "ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড" বিষয় আমার মনে পড়েছিল। দেহকে সেইজন্য তান্ত্রিক সাধকরা অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন, এবং মানব জন্মকে দুর্লভ বলে বিবেচনা করেন। যাই হোক, সেই গোঁসাই ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, যথা সময়ে আমাকে লোক দিয়ে সংবাদ পাঠানো হবে, আমি যেন সেই লোকের সঙ্গে চক্রে যোগদানের জন্য চলে যাই। কালীপুজোর পরের দিন, সন্ধ্যায় আমাকে একজন এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি যে শাক্ত পরিবারে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বর্ধমানের সেই প্রান্তিক গ্রামে গিয়েছিলাম, তাঁরাও ঘোর শাক্ত, কিন্তু তান্ত্রিক সাধক কেউ ছিলেন না। পুজোর দিন পনেরো-বিশটি ছাগ বলি এবং সমারোহ দেখেছিলাম। গৃহকর্তা আমাকে নিজের গোঁসাই ঠাকুরের চক্রে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমার মনে নেই, কালীপুজোর পরের দিনও অমাবস্যা ছিল কী না। কিন্তু আকাশে প্রথমার চাঁদ দেখতে পাই নি। সন্ধ্যাকালেই মনে হয়েছিল ঘোর অন্ধকার। প্রথম প্রহর ঘোষণা করে শিয়াল ডেকে উঠেছিল! গোঁসাই ঠাকুরের প্রেরিত গ্রাম্য

লোকটি আমার হাত না ধরলে, অন্ধকারের গ্রাম্য পথে আমি আছাড় খেতে পারতাম। লোকটি আমাকে গাছপালা ঘেরা উঁচু জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, এবং আমি নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখে, পাশেই বড় একটি জলাশয় অনুমান করেছিলাম। তারপরেই আমার চোখে পড়েছিল, কিছুটা দূরেই বড় একটি অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা ও কয়েকটি মানুষের ছায়া। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ওই আগুন কিসের?"

জবাবে লোকটি বলেছিল, ওখানে শবদাহ করা হচ্ছে, স্থানটি গ্রাম্য শ্মশান। শ্মশান শুনেই আমি চমকিয়ে উঠেছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাকে ওখানে যেতে হবে কী না। লোকটি বলেছিল, না। এবং সে আমাকে কাছেই একটি ঘরের সামনে নিয়ে গিয়েছিল। ঘন অন্ধকারের জন্যই আমি ঘরটি দেখতে পাইনি, বা সেখানে যে কোনো ঘর থাকতে পারে, ভাবতেই পারিনি। ঘরের দরজা খোলা ছিল, ভিতরে আলো জ্বলছিল। দরজার সামনে দাঁড়াতেই আমি কৌলমার্গী গোঁসাইঠাকুরকে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি যে আসনের ওপর বসেছিলেন, তার পাশের আসনেই প্রায় এক অশীতিপর বৃদ্ধ জটাধারী ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছিলাম। দুজনের গায়েই তখন নিম্নাংশে ও ঊর্ধ্বে দুই টুকরো লাল বস্ত্র জড়ানো। কপালে লাল ত্রিপুণ্ড্র আঁকা। একাধিক হ্যারিকেন এবং প্রদীপের আলোয় আরও দেখেছিলাম, অন্য পাশে এক রক্তাম্বর মধ্যবয়স্ক পুরুষ, ও তাঁর পাশে রক্তাম্বরী এক যুবতী রমণী বসেছিলেন। ঘরের মাঝখানে খড় ছড়িয়ে তার ওপর শতরঞ্জি, শতরঞ্জির ওপরে লাল কাপড় পাতা। যেন একটি লাল রঙ বিছানা পাতা হয়েছিল। বিছানার ঠিক মাঝখানে অনেকগুলো কলাপাতা এক সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে পাতা হয়েছিল। সাধারণতঃ গৃহস্থের বিবাহ বাড়িতে এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ অন্ন রাখবার মতো করে কলাপাতাগুলো জড়ো করে পাতা ছিল।

গোঁসাইঠাকুর (আমার ধারণা ছিল একমাত্র বৈষ্ণব গুরুকেই গোঁসাই বলা হয়। অথচ সেই গোঁসাইঠাকুর হিন্দু তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।) আমাকে দেখেই এবং চকিতে আমার পায়ের দিকে দেখে বলে উঠেছিলেন, "তোমার পায়ের স্যাণ্ডেল বাইরে খুলে রেখে ভেতরে এসে বস।"

আমি স্যাণ্ডেল খুলে রেখেছিলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলেন, "এস আমার কাছে এসে বস।"

ঘরের সকলেই তখন আমার দিকে দেখছিলেন। সেই পরিবেশে ধুতি পাঞ্জাবি পরা আমার নিজেকেই বেমানান লাগছিল। লাল বিছানার পাশ দিয়ে, আমি গোঁসাই-ঠাকুরের পাশে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, সেখানে পাশাপাশি কুশকাঠির কয়েকটি আসন পাতা আছে। তিনি আমাকে হাত ধরিয়ে বসিয়ে, পাশের অশীতিপর বৃদ্ধের দিকে ফিরে বলেছিলেন, "গুরুদেব, এই ছেলেটিকে আমি চক্রে যোগ দিতে বলেছি। ও দীক্ষিত নয়, তবে ওর ভেতরে একটা প্রবল ইচ্ছা আর ভক্তি আছে।"

"কিন্তু দীক্ষিত না হলে ও যোগ দেবে কেমন করে? ওর শক্তি কে?" গুরুদেব জিজ্ঞেস করেছিলেন।

গোঁসাইঠাকুর বলেছিলেন, "শক্তির সঙ্গে সাধনার জন্য ওকে ডাকিনি। নিতান্ত প্রসাদ গ্রহণের জন্যই ডেকেছি। ও বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন ছেলে।"

boiRboi.net

গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "ও যদি নির্বিকার থাকতে পারে, তা হলে নিশ্চয় থাকবে। ভক্তিশুদ্ধ মনে যে কেউ চক্রে স্থান পেতে পারে।"

আমি গোঁসাইঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি কি গুরুদেবকে প্রণাম করতে পারি?"

গোঁসাইঠাকুর কিছু বলবার আগেই তাঁর কোলের ওপর দিয়ে, গুরুদেব তাঁর দু পা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে প্রণাম করেছিলাম। গুরুদেব পা জোড়া সরিয়ে নিয়ে আবার জোড়াসনে বসেছিলেন। তারপরে আমি গোঁসাইঠাকুরকে প্রণাম করেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত স্পর্শ করে, ঠোঁট নেড়ে কিছু বলেছিলেন। সেই সময়েই ঘরে প্রবেশ করেছিলেন দুই জোড়া পুরুষ ও রমণী, যাঁদের গায়ের বস্ত্র ছিল লাল এবং কপালে সিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্র আঁকা। একজন পুরুষের মাথার চুল ছিল মেয়েদের মতো দীর্ঘ এবং ফাঁপানো ছড়ানো। তাঁর সঙ্গিনী রমণীর হাতে একটি ত্রিশূল ছিল। বলাবাহুল্য, সকলের গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। কারো কারো অবিশ্যি লাল প্রবাল বা নানা রঙের পাথরের মালা, লোহা বা তামার বা রুদ্রাক্ষের তাগাও হাতে পরা ছিল। নবীন দুই জোড়া রমণী পুরুষ ঘরে ঢুকে প্রথমে অশীতিপর বৃদ্ধ ও গোঁসাইঠাকুরকে প্রণাম করে, এক পাশে কুশকাঠির আসনে বসেছিলেন। তাঁরা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। আমি অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

তারপরেই দেখেছিলাম, কয়েকজন গ্রাম্য মানুষ বড় বড় পিতলের ও কাঠের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। তাদের দুজনের চার হাতে ছিল চারটি বড় বড় মাটির কলস। একজনের বাঁ কাঁধের পাশে ঝুলছিল একটা বড় ঝোলা। গন্ধেই টের পেয়েছিলাম, ভারী ওজনের কলসী চারটিতে মদ রয়েছে। একজন বিরাট একটি পিতলের গামলা উপুড় করে, বিছানার মাঝখানে রাখা কলাপাতায় ঢেলে দিয়েছিল তেল মাখা ভাজা মুড়ি, তার সঙ্গে শসা ও আদার কুচি। আর একজন একটি কাঠের বড় পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল প্রচুর ভাজা মাছ। অন্য আর একজন বৃহৎ দুই তামার হাঁড়িতে রেখেছিল রান্না করা মাংস। যে-লোক দুটি কলসী বহন করে এনেছিল, তারা বাইরে গিয়ে, আরও দুটি মদ্যপূর্ণ কলসী এনে ভোজ্য বস্তুর সামনে রেখেছিল। যে-লোকটির বাঁ কাঁধে ঝোলা ছিল, তাঁর ভিতর থেকে সে কতগুলো মেটে রঙের নরকরোটি বের করে কলসীগুলোর পাশে রেখেছিল। কিন্তু নরকরোটি সাদা হবার কথা। পরে বুঝেছিলাম, ওগুলো আসলে নারকেলের খোল, অতি যত্নে মাজা ও মসৃণ করা। এমন সব নারকেলের খোল দিয়ে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল, কেবল সাদা রঙ ছাড়া বাকিটা অবিকল করোটির মতো দেখতে। নরকরোটির প্রতীক হিসাবে নারকেলের খোলের প্রচলন ছিল।

নানা খাদ্য ও পানীয় বস্তুর গন্ধের সঙ্গে, বড় ঘরটির মধ্যে যেন এক কর্মযজ্ঞ চলছিল। দুটি সাধারণ স্ত্রীলোক কয়েক ডালি ভরতি ফুল, ফুলের মালা, লাল চন্দন গোলা, এবং তেল মাখানো তরল সিঁদুর কলাপাতায় এনে রেখেছিল। একটি পিতলের বাটায় আনা হয়েছিল অনেকগুলো পানের খিলি। পুরুষেরা কেউ কেউ কলসীতে

boiRboi.net

পানীয় জল, এবং লোহার বালতিতে ব্যবহারের জন্য জল রেখেছিল এক পাশে। তার মধ্যেই রক্তাম্বর রক্তাম্বরী পুরুষ রমণীরা কেউ কেউ ঘরের বাইরে ঘুরে আসছিল। অনুমান করতে পারছিলাম, বাইরে বেশ কিছু নরনারীর সমাবেশ ঘটেছে।

এই সব ব্যবস্থাদির পরেই, ঘরে প্রবেশ করেছিল এক অতুলনীয়া কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা, যার বয়স উপস্থিত সকল যুবতীর তুলনায় অনেক কম। আমার ধারণায় সে ছিল অষ্টাদশী। অতুলনীয়া বললাম এই কারণে, তার উদ্ধত বক্ষ, ছিপছিপে শরীরের সুষমায় যেন এক আশ্চর্য অলৌকিকতা ঘিরে ছিল। অনেকটা প্রতিমার মতোই তার দুই চোখ আকর্ণ বিস্তৃত, উন্নত নাসায় পাথরের নাকছাবি। পাখির খোলা ডানার মতো দুই ভুরুর মাঝখানে বড় একটি সিন্দুরের ফোঁটা, কিন্তু সিঁথেয় সিঁদুর না থাকায় বুঝেছিলাম, সে অবিবাহিতা। সামান্য একটি চওড়া লালপাড় শাড়ি ছাড়া আর কোনো বস্ত্র ছিল না তার গায়ে। এমন কি কোনো অলঙ্কার বা রুদ্রাক্ষের মালাও তার গলায় ছিল না। কেবল দুপায়ে চওড়া করে আলতা পরা ছিল। কুঞ্চিত কেশদাম পিঠে ও ঘাড়ে ছড়িয়ে ছিল। কোমরের কাছ থেকে তার পিঠের শিরদাঁড়া যেন অনেকটা ধনুকের মতো বাঁকা, আর সেই কারণেই তার বুক যেন পায়রার বুকের মতো সামনে উদ্ধত দেখাচ্ছিল, এবং তার নিতম্বও ছিল বুকের মতোই চওড়া ও সুঠাম। আমার অভিজ্ঞতায় চরাচর সেই রকম দেহ সৌষ্ঠব উচ্চ বর্ণের নারীর থেকে, নিম্নবর্ণের নারীদেরই বেশি দেখা যায়। পরে জেনেছিলাম, সে চণ্ডাল কন্যা।

অষ্টাদশী ঘরে ঢুকে প্রথমে গোঁসাইঠাকুরের গুরুদেবকে, এবং পরে তাঁকে প্রণাম করেছিল। গুরুদেব দু হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাঁর আর গোঁসাইঠাকুরের মাঝখানে বসিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আয় মা, শক্তিরূপিণী মা, তুই এখানে বোস।"

স্বভাবতই আমাকে পাশের আসনে সরে বসতে হয়েছিল। অন্যান্য সাধক সাধিকা সকলেই চিকন কালো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, সেই চক্রে মেয়েটির কী ভূমিকা থাকতে পারে। সে ছিল নীরব, যেন গভীর চিন্তামগ্ন, অথবা সম্মোহিত। কোনোরকম বয়সোচিত চঞ্চলতা ছিল না। তাকে দেখে, কামাখ্যা পাহাড়ের জগত সাধিকার কথা আমার মনে পড়েছিল, যদিও জগতের তুলনায় সে ছিল অল্প বয়স্কা এবং তার কালো রূপও ছিল অনেক উজ্জ্বল।

যারা ভোজ্য পানীয় ও অন্যান্য দ্রব্য বহন করে আনছিল, তাদের মধ্যে একজন গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বাবা, পুজোর সব সামগ্রী আনা হয়ে গেছে।"

গুরুদেব বলেছিলেন, "তা হলে তোমরা এবার সবাই বাইরে যাও। আমরা শুরু করি।"

সকলেই বাইরে চলে গিয়েছিল। আমাকে বাদ দিলে ঘরে ছিলেন তিন জোড়া সাধক সাধিকা, গুরুদেব, গোঁসাইঠাকুর এবং সেই কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী। গোঁসাই ঠাকুর ডান দিকে উপবিষ্ট সাধক পুরুষকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "অভয়, তুমি দরজটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও।"

অভয় নামে সাধক তাঁর সাধিকার পাশ থেকে উঠে দরজার খিল ভিতর থেকে বন্ধ করেছিলেন। গুরুদেব উঠে লাল কাপড় পাতা বিছানার ওপর ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্যের সামনে গিয়ে বসেছিলেন, এবং বলেছিলেন, "সবাই এগিয়ে এসে বসো।

boirboi.net

মায়েদের মধ্যে কেউ করোটিগুলো সকলের হাতে হাতে তুলে দাও, নিজেরাও নাও।"

গুরুদেবের কথা মতো সবাই পানীয় ও খাদ্যবস্তুর সামনে গিয়ে বসেছিলেন। গোঁসাইঠাকুর আমাকেও হাত ধরে তাঁর পাশে নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর আর গুরুদেবের মাঝখানে বসেছিল সেই দ্যুতিময়ী তরুণী। একজন সাধিকা নরকরোটির প্রতীক সেই নারকেলের খোল সকলের হাতে হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমাকেও দেওয়া হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। গুরুদেব তখন তাঁর গলার দীর্ঘ উপবীত হাতে নিয়ে, বিশেষ মুদ্রায় সমস্ত পানীয় ও ভোজ্যদ্রব্যে স্পর্শ করেছিলেন। সেই প্রথম আমার লক্ষ পড়েছিল, তাঁর এবং গোঁসাইঠাকুর ছাড়া, কোনো পুরুষের গলায় উপবীত নেই। আমাকে গোঁসাইঠাকুর নীচু স্বরে বলেছিলেন, "গুরুদেব সমস্ত পানীয় আর খাদ্য শোধন করে দিচ্ছেন। অশোধিত কিছুই আমরা গ্রহণ করি না। এমন কি অদীক্ষিত 'শক্তি'-কেও শোধন করে নিতে হয়, অভেদজ্ঞানে মায়াবীজ তার কানে ঢুকিয়ে দিয়ে। এই যে দেখছো আমার পাশে মেয়েটি, ওর নাম 'তারা'। ও চণ্ডাল পরিবারের কুমারী, শক্তি হিসাবে অতি উত্তমা। 'তারা' অদীক্ষিত, ওকেও শোধন করে নিতে হবে।...এইবার তুমি ঠিক আমার মতো করে নারকেলের খোলটি ধর।"

দেখেছিলাম, তিনি বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত রেখে, মধ্যম এবং অনামিকা আঙুল দুটি মুড়েছিলেন, এবং তার মাঝখানে রেখেছিলেন নারকেলের খোল। সেইরকম মুদ্রা আমি প্রাণতোষবাবার আশ্রমেও দেখেছিলাম। আমি গোঁসাইঠাকুরকে অনুকরণ করেছিলাম, এবং সকলেই একভাবে নারকেলের খোল হাতে নিয়েছিলেন। গুরুদেব স্বয়ং একটি মাটির গেলাস দিয়ে, কলসী থেকে মদ তুলে, সকলের পাত্রে পাত্রে ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার অনুমান, প্রত্যেক পাত্রে মদের পরিমাণ দুটি লার্জ পেগের কম ছিল না। তারপরে গুরুদেবও তাঁর পাত্রে মদ ঢেলে, হাতে নিয়ে, একটা কিছু উচ্চারণ করেছিলেন, এবং সকল সাধক সাধিকা এক সঙ্গে পাত্র উজাড় করে গলায় ঢেলে দিয়েছিলেন। এমন কি তারাও। আমিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্তব্ধ ছিলাম, কারণ এক সঙ্গে সেই পরিমাণ মদ গলায় ঢালতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। গোঁসাইঠাকুর সচকিত হয়ে বলেছিলেন, "একি, থেমে আছো কেন, শীঘ্র পান কর।"

ক্রিয়াবিশেষের নিয়মভঙ্গের আশঙ্কায় আমি তাড়াতাড়ি পাত্র তুলে গলায় ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর সকলেই মাছ মাংস ও মুড়িভাজা হাতে তুলে খেতে আরম্ভ করেছিলেন। গ্রামে তৈরী তীব্র মদের ঝাঁজে আমার গলা বুক জ্বালা করছিল। খাবার মুখে দিয়ে স্বস্তিবোধ করেছিলাম। সেইভাবে তিন প্রস্থ মদ্য পান ও মাংস আহারের পরে, আমি আর মদ্য পানে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমার রক্তে দ্রুত ক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ঘামতে আরম্ভ করেছিলাম। গোঁসাইঠাকুর নিজেই আমাকে বলেছিলেন, "না পারলে, আর পান করো না, খাবার খাও।"

সাধিকারা সকলেই পাঁচ পাত্র পর্যন্ত পান করেছিলেন। সাধকরা অধিকাংশই একাদশ পাত্র পর্যন্ত, কেবল একজন তেরো পাত্র পান করেছিলেন। ভোজ্যবস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। আমার কাছে লক্ষণীয় ছিল, চক্রে জাতিভেদের কোনো ব্যাপারই ছিল না। সকলেই এক পাত্র থেকে পানীয় ও খাদ্য নিয়েছিলেন। পান

boiRboi.net

ভোজনের পরে সাধক সাধিকারা নিজেরাই কলাপাতা এবং মদের কলসীগুলো ঘরের এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবং সকলের সঙ্গে আমিও, একটা কাঁচা নর্দমার মুখে হাত মুখ ধুয়েছিলাম। পানীয়র গুণে সকলের মধ্যেই একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, অবিশ্যি চোখে মুখের অভিব্যক্তিতে। কেউ কেউ 'মা মা!' বলে ডেকে উঠছিলেন। একজন গেয়ে উঠেছিলেন, "সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী! বলে।"...

তারপরেই সকলে জোড়ায় জোড়ায় আসন করে বসেছিলেন লাল কাপড় বিছানো শয্যায়। গোঁসাইঠাকুর আমাকে একটু দূরে কুশকাঠির আসনের ওপর বসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি লাল শয্যার বাইরে কুশকাঠির আসনে গিয়ে বসেছিলাম। গুরুদেব বললেন, 'হারিকেনগুলো সব নিভিয়ে দাও, কেবল প্রদীপগুলো জ্বলুক।'

একজন সাধক উঠে দুটো হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছিল। পাঁচটি প্রদীপ জ্বলছিল। তার আলো কিছু কম না। কামাখ্যায় প্রাণতোষবাবার ঘরে যেমন একটা আবছা আলো আঁধারের ভাব ছিল, তার থেকে এ ঘরে সবই স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। গুরুদেব ডাকলেন, 'তারা মা, আয় তোকে দীক্ষা দিই।'

সেই কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী গুরুদেবের কাছে আরও এগিয়ে গিয়েছিল। যাঁরা মা মা ডাকছিলেন, বা গান করছিলেন, সকলেই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। গুরুদেব সেই কৃষ্ণাঙ্গী যুবতীর কানের কাছে মুখ নিয়ে, কিছু বলেছিলেন, যার এক বর্ণও আমি শুনতে পাইনি। গোঁসাই ঠাকুরের কথা আমার মনে পড়েছিল। অদীক্ষিতা শক্তিকেও শোধন করে নিতে হয়। গুরুদেব কি তারাকে শোধন করছিলেন? প্রায় মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে কেটেছিল। তারা নামে (অবিশ্যি সেই চণ্ডাল কন্যাটির নাম তারা নয়) অষ্টাদশীর মুখে একটি ভাবান্তর হয়েছিল। তার চোখ বুজে গিয়েছিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়েছিল। বুকের লালপাড় শাড়ির আঁচল খসে পড়েছিল, আর পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্ট পাথরের মূর্তির মতোই তার সুগঠিত কুচযুগ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। গুরুদেব মাথা নত করে তাকে প্রণাম করেছিলেন। তারা নির্বিকার ছিল। এটা বিস্ময়ের বিষয়, একজন অশীতিপর ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ একটি চণ্ডাল তরুণীকে প্রণাম করছেন। তন্ত্রধর্মেই বোধহয় এমন সম্ভব। তারপরেই গুরুদেব বলেছিলেন, 'বাবারা তোমরা এবার মাতৃঅঙ্গে ন্যাস কর।'

কথাটা আমার কানে নতুন শোনালেও, দেখেছিলাম, মাতৃঅঙ্গন্যাস আসলে, 'শক্তি' রমণীদের শরীরকে নানা ভাবে পুজো করা, যা দেখেছিলাম কামাখ্যায় প্রাণতোষবাবার সাধনার সময়ে। বর্ণনা দিতে গেলে, অনেকটাই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা। সেখানেও সাধক সাধিকারা সকলেই নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাধকরা সাধিকাদের কপালে সিন্দুরের ত্রিকোণ যন্ত্র এঁকে দিয়েছিলেন। তারপরে পা থেকে নাভিস্থল পর্যন্ত, নাভি থেকে স্তন পর্যন্ত, স্তন থেকে মাথা পর্যন্ত ফুল চন্দন ইত্যাদি দ্বারা পুজো করেছিলেন। সকলের ঠোঁট নড়া দেখা বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন।

লক্ষণীয় যেটা, দেখেছিলাম, সেই অশীতিপর বৃদ্ধ গুরুদেব নগ্ন তারাকে একইভাবে পুজো করেছিলেন। আমি যথেষ্ট সংযত ও স্থির থাকা সত্ত্বেও, স্বীকার না করে

boiRboi.net

পারছি না, আমার দৃষ্টি বারেবারেই তারার দিকে পড়ছিল। একমাত্র তারাই সাধিকাদের মধ্যে চোখ বুজেছিল, বাকি সাধিকারা স্থির থাকলেও, চোখ খোলাই ছিল। আরও যেটা লক্ষণীয় ছিল, গোসাইঠাকুর একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে নিশ্চল বসেছিলেন। বুঝতে পারছিলাম না, তিনি কি তবে এই চক্র সাধনা থেকে বিরত থাকছেন? আমার প্রশ্ন করার কোনো উপায় ছিল না। বরং বৃদ্ধ গুরুদেবকে তরুণের ন্যায় দেখে অবাক হচ্ছিলাম। অর্থাৎ তাঁর অঙ্গটি তরুণের ন্যায় উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রাণতোষবাবার সাধন প্রকরণে, এই অনুষ্ঠানটি যতোক্ষণ সময় নিয়েছিল, এখানে তার থেকে অনেক কম সময় ব্যয় হয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, এটি ভৈরবীচক্র। পরস্পরকে পানের খিলি মুখে পুরে দেওয়ার মধ্যে মিল ছিল। পান চিবোতে চিবোতেই সাধকরা সাধিকাদের পায়ের কাছে বসে প্রণাম করেছিলেন। তারপরেই শুরু হয়েছিল, শৃঙ্গার। আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তন মর্দন ও পরস্পরের যৌনাঙ্গে চোষণ। তার সঙ্গে নানা শব্দ, যা হাসি ও উল্লাস ছাড়া কিছু মনে হয়নি। এমন কি, সাধক সাধিকারা প্রেম গদ্‌গদ স্বরে, পরস্পরকে নানা ভাষায় প্রশংসা করছিলেন। শুনতে অবাক লাগলেও, সেই সব ভাষার কয়েকটি অশ্রাব্য বলেই আমার মনে হয়েছিল।

গুরুদেব মাঝে মাঝে কিছু বলে উঠছিলেন। বাকিরা অট্টহাস্য করছিলেন, এবং অদ্ভুত কোনো শব্দ উচ্চারণ করছিলেন, যা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। তিনি তারার সর্বাঙ্গ লেহন করছিলেন, বিশেষ ভাবে, তাঁর নিজ ভাষায়, 'এই কামপীঠ দেবদুর্লভ' বলে বারে বারে জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। আমার মাতৃভাষায় সব ক্রিয়াগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম।

শৃঙ্গারাদির পরেই, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা মৈথুন ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গুরুদেবও বিরত থাকেন নি। অথচ গোঁসাইঠাকুর তেমনই চোখ বুজে স্থির ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। তারাকে অনেকটা নির্বিকার দেখাচ্ছিল। সাধিকারা কেউই তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন না। গুরুদেব তারার সঙ্গে মৈথুনে রত হয়েও, অচঞ্চল স্থির হয়ে, বারে বারেই কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, আর ধীরে অঙ্গ সঞ্চালন করছিলেন। অন্যান্য সাধকরাও প্রমত্ত মৈথুনে লিপ্ত হলেও, মাঝে মাঝেই নিশ্চল হয়ে, নিশ্বাস টেনে স্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। এক জোড়া সাধক সাধিকা বিপরীত বিহার করছিলেন, এবং সাধিকাটি সামনে কলসী থেকে, নারকেলের খোলে মদ তুলে, নিজে পান করছিলেন, সাধকের মুখেও ঢেলে দিচ্ছিলেন। দৃশ্যটি আমার কাছে অভাবিত মনে হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম, ভৈরবীচক্রে ঐ রকম অবস্থায় পান নিষিদ্ধ না।

গুরুদেবের গলা থেকে নানাবিধ শব্দ ক্রমেই বেশি শোনা যাচ্ছিল। অথচ তাঁকে শান্তই দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে 'তারা তারা!' ডেকে তারার দুই চোখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তারাও তাঁর চোখের দিকে তাকাচ্ছিল। অনধিক এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই, গুরুদেব কিছু উচ্চারণ করলেন, এবং তারাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারার শরীর যেন কেঁপে উঠলো, মাত্র ক্ষণিকের জন্য। তারপরেই গুরুদেব তারার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত, করে তাকে দু হাতে তুলে বসালেন। ডাকলেন, 'সৌরীন্দ্র।'

গোঁসাইঠাকুরের নাম যে সৌরীন্দ্র, সেই আমি প্রথম শুনেছিলাম। তিনি চোখ খুলে বললেন, 'আদেশ করুন গুরুদেব।'

'তুমি এই মহাশক্তি অঙ্গে ন্যাস কর।' তারাকে দেখিয়ে বললেন, এবং তারাকে বললেন, 'উঠে দাঁড়া মা।'

তারা উঠে দাঁড়ালো। সৌরীন্দ্র গোঁসাইও উঠে দাঁড়ালেন। নিজেকে বিবস্ত্র করলেন, এবং সকলের মতো, তারাকে মাথা পর্যন্ত যথাবিহিত চন্দন ফুল ইত্যাদি দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজা করলেন। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন, সৌরীন্দ্র গোঁসাইকে কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের নিম্নাঙ্গের সঙ্গে জাপটে ধরে বললেন, 'ওঁ শিবায় নমঃ।' গোঁসাইও উচ্চারণ করলেন, 'ওঁ শিবায় নমঃ।' তারপরেই তিনি তারার মুখে পানের খিলি পুরে দিলেন। তারাও দিল। এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে দুজনের মধ্যে চুম্বন মর্দন দংশন চোষণ শোষণ ইত্যাদি শুরু হলো।

ঘটনাটা আমার কাছে অভাবিত ছিল। গুরুদেব ও গোঁসাইয়ের কোমর জড়ানো আলিঙ্গনের বৈশিষ্ট্য কি, বা একই সাধিকার সঙ্গে দুই সাধকের চক্রে যোগদান ঘটতে পারে বলে আমার জানা ছিল না। পরে শুনেছিলাম, চক্রে ঐ রকম ঘটনা নিষিদ্ধ না। গুরু যদি বৃদ্ধ হন, অথচ চক্রে বসে সাধনা করেন, তা সার্থক হলেও সীমিত হতে বাধ্য। তখন তিনি তাঁর শিবত্ব শিষ্যকে দান করে সেই সাধিকার সঙ্গে সাধনায় লিপ্ত হতে অনুমতি দেন। অবশ্যিই সাধিকার অনুমতি থাকা চাই। দেখেছিলাম, তারার অনুমতি ছিল।

আগেই বলেছি, গোঁসাইঠাকুর বয়স্ক হলেও, তাঁর ছিল উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। নিশ্চয়ই তাঁর বয়স ষাটের উপর ছিল। তাঁর শরীরের পেশিসমূহ, চওড়া রক্তাভ বুক, সবই ছিল রুক্ষ ও দৃঢ়। আর সকলের তুলনায় তাঁকে দেখাচ্ছিল, যেন গভীর একাগ্রতায় এক কঠিন কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। তিনি তাঁর দুই পা দু দিকে এত দূরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল, কোনো মানুষের পক্ষে তা সম্ভব না। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুই জঙ্ঘার সংগমস্থল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কথা। যেন তাঁর হাড় নেই, অতএব ভাঙবারও কিছু নেই। এরকমটি আমি পৃথিবী বিখ্যাত এক ব্যালেরিনাকেই করতে দেখেছিলাম। সেই অবস্থায় গোঁসাই তাঁর হাঁটু মুড়েছিলেন, এবং তারাকে পুতুলের মতো দু হাতে নিয়ে, কোলের মাঝখানে বসিয়েছিলেন, অস্পষ্ট উচ্চারণে কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, পঞ্চ 'ম' কারের ক্রিয়া শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ মৈথুন, এবং শুরুতেই তাঁর আসন ভিন্ন, অনেকটা প্রাণতোষবাবার মতো বসা অবস্থায়। অঙ্গ সঞ্চালনের সময় মনে হচ্ছিল, তিনি যেন নাচছেন, এবং তাঁর সঙ্গে তারাও নাচছে।

কিন্তু একটানা কিছুই চলছিল না। কিছুক্ষণ পরে পরেই একেবারে স্থির হয়ে, তারার শরীরের নানা অংশে দু হাত রেখে জপ করছিলেন। অঙ্গসঞ্চালন ও জপ, দুই-ই চলছিল। আমার সামনে চার জোড়া সাধক সাধিকা চক্র সাধন করছিলেন। আমার দৃষ্টি বারেবারেই গোঁসাই ও তারার দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে সাধনার সময় তারাকে যতোটা নির্বিকার দেখেছিলাম, গোঁসাইয়ের সাধন সময়ে তাকে ততোটা নির্বিকার দেখাচ্ছিল না। অথবা সেটা আমারই দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে। গোঁসাই মাঝে মাঝে এমন হুংকার দিয়ে উঠছিলেন, যেন তিনি কারো সঙ্গে লড়াই করছিলেন, এবং প্রতিপক্ষকে গর্জন করে ধমক দিচ্ছিলেন।

boiRboi.net

আমি একজন সাধারণ মানুষ, যার সব রকমের ইন্দ্রিয়াসক্তিই আছে। চোখের সামনে এরকম ঘটনা দেখলে, মন অবিকৃত থাকা সম্ভব না। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটিই এমনভাবে ঘটছিল, আমার সাধারণ প্রবৃত্তিগুলো আদৌ কোনো চঞ্চলতা বোধ করছিল না, বরং ঘটনার বৈচিত্র্য আমাকে যেন বিমূঢ় করে দিচ্ছিল। সম্ভবতঃ মাঝে মাঝেই এঁদের প্রস্তরবৎ স্থির হয়ে যাওয়া, জপ তপ মন্ত্রোচ্চারণ, সাধিকার শরীরের নানা অংশে হাতের আঙুলের নানা ভঙ্গিতে স্পর্শ, অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ, আবার দৈহিক ক্রিয়া আমার কাছে অনেকটা রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় দৃশ্যের মতো লাগছিল।

রাত্রি কতো হয়েছিল জানি না। একে একে তিন জোড়া সাধক সাধিকা একেবারেই মৃতবৎ হয়ে গিয়েছিলেন। গোঁসাইঠাকুর এবং তারার সাধনা কতো সময় ধরে চলেছিল, আমার কোনো হিসাব ছিল না। দুজনের মৈথুন ক্রিয়ার আসনও একরকম ছিল না। গোঁসাই ঠাকুর একবার দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা তাঁর গলা জড়িয়ে দু পা দিয়ে তাঁর কোমর বেষ্টন করছিল। বিচ্ছিন্ন হবার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

রাত্রি বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি ঘরের ভিতর থেকে কাক ও দু একটি অন্য পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। আমি অবসন্ন বোধ করলেও ঘুমোইনি। গোঁসাইকে শিবত্ব দান করার পরে, গুরুদেব জোড়াসনে চোখ বুজে বসেছিলেন। যেন জপ করছিলেন। গোঁসাইঠাকুর একবার মা মা বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, তারপরে তারার সঙ্গে শয্যায় আসন করে, গাঢ় সংস্পৃষ্ট আলিঙ্গিত অবস্থায় স্থির হয়ে গিয়েছিলেন। গুরুদেব চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কিছু চাও?"

আমি কী চাইতে পারি? আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম, তা দেখা হয়েছিল। বলেছিলাম, না, আমি কিছু চাই না।"

"তা হলে তুমি দরজা খুলে বাইরে যাও।" তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখেছিলাম, তখনও ভোরের আলো স্পষ্ট হয় নি, তবে রাত্রি শেষ হয়ে এসেছিল। দরজার বাইরে সেই সব নরনারীরা অপেক্ষা করছিল, যারা রাত্রে পানীয় ভোজ্য এবং ফুল ইত্যাদি এনে দিয়েছিল। তারা সকলেই আমার দিকে বিশেষ উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল। আর সেই লোকটিও ছিল যে আমাকে রাত্রের অন্ধকারে এখানে নিয়ে এসেছিল। সে নিজেই আমাকে বলেছিল, "চলুন, আপনাকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে আসি।"

আমি তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে আমাকে বাড়ির কাছে পেঁৗছে দিয়ে, হঠাৎ আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে, কাতর স্বরে বলেছিল, "আপনি যে প্রসাদ পেয়েছেন, তার এক টুকরো আমাকে দিন।"

প্রসাদের আবার টুকরো কিসের? আমি বলেছিলাম, "প্রসাদ যা পেয়েছিলাম, তা তো খেয়ে নিয়েছি। আর কোনো প্রসাদ তো আমার কাছে নেই।"

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "যে-কাপড়ের ওপর চক্র সাধন হয়েছে, আপনি কি সেই কাপড়ের টুকরো একটুও পান নি?"

আমি আরও অবাক হয়ে বলেছিলাম, "না তো। কেন?"

লোকটি হতাশ বিস্ময়ে বলেছিল, "আপনি আসল বস্তু সিদ্ধবস্ত্রই নেন নি?

আশ্চর্য !" সে দৌড়ে চলে গিয়েছিল।

পরে জেনেছিলাম সাধক সাধিকারা যে শয্যায় চক্রানুষ্ঠান করেন, সেই শয্যার কাপড়কে 'সিদ্ধবস্ত্র' বলে, এবং তা সংগ্রহ করার জন্য সবাই ব্যাকুল হয়। গুরুদেব বোধহয় সেই জন্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কিছু চাই কী না। ঐ বস্ত্র নাকি লোকের অনেক কামনা সিদ্ধ করে।

*

তন্ত্র সম্পর্কে আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা বললাম। এ ছাড়াও কিছু কিছু ছোট-খাটো ঘটনা আমি দেখেছি। কিন্তু সে সব আমি আর আপাততঃ বলছি না। বাংলাদেশের বাউলদের সম্পর্কে দু একটি ঘটনার কথা বলে আমি এ নিবন্ধের শেষ করবো।

বহুকাল থেকেই বাউলদের গান শুনেছি। তাদের একতারা, ডুগি বা প্রেমজুরি বাজিয়ে নেচে নেচে গান গাওয়া আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। গানের কথাগুলোর সব মানে বুঝতে পারতাম না। যেটুকু বুঝতাম, তা খুবই ভালো লাগতো, বাউলের ধর্ম কী, কে এদের দেবতা এসব প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগেনি। আর চল্লিশ দশক পর্যন্ত বাউলদের আমি এক শ্রেণীর বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ ভক্ত মনে করতাম। কিন্তু তাদের গানের অনেক কথাই আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতো। রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের গান শুনেও আমার ধারণা ছিল ওগুলোও বাউল গান কিন্তু দুর্বোধ্য বা অর্থহীন না।

১৯৫১ সালে, আমি প্রথম বীরভূমের কেন্দুলি গ্রামে যাই। উপলক্ষ বাংলা পৌষ-মাসের শেষ দিন সেখানে বাউলদের সমাগম হয়। কবি জয়দেবকে তারা তাদের আদি গুরু মনে করে। তাঁরই স্মারক উৎসবে বাউলরা সেই দিনটিতে সেখানে সমবেত হয়। কারণ জয়দেব ছিলেন, অজয় নদের ধারে কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলির অধিবাসী। কেন্দুলির বাউল সমাবেশ দেখে, আমি খুবই আনন্দিত ও উৎসাহী হয়েছিলাম। দু একটি সাময়িক বড় আচ্ছাদন দিয়ে তৈরি আখড়া ছাড়া, অধিকাংশ বাউল পুরুষ ও রমণীরা নানা জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসেছিল, আর গান চলছিল। পুরুষদের মাথায় পাগড়ি, গায়ে আলখাল্লা কোমরে কাপড়ের বন্ধনী। অনেকের পায়ে ঘুংগুর বাঁধা। হাতে একতারা, কোমরের বন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানা বাঁয়া বা ডুগি। মেয়েদের পোশাক প্রধানতঃ গেরুয়া বা সাদা লাল পাড় শাড়ি, হাতে খুঞ্জনি বা প্রেমজুরি, যা দিয়ে তারা তাল দিয়ে পুরুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করে।

অনেক বাউলই আত্মহারা আবেগে নেচে নেচে গান করে। নানা ভঙ্গির নাচ যাকে বিশেষ কোনো ক্লাসিক পর্যায়ের বলা যায় না। অনেকটা যেন শিশুর মতো, নাচে মত্ত, কখনো কখনো ক্ষ্যাপার মতো লাফিয়ে, দু হাত তুলেও নাচে। বেশ বোঝা যায়, তারা কারোকে নাচ দেখানোর জন্য নাচে না, বা শোনাবার জন্য গায় না। নিজেদের গানে নাচে, নিজেরাই মত্ত, নিজেরাই নিজেদের আলিঙ্গন করে আনন্দ প্রকাশ করে। আবার কেউ একজনকে প্রণাম করলে, আর একজন তাকে তৎক্ষণাৎ প্রণাম করে। তরুণ বৃদ্ধ তরুণী বৃদ্ধা, সবাই সবাইকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এরকম আমি আর কোথাও দেখি নি। অনেক আড্ডাতেই গাঁজার আসর বেশ জমে উঠেছিল।

আমি ঘুরে ঘুরে কয়েকটি আড্ডাতে বসে গান শুনেছি। আসর প্রধানতঃ রাত্রেই বসে। সারা রাত্রি ধরে চলে। আমি আলাপ জমাবার চেষ্টা করি। একটি আড্ডায়, একজন বাউল আমাকে গাঁজার কলকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কেবল গান শুনছেন বাবা, একটু দম নিয়ে নিন।'

আমি প্রথমে একটু দ্বিধা করলেও পরে গাঁজার কলকেয় টান দিলাম, আর আমার গাঁজা টানা দেখে, আড্ডার মেয়ে পুরুষরা সবাই হেসে উঠলো। নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলো, 'বাবুটি গাঁজা টানতে শেখে নি, তাই সিগারেটের মতো কলকে টানছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, আমি তাদের কোনো সেবায় লাগতে পারি কী না। জবাবে একটি তরুণী হেসে বললো, "মিষ্টি খেলে, গাঁজার নেশা জমে। কিন্তু আমরা তো গাঁজায় দম দিই না। মিষ্টি এলে, আমরাও একটু খেতে পারি।"

যদিও মেয়েরা কেউই গঞ্জিকা সেবন করছিল না। আমি মেলার অন্য দিকে গিয়ে, খাবারের দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে এনেছিলাম। দেখলাম, সকলেই খুব খুশি। একজন বাউল আমার মুখেও মিষ্টি তুলে দিল।

একটা কথা বলা দরকার। অধিকাংশ বাউলেরই মুখে গোঁফ দাড়ি, মাথায় মেয়েদের মতো বড় বড় চুল। মাথার ওপরে ঝুঁটি করে বাঁধা, তার ওপরে পাগড়ি জড়ানো। আড্ডাগুলোতে আলো তেমন নেই। সামান্য একটা হারিকেন। অথবা গ্রামে তৈরি এক ধরনের ছোট চৌকো লণ্ঠন। কোনো কোনো আড্ডায় একেবারেই আলো নেই। মেলার দোকানপাটের চারদিকের আলো, মোটামুটি একটা আবছায়ার সৃষ্টি করেছে।

সন্ধ্যা থেকে বাউলদের নানা আসরে ঘুরতে ঘুরতে, রাত্রি দশটা নাগাদ, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক বৃদ্ধ বাউল। মাথায় জটা, পাগড়ি নেই। ধূসর গোঁফ-দাড়ি মুখে। গায়ে আলখাল্লা। একতারা আর ডুগি বাজিয়ে গান করছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে দশ বারো জন বাউল পুরুষ ও রমণী। প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার আজকাল আমরা শহরে, রেডিও বা রেকর্ডে যে-ধরনের বাউল গান শুনি, সেখানে আমি সেরকম গান শুনি নি। গানগুলো গাওয়া হচ্ছিল যেন কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে। যেন বিশেষ কোনো কথা গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছিল, আর বাকিরা জয় গুরু জয় গুরু বলে উল্লাসে চিৎকার করছিল। অথচ কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছিলাম না।

সেই বৃদ্ধ বাউল গানের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে, কখনো চোখের ভঙ্গি করছিলেন, হাসছিলেন, হাতের ইশারা করে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন, আর বসে বসেই কোমর ও শরীর দুলিয়ে, হঠাৎ যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেঁদে উঠছিলেন। বাকিরাও হেসে কেঁদে 'জয়গুরু' ধ্বনি দিচ্ছিল। এক সময়ে বৃদ্ধ বাউল হাতের ইশারায় আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বসালেন। গায়ে হাত দিয়ে কোথা থেকে এসেছি, জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নিজেও তাঁর নাম বললেন, এবং জানালেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন।

আমি এই বৃদ্ধ বাউলের নাম প্রকাশ করছি না। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে আসতেন। সেই বৃদ্ধ বাউলকে সব সময়েই আমার কেমন ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। এক সময়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন,

boiRboi.net

"বাবা, আমি হলাম 'পতিত' বাউল, প্রকৃত বাউল নই।"

আমি বললাম, "বাউলের আবার 'পতিত' 'প্রকৃত' কী আছে আমি জানি না।"

তিনি জবাব দিলেন, "প্রকৃত বাউলের কখনো সন্তান হয় না। আমার হয়েছে, তার মানে আমি বাউল হলেও একজন সংসারী। অর্থাৎ পতিত, আমার সাধনা ব্যর্থ।" এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবার কান্না থামিয়ে ভাঙ্গা গলায় গান করলেন, "আমি মীন (মাছ) ধরবো বলে/ডুব দিলেম ত্রিবেণীর জলে/হায় হায়, মীন গেল পিছলে/আমার অঙ্গ ভিজলো জলে/হায়, পতিত আমি, মরি এখন সেই জ্বালাতে জ্বলে।"...গাইতে গাইতে তিনি শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন।

আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই বিস্ময়কর, দুর্বোধ্য, অথচ বৃদ্ধ বাউলের জন্য মনটা কেমন বিচলিত হয়ে উঠলো। তখন একটি শ্যামলী তরুণী বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে বললো, "বাবা, ওগো বাবা, কেঁদো না।"

একজন স্বাস্থ্যবান যুবক বাউলও তরুণীর গা ঘেঁষে এগিয়ে এলো, বাউলের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে বললো, "বাবা, তবু তুমিই আমাদের গুরু। তোমার জ্বালা আমরা জুড়াবো, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর।"

বৃদ্ধ বাউল যুবকের মাথায় নিজের মুখ নামিয়ে, অনেকটা গানের সুরে বললেন, "হাঁ হাঁ, তোরা ভালো করে পড়গা ইস্কুলে। নইলে দুঃখ পাবি শেষকালে। কিন্তু আমাকে আর বলিস না বাপ, আমি শেষ রক্ষা করতে পারি নি।"

তরুণী বললো, "বাবা, তোমার জ্বালা যন্ত্রণাই আমাদের শক্তি দেবে। তুমিই আমাদের গুরু।"

বৃদ্ধ কিছুটা নিজেকে সামলে নিয়ে, তরুণী আর যুবককে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার মেয়ে, আর এই ছেলেটি ওর সাধক পুরুষ। আমার মেয়ে ওর সাধিকা প্রকৃতি।"

আমি সহজভাবেই বললাম, "তার মানে, আপনার মেয়ে আর জামাই।"

"হ্যাঁ, একদিক থেকে তা বলতে পারো, কিন্তু এখন আর আমার মেয়ে জামাই বলে ওদের পরিচয় নেই। ওরা বাউল সাধক সাধিকা, ওরা পুরুষ প্রকৃতি। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়।"

বৃদ্ধ যখন হেসে কেঁদে এসব কথা বলছিলেন, অন্যান্য বাউল পুরুষ রমণীরাও মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। স্বামী স্ত্রী না, মেয়ে জামাই না, ওদের একমাত্র পরিচয় পুরুষ ও প্রকৃতি। তার মানে কী? আমি বৃদ্ধের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, "এ সব তুমি বুঝবে না বাবা। বাউল সাধন তত্ত্ব বড় গোপনীয়, নিজেরা ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না।"

বৃদ্ধ বাউল সন্তানের জনক, অতএব তিনি পতিত, কারণ প্রকৃত বাউলের কখনো সন্তান হয় না। এদিকে বাউল সাধক সাধিকার একমাত্র পরিচয়, পুরুষ ও প্রকৃতি, স্বামী স্ত্রী না। আমার কৌতূহল বাড়লো, কিন্তু প্রকাশ করতে পারলাম না। গোপন সাধন তত্ত্বের কথা যে জিজ্ঞেস করা উচিত না, এ অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু বাউলদের আবার কী সাধন তত্ত্ব থাকতে পারে?

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে, নিচু স্বরে গেয়ে উঠলেন, "সুধা পান করতে গিয়ে

করেছি বিষ পান/এবার তোরা বিষ চিনে, সুধা কর গো পান।"

বৃদ্ধের কন্যার যুবক পুরুষটি বলে উঠলো, "জয় গুরু জয় গুরু।"

বৃদ্ধ হেসে, চোখ ঘুরিয়ে, একতারায় শব্দ তুলে বললেন, "ভাবিব, নারী হিজরা পুরুষ খোজা এই তো লক্ষণ/সাবধানে কর সবে সাধন ভজন।"

এবার সবাই মিলে জয়ধ্বনি দিল, "জয় গুরু, জয় গুরু।"

আমি যে ধাঁধাঁয়, সেই ধাঁধাঁতেই রইলাম। নারী হবে নপুংসক, পুরুষ হবে খোজা, অর্থাৎ যার যৌন শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই ভেবে সাধন ভজন করতে হবে। তার মানে কী? আমি যেন তন্ত্রের একটা স্তিমিত প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। অথচ বাউলদের সেরকম কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না।

বৃদ্ধ বাউল যুবককে বললেন, "বাবা মাধব, এবার একটু দমের ব্যবস্থা কর।"

"এই যে বাবা, আমি করছি।" অন্য এক বাউল বলে উঠল।

দেখলাম, সেই বাউলটি গাঁজা তৈরি করছে। একটি ছোট কাঠের পাটার ওপরে, গাঁজার দলা ছুরি দিয়ে কাটছে, আবার জড়ো করে, আবার কাটছে। কিন্তু গান বন্ধ নেই। এক বাউল ও তার প্রকৃতি একসঙ্গে গান ধরেছে। গানের কথা তেমনি দুর্বোধ্য, "আমার এক কলসে নয়টি ছিদ্র কেমন করে জল ধরি।"

বৃদ্ধ বাউলের তরুণী কন্যাকে দেখে, বর্ধমানের প্রান্তিক গ্রামের ভৈরবীচক্রের সেই কৃষ্ণাঙ্গী অষ্টাদশীর চেহারা ভেসে উঠছিল। কিন্তু দুজনের চেহারায় বিস্তর তফাত্। এই তরুণীর বয়স একুশ বাইশ হবে। গায়ের রঙ তেমন কালো না। চোখ দুটি যেন কাজল টানা কালো ও দীর্ঘ, অথচ কাজল সে মাখে নি। মুখের গড়ন কিঞ্চিৎ লম্বা, কিন্তু নাক ঠোঁট চিবুক, সব মিলিয়ে তাকে সুন্দরী বলতেই হবে। শীতকে তার তেমন গ্রাহ্য নেই। সামান্য একটি জামার ওপরে লাল পাড় শাড়ী, কপালে সিঁদুরের একটি ফোঁটা। উজ্জ্বল নিটুট স্বাস্থ্য। মুখে একটু হাসি লেগেই আছে। শান্ত আর স্নিগ্ধ তার মুখ, লাজুক নম্রতা চোখের দৃষ্টিতে। তার পাশে মাধবের শক্ত চওড়া শরীরে গেরুয়া রঙের লম্বা আলখাল্লা, তার নিচে একই রঙের ধুতি দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় পাগড়ি, কালো গোঁফ দাড়ি, চোখ দুটি উজ্জ্বল, উন্নত নাসা। দুজনকেই আমার চোখে সুন্দর লাগছিল। তারা বৃদ্ধ বাউলের দু পাশে বসে, গান শুনতে শুনতে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করছিল, আর যেন একটা অর্থবোধক হাসি ফুটে উঠছিল। যেন তাদের মধ্যে গোপনে কোনো ইশারা চলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, দুজনে নতুন প্রেমিক প্রেমিকা।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বাউলের হাতে জ্বলন্ত গাঁজার কলকে এগিয়ে দেওয়া হলো। তিনি "জয়গুরু" বলে, দু হাতে কলকে চেপে ধরে কয়েকটি ছোট টান দিলেন। তারপরে হঠাৎ এমন দীর্ঘ টান দিলেন কলকেয় দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু ধোঁয়া ছাড়লেন না, ভিতরে আটকে রাখলেন। কলকেটা বাড়িয়ে দিলেন মাধবের হাতে। দেখলাম, আড্ডায় তখন তিনটি কলকে বাউল পুরুষদের হাতে হাতে ঘুরছে।

আমার হঠাৎ মিষ্টির কথা মনে পড়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু বৃদ্ধ বাউল আমার হাত টেনে ধরলেন। তার তরুণী কন্যা জিজ্ঞেস করলো, "কোথা যাচ্ছেন? বসবেন না?"

boiRboi.net

মনে রাখতে হবে, কথাগুলো সবই বীরভূম জেলার আঞ্চলিক উচ্চারণে বলা হচ্ছিল। আমি বললাম, "এখনই আসছি।"

বৃদ্ধ বাউল কন্যার দিকে তাকিয়ে আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি বাউলদের সমাবেশের বাইরে, সাধারণ মেলায় গিয়ে, মিষ্টির দোকান থেকে, কিছু বেশি পরিমাণে মিষ্টি কিনে নিয়ে এলাম। আমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি দেখে বৃদ্ধ শিশুর মতো হা হা করে হেসে কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অগো পূর্ণিমা, এ যে দেখছি প্রেমের মানুষ! গাঁজাখোরদের জন্য মিষ্টি নিয়ে এসেছে?"

বাউল পুরুষ রমণীরা সবাই হেসে উঠলো। সকলেই খুশি। পূর্ণিমা বললো, "প্রেমের মানুষটি সব জানে দেখছি। তবে একটু দম দেওয়া হোক?"

আমি মিষ্টির হাঁড়িটি বৃদ্ধের সামনে রেখে বসলাম। মাধব আমার দিকে কলকে বাড়িয়ে দিল। আমিও কলকে নিয়ে, আগের মতোই টান দিলাম। দেখে সবাই হাসলো। বৃদ্ধ বাউল একটি মিষ্টি আমার মুখে তুলে দিলেন। পূর্ণিমা একটি ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে করে আমাকে জল দিল। বৃদ্ধ পূর্ণিমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি এগিয়ে দিলেন। পূর্ণিমা আগে তার বাবাকে মিষ্টি দিল। তারপর সবাইকেই পরিবেশন করলো। আড্ডাটি বেশ জমে উঠলো। গাঁজার এবং মিষ্টির পাট মিটে যাবার পরে, পূর্ণিমা মাধবের দিকে তাকালো। মাধব মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু ইশারা করলো। পূর্ণিমা তার হাতের কাছে রাখা খঞ্জনি জোড়া তুলে নিল, এবং কোকিলের মতো মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠলো, "সে কথা কি কইবার কথা, জানতে হয় ভাবাবেশে। অমাবস্যায় পূর্ণশশী, পূর্ণিমাতে অমাবস্যে।"

মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দিল। এ গান কেন বাউলের মুখে? আমার অভিজ্ঞতায়, এ তো তন্ত্রের বিষয়। পূর্ণিমার সঙ্গে মাধবও একতারা বাজিয়ে গান ধরলো। সমস্ত গানটিই অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের মতো দুর্বোধ্য। কিন্তু গানের কথার মধ্যে, 'মাসে একবার সেই ক্ষণ আসে' বা 'পুরুষ প্রকৃতি রতি। 'প্রেম রসেতে ভাসি' ইত্যাদি কথাগুলো ক্রমেই যেন বিশেষ একটি দিক নির্দেশ করছে। অন্যান্য গানের মধ্যেই শুনেছি, 'পুরুষ প্রকৃতি কাম কলার কেলি করে' কিন্তু, 'কামকে দেখবে ভয়ংকর কুমীর রূপে, সে যেন তোমাকে গ্রাস না করতে পারে।'·· এমন কি কবি চণ্ডীদাসের একটি গানের বিশেষ কয়েকটি পংক্তিকেও এক জায়গায় গানে ব্যবহার করা হয়েছে, "পুরুষ-প্রকৃতি / দোঁহে এক রীতি / সে-রতি সাধিতে হয়।" অথবা, "রেচক, পূরক, স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন / প্রেম ভক্তি খুঁটি তার কর স্থাপন।"....কথাগুলো গানের নানা কথার মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে, কান পেতে না শুনলে, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। যেমন একটি গানের মধ্যে এক যায়গায় বলা হচ্ছে, "রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয় / প্রেম যতো বাড়ে নাম স্নেহ-মান-প্রণয়।"

বাউল গানে এসব কথার অর্থ কী? আগে যে সব গান শুনেছি তার মধ্যে কান পেতে এসব কথা স্পষ্টভাবে শুনি নি। যেমন শুনেছি, "আছে প্রেম প্রয়োজন / রসিক ময়রা হলে সে পাবে প্রেমধন।" অথবা, "জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি / প্রেম-পীরিতি রসে সে-মানুষ করে কেলি।" কিংবা, "মনরে, চল রূপনগরে।" তারপরেই সেই গানের শেষে শুনেছি, "সুষুম্না ধরিয়ে, মৃণাল বাহিয়ে ওঠো সেই পদ্ম পরে।"

boiRboi.net

এই শেষের লাইনটি মনকে চমকিয়ে দেয়। যেমন 'রতি' শব্দ। রতি রমণী হতে পারে, আবার 'রতিক্রিয়া' হতে পারে। যাকে তন্ত্রে সরাসরি 'মৈথুনক্রিয়া' বলা হয়েছে। সুষুম্না নাড়ি একান্তই দেহতত্ত্বের বিষয়, তন্ত্রের সঙ্গে যার যোগ।

অথচ সাধারণ ভাবে বাউল গানের ভাষা শুনতে একেবারে অন্যরকম লাগে। "সোনার মানুষ ভাসছে রসে / যে জানে সে রসপন্থী / দেখতে পায় সে অনায়াসে।" অথবা "ওরে সহজ মানুষ সবাই বলে / আছে কোন্ মানুষের বসত কোন্ দলে।" ....এ সব কথা গানের সুরে শুনতে ভালো লাগে, অর্থ বোঝা যায় না।

রাত্রি একটা পর্যন্ত অনেকগুলো গান শুনলাম। তার মধ্যে কোনো কোনো কথা আমাকে কৌতূহলিত করেছে, যা আমি বাউলদের সঙ্গে মেলাতে পারিনি। রেচক পূরক কুম্ভকের কথা কেন তাদের গানে? গানে বলছে, এ সবের দ্বারা তারা 'রসসিদ্ধ' হয়, কিন্তু 'জীবাকার করে না, প্রেমাকার করে।' কিন্তু শিবশক্তির বদলে পুরুষ-প্রকৃতি ছাড়া সাধন হয় না। অবিশ্যি বৃদ্ধ বাউল আমাকে আগেই বলেছিলেন, বাউল সাধনতত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয়, নিজেরা ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তা হলে কি বাউল ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের কোনো যোগ আছে?

রাত্রি একটার পরে গানের আসরে কিছু ক্লান্তি নেমে এলো। আবার গাঁজার আসর চললো। বৃদ্ধ বাউল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বাবাজী দেখছি গানের খুব ভক্ত।"

বাউল গানের আমি বরাবরই ভক্ত, কিন্তু এই আসরের গানগুলো শুনে, আমার মনে বাউলদের সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন জাগছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের দেবতা কে? কার পূজা করেন?"

"আমাদের তো বাবা কোনো দেবদেবী নেই। আমরা গুরুর পূজা করি। গুরুই আমাদের সব, সাধনার ধন। তবে আসল গুরুকে চোখে দেখা যায় না। কেউ শিক্ষা দেন, দীক্ষাও দেন, আসল গুরুর নাম হলো আত্মা।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা আত্মার পূজারী? কোথায় আছেন সেই আত্মা?"

"কেন এই ভাণ্ডে!" বলে বৃদ্ধ বাউল তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখালেন, "এই ভাণ্ডের মধ্যেই সেই আত্মার বাস। তাঁর অনেক নাম। 'মনের মানুষ' 'সহজ মানুষ' বা 'অটল মানুষ'। আবার 'ভাবের মানুষ'ও বলতে পারো। গুরু অতি গোপনে থাকেন। আমরা সেই গুরুর সাধন ভজন করি, আর কারোকে না।"

বিষয়টি রহস্যময় মনে হলো। 'গুরু' অতি গোপনে থাকেন, যাঁর এক নাম 'আত্মা' এবং 'মনের মানুষ' বা আরও অনেক। কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ রতি, রেচক কুম্ভক স্তম্ভন ইরা সষুম্না পিঙ্গলা, ইত্যাদির সম্পর্ক কী? বৃদ্ধ বাউল আগেই বলেছেন, তাঁদের সাধনতত্ত্ব অতি গোপন, অতএব কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছি না। তিনি আমার দিকে তাকালেন। রহস্যের হাসি তাঁর ধূসর গোঁফ দাড়ির ভাজে 'ভাজে, গঞ্জিকা সেবনে আরক্ত চোখে। মাথা ঝাঁকিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, "বাবাজী বড় ধন্দে পড়ে গেলে? ও সব নিয়ে ভেবো না। এ সব হলো গোপন সাধন তত্ত্ব, সকলে জানতে পারে না। তবে একটা কথা বলতে পারি, এ ভাণ্ডে আর

ব্রহ্মাণ্ডে কিছু তফাত নেই।" তিনি নিজের বুক আর আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

এ কথাও আমার কাছে নতুন না। কামাখ্যায় প্রাণতোষবাবার কাছেই শুনেছিলাম, যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের কথা সাবিত্রী মায়ের কাছে শুনেছিলাম। সে তো তন্ত্রের বিষয়। এঁদের কথার সঙ্গেও অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। অথচ এঁরা গোপনে গুরুর সাধন ভজন করেন। এঁরা আত্মার পূজারী। ওদিকে দেখছি, মাধব আর পূর্ণিমা পাশাপাশি বসে আমাদের কথা শুনছে। দুজনেই আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে, আর নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সে-হাসিও রহস্যময়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বাউলের হাতে আবার একজন গাঁজার কলকে তুলে দিল। তিনি আগের মতোই দম দিলেন, তারপরে আমার দিকে কলকেটি বাড়িয়ে দিলেন। আমিও এবার একটু জোরেই টান দিলাম, ফলে বেজায় কাসি শুরু হয়ে গেল। বৃদ্ধ বাউল আমার মাথায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন, বললেন, "জয়গুরু!"

মাধব আমার হাত থেকে কলকে নিল। হেসে বললো, "আমাদের বাবু বাবাজীর মন এখন প্রেমে আঁকুপাঁকু করছে। প্রেমের কথা শুনতে চান।"

আমি বললাম, "প্রেমের কথা তো শুনতে চাইনি, আমি আপনাদের তত্ত্বের কথা বোঝবার চেষ্টা করছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বাবাজী, ঐ হলো প্রেমের কথা। আমাদের আসল তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব।" বৃদ্ধ বললেন।

পূর্ণিমা গেয়ে উঠলো, "যে জন প্রেমের ভাব জানে না / তার সঙ্গে নেই লেনা-দেনা।"

"জয় গুরু জয় গুরু।" বৃদ্ধ বাউল বলে উঠলেন, "আমাদের এই বাবাজীটি প্রেমের মানুষ, তাই নয় কি?"

পূর্ণিমা বললো, "হ্যাঁ, বাবু বাবাজী প্রেমের মানুষ।"

আমি বৃদ্ধ বাউলকে বললাম, "কিন্তু আমি আপনাদের গুরুতত্ত্বটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বলবেন কি?"

বৃদ্ধ বাউল হেসে হেসে মাথা ঝাঁকালেন, তারপরে আমার কানের কাছে ঝুঁকে বললেন, "আমাদের আসল গুরু তিন রকম। পুরুষ, প্রকৃতি, আর পুরুষ প্রকৃতির মিলন। এই নিয়েই আমাদের সাধন। কিছু কি বুঝলে বাবাজী?"

আমি একটু দ্বিধা করে বললাম, "ঠিক বুঝেছি, বলতে পারি না, তবে শক্তি সাধনা তন্ত্রের কথা আমার মনে পড়ছে।"

বৃদ্ধ বাউল হা হা করে হেসে উঠে আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কতোকটা বুঝেছো বটে। তবে বাউল সাধনা আর হিন্দুদের তন্ত্র সাধনা, দুয়েতে তফাত আছে। যোগ সাধনা আমাদেরও আছে। রমন কাকে বলে জানো তো?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, "শব্দের অর্থটা জানি।"

"আমাদের আত্মায় রমন হলে, রমন তারে কয়।" বৃদ্ধ বাউল বললেন, "আমাদের উপাসনা নেই, দেহের সাধনই সব, কিন্তু সেই দেহ আত্মা রূপে আছেন।

boiRboi.net

আর কিছু বলার নেই।"

সবই বুঝলাম, অথচ বুঝলাম না কিছুই। ইতিমধ্যে আবার গান শুরু হয়ে গেল, এবং এক সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। দেখলাম, সবাই যে-যার জিনিষপত্র গুছিয়ে আড্ডা ভেঙ্গে অজয় নদের ধারে গেল। সবাই নেমে পড়লো শীতের তুহিন ঠাণ্ডা জলে। পূর্ণিমা জলে নেমে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "চান করবেন না?"

বললাম, "করবো।"

আমি কাঁধের ঝোলা নামিয়ে জামা কাপড় খুলে, আণ্ডারওয়্যার পরে জলে নেমে পড়লাম। সকলের সঙ্গে স্নান করলাম। মেয়ে পুরুষ, কে নগ্ন আর কে নগ্ন নয়, সে বিচার এখানে অচল। প্রচণ্ড ভিড়, আর জলের স্রোতের টান তীব্র। কে কার গায়ে মেশামিশি করে আছে, কেউ দেখছে না। আমাকে মাধব হাত ধরে রেখেছে। আর এক পাশে উদ্ভিন্ন যৌবনা পূর্ণিমা।

স্নানের শেষে জামা কাপড় পরে, সকলেই আগে গেল মন্দিরে। যতোদূর মনে পড়ছে, মন্দিরটি শ্রীরামের। অথচ কবি জয়দেব যে কোন্‌খানটিতে বাস করতেন, তা কেউ বলতে পারলো না। বৃদ্ধ বাউল বললেন, "এ জায়গার নামই জয়দেব। তোমরা বলো কেন্দুলি, আমরা বলি জয়দেব।"

"তিনি কি আপনাদের আদিগুরু?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বৃদ্ধ বাউল বললেন, "তোমাকে তো আমাদের গুরুতত্ত্বের কথা বলেছি। তবে হ্যাঁ, তত্ত্ব জানবার জন্য মানুষ গুরু দরকার হয়। সেই হিসাবে জয়দেব আমাদের গুরু। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, আমাদের অনেক গুরু, সেদিক দিয়ে দেখলে আমাদের গুরুর শেষ নেই।"

তারপরে সকলেই দেখলাম মুড়ি খই ইত্যাদি খেলো। আমাকেও দিল। মাধব আর পূর্ণিমা মেলা থেকে মাটির হাঁড়ি, কাস্তে, দা ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস কিনলো। তারপরে বিদায় নেবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবু, আপনি কোথায় যাবেন?"

বললাম, "আপনাদের সঙ্গেও যেতে পারি।"

পূর্ণিমা বললে, "আমরা তো দূরের গ্রামে থাকি।"

"আমি দূরের গ্রামেও যেতে পারি।"

মাধব আর পূর্ণিমা বৃদ্ধ বাউলের দিকে তাকালো। বৃদ্ধ বাউল হেসে বললেন, "বুঝেছি, মনে তোমার মাতন লেগেছে। বেশ, চলো। তুমি আমি দুজনেই মাধবের আখড়ায় গিয়ে থাকবো। দুদিন থেকে যে যার বাড়ি চলে যাবো।"

কেন্দুলি থেকে বাসে চেপে, প্রায় তিরিশ মাইল গিয়ে, আরও পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে আমরা পেঁছুলাম এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামের প্রান্তে মাধবের বাড়ি বা আখড়া। দেখলাম, লেপা মোছা পরিচ্ছন্ন উঠোনে রয়েছে ধানের একটি মরাই। দুটি মাটির ঘর, মাথায় খড়ের চাল। পাশে আর একটি ছোট ঘর সেখানে রান্না হয়। বাড়ির পিছনে একটি বাঁশঝাড় থেকে একটু দূরে একটি পুকুর। পুকুরের চারপাশে তালগাছ। পুকুরের অন্যদিকে আসল গ্রাম, বাড়িঘর বেশি। মাধবের বাড়িটি একটু ফাঁকায়। একে আখড়া না বলে, গৃহস্থের বাড়ি বললেই যেন মানায়।

পেঁছুতে আমাদের বিকাল হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমা আমাকে অবাক করে দিয়ে, রান্না ঘর থেকে চা তৈরি করে এনে দিল। আমাকে একলা না, মাধব এবং তাঁর বাবাকেও। মাধব তামাক সেজে হুঁকো এগিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলা গাঁজা সাজা হলো। পূর্ণিমা রান্নায় ব্যস্ত। মাধব মাঝে মাঝে পূর্ণিমার সাহায্যে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বাউল আমাকে গান শোনাচ্ছেন। 'গাঁজার দম' গানের ব্যাখ্যা করে বললেন, "গানটা শুনে তুমি আসল কথাগুলো বুঝতে পারছো না। দম কাকে বলে? নিশ্বাস প্রশ্বাসকে। আমরা বলি দমের ঘর। আমাদের সাধনার জন্য এই দমের ঘরকে তৈরি করতে হয়। প্রাণায়ামের কথা শুনেছো?"

"শুনেছি।"

"এ হলো সেই প্রাণায়াম, দমের ঘর। শরীরের শ্বাসনালি পরিষ্কার না থাকলে সাধন হয় না। সাধনের মূল হলো এই শরীর। তোমাকে আমি ত্রিবেণীর কথা বলেছি। সেই ত্রিবেণী এই শরীরেই আছে, যার নাম ইরা সুষুম্না পিঙ্গলা। সেখানে যখন জোয়ার আসে, তখন সাধক সেই ত্রিবেণীতে ডুব দেয়, মনের মানুষকে ধরে। কেউ বলে মীন ধরে। জোয়ার কোথায় আসে? না, প্রকৃতির মধ্যে, মাসে একবার। তিন দিন। সেই সময়ে জোয়ারে ডুব দিতে হয়। পুরুষ আর প্রকৃতি দুজনের সাধনায় সেই মনের মানুষকে পাওয়া যায়।"

আমি শুনেছি, আর বারে বারে তন্ত্র সাধনার কথাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। পুরুষ-প্রকৃতি মিলন। তার সঙ্গে যোগ সাধনা। প্রকৃতির জোয়ার, মাসান্তে একবার। তার মানে সাধিকার ঋতুর সময়। বৃদ্ধ আবার গান করলেন, এবং সেই গানের কথা ব্যাখ্যা করে শোনালেন, "প্রকৃতির সত্তা রজে, পুরুষের বীর্যে, জল আর দুধের মতো এদের মিলন ঘটে। রজঃ হলো কাম স্বরূপিনী কিন্তু বীজ অচঞ্চল প্রেমস্বরূপ। এ দুধের আর এক নাম ক্ষীর, রজের আর এক নাম নীর। দুধকে নীর থেকে আলাদা করতে হবে, অর্থাৎ বীজকে। এই বীজই হলো 'সহজ মানুষ' বা 'মনের মানুষ'। প্রকৃতির রজে এই মনের মানুষের আবির্ভাব হয়। তখন সাধক সেই 'মনের মানুষ'কে ধরতে সাধন করে। কাম থেকেই প্রেম, কিন্তু প্রেম অটল। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে মহাসুখেই সেই 'সহজ মানুষ' পাওয়া যায়। প্রকৃতির ঋতুর তিন দিন সহজ মানুষ ধরার সময়। ঐ সময়ের নাম 'মহাযোগ' বা 'সুবর্ণ সুযোগ'।"

এই সময়ে একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়লো। আমি দেখলাম, রান্না ঘরের আলো বাইরে এসে পড়েছে। সেই আলোয় রমণী পুরুষ দুটি মূর্তির ছায়া পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। অর্থাৎ মাধব আর পূর্ণিমা দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। আমি অবাক হলাম না, বরং এই প্রেমের দৃশ্য দেখে আমি উত্তেজনাহীন একটা আনন্দ বোধ করলাম। আমি প্রথম থেকেই দেখে আসছি, মাধব আর পূর্ণিমা যেন দুটি সুখী পায়রার মতো সর্বদাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকছিল। যেমন নতুন প্রেমিক প্রেমিকা থাকে।

বৃদ্ধ বাউল আমাকে গান শুনিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছিলেন। ব্যাখ্যাগুলো সবই, আমার আগে জানা তন্ত্রের মতো। যোগ, প্রাণায়াম, মৈথুনাত্মক মিলন। তবে গানের ভাষা শুনে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কুলকুণ্ডলিনী, জননেন্দ্রিয়র মূলে

boiRboi.net

পর্যন্ত স্থানকে মূলাধার বলে, সবই দেখছি গানের মধ্যে আছে। কিন্তু বাউলরা সব কিছুকেই নিজেদের বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করে। যেমন 'ত্রিবেনীর ঘাট' আসলে প্রকৃতির জননেন্দ্রিয়, সেই ঘাটে বাউল সাধক 'মীন' শিকার করে। প্রকৃতির রজঃ প্রবাহকে তারা বলে 'সিন্ধু' 'রূপসাগর' 'শ্রীরূপ নদী' ইত্যাদি। গান শুনে আমাদের বোঝবার উপায় নেই।

শরীরের বর্ণনায় তারা আটটি চন্দ্রের কথা বলে। মুখ দুই স্তন, দুই হাত, একটি (পুরুষের) বুক, নাভি, উপস্থ-অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়। কিন্তু এই আট চন্দ্র হলো বাহ্যিক। আরও চারটি চন্দ্র আছে। সে-কথাও বৃদ্ধ বাউল আমাকে গানের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। প্রকৃতির রজঃ প্রবাহের প্রথম দিনটিকে তাঁরা 'অমাবস্যা'ও বলে, আর সেই অমাবস্যায় সাধক চাঁদের উদয় ঘটায়। তন্ত্রের সঙ্গে এখানে তাদের তফাত্ এই, প্রথম দিনই তারা রজঃবিন্দু পান করে।

বৃদ্ধ বাউল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি পঞ্চগব্য কাকে বলে জানো?"

বললাম, "জানি। গো-মূত্র, গো-বিষ্ঠা, দুধ, ঘি, দই। সবই গরুর দেহের বস্তু।"

"পঞ্চগব্য খেলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগ আরোগ্য হয়। শরীর শোধন হয়।"

"জানি।"

বৃদ্ধ বাউল আমাকে একটি গান শোনালেন, "চারচন্দ্রের নিরূপণ, জাননা মন তার বিবরণ/জানলে পরে জীবদেহেতে ঘুচে যেতো কুমতি।" পুরো গানটিই দুর্বোধ্য। বললেন, "প্রকৃতি আর পুরুষের দেহের বিশেষ বিশেষ বস্তু দিয়ে চারচন্দ্র হয়, আর এ চারচন্দ্র বাউলরা খায় ও পান করে। নীর ক্ষীর মাটি রস, এই চারটি মিলে চারচন্দ্র। বাউল এ বস্তু খেলে তার শরীর সাধনার জন্য পরিপক্ক হয়। পুরুষ প্রকৃতির নীর মুখ দিয়ে গ্রহণ করে। প্রকৃতি পুরুষের বীজ মুখ দিয়ে মোক্ষণ করে। মাটি আর রস কি, তুমি বুঝে নাও, সবই শরীরের ভিতরের বস্তু। ঘৃণা থাকলে, এ সাধন হয় না। তবে একদিনেই, এক সঙ্গে এসব হয় না। প্রকৃতির প্রথম দিনের রজঃ পুরুষ গ্রহণ করে, বীর্য অন্য দিন। সেই মোক্ষিত বীর্য দিয়ে তারা কপালে আগে ত্রিপুণ্ড্র আঁকে। তারপরে পান করে। মাটি আর রস, পনর দিন বা মাসান্তেও গ্রহণ করা চলে।"

এই বিষয়টির সঙ্গে শাক্ত তন্ত্রের কোনো মিল পেলাম না। বৃদ্ধ বাউলের মুখেই প্রথম শুনলাম। গন্ধ, স্বাদ নিয়ে কোনো দ্বিধা থাকলে চলবে না। কারণ চার চন্দ্রের দ্বারা বাউলেন শরীর সাধনার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ এখানেও সেই, "লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকিতে নয়"।

*

পরের দিন সকালে আমার ঘুম একটু দেরিতে ভাঙলো। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ হওয়ার পরে। পূর্ণিমা আমাকে চা আর মুড়ি খেতে দিয়ে বললো, "বাবাজী, আমি কদিনের জন্য বিদায় নিলাম।" বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। স্নান শেষে, খোলা, চুলে তাকে একটি কুমারী মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। বৃদ্ধ বাউল আমাকে নিচু স্বরে বললেন, "মহাযোগ উপস্থিত হয়েছে, অমাবস্যার উদয় হয়েছে। মাধব আর পূর্ণিমা এখন চারদিন সাধনায় ব্যস্ত থাকবে।"

আমি গভীর প্রত্যাশায় অথচ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে কি চলে

যেতে হবে ?"

"না, মাধব আর পূর্ণিমা তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে বলেছে।" বৃদ্ধ বাউল বললেন, "তবে আমাদের দুজনকেই হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে।"

আমি মহা উৎসাহে বললাম, "কোনো আপত্তি নেই। আমি কি মাধব আর পূর্ণিমার সাধনা দেখতে পাবো ?"

বৃদ্ধ বাউল গম্ভীর মুখে বললেন, "তা কী করে দেখতে পাবে ? এ কি তুমি ভৈরবী চক্র ভেবেছো ? বাউল সাধনা কেউ দেখতে পায় না ! ওরা দুজনে এখন চারদিন ঘরের বাইরে বিশেষ আসবে না। তবে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে।"

আমি তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করলাম। গতরাত্রে মাধব আর পূর্ণিমার ছায়া আলিঙ্গন ও চুম্বন দেখেছিলাম। সেই সময়েই কি পূর্ণিমার 'রজঃ দর্শন' হয়েছিল। মাধবকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরেই দেখলাম, সে স্নান করে, ভেজা কাপড়ে, মাথায় একটি বেতের চুপড়িতে কিছু নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারপর সে আর পূর্ণিমা বাইরে এসে বৃদ্ধ বাউলকে প্রণাম করলো। বৃদ্ধ বাউলও মাটিতে মাথা ঠেকালেন। মাধব পূর্ণিমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করলো। মাধব বললো, "আপনার যে কদিন খুশি থাকুন। থাকা না থাকা আপনার ইচ্ছা। আমাদের বিদায় দিন।" আমি বিদায় দিতে জানি না। কেবল দু হাত তুলে নমস্কার করলাম। পূর্ণিমা বৃদ্ধ বাউলকে বললো, "তোমাদের কয়েকদিনের খাবার চাল ডাল সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

বৃদ্ধ সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বারে বারেই "জয়গুরু জয় গুরু" বলে উল্লাস প্রকাশ করছিলেন। মাধব আর পূর্ণিমা তাদের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। বৃদ্ধ বাউল বললেন, "চলো, আমরা কাঠ কেটে উনোন জ্বালাই, তারপরে রান্না চাপাবো।" কিন্তু গান তাঁর সমানেই চললো। গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও চললো, "এখন দুদিন বিন্দু আর রস পান, সেই সঙ্গে মিলন ক্রিয়া কিন্তু তার মানে এই নয়, সব সময়েই পান আর ক্রিয়া চলবে। তার বিশেষ সময় আছে। দমের ঘরের অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের বিশেষ সময়ের ওপরেই ক্রিয়া নির্ভর করে। ক্রিয়াটি রাত্রেই, কিছু খাবার পরে ঘটে।" বোঝা গেল রজঃ আর শুক্রকে কখনো কখনো 'বিন্দু' এবং 'রস' বলা হয়েছে। গানের ব্যাখ্যাতেই জানা গেল, ক্রিয়ার আগে 'আলাপন' এবং সেই 'আট চন্দ্রের' নানা শৃঙ্গার চলবে। এই আট চন্দ্র মুখ হাত স্তন বুক জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি। কুম্ভকের কথা প্রত্যেক গানেই আছে। বিভিন্ন নামে। তৃতীয় দিনের রাত্রি শেষে, আমার হাল্‌কা ঘুম ভেঙে গেল। আমি মাধবের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। বাইরে যাবার ইচ্ছা থাকলেও, আমি গেলাম না। মাধব আর পূর্ণিমার গলার অস্পষ্ট কথা আমার কানে এলো। কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দও পেলাম।

তৃতীয় দিনে বৃদ্ধ বাউলের গানের ব্যাখ্যায় জানলাম, "বিন্দু আর রস পান শেষ। এখন কেবল ক্রিয়া। কিন্তু ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ সময় আছে।" এই সব গানে 'যোগ' 'কুম্ভক' 'আপানবায়ু' 'মূলবন্ধ' এ সব কথাই বেশি, আর বারে বারেই সাবধান বাণী, 'সে' আসছে, সাবধান ! বিন্দু অবিচলিত রাখো। 'কাম' শোধ, এবার 'প্রেম' এর

boiRboi.net

উদয় হতে চলেছে। সেই 'অধর মানুষ'-এর আসার সময় হয়েছে।

চতুর্থ দিনে গানে কেবল, 'উজানে চলো', 'উলটা কলে চলো' 'আর মানুষকে অনুভব কর।' কী করে অনুভব করা সম্ভব? নিরন্তর মহাসুখের মধ্যে। একটি গানের ব্যাখ্যা ঃ সাধক পায়ের গোড়ালি দিয়ে, যোনিস্থান সবলে চেপে ধরবে, রমণ চলতে থাকবে, আর গুহ্যদ্বার বারে বারে আকুঞ্চন করে, বীর্যকে ঊর্ধ্বগামী করবে, এর নাম মূলবন্ধ। কিন্তু বিন্দু অর্থাৎ শুক্র কোনোরকমেই বিচলিত হবে না, টলবে না, স্খলিত হবে না। তাকে কেবল ঊর্ধ্বগামী করে রাখতে হবে। এই সময়ে বিপরীত বিহার চলতে পারে, আর চোখে চোখে তাকিয়ে শৃঙ্গার। যে যতো বড় সাধক, সে মৈথুন-মিলনের নিরন্তর নিবিড় আনন্দময় অবস্থায় সব থেকে বেশি সময় থাকতে পারে। চব্বিশ ঘন্টারও বেশি হতে পারে। কারণ সে তো 'ঈশ্বর' চায় না। চায় নিরন্ত প্রেমলীলা-বিলাসময় 'মানুষ'। কিন্তু বীজ থাকবে অটল।

তন্ত্রসাধনায় এমন অসম্ভব কিছু নেই। প্রকৃত পক্ষে ছিয়ানব্বই ঘন্টারও ওপর সাধনা চলছিল। শেষের দিন পূর্ণ চব্বিশ ঘন্টা তো অবিচ্ছিন্ন মিথুনানন্দ। পঞ্চম দিনে আমার ঘুম ভাঙলো গানের সুরে। দরজা খুলে দেখলাম, মাধব আর পূর্ণিমা স্নান শেষে উনোন ধরিয়েছে। গান করছে মাধব। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে পূর্ণিমা। তাদের দুজনকে যেন আমি এক ভিন্ন জগতের আলোকিত পুরুষ প্রকৃতি রূপে দেখছিলাম। যেন একটা জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছিল তাদের শরীর থেকে। আর তারা দুজনেই কাজের মধ্যেও হাসি গানে মত্ত। তারা দুজনে যেন এ জগতে নেই। দুটি পুরুষ প্রকৃতি এক নিবিড় সুখে মগ্ন। বৃদ্ধ বাউলও গান করছেন, হাসছেন আর কাঁদছেন।

পঞ্চম দিন, দুপুরের খাবার পরে আমি বিদায় নিলাম। বৃদ্ধ বাউল ও মাধব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মাধব বললো, "তুমি এখন আমাদের বন্ধু, যখন খুশি আসবে।"

পূর্ণিমা বললো, "তুমি প্রেমের মানুষ, তোমার সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক।"

আমি তারপরেও কয়েকবার বীরভূমের সেই গণ্ডগ্রামে, মাধব আর পূর্ণিমার কাছে গিয়েছি। অত্যন্ত শোকের বিষয়, কিছুকাল আগে পূর্ণিমা মারা গিয়েছে।

*

বাউলদের দেহতত্ত্ব যে তন্ত্র সাধনারই এক রূপ, আমার জানা ছিল না। কয়েকটি তফাত চোখে পড়লো। তার মধ্যে বিশেষ করে বীর্যপাত। হিন্দুতন্ত্র সাধনায় বীর্যপাত আছে, বাউলদের মিলনে তা নেই। পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কথা বইয়ে পড়তে গিয়ে, মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে বাউল সাধনার মিল আছে। বাউলরা তন্ত্রের পঞ্চম 'ম' কারের মাত্র একটি 'ম'—অর্থাৎ প্রকৃতি গ্রহণ করে। সেটা অনিবার্য। কিন্তু মদ মাংস মাছ ইত্যাদি গ্রহণ করে না। বাউলদের বৈশিষ্ট্য "চারচন্দ্র" এবং বীর্যপাতহীন নিরন্তর মিথুনানন্দ। ব্যাখ্যা, এই ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর যা ঘটছে, এই দেহে, তারই ক্রিয়া চলছে। বাউল ঈশ্বর বিশ্বাসী না। যেমন একটি গানে বলা হচ্ছে, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি তর্পণের দ্বারা যদি তোমার পূর্বপুরুষকে জল দান করতে পারো, তবে ঐ যে কৃষক জলের অভাবে চাষ করতে পারছে না, তার মাঠে কেন তর্পণের দ্বারা

boiRboi.net

জল সিঞ্চন করছো না ?" তাদের গানের মধ্যে যেমন সাধনার সব গোপন কথা নানা 'প্রতীক' শব্দে দুর্বোধ্য, তেমনি মানুষের প্রতি প্রেম ভালবাসার কথাও ফুটে উঠেছে। কারণ 'মানুষ' তাদের কাছে সকলের আগে, সেই জন্যই তার সিদ্ধিলাভ প্রাপ্ত ঈশ্বরের নাম 'মনের মানুষ'। তারা জাতপাতে বিশ্বাসী না, দেব দেবীতেও না। তারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কথার মধ্যেই, নিজেদের সাধনার গোপন কথা অনায়াসেই মিশিয়ে দিয়েছে, সাধারণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না। অনেকে মনে করতে পারে, বাউলরা কেবল ইন্দ্রিয় সেবা করে। আমি দেখেছি, তাদের সাধনা যে-কোনো দেহ সাধনার তুলনায় অতি কঠিন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের 'দোহা' বা গান আবিষ্কার করেছিলেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করতে গেলে, অত্যন্ত অশ্লীল হয়ে পড়ে, অতএব ব্যাখ্যা করছি না"। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি কি বাউল গানের প্রকৃত মর্ম জানতেন না ? আমার মনে হয় জানতেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধর্মমতের সঙ্গে বাউলদের মানবপ্রীতিকে তিনি নিজের মতো করে মিশিয়ে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই, যৌনপ্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। সম্ভবতঃ আদি মাতৃদেবী ও আদি পিতৃদেবের কল্পনা থেকেই মানুষ তার ধর্মের সঙ্গে, নিজেও যৌন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। এখনও তার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা বিস্তৃত করে বলার দরকার নেই। আমরা এখন আধুনিক 'যৌন বিপ্লব'-এর কথা প্রায়ই শুনছি। এর স্বরূপ কী ? প্রাচীনতম কাল থেকেই কি যৌনতা, নিরন্তর নানা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে ? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যে যৌনতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, এটা পরিষ্কার। 'যৌন বিপ্লব'-এর প্রবক্তারা কী বলেন, কী তাদের বিধান, আমরা তা জানবার অপেক্ষায় আছি।

বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে

অনধিকার চর্চা বিষয়টি বড় উদ্বেগজনক। অথবা বলা ভালো, ধন্দ লাগানো। যতোবার যে-কোনো ক্ষেত্রেই সঙ্গীত নৃত্য বিষয়ে কিছু বলতে গিয়েছি বা লিখতে বসেছি, তন্মুহূর্তেই এই অধিকার-অনধিকার প্রসঙ্গটি আমার মনে কাঁটার মতো খচখচিয়ে উঠেছে। কেবল সঙ্গীত নৃত্য বিষয়েই কেন, শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়েই মন্তব্য করবার আগে, এই প্রসঙ্গটি একটি অনিবার্য জিজ্ঞাসার ভ্রূকুটি হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি, যে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিকারবোধ মনের কোণে ঠাঁই করে আছে, সেই সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়েও অনেকবার থতিয়ে গিয়েছি। দ্বন্দ্ব জেগেছে, ধন্দ লেগেছে মনে। যা বলছি, ঠিক বলছি তো ?

উদ্বেগটা একান্ত নিজের মনের। নিন্দুকের কথা ভেবে না ! কাঠঠোকরা শুকনো কাঠে ঠকঠকিয়ে ঠুকবে তাদের দীর্ঘ ধারালো চঞ্চু দিয়ে। বা কাদাখোঁচারা কাদা খুঁচিয়ে যাবে নিরন্তর, এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন কি-না স্বাভাবিক

boiRboi.net

ব্যাপার, দোয়েল শ্যামারা বিশ্বরূপের আঙ্গিনায় চিরকালই মুগ্ধ আর সুখী চিত্তে সঙ্গীতমুখর। এটি "একটি অতি পুরাতন কাহিনী।"

অনধিকার চর্চার উদ্বেগের কারণটা, মন্তব্যের যাথার্থ্য নিয়ে। কিন্তু অদ্যাবধি, রসের বিচারে আদৌ কোনো নিরিখের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কী? চোখের কোণে পিচুটি জমেছে, অন্তরে সদাই দংশনোদ্যত বিষধর, তাদের কথা আলাদা। তাঁরা হলেন ফতোয়াবাজ। ফতোয়াবাজদের কৌলীন্য, সে জাতে ঢেঁকি। সে একটি কাজই জানে। যেখানেই থাকুক, যেখানেই যাক, তার একটাই ছক, একটাই ফতোয়া। সেই ছকের বাইরে, সে কিছুই জানে না। অতএব, সে জানে, তার বিচারে কোনো ত্রুটি নেই। অথচ আমার জ্ঞানে এমন কোনো তত্ত্বের সন্ধান মেলে নি, যা ছকে বাঁধা। ছক মানেই, চিন্তাজগৎ শ্রমহীন, এক শ্রেণীর সুখীদের পরিক্রমার পথ। সৃষ্টির ক্ষেত্রে, এমন কি সে জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীও না, একেবারেই বন্ধ্যা।

বেশ আছেন, আরামে থাকুন, চালিয়ে যান। তবে মাঝে মধ্যে, যদি অন্তরে কোনো তাগিদ থাকে, হাঁটা চলাফেরা করবেন, অন্যথায় মেদ জমে যাওয়ার ভয় আছে। ছকের বাইরে হলেও ভয়ের কিছু নেই। কারণ রসের বিচারে, তর্ক কখনো মেটেনি। ছিল, আছে, থাকবেও। কিন্তু তর্কের বাইরেও চিরকালই একটা বিষয় ছিল। আছে এবং থাকবেও। তাকে শুধু "ভালো লাগার" মতো একটি তুচ্ছতা দিয়ে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে না। যদিও অবিশ্যি রকমফেরে কথাটা তা-ই, তবে আরো প্রাণ ঢেলে বলতে ইচ্ছা করে, "বিস্ময় মুগ্ধতা"। আমার কাছে এ অনুভূতিটা আবেগের তাড়না মাত্র না। বুদ্ধি এখানে প্রাণের দরজায় দাঁড়িয়ে দরোয়ানী করে না বটে, সে প্রচ্ছন্ন থেকে মুগ্ধ হৃদয়ের তীরে কিরণ ছড়ায়। প্রাণ ও মনের এমনি একটা অবস্থায়, রসের বিচারককে বলতে ইচ্ছা করে, "তফাত্ যান।" তাত্ত্বিক মহাশয়কেও, "এদিকে নয়।"

*

অধিকার-অনধিকার প্রসঙ্গটি মনে এলো, গত ফেবরুয়ারি মাসের গোড়ায়, যখন হঠাৎ-ই আমার এক বন্ধুর মুখে শুনলাম, মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির প্রাঙ্গণে, মন্দিরের পটভূমিতে, খোলা আকাশের নীচে, ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের শাস্ত্রীয় (classical) নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তারই পাশাপাশি, খাজুরাহোর পাহাড়ের পটভূমিতে, রাত্রের খোলা মাঠে, আগুনের আলোয় নাচতে আসছেন মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়। কে না জানেন, বিশাল মধ্যপ্রদেশের মতোই, তার আদিবাসী সম্প্রদায়ও বিশাল, বিচিত্র আর বর্ণাঢ্য! এর পিছনে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণও বর্তমান। কিন্তু সে প্রসঙ্গের কথা পরে। প্রথমেই বলা দরকার, এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ডিরেকটরেট অফ ট্যুরিজম—মধ্যপ্রদেশ। তাঁদের এই অপরূপ আয়োজনের মধ্যে কতোখানি হরিষে বিষাদ মিশেছিল, সে-কথা এখন নয়। এই মুহূর্তে তাঁদের ধন্যবাদ আর অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। এ একমাত্র তাঁদেরই উপযুক্ত কাজ, এ কথা বলেই শুধু চুপ করে থাকা যায় না। তাঁদের এই অভিনব পরিকল্পনা আর চিন্তার জন্য, দেশবাসী মাত্রেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সম সময়ে, কাগজের সব সংবাদ বা বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে না। খাজুরাহোর এই অভিনব চিত্তহারী মহোৎসবের কোনো সংবাদ বা বিজ্ঞাপন, কলিকাতার

কাগজে আমার চোখে পড়েনি। জানি না, প্রচার কতোটুকু হয়েছিল, বা আদৌ কলকাতায় কোনো প্রচার হয়েছিল কি না। অথচ এবার নিয়ে, এই মহোৎসবের বয়স তিন বছর। যে বন্ধু সংবাদটি দিয়েছিলেন, আপাততঃ তাঁকেই আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা আরো এক কারণে। তিনি, সপরিবারে না বলে সদলবলে বলা সঙ্গত, চলে গিয়েছিলেন আমার আগেই। উৎসবের তারিখ ছিল ফেবরুয়ারির এগারো থেকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত। আমার পক্ষে খাজুরাহো এই প্রথম আর নতুন। সেই মন্দির প্রাঙ্গণে ওই রকম এক নৃত্যোৎসব হতে চলেছে। নিজের উৎসাহ আর ব্যাকুলতা থেকেই, আরো বহু ভিড়ের একটা ছবি কল্পনা করতে পারছিলাম, যা দিশাহারা করবার পক্ষে যথেষ্ট। কোথায় আশ্রয় পাবো, কিছুই জানি না। আদৌ পাবো কী না, সে-বিষয়েও যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ছিল। এমন কি, উৎকণ্ঠা ছিল, ভায়া-এলাহাবাদ বমবে মেলে, সাতনা পেঁছে, সেখান থেকে খাজুরাহো পেঁছাবো কেমন করে? অন্তত সাতনা স্টেশনে নেমেই কারোর সাহায্য আমার দরকার ছিল। কারণ, আগেই শুনেছিলাম আমাদের সেই দেশটির নাম মধ্যপ্রদেশ যার যে-কোনো দ্রষ্টব্যস্থানে যেতে হলেই, দেড়শো দুশো মিনিমাম তিনশো-চারশো কিলোমিটার পথ কিছুই নয়। রেলপথ আর রেলের সময়ের সবটাই এমন বেকায়দায়, বাসের রাস্তাই একমাত্র ভরসা। এক কথায় বাই-রোড।

দেশটি বড় বলতে যে-সে বড় না, একমাত্র বস্তার জেলা-ই কেরল প্রদেশের সমান। যাই হোক, আমার সহৃদয় বন্ধুটি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। সাত্না স্টেশনে আমাকে রিসিভ করেছিলেন এলাহাবাদ ব্যাংকের ম্যানেজার, আর খাজুরাহো পেঁছোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনিই। কিন্তু এখানেও আমাকে আর একবার অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে এ যাত্রায় আমার ভূমিকাটা কী? আলোচক, সমালোচক, সমীক্ষক কোনো বিশেষণেই আমাকে মানায় না। সঙ্গীত নৃত্যাদি বিষয়ে সচরাচর যা দেখতে পাই। তবে সে-জবাবটা আমার আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। উৎসবের বিবরণেই, আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল প্রাণে। মুগ্ধ বিস্ময়ের ব্যাকুল-গতি আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কল্পনা প্রতিভাত হয়েছিল স্বপ্নের মতো।

আজকাল অনেকে কথায় কথায় বলেন, পৃথিবী সত্যি ছোট। কথাটা যে সত্যি তা তো অনেক আগেই শুনেছি, "জীবন এত ছোটো ক্যানে।"···তবুও, এতাবৎকাল খাজুরাহো তো আমার কাছে দুরন্ত-ই ছিল। ঘরের কোণে কোনারকের মন্দির দেখেছি একাধিকবার। খাজুরাহোর মন্দির এতোকাল ছিল, চোখে না-দেখা, বাঁশী শোনার মতো।

আগে পটভূমি, তারপরে অনুষ্ঠান। আমাদের বাঙালী মৃৎশিল্পীরা হয় তো প্রতিমার কাঠামো আর চালচিত্র আলাদা আলাদা তৈরি করে, পরে তাকে সাজান। কিন্তু প্রতিমা যখন দেখি, তখন তার পটভূমি চালচিত্র। অতএব মহোৎসবের চালচিত্রের কথা আগে। কিন্তু চালচিত্র যেমন, কেবলমাত্র একটি ডেকোরেটেড ব্যাকগ্রাউণ্ড নয়, প্রতিমাকে ঘিরে থাকে নানা প্রতীক, গূঢ় যন্ত্রাঙ্কন অর্থবহ বিচিত্র সংকেতময় নানা মুদ্রাঙ্কিত চিত্র আমার কাছে খাজুরাহোর মন্দিরসমূহ, শাস্ত্রীয় নৃত্যাদির তেমনি এক চালচিত্র পটভূমি।

boiRboi.net

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর উড়িষ্যার মন্দিরগুলো সবই দেখেছিলেন, আর উড়িষ্যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন, মন্দির-ক্ষেত্র। মন্দিরের দেশ। তাঁর মুগ্ধতার মধ্যে একটি স্বপ্নাবেশ যেমন ছিল, ছিল তেমনি পাশাপাশি একটি রুচির বিচার। সংশয়িত জিজ্ঞাসা।

একমাত্র খাজুরাহোর মন্দিরগুলো দেখেই, মধ্যপ্রদেশকে আমার বলতে ইচ্ছা করে, মন্দিরের দেশ। তার থেকেও বেশি, আমি এসে দাঁড়ালাম যেন এক স্বপ্নময় জগতে। মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে, খাজুরাহোর কয়েক মাইলের মধ্যে, নিভৃতে। ইতিহাস বলে, খাজুরাহোতে মন্দিরের সংখ্যা ছিল প্রায় আশি। এখন বর্তমান বিশ-বাইশের বেশি না। কিন্তু প্রতিটি মন্দির খুঁটিয়ে দেখে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবরণের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভাবনা চিন্তায় আমি নেই। তাত্ত্বিকের কাজ তাত্ত্বিক করবেন। মুগ্ধপ্রাণ পারে শুধু মহিমা কীর্তন করতে।

এখানে চোখে পড়ে না কোনো রাজপ্রাসাদ, ধনিকশ্রেণীর ইমারত, অথচ আকাশে বিদ্ধ হয়ে আছে মন্দিরের উচ্চ শিখর। বিশারদদের মতে, যে-সব পাথর দিয়ে মন্দির-গাত্রের এই দেবদেবী, নরনারী, পশু-পক্ষীর জীবনলীলাকে রূপদান করা হয়েছে, যা স্তব্ধ, কিন্তু প্রাণহীন ভাবতে পারি না, বাস্তব অবাস্তবের মাঝামাঝি, এক স্বপ্নময় জগতে চলমান অনুভূত হয়, সেই সব পাথর আনা হয়েছিল কেন্ নদীর তীরে, পান্না হীরক খনির পাহাড় কেটে। দূর থেকে, সহসা যে-সব মূর্তিকে মনে হয় সাদা, তার অধিকাংশই সাদা নয়। শিল্পীরা সম্ভবত খুঁজেছিলেন সেই সব বালিপাথর (sand stone), যার মধ্যে মিশেছিল মানুষের গায়ের রঙের আভা। সেইজন্যই কি খাজুরাহোর রমণী-পুরুষের মূর্তিগুলোর রঙ অধিকাংশই কিঞ্চিৎ গোলাপী আভা, ঈষৎ পীতাভ, হালকা হলুদ?

জানি না। আমি দেব-দেবী জানি না, যক্ষরক্ষ অপ্সরা সুরসুন্দরী বুঝি না, আপন হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে শুনতেও নিজেরই আর্তজিজ্ঞাসা শুনি, কেন আমি সেই সব শিল্পীর হাতের পাথর প্রতিমা হলাম না? হাজার বছরের ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষী হয়ে থাকবার জন্য না। আমি থাকতে চাই এই রূপ ও লাবণ্যের, বীরত্ব ও মহত্ত্বের, দৈনন্দিন জীবন-লীলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে। সেই সামান্য গাইড বুকে উদ্ধৃত ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার পঙ্ক্তি কয়টি এখানে দাঁড়িয়ে, আমারও বলতে ইচ্ছা করছে:

আমি কবি দেহের এবং
আমি কবি আত্মার
আমার কাছে স্বর্গের সুখ
এবং নরকের যন্ত্রণা আছে আমার
আমি কবি রমণীর
যেমন পুরুষের
এবং আমি বলি যেমন মহৎ
রমণী জন্ম তেমনি পুরুষের...
আমি বলেছি, যে আত্মা
দেহের অধিক নয়

boiRboi.net

এবং বলেছি

আত্মার অধিক নয় দেহ।

এবং কিছুই না নয় ঈশ্বর

স্বয়ং একজনের থেকে অধিকতর মহৎ

এই মোর গান…

*

যা আমাকে বই পড়ে জানতে হয়, তা মন্দিরের গঠনশৈলী। খাজুরাহোর কোনো মন্দিরই প্রাচীর ঘেরা নয় এবং অধিকাংশ মন্দিরই হিন্দু ধ্যানধারণার ধারক বাহক। কিছু জৈন মন্দিরও আছে। মন্তব্য করতে দ্বিধা হয়, তবু ধারণা করি, জৈন মন্দিরাদি পরবর্তীকালের সৃষ্টি। "জগতী"র ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত, আমাকে মনে করিয়ে দেয় যেন জগতী তলে মানব মানবী, তাদের গৃহ সংসার সব কিছু নিয়ে চলেছে নিত্যকালের প্রবাহে। অধিস্থানের ওপরে জগতী, জগতীর ওপরেই অর্ধমণ্ডপ, তার ওপরে মণ্ডপ, মণ্ডপের পরে অন্তরাল এবং গর্ভগৃহ। বিগ্রহ অবস্থান করেন গর্ভগৃহে। মণ্ডপ কখনো কখনো মহামণ্ডপ। মানুষের দেহ যেমন ভর করে থাকে জঙ্ঘার ওপর, মন্দিরের মধ্যস্থলের কোনো কোনো স্থানকে তেমনি বলা হয়েছে জঙ্ঘা, যে শক্ত পাথরের দেওয়ালের ওপরে, মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উচ্চ শিখরে।

দেওয়াল? কথাটা একদিকে সত্যি, কিন্তু খাজুরাহোর সমস্ত মন্দিরের দেওয়াল, থাম, ছাদ, ছাদের বিম্, প্রবেশ দ্বার, অধিস্থান, অধিস্থান থেকে গর্ভগৃহ, তার ভিতর বাহির সবখানেই নানা ভঙ্গিমায় নানারূপে, নরনারীর মিছিল। কোথাও পারিবারিক, কোথাও দেবদেবীর নানা ক্রীড়া। নামে তাঁরা অনেক অনেক কিছু। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, "আমি কবি রমণীর যেমন পুরুষের।"…

কোনো কীর্তিমান কবি লিখেছিলেন "তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?" আমার বিনীত আর অকুণ্ঠ জবাব, পাইনি। কিন্তু খাজুরাহোর মন্দিরের রমণীর নিশ্বাস যেন কুসুমের গন্ধে স্পর্শ করেছে আমার শরীর। শালপ্রাংশু বৃষস্কন্ধ পুরুষের বলবীর্যের উত্তাপ লেগেছে আমার গায়ে। অপ্সরা অথবা সুরসুন্দরী, (nymphs) ওঁদের যাই বলো ঈষৎ গোলাপী বা পীত আভাযুক্ত এই সব অপরূপ রমণীরা, যারা ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্বিনী, বিল্বফল সদৃশ সুস্তনী, যাদের এক একজনের চোখে মুখে, ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার কারণে, তারা সকলেই যেন আমার চেনা-অচেনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচিয়ে দিচ্ছে রক্তধারা।

যেখানে তারা নেচে চলেছে নানা ভঙ্গিমায়, তখন সে একান্ত আপন ছন্দে আত্মহারা। কারোর ঠোঁটে বিকট হাসি, চোখের কোণে হাসির ঝিলিক। কারোর অভিব্যক্তিতে আর্ত আবেগ, দেহের ছন্দে যা হয়ে উঠেছে জীবন্ত, ব্যাকুল কেউ দ্রুত-তালের ছন্দে, দৃষ্টি দিশাহারা। এ কি কেবলই পাথরের মায়া? "তুমি কি কেবলই ছবি?" কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে হাতের শতদল পদ্ম? তোমার নাচের ভঙ্গিতেও কি মুকুর একটি সরঞ্জাম? অথবা তাও তুমি নিবেদন কর তোমার দেবতাকে? কে পরালে তোমার নগ্ন বক্ষে এমন চন্দ্রহার। আশ্চর্য, তোমার হাতে ছাড়া আর কার হাতেই বা মানায় এমন কঙ্কণ।

boiRboi.net

দেখছি, উদ্ধতবক্ষ নারী, কোমরের কাছে একটি পা তুলে পরে নিচ্ছে পায়ের অলংকার। স্পষ্টতই, খুলে পড়েছিল কোনো এক মুহূর্তে। কিন্তু অন্য এক রমণী নতমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে দুই জঙ্ঘার মধ্যস্থলে, পা তুলে, কী খুঁটে তুলছে পায়ের তলা থেকে? চোখে তার ভ্রূকুটি, একটু বা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ। বলে দেবার দরকার হয় না, বিঁধে যাওয়া কাঁটা তুলছে, পায়ের তলা থেকে। বড় চেনা ছবি। কোথায় যেন দেখেছিলাম? কোথায় যেতে যেতে না কি কোনো গৃহাঙ্গনেই? ইচ্ছা কি করে না, ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিই, তুলে নিই ওই সুকোমল চরণ? মুক্ত করি কাঁটা?

শুনি, রচয়িতার প্রকাশের ভাষা যখন এক গভীর ও উচ্চতায় (Hightened) পেঁছায়, তখন তা হয়ে ওঠে কবিতা। শিল্পীরও কি তাই। যখন তার সৃষ্টিকর্ম পেঁছায় কল্পনার শীর্ষে, তখন সে বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যথায় রমণী ও পুরুষের এমন মুহূর্তে আশ্চর্য স্বাধীন এমন উদ্ধত অথচ নম্র, অতি অধরা অথচ স্বাভাবিক, আর এত আশ্চর্য স্বাধীন তাদের ক্রীড়া ও ভঙ্গিমা, কেমন করে রূপ পায়। বর্তমানের দু-একজন আধুনিক শিল্পীর তুলির টানে, এমন বলিষ্ঠ মূর্তি আমার চোখে পড়েছে।

কিন্তু এই যে রমণী, একে একে খুলে ফেলছে তার প্রতিটি অলংকার আর একজন হাই তুলেছে, অন্যে ভেজা কাপড় শরীর থেকে খুলে জল নিংড়াচ্ছে, অপর একজন সামনের দিক পিছন ফিরে নত হয়ে কিছু তুলে নিচ্ছে, কেউ বা অন্যমনস্ক আবেগে নিজের নগ্ন বক্ষে হাত রেখেছে, দেখে মনে হয়, সে স্বাধীনভাবে আপন গৃহেই রয়েছে, এমন আত্মমগ্ন চরিত্র সকল কালের সৃষ্টিকে যেন ম্লান করে দিয়েছে। কখনো সে চিবুকে রেখেছে হাত, কখনো ঠোঁটে রেখেছে তর্জনী। এটা কোনো ইঙ্গিত বা ইশারা না, অন্যমনস্ক ভাবনার অভিব্যক্তি তাদের মুখে। কেউ গাছের ডাল নুইয়ে ফুল পাড়ে, কেউ বাঁ হাতে আরশি দেখে, ডান হাতে চুলের খোঁপা গোছায়। চোখে কাজল আঁকে কেউ, কেউ, খেলা করে বর্তুলখণ্ড নিয়ে, পুষ্পযানে দোল খায়, চন্দনে সাজায় শরীর। কারোর ঠোঁটের ও চোখের কূলে শুধু অপার রহস্যের হাসি। সন্তান স্নেহে বিগলিত মায়ের কোলে শিশু।

মন্দিরের অধিস্থানের গা থেকে (Basement Panel) যদি শুরু করি, সেখানে নারীর প্রবেশাধিকার প্রায় নেই। কারণ জীবন ও জগৎ মাঝে যা অনিবার্য, পুরুষরা সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত। সেখানে খোলা কৃপাণ আর তীরে শর যোজনা করে ছুটে চলেছে পদাতিক বাহিনী। অগ্রে নানা অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী, তারও আগে হস্তীযূথবাহী যোদ্ধারা। কখনো ধারাবাহিক দ্রুত গতি কখনো মুখোমুখি যুদ্ধ। নিবিড় হয়ে দেখতে দেখতে গন্ধে পাই যেন ঘামের ঘ্রাণ, শুনতে পাই হুংকার, আহতের আর্তনাদ, হস্তীর কংক, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। স্তব্ধ, কিন্তু এমনই আশ্চর্য প্রাণময়, মাছ গেঁথে যাওয়া বাঁকানো ছিপের মতো অশ্বের স্ফুরিত নাসারন্ধ্র বাঁকানো মুখ সহসাই যেন বেরিয়ে এসেছে মন্দিরের গা থেকে। শত্রু সৈন্য পদদলিত হচ্ছে হাতীর পায়ের তলায়, কেউ বা পলায়মান। কোথাও মুখোমুখি হাতাহাতি যুদ্ধ।

এই চিত্রেরই মাঝে মাঝে চোখে পড়ে কোনো এক শান্ত গম্ভীর ব্যক্তি হাত তুলে কিছু বলছেন, দু পাশের সারি সারি শ্রোতারা আসীন। যেন যুদ্ধের অবকাশকালে

boiRboi.net

কোনো জ্ঞানী কিছু উপদেশ দিচ্ছেন, অথবা শোনাচ্ছেন কোনো সামরিক বিধির বিষয়। এই যুদ্ধ চিত্রের মধ্যেই সহসা কোথাও কোথাও নারীর প্রবেশ, যারা একাধিক পুরুষের বাহুবন্দী। কল্পনা করতে ইচ্ছা করে, এ হয়তো বিজয়ী সেনাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তির উল্লাস। তবু এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতে হয়, যখন দেখি, এক সৈনিক অশ্বিনী মৈথুনে উদ্যত। আমি নিজে এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। মধ্যপ্রদেশের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের একজন কর্মী—তিনি একজন শিল্পীও, আমাকে শোনালেন, বহুকাল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন সৈনিক নিতান্ত কামনাতাড়িত হয়ে এই মুহূর্তে বিকার-গ্রস্ত, লিপ্ত হতে চলেছে পশু-মৈথুনে।

এই ব্যাখ্যা মানতে পারি বা না পারি, জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের জানিয়ে দেয়, মানুষের দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব।

খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রের এই যুদ্ধ ও জীবনযাত্রার নানা চিত্রের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মহিমময় সৃষ্টি রমণী, পুরুষদের আদি ও অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার, অনায়াস ও নগ্ন প্রকাশ, নাম যার যৌবন। যে সব ক্রীড়ারত মূর্তিগুলোকে বলা হয়েছে মিথুন মূর্তি। অথবা যুগলবন্দী। একি সৃষ্টি উল্লাস, না কি জীবনেরই আকাঙ্ক্ষার এক বিপুল আনন্দ। আমি জানি না, কেন কেউ কেউ মিথুন মূর্তিগুলোর অভিব্যক্তিকে স্বর্গীয় আখ্যা দিয়েছেন। আমি দেখেছি, কামনায় উদ্বেল, যৌনাসনে উভয়ে প্রগাঢ়-ভাবে আপনাতে আপনি মগ্ন, আশ্লেষ চুম্বনে যেন পিপাসিত প্রাণ, তৃপ্ত—অথচ অতৃপ্ত, যা একান্ত মানবিক।

মানুষের ক্ষেত্রে কাম যদি কেবল মাত্র বীভৎস রস না হয়, হওয়াটাই অবিশ্বাস্য আর অযৌক্তিক, তবে এইসব মিথুন মূর্তির মধ্যে আমি দেখছি কেবল জগত পারাবারের চলমান স্বভাব সৌন্দর্য। কিন্তু মহাকাল অন্ধ, তিনি নিরন্তর অতি বেগে ধাবমান, আর তাঁর রথচক্রের আঘাতে ধ্যানধারণা মানসিকতা রুচি সকলই কেবল অতীত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হে বোদ্ধা, জীবনের বিচারক, শুনতে ইচ্ছা করে তোমার বাণী, মানুষ কি ত্যাগ করেছে বিপরীত বিহার? কামশাস্ত্রের মতো যত রূপ-অরূপের খেলা? বরং, অবাক হয়েছি সেই রমণী মূর্তির দিকে তাকিয়ে, যে যুগলবন্দী ক্রীড়ারত রমণী পুরুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সহসা মনে হয়, রমণী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অন্য পাশের রমণীর আপন অঙ্গে হস্তাবলেপ অথবা বক্ষমর্দন এবং মুখের বাসনা ব্যাকুলতা অন্য ভাবনা এনে দেয়। বুঝতে পারি, চারি পাশের নানান জীবনলীলার মাঝখানে অন্য এক পরিবেশে রমণী পুরুষেরা চুম্বনে আলিঙ্গনে রতিবিহারে মগ্ন। প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডেই যেন জীবননাট্যের নানা দৃশ্য উপস্থিত। অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যেও এক একটি পরিবেশ বিচ্ছিন্ন, চরিত্রবৃন্দ ভিন্ন। অন্যান্য সব মূর্তির মতই মিথুন মূর্তিগুলোও এমনই প্রাণবন্ত, এমন আশ্চর্য তাদের দেহসৌষ্ঠব, এমনই অনায়াসে তারা, ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহ আসনে ক্রীড়ারত, আমাদের সীমায়িত শক্তির তুলনায় তা যেন অনেকটাও অসাধারণ।

কারা তাঁরা, কোন্ সেই শিল্পী বাহিনী, হাজার বছর আগে এই আশ্চর্য রূপ দান করেছিলেন পাথরে? আমি জানি, এক বাক্যে সবাই আমাকে ইতিহাসের সন্ধান দেবেন, এ সবই চান্দেলা রাজবংশের কীর্তি। প্রায় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে

boiRboi.net

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে, চান্দেলা রাজবংশের রাজত্বে এই সব মন্দিরসমূহের সৃষ্টি। কিন্তু রাজবংশের উৎসাহে, অর্থানুকূল্যে অথবা এমনকি যদি কারো কারো মতানুযায়ী মেনেই নিই, রাজকীয় শাসনের প্রতাপে ও হুকুমে, এই মন্দির তৈরি হয়েছিল, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, তাঁরা কারা? সেই সব শিল্পীরা?

একটা প্রচলিত প্রবাদ কোনো কোনো মহল থেকে প্রচারিত আছে, স্বয়ং বিশ্বকর্মা এই সব মন্দিরের স্রষ্টা। এমন কোনো স্বর্গীয় ভাবনা বা বিশ্বাস আমার নেই, যদিও অনুমান করতে পারি, বিশ্বকর্মাও যদি করে থাকেন, তবে তিনি বা তাঁদের শ্রেণীরা এই পৃথিবীর মানুষ। তার থেকেও বেশি, এই ভারতেরই মানুষ। কিন্তু সেই তো এক কথাই ফিরে আসবে। মহাকালের নির্দয় রথচক্রতলে সকলই অতীত। গ্রহের অয়ন চলনের প্রতিটি মুহূর্তই অতীতের গর্ভে বিলীয়মান হয়ে চলেছে।

কিন্তু সেই সব শিল্পীদের জীবন-যাপন ধ্যানধারণা· কল্পনা ও সৃষ্টি আমাদের চিরকাল বিস্মিত ব্যথায় কেবল আহত করেই রাখবে। কোনো কবি কি পারেন না সেই দুরন্ত পরিশ্রমী অপরূপ কল্পনাশ্রয়ী শিল্পীদের বংশধরদের সন্ধানের জন্য একটা কবিতা লিখতে? ঐতিহাসিকেরা তো ধরা দিলেন না। যখন কোনারকের মন্দির দেখেছিলাম, তখনো এই ব্যাকুল বিস্মিত অনুসন্ধিৎসা আমার মনে জেগেছিল।

তারপরে শেষ কথা, মন্দিরগাত্রে কেন এই অকুণ্ঠ জীবনলীলা?

অনেকেই নানান কারণ দেখিয়েছেন। স্বর্গীয়, ধর্মীয়, চিত্তশুদ্ধিকরণ, কাম রাজসিক বিলাসিতা, এমন কি কারো কারো মতে, প্রাচীনকালে এই সব সৃষ্টিই ছিল কামসূত্রের শিক্ষা। আবার অনেকেই অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন, অশ্লীল, কদর্য, বিকৃত। স্বয়ং বলেন্দ্রনাথও কোনারক মন্দির সম্পর্কে এক নিবন্ধে এক জায়গায় 'কুৎসিত কল্পনা' বলেছেন, আবার সেই নিবন্ধেরই অন্য জায়গায় তিনি যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারছি না ঃ 'তবে কি মায়া? একি এই সংসার খেলার একটা রূপক? বুঝান যে, চারিদিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবি হৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এই-রূপ ভাস্কর্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না।—বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এ পিঠ ও পিঠ, শুধু ভিতর বাহির। শুধু দেহ মন।'···

বলেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই আমি কল্পনা করেছি, খাজুরাহোর প্রতিটি মন্দিরই বিশ্বের প্রতিক। জীবন যৌবন যুদ্ধ গৃহ সংসার পশুপালন, জীবন নিরন্তর আপন প্রবাহে চলেছে। আর এই চলমান বিশ্বরূপের অন্তরে, আমাদের হৃদয়ের হারানো বিশ্বাস অবস্থান করছে, যাকে খুঁজে ফিরছি জীবনকাল ধরে।

এই বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে যে নৃত্যের মহোৎসব শুরু হতে চলেছে পরবর্তী অংশে সেই চিত্র আঁকব।

boiRboi.net

*

অতঃপর নৃত্যের মহোৎসব এই বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে। যা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। কেবল বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণেই বা বলি কেন? বাউলের 'অধর ধরার' অঙ্গনে বলতেই বা বাধা কোথায়। একদিক থেকে তো অধর ধরারই সামিল। শাস্ত্রীয় নৃত্য যে! ক্লাসিক্যাল ড্যান্স বলতে ওই কথাটাই বুঝেছি। অতএব, অধিকার অনধিকারের জিজ্ঞাসাটা আবার ফোঁস করে উঠতে চাইছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের বুঝি না কিছুই। কাকে বলে ভরতনাট্যম, কলুকের রূপ আর ব্যাখ্যাই বা কী, দেশের সঙ্গে নাম মিলিয়ে কোন্‌টি ওড়িশি বা কুচিপুড়ি, আমার কাছে এ সবই কিছু নাম ছাড়া আর কিছু না।

কিন্তু কেবল নামের ফেরে মানুষ ফেরে, সেও তো ভাবি বেয়াকুফি। যে মন্ত্র তন্ত্র জানে না, সে পূজায় বসতে না পারে, প্রতিমা দেখে মুগ্ধ হতে বাধা কোথায়? সাধন ভজন না জেনেও যে ধ্যানী, সে কবি। এমন কি সে কখন বীভৎস কিছু আঁকে, তখনো শিল্পীর মুগ্ধতাজনিত। সে-গীত তো আমি আগেই গেয়ে রেখেছি। আমি তাত্ত্বিক না। সমালোচকের ছুরিকাঁচি নেই আমার হাতে, যা দিয়ে ছিঁড়ে কেটে দেখাতে পারি ভালো মন্দ। বিজ্ঞ নই, যে ব্যাখ্যা করি। রসিকও না, যে জায়গা বুঝে হাততালি দিয়ে বলি, বাহ্‌বা! বাহ্‌বা! কেয়াবাৎ। আমি ছুটে এসেছি, খাজুরাহোর বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে, মুক্তমঞ্চে নৃত্যের মহোৎসবে। সেই হিসাবে, আমি রসিকলাল নই কোনো মতেই। মুগ্ধলাল—যাকে বলে মুগ্ধ-প্রাণ।

শিল্পীদের নামের তালিকা আমার হাতে। তার আগে অবিশ্যি একটি কথা। উৎসবের শুরুর তারিখ ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ পর্যন্ত। কিন্তু প্রথম দিকের তিন দিনের উৎসব দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেনি। কথক নৃত্যের শুরুতেই দেখেছি 'সরস্বতী বন্দনা'। দেখেছি বললে ভুল বলা হয়। জেনেছি কলকাতার এক উচ্চ-মানের কথক নৃত্যশিল্পীর কাছ থেকেই। এই জানার বিষয়ে, একদিক থেকে তিনি আমার গুরুর কাজ করেছেন। তাঁর কথায় আমি পরে আসছি। তবু, নিজে নৃত্যের শিল্পী না হয়েও, তাঁকে গুরু বললাম এই কারণে, আমি গুরুবাদীদের সেই গানটিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, 'গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন! তোর অধিক (অঠিক?) গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।' সেই হিসাবে গুরুর কোনো বয়স নেই, শ্রেণী নেই। যাঁর কাছে যে-টুকু অজ্ঞাতের সন্ধান মেলে, তিনিই গুরু।

গুরুর তিন দিনের উৎসব যে আমি দেখতে পাইনি, তার কারণও সরস্বতী বন্দনা। কাজটা খাজুরাহোতে গিয়ে, শিল্পীদের সঙ্গেই সেরে নিতে পারা যেতো। যে-যাই বলুক, সরস্বতী বন্দনাটা আমার ক্ষেত্রে অনিবার্য, এবং অনিবার্যভাবেই তার আয়োজন গৃহাঙ্গনেই বরাবর ঘটে থাকে। গৃহোৎসব বলেও একটা কথা আছে তো। ওটা ধারাবাহিকতার অন্তর্গত।

তিন দিনের নামের তালিকায় দেখছি, শোভনা রাধাকৃষ্ণণ—ভরতনাট্যমের শিল্পী রাজা এবং রাধা রেড্‌ডি যুগল—কুছিপুড়ি নৃত্যের শিল্পী, কুমারী রসিকা খান্না—ভরতনাট্যম্‌। চতুর্থ দিনে, ওড়িশি নৃত্যের শিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী আমার সামনে। ভরতনাট্যমের সঙ্গে কোথায় কতোখানি এই নৃত্যের তফাত আমি খুব পরিষ্কার বুঝতে পারি না। পোশাক এবং নাচের সঙ্গে গানের পদ ছাড়া। কিন্তু

আমার বিমোহিত বিস্ময় সেখানে না। এই সব কীর্তিমতী শিল্পীদের স্ব-নামে পরিচয় সর্বত্র, নন্দিত তাঁরা দেশে দেশে, অথচ ব্যতিক্রম ঘটে যায় যেন এই মন্দির প্রাঙ্গণে।

আমি দেখি খাজুরাহোর কৃষ্ণনীল আকাশে প্রায় পূর্ণ চন্দ্র, জ্যোৎস্নালোকের ছায়া ও মায়ায় মন্দিরের বিশ্বরূপ গাত্র থেকে সুরসুন্দরী নেমে আসে অপরূপ নৃত্যের ছন্দে। দিনের আলোয় যাদের দেখে সন্দিগ্ধ ছিল মন, তুমি কি কেবল শিল্পীর হাতে গড়া পাথরের মূর্তি অথচ যেন পেয়েছিলাম নিঃশ্বাসের সুগন্ধ স্পর্শ এখন রোমাঞ্চিত হয়ে দেখি, তুমি মূর্তিমতী রমণী নেমে আসো সেই দূরকালের নর্তকীর বেশে।

সুরসুন্দরী অথবা অপ্সরা? পুরাণকার—প্রাচীন ঐতিহাসিকরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন সুরলোক-স্বর্গলোক-অন্তরীক্ষের সন্ধান, মানবেরই ভিন্ন নামের বিভিন্ন জাতির পরিচয়। বিভিন্ন রমণীকুলেরই নানা নাম, সুর-সুন্দরী বা অপ্সরা যে-নামেই ডাকি। চির অপরিচয়ের অন্ধকারে ঢাকা, নামহীন সেই শিল্পীরা হাজার বছর আগে, তোমাকে অবিকল স্থাপিত করে রেখে গিয়েছিলেন এই মন্দিরগাত্রে। নিশিথিনী তুমি, অভিসারিকা, হাজার বছরের পাথর প্রতিমা, এই জ্যোৎস্নালোকের মাথায় নেমে আসো রক্তমাংসের মানবী শরীর নিয়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে সঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ঃ

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্‌॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয়জগদীশ হরে॥

নৃত্যের ছন্দে তুমি দেববন্দনা কর। কিন্তু দেখছি, খাজুরাহোর এই বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে চন্দ্রই সর্বাগ্রে। চন্দ্রাহত এক রমণীই, এইসব মন্দির সৃষ্টির প্রেরণাকারী চান্দেলা রাজবংশের প্রথম পুরুষের জন্মদাত্রী। ইতিহাসের বাস্তবতা যখন তার কালের ঝাপটায় বাতাহত হয়, তখন কি জন্ম নেয় কিংবদন্তী? কিংবদন্তীর আড়ালে কি লুকিয়ে থাকে বাস্তবের কোনো সংকেত বা ইশারা?

সে-বিচারের ভার থাক ঐতিহাসিকের ওপর। কারণ চান্দেলা রাজবংশের ইতিহাস দশম শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে শুরু। অবিশ্যি ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাতে, কিংবদন্তী প্রচার হাজার বছরের মুখ চেয়ে থাকে না। কিংবদন্তী জন্ম নেয় যুগে যুগে, এমন কি আধুনিককালেও।

এই মুহূর্তে, এই মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে, মন্দিরের পটভূমিতে, মহিমময়ী নর্তকীর অপরূপ নৃত্যের সুষমায়, সেই কিংবদন্তী যেন এক স্বপ্নের মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কিংবদন্তীর নায়িকা এক ষোড়শী রূপবতী। তার নাম হেমবতী। গহরওয়ারের শাসক ইন্দ্রজিতের পারিবারিক পুরোহিত হেমরাজের কন্যা। বিয়ে হয়েছিল শৈশবেই, কিন্তু ইন্দ্রের অভিশাপে সে বিধবা হয়েছিল অল্প বয়সেই। কিংবদন্তী তো! সব কথাই তার মনের মতো। কারণ কেন ইন্দ্রের অভিশাপ, কী বা নাম ছিল হেমবতীর স্বামীর, কিংবদন্তীতে তার কোনো উল্লেখ নেই। দিনে দিনে হেমবতী যতো বড় হয়ে উঠতে লাগলো, যৌবন আর রূপ-রাশিও তাকে করে তুললো অপরূপা। কল্পলোকের সুরসুন্দরীর মতোই।…

এক গ্রীষ্মের রাত্রে, চোখে তার ঘুম নেই, অনুভূতির জগতে এক অস্থিরতা, এক আশ্চর্য অবোধ বাসনা তার প্রাণে। ঘর ছেড়ে সে গেল এক পদ্মপুকুরে, নাম যার রতিসায়র। রতিসায়রের শীতল জলে ডুব দিয়ে সুখী ও উজ্জ্বলতর হলো। দেহের

boiRboi.net

বস্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে, নগ্ন সুন্দরী রতিসায়রের জলে কেলি করতে লাগলো। পদ্মফুলবন্ধু চন্দ্র আকাশ থেকে রমণীর সেই রূপলাবণ্য দেখা মাত্র, বিদ্ধ হলেন মদনশরে। নেমে এলেন ধরাতলে, আলিঙ্গন করলেন হেমবতীকে। হেমবতী যেন জানতেও পারলো না, মদির আচ্ছন্নতায় সে এক পুরুষের দেহলগ্ন। কোথা দিয়ে রাত্রি কেটে গেল, দুজনের কারোরই খেয়াল হলো না। সূর্যোদয়ের পূর্বে খেয়াল হলো চন্দ্রের, তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করলেন। হেমবতীরও তখন সংবিত ফিরলো, যেন সেই বিদায়কে সে অনিবার্য ভাবেনি, তাই চন্দ্রকে অভিশাপ দিতে গেল। চন্দ্র বললেন, 'শোন সুন্দরী, আমাকে অভিশাপ দিও না, বরং জেনে সুখী হও, তোমার গর্ভজাত সন্তান হবে এক সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী, দুর্ধর্ষ রাজা।'…

হেমবতী বললেন, 'কিন্তু স্বামী-হীনা আমি, কী গতি হবে আমার এই কলঙ্কের?' …চন্দ্র বললেন, তোমার ছেলের জন্ম হবে কর্ণবতী নদীতীরে। ওকে নিয়ে যেও খাজুরাহোতে, থেকো ত্যাগ ও সাধনার মধ্যে। মহোবাতে ও রাজত্ব করবে। ওর ভাগ্যে আছে পরশপাথর, যা দিয়ে লোহা স্পর্শ করলে সোনা হবে। কালিনজর পাহাড়ে ও এক বিরাট দুর্গ তৈরী করবে। ছেলের ষোল বছর বয়সের সময় তুমি যজ্ঞ করলে, তোমার সকল পাপমোচন হয়ে যাবে।'…

চান্দেলা রাজবংশ প্রথম থেকেই চন্দ্রোপাসক। কিংবদন্তী—কিংবদন্তীই, তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠে না। এখানে কর্ণবতী নদীর কথা আছে, কিন্তু হেমবতী, কুন্তীর মতো লজ্জা-মোচনের দায়ে, পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেয়নি। আমি ঐতিহাসিক না, কিন্তু পুরাণকার ইতিহাসবেত্তাদের সংকেতগুলো ভুলতে পারি না। তাই আমার একান্ত মানব মনে স্বতোৎসারিত জিজ্ঞাসা, আকাশের চন্দ্রের কুহেলিতে ঢাকা কে সেই পুরুষ, যিনি অপরূপ রূপসীর মনোহরণ করেছিলেন? ভাবতে ইচ্ছা করে, তিনি ছিলেন চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল পুরুষ, হয়তো ছিলেন মহাপরাক্রান্তশালীও এবং রমণী-মোহন। চিরকাল থেকে গেলেন ইতিহাসের আড়ালে।

থাক কিংবদন্তী, ইতিহাসও থাক। জ্যোৎস্নাখচিত খাজুরাহো, খাজুরাহোর মন্দির এখন স্বপ্নলোক। আর সেই স্বপ্নলোক থেকে নেমে আসে নর্তকী, খ্যাতনামা নর্তকীর ছদ্মবেশে। হেমবতীর কথা ভুলি কেমন করে? এই যে দেখী, নর্তকী হাঁটু মুড়ে, দু পায়ের অপরূপ ভঙ্গিতে নিতম্বে বাঁক নিয়ে বসে, চন্দন বাটে ও বক্ষে লেপন করে, শুনি জয়দেবের রাধার স্বগতোক্তি গান, তখন আমার ব্যাকুল চোখ বারে বারে ছুটে যায় জ্যোৎস্নালোকের মায়াময় মন্দির গাত্রে। এই নর্তকীকে যে আমি অবিকল দেখেছিলাম পাথরের মূর্তিতে, যদিও তখনো ধন্দ ছিল, সে কি কেবলই পাথর? কোনো কালে ছিলে না কি রক্তমাংসের মানবী, দাঁড়াওনি এসে শিল্পীর সামনে?

দাঁড়িয়েছিলে নিশ্চয়ই। হয় তো এই খ্যাতনামা নর্তকীর মতো এমন জনসমক্ষে এত আয়োজনের মধ্যে না। দেবতার বিগ্রহের পূজারিণী, তুমি ছিলে দেবদাসী। উত্তর মধ্যভারতের কথা জানি না, দক্ষিণ ভারতে মন্দিরেই তোমার প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে, পূর্বাঞ্চলের উড়িষ্যায়। কিন্তু খাজুরাহোর সেই নামহীন শিল্পীরা কোথায় তোমার দেখা পেয়েছিল? চান্দেলারাজের মহোবা বা কালিনজরের প্রমোদ-কক্ষে? অথবা সেখানকার মন্দিরেও তোমরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলে?

boiRboi.net

তা-ই যদি হবে, শিল্পী এমন নিবিড়রূপে তোমাকে গড়েছিল কেমন করে ? সকল শিল্পীকেই আমার জিজ্ঞাসা, যে কখনো আসেনি তার নিবিড় ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে, সে কেমন করে রমণীর এই জীবন্ত মূর্তি গড়েছিল ? সেই জন্য এই নামহীন শিল্পীদের উদ্দেশ্যে আমার বলতে ইচ্ছা করে "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ !"

এই মুহূর্তের একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। বর্তমান ভোপাল শহর থেকে প্রায় পনের কুড়ি কিলোমিটার দূরে ভোজপুর গিয়েছিলাম। সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় আছে এক শিব মন্দির। মহাদেবের মন্দিরের বিগ্রহ মাত্রেই লিঙ্গ। সেই মন্দির আর তার ভাস্কর্য দর্শনমাত্রই খাজুরাহোর মন্দির সমূহের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মন্দিরটি নাকি ভোজরাজের আনুকূল্যে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, মন্দিরটি অসমাপ্ত। সম্মুখের অংশের কাজ অনেকখানিই শেষ করা গিয়েছিল, কিন্তু খিলানের উপরিভাগে, শিখর পর্যন্ত খাড়া করা হয়ে ওঠেনি। আমার আজ পর্যন্ত দেখা সমস্ত শিবলিঙ্গের মধ্যে এইটি কেবল সুবৃহৎ না, পাথরের এমন মার্জিত উজ্জ্বলতা আর কোথাও দেখিনি।

ভোজপুরের এই মহাদেব মন্দিরের দুই পাশে ও পিছনের দেওয়ালে যেন কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র। বিভিন্ন রমণী পুরুষের মূর্তিগুলো যথাস্থানে প্রোথিত করা হয়ে ওঠেনি, মন্দিরের বিশাল চত্বরের আশেপাশেই বহু অতুলনীয় ভঙ্গির মূর্তিগুলো ইতস্তত ছড়ানো। কিন্তু এক বাস্তব সূত্রের সন্ধান এখানেই দেখতে পেলাম। মন্দিরের পাহাড়ের প্রায় সমতল পাথরের জায়গায় জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রেখেছে। সেই সব পাথরের বুকে সুতোর মতো রেখায় নানান নকশা আঁকা রয়েছে। খিলান, অথবা অন্তরালের স্তম্ভ এবং এমন কি মূর্তির নকশাও। যা দেখলেই স্পষ্টত অনুমান করা যায়, সূক্ষ্ম ছেনি হাতুড়ি দিয়ে প্রধান শিল্পী নকশাগুলো এঁকেছিলেন, পরবর্তী কর্মীদের সে সব আর বৃহৎ যন্ত্রে কাটা হয়ে ওঠেনি শিল্পীদের খোদাই কাজ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। মন্দির আর তার মূর্তিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। খাজুরাহোর আর ভোজপুরের শিল্পীগোষ্ঠী নিশ্চয়ই অভিন্ন ছিল।

নে-পাহাড়ের ওপর এই মন্দির, তার গায়ে এখনো পাথর কেটে বসানো বাঁধের চিহ্ন স্পষ্ট। বেত্রবতী নদী (স্থানীয় ভাষায় বেতোয়া) এখন প্রবাহ বদলিয়েছে। কোনো এককালে এই পাহাড়ের কোলে দিয়েই প্রবাহিত ছিল, বাঁধ দিয়ে তাকে সামলাতে হতো। কোনো কোনো মতে, বেত্রবতীর জলকে ধরে রাখার জন্যই পাহাড়ের গা কেটে এই বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল। আমি ভাবি বেত্রবতীর জলোচ্ছ্বাসের কারণেই, মহাদেব মন্দিরের কাজ কি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল ?

কিন্তু তার থেকেও আমার বড় লাভ, ভোজপুরের পাথরের গায়ে শিল্পীদের কাজের প্রাথমিক সূত্রপাতের চিহ্ন। খাজুরাহোর আশ্চর্য মন্দির ভাস্কর্য যেন জীবন্ত প্রতিমা-সমূহ কেবল শিল্পীর আবেগের সৃষ্টি না। নিখুঁত মাপজোক বৈজ্ঞানিক ভাবনাও ছিল। তিলে তিলে গড়া তিলোত্তমা। পৃথিবীর কোনো শিল্পই অনায়াস সাধ্য না।

ফিরে যাই নৃত্যের মহোৎসবে। পৃথিবীর সব শিল্পের মতো নৃত্যও নয় অনায়াসসাধ্য যা কেবল চোখের সামনে রচনা করে এক স্বপ্নের জগৎ। আপাতস্তব্ধ মুগ্ধ-প্রাণের গভীরে রক্তে দেয় দোলা। খ্যাতনামা যে-নৃত্য-শিল্পীকে মুগ্ধ বিস্ময়ে

দেখছি, তাঁর এবং তাঁদের সকল কলাকুশলতা আর অপরূপ ভঙ্গিই দেখেছি মন্দিরগাত্রে। এই মন্দিরসমূহের বয়স যদি হয় হাজার বছর তবে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সৃষ্টি দু হাজার বছরের কম না। তখন হয়তো জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদবন্ধের সৃষ্টি হয়নি। হয়নি হয় তো পরবর্তীকালে বাদশাহী আমলে কথকের সঙ্গে ঠুংরি বা গজলের সৃষ্টি। কিন্তু ছিল রাগ তাল ভাব, ছিল ধ্রুপদ ধামার গীতিমালা। ছিল শব্দম্ পদম্ বর্ণম্ শৃঙ্গার।

পৌরাণিক বললেই ধর্মের কথা আসে এবং বলা হয়ে থাকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সকল সৃষ্টির মধ্যেই ধর্মীয় সংকেত। ইতিহাস বিচারের আলোচনার ক্ষেত্র এটা না কিন্তু পৌরাণিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ মাত্রেই মাইথলজি না। শাস্ত্রীয় নৃত্যেও অতএব, কালে ও কালান্তরের মানুষের, আপন আপন যুগের অবদান আছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভরতনাট্যমও যুগে যুগে তার আপন চরিত্রকে মাধুর্য মণ্ডিত করার জন্যই কিছু কিছু পরিবর্তন করেছে। যেমন ওড়িশি নৃত্য। একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে নিশ্চয়ই অর্জন করেছে, কিন্তু তার প্রকৃত জন্ম ভরতনাট্যমের গর্ভ থেকে নয় কি?

শাস্ত্রীয় নৃত্যের সংজ্ঞায় দেখছি তিনটি বৈশিষ্ট্য। এক ঃ নৃত্ত। দেহের নানা ভঙ্গিতে, শিল্পীর একান্ত আপন সৌন্দর্যকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, অপরের জন্য না। দুই ঃ নৃত্য। বিশেষ একটি বিষয়কে দেহের ও মুখের নানা ভঙ্গিমায় ও অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা। হাতের ও দেহের নানা প্রতীকী মুদ্রা নৃত্যের অঙ্গ। তিন ঃ নাট্য। এর সঙ্গে হাত পা মুখের ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি কেবল মাত্র না। এর সঙ্গে মিশে থাকে এক নাটকীয়তা, চোখের ইশারায় ঠোঁটের নানা অভিব্যক্তিতে প্রতীকী মুদ্রায়, আর এর সঙ্গেই যুক্ত হয় গীতি আলেখ্য। আরো আছে তাণ্ডব ও লাস্য।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের আর এক অঙ্গের নাম "অভিনয়"। অঙ্গের নানা ভঙ্গি, সঙ্গীত ও কথা, পোশাক ও সাজ ভাব ও আবেগ, এগুলো "অভিনয়" নৃত্যের অঙ্গ। অভিনয় নৃত্য পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই করতে পারেন। যেমন কথক। কি ভরতনাট্যম প্রধানত নারীর জন্যই। এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বাণীতে যেমন থাকে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ, নৃত্যের মূল ভিত্তিও তাই। আমায় মনে হয়েছে, মন্দিরগাত্রে যতগুলো নর্তকীর মূর্তি দেখেছি, সবগুলোতেই ভরতনাট্যমের ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি। এবং সম্ভবত মন্দিরের দেবদাসীদের সকলের আয়ত্তেই ছিল এই ভরতনাট্যম। কিন্তু গানগুলো ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হলেও, তা মূলত প্রেম সঙ্গীত। হয় তো সেই প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তাহে।

অতীতে মন্দিরের পাথরের বিগ্রহের রক্তে দোলা লাগাতো কী না জানি না, ইতিহাস বলে, মন্দিরের রক্তমাংসের পূজারীরা সকলেই নির্বিকার থাকতে পারেননি। যেমন আমিও নির্বিকার নই পাথরের নর্তকীকে দেখে, এবং নই রক্তমাংসের আশ্চর্য সুরসুন্দরীবেশিনী খ্যাতনামা নর্তকীদের দেখে। তবে হায়, কাল বহে যায়! কমলা এবং পদ্মা সুব্রহ্মনিয়ম ছাড়া,প্রায় সব খ্যাতনামা ভরতনাট্যম শিল্পীদের অঙ্গে লেগেছে, অস্তাভার রক্তিমতা। যদিও যামিনী কৃষ্ণমূর্তির সম্পর্কে একথা বলতে এখনো আমার জিভ জড়িয়ে যায়। ডিসেম্বরে তাঁকে দেখেছি হাফিজ আলি স্মরণোৎসবে, রবীন্দ্র

boiRboi.net

সদনে, তারপরে ফেব্রুয়ারিতে খাজুরাহোর মন্দিরের পটভূমিতে। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি নৃত্য-নাট্যের নাম কুচিপুড়ি। নামোৎপত্তির কারণ কুচিপুড়ি গ্রাম থেকেই এই নৃত্য-নাট্যের উদ্ভব। অতীতে পুরুষরাই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতেন, পরবর্তীকালে এগিয়ে আসেন মহিলারাও। তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম নাম, আবার সেই যামিনী কৃষ্ণমূর্তি'ই!

কত্থক প্রধানত উত্তর ভারতের। তার বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে প্রধানত কয়েকটি ভঙ্গিতে ও আচরণে। ঠাট, সালামি, অমদ, ঠাট লয়ের টুকরা, টাটকর। দুন লয়ের টাটকর টুকরা নাচ টুকরা, সঙ্গীত টুকরা, তোড়া, তবলবোল, পরমেলু গমনিকস, গত ভাও। গত নিকসবাণী গত ভাওগীতিকাব্য।

কত্থকের জগতে এখনো বিরজু মহারাজই মহারাজা। কিন্তু তাঁর চোস্ত পাঞ্জাবি বস্ত্রের কোমরবন্ধনী ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় কত্থক একদা যে-রূপেই জন্মলাভ করে থাক বাদশাহী আমলে তার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। দেখছি, কত্থকের সঙ্গে যেমন "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্" যেমন চলে তেমনিই চলে, "কাহে রোতক ডাগর প্যারে নন্দলাল মেরী"-র ঠুংরি এবং ভোজপুরী ব্রজভাষা, সব রকমের ভাষার গানই ব্যবহৃত হয়। বোধহয় হয় না কেবল বাঙলা।

কিন্তু পনেরই ফেব্রুয়ারিতেই হরিষে বিষাদ। সেদিন ছিল কবিতা শ্রীধারনীর ভরতনাট্যম। আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো, বজ্র বিদ্যুৎসহ খাজুরাহোর আকাশ জুড়ে নামলো বৃষ্টি। ষোল তারিখে এসে পড়লেন বিরজু মহারাজ। হায়, সেদিনও বৃষ্টি। কবিতাকে আগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম সব থেকে বয়ঃকনিষ্ঠা শিল্পী চলে যাবেন কী না। বলেছিলেন, যাবো না। মহারাজের নাচ দেখবো। কিন্তু বৃষ্টি?

এই বৃষ্টিই মধ্যভারত ট্যুরিজম বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের মেজাজ গোলমাল করে দিল। খাজুরাহোর সাহেবী হোটেল—হোটেল চান্দেলার মিটিংরুমে তিনি নাচিয়ে দিলেন বিরজু মহারাজকে। হাজার হাজার দর্শকের জায়গায় সে ঘর তো সিন্ধুতে বিন্দু। পরের দিনই মাইকের চিৎকার ফেটে পড়লো খাজুরাহোর সদরেঃ "বাগচি (ডিরেক্টর ট্যুরিজম সঃ ভাঃ) মুর্দাবাদ। অফিসারশাহী নহি চলে গা / বিরজুকো নাচ চাহি মন্দির মে।"

আমি সুখী হতাম, যদি জনসাধারণের এই দাবি ও ধিক্কারগুলোকে মিথ্যা বা মতলবী বলতে পারতাম। কেন না, সতেরো তারিখের সকালবেলায় যখন এই কাণ্ড চলেছে, আমি তখন বিরজুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী তাঁর অভিপ্রায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমি আজকের রাতটাও থেকে গিয়ে শেষ চেষ্টা করবো।"

শিল্পীজনোচিত বাক্য বটে। সতরো তারিখে কুমকুমলালের ওড়িশি নৃত্য ছিল আর সেই তারিখেই কবিতা, কুমকুম এবং বিরজু তিন জনের অনুষ্ঠানই হয়েছিল। অর্থাৎ একের মধ্যে তিন। কবিতা আর বিরজু একাধিক দিন থেকে তাঁদের কথা রেখেছিলেন। ট্যুরিজমের কর্তাদেরও মুখরক্ষা।

শেষ দিন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি।

শেষ করার আগে, দুটি কথা। কবিতা শ্রীধারণীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

boiRboi.net

কলকাতায় নাচতে আসুন না কেন ? জবাব ঃ "ডাকছে কে ?" আমাকে যিনি লিখে নাচের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা করবার সুযোগ দিয়েছেন, তিনি কলকাতার কত্থক শিল্পী, অমিতা দত্ত। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নালোকিত খাজুরাহোর থেকে তাঁকে কি নেমে আসতে দেখতে পারি না ?

জবাবটা দিতে পারেন দিল্লি ভোপালের ট্যুরিজম বিভাগের কর্তারাই।

এত কথা বললাম, তবু মন্দিরের কথা ভুলতে পারি না। নৃত্যের মহোৎসব সেখানেই, সেখান থেকেই তারা নেমে আসে, খ্যাতনামা শিল্পীদের ছদ্মবেশে। এই স্বপ্ন আমার গৌরবের।

*

এবার রূপ হতে রূপান্তরের ভিন্ন হাটে। একের অপরূপ ছন্দ ও তাল থেকে যৌথ নৃত্যের এক রূপ, মিলিতছন্দিত-মত্ত-পদচারণা ও দেহ হিল্লোলের বন্য সুষমায়, সেই রূপান্তরের হাটে বাজে জগঝম্প, সমবেত স্বরের গান বাতাসে ভর করে, মুখরিত করে আকাশ। বাঁশি বেজে ওঠে যেন সেই এক কোন দূরকালের আদিম আরম্ভ থেকে।

ইংরেজীতে কী বলতে হবে এই জীবনের নাচ ও জয়গানকে ? কলেকটিভ ? হ্যাঁ, যৌথ সে-কথা তো প্রথমেই উচ্চারণ করেছি। কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্যের মতো, এই যৌথ নাচ বাজাবাজনা গানেরও কি নেই কোন নির্দেশ ? নেই উৎসর্গ ? নেই কি আমাদের বুদ্ধির প্রতি কোনো আবেদন ?

আছে, এই আমার বিশ্বাস। যে বিশ্বাস থেকে নগ্নতার দিক থেকে, অশুভ গন্ধ-প্রাপ্ত ঘোড়ার মতো ফিরিয়ে নিতে পারিনি ঘাড়, লোম খাড়া করে পারিনি নাক কোঁচকাতে, সেই বিশ্বাস থেকেই বুঝেছি, যৌথ নাচে গানে বাজনায়, উচ্চরোলের নাটকীয় উল্লাসেও রয়েছে এক কাব্যের নির্দেশ। রয়েছে জীবনকে আহরণের কঠিন প্রয়াস, আপনাকে উৎসর্গের এক বিশ্বাস-মত্ত উল্লাস।

"নগ্নতার চতুর্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্নপ্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য।...নগ্নতায় আত্মা পরিব্যাপ্ত।" সেই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্যকে, মন্দিরগাত্র থেকে নেমে আসতে দেখেই নৃত্যপটিয়সী শিল্পীকে কালের নির্ণীত স্বরূপে, যেখানে আত্মোৎসর্গ মৌল প্রেরণায়। সে অবদান একার। বড়জোর যুগলের।

এ রূপান্তরের হাট ভিন্ন, যদিও মনে করি তার আত্মোৎসর্গও মৌল প্রেরণাজাত। কিন্তু এখানে স্তনে চন্দন লেপন, শৃঙ্গারে বিবিধ ভঙ্গি নেই। এখানে যৌথ জীবনের শিকার উল্লাস, বীরত্বের হুংকার, দলবদ্ধ মিলনের গান অরণ্যে পর্বতে জীবনযাপনের নাটকীয় ঘটনার প্রবাহ। এখান থেকে মন্দির দূরে, এখানে আছড়িয়ে পড়ে বিরাট তরঙ্গ, ধ্বনি ও শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ। তখন সে প্রাঙ্গণ আর প্রাঙ্গণ থাকে না, বিন্ধ্যাচলের স্তব্ধ চূড়া জেগে ওঠে বৃহৎ মাদলের ডিমি ডিমি শব্দে, অরণ্যের প্রহেলিকায় বেজে ওঠে উৎসবের করতালি।

মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের সচিত্র প্রোগ্রামে সেই দেশের আদিবাসীদের কোন চিত্র ছিল না। মন্দির প্রাঙ্গণের মূল প্রোগ্রামের সঙ্গে, ক্ষুদ্রাক্ষরে ঘোষণা ছিল শাস্ত্রীয় নৃত্য

boiRboi.net

ব্যতীতও বাড়তি আকর্ষণের মধ্যে যা থাকবে, তা হলো "মীনাবাজার" "ট্রাইবাল ড্যানসেস অ্যারাউণ্ড এ ফায়ার" আর তার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে "ওয়াইলড লাইফ সাংচুয়ারিজ" এবং বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর নিকটবর্তী পান্নার হীরকখনি।

মনে করি না, এটা আমার দুর্বলতা, যে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সাক্ষাৎ পাবার কৌতূহল আর উৎসাহ আমার দীর্ঘকালের। সচিত্র প্রোগ্রামটি দেখবার আগে, কলকাতায় যখন আমার বন্ধুর মুখে, আদিবাসীদের নৃত্যানুষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম, তখন আমার মুগ্ধব্যাকুল প্রাণের যতোখানি আকর্ষণ ছিল মন্দির প্রাঙ্গণে শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠানের প্রতি, ঠিক ততোখানিই ছিল আধিবাসীদের আগুন ঘিরে নাচের প্রতি। বরং বলা ভালো, আদিবাসীদের অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ কিছু বেশিই ছিল, কারণ তাঁদের উৎসব অনুষ্ঠান দেখাটা আমাদের ভাগ্যে জোটে কালেভদ্রে। শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীদের নাচ ভারতের যে-কোনো বড় শহরেই প্রায়শ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে। যথা, ফেব্রুয়ারিতে খাজুরাহোতে যাবার আগেই আমাদের যুগের দুই মহত্তম শিল্পীর নাচ দেখেছি ডিসেম্বরে। রবীন্দ্র সদনে। বিরজু মহারাজ—কথকের যিনি সম্রাট, ভরতনাট্যমের সম্রাজ্ঞী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি—উভয়েই কলকাতার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন হাফিজআলি স্মরণোৎসবে।

বলবো না, তাঁদের নৃত্যানুষ্ঠান দর্শন খুবই সুলভ ব্যাপার। কমারশিয়াল আর নন-কমারশিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোর দৌলতে, আমরা শহরবাসীরা তবু তাঁদের দেখা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। কিন্তু যাঁরা আছেন ভারতের নানা অরণ্যে পর্বতের দিকে দিকে ছড়ানো, তাঁদের উৎসব অনুষ্ঠান আমাদের কাছে একান্তই দুর্লভ। তাও আবার ট্যুরিজম বিভাগের ব্যবস্থাপনায়। সেদিক থেকে মধ্যপ্রদেশের ট্যুরিজম ডিরেক্টরেটকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারছি না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দু-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা না করাটাও অসম্ভব। ডিরেকটরেট অফ ট্যুরিজম মধ্যপ্রদেশ, অথবা খোদ আই টি ডি সিকেই বলি, তাঁদের প্রচারের ধরন-ধারণ দেখে, স্পষ্টই বোঝা যায়, দেশের মানুষের থেকে, বিদেশের মানুষকে আকর্ষণ করাটাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এতে আপত্তির কিছু দেখি না। আমি বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের বিষয়টি বাদ দিয়েও বলতে পারি, ভারতবাসী হিসাবে এটা আমাদের গৌরব, আমাদের আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি বিদেশের বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। জগৎসভায় আসন তো কেউ আমাদের এমনি এমনি দেবে না। নিজেদের মহৎ ঐতিহ্য দিয়েই তা আমাদের লাভ করতে হবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, হিসাবের ভাগাভাগিটা কোন্ অঙ্কের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে? দেশের মানুষকে একেবারেই দূরে হটিয়ে? অথবা দেশের মানুষ কি তাঁদের কাছে কেবল প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের কিছু অফিসার এবং কিছু সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি?

আমার কথা যে ভুয়া না, তার প্রমাণ খাজুরাহোর সাধারণ মানুষই তাঁদের শ্লোগানে উচ্চারণ করেছেন, 'অফিসারশাহী নহি চলে গা।" বৃষ্টির কারণে বিরজু মহারাজকে কর্তৃপক্ষ চান্দেলা হোটেলের মিটিং রুমে নাচিয়ে, তাঁদের মূঢ় (?) বিদেশ-প্রীতি এবং অফিসারশাহীর প্রতি প্রীতির প্রবণতাকেই প্রমাণ করেছেন। তাঁরা ভুলে যান কেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতবাসী তাঁদের শিল্পকলা ঐশ্বর্য

boiRboi.net

বিষয়ে ছিলেন বঞ্চিত। এমন কি সে-সবই ছিল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। আজ যখন সুযোগ এসেছে, তখনো সেই ঐশ্বর্যের মহিমাকে আড়াল করে রাখতে হবে, কেবলমাত্র বিদেশীদের দোহাই দিয়ে, আর অফিসারশাহীর গর্বিত অধিকার দিয়ে ? কর্তৃপক্ষের অঙ্কে এতোটা ভুল হওয়া বোধ হয় উচিত না। তাঁরা কি দেশ-বিদেশের মানুষের মিলনক্ষেত্রও করে তোলার সুযোগ পেতেন না, এই সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ?

কিন্তু হায়, স্বাধীন স্বাধীন বলে এতো হাঁকডাকের পরেও দেশী সাহেবদের চিত্ত চরিত্র যেথায় ছিল, সেথায়ই আছে।

আজকের কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতার শীর্ষেই একটি ফটো বেরিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ওড়িশার কোরাপুটের আদিবাসী রমণীদের প্রতি করজোড়ে নমস্কার নিবেদন করছেন। আজ দরিদ্র হরিজন, আদিবাসীদের নিয়ে রাজনীতির উচ্চকণ্ঠ খুবই মুখরিত। রাজনীতির ব্যাপার তো, অতএব এর মধ্যে কতোখানি আন্তরিকতা, আর কতোখানি কেবলই আসন বাঁচানোর, পালটা আসন গড়বার কাজ গোছানো, জানেন কেবল রাজনীতির অন্তর্যামী। কিন্তু যে-কোনো দায়ে পড়েই হোক, শাসক এবং বিরোধী দলগুলো, হরিজন, এবং আদিবাসীদের কথা প্রত্যেকটি সভাতেই বলছেন। তবু, ক্ষুদ্র খাজুরাহো শহরের সকল সুখ-সুবিধা থেকে আদিবাসীদের কেন তিন চার কিলোমিটার দূরে একটি সামান্য ধর্মশালায় সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

আদিবাসী যৌথ নৃত্যের ও গানের আবেদন নিশ্চয়ই শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে আলাদা। কিন্তু সম্ভবত তাঁরাও শিল্পী হিসাবেই আমন্ত্রিত ছিলেন। তবে তাঁদের এমন বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল কেন ? কোনো টেকনিকাল কারণ থাকলে আলাদা কথা। হয় তো আদিবাসীরা দূরের ধর্মশালার ঘরের মেঝেয় দলা পাকিয়ে শুয়ে বসে ভালোই ছিলেন। কিন্তু যে-ভাবে তাঁদের থাকতে দেখেছি, নিতান্ত মানবিক কারণেই জিজ্ঞাসাটা মনে এলো।

এ প্রসঙ্গ এ পর্যন্তই থাক।

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বিচিত্র বর্ণাঢ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভৌগোলিক চিত্রের মধ্যেই তাঁদের গোষ্ঠীগত ভিন্নতা ফুটে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশ এমন একটি দেশ, যাকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো প্রদেশ। তার বিভিন্ন সীমায় বিভিন্ন আদিবাসী জনেরা রয়েছেন, এবং সকলেরই রয়েছে নিজস্ব বৈচিত্র্য। ওড়িশা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, প্রতিটি সীমান্তেই এই বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের ছড়াছড়ি। এক যাত্রায় আমাদের এই বিশাল দেশটির সর্বত্র ঘুরে বেড়াবো, এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। অথচ মনে মনে এমন একটি অলীক বাসনা ছিল।

বাসনা ছিল বিশেষ করে, খাজুরাহোর প্রাঙ্গণে যে-সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নৃত্যানুষ্ঠান দেখবো, তাঁদের সেই নাচ গান বাজনার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র খুঁজতে যাবো পাহাড় অরণ্যের বসতিতে। সেই বাসনা যে কেবল অপূর্ণ থেকে গেল তা নয় মাত্র অঞ্জলিভর পান করে ফিরে আসতে হলো তৃষ্ণার্ত হয়ে। সে তৃষ্ণা এতোই গভীর, মধ্যপ্রদেশের হাতছানি সদাই আমার চোখে। ডাক শুনছি তার নিরন্তর, সাড়া দেবার সময় কবে হবে, জানি না।

boiRboi.net

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন বিশাল আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে, আমার প্রথম কৌতূহল আর উৎসাহ জেগেছিল ছোটনাগপুরের এবং তার সীমান্তবর্তী ওড়িশার পাহাড় অরণ্যের আদিবাসীদের দেখে। তাঁদের চিনতে, জানতে বুঝতে, একবার না একাধিকবার আমি ছুটে গিয়েছি। দেখেছি সাঁওতাল সেখানে খুবই কম। প্রধানত মুণ্ডা এবং ওরাঁওদের বাস। তাঁদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে, সেই প্রথম আমার নৃতাত্ত্বিক এঙ্গেলস-এর "স্পেকটিক্যাল অফ প্রসটিটিউশন"-এর কথা মনে পড়েছিল। তাঁদের জীবনযাপনের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ আমাদের থেকে এতোই পৃথক, তথাকথিত সভ্য জগতের মানুষ আমরা দিশাহারা হয়ে যাই। তাঁদের অবারিত মেলামেশা, তাঁদের নাচগান পান ভোজন, তাঁদের সংক্ষিপ্তবাস, কলহাস্যে উৎফুল্ল উল্লাস, আমাদের সভ্যতার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে বুকে হাঁটা সরীসৃপের মতো। তখন সহজের পাশে আমরাই অসহজ। সারল্যের পাশে জটিল ও কুটিল। অনায়াস আনন্দ উচ্ছলতার পাশে মূর্তিমান উচ্ছৃঙ্খল। ফলে দূরত্ব বাড়ে, সন্দেহ আর শত্রুতা বাড়ে। অবিশ্বাস আর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অথচ তা হবার কথা না। পরস্পরকে বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে, সেখানে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অনায়াসে। সেখানে হাতের ইশারা, চোখের ইশারা অচল। সেখানে আমি যতো অনায়াস আর সহজ সে ততোধিক। সভ্যতার অঙ্গন থেকে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তেই তাই "স্পেকটিক্যাল অফ প্রসটিটিউশন"টি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। চশমা—এমন কি মহৎ সংস্কৃতিবানদেরও রক্তে মজ্জায়। ওটাকে ছিন্ন করতে, বিবেকের থেকেও বড় কথা আন্তরিকতা। সভ্যতার অহমিকাকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া। সংযম আর প্রেম সেখানে বুকের দু পাশে পাশাপাশি লীলা করে। রমণীর অনাবৃত বক্ষ সেখানে মহৎ। মত্ততা সেখানে অবসাদের পূর্বানুষ্ঠান না। চুম্বন সেখানে অপ্রচলিত। শহরে পোশাক পরা শহুরে মানুষ মাত্রই সন্দেহজনক, তাঁদের ধ্যান ধারণায় অশ্লীল। প্রাচীনতমকালের মাতৃতন্ত্র সেখানে এখনো সামাজিক রীতি। এই সব বৈপরীত্যকে মেনে নিয়েই, তাদের সঙ্গে আমাদের সার্বিক মিলনের সম্ভাবনা। অন্যথায় হিতে বিপরীত।

গল্প বলার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু রাত্রের অরণ্যে, বিরাট অগ্নিকুণ্ডের আলোয়, আদিবাসীদের নাচের আসরে, সংস্কৃতিবান শহুরে প্রতিভাকে আঘাতে রক্তাক্ত হতে দেখেছি। আবার দেখেছি শহরের শুভাকাঙ্ক্ষীকে মেয়েরাই টেনে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের নাচের আসরে, আপন হাতে করিয়েছেন পান ভোজন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, আদিবাসীদের মূল ধ্যান-ধারণা নাড়া খাচ্ছে, কাঁপন লাগছে তার সমাজ দেহে, চিড় খাচ্ছে কোথাও কোথাও। কেবল বানিয়া আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তর্জনী দিয়ে দেখাবো না। দেখাবো রাজনৈতিক দলগুলোকেও। এই তিনটি বিভাগ নিজেদের প্রয়োজনে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর একজনকেও রেহাই দিতে রাজী নয়।

থাক এই সব অশুভ ভাবনা। খাজুরাহোতে প্রথম সন্ধ্যায় সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নাচ দেখেই ছুটে গিয়েছিলাম আদিবাসীদের নাচ দেখতে। আগুন ঘিরে নাচের আগুনের বহর ছিল খুবই কম, প্রায় নিবু নিবু বলা চলে। অন্যথায় আগুনের

boiRboi.net

আলোয় নাচের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে পারতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আলোর কার্পণ্য করেননি, এবং নিয়নের সেই আলোয় নাচ দেখার সুবিধা হয়েছিল ঠিকই, আরণ্যক উল্লাস ও সৌন্দর্য ছিল না।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, আসরে উপস্থিত ছিলেন, মারিয়া, বৈগা আর গোন্দ আদিবাসী গোষ্ঠী। আগুনের আলো না থাক, বৈগাগোষ্ঠীর রণপা নৃত্য দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। রণপা বলতেই আমার চোখে ভেসে ওঠে, বাঙলা দেশের অতীতের ডাকাতদের কথা, যাদের চোখে দেখিনি, গল্প শুনেছি। রণপা—অর্থাৎ দীর্ঘ দুটো বাঁশের গাঁটে দু পা রেখে ছুটে চলা। ডাকাতরা নাকি রণপায়ে চেপে বাঁশের বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত পালিয়ে যেতো। অনেক সময় খাল নালা ডিঙিয়ে যেতো অনায়াসে। সেই রোমহর্ষক ছবির ডাকাত ছুটে যেতো উঁচু গাছের পাশ দিয়ে, আকাশের নক্ষত্রের গা দিয়ে।

খাজুরাহোতে দেখেছিলাম, রণপা নৃত্যের অনায়াস ছন্দ। তাঁদের ভাষায় রণপা নাচের নাম হলো "ডিটো এন্না"। তালে ভুল ছিল না, সারিবদ্ধতায় কোথাও অমিল ঘটেনি। নাচতে নাচতে ঘন হয়ে আসা আবার ছড়িয়ে যাওয়ার কৌশলটি তাঁদের যেন জন্ম থেকেই আয়ত্তে। এতোকাল যা আমার কাছে ছিল পলায়নপর ডাকাতদের দ্রুত এক কৌশল, খাজুরাহোতে দেখেছিলাম তা আরণ্যক, শিল্প।

পরের দিন থেকেই সেই সর্বনেশে বৃষ্টির পালা। আদিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানা, সবই বাকি থেকে গিয়েছিল। আশা ছিল পরের দিন রাত্রে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যেতে পারবো। জেনে নিতে পারবো তাঁদের ঠাঁই-ঠিকানা, জীবনযাপনের ধ্যান-ধারণার কিছু সংবাদ।

বৃষ্টি নেমেছিল পনরই ফেব্রুয়ারি প্রায় বিকালে। সকালে খবর পেলাম, বামিঠার পথে, প্রায় ছ' কিলোমিটার দূরে বেনীগঞ্জ ড্যামের ধারে, আদিবাসীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুভি তোলবার জন্যই। খবর পেয়েই ছুটলাম। আমাদের কাছেও ছিল একটি জীপ। দলটা নেহাত ছোটোখাটো ছিল না, তাই একটা অ্যামব্যাসাডর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কপাল বলে একটা কথা আছে। কর্মের সঙ্গে সব সময়ে তাকে মেলানো যায় না। আমরা যখন গিয়ে পেঁছুলাম, তখন সব খতম। বেনীগঞ্জ ড্যাম দেখাটা এমন কিছু আহা মরি ব্যাপার ছিল না। কারণ মাইথন মাসানজোরের তুলনায় সে বাঁধ তেমন নয়ন ভোলানো না। তবে কপালে একটা বস্তু ছিল, ড্যামের টাটকা রুই আর কাতলা। ওটা বাঙালীর কপাল গুণে। মাছ ধরার ঠিকাদার তখন সব বস্তা বন্দী করে বসে আছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে সে তার ঠাসবুনোট বস্তা খুলতে রাজী হলো। দাম শুনলে চমকে উঠারই কথা। ছ' টাকা কেজি দরে বেশ কিছু মাছ কেনা হলো। তাঁবুর আস্তানায় ফিরে, কলসীর মতো হাঁড়িতে ফোটানো হলো খিচুড়ি। তরকারি না বলে, আলুকপির ছেঁচকি, আর মাছ ভাজা। চড়ুইভাতির মতোই সেটি হলো একটি ভোজনের মহোৎসব।

মহোৎসব তো হলো বটে, ভাগ্যাকাশে তখন কিছু মেঘের ছড়াছড়ি। দুপুর গড়িয়ে যেতেই কলঙ্কিত আকাশে বিজলী হানা চমক, বজ্রের হুংকার, তারপরে ধারা

পাত। ষোল তারিখের সকালটাও মোটেই আশার আলো নিয়ে হাসলো না। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আদিবাসীদের সাক্ষাতের জন্য।

"রাহিল" নামে টুরিস্ট হোটেলে খোঁজ-খবর করে এক ভদ্রলোকের নাম জানা গেল, রাজা মুখার্জি। তিনি ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের রাজধানী অফিসের কর্মী। আদিবাসীদের খাজুরাহোতে নিয়ে আসার যোগাযোগ অনেকটা তাঁর হাতেই ছিল। সকালের মুভির ব্যাপারেও নাকি তিনি ছিলেন। আদিবাসীদের দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপরে অনেকখানি।

রাজা মুখার্জিকে খুঁজে পাওয়া গেল রাহিলেই। যেচে আলাপ করলাম। বয়স এমন কিছু না। কিছু কথাবার্তার পরেই জানা গেল, রাজা মুখার্জি অন্তরে বাইরে একজন শিল্পী। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা কম না। তাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচতে জানেন। চাকরির বাইরেও তিনি ছবি আঁকেন।

কাণ্ডারী যখন পাওয়া গেল, তখন ভাসতে দেরি করা নিরর্থক। রাজা মুখার্জি বললেন, "আকাশের যা অবস্থা দেখছি, দুপুরের খাওয়ার পরেই আদিবাসীদের ডেরায় চলে যাওয়া ভালো।"

তখনই জানতে পারলাম, আদিবাসীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে তিন চার কিলোমিটার দূরে। জীপ নিয়ে রাজাবাবুর সঙ্গে জৈন ধর্মশালার একটি বড় ঘরে গিয়ে দেখলাম। রমণী পুরুষ শিল্পীরা সকলেই দলা পাকিয়ে, এ ওর ঘাড়ে মাথায় পা ছড়িয়ে, কোনোরকমে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে আছেন।

বর্ষার জন্যেই শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। সহজ ভাবনাটাই মনে এলো, সবাই পান করে ভোর হয়ে নেই তো? রাজাবাবুকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "আদৌ না। নিজেদের তৈরি বস্তু ছাড়া ওদের চলে না, আর সে সব তৈরির কোনো সামগ্রীও সঙ্গে নেই।"

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বস্তুর নাম "সাল্‌ফি" আর "খাড়িয়া"। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের "ডিয়েং"-এর কথা। ডিয়েং পচাই ছাড়া কিছু না, একটু ঘুরিয়ে বললে খাঁটি "রাইস বীয়র"।

মারিয়া গোন্দ আর বৈগা, তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে, মারিয়া আর বৈগা দলপতি দুজনকেই রাজাবাবু আমাদের প্রার্থনার কথা নিবেদন করলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন কিঞ্চিৎ দ্বিধা দেখা গেল। তারপরেই দলপতিরা ডেকে তুললেন শিল্পীদের। সহসা যেন যাদুমন্ত্রে ঘরের চেহারা বদলিয়ে গেল। রব পড়ে গেল সাজো সাজো।

মেয়েদের পায়ের গোছার কাঁসার অলঙ্কার সুড়ায় টুংটুং আওয়াজ হলো। পোশাক পরতে শুরু করলেন সব আমাদের সামনেই। মারিয়া পুরুষেরা মাথায় পরলেন দুরকমের শিরস্ত্রাণ। বরাহের দাঁতের সঙ্গে ভৃঙ্গরাজ পাখীর পালক গোঁজা, অনেকটা পাগড়ির মতোই। নাম তার "গুবুবা"। কাঁড়র পাগড়িতে মোষের দুই শিং। কোথাও বা তার ছোট আয়না বসানো, এই শিরস্ত্রাণের নাম "কোক্"। বড় বড় ঘন্টার মালা—নাম যার "হিরণা", বন্য মহিষ শিকারী পুরুষ শিল্পীর তা হলো কোমরবন্ধ। সাজতে সাজতেই দুবার যখন কোমরে ঢেউ দিয়ে ঘণ্টার শব্দ

তুললেন, মনে হলো শিকারের ডাক পড়েছে। তা ছাড়া তাঁদের কানে আছে মাকড়ি, নাম যার "বারি"।

মেয়েরা কোমরে পরেন বড় ঘুংগুর, "মুইয়াং" যার নাম, তামারা পরলেন মাথায়, অনেকটা গোল টুপির মতো। কিন্তু মাথায় পুঁতির মালা এবং গলাতেও, পরতে অনেকেই ব্যস্ত। বিশেষ করে মাথায় জড়ানো পুঁতির বেষ্টনীর নাম "তালাকাস্‌রা"।

দেখলাম, মেয়েদের থেকে পুরুষদের সাজগোজ অস্ত্রসস্ত্র বাদ্য বেশি। মাদল তো অনেকের গলাতেই ছিল। মোষের শিংয়ের বাঁশি, "হাকুম" যার নাম। বাঘের গায়ের মতো ডোরা কাটা বড় বড় লাঠি, মাথায় লোহার গুচ্ছ, নাম তার "গুজুর বড়গা" আর ছোট লাঠির নাম "কোলাং বরগা"। "কোটারকা" আছে গলায় ঝোলানো, দেখে মনে হয়, পশুর চামড়ার তৈরি নাকাড়া। আসলে গোটাটাই একরকমের গাছের গুঁড়ি, চাঁটি মারলেই ঠং ঠং করে বাজে। পুরুষের আঙোচিতে (পাগড়িতে) ছুরি গোঁজা থাকে, কারোর কারোর হাতে অতি ধারালো টাঙি।

এই যৌথ নৃত্যের সবটাই জীবনের প্রয়োজনে, প্রয়োজনই উৎসব। সবই জীবনযাপনের প্রতীক। বৈগা গোষ্ঠী প্রধানত এসেছেন মান্ডলা থেকে। বৈগা মেয়েদের সাজের মধ্যে সব থেকে মনোহারী "লাছা", যা ঘাসে বোনা এক ধরনের দীর্ঘ পালকের মতো মাথার পিছন থেকে পিঠে এলিয়ে পড়ে। ছেলেদের পায়ের "পায়জানা" অলংকার, নাচের তালে যে বাজনা বাজে, তার নাম "ঠিস্‌কি"।

মেয়ে হোক, ছেলে হোক, কারোকে একটি কথা জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই। যেন লজ্জায় হেসেই মরে যায়। এই বনবালারাও কি তাঁদের ঠোঁটের কূলের চিকন হাসি দিয়ে, মন্দির গাত্রের সেই মোহিনী-মূর্তিকে মনে করিয়ে দেয়নি? দিয়েছে। এবং প্রতিটি কথার জবাবেই কেউ নীরব থাকেন নি। জবাব দিয়েছেন, আর নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে হেসেছেন।

বিয়ে? বিয়ের নিয়ম? এর আবার কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি? কলকাতাইয়া বাঙালী তো আজব ভারি! মাথার খোঁপায় গোঁজা চিরুনিটা দেখিয়ে দিয়েছেন হাসতে হাসতে, কথা হলে, "ওইটি যে পুরুষ পরিয়ে দেয়, সেই প্রেম নিবেদন।" প্রেম আর বিবাহ এখানে দ্ব্যর্থবোধক না। "তবে মহলোও কি না হয়?" অর্থাৎ বাবা মায়ের পছন্দমতো সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দেওয়া।

সাজগোজের শেষেই নাচ। বৈগারা নাচলেন ধর্মশালার প্রাঙ্গণে, দূরে মন্দির। আর মারিয়াদের জোড় হাতে টেনে টেনে নিয়ে গেলাম প্রাচীন জৈন মন্দিরের চত্বরে। বন্য মহিষ শিকার থেকে দেবদেবীর আরাধনা, বাদ গেল না কিছুই। শেষের গানটি ছিল ঃ

বারাকিয়া তাতোর দাদালে……
শালিকাসিলো শয়োর ওঁহি তাতোর দাদলে……
লয়োর গোলা সোমোয়ে দাদালে
পলায়ে তানতম ভানুদাখি
দাদালে…

boiRboi.net

রিলো লেয়ো রিলো রিলো……

শালিকাসিলো রিলো রিলো……

যার অর্থ হলো,

হে ভগবতী, আমরা মন্দিরে এসে পুজো করলাম। সমস্ত ছেলেমেয়েরা একত্র হয়ে নৃত্যগীতাদি করলো। হে মা! প্রর্থনা, আমাদের সব ত্রুটি ক্ষমা করুন।

ক্ষমা আমিও চাই, এই সব শিল্পীদের কাছে। কারণ, আমরা এবং তাঁরা, কেউ কারোকে পরস্পর তেমন করে চিনতে জানতে পারলাম না।

———

boiRboi.net

আঁখির আলোয়

boiRboi.net

দেওয়ালে গ্রথিত বিশাল আয়না, যে আয়নায় আমার মত ব্যক্তির দ্বিগুণ দীর্ঘ ছায়াকেও সম্পূর্ণ দেখা যাবে, যে আয়নায় এই ঘরের খাঁটি মার্বেল ফ্লোরের অনেকখানি, এবং ওপাশের পঙ্খের কাজ করা সাদা ঝকঝকে দেওয়ালের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, আমি সেখানে এসে দাঁড়ালাম।

কেন এই আয়না এ-ভাবে দেওয়ালে গাঁথা, তা জানি না। শতাধিক বৎসর নিশ্চয় পার হয়েছে, যখন এই পঁচিশ ফুট চওড়া দেওয়ালে, ভারতের বাইরে তৈরি সুন্দর আয়নাটি গাঁথা হয়েছে। কিন্তু কেন এ-ভাবে আয়নাটি এখানে গাঁথা হয়েছে, এ ভাবনা আমার ভুল। কেন গাঁথা হয়েছে, তা আমি জানি। এই শ্বেত-পাথরের মেঝে, পঙ্খের দেওয়াল, যা শাঁখের মতই মসৃণ এবং ঝকঝকে, আধুনিক কোন মাল-মশলা, এমন কি প্লাস্টিক বা যে-কোন মডার্ন পেণ্টিং, এমনটি আজ পর্যন্ত করতে পারেনি, যে কারণে ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন ইমারত ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে এখনো অযত্নে পড়ে থাকা পঙ্খের মেঝে আশ্চর্য সুন্দর আর প্রায় অভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়, এবং অনেক উঁচু ছাদের কাঠের কড়ি-বরগার গায়ে ছুতোর শিল্পীর অপূর্ব পরিচ্ছন্ন নিখুঁত খোদাই চিত্র, যার অধিকাংশই ফুল-লতা-পাতা, অথবা পশু-পক্ষীর মুখাবয়ব বা বিচিত্র ভঙ্গি যা একমাত্র গুজরাত বা মারাঠা দেশেই দেখা যায় বেশি, আর দরজা ও তার ফ্রেম এবং আলমারির পাল্লার তো কোন কথাই নেই, সর্বত্রই কাঠের গায়ে সুন্দর খোদাই শিল্প, এই ঘরের সৌকর্য বাড়াবার জন্যেই, এমন বিরাট আয়না এখানে গাঁথা হয়েছে, এবং এই প্রাসাদে যিনি যখন বাস করেছেন, তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্যেই আয়নাটি এ দেওয়ালে স্থান পেয়েছে। এ কথাটা খুবই সহজ, কিন্তু আমি ভাবতে চেয়েছিলাম, আয়নাটা দেওয়ালে গাঁথা কেন? আয়নার মত বস্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এ-ঘরে ও-ঘরে বা এদিকে-ওদিকে সরানো যায়, এমনভাবেই রাখবার ব্যবস্থা অন্যত্র দেখে থাকি। এ-যুগের ড্রেসিং টেবলের কথা বলছি না, বড় পায়ার সঙ্গে দাঁড় করানো ফ্রেমে-আঁটা আয়না দেখেছি। অবিশ্যি এ আয়না অনেক বড়, লম্বায় ছ ফুট প্রস্থে ফুট চারেকের কম নয়, এবং চারপাশের ধারের ছিলা-কাটা দেখে বোঝা যায়, এক ইঞ্চি মোটা হওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অতএব, যথেষ্ট ভারী নিশ্চয়। সম্ভবত এই কারণেই, স্থায়ীভাবে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই কারণ ছাড়া, আরো না ভেবে পারি না, যাঁরা এ প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন, তাঁদের একটি বিশেষ ধ্যান-ধারণা ছিল। তাঁরা জানতেন, এ সবকিছুতেই ঈশ্বরের স্বত্ব। ঈশ্বরের আপন ঐশ্বর্যে তৈরি। ঈশ্বরের সেবক ও উপাসক—যাঁরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁরাই উপাস্যের অনুমতিক্রমে এই প্রাসাদে আশ্রয় নেবেন, আয়নায় অবলোকন করবেন। যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আগ্রহে, দয়ায় এ প্রাসাদ আসবাবের সৃষ্টি, সেই হেতু এ সবকিছুই সম্ভবত অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। সুতরাং, এমনভাবে সব কিছু করতে হবে, যা যুগযুগান্তর কাল একভাবে অবস্থান করবে।

এই হয়ত চিরকালের মন; ঈশ্বরকেই বা দায়ী করা কেন, মানসিকতাই মহাকালের

কোলে বসে নিজের খেলা খেলে গিয়েছে। আর কাল, অন্ধ, অশ্রান্ত, সম্ভবত অনুভূতি-হীন, (কোন ভারতীয় উপাসকেরই এরকম ভাবা বিধেয় নয়) অনেক ধ্বংসের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে, চলেছে নিরন্তর। মৃত্যু আর ধ্বংসের কথা কে বা ভাবতে চায়। তবু মানুষের ভোগের অমরতার সঙ্গে সৃষ্টির যে মনোবৃত্তি কাজ করে, ঈশ্বরের চিন্তা, ধর্মীয় মনোবৃত্তি বোধ হয় তার থেকে আলাদা। উপলক্ষই এখানে মনোবৃত্তি।

আমি জানি না, এ আয়না কেউ দান করেছিলেন কিনা, কিংবা ঈশ্বরের নিজের বিপুল আয়ের কড়ি থেকেই কেনা হয়েছিল। সম্ভবত এ কোন ভক্তের দান, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ বস্তুটি দিতে পেরে কৃতার্থ হয়েছিলেন বা অর্বাচীন সাধারণ মাৎসর্যপূর্ণ লোকদের মত ভাবতে গেলে কোন দরিদ্রের সঙ্গে রেষারেষি করে কোন বড়লোক ঈশ্বরকে উপঢৌকনে বেশী খুশী করতে চেয়েছিলেন। যে ভাবেই হোক, আয়নাটি সুন্দর। প্রতিদিন সকালে, এ-সময়ে এখানে এসে, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি করে দাঁড়াতে ভালবাসি। এই আয়নাটি-কেও আমি ভালবাসি। যেন আমার সুস্থ, সবল, সদ্য-স্নান-করা, এখনো রক্তাভ (প্রায় এক ঘণ্টা কুস্তির পর, কয়েকটি আসন শেষে, প্রায় আধঘণ্টা মর্দন ভোগ করে, ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ স্নান করলেও, আমার শরীরের এ রক্তাভা সহজে দূর হয় না। স্বাভাবিক রক্তাভা ছাড়া, এখন যে উজ্জ্বল রক্তিম অবস্থা, তার কারণ কুস্তি ও মর্দন) শরীরের শক্তি ও আনন্দ, সবই যেন এই আয়নাটি আমাকে দিয়েছে। মেদ-বর্জিত, আমার এই সাতাশ বছরের শক্ত সুঠাম শরীরটিকে কেবল যে লোকে দেখে মুগ্ধ হয় তা বলি না, আমি নিজে দেখতেও ভালবাসি। একথা আমার বলা উচিত নয়, ভাবাও উচিত নয়, কারণ লোক-সমাজের কথা ভেবে বলছি না, আমার জীবনধারণ ও জীবিকা—হ্যাঁ, জীবিকাই বলতে হবে, কোনকিছুর সঙ্গেই এ-রকম বলা বা ভাবা অনুচিত।

তবু এই সত্য আমি স্বীকার না করে পারি না। বিশেষত আমি সুগঠিত শরীরের চর্চা করি, নিজেকে ভাল লাগলে, আমার চর্চা করাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে, এবং আমার মনের মধ্যে এ চিন্তা আপনি আসে। তাই আমি যখন, এই আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াই, নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি, দেখে খুশী হই, তখন এই আয়নাটি যেন আমার খুব আপন হয়ে ওঠে। এমন কি, ভাবতে আরম্ভ করি, এই আয়নার বুকে ছাড়া আর কোথাও বোধ হয় আমাকে এত ভাল দেখাবে না। সে জন্যেই আয়নাটির বিষয়ে আমার এত কথা ভাবতে ভাল লাগে। ঘুম থেকে ওঠার পর, শেষ রাত্রেই আমি ঘুম থেকে উঠি, সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত, আমার নিজের সঙ্গে এমনভাবে দেখা হয় না। এ সময়ে স্নান করে, গা মুছে কোমরে একটি সংক্ষিপ্ত গেরুয়া কৌপীন বেঁধে আমি নিজের সঙ্গে দেখা করি, ঘাড় নেড়ে হাসি, নিজেকেই অভ্যর্থনা করি, বলি, 'দাসোঽহং !'

'দাসোঽস্মি' বা 'দাসোঽহং' এই দুই শব্দের দ্বারা প্রণাম বা নমস্কার যা হোক, করা বিধেয়, বিশেষ আমি নিজে যে সম্প্রদায়ের অধীন। 'ওঁ বিষ্ণু' বলাও অবিধেয় নয়, কিংবা সাধারণভাবে বৈষ্ণবোচিত যে-কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করলেই হয়। কিন্তু আমার ওই শব্দ দুটিই ভাল লাগে, বিশেষ করে যখন আমি নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হই, হাসি, এবং আরো অনেক কিছু যেমন, নিজেকেই বলতে শুনি, 'আপনি একজন বিরক্ত সংসার-হীন সাধক, নিজেকে আর এতটা দেখবেন না, এবার দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন' ।

এই কথা বলে আমি হেসে ফেলি, এবং তৎক্ষণাৎ জিভ কেটে মার্জনা চাই, আর তাড়াতাড়ি চারপাশে তাকিয়ে দেখি, আমাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না।

লক্ষ্য করবার কেউ নেই। এ সময়ে, আমার এই অংশে সহসা কারোর আসবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি বা কেউ আসে, তাহলে তাকে এই বিরাট ঘরের এক প্রান্তে, দরজার কাছ থেকে ডেকে সাড়া দিতে হবে, এবং দরজার কাছে কেউ দাঁড়ালেও আমাকে দেখতে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ কবজা-লাগানো কাঠের পর্দা আমাকে আড়াল করে রয়েছে। কাঠের ফ্রেমের পায়ার সঙ্গে, এই কারুকার্যখচিত অজস্র ছিদ্রসহ ওয়ালনাটের পর্দাটি, সত্যি বলতে কি, কোন বিলাসী রাজপুরুষের ঘরে মানাতো।

কথাটা অবিশ্যি ঠিক হল না, এ ঘরের সমগ্র চেহারাটাই ত তাই, এই প্রতিবিম্ব পরিচ্ছন্ন শ্বেত-মর্মর, পঙ্খের শঙ্খ-মসৃণ দেওয়াল, কারুকার্যখচিত কাঠের কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা, সব কিছুর মধ্যেই বিলাসকক্ষের ছাপ ফুটে উঠেছে, যেন মনে হয়, বিলাসী রাজপুরুষের থেকেও, অন্য কারোর আবাস হলেই ভাল হত। যার চলার সময়ে একটা রিনিক্-রিনিক্ শব্দ বাজতে পারে। এবং সেই শব্দে যার কৃতিত্ব, তা নিশ্চয় বাজুবন্ধ নয়, অলঙ্কার যার পায়ে, এই সাদা পাথরের ওপরে যার রং লাগানো পায়ের সঞ্চরণ, বলতে গেলে কৃতিত্ব তারই, এবং এই ঘরে সে-রকম কোন বিলাসিনীর পায়ের ছাপ পড়েছে কিনা… ।

না, এসব কথা আমার ভাবা উচিত নয়। নিজেকে ভ্রূকুটি না করে পারি না, এবং হাসিও, আর, অনেকটা যেন নিজেকে ক্ষমা করার জন্যেই, আমি গুনগুনিয়ে উঠি—'মন গরীবের কী দোষ আছে? তুমি বাজীকরের মেয়ে গো শ্যামা, যেমন নাচাও, তেমনি নাচে॥'

না, কোন এক শাক্ত গৃহী সাধকের গান গুনগুনানোও আমার অন্যায়। যদিচ, গানটাকে আমি কখনোই একজন সাধকের মত গাই না, অনেকটা, আমার ভিতরে যে সমস্ত চিন্তার উদয় হয়, তার অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করার জন্যেই কথাগুলো না বলে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে, এ সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আমি যে সময়টুকু কাটাই, তার সবকিছুর মুলেই বোধ হয়, শরীর ও মনের প্রসন্নতা, যা আমাকে তরল করে তোলে, যে তারল্য আমার কোনদিক থেকেই শোভনীয় বা উচিত নয়। জানি না, এসব আমার ভিতরের অসংযম কিনা, অথচ সংযমই হল আমার দিনযাপনের এক প্রধান অঙ্গ। আমি যখন একলা থাকি, তখন আমার অনেক আচার-আচরণই এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানায় না, বিশেষত, আমার ভিতরে তো ভীষণ গোলমাল, অর্থাৎ একেবারেই বেমানান বলে মনে হয়। অথচ আমি প্রকৃতই বিরক্ত—বিরক্ত কথাটা বাংলায় বললে অন্যরকম অর্থ হয়ে যেতে চায়, এখানে কথাটা ঠিক তা নয়, কথাটা এরকম হওয়া উচিত, যে কোনকিছুতেই অনুরক্ত নয়। সম্ভবত উদাসীন বলা যায়, যে উদাসীনতা, চলতি সাধারণ অর্থে নয়, বৈরাগ্যের সঙ্গে যার যোগাযোগ করা যায়। বিরক্ত সে, যে গৃহত্যাগ করেছে, সংসার-ত্যাগী উপাসক, সন্ন্যাসী। আমি সেই রকম সংসারবিরক্ত, অন্তত আমি তাই ভাবতে

চাই। লোকেও তাই ভাবে, শুধু ভাবে না, বিশ্বাস করে, এবং এ কথা সত্যি, আমার কোন সংসার নেই, গৃহী বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই আমার নেই, তথাপি, আমি অনুভব করতে পারি, ভীষণ গোলমাল আছে আমার মধ্যে, সম্ভবত তা সংসারের নানান গোলমালের থেকেও অনেক বেশি তীব্র, উচ্চকিত।...

কিন্তু এসব ভাববার এখন সময় নেই, এ চিন্তা আমার সংকটের মূলে রয়েছে, সেই মূল ধরে নাড়া দিতে পারি, তেমন সাহস বা যোগ্যতা কোনটাই আপাতত নেই। কারণ, ধর্ম এবং সংসার, ঈশ্বর ও মানুষ, তার মাঝখানে আমার জীবন, এইসব মিলিয়ে আমার সংকট, আর এ সংকট এই পৃথিবীতে অনেক মানুষের থাকতে পারে, তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না, কারণ, সত্যি বলতে কি, আমি নিজের সংকট ছাড়া, অপরের সংকটের কথা একেবারেই ভাবি না।

এ-কথা শুনলে কেউ নিশ্চয় এ রকম ধরে নেবে না, আমার চোখের সামনে যদি কোন শিশুকে জলে ডুবে যেতে দেখি, তবে সাঁতার জানা সত্ত্বেও আমি তাকে রক্ষা করব না। না, এ-ধরনের কোন কাপুরুষোচিত ইতরতার কথা বলছি না। আমি বলছি, যারা অপরের সংকটের কথা ভাবে বা উদ্ধার করে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে আমার দূর ফারাক। যখন কোন শিশু ডুবে যায়, তখনও যদি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, তাহলে স্বভাবতই বুঝতে হবে, এ-বিষয়ে আমি নিজে কোন সংকটই অনুভব করিনি, অর্থাৎ আমার নিজের মধ্যে কোন সংকটই নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ঘটায়, আমি যে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারি না, সেটা আমার ভিতরেরই সংকট, এবং তখন সে সংকট থেকে উদ্ধার পেতে চাই বলে, আমি জলে ঝাঁপ দিই। এর জন্যে যেটুকু কৃতিত্ব আমার বলে দাবী করতে পারি, সেটা হল, আমার নিজের সংকট থেকেই আমি উদ্ধার পেয়েছি। এই ভাবনা অপরের ক্ষেত্রে কতখানি সত্য, আমি জানি না, তবে আমার কথা সঠিক বুঝিয়ে বলতে চাইলে, দেখেছি অনেকের পক্ষেই গ্রহণের অযোগ্য হয়ে ওঠে। কেননা অধিকাংশ মানুষই এমনভাবে চিন্তা করে, যেন দেশের ও দশের সংকট উদ্ধারের জন্যেই সকলে ব্যস্ত। কিন্তু সকল সংকটের মূলে, আত্মসংকটই যে মানুষকে বেশি দোলায়, এ-কথাটা কেউ মনে রাখে না। আত্মসংকট আছে বলেই, অপরের সংকটে আমার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

আমার হাসি পেল। আমার নিজেকে এই কৈফিয়তটা আমি না দিলেও পারতাম। আমি ভাবতে চাইছিলাম, নিজের সংকটকেও আমি বড় করে দেখি, অন্যের সংকটের কথা আমি একেবারেই ভাবি না। বলা উচিত, আমি নিজেকে নিয়ে সর্বক্ষণই ব্যস্ত, এবং আমার মত সংসারত্যাগী বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, এ কথা ভাবাও অন্যায়, কেননা, মানুষের সমাজ সবকিছুরই এমন কতকগুলো নিয়ম ও অর্থ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, তার বাইরে কিছু বললেই, সকলে চীৎকার করে ওঠে। আমি যদি কাউকে বলি, এখানে যে সব গৃহী ধনী ভক্তরা আসে, 'তুমি যা দান করছ, তা ঈশ্বরকে নয়, তোমার কোন কষ্টকে, যন্ত্রণাকে, এমন কি ভয়কে দান করছ, কেননা, তোমার শান্তি নেই। তুমি এই দানে একটা স্বস্তি বোধ করছ, তোমার সংস্কারের মধ্যে এই ধারণার বীজ আছে। যদি জানতে, এই সব সামগ্রী, চোরকে দিয়ে দিলে বা পুড়িয়ে ফেললে তোমার শান্তি হবে, তবে তুমি তাই করতে। অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে সংকটের অবস্থা যাচ্ছে, তার থেকে বেশি গ্রাহ্য

ও চেনা। লোকে দেখছে, ঈশ্বরকে ধনরত্ন নিবেদন করছ, তা হলে আমি অপ্রিয় হব, এবং সকলে ভাববে আমি ঈশ্বরের মহিমাকে অস্বীকার করছি। কারণ, চিরদিনেরই বিচার হল, ঈশ্বরের কৃপায় ও অনুমতিক্রমে মানুষ দান করে। তবু মানুষ মুক্তির কথা বলে, অথচ নিজের মুক্তির স্বরূপকে সে চেনে না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম, এবং নিজের প্রতি কিছুটা বিরক্তি বোধ করে, ভ্রূকুটি না করে পারি না। আমার চিন্তার জগৎ জুড়ে যে সব ভাবনার আনাগোনা নিষেধ, প্রতি মুহূর্তেই সেই সব ভাবনা, আমার ভিতরে তুষের আগুনের মত জ্বলতে থাকে। আগুনের মত জ্বলতে থাকে বললে বোধ হয় ভুল হয়। ছায়া যেমন কায়াকে সব সময়েই অনুসরণ করে, অনেকটা সেই রকম। অস্বীকার করতে চাইলেও, সে থাকে। আমার এই নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণ-রূপ-বেশ বাস-গন্ধ, কোন কিছুই ছায়াটাতে ফোটে না, তেমনি আমি যা, আমার জীবন যা, তাতে আমি উৎসর্গের দ্বারা তর্কাতীত জগতে থাকি, তবু ছায়ার মতই বিতর্ক আমার পিছনে পিছনে চক্র দিচ্ছে। এই চক্র দেওয়ার কথা মনে হলেই, আমি যেন একটা বাঘের অস্তিত্ব টের পাই, যে বাঘকে চোখে দেখা যায় না, অথচ শিকারের প্রতি তার স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ, এবং জঙ্গলের আড়ালে-আড়ালে, শিকারকে ঘিরে চক্র দিতে দিতে, ক্রমেই শিকারের নিকটবর্তী হতে থাকে, চক্র ছোট হয়ে আসে, কিন্তু শিকার বারেবারেই ঘুরে ফিরে দ্যাখে, কেননা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তখন একটা অজানা আতঙ্কে আক্রান্ত, আর তারপরেই গর্জন ও ঝাঁপ। এই আমার সংকট, আমার বিতর্ক, উৎসর্গের তর্কাতীত আর সেই বিতর্ক এক এক সময় বাঘের মতই মনে হয়।

অথবা, বাঘই বা কেন বলি, এই বিতর্ক সাবিত্রীর মত যেন যমরাজার পিছনে পিছনে চলেছে। স্বামীর জীবন তার প্রার্থনা, তাই সে মৃত্যুরাজের পিছনে পিছনে চলে, এবং অমোঘ মৃত্যুকে সে যেমন ধৈর্য আর অধ্যবসায় দিয়ে আস্তে আস্তে মুগ্ধ করে, আর মুগ্ধ মাত্রেই যেমন পরাজিত হয়, যেমন করে মৃত্যুরাজ, সাবিত্রীর স্বামীর প্রাণহরণ করেও, শতপুত্রের মা হবার বর দেয়, আর সাবিত্রী তখন তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িকের মত জানতে চায়, যদি স্বামীর প্রাণ নিলে, তবে শতপুত্র কোথায় পাই, তখন মুগ্ধ মৃত্যুকে থমকে দাঁড়াতে হয়। স্বয়ং মৃত্যু জীবনের কারাগারে আটকা পড়ে যায়, বেরোবার পথ পায় না, এবং তখন পরাজয় স্বীকার করে, জীবনকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হয়।

আমার বিতর্ক, যা আমার সংকট, সে যেন সাবিত্রীর মত নিষ্ঠায় আমার এই জীবনের পিছনে পিছনে চলেছে। জীবনের আত্মা নামক জিনিসটা কী, (এই কথা ভাবা মাত্র আমার মুণ্ডচ্ছেদ হওয়া উচিত। আর আমি কিনা বিরক্ত, ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত প্রাণ) আমি জানি না। আমার গুরুর যা ব্যাখ্যা, তাতে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আমি অনেক কথা জানি, কিন্তু সেই উপলব্ধি নেই। জীবের আত্মা যাই হোক, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যান আমার বেশ বাস্তব বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, সাবিত্রী কি সত্যি ন্যায়শাস্ত্র জানত? নইলে সে মৃত্যুর কাছে স্বামীর প্রাণ সোজাসুজি একবারও না চেয়ে, প্রাণ দিতে বাধ্য করার পদ্ধতিটি আবিষ্কার

করেছিল কেমন করে। আমি ভাবি, আমার বিতর্ক একদিন হয়ত সাবিত্রীর মতই, মুগ্ধ করবে, পরাজিত করবে, আটকে ফেলবে।

আমি এবার সত্যি বিরক্ত হয়েই হেসে ফেলি, এবং ডান হাত বাড়িয়ে যে পাথরের পাত্রের ঢাকনা আমি এইমাত্র খুলেছি, তার থেকে ছোট পাথরের বাটির লাল চন্দনে আঙুল ডুবিয়ে, আয়নায়, আমার মুখের দিকে ছিটিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ আমার মুখে, কপালে, গালে, গলায় যেন রক্তের ছিটা লেগে গেল। মুখের আঘাতে এ-রকম রক্ত লাগে না, কিন্তু এ-রকম মুখ আমি দেখেছি, রেলে কাটা পড়ে, নিজেরই রক্ত যার মুখে ছিটকে লেগেছে, ঠিক এই রকম। চন্দনের ছিটার আড়ালে আমি আমার হাসিমুখ দেখতে পাচ্ছি। নিজেকে আমি বলতে শুনি, 'ঠিক হয়েছে, ভণ্ড কোথাকার!'

চন্দনের দাগের কাছ থেকে সরে দাঁড়াই, এবং আমার মুখ (সবাই বলে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আমার। হয়তো আমার এই বর্ণকে তাই বলে। কুচকুচে কালো না হলেই বোধ হয় শ্যাম বলে, যেটা, আমার ধারণা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই তাই, শ্যাম-বর্ণের দেশ, কিছুটা বা রঙীন, সম্ভবত পৃথিবীতে একমাত্র দেশ, যাদের গায়ের রঙ বর্ণবহুল) স্পষ্ট দেখতে পাই। নিজের সম্পর্কে আমার মাঝামাঝি ধারণা, অর্থাৎ আমাকে মাঝামাঝি দেখতে।

পুরুষ হিসেবে, কাকে সুপুরুষ বলে, সে বিষয়ে আমার যা ধারণা, তারই মানদণ্ডে, নিজেকে আমি মাঝামাঝি মনে করি এবং এই মাঝামাঝি ধারণা নিয়ে, সময়ে সময়ে, নিজেকে দেখে আমি খুশী হই, ভাবি, 'খুব মন্দ কি?'

আবার কোন কোন সময়ে দুঃখিত হই, নিশ্বাস ফেলি, ভাবি, মানুষ কত সুন্দর হয়, আমি হতে পারিনি। এই পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি যদি আর চারটে ইঞ্চি বাড়ত, যদি তীক্ষ্ন নাসা হত, এবং বাহু আজানু-লম্বিত—কিন্তু না, সত্যি বলতে কি, উত্তর দেশীয় এক একজন রোখা-চোখা সাধুর মত চেহারা যেন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যা আমার মোটেই ভাল লাগে না। যাদের টকটকে ফর্সা রঙ, বাদামী বা কটা চোখ, তীক্ষ্ন উঁচু নাক, সব মিলিয়ে, তাদের মধ্যে যেন আমি একজন হৃদয়হীন মানুষকে ফুটে উঠতে দেখি, যদিচ জানি এ সবের কোন অর্থই নেই, কারণ, এখানে আমার যে পার্শ্বচর সেবক আছে, যাকে সবাই জয়মন বলে ডাকে, তার চেহারায় ওসব জিনিসগুলোই আছে, অথচ সে আমার খুব বশংবদ, হাসিখুশী এবং ভীষণ হাসাতে পারে। তার কটা চোখ, তীক্ষ্ন নাসার মধ্যে, এমন আশ্চর্য হাসি লুকিয়ে থাকে, যা হঠাৎ কেউ ধরতেই পারবে না। তার সব কথার মধ্যেই একটা অদ্ভুত টিপ্পনীর ছাপ থাকে, যা সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা বা বোঝা মুশকিল। সেই সব টিপ্পনীকে ঠিক বিদ্রূপ বলা যাবে কিনা জানি না, বা ব্যঙ্গ। তবে তাকে বিদূষক বলা যাবে না, ভাঁড় বলতে যা বুঝি।

না, ক্লাউনিশ কিছু নেই, অথচ তার চোখে-মুখে এমন একটি ভাব আছে, এবং চলা-ফেরার এমন একটা ভঙ্গি, (সব সময় নয়) যারা ওকে চেনে বা বোঝে, তারা না হেসে পারবে না। আমার সন্দেহ হয়, কোথাও কোন তিক্ততা আছে ওর মধ্যে, এবং ওর নামের মধ্যেও সেটাই পাওয়া যায়, যেটা ওর জীবনের সঙ্গে কোথাও যোগসূত্র রেখেছে। জয়মন ওর ঠিক নাম নয়, ও সকলের সামনেই বড় বেশি জয় মন বলে জয় মন। আগে খুব বেশি বলত, গৃহস্থ জীবন থেকে যখন বেরিয়ে আসে (এখন ও সাধু, বিরক্ত বৈরাগী)

তখন ওটাই ওর বুলি, জয় মন বল, মনই আসল, মনের সেবা কর, মনকে বোঝাও, মনকে চেন। সেটা কতখানি ভেবেচিন্তে বলা, জানি না, তবে মন মন করে যে রকম কথা বলে, তা আমার কাছে, অনেকটা অব্‌সেশন্‌-এর মত লাগে। যে কারণে খানিকটা পাগলামি বলে মনে হয়, এবং ঠাট্টার ভঙ্গিতেই সবাই ওকে জয় মন বলে ডাকতে ডাকতে, জয়মন হয়ে গিয়েছে।

অবিশ্যি, এ সব কোন কিছুই আমার আগে জানা ছিল না, পরে জেনেছি ও শুনেছি। ওর কাছ থেকে, অতীত জীবনের যে সব কথা শুনেছি, অস্পষ্ট হলেও, কোথাও একটা মন বিকলের ব্যাপার আছে বলে আমার সন্দেহ হয়। সন্দেহই বা বলি কেন, নিশ্চিত ভাবেই একটা মন বিকলের ব্যাপার ছিল, এবং প্রথম দিকে সেই কারণে যে অব্‌সেশন (এই মুহূর্তেই ঠিক বাংলা কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, ছি! হায় ওরে বিরক্ত বিরাগী, তোমার লজ্জা নেই।) ছিল, সেটাই ক্রমে ধাতস্থ হয়ে আসার পর, বর্তমানের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারে ও কথাবার্তায় রূপ নিয়েছে। আর বিকল মানেই, তার পিছনে থাকে আসক্তি, শোক, ব্যর্থতা, তিক্ততা ইত্যাদি, এবং জয়মনের বিকলতায় একটা তিক্ততার বিষয় আছে, যে তিক্ততার মধ্যে খোঁজ করলে, একজন অসহায় পলাতককে চেনা যেতে পারে।

কিন্তু জয়মনের কথা এখন থাক, তার চেহারার কথাই বলতে চাইছিলাম, উগ্র বর্ণ ও মূর্তি তার, অথচ সে আমাকে বলে, 'মহারাজ, (আমাকে সেবক ও ভক্তবৃন্দ এই নামেই ডেকে থাকে) রামজীর মত এমন রূপ আমি মানুষের মধ্যে আর দেখিনি।'

আমাকে সে রামজীর মত (রামায়ণের রাম, নিঃসন্দেহে) দেখে থাকে, এবং অনেক দিন বলেছে, চোখ বুজে রামমূর্তি ধ্যান করতে গেলে, আমাকেই নাকি দেখতে পায়, আর সেটা যে ওর ধ্যানের দিক থেকে খুবই অগভীর, সেটাও ব্যক্ত করে, ক্ষমা চায়, কিন্তু বেচারী নিরুপায়। এ বিষয়ে পাপবোধ থেকে আমারই কিছু বলা উচিত, কেননা রাম পরমেশ্বর, ধ্যানের পুরুষ, তাঁর মধ্যে আমাকে দেখতে পাওয়া, আমার নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করার পাপ হয়। তাই আমি তাকে এ-বিষয়ে বারণ করি। আগে আগে খুবই করতাম, কিন্তু জয়মন এমনভাবে মাথা নিচু করে, অপরাধীর মত থাকত, আমি বুঝতে পারতাম, ওটা কোন ইচ্ছার ব্যাপার নয়।

এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাই আমার মনে পড়ছে, এবং সত্যি বলতে কি, নীল রং দেওয়া যে সব ছবি শ্রীরামের নামে এ দেশে চলে, তার সঙ্গে আমি কোথাও আমার মিল খুঁজে পাই না। ছবির মত সে-রকম নীলবর্ণ পুরুষ হয় কিনা, আমি জানি না, কিন্তু নিজেকে ও-রকম নীলবর্ণ ভাবতে, সত্যি বিশ্রী লাগে।...

তবু আমি বলব, আমার প্রতি মুগ্ধ চোখ অনেক দেখেছি, এবং সেই কারণে আমার মনের মধ্যে একটা সন্তোষের ছাপ দেখতে পাই, যা আমার মত উদাসীনের পক্ষে একেবারেই অনুচিত, কিন্তু ভিতরে খুশির আমেজের কথাটা স্বীকার না করে পারি না। পরে তা ভেবে বিরক্তি বোধ করি। এবং বুঝতে পারি, আমি যখন বাইরে দর্শনার্থী বা অন্যান্য লোকজনের সামনে যাই, তখন কেন কারুর দিকেই ভাল করে তাকাই না। কারণ, আমার মধ্যে অহঙ্কার কাজ করে, যদিচ আমার চেহারাই সব নয়, আমার অবস্থা, পরিবেশ, জীবনধারণের পদ্ধতি, সবই সেই অহঙ্কারের মূলে থাকে। কারণ আমি সত্যি

প্রায় রাজা, প্রভূত ধন-সম্পত্তি, গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে আমার জিম্মায় আছে, এবং বিশাল প্রতিষ্ঠান, যেখানে অনেক লোক কাজ করে, বিরাট লোকবল আমার আছে, যদিচ বর্তমানের ভারতীয় সরকার নানানভাবে তাদের হাত আমার সীমার মধ্যে ঢুকিয়েছে, নানান নিয়ম-কানুনের মধ্যে আমার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছে, আমার নয়, আমাদেরই বলাই উচিত এবং তাদের প্রতিনিধিকে, জনসাধারণের প্রতিনিধিকে, আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাবার পদ্ধতি নিয়েছে, অর্থাৎ খবরদারি করতে চেয়েছে, তথাপি আমিই সর্বেসর্বা। আমিই প্রধান, এবং সভাপতি শব্দটা (প্রেসিডেন্ট) যদিও এখানে অচল, তবু সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী, আমি তাই।

অবিশ্যি, পদাধিকারের বলেই একথা বলছি, যদিচ আমার স্বীকার না করে উপায় নেই, আমার এই পদাধিকারের পিছনে যিনি কারণ হিসাবে আছেন, তিনিই সব কিছু। তাঁকে বলা যায় সর্বনিয়ন্তা। এখানে তাঁর কথাই রীতিনীতিপদ্ধতি, তাঁর ইচ্ছাই এখানে সকলের ইচ্ছা, কাজকর্ম-পরিচালনা সবকিছুর মধ্যে তিনিই আছেন, এবং আমিও। তাঁর নির্দেশ-উপদেশ নিয়েই আমি চলি। তিনি আমাকে যা যা হতে বলেছেন, আমি তাই হয়েছি, যা করতে বলেন, তাই করি। তিনি তাঁর পদে আমাকে অভিষিক্ত করেছেন বলেই, আমার এই পদাধিকার, তিনি আমাকে তাঁর জায়গায় রেখে কাজ করাতে চান বলেই আমি কাজ করি। আমাকে যদি মুকুটপরা রাজা বলা যায়, তাঁকে বলা যায় রাজস্রষ্টা। সরকারী প্রতিনিধি (ঘুষখোর) অর্থাৎ অফিসার, জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দ, (এঁরাও একই গোত্রের) এমন কি আমিও, তাঁর ক্রীড়নক বলা যায়।

আমাকে আমি ঘুষখোর বলতে পারতাম, কিন্তু আমি যে মহারাজ, সবই যে আমার ভোগে ও রক্ষণাবেক্ষণে আছে, অলিখিতভাবে আমাকেই এখানকার সবকিছুর মালিক বলে মনে করে সবাই, এবং সেটা নেহাত মিথ্যে কথাও নয়, অতএব, আমাকে ঘুষখোর বলা যায় না। একেবারে শেষ বিচারে, আমাকে চোর বলা যাবে বা ভণ্ড বলা যাবে, জানি না, তবে আমি একটা প্রচলিত প্রথানুযায়ী কাজ করে চলেছি, যা কিছু ভোগ করছি, সেই নিয়মানুযায়ীই করছি!

আমি একটা বিরাট এস্টেটের সর্বেসর্বা, যে এস্টেট দেশীয় রাজা মহারাজাদের রাজ্য বা জমিদারি নয় যে, সরকার বাজেয়াপ্ত করবে, বা লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে, সরকারী ভূখণ্ডের মধ্যে মিশিয়ে নেবে। অবিশ্যি আমি সত্যি জানি না, এত জমিদারি গেল, রাজাদের রাজ্য গেল, কিন্তু সে-সব ভূখন্ডের অধিকারী কারা হল, কাদের মধ্যে বণ্টন হল, যদিচ জমিদারি বা রাজাবৃত্তি দেশ থেকে উঠে গিয়েছে, কিন্তু প্রজারা ভূমি-হীন নিঃস্ব ও ক্ষুধাকাতর হয়ে চীৎকার করছে যে-চীৎকার ক্রমেই এত বেশি উচ্চগ্রামে উঠছে যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে, অনেক, অনেক দূরে থেকেও অস্বস্তিবোধ করি, কারণ চীৎকার কেন আমার কানে পেঁছায়, কারণ আমার কানে তা আসা অনুচিত, এবং আসলে এসবই আমার সেই বিতর্কের, আমার সংকটের সঙ্গে জড়িত।...

boiRboi.net

জমিদারি বা রাজাদের রাজ্য সরকার নিতে পারে, কিন্তু ধর্মে হাত দিতে পারে না, তাই আমি যে রাজ্যের মধ্যে আছি, সে রাজ্য ঈশ্বরের, বিশেষ এক দেবতার বিগ্রহই সব

কিছুর মালিক এবং সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেও (সাড়ে তিন শো বছরের কম নয়) যেভাবে সেবক নিয়োজিতহয়ে এসেছেন, আমিও, কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা বাদ দিলে, সেইভাবেই নিয়োজিত হয়েছি। আমি একজন মোহান্ত, এই মঠের অধ্যক্ষ যাকে বলে।

সরকারী নিয়মানুযায়ী, আগের সেবকদের তুলনায়, আমার বা আমার যিনি প্রাক্তন, তাঁর শেষদিকের কিছু কাল মঠ এবং বিগ্রহসেবার স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয়েছে, কারণ যে সম্প্রদায়ের দ্বারা এই মঠের সৃষ্টি হয়েছে ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের সরাসরি ক্ষমতার মধ্যে ট্রাস্টি-বোর্ড গঠিত হয়েছে, অর্থাৎ সরকারী প্রতিনিধি, ধার্মিক ও জনসাধারণের প্রতিনিধি, তাঁরাও এতে যোগদান করেছেন, সবাইকে নিয়ে ট্রাস্টি-বোর্ড তৈরি করা হয়েছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য, আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা। যদিচ, আরো নানান কারণের উল্লেখ আছে, যথাঃ এই মঠের বিগ্রহ যেহেতু ধার্মিক জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত জাগ্রত, (কথাটা কেন এভাবে ভাবা হয়, আমি জানি না। প্রায়ই শোনা যায়, অমুক জায়গায়, অমুক মন্দিরের, অমুক ঠাকুর খুবই জাগ্রত। যেন কোন কোন ঠাকুর কম জাগ্রত বা নিদ্রিত। সম্ভবত লোকেরা, যারা রোগ-শোক-লাভ-লোকসান ইত্যাদির সাফল্য বিষয়ে দেবালয়ের দ্বারস্থ হয়, এবং যেভাবেই হোক, যেখানে বেশি ফল লাভ হয়, সেই দেবালয়ের ঠাকুর সম্পর্কেই এই ধরনের প্রচার হয়ে থাকে। কী ভাবে ফললাভ হয়, সে-বিষয়েও আমার সম্যক কোন ধারণা নেই, তবে এই মঠের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে-দেবতা ও মন্দিরের যত বেশি প্রচার, যত বেশি অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত, অথবা মিথ্, অর্থাৎ পৌরাণিক কথা লোকের মুখে মুখে চলে, সেই দেবতাই তত বেশি জাগ্রত, এবং আমি স্বীকার না করে পারি না, যারা নানান ফললাভের আশায় জাগ্রত দেবতার পিছনে ছোটে, তারা খুবই অসহায় ও দুঃখী।) যেহেতু এই বিগ্রহের কাছে সারা বছরে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, পূজা দেয়, তারা যাতে না ঠকে, ভালভাবে পূজা দিতে পারে, কোনরকম নিগ্রহ ভোগ না করে, এই সব নানান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও, কতগুলো কারণ।

তবু মূলে, টাকা-পয়সাই আসল, কারণ ভক্তদের টাকা যাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে না যায়, ব্যক্তিবিশেষের ভোগে ব্যয় না হয়, অর্থাৎ সোজাসুজি বললে, এই রকম বোঝায়, আমি বা আমার লোকেরা চুরি না করতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি না করতে পারে, কারণ জনসাধারণের টাকাতেই যেহেতু মঠ চলে, সেই হেতু মঠ জনসাধারণেরই সম্পত্তি, (ভারতবর্ষের সবই তো জনসাধারণের, তাদের দিকে তাকালেই কি তা বোঝা যায় না?) অতএব জনসাধারণের অধিকার আছে, মঠের আয়-ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানবার, এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করবার প্রতিনিধিও চাই। আর জনগণের সরকার যখন রয়েছে, তখন জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে তাদের কর্মচারীও এখানে থাকবে, ধরেই নেওয়া যায়। সাড়ে তিনশো বছর আগে, প্রধানত যিনি এই মঠের সৃষ্টি করেছিলেন, পরে যাঁরা এই মঠের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন, নানারকম দানের দ্বারা এবং ব্যবসায়ের দ্বারা, (এই মঠ যারা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের ব্যবসাতে কোনরকম বাধা ছিল না। দান ও দর্শনী বাবদ যে টাকা-পয়সা পাওয়া যেত তা দিয়ে, বিগ্রহের ও মঠের নামে ব্যবসা করবার অধিকার তাঁদের ছিল, মঠেরই আয় বাড়াবার জন্যে। যে কারণে মঠের এই বিশাল ভূখণ্ড বা নানান শহরে বড় বড় গদী এক ধরনের মার্চেণ্ট

অফিসই বলা যায়, সবই আছে, এবং তার আয়ের অঙ্কটা স্বভাবতই বিরাট। সেই সব জমিজমা, কৃষি প্রজা—ধরেই নিতে হবে, প্রজারা সকলেই এই বিগ্রহের প্রজা, কারণ, তিনি জমির মালিক এবং তিনিই যেহেতু এই মঠের দ্বারা সেবিত, সেই হেতু এই মঠেরই প্রজা বলা যায়, সেই সব প্রজাদের মধ্যেই জমি চাষ-আবাদের জন্যে ভাগ ও বর্গা দেওয়া আছে, যার ফসল ইত্যাদির হিসাব দেখা-শোনা, প্রজা-উচ্ছেদ বা বন্দোবস্ত, এমন কি শাসন-পালন, সামাজিক নিয়মকানুন-বিবাহ-শ্রাদ্ধ সবই মঠের কর্মচারীরা করে এসেছে, ব্যবসার গদীগুলোও তাই।) তাঁরা বর্তমানের গণতন্ত্রের কথা জানতেন। তখন মঠের যিনি অধ্যক্ষ, (মোহান্ত) তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ চালাতেন, যদিচ তিনিই সর্বেসর্বা, তাঁর কথাই শেষ কথা।

নবাবী আমলে বা ইংরেজ আমলেও সেইভাবেই চলে এসেছে, এবং সেই সব আমলে এই মঠের বিরুদ্ধে কোন কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, স্বয়ং দেবতার প্রজারাই বিদ্রোহ করেছে, যে কারণে অনেক অবাধ্য প্রজাকে বিগ্রহের সামনেই বুকে বাঁশ চাপা অবস্থায় মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরতে হয়েছে, বেত্রাঘাতে জর্জরিত হতে হয়েছে, ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, অথবা, স্বয়ং শ্রীমাধবের (এখানকার প্রধান বিগ্রহের নাম।) হস্তিযূথ (এক সময়ে বারোটি মেয়ে ও পুরুষ হাতি ছিল, যাদের কেউই এখন আর জীবিত নেই। এখন যে-দুটি আছে তারা অনেক পরের, এবং না বললেও চলে, এ দুটিও ভক্তের দান। বরাবরই শ্রীমাধবকে ভক্তরা হাতি দান করে এসেছে, এবং মাধব মঠে হাতি তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আছে, বেশি আর কম।) অবাধ্য প্রজার বা মঠের বিরুদ্ধাচারীদের গ্রাম ও ঘর আক্রমণ করে, চুরমার করে দিয়েছে। তবে সে সব বিদ্রোহের সংখ্যা অনেক নয়, এবং প্রজাবিদ্রোহ, তা যেকোন কারণে, যার বিরুদ্ধেই হোক, জমিদার সরকার বা শ্রীমাধব, সব বিদ্রোহই কঠিন হাতে দমন করা হয়েছে, কারণ প্রজাবিদ্রোহ কোন শাসকের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এ ছাড়া, কোন কোন সময় মঠের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে, এবং দু-একজনকে জেলবাসও করতে হয়েছে, এমন কি, এই সাড়ে তিনশো বছরের মধ্যে, অন্তত তিনজন অধ্যক্ষকে, যাকে মোহান্ত বলা হয়, খুন হতে হয়েছে। একজন ছাড়া, বাকি দু জনের হত্যাকারীকে কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় নি। খুনের পিছনে কোন কারণ ছিল না, এমন কথা বলা যাবে কিনা জানি না, কিন্তু কী কী কারণ থাকতে পারে, তার বিচার করতে গেলে, নারী সম্ভবত তার মধ্যে একটি, কারণ নারীঘটিত কিছু কিছু ঘটনা শ্রীমাধবের মঠ সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে। যে অধ্যক্ষের হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তার ঘটনাকাল তিরিশ বছরের বেশি নয়, এবং সেই হত্যাকারীর জবানবন্দী থেকে জানা গিয়েছিল, সেই সময়ে অধ্যক্ষেরঅধীনে কম করে পঞ্চাশটি যুবতী ছিল, প্রায় একটি গোটা হারেম সেই অধ্যক্ষ মহারাজের, এই প্রাসাদেই ছিল, যাদের মধ্যে বিহারী, ওড়িয়া ও বাঙালী, তিন প্রদেশের মেয়েই ছিল, এবং বেশির ভাগই ছিল, বাংলার ও বিহারের সীমান্তের মেয়ে; উড়িষ্যার বেলায় তা হয় নি, কারণ এই মঠ বাংলা ও বিহারের সীমানায় পড়েছে, যে কারণে সাম্প্রতিক বিহার-বাংলার সীমানা নির্ধারণে মাধবগড় (গ্রামের নাম) কোন প্রদেশের মধ্যে পড়বে, তা নিয়ে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত মাধবগড় বিহারের মধ্যেই পড়েছে।

boiRboi.net

আমি জানি না, এইরকম একটা সীমানা, বিশেষভাবেই বেছে নেওয়া হয়েছিল কিনা, কিংবা তিনি (যিনি প্রথম শ্রীমাধবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।) দান হিসাবে কারুর কাছ থেকে এখানেই জমি পেয়েছিলেন হয়তো, আর দাতার পক্ষে সীমান্তভূমির জটিলতা ও সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভবত বিরক্তিকর ছিল, কারণ, যে সীমান্তে দুই জাতি পাশাপাশি বাস করে, সেখানে গোলমাল প্রায়ই লেগে থাকে, তাদের ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে। তাই তিনি সীমান্তের ভূমি বিগ্রহকে দান করে দিয়েছিলেন।

যে কারণেই হোক, শেষপর্যন্ত মাধবগড় বিহারেই ঢুকেছে, এবং তার জন্যে, এখানকার বাঙালীরা তেমন কোন আপত্তিই তোলে নি। কারণ বাংলার এমন একটা সীমানায় এই অঞ্চল, যাকে বিহার প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে আছে, যার একদিকে সাঁওতাল পরগনা, এবং ঠিকমত বলতে গেলে, মাধবগড় প্রকৃত সাঁওতাল পরগনার মধ্যেই পড়ে, এবং সাঁওতাল পরগনার সমগ্র অংশই প্রায় বিহারে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর যেসব বাঙালী এখানকার প্রাচীন অধিবাসী, বাংলার মূল জীবনের সঙ্গে তাদের তেমন যোগাযোগ কখনো ছিল না। যেসব বিহারী আছে, তাদের মূল বিহার-সংস্কৃতির সঙ্গে তেমন রক্তের যোগাযোগ নেই, এবং অনেক কারণেই দেখা গিয়েছে, বাংলা বা বিহারের কোন জাতীয় সংকটে বা সুখেই, এদের কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি। যে কারণে, ভৌগোলিক সীমার এই বৈশিষ্ট্যই সম্ভবত তিরিশ বছর আগের খুন-হওয়া অধ্যক্ষের রক্ষিতাদের অধিকাংশই ছিল বিহারী ও বাঙালী, এবং যে তাকে খুন করেছিল, সে ছিল একজন বিহারী। খুনের কারণ ছিল, তার স্ত্রীকে অপহরণ, ধর্ষণ, (ছি ছি, বিরক্ত সাধু, এই সব অনুচিত চিন্তা কেন তোর মনে !) ও সর্বোপরি বশীকরণ, কারণ জবানবন্দীতে সে বলেছিল, মহারাজ তার স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে এসে ভোগ করার জন্যেই সে খুন করে নি, কিন্তু স্ত্রীকে যখন সে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তখন তার স্ত্রী যেতে চায় নি। হয়তো, স্ত্রী ভয় পেয়েছিল স্বামীর সঙ্গে যেতে, কিংবা তার লোভ ছিল এখানকার ঐশ্বর্যভোগের (যে ভোগ করতে চায়, তার পক্ষে শ্রীমাধবের ঐশ্বর্য নিশ্চয়ই লোভের, কারণ অনেক রাজা-মহারাজাও সোনা-রুপা টাকা বিত্ত এত সঞ্চয় করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ, এবং মহারাজের অনুগ্রহ নিয়ে সারা জীবন কিছু জমি-জমা পেয়ে জীবনধারণ অসম্ভব ছিল না।) অথবা তার মহারাজকেই বেশি পছন্দ ছিল, যেটাকে খুনী স্বামী ভেবেছিল, তার স্ত্রীকে মন্ত্র দিয়ে বশীকরণ করা হয়েছে, আর সেটাই তার সমস্ত ক্রোধকে জাগিয়ে তুলেছিল, অর্থাৎ স্ত্রী তার কাছে যেতে চায় নি, যাকে সে পাপীর দ্বারা অপহৃতা ধর্ষিতা ভেবে করুণা করে (সম্ভবত) গ্রহণ করতে চেয়েছিল, (তার মানে কি এই, সেই লোকটি তার স্ত্রীকে ভালবাসত, পেতে চেয়েছিল, অন্যথায় তার পক্ষে জীবনধারণের কোন অর্থ থাকছিল না।) তাই তার সমস্ত ঘৃণা মহারাজের ওপরেই ফেটে পড়েছিল, কারণ বশীকরণ করে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নেবার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই পড়ে। আমি শুনেছি, তাঁকে এই ঘরেই (মহারাজকে) বর্শা বিঁধিয়ে মারা হয়েছিল। এবং আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তখন কি তিনি এখানে এই আয়নার সামনেই···এই ঘরে, এই শ্বেতপাথরের মেঝেয়, পঞ্চাশটি মেয়ে···আশ্চর্য, এই প্রাসাদে রক্ত এবং···। কিন্তু না, আমি এসব কথা ভাবতে চাই নি, যে কারণে প্রায় ভ্রূকুটি করে চোখ পাকিয়ে আমার প্রতিবিম্বের দিকে তাকালাম, এবং দেখলাম,

boiBoi.net

আমার মুখটা রক্তচন্দনের ছিটার আড়ালে আবার চলে গিয়েছে, অথচ আমি সরে দাঁড়িয়েছিলাম, এবং আবার তাড়াতাড়ি সরে এলাম, আর হাত বাড়িয়ে রক্তচন্দনের ছিটাগুলো ঘষে দিলাম।

কিন্তু চন্দনের দাগ উঠল না, ইতিমধ্যেই শুকিয়ে গিয়েছে। আমি নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে দিলাম, তাতে ছিটাগুলো উঠে গেল, কারণ রক্ত বা চন্দন বা মৃত্তিকা, এই জাতীয় যা কিছুই হোক, যদি তেলের কিছু না হয়, তা হলে আয়নায় তা দাগ রাখতে পারে না। শুকিয়ে গেলে, খোঁচা দিলে, আপনিই ঝরে যায়। আমি কঠিন মুখে নিজের দিকে তাকাই, এবং নিজেকেই না বলে পারি না, সময় ও নিশ্চিন্ত জীবনের, এসবই আমার অলস ভাবনার বিলাসিতা, কারণ, আমি কেন এসব কথা ভাবি। কিন্তু নিজের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেরই ভিতরে কোথায় যেন একটা বাঁকা হাসি আমি ফুটে উঠতে দেখি, যার চিহ্ন আমি আমার ঠোঁটের কোণে (বিরক্তির সঙ্গে) ফুটে উঠতে দেখি, এবং তারপরে নিজেকেই নিজে, খানিকটা বিদ্রূপ করেই, (সত্যি, এত লজ্জা করে) হেসে উঠি, আর বলি, তোমার কোন সংকটই নেই, সবটাই তোমার ভণ্ডামি। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে আমি সুখে থাকি না কেন, নিশ্চিন্তে সুখের পরশে, আরামে, সমস্ত কূট ভাবনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়ে, কেবল একজন অধ্যক্ষের মত, মহারাজের মত··· ।

না আবার আমি ভুল ভাবছি, কারণ মঠের অধ্যক্ষের মত ঈশ্বরের চিন্তা, বা অন্য জীবন, যাকে সাধারণ মানুষের জীবন বলে, আমি তার কোনটার মধ্যে অবস্থান করতে পারছি না বলেই আমি সংকটের কথা বলেছি। অথচ আমি যে-জীবন গ্রহণ করেছি, আমার এই উৎসর্গ-করা জীবন, সেখানেই বা সুখ, নিশ্চিন্ত আরামের কথা আসে কেন। বরং আমার সমগ্র চিন্তার মধ্যে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের ভাবনা, এবং এই জীবন, সকলই একটা নিয়মের অধীন, যে নিয়মের মধ্যে আমার সবকিছুই নিয়োজিত, অতএব একে আমি নিশ্চিন্ত সুখ, পরম আরাম ইত্যাদি ভাবি কেন। সত্যি, আমি নিজেকে শাসন করতে শিখি নি, এবং লক্ষ্য করে দেখেছি, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালে, নিজের চোখের দিকে তাকালে, আমি আর সবকিছুই ভুলে যাই। এর থেকে এইরকম প্রমাণ হয়, আমি নিজেই নিজেকে বিব্রত করি, এবং সম্ভবত নিজেকেই নিজে ভয় পাই, নিজেকেই নিজে বিরক্ত করি। আমি আয়নার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই। আমার যা কাজ তাতে মনোনিবেশ করি।

আয়নায় ডান পাশেই শ্বেত-পাথরের টেবিলের ওপরে শ্বেতপাথরেরই পাত্রের বুকে, সুগঠিত সুন্দর ছোট ছোট পাথরের বাটিতে চন্দন রয়েছে, এর প্রত্যেকটি বাটিই মুকুটের মত উঁচু চূড়ার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ঠান্ডা পাথরের বাটিগুলোতে ঠাণ্ডা চন্দন, সবকিছু মিলিয়ে এক কথায় পবিত্রতার চেয়েও যেন আরামের, না, তার চেয়ে বেশি, একটি ভোগের সামগ্রী বলে মনে হয়।

আমার নিজেরই হাসি পায় ভাবতে, মিষ্টি হলে, এ চন্দন হয়তো খেতেও ইচ্ছে করত। কয়েকটি বাটিতে শুধু চন্দনই নেই, সম্প্রদায়ের নিয়মানুযায়ী, গোপীচন্দন-মৃত্তিকা এবং এই গোপীচন্দন মৃত্তিকা দ্বারকা থেকেই একমাত্র সংগ্রহ করা হয়, তা ছাড়া,

boiRboi.net

এই তল্লাটের নদীর ধার থেকে আনা রক্তাভ মাটি, যা মঠেই থাকে, কাজের সময় জল দিয়ে গুলে নেওয়া হয়, সবই এক একটি পাথরের বাটিতে সাজানো আছে। কারণ আমাকে এবার এইসব জিনিস দিয়ে, সারা গায়ে ছাপ দিতে হবে, সম্প্রদায়ের ভাষায় যাকে তিলকসাধন বলা হয়।

এখানে যে-কোন সাধকেরই তিলক আঁকা একটি প্রধান অঙ্গ—অঙ্গ বললে ভুল হয়, সাধনার অঙ্গ বলা উচিত। স্নানের পর, এইটি আমার প্রথম কাজ, প্রতিদিন। অনেক সময়, অনেকের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাকে আমার প্রসাধন বলেই মনে হয়েছে, অথচ প্রসাধন হিসেবে এ ব্যাপারটাকে ভাবাও পাপ। আমি এই জন্যে প্রসাধন ভাবছি যে, তিলক সুন্দর করে আঁকা একটা বিশেষ পরিশ্রমের কাজ, এবং যারা তিলক সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন, অবিশ্যিই তিলক কাটা যাদের ধর্মে প্রায় বাধ্যতামূলকই বলা যায়, তাদের অনেককে দেখেছি, অনেকক্ষণ ধরে বেশ নিবিষ্ট হয়ে প্রতিটি ছাপ আঁকতে, এবং যতটা সম্ভব নিখুঁত করে তুলতে। মনে হয়, শিল্পীর মতই মনোযোগ দিয়ে ছাপ আঁকতে হয়। আমাকে অবিশ্যি কোনদিনই আঁকতে হয় না, কারণ একটি পাথরের পাত্রে কয়েকটি সোনার ও রুপার ছাপ রয়েছে, যেগুলো একমাত্র, আমার, অর্থাৎ মহারাজের ব্যবহারের জন্যে। এইসব সোনা আর রুপোর ছাপগুলো, (কয়েকটা কাঠ আর পাথরের ছাপও আছে।) নানান সময় নানান ভক্তরাই দান করেছে, যার মধ্যে বিষ্ণুর স্মারকচিহ্ন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ছাড়াও বিষ্ণু বা ওঁ শব্দের ছাপও রয়েছে, এবং শব্দের ছাপগুলো সবই যে সংস্কৃত অক্ষরে তা নয়, কোন কোনটা বাংলাও আছে।

এতে বোঝা যায়, অবাঙালী ভক্তরা বোধ হয় সংস্কৃত অক্ষরের গুলো দিয়েছে। সংস্কৃত আর দেবনাগরী হরফে তেমন একটা তফাত করা যায় না বলেই বোধহয়, সংস্কৃত দেওয়া গিয়েছে, অন্যথায় হিন্দীতে দেওয়া যেত, যে কারণে বাঙালীরা বাংলা অক্ষরে দিয়েছে, অথচ সত্যি বলতে কি, বাংলা তো দেবাক্ষর নয়। কিন্তু আমি যদি ইংরেজীতে বিষ্ণু নাম আঁকবার কথা চিন্তা করি, তাহলে একটাই জবাব আছে, ওটা ম্লেচ্ছ ভাষা, ওতে আর যাই হোক সাধকের গায়ে ছাপ দেওয়া যায় না। এধরনের চিন্তাই বা আমার মনে উদয় হয় কেন, তা জানি না। যেমন, এই মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে একজন সাহেবের মূর্তি ভাসছে, অর্থাৎ কোন ইয়োরোপীয়, যে এই ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং যার গায়ে ইংরেজীতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ নাম ছাপা আছে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে, আমি একজন কালা দেশের কালা লোক, অনেকটা যেন অবাক হয়ে হাঁ করে সাহেব সাধু দেখছি, গোরা গায়ে গেরুয়া ডোর কৌপীন, আর ইংরেজীতে দেবতার নাম ছাপা।

আবার না হেসে পারি না, যে হাসিটা আসলে নিজেকেই খানিকটা বিদ্রূপের মত, কারণ নিজেকে আবার আমি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে পারছি না এ সবই অলস ও বিলাস ভাবনা ছাড়া, কিছু নয়, কিংবা সেই আমার বিতর্কের···না থাক।

আমি সোনার শঙ্খ ছাপটা তুলে নিয়ে গোপীচন্দের গোলায় তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে নিই, এবং বুকের কাছে তুলে নিয়ে আসি। মাথা নিচু করে যদিও আমি বুক দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক জায়গায় না পড়তে পারে ভেবে, আবার আয়নায় মুখোমুখি সরে দাঁড়াতে হয়। ভুরু কুঁচকে একবার চোখের দিকে তাকিয়েই বুকের শঙ্খ ছাপের জায়গায়

boiRboi.net

লক্ষ্য স্থির করি, এবং সোনার শঙ্খটা ছেপে দিই। প্রথমটা ভেজা অবস্থায় থাকে বলে, একটু অস্পষ্ট দেখায়। তা ছাড়া, আমার একটা সুবিধে আছে এই যে, আমার গায়ে তেমন লোম নেই। বেশি লোম থাকলে, এক একজনের যেমন থাকে, আমার ধারণা, বেশির ভাগ লোকেরই থাকে এবং আবার এমন কথাও শুনেছি, বুকে লোম না থাকলে, সেই পুরুষ নাকি নির্দয় হয় অথচ উলটো ব্যাপারও আমি কম দেখি নি, অর্থাৎ লোম-ওয়ালা বুকের মানুষকেও নিষ্ঠুরতা করতে দেখেছি। অবিশ্যি আমার স্বীকার করা উচিত, যাদের বুকে চুল নেই, এমন মানুষকেও ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা করতে দেখেছি। আমার নিজের সম্পর্কে ধারণা, আমি খুব নিষ্ঠুর, শুধু নিষ্ঠুর বললে ঠিক বলা হয় না সম্ভবত ক্রুর এবং নির্দয় বলতে যা বোঝায়, আমার মধ্যে সেই সব বিষয় খুবই আছে যা এমন কি নিজের কাছেই নিজে স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করি, লজ্জা পাই, অবাক হই ভেবে যে, আমার মধ্যেও এমন ভয়ংকর একটা মানুষ আছে. যদিচ আমাকে কেউই কখনো কোন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতে দেখে নি, আমি প্রকাশও করি নি, অথচ আমার মধ্যে তাকে দেখতে পেয়েছি, কখনো স্বপ্নের মধ্যে, কখনো কোন ঘটনার অন্যমনস্ক চিন্তায়, এবং তখন আমার এই মুখ, যা জয়মনের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের মত পবিত্র সুন্দর বলে মনে হয়, আর অনেকের মুগ্ধ, এমন কি, হ্যাঁ বলাই উচিত, নারী—মানে মেয়েদের চোখে সলজ্জ লোভাতুর, কিংবা লোভাতুর নয়, এসব আমারই পাপ চিন্তা, কিন্তু মনে হয়েছে যেন, 'ওহে প্রিয়, ঘন নিশ্বাসে যবে বাঁকা গ্রীবে, নত মুখে থাকি, জানিবে সকল রক্তকণা ওষ্ঠে আসি প্রতীক্ষা করে তোমার চুম্বনের।' (সংস্কৃত কাব্য থেকে আমার অনুবাদ) এইরূপ ভাব-ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে। ছি, জানি এও আমার পাপ চিন্তা, বিরক্ত বৈরাগী—কিন্তু যাই হোক, আমার এই মুখ তখন বীভৎস হয়ে ওঠে। যেন আমি আমার দাঁতে দাঁত ঘষবার শব্দ শুনতে পাই, আর দুই হাত পশুর থাবা, রক্তে মাখামাখি।

এর কারণ কি আমার বুকে লোম নেই, তাই? (সম্ভবত এটা কোন কুসংস্কারের বিশ্বাস।) যেমন আমাদের জয়মনের বুকেই অনেক লোম, তাদের পক্ষে এই সব স্মারকচিহ্নের ছাপ লাগানো বড় অসুবিধা। সেই জন্যে জয়মনকে প্রায়ই বুক কামিয়ে ফেলতে হয়, যে কারণে তার কামানো গালের থেকেও বুক কর্কশ খরখরে সবুজ। ওর খুব কষ্ট, যখন আমি দেখি, প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই বেচারীকে একদিন মঠের প্রজা-নাপিতের কাছে বুক খুলে বসতে হয়, আর নাপিত জল দিয়ে ভিজিয়ে ওর বুকের ওপর খরখর শব্দে ক্ষুর চালায়। এর একমাত্র কারণ, তিলক সাধন নইলে ছাপগুলো দিতে পারে না।

শুধু জয়মনই নয়, অনেককেই এই দুর্গতি মেনে নিতে হয়েছে, নইলে তারা ছাপ পরতে পারে না। যদি না-ই পরা হত, একথা ভাবা অন্যায়, কারণ তাহলে কোন প্রশ্নই ছিল না, যেমন বিবাহিতা হিন্দু মেয়ে সিঁদুর পরবে না, একথা ভাবাও যেমন, তেমনি এই সম্প্রদায় তিলক আঁকবে না, সেই রকমই ভাবা হয়।

boiRboi.net

কিন্তু সোনার শঙ্খ এঁকে ভুল করলাম, তার আগে আমার কপালের তিলক এঁকে নেওয়া দরকার, আর সেটা এঁকেই নিতে হয়, কারণ তার কোন ভাল ছাপ হয় না।

ওপর থেকে শুরু না করলে, নিচের চিহ্নগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এবং এ রকম ভুল আমার প্রায়ই হয়, যেমন আমি যখন ভাবি 'বুকে, তিলক আঁকা' কথাটা নীতিবোধযুক্ত নয়, আমার ভাবা উচিত, হৃদয়ের তিলক ধারণ।

নিয়মানুযায়ী, আমাদের দ্বাদশ অঙ্গে, শরীরের বারোটি জায়গায় তিলক আঁকতে হবে, এবং তার নামগুলো এইরকম—ললাট, কন্ঠ, বামবাহু, দক্ষিণবাহু, হৃদয়, নাভি, বামপার্শ্ব, দক্ষিণপার্শ্ব, বামকর্ণমূল, দক্ষিণকর্ণমূল, শিরোমধ্য এবং পৃষ্ঠদেশ—এর নাম তিলকের দ্বাদশ অঙ্গ। শিরোমধ্যকে ব্রহ্মতালু বলা যায়, পিঠেরটা একটু বেকায়দা, তবে তেমন অসুবিধা নেই। কতগুলো এমন আসনের অভ্যাস আছে, জোড়হাত বুকের ওপর-রেখে যেভাবে নমস্কার করে, পিছনে, পিঠের ওপরেও হাত উল্টো করে, ঠিক তেমনিভাবেই জোড়হাতে নমস্কার করা যায়, অতএব পিঠে একটা গোপীচন্দনের তিলক এঁকে দিতে অসুবিধা হয় না। মাথারটা কেউ দেখতে পায় না, বিশেষ করে যাদের মাথায় টাক নেই, চুল থাকলেই তার দাগ পড়ে না, তবু নিয়মরক্ষা করতেই হয়।

আমি চন্দন কাঠের কাঠি তুলে নিয়ে, গোপীচন্দনের বাটিতে ডুবিয়ে, নাকের ডগা থেকে কপালের চুলের গোড়া অবধি টেনে দিলাম। নিয়ম হচ্ছে—নাসা-মূল অবধি কেশ পর্যন্ত, দুইটি ঊর্ধ্বপুন্ড্র রেখা টানিবে, দুই রেখার নাসা-মূল-স্পৃষ্ট উভয় প্রান্ত, অপর একটি ভ্রূ-মধ্য-গত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দিবে। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করলে কথাগুলো এই রকমই দাঁড়ায়, যদিচ বই পড়ে জানার থেকেও অপরেরটা দেখেই শেখা যায় বেশি, এবং আমি সেইভাবেই প্রথম শিখেছি।

প্রথম প্রথম হাত কেঁপে যেত, তিলক আঁকাবাঁকা হত, প্রাক্তন মহারাজ ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে, রীতিমত পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখতেন, এবং আবার নিখুঁত করে তিলক আঁকতে আদেশ দিতেন, যে-আদেশের কোন নড়চড় হবার উপায় ছিল না। অনেকটা মিলিটারি নিয়মকানুনের মতই, পায়ের ফিতে বাঁধা থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত, এমন কি ভাল করে দাড়ি কামানো না হলেও (শুধু চোখে দেখা নয়, শুনেছি অফিসার অনেক সময় সৈনিকের গালে হাত বুলিয়ে পর্যন্ত দেখেন, এবং যদি হাতে খরখর করে, তবে আবার কামিয়ে আসবার নির্দেশ দেন।) লাইন থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এখানে তিলকের বেলাও সেই রকম। যেমন-তেমন করে শরীরের বারো জায়গায় বারোটি দাগা বুলোলেই হয় না। সম্ভবত মনোযোগ ধৈর্য এবং আচার-আচরণের নিয়মতান্ত্রিকতা যাতে বাড়ে, সেই জন্যে সবকিছুর মধ্যেই একটা কঠোর নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ এসব ক্ষেত্রে আবার সকলই দেবতার নির্দেশ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, যে কারণে মানুষের অন্যান্য নিয়মকানুনের থেকেও এসব নিয়মকানুনের ভাবনা-ধারণা আলাদা, যদিচ, তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেকেই আবার যেমন-তেমন করে সবকিছু সারতে চায়।

এই মঠেই এ-রকম কয়েকজন আছে, যাদের তিলক অপরিচ্ছন্ন, আঁকাবাঁকা, স্বয়ং মহারাজও যাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না, কারণ সারা জীবনব্যাপীই তাদের কখনো সংশোধন করা যায় নি।

এখন আর আমার হাত কাঁপে না, বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট দুটো রেখা আমি কপালের চুল অবধি নিয়ম অনুযায়ী টেনে দিয়ে, ভুরুর কাছে মিলিয়ে দিই। আর যখনই এটা টানতে যাই, তখনই আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

ছেলেবেলায় আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে এক ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই কোন না কোন উৎসব হত, এবং তখন কৃষ্ণের নানা লীলা, (আমাদের এ মঠের আসল বিগ্রহ বিষ্ণু, আদি মন্দির যেটাকে বলে, সেখানে বিষ্ণুরই বিগ্রহ, এবং তখন বিষ্ণুর কোন শক্তিও এখানে ছিল না, এখন লক্ষ্মীর আবির্ভাবও হয়েছে। এখন বলতে, হয়তো দেড়শো-দুশো বছর আগে আর তারো পরে কৃষ্ণের মন্দিরও হয়েছে এবং যথানিয়মে রাধাও তার পাশে এসেছে, যে-কারণে আমার ধারণা, মাধবগড়কে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যেই, লক্ষ্মী বা রাধা-কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে, আর সত্যি বলতে কি, দেবতার কোন দেবী থাকবে না, অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সেটা তেমন ভালই লাগে না। ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ করে, দেবতার যুগলমূর্তি খুবই প্রিয়। সম্ভবত তাতে মানুষের মানুষিকতা প্রকট হয়ে ওঠে, যার ভিতর দিয়ে সে নিজের ছায়া দেখতে পায় আর কল্পনার সুযোগ অনেক বেশি। এখানে বিষ্ণুর নাম কেমন করে শ্রীমাধব হয়েছিল, সঠিক জানা নেই আমার, কারণ মাধব বললে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে যায়, যদিচ বিষ্ণু কৃষ্ণ রাম এঁরা সকলেই নাকি এক ও অভিন্ন কেবল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল, রাঢ়ে গৌড়ে বঙ্গে যে-ধরনের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক উৎসব ইত্যাদি হয়ে থাকে, এখানে তা হয় না।) আমাদের মত পাঠশালায় পড়ো ছেলেদের সাজিয়ে দেখানো হত। সেগুলোকে ঠিক, আমরা যাকে কেষ্টযাত্রা বলি, তা বলা যেত না, অনেকটা প্রদর্শনীর মত, অথচ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার নিয়ম ছিল না, সারা ঠাকুরবাড়িতেই আমাদের ঘোরানো হত, এবং সেখানে যেহেতু অনেকগুলো মন্দির, সব মন্দিরের সামনেই আমাদের ঘোরানো হত, আমরা যারা রাধা-কৃষ্ণ গোপাল-যশোদা রাধা-জটিলা-কুটিলা ইত্যাদি সাজতাম, আর একদল আমাদের ঘিরে গান গেয়ে বেড়াত। গায়ক-বাদকেরা সকলেই বয়স্ক। যে লোকটি আমাদের সাজিয়ে দিত, অর্থাৎ মুখে রঙ মাখিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দিত, ছবি-আঁকিয়ে বলে তার নাম ছিল, এবং আমাদের ছোট শহরে সে থিয়েটারের সিন আঁকত, দোকানের সাইনবোর্ড লিখত। তার মাথায় বড় বড় চুল ছিল, রঙ ফরসা ছিল, চেহারাটা দেখতে ভাল ছিল, যদিচ, তার বউ ভয়ঙ্কর (এইরকম বিশেষণই আমার মনে আসে।) সুন্দরী ছিল, এবং আমরা ছেলেবেলাতেও পাড়ার বড়দের কথা থেকে বুঝতে পারতাম, পাড়ার যুবকেরা সকলেই সেই বউয়ের রূপের টানে মজেছিল, (আমি নিজেকে না বলে পারছি না, এসব ভাবা কিন্তু খুবই অন্যায় হচ্ছে।) এবং সবাই বউটাকে গালাগাল দিত, কারণ যারা মজেছিল, তাদের প্রতি বউটার নাকি কোন ভয়-ডর তো ছিলই না, উপরন্তু তার আচার-আচরণে অন্যরকমই দেখা যেত, যে-কারণে তাকে সবাই—না থাক।

মনে মনে যাই ভাবি, খারাপ কথা আমি মনে মনেও উচ্চারণ করতে চাই না, বা পারি না, অর্থাৎ তাকে সবাই, মেয়েদের যে ভাষায় খুব খারাপ গালাগাল দেওয়া হয়, তাই বলত। সবাই বলাবলি করত, বউটা নাকি কোনদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে, এবং যে কথাটা শুনে সব থেকে বেশি ভয়ে এবং কৌতূহলে উত্তেজিত হয়ে উঠতাম, তা হল, বয়স্করা এরকম আশঙ্কাও করত, বউটা হয়তো স্বামীকে গলা কেটে রেখে যাবে।

boiRboi.net

ছেলেবেলায়, সে দৃশ্যটা আমি অনেকবারই কল্পনা করেছি—লোকটা ঘুমিয়ে আছে, বউটা বিছানা থেকে উঠল, তার সেই বড় বড় কালো চোখ দুটো তখন যেন কেমন গোল গোল হয়ে উঠেছে, অথচ আশ্চর্য, কল্পনায় কখনো এরকম দেখি নি যে বউটার চোখ-দুটো রাগে দপদপ করছে, গলা কাটতে হলে যেরকম মানুষের হয়, বরং গোল গোল দেখতাম, আর একটা কেমন ভয় ভয় ইতিউতি ভাব। বিছানা থেকে উঠেই বউটা তাদের ছোট ঘরের যেখানে তার স্বামীর কাজের জিনিসপত্র থাকত, সেখান থেকে ধারালো কাটারিটা নিয়ে এল, (কাটারি ওখানে একটা থাকত অনেকদিন দেখেছি।) আর জল খেয়ে নেওয়া ডাবে যেমন করে কোপ বসায়, তেমনি করে গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিল। দিতেই মাথা আর ধড় আলাদা হয়ে গেল, রক্ত ছিটকে যাওয়ার কথাটা তখন মনে হত না, তবে 'রক্তগঙ্গা' বলে একটা শব্দের ছবি হিসাবে দেখতাম, বিছানা বালিশ সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে, আর বউটা পা টিপে টিপে দরজা খুলে, গায়ের আঁচল ঠিক করতে করতে (কেন তখন আঁচল ঠিক করেছিল জানি না) বেরিয়ে গেল এবং বাইরের অন্ধকারে দেখলাম, পাড়ার সেই সব যুবকেরা, (কজন, আমি ঠিক মনে করতে পারি না, চার-পাঁচ জন হতে পারে, দশ জনও হতে পারে।) শব্দ না করে হাসতে হাসতে বউটাকে জড়িয়ে ধরল, আর বউটা সকলের টানাটানির মধ্যে, ওদের মতই হাসতে লাগল।

কেন এরকম কল্পনা করতাম আমি জানি না, এবং কল্পনার দৌড় তার বেশি আর ছিল না, ওই পর্যন্ত এসেই সব শেষ হয়ে যেত। ওরকম কল্পনা যে কেবল একা একা যখন থাকতাম তখনই করতাম তা নয়, বউটার কাছে বসেই, মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় ওসব মনে পড়ত। আমি বা আমরা ছোটরা প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম, বউটা আমাদের সঙ্গে গল্প করত, পাড়ার খবরাখবর নিত, ঘরে কিছু থাকলে খেতে-টেতে দিত। তার কোন ছেলে-পিলে ছিল না, এবং তার কখনো ছেলে-পিলে হতে পারে বা কেন হয় নি, এসব কথা কখনো মনে হত না। সত্যি বলতে কি, আমাদের ছোটদের মধ্যে রীতিমত রেষারেষি চলত, কে বউটির কাছ থেকে কতখানি স্নেহ পাব, কে তার কাছে বেশি থাকতে পাব, কে তার বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারব, যার অর্থ হল, আমরা ছোট-বড় সকলেই তার রূপে মজেছিলুম, এবং এখনো তার সেই সুন্দর, টিকোলো নাক, কালো টানা ভুরু, আয়ত চোখ, লাল ঠোঁট ও তার ফাঁকে সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি, সব মনে পড়ে যায়, যে হাসি আমার মায়ের মত মোটেই ছিল না, (সে আমার মায়ের সমবয়সীই প্রায় ছিল।) অন্যরকম, একটা কী যেন ছিল, যে কারণে তাকে মায়ের থেকে আলাদা মনে হত এবং মা আদর করলে যেরকম মনে হত, সে আদর করলে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হত, অন্যরকম ভাল লাগত, সম্ভবত তার কারণ ছিল, মায়ের কাছে ছেলেই থাকতাম, বউটির কাছে আমরা সবাই পুরুষ হয়ে উঠতে চাইতাম! (আবার অনুচিত ভাবনায় যাচ্ছি।) তবে বউটি স্বামীর গলায় কখনোই ঘুমন্ত কোপ দেয় নি, জাগা অবস্থাতেও নয়, কোপ সে কখনোই কাউকে দেয় নি, কারণ তাকেই কোপানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাদের বাড়ির পিছনে, একটা কাঁচা লম্বা রাস্তার অনেকখানি দূরে, কালকাসুন্দে আর আসশ্যাওড়ার ঝোপে, যে-রাস্তাটা ছোট শহরের এক অংশের ময়লা ফেলার ডিপো ছিল, মেথরেরা যাতায়াত করত, আমাদের যাওয়া একেবারেই নিষেধ

boiRboi.net

ছিল, এবং গেলে আর কেউ দেখে ফেললে, স্নান না করে বাড়ি ঢোকবার উপায় ছিল না।

সে ঘটনায় খুব হৈচৈ হয়েছিল, পুলিস তো এসেই ছিল, গোটা শহরটাই যেন আমাদের পাড়ায় ভেঙে পড়েছিল এবং পুলিস পাড়ার সবাইকে, সকলের বাবা-মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, বউটিদের বাড়ি তল্লাসী করেছিল এবং সে সময় আমরা বাড়ির কাছে ভিড় করেছিলাম বলে পুলিস আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ি থেকেও বারবার মা বারণ করেছিল, যে-বারণ কিছুতেই শুনতে পারি নি, সবকিছু দেখবার ও জানবার জন্যে যেন দম ফেটে মরে যাচ্ছিলাম, বিশেষ করে বউটিদের বাড়িতে, তার স্বামীর কাজের ঘরে সেই কাটারিটা আছে কি না দেখবার জন্যে আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছিল, যদিচ তার স্বামীকে আমি ঠিক সন্দেহ করতে পারিনি, কারণ তাকে আমি কখনো কোনদিন একটু রাগ করতেও দেখি নি, কোন বিষয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনি নি, যে সব দেখলে মানুষকে তখন খুনী ভাবতে পারতাম, এবং পুলিস যখন এসেছিল, তখন তাকে দেখেছিলাম। পরবার কাপড়েরই এক অংশ গায়ে জড়ানো রোগা রোগা বুকটা খোলা, যার ফাঁক দিয়ে তার পৈতা দেখা যাচ্ছিল। তার মুখ ছিল শুকনো, চিন্তিত, দুঃখী আর অসহায়ের মত। শেষ পর্যন্ত আমি বড়দের এবং পুলিসের বেড়া ডিঙিয়ে তল্লাসী দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং কাটারিটা দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম, সেটা ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। কাটারিটা ওখানে না দেখলে, আমি স্বামীকেই সন্দেহ করতাম, অন্তত সেই বয়সে আমার সেরকম ধারণাই ছিল। এখন হলে কী করতাম জানি না, হয়তো প্রথমেই স্বামীকে সন্দেহ করতাম, এবং একটা বিস্ময়কর আবিষ্কারের মত ভাবতাম, রোগাটে নিরীহ স্বামীটি বেশ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বউটিকে মেরে, ময়লার ডিপোতে যাবার মেথর-রাস্তার জঙ্গলে ফেলে এসেছে, তারপরে সকলের সামনে অসহায়ভাবে, দুঃখী মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক সময়ে বিশ-বাইশ বছর বয়সে মিস্ট্রি-মার্ডার এবং হরর্ প্রচুর পড়েছি, যে কারণে অদ্ভুত চিন্তা করতে ইচ্ছা হয়, যদিচ আমার এই আটাশ বছর বয়সের মধ্যেই, মানুষের সেই জগতের বাইরে আমি চলে এসেছি, ওসব ভাবার আর কোন কারণই নেই। (তবু যে কেন ভাবছি।)

তবে, আমার অনেকবারই মনে হয়েছিল, বউটি স্বামীকে মারবে, এটা সকলেই ভুল ভেবেছিল, এবং লোকেরা অধিকাংশই ভুল করে, যে কারণে প্রমাণ হয়েছিল, স্বামীকে তো সে কখনোই কোপ মারে নি, তার স্বামীও তাকে মারে নি, এবং যে সব যুবকদের নিয়ে তার দুর্নাম ছিল, তাদেরই মধ্যে একজন শেষপর্যন্ত স্বীকার করেছিল, সে মেরেছে, কারণ বউটার ব্যাপারে বন্ধুদের সে সহ্য করতে পারে নি, সে তাকে একলা পেতে চেয়েছিল, এবং জবানবন্দীতে সে বলেছিল বউটিকে সে একলা তার সঙ্গে যেতে বলেছিল, বউটি রাজী হয় নি, সেটা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় নি, তাই সে বউটিকে রাত্রে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল, এবং এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তার ফাঁসি হয়েছিল। তার চেহারাটা আমার এখনো মনে পড়ে। সে ভদ্রঘরেরই ছেলে ছিল, একটা ফ্যাক্টরীতে সে ভাল চাকরি করত, চেহারাটিও সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ছিল, এবং তাকে যখন ধরে নিয়ে যায়, তখন তাকে আমি শেষবার দেখেছিলাম। কেন জানি না, তখন তাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল, প্রায় চোখে জল এসে পড়েছিল, যখন দেখেছিলাম, তার

boiRboi.net

কোমরে দড়ি, হাতে হ্যাণ্ডকাপ, মাথাটা নিচু করে সে হেঁটে চলেছিল, যার কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম, গলির দুপাশে ভিড় করা চেনা লোকদের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না, এবং তার তাহলে লজ্জা ও সঙ্কোচ ছিল। শুধু লজ্জা ও সঙ্কোচ নয়, তার উস্কখুস্ক চুল কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল, পাতলা জামার ভিতরে গেঞ্জি ছিল না, সুগঠিত শরীরটা দেখা যাচ্ছিল, আর তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। হ্যাণ্ডকাপ বাঁধা হাত দিয়ে একবার তাকে আমি চোখ মুছতে দেখেছিলাম, মুখটা বিকৃত হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। বাড়ির দরজায় তার মায়ের কান্নার চীৎকার শোনা গিয়েছিল, এবং সে পার হয়ে যাবার পর, কে যেন কাকে বলছিল, 'খোকা, তোর জন্যে আমি কত সুন্দর বউ আনতাম, তুই কেন ওই রাক্ষুসীর মায়ায় পড়লি' এই কথা বলে ওর মা কাঁদছে।···

কথাটা আমার কানে যেতেই, আমার বুকটা কেমন মোচড়ে উঠেছিল, এবং সকলের সঙ্গে তার পিছনে যেতে যেতে, আমার চোখের সামনে বউটির কোপানো শরীরটা ভেসে উঠেছিল, যার মুখে গলায় ও বুকে অস্ত্রের গভীর দাগ ছিল, যেন কেউ রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, হিংস্রভাবে মেরেছিল, অথচ যাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম, তাকে একবারও সেই রকম হিংস্র নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল না। মনে করতে পারছিলাম না, সে ওরকম ভাবে মারতে পারে, এবং তখন বউটাই আমার অদ্ভুত মনে হয়েছিল, অদ্ভুত অর্থাৎ এমন কি, অনেকটা রাক্ষুসীর প্রাণভোমরার ডানাছেঁড়া রাক্ষুসীর মতই মনে হয়েছিল, অথচ সে যখন জীবিত ছিল তখন তার কাছে যেতে, ঘনিষ্ঠ হতে কত ভাল লাগত, যে কারণে, আমরা ছোটরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতাম, কে তাকে বেশি পেয়ারা পেড়ে এনে দেব, বেশি কুল, কয়েতবেল, তেঁতুল, চানাচুর, আলু-কাবলি, এবং দরকার হলে সাজি-ভরা ফুল।

তার ব্যবহারের মধ্যেই কিছু ছিল কি না জানি না, কিন্তু তাকে নিয়ে সকলের মধ্যেই রেষারেষি ছিল। তার কাছে গেলেই যেন রেষারেষির প্রবণতা বেড়ে উঠত। মনে হত কে তাকে সব থেকে বেশি খুশী করতে পারবে, যার একটাই অর্থ কে তার বেশি সঙ্গ ও সান্নিধ্য পাব। সেই সময়ে, বউটির প্রতি আমার কোন সমবেদনা জাগছিল না, বরং একটা বীভৎসতা ও তার সম্পর্কে একটা অলৌকিকতা মনের ওপর ছাপ ফেলেছিল, যে কারণে মায়ের গায়ে হাত দিয়ে ছাড়া রাত্রে ঘুমোতেই পারতাম না, কারণ তার সেই কোপানো চেহারা, হাঁ মুখ, ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো আমি চোখ বুজলেই দেখতে পেতাম, এবং সত্যি বলতে কি সেই যুবক, যে তাকে মেরেছিল, তাকে আমি কখনো সেই কোপানোর ভয়ঙ্করতার সঙ্গে মেলাতে পারতাম না। বরং বড় হয়ে, যখন সে কথা মনে হয়েছে, তখন আমি যুক্তি খুঁজে পাইনি, কেন সে বউটিকে একলাই চাইবে না। বউটি নিশ্চয় স্বামীত্যাগ করতে রাজী হয়েছিল, আর তা অন্য পুরুষেরই জন্যে, তখন এটাই স্বাভাবিক যে সে অন্য কাউকে চায়। সে নিশ্চয়ই কয়েকজনের সঙ্গে ঘর ছেড়ে যেতে পারত না, আর সেই হিসাবে, যুবকের চাওয়াই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়, এবং এমন কি একথাও মনে হয়, দলের মধ্যে সে-ই হয়তো একমাত্র বউটিকে ভালবেসে-ছিল, যে কারণে দল বেঁধে একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে থাকবার পদ্ধতি তার ভাল লাগেনি। অবিশ্যি, একথা ঠিক, হয়তো বউটি তাকে ভালবাসত না। যদিচ, তার

ভালবাসা বিচার করার অসুবিধা, কারণ যুবকদের একটি দলের সকলের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তার মধ্যে একমাত্র খুনী যুবকটিই তাকে একলা চেয়েছিল, এবং স্ত্রীর প্রতি অধিকারে একাধিক পুরুষের গাম্য হওয়া খুবই কঠিন, যে কারণে স্বয়ং পাঞ্চালী-কেও নরকের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল, অর্জুনের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশি, যেটাকে আমার মনে হয়, অর্জুনকে সে ভালবেসেছিল, বাকীটা প্রথা অথবা মাতৃআজ্ঞা বিধি, এবং প্রথা আজ্ঞা বিধি, মনের ঘরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। পারে না, তাই মানুষের অনেক সঙ্কট, আমার সঙ্কট, আমিও এক মুখ দেখি, আমার মনের ঘরে, না সে বউ নয়, খুনী নয় ; এক মুখ দেখি, প্রথা আজ্ঞা বিধির আধিপত্য যাকে আড়াল করতে পারে না, এক মুখ, মুখের প্রাণ, প্রাণের চরিত্রের আধিপত্য—কিন্তু না···এসব আমি কিছুই ঠিক ভাবতে চাইনি এমন কি বউটি বা তার খুনের বিষয় বা খুনের কথাও ভাবতে চাইনি, ভাবা উচিত নয়, তবু মনে পড়ে, যুবকটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন সে খুনের স্বীকারোক্তি দিল, তখন সে জবাব দিয়েছিল, এই ভেবে যে, আর আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই। কেন ? কারণ কোন অর্থ খুঁজে পাই না। হয়তো সে তখন একটা অবসেশনে ভুগছিল, অর্থহীনতার, অপ্রয়োজনের অস্তিত্বনাশের—কিন্তু এসবও আমি ভাবতে চাইনি, আমি সংসার বিরক্ত বৈরাগী—তবু একটা আর্তনাদ শুনতে পাই, মা, সেই রাক্ষুসীটার কাছেই আমার প্রাণের তমসুক ছিল—যদিও এই আর্তনাদ শোনা আমার পাপ।

কিন্তু আমি এসব কোন কথাই ভাবতে চাইনি। আমি নাসামূল থেকে উর্ধ্বপুণ্ড্র রেখা টানতে গিয়ে, সেই সাজিয়ে দেবার লোকটির কথা বলছিলাম, ছেলেবেলায় যে আমাদের নানান রঙে ও পোশাকে সাজাত, যার সুন্দরী বউ ছিল এবং ওই রকম পরিণতি হয়েছিল, সেই লোকটা (আরো দুরপনেয় পাপের কথা আমি ভাবছি কিন্তু মনে পড়ছে।) সাজিয়ে দিতে দিতে আমাদের একলা ঘরে অন্যায়ভাবে আদর করত। জানি না, সে সব আচরণকে আদর বলা যাবে কিনা, বোধ হয় না, একটা অন্যায় সুখ সে ভোগ করত, এবং সে আমাকে বালক কৃষ্ণবেশে সাজাতে গিয়ে যেমন গভীর অভিনিবেশে, গম্ভীর মুখে, আমার নীল রং মাখা মুখে তিলক এঁকে দিত, ঠিক তেমনি-ভাবেই, গম্ভীর মুখে, সেই অন্যায় আচরণগুলো করত, এবং আমি (আমার সমবয়সী সব বন্ধুদের একই অভিজ্ঞতা।) অনেকটা সম্মোহিতের মতোই তার নির্দেশ পালন করতাম। অথচ একটা প্রতিবাদ ভিতরে ভিতরে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকত, যে কারণে একটা গা ঘুলিয়ে ওঠা ঘৃণা লোকটার স্পর্শে অনুভব করতাম। তবু সে কথা বাড়িতে গিয়ে কখনো বলে দিতে পারিনি, কারণ কী ভাবে বলা যায় তা ভাবতেই পারতাম না।

লোকটার এই প্রবৃত্তির জন্যেই তার স্ত্রীর রূপের সকল অমৃত গরল হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু এখনো সেই ঘৃণার রেশ আমার মধ্যে রয়ে গিয়েছে, এবং যখন বড় হয়েছি, দেহে শক্তি হয়েছে, তখন কোন কোন সময় সে কথা মনে করে, আমার হাতের থাবা ও কব্জি শক্ত হয়ে উঠেছে, লোকটাকে আঘাত করার জন্যে একটা অসহায় রাগ ফুঁসে উঠতে চেয়েছে, তবু সত্যি বলতে কি, এখন মাঝে মাঝে হাসি পেয়ে যায়, লোকটার তখনকার অত্যন্ত সহজ ভাবভঙ্গিগুলো মনে করলে, যেমন ঃ সে তার অন্যায় আচরণের সময়েও গম্ভীরভাবেই বলত, নে, আর দেরি করিস না, আরো কাজ আছে।

boiRboi.net

কিন্তু এসব আমার ভাবা উচিত নয়, কারণ আমি আমার গত জীবনের ওপরে সম্পূর্ণ ছেদ টেনে দিয়ে এসেছি, যাকে যবনিকা বলা যায়, কিংবা আর এক জন্মের কাহিনী, যা আমার মনে থাকা উচিত, কারণ সে আর এখন আমি নয়, তথাপি, এই আমার সংকট··· ।

গোপীচন্দনের রেখা টানা হয়ে যাবার পরেই যেটা দরকার, সেই রুলি দেখতে পেলাম না। এই দুই রেখার মাঝখান দিয়ে, একটি রুলির রেখা টানা নিয়ম। হলুদ আর চুর্ণ মিশিয়ে রক্তের রঙ করা হয়, আমরা তাকে রুলি বলি, এবং দুই রেখার মাঝখানে রুলির লাল রেখা না থাকলে, তিলক ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। সম্ভবত এর কোন বিশদ ব্যাখ্যা আছে, কিংবা নেই, জানি না, আমি এটাকে একটা মানানসই সৌন্দর্য বলেই মনে করি। কিন্তু রুলির পাত্র দেখতে না পেয়ে অবাক হলাম, কারণ জয়মনের এরকম ভুল কদাচিত দেখা যায়, আর এই ভুলগুলো তখনই ঘটে, যখন তার মনে কোন গোলমাল দেখা দেয়। অপরিচিত কেউ দেখলে, তার ভিতরের গোলমালের বিষয় টের পাবে না, কারণ এমনিতেই তাকে দেখলে চুপচাপ গম্ভীর মানুষ বলে মনে হয়, এবং তার কথাবার্তার মধ্যে যে একটা ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপের ছাপ থাকে, যা শুনলেই হাসি পায়, তখনো তাকে যথেষ্ট গম্ভীর দেখায়, গলার স্বরে কোন উচ্ছ্বাসই টের পাওয়া যায় না, বরং একটা অতিরিক্ত গাম্ভীর্য (সীরিয়াসনেস্) ফুটে ওঠে। তখন কেবল তার চোখ দুটিই চকচক করে, এবং চোখের দিকে লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়, সেখানে হাসির স্রোত বইছে, যদিচ, আরো লক্ষণীয়, তখন সে সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায় না। সম্ভবত নিজের হাসি দমন করার, ওটাই তার পদ্ধতি। যেমন ঃ কোন কাজের জন্যে সে হয়ত আমার কাছে এল, কাজ মিটিয়ে চলে যাবার সময়ে, অন্যদিকে চোখ রেখেই হয়ত বলল, একটা ব্যাপার দেখে একটু অবাক হলাম। সে এমনভাবেই বলে, যেন মঠে কোন ব্যাপার ঘটেছে, স্বভাবতই আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, কি ব্যাপার ?

—না এমন কিছু নয়, আমি ওই কেষ্টকান্তের কথা বলছিলাম।

জয়মনের তখন ভুরু কোঁচকানো, মুখ গম্ভীর, যেমন সাধারণত থাকে, কিন্তু আমার প্রথমেই হোঁচট লাগে কেষ্টকান্ত নাম শুনে, কারণ হঠাৎ মনে করতে পারি না, কেষ্টকান্ত কে। অবাক হয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই, সে-ও তাড়াতাড়ি তার মোটা ভুরু তুলে আমার মুখ দেখে নেয়, এবং আবার অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, আমি মঠের কেষ্টকান্তের কথা বলছিলাম, মানে আমাদের··· ।

ততক্ষণে আমারও মনে পড়ে যায়, বলি, তুমি ময়ূরটার কথা বলছ ?

—হ্যাঁ। পরশু রাত্রির থেকেই তো খুব মেঘ ডাকছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি-বাদলা হচ্ছে। কাল বিকেলে দেখলাম, কেষ্টকান্ত দুর্গার চালচিত্তিরের মত প্রকাণ্ড একটা পেখম (হাত দিয়ে দেখায়) মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবলাম দীপিকা (মঠের পোষা ময়ূরী) কাছেই আছে। কিন্তু তাকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না। মনে হল, কেষ্টকান্ত তাতে একটু বিরক্ত, একটু ব্যস্ত, যে জন্যে পেখমটা মাঝে মাঝে একটু গুটিয়ে যাচ্ছিল, টাল খাচ্ছিল··· ।

এই পর্যন্ত বলে সে আর একবার আমার মুখের দিকে দেখে নেয়, এবং ততক্ষণে

boiRboi.net

আমার ভিতরে হাসির একটা ঢেউ আমি অনুভব করি। কিন্তু হাসি না, বলি, তাই নাকি ?

জয়মন মাথা নেড়ে বলে, আপনাকে তো মিথ্যে কথা বলতে পারি না মহারাজ, যা দেখেছি, তাই বলছি। ভাবলাম, কেষ্টকান্তের জন্যে দীপিকাকে একবার খুঁজে দেখি। খুঁজতে খুঁজতে, আমাদের সেই গোয়ালবাড়ির কাছে গিয়ে দেখি দীপিকা মুখ ভরতি করে একটা ছোট ঢোঁড়া সাপ গিলছে।

বলে সে আমার মুখের দিকে তাকায়, তার চোখে তখন অত্যন্ত বিরক্তি ও বিস্ময়, অথচ হাসির স্রোতটা প্রায় কলকলিয়ে চলার মত আমি যেন শুনতে পাই এবং শব্দহীন হাসিতে আমার শরীর প্রায় কাঁপতেই থাকে।

জয়মন বলে যায়, পক্ষীদের মধ্যে এরকম মেজাজ···যাকগে, আমি দীপিকাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে চাইলাম, কিন্তু, দীপিকা নড়লও না, ওখানেই মুরগীর মত (একবার কানে হাত ঠেকায়, মুরগীর নাম করার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত) পা দিয়ে, মাটি খুঁড়ে পেট ঢুকিয়ে বসে রইল।

আমি বলি, আর কেষ্টকান্ত ?

—ঠিক সেইভাবেই চালচিত্তির নিয়ে খাড়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এরা মানুষ নয়, এদের মধ্যেও···কী বলব, জয় মন ! জয় মন !···

অনেকটা বিরক্ত আহত মানুষের মতই সে মুখ ফিরিয়ে, মাথা নীচু করে চলে যায়। আর আমি একলাই হাসতে থাকি, এবং পরে সমস্ত ব্যাপারটা যখন আমি আবার আগাগোড়া ভাবি, তখন তার সঙ্গে জয়মনের চেহারাও আমার কাছে আলাদা হয়ে ওঠে। মনে হয়, ময়ূর-ময়ূরীর যে ঘটনাটা শুনলাম, সেটা শুধুমাত্র যেন দুটো পাখির গল্প নয়, আরো কিছু, যেমন, যে-জয়মনকে অষ্টপ্রহরই দেখছি, তার মধ্যে আলাদা আর একটি মানুষকে যেন দেখতে পাই। পেখমখোলা ময়ূরের প্রতিই তার বিদ্রূপ বেশি, যদিচ তার মধ্যে ঈষৎ করুণ রেশ আঁচ করা যেতে পারে। একথা ঠিক, সে আমার কাছে যে-সব কথা বলে, সে-সব কথা অন্যের কাছে বলে না, যেমন, ময়ূর-ময়ূরী সংবাদ এবং এর ভিতর দিয়ে আমি যেমন তাকে কিছুটা চিনতে পারি, সে-ও আমাকে পারে, যে কারণে বোঝা যায়, তার আর আমার মধ্যে কোথাও একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে, যা মঠের মহারাজ ও পার্শ্বচরের বাইরে, অথচ যা প্রকাশ্য নয়, যে সম্পর্কের কথা আমরা নিজেরাও জানি না, বলাবলি করি না।

কিন্তু অন্যদিকে জয়মন খুব নিয়মতান্ত্রিক মানুষ, যে কারণে, সে যখন কোন কাজে ভুল করে, তখন তাকে দেখে আমি বুঝতে পারি, এবং মনের মধ্যে কোন গোলমাল চলছে টের পাই। তখনো সে গম্ভীর গলায় ও মুখে অনেক কথা বলে, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গও করে কিন্তু তার চোখে সেই হাসির স্রোতটা দেখা যায় না, মুখে একটা ছায়া জমে থাকে, যাকে ঠিক বিষণ্ণতা বলা যাবে না, তার থেকে কিছু বেশি—একটা কষ্ট বলা যেতে পারে।

কিন্তু আমার দেরি সয় না, রুলি আমার এই মুহূর্তেই দরকার। আমার এই মহলের (এই বিশাল অট্টালিকার কয়েকটি মহল আছে, যেমন সেকালের রাজা বা জমিদারের বাড়িতে থাকে, এবং আমি যেখানে রয়েছি সেটা মহারাজের মহল বলেই

boiRboi.net

খ্যাত।) পিছনেই, বাগানের পাখিদের চীৎকার ক্রমে বাড়ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। এমন কি বাগানের অদূরে ছোট বিল ও বড় ঘাসের জঙ্গলভরা এলাকায় সারসের ডাকও আমার এই ঘরে ভেসে আসছে। সব থেকে বেশি জোরে শুনতে পাচ্ছি মঠের ময়ূরদের ডাক, যার শব্দটা আমার কাছে অনেক সময় ঝগড়াটে মেয়েদের চড়া গলার মতই খর ও কর্কশ হয়ে বাজে, আর উচ্চারণটা একই শব্দে বাজে; কে—প্! কে—প্! এ সবেরই অর্থ, সূর্যোদয় আসন্ন, এবং আমার সময়ও আসন্ন, কারণ এই জীবনকে বৃত্তি বা জীবিকা উৎসর্গ করাই বলি, তার জন্যে সূর্যোদয়ের আগেই আমাকে তৈরি হতে হবে।

আমি জানি, ভেজানো দরজার বাইরেও কোথাও জয়মন রয়েছে, যাতে আমার কোন প্রয়োজন হলেই, হাতের কাছে পেতে পারি। তাই আমি ওয়ালনাটের পর্দায় হাত তুলে শব্দ করতে যাই, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, প্রায় ঝড়ের বেগে জয়মন ছুটে আসে, তার হাতে একটি ছোট পাথরের বাটি। আমি তাকে ওয়ালনাটের নকশার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছিলাম, সে বারে বারে মাথা নাড়ছিল, এবং জিভ কাটছিল, এবং হাসবার চেষ্টা করে, যেটা সম্ভবত হাসি নয়, কারণ তার মুখের এই হাসিটাই আমার কখনোই হাসি বলে মনে হয় না।

পর্দার এ পাশে আসতেই, তার সঙ্গে মুহূর্তে একবার আমার চোখাচোখি হল। শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরে রুলির পাত্র রাখতে রাখতে সে বলল, শুধু নারায়ণই দিয়ে গেছি। লক্ষ্মীস্বরূপা বাদ পড়ে গেছে, ছি ছি ছি।

বলেই সে আবার আমার দিকে দেখল, এবং যা আশা করেছিলাম, তার চোখের সেই হাসির স্রোত বন্ধ, একটা অন্ধকারের ছায়া সেখানে জমে উঠেছে, অন্যমনস্ক আবিষ্ট ভাব একটা। সে বুঝতে পারল, আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, যে জন্যে সে আবার বলল, আমি নিজে তিলক পরতে গিয়ে দেখলাম, আপনার রুলি আমার সামনে পড়ে রয়েছে। কী করে যে এরকম…।

এসব কথাগুলো অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার মতই শোনাচ্ছিল, এবং সে আসলে ক্ষমাই চাইছিল। আমি দেখলাম, তার সর্বাঙ্গেই তিলক ছাপা হয়ে গিয়েছে, কেবল রুলির রঙ কোথাও লাগানো হয়নি। অর্থাৎ নিজে রুলি পরতে গিয়েই তার খেয়াল হয়েছে, তাই ছুটে এসেছে আর কথা শেষ করে সেইভাবেই সে চলে গেল। কিন্তু আয়নায় আমি দেখলাম, আমার মুখ একটু ভারী দেখাচ্ছে, এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, এবং জয়মনের মুখের ছবি ভাবতে ভাবতেই একটি মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, আর আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে, মনে মনে বলে উঠলাম, না না। মনে মনে উচ্চারণ করতে করতেই, গলার স্বরে তা ফুটে উঠল, গলার স্বর কানে যেতেই আমি যেন চমকে উঠলাম, সংবিৎ ফিরল এবং জয়মনের মুখই আবার দেখতে পেলাম। হঠাৎ একটা নিশ্বাস পড়ল, আর সেই মুহূর্তেই বলে উঠলাম, অনুচিত, খুবই অনুচিত।

বলতে বলতেই হাসি পেয়ে গেল, এবং প্রায় নিজেকে বিদ্রূপ করে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে উঠলাম, জানি, মহারাজ জানি।

রুপার কাঠি ডুবিয়ে, তিলকের মাঝখানে রুলির রেখা ভুরুর মাঝখান থেকে চুলের ডগা অবধি টেনে দিলাম। তারপরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বুকের দুই পাশে ও দুই হাতে ছেপে দিলাম। এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের মাঝখানে, রুলির রক্ত রং দিয়ে একটি ছোট

boiRboi.net

চিহ্ন করতে হবে, এবং এই রক্ত চিহ্নগুলোকেই লক্ষ্মীস্বরূপা (জয়মন যে কথা বলছিল) বলা হয়। অবিশ্যি কপালের তিলকের মাঝখানে রক্তরেখাকেও তাই বলা হয় কি না কখনও শুনিনি, সম্ভবত নয়, কারণ ওগুলো বিষ্ণুর স্মারকচিহ্ন নয়, এবং বিষ্ণুর স্মারকচিহ্নের মাঝখানেই একমাত্র লক্ষ্মীর অবস্থান ঘটতে পারে, যে কারণে আবার আমার সেই দেবতা থাকলেই দেবীর প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়, যা আমাকে শরীর ভরে নিতে হচ্ছে, অথচ, আমি একজন সংসার-বিরক্ত, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী তো বটেই, কারণ সন্ন্যাসী, তবু এই চিহ্ন··· ।

আবার আমি ঘাড় নাড়ি, নিজেকে নিষেধ করি, আর ঠিক এ সময়েই আমার মনে হয়, তার থেকে এই মঠের সম্প্রদায়ের অনেকের মত আমিও যদি এই সব স্মারকচিহ্নগুলোর ছাপ পুড়িয়ে গায়ে লাগিয়ে নিতাম, তাহলে প্রতিদিন এ-কাজ করতে হত না। এই সম্প্রদায়ের অনেককে, বিশেষ করে দক্ষিণদেশের লোকদের অনেককেই আমি সে রকম 'তপ্তমুদ্রার' ছাপ গায়ে লাগাতে দেখেছি, আর একমাত্র বইয়েতেই পড়েছি, প্রাচীনকালের খৃষ্টানদের মধ্যে দীক্ষা নেবার সময়, লোহা পুড়িয়ে কপালে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকবার প্রচলন ছিল। ভাবতে ভাবতেই আমার গায়ে যেন তপ্তমুদ্রার ছ্যাঁকা লাগল, মুখটা একটু বিকৃত হয়ে উঠতে দেখলাম। অবিশ্যি আমাকে যিনি দীক্ষা দিয়েছেন, এই মঠের প্রাক্তন মহারাজ, (আমি আসল মহারাজ বলেই মনে করি।) তাঁর মতে, পুড়িয়ে দাগ করা নাকি দোষ বিশেষ। তিনি আবরণী ও অনাবরণী—এই দুই দলের উল্লেখ করে থাকেন প্রায়ই, যাদের মধ্যে আবরণীরাই নিয়ম-কানুনে খুব কঠোর, অথচ আমার ধারণা এখানে এখন যে মত মানা হয়, তার মধ্যে দু-রকমই আছে, যদিচ আমি সত্যি লোহা পুড়িয়ে গায়ে দাগ করতে চাই না। প্রতিদিনের কথা ভেবেই আমার এ কথা মনে হয়েছিল।

দ্বাদশ অঙ্গে তিলক শেষ করে, রুলির চিহ্নগুলো এঁকে দিলাম, এবং প্রত্যেকটা লাল রুলি চিহ্নই আমার কাছে একটি মুখের মত মনে হল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, ঝকঝকে মাজা পিতলের আলনার কাছে এগিয়ে যাই, সেখানেই আমার পোশাক রয়েছে। স্নানের পর, কার্পাসের কাপড় পরা নিয়ম নয়, এবং কোন সময়েই তা পারি না। আমাদের সম্প্রদায়ের নিয়মানুযায়ী, বিশেষ করে স্নানের পর লোমজ বা তন্তুজ কাপড় পরাই বিধেয়, অর্থাৎ গরম বা সিল্ক, এই দুয়ের ব্যবহার চলে। আমার ব্যবহারের জন্য এক চিলতে তুলার কাপড়ও এই মহলে নেই, কারণ, এখানকার অবস্থা এমন নয় যে, কোন কারণেই, উলেন বা সিল্ক কাপড়ের অভাবের জন্যে সময় বিশেষে তুলার কাপড় আমাকে পরতে হবে। শীতকালে কাশ্মীরের সাদা শালের থান কেটে আমি পরি, যা অনেক অর্থবান লোকের পক্ষেও অচিন্তনীয়, আর এ সময়ে, (এখন বসন্ত) সেরা সিল্কের থান কেটেই আমার পরবার ব্যবস্থা হয়। অবিশ্যি, জয়মনদের অবস্থা তা নয় নিশ্চয়ই। একমাত্র স্নানের পর পরবার জন্যে তাদের একটা বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হয়, অন্য সময় কার্পাসের কাপড়ই পরে, আর মহারাজের (আমার) জন্যে সকল ব্যবস্থা সে নিজের হাতেই করে, আমার প্রতিদিনের পরবার কাপড় আলনায় সে-ই সাজিয়ে রাখে।

মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয় জয়মনকে এই দামী কাপড় কিছু দান করি। শুধু জয়মনকে কেন, মঠের সমস্ত কর্মীকেই দান করা যায়, কারণ আমি জানি, দেখেছি, মঠের

ভাণ্ডারে যে পরিমাণ গরম আর সিল্ক কাপড় আছে, পঞ্চাশ বছর কেউ দান না করলেও তাতে চলে যাবে। কিন্তু আমি তা দিতে পারি না, আমার সে অধিকার নেই, এবং আমি নিয়মভঙ্গ করতে পারি না। সত্যি বলতে কি, ধর্মীয় নিয়মের থেকেও, এই চোখ জুড়িয়ে যাওয়া হালকা অথচ ঠাস বুনোটের সিল্ক দেখলে, সুখ ও বিলাসিতার কথাই আমার আগে মনে হয়, যা রাজভোগ্য, এবং আমি তাই, রাজার মতই এসব ভোগ করি, আর অন্যান্য সেবকেরা—কিন্তু না, সেকথা আমার ভাবা উচিত নয়।

আমি পোশাক পরতে শুরু করি। তবু আবার আমি নিয়মের প্রশ্ন না তুলে পারি না, কারণ প্রাক্তন মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষেই, কাপড়ের অভ্যন্তরে আধুনিক হোসিয়ারী অন্তর্বাস বিশেষ ব্যবহার করি, যা নিয়মের মধ্যে পড়ে না। ব্যায়াম আর কুস্তির জন্যে এসব আমাকে বিশেষভাবেই ব্যবহার করতে হয়, এবং কুস্তি লড়াও বোধহয় একজন সংসার-বিরক্ত বৈরাগীর পক্ষে উচিত নয়, কিংবা যেমন ধরা যাক, আমার মাথার চুল। অবিশ্যি আমাদের মাথা মুড়িয়ে ফেলার কোন নিয়ম নেই, তবু সন্ন্যাসীর নিয়মানুযায়ী, অধিকাংশেরই মাথা কামিয়ে ফেলা হয় বা চুল কোন সময়েই না কাটা উচিত, যদিচ প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই একদিন কামানো নিয়ম আছে, কিন্তু আমার চুল সাধারণ মানুষের মতই কাটা। বরং পনরদিন অন্তর, নিয়মিত আমার চুল ছেঁটে দেওয়া হয়, প্রতি একদিন অন্তরই গোঁফ-দাড়ি কামানো হয়। এমন কি, বিশেষ বিশেষ দিন বাদ দিলে, মাথায় তেল ব্যবহারেও আপত্তি নেই, এবং আমি একটি বহুখ্যাত সুগন্ধি দামী তেলই ব্যবহার করি, তবে এ সময়ে নয়, সাধারণত তেলের ব্যবহারটা বিকেলের দিকেই করি। এ সবই, আমার কোন ইচ্ছায় নয়, প্রাক্তন মহারাজের অনুমতিতেই করি। অথচ তাঁর মাথামুখ সবই মুণ্ডিত, পনরদিন অন্তর নিয়মিত কামান।

নিয়মের ব্যতিক্রম যে শুধু এখানেই তা নয়, নিজেকে 'বস্ত্রাবৃত' (বস্ত্রাবৃত বলাই উচিত, এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এই কাপড় পরার সময়ে, আমার মনের মধ্যে আশ্চর্য সব চিন্তার উদয় হয়, এমন কি এক অচেনা যুগল মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে কারণে আমি চোখ বুজে থাকি, মাথা ওপরের দিকে তুলে রাখি।) করেই, পাশের চন্দনকাঠের আলমারি খুলে অলংকার বের করি। সোনার স্মারকচিহ্ন, যার মধ্যে একটি করে লাল পাথর বসানো, সোনার বিছেয় গাঁথা হার আমি গলায় পরি। তুলসীর মালা সব সময়ে পরবারও আমার দরকার হয় না, এটাও অনিয়ম, কিন্তু শরীর-চর্চার জন্যে আমার পরে থাকবার উপায় নেই, এখন সেই মালা বের করে পরি। পদ্ম-বীজের মালা যদিও জপের জন্যেই ব্যবহারের নিয়ম, তবু সোনার মটর-দানার সঙ্গে সাজানো পদ্মবীজের মালা গলায় পরি, এবং দুই ডানায়, স্মারকচিহ্নের নিচেই পরি। তিলকগুলো না থাকলে, অনেকটা হিন্দু আমলের রাজার মতই বোধহয় মনে হত, যে কারণে, সব মিলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এখন নিজেকে আমার অনেকটা সঙের মত মনে হচ্ছে। এটা পাপ চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ব্যসন-ভূষণ সমস্ত কিছুর পিছনেই একটা গভীর চিন্তা কাজ করে, একে আমি সঙের মত বলতে পারি না। তবু কেন যে এ রকম মনে হয়।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, 'পহলে দর্শনধারী', এ কথাটা বিশ্বাস করেন, বলেনও সেকথা, এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, যে ভাবেই চাও, মানুষকে তোমার মুগ্ধ করতে হবে।

যদি মনে কর নগ্ন হলেই মানুষকে মুগ্ধ করা যায়, তাই হও, অর্থাৎ তোমার নগ্নরূপেই সে তার চিরদিনের সংস্কারের আঘাত পেয়ে, এক ধরনের মুগ্ধ হয়। আর, কোন কিছুই একভাবে চলতে পারে না, মঠ-মন্দিরও না, সময়ের সঙ্গে তাকেও রূপের পরিবর্তন করে যেতে হবে।

আমার এই বেশভূষা এই চিন্তারই ফল বলে আমার ধারণা, এবং চিন্তা যে সফল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ হাজার হাজার মানুষের চোখে আমি তার ছায়া দেখেছি, এমন কি, আমার মায়ের চোখে, মা—না মায়ের কথা থাক, তিনিও একজন ভক্ত নারী মাত্র, এই সন্ন্যাসী আর তাঁকে প্রণামও করে না, তবু, আঃ এই মুহূর্তে সেই পা দুখানি দেখি, ডান পায়ের পাতায় সেই ছোট একটি কাটা দাগ, বাঁ পায়ে একটি তিল, আর সেই গানের কলি আমার মনে পড়ে যায়—ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি—এবং মনে মনে না বলে পারি না, ঈশ্বর, তোমারে চিনি না, ধর্ম, তোমার আচরণে জলাঞ্জলি, সরো, সরে দাঁড়াও, সেই মাটিতে চলা খালি পায়ে একবার মাথা রাখি। কিন্তু পর মুহূর্তেই আয়নায় নিজেকে দেখে ধিক্কার দিই, এবং চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হই, সেখানে জলের আভাস। ভ্রূকুটি করি, হাসি, ভাবি এই সেই বাঘ, যে শিকারের চারপাশে চক্র দিচ্ছে, এই সেই সাবিত্রী, যে মৃত্যুর পিছন ছাড়ে না, কিন্তু জন্মান্তরের জীবন আমার, এখন আমার বাবা, মা, আর যাকে বলে, 'দারা-পুত্র-পরিবার' সে সব কিছুই নেই। আমার মা একজন নারী মাত্র, যে নারীর চোখে আমি আমার এই রূপের মুগ্ধতা দেখেছি, কেন না তাঁর প্রাণ তাতেই সম্মোহিত, এবং এমন কি সেই নারী, যে আমার সংকটের মাঝখানে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়ে, কলকাতা-কলেজ-কফির গন্ধ যার গায়ে, তার চোখেও—।

সানাই বেজে ওঠে, আর তৎক্ষণাৎ আয়নার বুক থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি সরে যাই। তিলক, পোশাক আমার শেষ। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে ভিতরের দালানে যাই, একবার আমার শোবার ঘরের দিকে উঁকি দিই, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। আমার শোবার ঘরও, একদিক থেকে রাজকীয় বহরেই সাজানো, সন্ন্যাসীর আশ্রম বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কিছু নয়। সেখানে ড্রেসিং টেবিল থেকে, হাল আমলের ডানলোপিলোর গদি পাতা, মেহগনি কাঠের খাট আছে। সুদৃশ্য আলমারি এবং পর্দা, বসবার গদি আঁটা সোফা কোনকিছুই বাদ নেই। জয়মনের সেবায় সব-কিছুই ঝকঝকে তকতকে রয়েছে।

সানাইয়ের আলাপ ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে। মন্দিরের কাছেই, নহবতখানায়, হৃদয় মালী সানাই বাজাচ্ছে, শ্রীমাধবের নহবতখানার সে-ই বাদক, সে শ্রীমাধবের প্রজা, জমি ভোগ করে। কিন্তু সে মঠের কর্মচারী নয়, সেবক হিসেবে তাকে ধরা হয় না। এই মুহূর্তে তার মুখ আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, অথচ সন্ন্যাসী আমি। দালান পেরিয়ে ইষ্টদেবতার ঘরে চলেছি, চোখের ওপর ভাসছে, হৃদয় মালীর কালো রেখায় ভরা মস্ত মুখ, লাল চোখ, ধূসর চুল, খালি গা, সানাই বাজাচ্ছে, গলায় এবং বুকে অনেকগুলো শিরা ও পেশী ফুলে উঠেছে। পিছনে আমি পায়ের শব্দ পাচ্ছি, জয়মন আসছে। দরজা খুলে আমি শালগ্রামশিলার দিকে তাকাই। জয়মন তাড়াতাড়ি ঢুকে শাঁখ আর ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়, আমার এখন নাম জপ করা উচিত। ইষ্টদেবতা একটি সোনার

পায়াওয়ালা পাত্রে শোয়ানো, তিনি এখনো নিদ্রিত বা শায়িত এইরকম বলা উচিত। শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে জাগানোই উদ্দেশ্য, এবং তাঁকে আমি হাতে তুলে নিই, এবার আমাকে মন্দিরে যেতে হবে, যেখানে শ্রীমাধব রয়েছেন।

* * *

আমার মহলের বাইরে এলেই, চক-মিলানো চত্বর, যেমন থাকা উচিত। বিশাল চত্বরের চারপাশেই বারান্দা, বড় বড় থাম, সারি সারি ঘর। সামনের সারিগুলো এখন সবই অফিস-ঘরে পরিণত হয়েছে, আগে মঠের কাছারিবাড়ি বলা হত। ডাইনে-বাঁয়ে মঠের অন্যান্যদের বাস, এবং সেগুলো ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যার চেহারা দেখে অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে, প্রয়োজন হলে রাতারাতি এ ইমারতকে, বিভিন্ন অন্তঃপুর, নাচঘর, কাছারি, সব মিলিয়ে এক রাজকীয় চেহারায় বদলে দেওয়া যায়। কিন্তু সে-কথা আমি ভাবব না। মঠের সেবকরাই এখানে বাস করে, যার চেহারা অনেকটা দশনামী দণ্ডীদের মতই বিরাট আখড়া বিশেষ। যেমন হিসাবী ভাণ্ডারী, পূজারী, কোতোয়াল, সকলেরই বিশেষ পদ, বিশেষ কাজ।

একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যা কিছু প্রয়োজন, সবই এখানে আছে, এবং সকলের ওপরে আমি, অন্তত বাইরের লোকের চোখে, যে কারণে সেবক কর্মচারী ছাড়াও অন্তত কুড়িজন সহবাসী বা চেলাও আমার আছে, যাদের সকলের গুরু হিসাবেই আমাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে। আমি গুরু, কিন্তু মঠের সকলেই জানে, আমরা সকলে একজনকেই, সবার ওপরে সত্য বলে জানি, এবং নিয়মানুযায়ী তাঁর মৃত্যুর আগে অন্য কেউ-ই সেই পদে অভিষিক্ত হতে পারে না, অথচ আমি হয়েছি, আর সেটাও তাঁরই ইচ্ছানুসারে। নিয়মের পরিবর্তনও হয়, যদি মহারাজ অসুস্থ, অপারগ হন, কিংবা তাঁর অন্যায় স্খলন ইত্যাদির জন্যে, সম্প্রদায়ের প্রধানরা একত্র হয়ে তাঁকে খারিজ করতে পারেন, যদিচ এ রকম ঘটনা প্রায় ঘটেই না, কারণ অন্যায় যিনি করেন, তিনি সব আটঘাট বেঁধেই করেন। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লে আলাদা কথা। আমার ক্ষেত্রে তাও হয়নি। আমার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে, সেটা অনেকটা মঞ্চের রাজার মত, (এসব ভাবা অন্যায় হচ্ছে) আমাকে সামনে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুখে রঙ মেখে, পোশাক পরিয়ে, পার্ট মুখস্থ করিয়ে, আচার-আচরণগুলোকে শিখিয়ে দিয়ে। অবিশ্যি, এসব কলঙ্কজনক ধারণাগুলো আমারই, সত্যি তা নয়, মনে হয় মাত্র, এবং যেন এক পরিচালকের নির্দেশে আমি চলছি, আড়াল থেকে তিনিই সবকিছু করছেন। সম্ভবত, আমার এ-কথাও মনে হয়, এর দরকার ছিল, তাঁর পক্ষে আড়াল থেকে কাজ চালানো অনেক সুবিধা, একটু দূরে থেকে বসে সবকিছু ভালভাবে দেখতে পারেন, ভাবতে পারেন, এবং যে-সব নিয়ম-কানুনের বাইরে আমার পক্ষে যাবার অসুবিধা, সেগুলো তিনি অতিক্রম করে যেতে পারেন। তাঁর নাম শ্রীমৎ পরমানন্দ, তিনি চত্বরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমি জানতাম, তিনি এখন এখানেই আছেন, রোজই থাকেন, পায়রাদের খেতে দেন। এই বিশাল প্রাসাদের থামগুলোর ওপরে, দালানের কড়ি-বরগার খাঁজে খাঁজে, আমার ধারণা প্রায় হাজারখানেক পায়রা আছে, যাদের বক্‌বকম্ সারা দিনরাত্রিই শোনা যায় এবং সেটাই যেন এখানকার প্রাণের শব্দ, যেমন জীবন্ত মানুষের বুকে সব

boiRboi.net

সময়েই ধ্বকধ্বক শব্দ হয়, বা নিশ্বাস পড়ে, যেটা চলছে, অথচ মনে থাকে না, খেয়াল হয় না। জীবন্ত মানুষ, কতবারই বা ভাবে যে তার নিশ্বাস পড়ছে। এও সেই রকম, পায়রার ডাক সব সময়েই শোনা যায়, শুনতে শুনতে মনে থাকে না, শব্দটা বাজছে। আমি মনে করি, শব্দটা মাধব মঠের, মাধব মঠ যে চলছে তারই শব্দ, আর হয়ত এ শব্দ কোনদিনই থামবে না।

চত্বরের উঠোনের এখন যে রকম অবস্থা হয়ে রয়েছে, তাতে উঠোনের শান দেখা যাচ্ছে না প্রায়, প্রতিমুহূর্তেই পায়রা উড়ে এসে নামছে আর নামছে, যেমন কচুরিপানা জল ঢেকে ফেলে, সেই রকম। পরমানন্দ তার মাঝখানেই ঘুরে ঘুরে, একটা থলি থেকে ছোলা গম খুদ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমার মনে হয়, এই খেতে দেওয়াটা কেবল মাত্র খেতে দেওয়া নয়, উঠোনে দাঁড়িয়ে, ভোরবেলা চারদিক দেখাই উদ্দেশ্য, এমন কি আমাকেও, কারণ রোজ তাঁর সঙ্গে আমার এখানেই প্রথম দেখা হয়। তিনি একবার মাত্র আমার দিকে চোখ তুলে তাকান, এবং তাতেই মনে হয়, আমার ভেতর এবং বার সবই মুহূর্তে দেখে নেন। শত চেষ্টা করেও, সেই মুহূর্তটা আমি স্বাভাবিক থাকতে পারি না, একটা তীব্র সচেতনতা, এবং সেই সঙ্গেই শক্ত আড়ষ্টতা অনুভব করি। অথচ তাঁর মুখে যে কোনরকম ভ্রূকুটি তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসা ফুটে ওঠে, সে রকম কিছুই নয় যেন নিতান্তই, আমার অভিবাদনের জবাবে, (ওঁকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতাম, এখনো আর সবাই করে, আমার সে অধিকার নেই, আমরা পরস্পরকে কেবল 'দাসোহং-হস্মি' এই বলে অভিবাদন করতে পারি।) অভিবাদন করে, একবার তাকিয়ে দেখে নেন। তাতেই আমার মনে হয়, তিনি সবকিছু দেখে নেন। ভেতরটা কতখানি দেখতে পান জানি না, সেটা আমার অনুমান, বাইরের সবকিছুই যে তিনি যাচিয়ে নেন, তা বুঝতে পারি। প্রথম প্রথম, আমার যে সব ভুল-ত্রুটি হত, সেগুলো এখানে দাঁড়িয়েই, তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে বলে দিতেন, প্রয়োজন হলে, সংশোধনের জন্যে ফিরিয়ে পাঠাতেন, যেমন তিলক বা অন্য কিছু, এবং যে জন্যে আমার মনে হয়, তাঁর চোখে কিছুই বাদ যায় না, এমন কি সামান্য একটি জায়গায় রুলির রক্তচিহ্ন বাদ গেলেও, তাঁর চোখে পড়ে।

আমি জানি, এই চোখকে, মঠের সকলেই ভয় করে। অথচ তিনি যে কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বা পীড়ন করেন, তা নয়। আমার ধারণা, তিনি সকলের সবকিছু জানেন, (ভাবতেও আমার বুক কাঁপে, আমার সব কিছুও কি···?) যে কারণে সকলেই তাঁকে অনেকটা অন্তর্যামীর মতই ভাবে।

মানুষের এইটাই ট্রাজেডি, (ট্রাজেডির বাঙলা জানি না) সে সাধু-সন্ন্যাসী, যা-ই হোক, সে মানুষ, এবং এই মানুষিকতাকে সে এমন কতকগুলো ছকে বেঁধে ফেলে, ফেলতেই হয়, কারণ সমাজের সেটাই নিয়ম, সেটা জীবনের আদর্শ ধর্ম রীতিনীতি নানান কিছু দিয়েই ভরা, যে-ছকের মধ্যে আর যা-ই হোক, মানুষ নিজেকে সব সময় আটক রাখতে পারে না, তার জন্মসূত্রে পাওয়া স্বাধীনতাকে যে সব সময়ে জমিয়ে রাখতে পারে না। যার ফলে, সে যে মানুষ, এটা বারেবারেই নানানভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। 'মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন, কিন্তু সে সর্বত্র শৃংখলিত' এ-কথা বিপ্লবের প্রাক্-পটভূমিকায় একজন (ভলতেয়র) বলেছিলেন, এবং মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছিল, এটা ট্র্যাজেডি নয়। জন্মসূত্রে মানুষের পাওয়া স্বাধীনতা আরো বহু ছকের মধ্যে

বাঁধা, তার মধ্যে বহু ভয়-ভাবনা-স্বার্থ-ঈর্ষা-দুর্বলতা দিয়ে ভরা। এর থেকে বেরিয়ে আসাটা ট্র্যাজেডি নয়। তবু একেই মানুষ ট্র্যাজেডি করে তুলেছে, কারণ সে স্বাধীনতাকে ভয় পায়, অথচ স্বাধীন হয়ে পড়ার ইচ্ছাগুলো তার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে, যাকে আমি, মানুষকে মানুষ হয়ে পড়ার কথা বলেছি, আর এরকম ক্ষেত্রে মানুষ হয়ে পড়ার মধ্যে কিছু গোলমেলে লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন মাস্টারমশাইয়ের সামনে বসে, অঙ্কের হিজিবিজিতে ক্লান্ত শিশু জানালা দিয়ে গাছের দিকে চেয়ে পাখি দেখার অপরাধ করে।

পরমানন্দের চোখকেও কেউ ফাঁকি দিতে পারে না, সংসার-বিরক্ত বৈরাগীরা অধিকাংশই তাঁর কাছে, কোন কোন মানুষিক ব্যাপারে ধরা পড়েছে, যে কারণে তাঁকে সকলেই ভয় পায়। তিনি সেজন্য কোন শাস্তি দেন না, কিন্তু শাস্তির পরোয়ানা তাঁর হাতে থাকে, এবং তাঁর ক্ষমতার এটাই প্রধান গুণ যে, তিনি সবাইকে বুঝতে পারেন।

তিনি এসব বুঝতে পারেন বলেই, মাধব এস্টেটের খবরদারি করার জন্যে যে সব সরকারী কর্মচারী আছে বা জনসাধারণের প্রতিনিধিরা রয়েছে, তাদের সবাইকেই ঘুষ দিয়েছেন, সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখেছেন, যে কারণে আমি ভাবছিলাম, এ মঠের তিনিই সব। তাঁর ক্ষমতা অসীম। তিনিই আসল মহারাজ। তাঁকে কেউ ভয় করে, কেউ ভক্তি করে, এবং আমার ধারণা, সেটা তাঁর প্রাপ্য।

* * *

আমি জানি না হৃদয়মালীর ফুসফুসের মধ্যে বিশেষ কোন কারুকার্য করা আছে কিনা, না হলে তাঁর সানাইয়ের আলাপ যত জোর হচ্ছে, সুরের সূক্ষ্ম কাজগুলো ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে কেন। আমার কোন ধারণা নেই, ফুসফুসের ভেতর থেকে ফুঁ দিয়ে, আর কয়েকটা আঙুল সানাইয়ের ছিদ্রে নাচিয়ে, কেমন করে, এই সুর ফুটিয়ে তোলা যায়, আর এখন যে আলাপটা বাজছে, তার মধ্যেই আমি হৃদয়ের মুখটা যেন দেখতে পাচ্ছি, এবং সানাইয়ের সুর আমার কখনোই খুব সুখের বলে মনে হয় না। যেন একটা কষ্ট কোথায় কোথায় লেগে থাকে, যা অনেক কিছু মনে করিয়ে দিতে চায়, অথচ একটা আনন্দ, হ্যাঁ আনন্দই বলা যায়, যাতে হাততালি দিয়ে ওঠা যায় না। অনেকটা, সুখ-দুঃখ একসঙ্গে জড়িয়ে যাবার মত আলাপটা যে ভাবে উঠছে, তাতে বুঝতে পারছি শেষ হতে বাকী নেই, তারপরেই ঢোল বেজে উঠবে, এবং সে সময়ের মধ্যেই আমার পৌঁছনো উচিত।

পায়রার ভিড়ে পা ডুবিয়ে আমি চত্বরে এগিয়ে গেলাম। পরমানন্দ এবং আমি পরস্পরকে অভিবাদন করলাম। পরমানন্দ তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে একবার আমাকে দেখে নিলেন। দেখবেন তা আমি জানি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ততক্ষণ দেউড়ির দিকে চলে গিয়েছে। উনি যখন দেখেন, তখন আমি ওঁর দিকে তাকাই না, দেখতে দিতেই চাই, তবু কোথায় যেন একটা আড়ষ্টতা আমাকে শক্ত করে রাখে। সেটা আমি টের পেতে দিই না, অনেকটা ধ্যানস্থের মতই চলে যাই, কারণ তখন আমার সেই রকম থাকবার কথা। অন্যান্য সেবকেরা যারা এদিকে ওদিকে নিজেদের কাজে চলেছে, যাদের (কেন জানি না) আমার খানিকটা মৌমাছির মত মনে হয়, যাদের শ্রমিক-মৌমাছি

boiRboi.net

বলে, এবং মৌমাছিরা সকলেই তাই, মেয়ে নয়, পুরুষ নয়, তারা জন্ম দিতে পারে না, চাকের মক্ষীরাণীর জন্যে কেবল মধু যোগাড় করে আনে, তারা শুধু শ্রমিক। মৌমাছি-সেবকেরা কেউ কেউ নিজের কাজে এদিক-ওদিক চলেছে, তারাও আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে, আমি তাদের মাথা ঝাঁকিয়ে, অনেকটা আশীর্বাদের মতই জবাব দিয়ে চলেছি।

দেউড়ির বাইরে মঠবাড়িকে ঘিরে অনেকখানি জমি, যার চারপাশেই ঢেউ তোলা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পূবদিকে মস্ত বড় গেট, এখানে ফটক বলে সবাই। পূবদিকে আর দক্ষিণদিকে বড় ফটক। দুই ফটকের পাশেই, বড় বড় দেবদারু গাছ রয়েছে। তা ছাড়া মঠবাড়িকে ঘিরে এই জমির পরিমাণ প্রায় একশো বিঘা, যার মধ্যে দেবদারু ছাড়া আম লিচুর গাছ কিছু আছে, আতা সফেদা ইত্যাদি ছাড়াও কয়েকটা অর্জুন এবং ইউক্যালিপটাসও আছে। এ ছাড়া মঠবাড়ির পিছনে আলাদা বাগান আছে, বাগান এবং পুকুর। পূব-দক্ষিণ কোণে ধর্মশালা যদিচ এ ধর্মশালা সাধারণ যাত্রীদের জন্য নয়, মঠবাড়ির সীমানার বাইরে, সাধারণ যাত্রীদের ধর্মশালা রয়েছে, ভেতরেরটা একমাত্র সম্প্রদায়ের বহিরাগত সেবকদের জন্যে। তার মধ্যে সম্প্রদায়ের গৃহস্থ ও উদাসীন সব রকমই আছে এবং এই সীমানার মধ্যে যারা থাকে, তারা স্বভাবতই ভেতরের পুকুর ব্যবহার, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলো পায়। পশ্চিম-উত্তর কোণে পিলখানা, যেখানে মঠের হাতি থাকে। আগের সেই বড় পিলখানাই আছে যখন অনেক হাতি ছিল, এখন আছে মাত্র দুটো, এবং দুটোই হস্তিনী, অলকা আর তিলকা। দান হিসাবে যে শ্রীমাধব আরো হাতি পেতে পারেন না, তা নয়। মঠের যে অর্থাভাব ঘটেছে তাও নয়। হাতি পোষার ব্যবস্থাগুলোই করে ওঠা যায় না। অলকা তিলকা দুজনেই যুবতী, বয়স তিরিশের মধ্যেই, কারোর গায়ের চামড়াই কোঁচকায়নি বা শিথিল হয়নি, এবং দুজনেরই গায়ের রঙ এখনো বেশ গাঢ় আর চকচকে। দুজনের মধ্যেই বেশ সখিত্ব আছে, কিন্তু তাদের কারোরই ছেলেমেয়ে নেই, কারণ তাদের পুরুষ নেই, তারা পরাধীন। তারা যদি জঙ্গলে থাকতো, এতদিনে হয়তো, পুরুষ হাতিদের মধ্যে, তাদের নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়ে যেত, এবং বিজয়ী যোদ্ধাদের রক্তাক্ত গা তারা শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে ধুয়ে দিত, তারপরে দলের বাইরে কোন নিরালায় গিয়ে, লোকেরা যাকে ফুলশয্যা বলে (হনিমুন নয়), তাই যাপন করতো, যদিচ তারা জানতো না বংশবৃদ্ধির জন্যে সেই মিলন, কারণ তারা মানুষ নয়, মিলন তাদের কাছে মিলনই মাত্র, তাই মানুষের মত তারা কোন বাণী তৈরি করে না। কিন্তু এসব কথা আমার ভাবা উচিত নয়, বিশেষ করে আমার হাতে এখন শালগ্রামশিলা, আমার একটুও একাগ্রতা নেই, বরং এইসব কথা ভাবতে গিয়ে, আমার চোখের সামনে এমন সব ছবি ভেসে উঠতে লাগল যার ফলে শরীরের মধ্যে সংসার-অনুরক্ত মানুষদের একটা অনুভূতি ঝংকার দিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি তিলকার দিকে এগিয়ে গেলাম।

দেউড়ির বাইরে, বাঁ দিকেই তিলকা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে তুলে নেবার জন্যে। না, আমাকে নয়, এই শালগ্রামশিলাকে তুলে নেবার জন্যে, বহন করে মন্দিরে নিয়ে যাবে। আমিও একজন বাহক মাত্র, কারণ শিলা হাঁটতে পারেন না, চলতে পারেন না, হাওদায় উঠতে পারেন না, যদিচ, কী-ই বা না পারেন, কারণ তিনিই সব, সব-কিছুর কারণ।

boiRboi.net

অলকা আমাকে দেখেই শুঁড় কপালে স্পর্শ করল। জবাবে আমার 'দাসোঽহং' বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তা পারি না, হেসে মাথা নাড়ি। আসলে এটা তার অভিবাদনই, তার জবাব আমারও দেওয়া উচিত। তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মাহুত রামু, যে এইমাত্র আমাকে না ছুঁয়ে 'সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত' করে গায়ের ধুলো ঝাড়ছে। তিলকা ইতিমধ্যে বসে পড়ে। তার শুঁড়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকেই কপাল পর্যন্ত প্রকাণ্ড তিলক আঁকা হয়েছে, যার মাঝখানে লাল রঙের রেখাও আছে। কপালের দুই পাশে, কানেও রামু নিজের হাতে স্মারকচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যেগুলো আসলে তিলকার প্রসাধনের মতই দেখাচ্ছে এবং রামু এসব তার বাবার কাছ থেকেই ছেলেবেলায় শিখেছে, কারণ তারা এই মঠের বংশপরম্পরা মাহুতের কাজ করে আসছে। তিলকা বসে পড়তেই রামু একটা মই এনে হাওদার সঙ্গে ঠেকিয়ে দেয়, আমি মই বেয়ে শিলা নিয়ে উঠে বসি। কাশ্মীরী রঙীন গাব্বার ওপরে, নকশা-কাটা হাওদায় গদী পাতা রয়েছে। রামু মই সরিয়ে রেখে, অঙ্কুশ হাতে তিলকার কাঁধের কাছে বসে। একটা ছোটখাটো জনতা জমে ওঠে। যারা মঠবাড়ির ভেতরে এসেছিল, হাতি এবং মঠবাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে, অনেকসময়, পিছনের বাগানে পাখি ও হরিণ দেখতে, (সাধারণ দর্শনার্থী ও যাত্রীদের এ ব্যাপারে কোন বাধা দেওয়া হয় না, কেবল বাড়ির মধ্যে তাদের প্রবেশ নিষেধ।) তারা সকলেই তিলকার কাছাকাছি জড়ো হয়। তিলকা উঠে দাঁড়িয়ে পূব ফটকের দিকে এগিয়ে চলে।

একদিন তিলকা, একদিন অলকা, এই নিয়মেই চলে। আমি এ-সময়ে মই বেয়ে হাওদায় উঠলেও, অন্যান্য সময়, যখন বেড়াতে যাই বা কোন কাজে বেরুই, তখনো আমি এদের পিঠে চেপেই যাই, এবং তখন, অলকা তিলকা আমাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নেয়। ওটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হত, ভয় পেতাম। ব্যাপারটা অনেকটা ট্র্যাপিজ খেলার মত, কিংবা তার থেকেও অন্যরকম কিছু। তবে তোলার থেকেও যাকে তোলা হয়, তার কৃতিত্বই বেশি বলে আমার ধারণা, কারণ তাকে মাংসপেশী শক্ত করে, অনেক কসরত করেই উঠতে হয়। অনেকবারই পড়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছে, যদিও ওরা শুঁড় দিয়ে আটকে রেখেছে, ঠেলে দিয়েছে। এ বিষয়ে রামুই আমার গুরু।

* * *

ধর্মশালার বারান্দায় কয়েকজন যাত্রী দাঁড়িয়ে দেখছিল। ছেলেবেলায় আমি ওখান থেকেই প্রথম, এই রকম দৃশ্য দেখেছিলাম, ঠিক ওই রকম বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মনে করতে পারি না, তখন কোন ঋতু ছিল, এমনি পরিষ্কার আকাশ ছিল কিনা, এমনি নীল, যদিচ এখনো ঝকঝকে হয়ে ওঠেনি, কারণ সূর্য ওঠেনি, তবু নীল এবং পাখিরা ডাকাডাকি করছিল কিনা, আমার মনে পড়ে না। তবে প্রথমে যেদিন দেখেছিলাম, সেদিনও এরকম ভোর ছিল, কিন্তু সানাই বাজছিল কিনা মনে নেই, কারণ এতই নিবিষ্ট হয়ে হাতি দেখছিলাম, এবং একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল, যে-কারণে দূর থেকেই দেখেছিলাম। হাওদার ওপরে মহারাজকে দেখেছিলাম, পরমানন্দ তখন অধ্যক্ষ। মনে মনে ভেবেছিলাম, 'মানুষ কী করে হাতির পিঠে ওঠে, ভয় হয় না। আমি কোন দিনই উঠতে পারব না।

হয়তো সেই মুহূর্ত থেকেই আমি হাতির পিঠে চড়ার স্বপ্ন দেখেছি, মানুষ কেমন করে ওঠে, এই ভীরু ভাবনা ও সংকটের সঙ্গে লড়াই করেছি, যে-লড়াইয়ের কথা আমার নিজেরই জানা ছিল না। তারপরে যেদিন প্রথম হাতির পিঠে উঠেছিলাম, সে কথা মনে হয়েছিল, এবং আমি ধর্মশালার বারান্দার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হেসেছিলাম, যেন নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, বলছিলাম, এইভাবে, মানুষ এইভাবে ওঠে, তার ভয় হয় না। এবং তখন আমার মনে হয়েছিল, মানুষ যা পারবে না বলে ভাবে, সেই দিকটাতেই তার ঝোঁক বেশি থাকে, কারণ, সে পারবে না, একথা ভাবলেই একটা ব্যর্থতার কষ্ট তার মনের মধ্যে লেগে থাকে, পারবার একটা ইচ্ছা চিরদিন তার ভিতরে কাজ করতে থাকে। মানুষ কী পারে আর পারে না, তা তার জানা নেই, কারণ সে নিজেকে চেনে না। এ কথাটা, সামাজিক কোন কাজে বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হয়তো তেমন সত্যি নয়, যেমন ভোটে দাঁড়ানো বা দৌড়ের বাজী ধরা ; কিন্তু যেমন ধরা যাক, দৌড়ের সময়, একজন বরাবরের সৎ মানুষ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাবার জন্যে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, তাকে একটা ল্যাঙ মেরে পা খোঁড়া করে দেবে, এমন কি প্রয়োজন হলে, বর্ডার ফেন্‌সিং-এর যেখানে লোহার শিকের খোঁচাটা বেরিয়ে আছে, সেখানে তাকে ছুটতে ছুটতে ধাক্কা মারবে, যাতে খোঁচাটা বিঁধে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, অথবা ভোটে যে লোকটা দাঁড়িয়েছে, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় নিজেকে অনেক দুর্বল ও হীন মনে করায়, শেষ মুহূর্তে তার শত্রুতার মনোভাব চলে যায়, প্রতিদ্বন্দ্বীর দাঁড়ানোটাই তার কাছে উচিত মনে হয়, নিজের নাম তুলে নেবার সিদ্ধান্ত করে, এবং নিজের শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দান করে। এদের মধ্যে একজনকে লোকে জানত, কোন অন্যায় সে করতে পারে না, আর একজনকে জানত, কোন অন্যায় করতেই লোকটা পেছ-পা নয়।

আমি এরকম না চেনার কথাই বলছি, মানুষ নিজেকেই সব থেকে কম চেনে, এবং এরকম ঘটনার দ্বারাই সেগুলো প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ কথা আমি বলব না, মানুষ নিজেকে মোটেই চিনতে পারে না, এবং যখন সে নিজেকে চিনতে পারে, তখন তার সামনে দুটো পথই মাত্র খোলা থাকে। একটা হচ্ছে লুকিয়ে চলা, সে যা নয়, তাই লোকের সামনে দেখানো, তার কোন উপায় নেই যে, সে নিজেকে খুলে ধরবে, কারণ সে আত্মসমর্পণ করেছে। নিজেকে চিনলেই নিজের সঙ্গে লড়াই লাগবেই, এবং লড়াই লাগলে, হয় লড়তে হবে, না হয় হার মানতে হবে। কোটি হার মানে, গোটি লড়ে। নিজেকে চেনা মানেই নিজের ভিতরের অসহায় অবস্থাগুলোর খবর জানা—ওহো আমি এই ? কোটি ভয় পেয়ে যায়—বলে, চেপে যাও। সবাই যা করছে, তুমিও তাই করে যাও, তুমিও বল—"আঃ ছি ছি, দেশ ও সমাজের কাণ্ডটা দেখেছেন, ঃ সব রসাতলে গেল,···দেশকে গঠন করতে হবে, তার জন্যে ত্যাগ চাই···ধর্মে মতিগতি রাখো··· আজকালকার ছেলেমেয়েরা খারাপ···ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ফাঁসি দেওয়া উচিত, আমি হলে··· ।" অর্থাৎ কোন ব্যাপারেই কোন দায়িত্ব নেই, অনুভবও করে না, সাহসও নেই, এবং কোন কথাটার সঙ্গেই নিজের জীবনধারণের কোথাও কোন যোগাযোগ নেই।

প্রতিদিন, এবং জন্ম থেকে মৃত্যু, এইভাবেই কেটে যায়। একে ভীরুর সুখ বলা যায়, যদিচ একে আমি দুঃখীই ভাবি, কারণ একটা মানুষ নিজেকে কখনো আলোর

boiRboi.net

নিয়ে আসতে পারল না, কারণ আলোটা অতি ভয়ঙ্কর, তার কাছে প্রায় বীভৎসই বলা যায়, কারণ আলোয় টেনে নিয়ে আসার জন্যে, নিজের ভিতরের অসহায়তাগুলোর সঙ্গে লড়তে হয়—কেন আমি এই ? এ বিষয়ে তাকে খুঁজতে হয় এবং খুঁজতে গেলেই, তার গায়ের ময়লাগুলো আর ঢেকে রাখা যায় না, খুলে ফেলতে হয়, আর চেপে যাওয়ার দল তখন ওয়াক্ থুঃ বলে ঘৃণা করে হাসে, টিটকারি দেয়, কারণ তার তো সবই ঢাকা দেওয়া আছে। কিন্তু যে খোঁজে ও লড়ে, তার তখন চরম দুর্গতি, নিজেকে পরিষ্কার করার জন্যে তাকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়, নিজেকে খুলে ফেলার দরুন ঘৃণাও সইতে হয়, তবু সে আলোর দিকেই চলে, কারণ সে-ই জেনেছে, আলো কত সুন্দর, কত অপরূপ, সেইজন্যে আলো আলো বলেই ছুটতে থাকে, চীৎকার করতে থাকে, (এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের একজন মহান কবির কথা আমার মনে পড়ছে, যিনি সারা জীবনই কেবল 'আলো আলো' করে ছন্দে গানে ধ্বনি করেছেন, যেন অন্ধকার তাঁকে সারা জীবনই তাড়া করেছে, আর সেটাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন, অন্ধকার—অন্ধকার, তাই, আলো—আলো।) আর দুর্গতিই যে জীবন, দুঃখই যে সত্য ও সুন্দর, এই অনুভূতিই তার মুখে সাহস ও বিশ্বাসের ও শান্তির একটা হাসি ফুটিয়ে তোলে, আর তখন দায়িত্ব-বোধের দরুন সে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকে ফাঁসি দেবার জন্যে কাজ করে কিন্তু তার জন্যে নিজের গলাকে সে কোন মিথ্যার কোটরে বাঁধা রেখে আসে না জানে, দায়িত্ববোধের কাছে নিজের গলা জামিন দেওয়া আছে, এবং দেশ ও সমাজ যে-রসাতলে, সেখানেই তার কাঁধ পাতে, জানে, কাঁধ দিলে, মুখ থুবড়ে পড়ে মরাটাও মেনে নিতে হয়।

* * * *

হৃদয় মালীর সানাইয়ের আলাপ শেষ হতে চলেছে, আমি বুঝতে পারছি, কারণ যদিচ আমি সুরটার নাম জানি না, তবু যতই শেষ হয়ে আসে ততই যেন একটা আর্তস্বরের চীৎকার তীব্র হতে থাকে। চীৎকার বলব না, হয়তো সেটা কান্নার মতই। কেন আমার এরকম মনে হয় জানি না, এবং আমি দূরের নহবতখানায় হৃদয়ের অস্পষ্ট ছোট মূর্তি দেখতে পাচ্ছি, যা একটু একটু করে দুলছে। কিন্তু তার থেকে বেশি যেন আমি তার ফুসফুসটা হাপরের মত ফুলতে আর চোপসাতে দেখছি, যে ফুসফুসের মধ্যে অনেক কারুকার্য করা আছে বলে আমার ধারণা, এবং তার প্রকাণ্ড কালো মুখটা, একটা রুদ্ধশ্বাস গলা ফুলানো অবস্থায় আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং সব মিলিয়ে কেন যেন মনে হচ্ছে সানাইটাকে সে জীবনপণ করে মুখের মধ্যে ঠেসে ধরে বুকের ভিতর থেকে কিছু জানাচ্ছে, যাতে মনে হয় সে বাঁশীটাকে কখনো ছাড়তে পারবে না। অথচ একটা অসহ্য যন্ত্রণা ও ঘৃণা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। কেন এরকম মনে হয় তা জানি, তবে এর থেকে এরকম ধারণা হয়, যেন সানাইটার সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গিয়েছে। সে ওটার মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছে, বেরিয়ে আসবার জন্যে যতই চীৎকার করে, ততই বাজে, আর বাজে বলেই বেরিয়ে আসতেও পারে না। একে হয়তো প্রেম বলে।

হৃদয় মালীর নিজের প্রেমের ব্যাপারটাও প্রায় এইরকম, আমি জানি, কারণ এই মাধবগড়ের সম্পত্তির মধ্যেই সুহাগা নামে যে গ্রাম আছে মাইল দেড়েক দূরে, সেখানকার এক অচ্ছুৎ নটীর (নটী অর্থে নর্তকী নয়, নট নামে এক জাত আছে, গ্রামে যারা সীমান্তে বাস করে, শুয়োর-পালনই যাদের প্রধান কাজ বলা যায়। কোন কোন সময়

ডোমেদের মতই ঝুড়ি-চুপড়ি তৈরি করে, তবে গান-বাজনার রেওয়াজটা এদের মধ্যে খুব লক্ষ্য করা যায়, কিছুটা যাযাবরবৃত্তিও দেখা যায়, যার থেকে মনে হয়, এরা ঘর বাঁধতে বেশিকাল শেখেনি, ঘরের ভিত্ তেমন শক্ত হয়ে ওঠেনি, এবং এদের মেয়েদের নামে গৃহস্থের ঘরেও পুরুষদের মন-চুরির অপবাদ আছে, অর্থাৎ মেয়েদের চরিত্র নাকি খারাপ, তাই ওরা বশীকরণ জানে, নাচ-গানও নাকি জানে। নট জাতের মেয়ে বলেই আমি নটী বলেছি।) স্বামীর কাছ থেকে অভিযোগ এসেছিল, হৃদয় মালী তার বউকে খারাপ করেছে। হৃদয় বিপত্নীক, তার একটি ছেলে আছে, যার ছোট মাথাটি দূরের নহবত-খানায়, তার বাবার পাশেই আমি দেখতে পাচ্ছি, সে পোঁ ধরেছে। নালিশটা অদ্ভুত, নটের বউকে খারাপ করেছে মঠের সানাইবাজাওয়ালা, কারণ—আগে জানা ছিল, ওরাই লোককে খারাপ করে, কারণ মেয়েদের বশীকরণ জানা আছে, এবং চরিত্রের কোন বালাই নেই। বিচারের ভার আমার ওপরেই এসেছিল। এখনো, এইসব অঞ্চলের লোকেরা, মাধবগড়ের মোহন্তকেই তাদের সবকিছুর মালিক বলে মনে করে, বিশেষ যারা শ্রীমাধবের প্রজা, আর্জি করে, নালিশ জানায়। মোহন্তরা সে ভার নিয়ে এসেছেন, এখন এই গণতান্ত্রিক সরকারের যুগেও, যতটা সম্ভব মিটমাটের চেষ্টা করেন, যাতে ব্যাপারটা কোর্ট-কাছারি পুলিসের হাতের মধ্যে গিয়ে না পড়ে।

পরমানন্দ আমাকে বিচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং আমি হৃদয় মালীর মুখটা মনে করে, তাকে কোনরকমেই অপরাধী চিন্তা করতে পারছিলাম না, ভাবতে পারছিলাম না যে, একটি সরল যুবতী নট-বউকে সে খারাপ করেছে। অবিশ্যি যদিচ তখনো জানতাম না, খারাপ করার ব্যাপারটা কী, অর্থাৎ কী ভাবে খারাপ করেছে। খারাপ অর্থে, এখানে দু-রকম বোঝায়, খারাপ কাজ (কথাটা বিশ্রী, বোধহয় যৌন আচরণ বললেই ঠিক হয়, কিন্তু সেটা তো আমাদের ভাষায় আরো খারাপ! আর আমিই বা কি, একজন সংসার-বিরক্ত বৈরাগী, হাতে শালগ্রাম শিলা, এসময়ে এসব ভাবনা—কিন্তু মনে আসে কেন জানি না।) করে বউটিকে খারাপ করে ফেলেছে, অর্থাৎ বক্তব্যটা অনেকটা দুধের ছানা কেটে যাবার মত, অথবা হৃদয় বউটির প্রতি আসক্তি জানিয়েছে, কোনরকম লোভ দেখিয়েছে, বা ভাব করতে চেয়েছে।

যাই হোক, কোন নট-বউকে খারাপ করার নালিশ কখনো মঠে আসেনি, উলটোটাই এসেছে, তাই পরমানন্দ আমাকে সকলের সব কথা ভাল করে শুনতে বলেছিলেন, এবং যারা নালিশ করেছিল, তাদের সঙ্গে কোন্ ধরনের লোকেরা আসছে, সেটা লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসীরা যারা সাধারণ নরনারী নন, তাদের চরিত্র ও মনের কথা জানবেন কী করে, বিচারই বা করবেন কেমন করে, করা উচিতই বা কেন। কিন্তু মাধবগড়ের মহারাজ হলে, তাকে অনেকটা রাজার মতই দায়িত্ব পালন করতে হয়, এটাই রেওয়াজ হিসাবে চলে আসছে।

সেই নট ও নটের বউ, তাদের সঙ্গে, নট নয়, এরকম কয়েকজন লোকও এসেছিল, হৃদয়ের পক্ষে কেউ ছিল না। মঠের কাছারি ঘরেই বসেছিল, আমার কাছ থেকে একটু দূরে পরমানন্দও বসেছিলেন। দেখেছিলাম নট-বউটি সম্পূর্ণ আলাদা, দল-ছাড়া হয়ে এসে মাটিতে পড়ে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল, যেন অনিচ্ছায় সে এসেছিল, তার চোখে একটা রাগ এবং ঘৃণার ভাব, এবং নট-বউয়ের কালো বড় বড় চোখদুটিতে সেই

boiRboi.net

রাগ ও ঘৃণার ভাব যেন একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য (হায় বৈরাগী !) এনে দিয়েছিল। ওই রকম ভাব নিয়ে সে তার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল, তার স্বামী অনেকটা ভক্তিনম্র হয়ে আমার দিকে ও তার সঙ্গের লোকদের দিকে তাকাচ্ছিল, বউয়ের দিকে একবারও নয়। নট-বউকে আমার একটা ঝকঝকে ছুরির মত মনে হয়েছিল, যুবতীদের যা সব থাকলে তাকে পরমাশ্চর্য বলে মনে হয়, (এ সব আমার জানার কথা নয়।) তার সবই ছিল, এবং তার কালো রঙ তাকে আরো যেন যুবতী করে তুলেছিল, সহবতের জন্যে সে ঘোমটা দিয়েছিল, যদিচ মুখ ঢাকেনি, নাকে একটা সোনা বা পিতলের ফুল ছিল, যাকে নাকছাবি বলে, দু হাতেই অনেকগুলো কাঁচের চুড়ি, এবং খয়েরি রঙের কাপড়ে সাদা সাদা অজস্র ফুলের ছাপার জন্যে, মনে হচ্ছিল যেন, ফুল-ফোটা ঝোপের মধ্য থেকে, তার মুখ-হাত-পা বেরিয়ে আছে। সে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল, তবু তাকে অনিচ্ছুক, তার থেকে বেশি, উদ্ধত দেখাচ্ছিল, এবং তার ঔদ্ধত্যের জন্যে, আমি তার চরিত্রকে যেন ঠিক দোষারোপ করতে পারছিলাম না, দোষটা তার শরীরেরই ছিল, কারণ তার স্বাস্থ্য উদ্ধত। হৃদয় কোনদিকে না তাকিয়েই ঘরে ঢুকেছিল, এবং একপাশে বসেছিল, আর তার দিকে নট ও সঙ্গীরা রেগে তাকিয়েছিল, নট-বউও তাকিয়েছিল, এক পলক মাত্র, এবং তার নিজের অজান্তেই বোধহয় ভুরু কেঁপে গিয়েছিল। কী রকম ভাব যে তার মুখে ফুটে উঠেছিল, আমি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারি না।

প্রথমে নট-স্বামীর অভিযোগই আমি শুনেছিলাম, তার অভিযোগ ছিল, সুহাগার নটপাড়ায় প্রায়ই হৃদয়ের যাতায়াত ছিল, সে ওখানে তাড়ি খেতে যায়, এবং সানাই বাজায়। তাড়ি খেলেই সে মাতাল হয়ে যায়, মাতাল হলেই পাড়ায় ঢুকে মাতলামি করে, মেয়েদের নামে যা-তা বলে, মুখ খারাপ করে। মাতাল হয়ে প্রায়ই সে নটের বাড়িতে যেত। তারপরে বউয়ের সঙ্গে ভাব করে, তাকে খারাপ করেছে, যার মূলে ছিল সানাই, কারণ ওটা বাজিয়ে সে বউকে শোনাত, এবং শুধু তার বউকেই নয়, অনেক বউ-মেয়েই তার সানাই শুনত। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, বউ আর ঘরেই থাকে না, গৃহস্থালির কাজকর্ম সবই পড়ে থাকে, সে হৃদয় মালীর ঘরে চলে যায়। হৃদয় মালীকে সে তার বাড়ি যেতে নিষেধ করে দিয়েছিল, বউকেও অনেকদিন যেতে বারণ করেছে, কিন্তু তারা কেউ কথা শোনে না। তারা যে পাপ করছে, তার প্রমাণ, হৃদয় মালীর জল চলে, কিন্তু নটেরা অচ্ছুৎ, তবু হৃদয় তার বাড়ি যায়, এবং বউকেও নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেয়, অথচ হৃদয় শ্রীমাধবের নহবতখানায় সানাই বাজায়। অতএব, হৃদয় যাতে তার স্ত্রীকে আর বাড়িতে যেতে না দেয়, হৃদয়ও যেন তার বাড়িতে আর না যায়, এটাই মহারাজের কাছে তার প্রার্থনা, যদিচ গাঁয়ের লোকেরা সবাই বলেছে, হৃদয়ের মত খারাপ লোককে মাধবের সেবায় রাখা উচিত নয়।

নটের সঙ্গে যারা এসেছিল সাক্ষী হিসাবে, তারা হৃদয়ের ওপর আরো বেশি চটা। তারা হৃদয়কে সুহাগায় আর ঢুকতে দিতে চায় না, এমন কি মাধবগড়েও যেন তাকে আর রাখা না হয়, তাকে যেন উচ্ছেদ করা হয়, কারণ, মেয়েদের খারাপ করার অভ্যাস সে ছাড়তে পারবে না, এটা তারা বুঝতে পেরেছে।

boiRboi.net

আমি পরমানন্দের দিকে তাকিয়েছিলাম, তাঁর দৃষ্টি ছিল হৃদয়ের ওপর কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে কিছু না জিজ্ঞেস করে, নটবউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ সব বিষয়ে

তার কী বলবার আছে। এতে পরমানন্দ অবাক ও বিরক্ত হয়েছিলেন, পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন আমি হৃদয়কে তখন কিছু জিজ্ঞেস করিনি। সত্যি বলতে কি, সমস্ত অভিযোগ থেকে হৃদয়ের কোন দোষ বুঝতে পারিনি, যে কারণে বউটির কথা আমি আগে শুনতে চেয়েছিলাম, যাতে হৃদয়ের দোষ আরো বেশি করে বুঝতে পারি। পরমানন্দ সে কথায় খুশীই হয়েছিলেন, সমর্থন করেছিলেন।

কিন্তু বউটি স্বামীর কথার অনেক প্রতিবাদ করেছিল, সে জানিয়েছিল, বাজাওয়ালাকে (হৃদয়কে) সে কোনদিন মাতলামি করতে দেখেনি, মুখ-খারাপ করতে শোনেনি, মেয়েদের সঙ্গে খারাপ কিছুই করতে দেখেনি। বাজাওয়ালা তাড়ি খেতে যেত ঠিকই, এবং তার স্বামী ও গ্রামের আরো যারা সব এসেছে, সকলেই একসঙ্গে তাড়ি খেত, জঘন্য মাতলামিও এরাই করত, এবং যাদের জল চলে, এরকম লোক যারা এখানে সাক্ষী দিতে এসেছে, একটু জমি-জায়গা-চাষবাস বেশি আছে, তারা সকলেই তার স্বামীর সঙ্গে, তাদের বাড়িতে এসে খারাপ কথা গল্প-গান করত, যা বাজাওয়ালা কখনোই করেনি। সে কেবল বাজাত, নট-বউয়ের তা ভাল লাগত, সে কারণে যে নিজেই তাড়ির আড্ডায় যেত আরো দু-চার জন যেত, একটু দূরের একটা গাছতলায় বসে তারা বাঁশী শুনত আর নিজেদের মধ্যে গল্প করত, তার মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না। তারা মেয়েরা কখনোই সহবত হারায়নি, পুরুষদের দিকে আড়াল করে বসে অল্পস্বল্প তাড়ি খেত, বরং এই সব সাক্ষীরা অনেকেই মেয়েদের গাছতলায় হানা দিত, যা নিয়ে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ হত।··· যাই হোক, যখন কোন ভিড়-টিড় না থাকত, তখন সে বাজাওয়ালার কাছে গিয়ে বসত, তার সঙ্গে কথা বলত, এবং সে নিজেই বাজাওয়ালাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়, কারণ কাছে বসিয়ে বাজানো শুনতে তার ইচ্ছা হত। তবে হ্যাঁ, যদি জিজ্ঞেস করেন, বাজাওয়ালা কেন নটের বাড়িতে ঢুকেছিল, বা আমিই বা কেন এরকম অধর্ম করলাম যে, তাকে বাড়িতে আসতে বললাম, কারণ আমরা অচ্ছুৎ, তবে শ্রীমাধবের নাম করে বলছি, আমার মন মানেনি। তবে কিনা, হ্যাঁ, বাজাওয়ালারও মন মানেনি, নট-বউকে তার ভাল লেগেছে, আর তা লাগতেই পারে, কারণ লোকটার ঘরে বউ নেই, যে কারণে তার মনে হয়, পুরুষেরা বয়স হলে মেয়েমানুষ নিয়ে থাকতে চায়, এবং মেয়েমানুষেরাও পুরুষের কাছে থাকতে চায়, (আঃ, সত্য কী বিচ্ছিরি, তার থেকে বিচ্ছিরি মেয়েটার সত্য বলার ভঙ্গি, কারণ সে-ভাবে বলতে শেখেনি, যে কারণে আমি বউটার দিকে তাকাতেই পারছিলাম না, এবং আমার মুখের চেহারা কেমন দেখাচ্ছিল জানি না।) অবিশ্যি যদিচ, তার স্বামী আছে, তবু সত্যি বলতে কি বাজাওয়ালাকে তার ভাল লাগে, কারণ তার স্বামীকে ভাল লাগে না, এবং এখানে যারা সাক্ষী দিতে এসেছে, স্বামী চায় যেন সে এদের সঙ্গে মেলামেশা করে, কিন্তু সে তা পারে না। তার থেকে সে বাজাওয়ালার সঙ্গেই মেলামেশা করবে এবং একথাও সত্যি, সে বাজাওয়ালার বাড়ি যায়।

নট-বউয়ের কথাবার্তা এতই স্পষ্ট, তার যে সত্যি বলতে কোন ভয়-ডর ছিল না, সে যে জীবনের বিতৃষ্ণা নিয়ে, অনেক দুঃখে ও তিক্ততায় ওভাবে কথা বলছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল। আমি তার কোন দোষই দেখতে পাচ্ছিলাম না, যদিচ সেকথা আমার ভাবাও অন্যায়, কারণ সে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, অন্য পুরুষের সঙ্গে সে যা খুশি করতে

boiRboi.net

পারে না, তবু তার মধ্যে একটা কথা থেকে যাবে, যে-কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় তার স্বামীর আপত্তি ছিল না, আপত্তি কেবল হৃদয়ের সঙ্গেই। আর একটা কথাও স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, স্বামীকে সে তার উপযুক্ত পুরুষ মনে করে না, একটা অশ্রদ্ধা আর বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছিল, এবং সেটা সম্ভবত সে যন্ত্রণার সঙ্গেই অনুভব করেছে, একজন নট-পুরুষের দিক থেকে যেটা খুবই আশ্চর্যের। তার ওপরে, বউয়ের কথা থেকে অনুমান করা গিয়েছিল, যাদের সঙ্গে নট তার স্ত্রীকে মেলামেশা করতে বলেছিল, তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন স্বার্থের সম্পর্ক আছে, কোন ভয় আছে, যা হৃদয়ের কাছে নেই।

আমি বারে বারেই পরমানন্দর দিকে তাকাচ্ছিলাম, এবং হৃদয়কে, যে সমস্ত সময়টাই মাথা নিচু করে বসে শুনেছিল, একবারও মুখ তোলেনি, জিজ্ঞেস করেছিলাম তার কী বলবার আছে। সে তখনো মাথা তোলেনি, জবাব দিয়েছিল, নট-বউ যা বলেছে, সবই সত্যি।

আমি নিজেকে খুব বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত মনে করেছিলাম, কারণ তারপরেই আমাকে রায় দিতে হবে। খুবই আশা করেছিলাম, পরমানন্দই কিছু বলবেন, আমাকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দেবেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে চুপচাপ শক্ত মুখে বসেছিলেন, যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন, যে কারণে মনে হয়েছিল, বিচারটা নট-বউ বা হৃদয়ের নয়, আসল পরীক্ষা আমারই।

আমি প্রথমেই বলেছিলাম, তোমরা সকলেই ধর্ম ভুলে গেছ, (জয় মহারাজ! মনে মনে একথাও আমি নিজেকে বলেছিলাম।) তোমরা যে শ্রীমাধবের প্রজা, তা তোমাদের কথা থেকে একটুও বোঝা যায় না। এতে আমি খুবই দুঃখিত।

দেখেছিলাম, পরমানন্দর মুখে একটা পরম আনন্দ গলে পড়ছে, তিনি প্রশংসার চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, ধর্ম এবং জাত সবাইকে মানতে হবে, (আহা মোহন্তজী, আপনার কী অপার মহিমা।) এর কোনরকম গোলমাল করলে চলবে না। নটদের নিজেদের মধ্যে কিছু ঘটলে আমি বলতে পারতাম, যে পরিমাণ টাকা এবং পণ দিয়ে নট বিয়ে করেছে, সেই পরিমাণ টাকা আর পণ হৃদয় নটকে দিয়ে দিক, এবং তারা সাঙা করুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সে জন্যে নট-বউ আর হৃদয়কে বলব, তারা যেন আর মেলামেশা না করে, কেউ কারুর বাড়ি না যায়।

এ সময়ে নট ও তার সঙ্গীরা খুব খুশী আর ভক্তি-গদ্‌গদ মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিল, আর নট-বউয়ের চোখে দেখেছিলাম আগুন, যে-আগুন দিয়ে সে তার স্বামী, স্বামীর সাঙ্গপাঙ্গ, বিচার, এমন কি বাজাওয়ালাকেও পুড়িয়ে দিতে চাইছিল।

আমি তারপরে আরো গম্ভীর আর কঠিন গলায় বলেছিলাম, কিন্তু নট-বউয়ের কথা আমি বিশ্বাস করেছি, নট ভিন্ জাতের লোকদের সঙ্গে তার বউকে মিশতে বলে। যদি আমি কখনো খবর পাই, ভিন্ জাতের লোকদের সে বাড়িতে নিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে মিশতে বলেছে, তাহলে তার ঘর আমি হাতি দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেব, এবং সেই সব, ভিন্ জাতের লোকদেরও আমি উচ্ছেদ করে ছাড়ব। সকলেই ধর্ম আর জাত নিয়ে (শ্রীমাধব আপনাকে রক্ষা করুক।) শান্তিতে বাস করুক, এই আমি চাই।

আমার বিচারে পরমানন্দ খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু জানতাম, আর কাউকেই খুশী

boiRboi.net

করতে পারিনি, কারণ বিচার কখনো দেশ-সমাজ-কালের ওপর যেতে পারে না, এবং এই সব বিচার যে কখনোই মানুষকে কোন পথ দেখাতে পারে না, তার প্রমাণ হয়েছিল অন্য ভাবে, নট-বউ একটি পাকা স্বৈরিণী হয়ে উঠেছিল। সে স্বৈরিণী হওয়ায়, কেউ নালিশ করতে আসেনি, কারণ নালিশ করার আর কিছুই ছিল না, সকলে হয়তো তাই চেয়েছিল। তবু কোন নালিশই যে ছিল না, তা আমি বলব না ; নালিশ একটা ছিল, যা কখনো কেউ উচ্চারণ করেনি, যা কেউ কখনো শুনতে পায়নি। তা একজনের স্বৈরিণী হওয়ার জ্বালা, আর একজনের চাওয়ার যত না পাওয়ার কষ্ট।

আমি জানি, হৃদয় মালী তার বুকের দরজা বন্ধ করে চাবিটা দিয়ে বসে আছে, নট-বউকে, কিন্তু যে নট-বউকে দিয়েছিল, বিচারের প্রহসনের পর (জয় হোক মহারাজের) সে নট-বউ আর ছিল না। চাবিটা নিয়ে চাবির কথা মনে রাখতে পারত না, কারণ তখন যে সে নিজেকেই ভুলেছে প্রতিশোধের জ্বালায়, বুকে তখন হাঁক পড়েছে, তবে রে মুখপোড়া সমাজ-ধর্ম আর জাত, দ্যাখ তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখাতে গিয়ে সে রঙ্গিণী হয়ে পড়ল, চাবিটার কথা মনে রইল না। মাঝে মাঝে, চাবিটা যখন হঠাৎ আচমকা ফুটে যায়, তখন মনে পড়ে, একটা ঘরের দরজার চাবি তার কাছে, ভাবে, যাই দেখে আসি, ঘরটা বন্ধ আছে, না কেউ খুলে ফেলেছে। এসে দেখে, যেমন বন্ধ, তেমনই বন্ধ, তখন খোলে এবং ঢোকে এবং ঘর পেয়ে একটু বিশ্রাম করতে চায়, ঘরের মধ্যে গড়াগড়ি যায়, ঘরটাকে সাজাতে চায়, কিন্তু ঘর তার, জমি যে তার নয়, তাই উঠবন্দী প্রজার মত তার অবস্থা, আবার চাবি এঁটে বেরিয়ে যায়। তাই বলছিলাম, হৃদয়ের সঙ্গে তার সানাইটার যেমন প্রেম, নিজের প্রেমটাও তার তেমনি, মুখের ওপর ঠেসে ধরে বসে আছে, ফুসফুস ফুলছে, শব্দ হচ্ছে, কোথায় যেন জড়িয়ে গিয়েছে, মুক্তি পাওয়া যায় না, যে কারণে ঘৃণা হয়। রাগও হয়, তবু বেরিয়ে আসা যায় না।

কিন্তু হাতে আমার শালগ্রাম শিলা, মনকে আমার একাগ্র করা উচিত, অথচ এই আমার সংকট, যে অন্য জীবন থেকে সাবিত্রীর মত মৃত্যুদূতের পিছনে পিছনে অনুসরণ করে আসছে। আমার ভয় হয়, আমি যেন ইতিপূর্বেই শতপুত্রের জননী হবার রায় দিয়ে বসে আছি, অনেক আগেই আমি হয়তো নিজের চক্র ভুল করে বসে আছি, বাঘ কোন্ দিকে, আর তা স্থির করতে পারছি না, যে কারণে আমার ধারণা হয় আমি বোধ হয় নিজেকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু তা আমি চাইনি। নহবতখানা এগিয়ে আসছে, এখন আমি ওদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আলাপের পর সুর বদলেছে, কর্মা ঢুলী তার ঢোলকে চাঁটি মেরেছে। মন্দিরের পাঁচিলের পাশের রাস্তা দিয়ে তিলকা চলেছে। পূর্বদিকের আকাশ এত লাল দেখাচ্ছে যে, হয়তো সূর্য উঠেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। মন্দিরের সীমানায়, গাছে গাছে পাখিরা ডাকছে, ঢোল-সানাইয়ের শব্দ ছাড়িয়েও আমি তা শুনতে পাচ্ছি, এবং তিলকাকে পাখিরা ভয় পায় না, যে কারণে, তার খুব কাছ দিয়েই তারা উড়ে যাচ্ছে।

রাস্তার ধারে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে, আমি পাথর কামড়ে ধরা লাল মাটির গাছপালা-হীন ভূমি দেখতে পাচ্ছি, যে ভূমি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে, এবং আবার গিয়ে অনেক দূরে উঠতে আরম্ভ করেছে। সেই ভূমির কোথাও কোথাও, ছড়ানো ছিটানো পলাশ বা মহুয়া বা অন্য কোন গাছ কয়েকটা দেখা যায়। আমার পিছনে পিছনে জনতা

boipoi.net

আসছে, ছেলেমেয়ে-পুরুষ, সব রকমেরই, যাদের পায়ে লাল ধুলো উড়ছে, এবং রোজই এই রকম একদল মানুষ ভোরবেলা তিলকার পিছনে পিছনে চলে। তারা যে শুধুই মজা দেখার জন্যে ছোটে, তা নয়, অনেকে এটাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। এরা অধিকাংশই মাধবগড়ের বাসিন্দা নয়, বাইরের লোক, যারা মাধবগড়ে তীর্থ করতে এসেছে। শ্রীমাধব জাগ্রত, সুতরাং রোজই বহুলোক আসে, পুজো দেয়, ধর্মশালায় থাকে। শুধু যে ধর্মশালাতেই থাকে, তা নয়, পূজারী-পাণ্ডাদের বাড়িতেও অনেকে থাকে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে পাণ্ডাদের বাস, ওটাকে পাণ্ডাপাড়া বলে।

শ্রীমাধবের জয়ধ্বনি উঠতে থাকে, সানাই-ঢোলের শব্দ ঢেকে যায়। তিলকা খোলা গেট দিয়ে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢোকে। মন্দিরের নিজস্ব সীমাও অনেকখানি, প্রায় কয়েক বিঘা মাঠ তার চারপাশে আছে, এবং সবটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

মন্দিরের সামনেই নাটমন্দির, আর নাটমন্দিরের বাইরেই তিলকাকে দাঁড়াতে হয়, কারণ আর তার এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সে বসে পড়ে, রামু আবার মইয়ের সিঁড়ি পেতে দেয়, আমি শিলা হাতে নামি। যাত্রী দর্শকদের ভিড় চারিদিকে, নাটমন্দিরের মধ্যে, সেখানে ঘণ্টা ঝোলানো আছে, বাজিয়ে যাতে শ্রীমাধবকে জানানো যায়। কেন এ রকম নিয়ম জানি না, যে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবতাকে ডাকতে হবে, যেন তিনি ঘুমোন বা ঝিমোন, ভক্তদের কথা তাঁর মনে থাকে না। কিংবা ঘণ্টা হয়তো আর কিছু, তবে খৃষ্টানদের ঘণ্টার সঙ্গে, আমাদের ঘণ্টার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তফাত আছে।

ভক্ত যাত্রী এবং পাণ্ডাদের চীৎকার কমে না। আমি তিলকার পিঠ থেকে নেমে, নাটমন্দিরের সামনে যে সিঁড়ি শ্রীমাধবের মন্দিরে উঠেছে, সেদিকে যাই। তার মধ্যেই, নাটমন্দিরের দেওয়ালে যে সব বিষ্ণুলীলার ছবি আঁকা আছে, সেগুলো চোখে পড়ে, এবং সেই সঙ্গে অনেক মানুষ, যারা এই মুহূর্তে অনেকেই দেবতার কথা ভুলে গিয়েছে, শ্রীমাধবের কথা মনে নেই, আমাকে দেখছে, আর তিলকাকে দেখছে। বাতাস বইছে, আমার রেশমী উত্তরীয় উড়ছে। জানি না, এ বাতাস বাংলার দক্ষিণা বাতাস কিনা, তবে এখন বসন্তকাল, এবং আমার ধারণা বসন্তকালে দক্ষিণের বাতাসই আসে। পুবের বাতাস হওয়াটাও বিচিত্র নয়, উত্তর পশ্চিমের নয়, তাতে সন্দেহ নেই।

জয়মন ভিন্ন পথে আমার আগেই এসেছে, মঠের যে পূজারী সেও এসে পড়েছে, যদিচ, অধ্যক্ষ হিসাবে আমার পুজো আমি আগেই শেষ করব। পূজারী, তারপরে পাণ্ডারা তাদের যজমান যাত্রীদের নিয়ে মন্দিরে ঢুকতে পারবে। এখন পাণ্ডাদের এবং যাত্রীদের চীৎকারই বেশি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আমার কানে এখনো সানাইয়ের শব্দ আসছে। যাত্রীরা নিশ্চয়ই ঠেলাঠেলি করছে, মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে চাইছে, আর পাণ্ডারা তাদের নিজ নিজ যাত্রীদের বকে ধমকে আটকে রাখার চেষ্টা করছে, এবং ফাঁকেই পুজোর দক্ষিণা বিষয়ে কথাবার্তা শেষ করে নিচ্ছে, দর-কষাকষি চলছে যদিচ, এখন রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে, পুজোর রেট, ভোগের রেট, সবখানেই রেট, হলই বা ধর্ম এবং প্রাচীন দেশ ভারতবর্ষ, তবু তাকে বেঁধে দেওয়া দরেই পুণ্য আর আশীর্বাদ কিনতে হয়, কোন দেশেই বা হয় না। সবখানেই রেট আর কিউ, সেটাও আমি শুনতে পাচ্ছি, পাণ্ডারা চীৎকার করছে, যাত্রীদের লাইন দেবার জন্যে, এবং সেজন্যও পাণ্ডাদের নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছে, কার যাত্রী যজমানের আগে আর পরে, আর এই

মুহূর্তেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা একটি উপন্যাসের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, একটা ছবি, পূর্ব ইয়োরোপের এক গ্রামে এক কুঁড়েঘরের দরজায় বিজয়ী নাজী সৈন্যরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, অন্তত তিরিশ জন, ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে, তবু তারা নিয়ম তো ভঙ্গ করেনি, তারা ধাক্কাধাক্কি করলেও একজনের পর একজন বেরিয়ে আসছিল, এবং শেষের ক-জনকে আর ভিতরে ঢুকতে হয়নি, কারণ তারা দেখেছিল একটা রক্তাক্ত মেয়ের মূর্তি প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়েই পড়ে আছে, যে কারণে বাকীরা হতাশায় শুধু তাদের রিভলবার থেকে একটি করে গুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল—(কিন্তু আঃ ছি, আমি মন্দিরের মধ্যে, শ্রীমাধবের ধাতুময় মূর্তি আমার সামনে।···) এবং সবখানেই রেট-এর থেকে 'আদায়' বেশি, যার হিসাবে ট্রাস্টিবোর্ডের কাগজ-কলমে আসে না।

কিন্তু না, আমি এখন মন্দিরের মধ্যে, আমি একটু একাগ্র হই, যদিচ প্রতিটি পদক্ষেপে ও কাজে আমার কোন ত্রুটি নেই, সবকিছুই অনেকটা যন্ত্রের মত করে যাই, যে কারণে এই অন্যমনস্কতার মধ্যেও, আমি যেন পরমানন্দের গলার স্বর পাই, এবং নিজেও বলতে থাকি, হে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর—প্রণাম। হে চিৎ, আপনি জীবাত্মা, ভোক্তা, নিত্য-চেতন-স্বরূপ। হে অচিৎ, আপনি জড়, অন্ন জল ভোগ্য, ভোগোপকরণ, শরীরাদি ভোগায়তন। হে ঈশ্বর, আপনি বিশ্বকর্তা, উপাদান, অপরিছিন্ন জ্ঞান-স্বরূপ, চিৎ ও অচিৎ আপনার শরীর-স্বরূপ, আপনি সর্বজীবের নিয়ন্তা। (আমারও নয় কি ? আমার সংকটও কি তাহলে নিয়ন্ত্রিত বিধির মধ্যে দিয়ে চলেছে। আমি তা বুঝতে পারি না, আমি ভয় পাচ্ছি, কারণ আমি ভাবি, মানুষ জেনে বা না-জেনে, নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করছে, যে কারণে মানুষ নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার স্বরূপকে দেখতে চাইছে কিন্তু আমি এখন মন্দিরে, সংসার-বিরক্ত—!) আপনি বিষ্ণু, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরব্রহ্ম। "আমি বহু হই" আপনার এই ইচ্ছা মাত্র আপনি স্থূল রূপে আবির্ভূত। আপনি পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা তদীয় দাস-স্বরূপ। (আমি জানি না, জীবাত্মা কার দাসত্ব করে—না, তা নয়, আমি জানি না জীবাত্মা কোন পরমাত্মার দাসত্ব করে, আমার যা ভাবা উচিত নয়, তাই ভাবি, জীবাত্মা কেবলমাত্র ভয়ের দাসত্বে মরে, পরাধীনতার দাসত্বে মরে, নিজেকে না খোঁজার মিথ্যার দাসত্বে মরে। জীবাত্মাকে আমি মানুষের অস্তিত্ব মনে করি, এবং আত্মার সংকট মানেই বিপন্ন অস্তিত্ব, আর এর থেকে মুক্তির জন্যে মানুষ নিজের সঙ্গে নিজেই লড়ে, শক্তি-পরীক্ষা নিজের সঙ্গেই, যে কথা আগেই ভাবছিলাম, মানুষ একবার জানতে পারে সে কী, তখন তার দায়িত্ব বেড়ে যায়। এবং এসব ভাবি বলেই, ভারতীয় মুনি-ঋষিদের কথা আমার সব থেকে আগে মনে পড়ে, আমার যেন মনে হয়, তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব সচেতন ব্যক্তি, যিনি খুঁজতে খুঁজতে, খুঁজতে খুঁজতে, এমন এক জায়গায় এসে পড়েছিলেন যেখানে এসে তিনি পরম অসহায় বলে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, এবং যদি তাই, তবে কেননা নিজেকে উৎসর্গ করি, কারণ তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বিষয়ে এক অন্যলোকের কথা ভেবেছেন, সেই অন্যলোকে যিনি আছেন তিনি অশেষ, তিনিই কর্তা, অতএব, আমি যখন জানলাম, যুদ্ধ, জ্ঞাতিবিরোধ, সকলই স্থূল সুখ-দুঃখের কারণ, তাতে রাজা হই, কিংবা গণপ্রধানেরা মিলে শাসন করি শেষ পর্যন্ত, সকলেই এক, এই জন্ম এবং এই অস্তিত্ব নিয়ে এক অসহায়তার আবর্তে এসে পড়তে হচ্ছে, তখন সেই পরম শক্তির কাছে

boiRboi.net

আপনাকে উৎসর্গ করি।···আর আমি, মাধবগড়ের আটাশ বছরের মহারাজ, মোহন্ত, সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী, কী অন্যায়, আঃ এ যুগের এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সেই অশেষ ও পরমশক্তির কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছি না, কারণ আমি দেখেছি, আমার অসহায়তা যেখানে, আমার মুক্তিও সেখানে। যেখানে আমার ভয়, আমার পরাধীনতা, আমার অন্ধকার, আমার লড়াই সেখানেই, লড়াই মানেই মুক্তি, কারণ আমি কী চাই, আমি কী করব, তার সিদ্ধান্ত একমাত্র আমিই নিতে পারি, এবং আমি যেহেতু এই পৃথিবীর মানুষ, অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো কার্য-কারণের সঙ্গে জড়ানো। নিজেকে জানার পরেই একমাত্র উৎসর্গের কথা ভাবা যায়, যে কারণে আমি দুটো পথের কথা ভেবেছিলাম, চেপে যাওয়া, না প্রকাশ করা, এবং প্রকাশ মানেই উৎসর্গ, কিন্তু কোথায় উৎসর্গ, করব? কেন, ঈশ্বরে, ধর্মে, মন্দিরে? না, আমার মনে হচ্ছে, আবার সেই চেপে যাবার দলে চলে যাচ্ছি। যেন পালিয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে। কেন কোটির সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিতে হয়?···আঃ, কী জঘন্য সংকট···) কিন্তু ইতিমধ্যে আমার উপাসনা সাঙ্গ হয়ে যায়!

আমার উপাসনার সময়, মন্দিরের মধ্যে একমাত্র জয়মনই থাকতে পারে, এবং দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্তব মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি শেষ হতেই, সংকীর্তন শুরু হয়। জয়মন দরজা খুলে দেয়। দেবার আগে, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকায়, তার চোখে একটু অবাক হওয়ার ছায়া, আমি টের পাই। আমি জানি না, আমার মুখ তখন কেমন দেখাচ্ছিল, সেখানে কোন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কিনা। তবে আমি নিজেই টের পাচ্ছি, আমার মুখোশ খুলে পড়ছে, কারণ, আমি যে মাধবানন্দ, (দীক্ষা নেবার সময় আমাকে ওই নাম দেওয়া হয়েছে। আমার আসল নাম, অলকেশ ভট্টাচার্য। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ অধ্যক্ষ হতে পারে না, যদিচ দীক্ষা সবাই নিতে পারে, সম্প্রদায়ভুক্ত হতেও কোন অসুবিধা নেই, এবং যখন আমার কথা ভাবি, তখন নামটার কথা মনে পড়ে না, যদি বা পড়ে, তবে অলকেশ বলেই পড়ে, কখনোই মাধবানন্দ মনে হয় না।) আমি যে অলকেশ ভট্টাচার্য নই, এ কথা মনে রাখবার জন্যে, তার চেয়ে বলা ভাল, সবাইকেই মনে রাখবার জন্যে, আপনা থেকেই আমার মুখের ওপরে একটা অন্য ছাপ এসে পড়ে, যেটা আমি যেন আর ধরে রাখতে পারছি না। এতক্ষণ ধরে, কী উপাসনা আমি করেছি, মনে করতে পারি না, তবে আমার জীবনে যে একটা কিছু ঘটতে চলেছে, সেটা যেন আমি এখন পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছি, বা সিদ্ধান্তে নিয়ে ফেলেছি। সম্ভবত, সেই সিদ্ধান্তের ছায়াই জয়মন দেখতে পেয়েছে।

তবু আমি আমার নিয়মিত কাজের কথা ভুলি না। মোটা সলতে দেওয়া রেড়ির তেলের প্রদীপটা নিয়ে আমি বাইরে আসি। অল্প বাতাসে এই প্রদীপ নেভে না। প্রথমেই, মন্দিরের বারান্দার ওপরে যে সব পাণ্ডারা ভিড় করেছিল, তারাই প্রদীপের তাপ হাত বাড়িয়ে নেয়, মুখে মাথায় মাখে।

জয়মন তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে প্রদীপটা হাত বাড়িয়ে চায়, বলে, আমাকে দিন মহারাজজী।

আমি তার হাতে প্রদীপ তুলে দিই, এক মুহূর্তের জন্যে আমি তার চোখে ঈষৎ উদ্বেগ মেশানো হাসি দেখতে পাই, যার মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা এবং সম্ভবত সান্ত্বনাও

boiRboi.net

রয়েছে। আমি জানি, এই গৃহত্যাগী লোকটাই একমাত্র আমাকে একটু বোঝে, একটু ভালবাসে, যদিচ সে যখন আমার পাশে পাশে থাকে, ছুটে ছুটে আসে, ফাইফরমায়েশ খাটে, মহারাজজী বলে ডাকে, তখন যেন, মহারাজজী-র বদলে আমি শুনতে পাই, সে হুজুর বলে ছুটে আসছে। এবং একদিক থেকে বলতে গেলে, সে আমার ভৃত্য, অথচ মঠের সেবক, অধ্যক্ষের পার্শ্বচর। রাজার কি পার্শ্বচর থাকে না? থাকতেই হবে, জয়মন তাই, তবু আমি মনে মনে অনুভব করি, সে আমার বন্ধু, আমার ভাই।

জয়মন প্রদীপ নিয়ে সিঁড়ির ধাপে নেমে যায়, আর যাত্রীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রদীপের তাপ নেবার জন্যে। সবাই তাপ নিয়ে মুখে-মাথায় মাখে, কোলের শিশুকে মাখিয়ে দেয়। আমার চোখ পড়ে, একটি যুবতী বউয়ের দিকে, যে তার রুগ্ন স্বামীকে শিশুর মত বুকে ধরে রেখেছে। আর পাগলের মত হাত বাড়াচ্ছে প্রদীপের দিকে, যে কারণে তার বসনে বৈরাগ্য। যেন, কী ছার আমার এই পুষ্ট বুক দেখিস। কিংবা আমার এই ডাগর চোখের মিঠে মুখ, বা উদাস কাপড়ে খোলা নিচের শরীর। এ তুই নিতে পারিস, দিতে কিছুই পারিস না। পাব বলে যার মুখ চেয়ে আছি, সে আমার বুকে, তাকে জন্ম দেব আবার, তারপর পাওয়ানা নেব। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, এখন এই সিদ্ধান্তে সে অটল, তাই লজ্জার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, আর আশ্চর্য, আমার চোখ যেন ভিজে উঠতে চাইছে, এবং আমার ভিতর থেকে যেন শুনতে পাই, দুঃখই শক্তি দেয়, দুঃখই নিয়ে যায় সমুদ্র পার করে, সুখের এক ফোঁটা তটে।

আমি দেখছি, জয়মন বউটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত, তারপরে নাটমন্দিরের অন্য দিকে যায়, কিন্তু যেন দেখতে পাই, তার চোখে সেই যুবতী বউ ও স্বামী ভেসে রয়েছে। সে হাসছে একটু একটু, যাত্রীদের কিছু বলছে। আমি এত দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি না, কী বলছে, তা জানি। সে বলছে,—বেশি নিও না, উনি তা হলে পুড়িয়ে দেবেন। উনি আগুন কিনা।

তার ছোট কথাটির মধ্যে একটা ছোট খোঁচা আছে, তবু এ কাজটি করতে তার খুব উৎসাহ, তা আমি জানি। সকলের সামনে ঘুরে ঘুরে সে তাপ দিয়ে আসে, এবং তার কথা শুনে, অনেকে বলে ওঠে, 'অগ্নিও দেবতা'!

জয়মন বলে, 'ভাত ফোটায় যে। তবে বড্ড জ্বালানে, অতটা হাত বাড়িও না।' তাছাড়াও সে সকলের সঙ্গেই কিছু না কিছু কথা বলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তার জবাব দেয়, আর মাঝে মাঝে 'জয় মন' 'জয় মন' বলে হাঁক দেয়। আমি দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু শত শত হাতের স্পর্শ তখন আমার পায়ে। যেমন করে সবাই হাত বাড়িয়ে প্রদীপের তাপ নিচ্ছে, তেমনি করেই মহারাজের পায়ের ধুলো নিচ্ছে সবাই। বুকে-মাথায় মাখাচ্ছে। অনেকটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতেই আমাকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এবং অনেকটা যন্ত্রের মত, আমি কারুর দিকেই ফিরে তাকিয়ে দেখি না, যেন আমিও একটা পাথরের বিগ্রহ, কিন্তু আমার ভিতরটা যেন ক্রমেই গুটিয়ে যেতে থাকে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, দাঁতে দাঁত টিপে থাকি, এবং নিজেরই কাতর স্বর শুনতে পাই, —অসহ্য, আর পারি না, আর পারি না।

অথচ আমি অনড়, নিশ্চল, এবং তিলকার দিকেই তাকাই। সে যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, বুঝতে পারি। আগে আগে বুঝতে পারতাম না, যে কারণে লোকে

boiRboi.net

লোককে বলে, 'গজচোখো' হাতির দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল বোঝা যায় না। অলকা-তিলকার চাউনি এখন আমি বুঝতে পারি, এবং তিলকা যে শুঁড় দোলাচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে তার গলায় বাঁধা ঘণ্টায় ঘা মারছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, সে আমার গায়ের গন্ধ নিচ্ছে, এবং জিজ্ঞেস করছে, 'কখন যাবে?' ইতিমধ্যেই সে হয়ত একটি কলাগাছ এখানে এসে খেয়েছে। আমাকে নামিয়ে দেবার পর সেটা তার প্রাপ্য।

ইতিমধ্যে পূজারীর পূজা শুরু হয়েছে, পাণ্ডারা মন্দিরের বারান্দার ওপরে ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। জয়মন প্রদীপ নিয়ে, নাট-মন্দির থেকে ফিরে আসে, আমি নেমে যাই যদিচ, সহজভাবেই নেমে যেতে পারি না, কেন না তখনো আমার পায়ের ওপরে এসে লোক পড়েছে। কিন্তু আমার দাঁড়ালে চলে না, তা হলে সারাদিনই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমি নেমে এগিয়ে যেতে থাকি।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নামার পরেই, যুবতী বউটি তার রুগ্ন স্বামীসহ আমার পায়ের কাছে নত হয়ে এল, এবং আমি যেন সেই মুহূর্তে আর পাথর থাকতে পারলাম না, চমকে উঠলাম, আর একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে, আমি তার স্বামীকে স্পর্শ করে বললাম, 'থাক, থাক।'

লোকটি তার রুগ্ন চোখে, বিগ্রহ দর্শনের মত আমার দিকে তাকালো, তার স্ত্রীও একই ভাবে তাকালো, আর তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, কিসে আমি মহৎ? বাঁচবার জন্যে, বাঁচাবার জন্যে, এদের থেকে কানাকড়ি শক্তিও কি আমার আছে? আমি স্বামীর মাথায় হাত দিলাম, তেল চিটচিটে, ছোট ছোট চুল, রুগ্ন গন্ধ তাতে। জানি, এই মাথায় হাত দেওয়া আমার কোন দয়া নয়, যদিচ, এই মুহূর্তে যারা এ দৃশ্য দেখছে, তারা সকলে তাই ভাবছে,—'আহা, মহারাজের কি দয়া'—যে কারণে দেখছি, বউটির চোখ দুটিও জলে ভরে উঠছে, কিন্তু আমি জানি, এ নিতান্ত আমার ব্যাপার, আমার ভিতরের নির্দেশ, মাথায় হাত না রেখে আমার উপায় নেই। আমি বউটির জলে-ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ডাক্তার দেখাচ্ছ?'

বউটি আশা করেনি, আমি ডাক্তারের কথা বলব, এমন কি, আমার পাশে দাঁড়ানো জয়মনও তা ভাবতে পারেনি, কারণ আমার বলা উচিত ছিলো, 'শ্রীমাধবের ওপর ভরসা রাখো মা, তাঁকে ডাকো, তিনিই ভালো করে দেবেন।' কিন্তু আমি তা বললাম না। বউটির চোখেও যেন আমি একটু বিস্ময় দেখলাম, যদিচ তার গলার স্বর আরো ভেঙে এল। সে বলল, 'আই দেওতা হামনিকে পৈসা কহা, গাঁও মে ডগদর কহা, তুঁসিয়া মেরী কোই না ছে, শ্রীমাধো সিয়া মেরী কোই না ছে।'

ওর পয়সা নেই, গাঁয়ে ডাক্তার নেই, আমি ছাড়া ওর কেউ নেই, শ্রীমাধব ছাড়া ওর কেউ নেই। ভারতবর্ষের এই শ্রীমাধবের কাছে সব ভরসা, ধর্ম তাকে এই শিখিয়েছে, আর আমি তারই সেবক, আমি মহারাজ, রাজা। দেখলাম, মেয়েটি আঁচল খুলছে, সেখানে গরীব বউটির কিছু পয়সা বাঁধা আছে, যা দিয়ে সে স্বামীর কল্যাণে পূজা দিতে এসেছে জাগ্রত মাধবের কাছে, এবং স্বয়ং মোহন্ত তাকে কৃপা দেখিয়েছে, এই সুযোগ সে ছাড়তে চায় না, পূজার পয়সা সে আমার হাতেই তুলে দিতে চায়। কে যে ওর পাণ্ডা, বেচারী ভিড়ের মধ্যে থেকে দেখছে, ভাবছে পয়সাটি তার মার গেল। আমি জয়মনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'ওর পুরোহিতকে ডেকে দাও, আর পূজা হয়ে

boiRboi.net

গেলে, একে আমাদের ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাও। আমার কথা বলবে, যেন তিনি ভাল করে দেখেন, দরকার হলে, রক্ত থেকে যা কিছু প্রয়োজন, সব পরীক্ষা করেন, আর সেই মতই চিকিৎসা করেন। এ ছাড়া, একে আমার আর কিছু বলবার নেই।' আমি জানি, জয়মনের প্রতিটি মুহূর্তই অবাক হবার, এবং 'আজ্ঞে আচ্ছা মহারাজ' এই কথার মধ্যেও আমি তার অবাক হওয়া স্বর শুনতে পাই। শুধু সে নয়, যে সব পাণ্ডা-পুরোহিতরা আমার কাছাকাছি ছিল, তারাও অবাক হয়েছিল, যদিচ, সত্যি বলতে কি, মাধবগড়ে যুবতী স্ত্রীলোককে মহারাজের হঠাৎ কৃপা দেখানোটা ট্র্যাডিশনের বাইরে নয়, (অলকেশ, চুপ!) তথাপি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়াটা শুধু অবাক হবার নয়, যে কারণে একটা ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা তাদের চোখে ফুটে রইল, কারণ লোকে তো জানে, দুরারোগ্য ব্যাধি যত, সবই শ্রীমাধবের চরণামৃত ও প্রসাদেই আরোগ্য হয়। শ্রীমাধবের যত অলৌকিক গুণ, দেশজোড়া যার নাম, তার সেবক হয়ে, আমি কেমন করে ডাক্তারের চিকিৎসার নির্দেশ দিই। আমি জানি, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, স্বয়ং শ্রীমৎ পরমানন্দর কানে সংবাদ যাবে। আমাদের যিনি ডাক্তার, তিনিও একজন সেবক, যদিচ এম. বি. ডি. টি. এম। তিনি একজন গৃহী ভক্ত, কিন্তু ডাক্তার হিসাবে চাকরি করেন, মাধবগড় এস্টেটের তিনি বেতনভোগী ডাক্তার, আসলে মঠের সকলের চিকিৎসা করেন, যারা শুধুমাত্র শ্রীমাধবের চরণামৃত খেয়েই ভাল থাকেন না, ওষুধও খান, এবং বাইরেও চিকিৎসা করবার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। জানি, তিনি আমার ওপর রুষ্ট হবেন, তবু এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না।

মেয়েটি পয়সা খোলবার আগেই, জয়মনকে নির্দেশ দিয়ে আমি এগিয়ে যাই। তিলকা চকিতে, তার শুঁড় তুলে, আলগোছে একবার আমার হাঁটুর কাছে স্পর্শ করে, তার-পরেই হাঁটু মুড়ে বসে। রামু তেমনি মই দেয়, আমি হাওদায় উঠে যাই, তিলকা চলতে আরম্ভ করে। হৃদয়ের সানাই তখনো বাজছে। আমার যেন মনে হয়, অতুলপ্রসাদের সেই গানটা সে বাজাচ্ছে···'কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা···এবার একলা ঘরে, পরান ভরে, কাঁদ।' যদিচ, সুরটা সে দ্রুতই বাজাচ্ছে, এবং কর্মাঢুলী বেশ মনের মত করেই তাল দিচ্ছে, কেননা, তার হাতটিও মিষ্টি, যে কারণে তাদের দুজনেরই ভাল জমে, তবু আমার মনে হয়, দ্রুত বাজছে বলেই যেন, গুমরে কাঁদবার থেকে, হঠাৎ হাহাকার করে ওঠার মত শোনাচ্ছে। এই জীবনকেই আমার স্বাভাবিক, নর্ম্যাল বলে মনে হয়, যেখান থেকে আমি চলে এসেছি, যেখানে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে খোঁজা যায়। দুঃখের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে সহজ, সে-ই কি সাহসী নয়? সে-ই তো খুঁজতে পারে। কিন্তু আমি দেখছি, আমার চারপাশে আমি পরাধীনতার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছি, অনেক ভয়ের বেড়া আমাকে বেঁধে ফেলেছে, যা প্রতি মুহূর্তেই আমাকে শাসাচ্ছে। দু-বছর ধরে এই বেড়া অনেক শক্ত হয়েছে, অনেক উঁচু হয়েছে, যখন থেকে আমি মহারাজ হয়েছি, কিন্তু এই দুবছর ধরেই আমার মনে হয়েছে, মুক্তির দরকার।

না, দু-বছর কেন, তারো আগে, অনেক আগে, সেই ছেলেবেলায়, মঠের এলাকার মধ্যে, যখন আমি প্রথম পরমানন্দকে হাতির পিঠে উঠতে দেখেছিলাম, সেইদিন থেকেই বেড়া আমাকে ঘিরতে আরম্ভ করেছিল। তখন আমার বারো বছর বয়স হতে পারে,

boiRboi.net

কিংবা দশ, সঠিক মনে করতে পারি না। মনে আছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম। আমাকে নিয়ে বাবা-মা পরমানন্দর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, আমাকেও প্রণাম করতে বলেছিলেন। আমি প্রণাম করেছিলাম। পরমানন্দ তখন যুবক, যদিচ, তাঁকে আমার মনে হয়েছিল যেন, একজন গম্ভীর রাগী যোদ্ধার মত।

তিনি বাবা-মায়ের কুশল জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঘর-গৃহস্থ আয়-ব্যয়, অসুখ-বিসুখ, আমার ঠাকুরমা-ঠাকুরদার কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন, যাতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, পরমানন্দর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় খুবই নিবিড়। আমরাও, ছেলেবেলায় শুনেছি, বংশানুক্রমিক এই মাধবগড়ের শিষ্য। জন্মের পর থেকেই আমাদের বাড়িতে আমি শ্রীমাধবের পট এবং মূর্তির পূজা হতে দেখেছি। আমাদের পরিবারের কোন ছুটি বা অবকাশে দূর দেশ ভ্রমণে যাবার তেমন যোগ্যতা ছিল না, কিন্তু বছরে অন্তত দুর তিনবার মাধবগড়ে আসবার নিয়ম ছিল। নিয়ম না বলে, বলা উচিত, আসতেই হত, নইলে ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা বাবা-মা কেউ শান্তি পেতেন না।

সেই প্রথম বারেই, পরমানন্দ বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারে বারে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। আমার একটু ভয় ভয় করছিল, কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম, তাঁর চোখে রাগ বা ভ্রূকুটি নেই, বরং একটা স্নেহের আভাস ফুটে উঠছিল। মনে আছে, এক সময়ে তিনি হঠাৎ আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'আমার কাছে এস তো।'

আমি কাছে যাব কিনা, ভাববার আগেই, বাবা-মা যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে আমাকে তাঁর কাছে ঠেলে দিয়েছিলেন। যে ঘরে আজ আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিলকসাধন করছিলাম, সেই ঘরেরই দরজার কাছে, শ্বেতপাথরের মেঝেয় আমরা বসেছিলাম। তিনি পশমের আসনে বসেছিলেন। আমার ভাল লেগেছিল সেই ঘর, তার গন্ধ, তার রূপ, তার সব কিছুর মহার্ঘতা, যেন রাজপুরী এবং ছেলেমানুষ হলেও, বাবা-মায়ের ব্যবহারে বুঝতে পেরেছিলাম, এক পরম সৌভাগ্যের আমি অধিকারী হয়েছি, মহারাজ পরমানন্দ আমাকে কাছে যেতে গায়ে হাত দিয়েছিলেন, মাথায় হাত রেখে, চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলেছিলেন, 'মঠে এসে থাকবে?'

কী জবাব দিতে হবে, জানতাম না, তাই ছেলেমানুষি লজ্জাতে মাথা নিচু করেছিলাম। তিনি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'এটি তোমার কোন্ সন্তান?'

'আজ্ঞে ও ই এখন সকলের ছোট।'

'তাহলে, তোমার আর এক ছেলে, এক মেয়ে এর থেকে বড়?'

'হ্যাঁ।'

'ও এখন কোন ক্লাসে পড়ে?'

'ফাইভ-এ।'

পরমানন্দ চুপ করে অনেকক্ষণ যেন কী ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর হাত ছিল আমার কাঁধের ওপরে। বাবা-মা তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, তাঁদের চোখে একটা ভয় ভয় সংশয়ের ছায়া পড়েছিল, এবং দুজনেই দুজনের দিকে দু-একবার তাকাচ্ছিলেন। আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম, কেন তিনি ওকথা জিজ্ঞেস করছেন। অবিশ্যি, পরে আমি বাবা-মায়ের কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, হয়ত

boiRboi.net

সর্বজ্ঞ মহারাজ আমার ভবিষ্যতের কিছু মন্দ দেখতে পেয়েছিলেন, কোন দৈব দুর্ঘটনা, কিংবা অকালমৃত্যু যোগ। কিন্তু তিনি সে-কথা ভাবেননি, তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন না, যদিচ, পরমানন্দকে আমি, যাকে বলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাই ভাবি।

তিনি হঠাৎ অত্যন্ত উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন, উদাস গলায় বলেছিলেন, 'এই মঠ নিয়ে আমার শান্তি নেই বুঝলে? গুরুদেব যখন আমাকে সব দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, তখন আমাকে তা পালন করতেই হবে। কিন্তু আমার দিন একদিন শেষ হবে, তখন কে আমার জায়গায় আসবে, বুঝতে পারি না।'

বাবা-মা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন পরমানন্দর দিকে, কারণ তাঁরা ভাবতেই পারেননি, মঠের এমন একটা গুরুতর বিষয় তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বাবা-মা কোন কথাই বলেননি, কেবল উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

পরমানন্দ আবার বলেছিলেন, 'যা দেখছি, সব অকর্মণ্য। মঠের এই সব লোক দিয়ে ঝুলি কাঁধে ভিক্ষে করানো যায়, আর কিছু না। তোতাপাখির মত কিছু শেখানো বুলি আওড়ায়, হয়ত তার মানেও জানে না। লক্ষ্য একমাত্র স্বার্থ, এদের আমি সন্ন্যাসী বলতে চাই না। কিন্তু উপায় নেই এদের ছাড়া, একটা গোলমাল তো করা যায় না। যে কজন আছেন বয়স্ক, আর সত্যি সত্যি জ্ঞানী, তাঁরা মঠের দায়িত্ব নিতে চান না, লোকজন পছন্দ করেন না, তাঁদের চরিত্রই আলাদা। অথচ, তোমরা মাধবগড়ের বংশানুক্রমিক সেবক-শিষ্য, তোমাদের বলতে তো বাধা নেই, শ্রীমাধবের যা গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি আমার জিম্মায় আছে, আমি সোনা-জহরত ইত্যাদির কথাই বলছি, তার পরিমাণই কম করে বিশ লক্ষ টাকার মত হবে। এ সব খবর একমাত্র মোহন্তরাই জানেন, তাঁরাই অন্য মোহন্তকে সে সব জানিয়ে যান কী কোথায় আছে। আমার গুরু-দেব আমাকে দিয়ে গেছেন, তাঁর গুরুদেব তাঁকে, এইভাবেই চলে আসছে। তা ছাড়া, মাধবগড়ের এই এস্টেট, বাইরের গদী—সব মিলিয়ে বছরে প্রায় পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা আয়। (পরমানন্দ তখনো জানতেন না, ভারতবর্ষে দু-এক বছরের মধ্যেই সরকার পরিবর্তন হতে চলেছে, এবং সেই সরকার মাধবগড়ের ওপর খবরদারি করতে আসবে।) মঠে এমন একজন কাউকে দেখি না, যে এ সব নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে পারবে। অনেকের পক্ষেই মাথা ঠিক রাখা সম্ভব নয়। মানুষের লোভের কথা কিছু বলা যায় না। তারপর দেখ, এমন দিনকাল আসছে, খালি ছাপ তিলক এঁকে মোহন্তগিরি করলেই হবে না, একটু শিক্ষা-দীক্ষার দরকার, সব রকম লোকের সঙ্গে যাতে কথাবার্তা চালাতে পারে। এ সবই আমার এখন দুশ্চিন্তা।

পরমানন্দ চুপ করেছিলেন, আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। আর তাঁর কথা-গুলো শুনে তাঁর প্রতি যে একটা দূরত্ব বোধ করেছিলাম, সেটা অনেকখানি কমে গিয়েছিল, কেন না আমার একবারও তখন মনে হয়নি, আমি কোন সন্ন্যাসীর কথা শুনছি, যেন নিতান্তই একজন সম্পন্ন ধনী অসুখী গৃহস্থের কথা শুনছিলাম, যিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে চিন্তিত।

তিনি আমাকে আরো কাছে টেনে বাবা-মায়ের দিকে ফিরে বলেছিলেন—'আমি এই রকম একটি ছেলে চাই, এই ছেলেটিকেই বা নয় কেন? তোমরা দেবে ওকে?'

বাবা-মা হঠাৎ কোন কথা বলতে পারেননি, দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়েছিলেন,

যেন পরমানন্দর কথা ঠিক তাঁরা বুঝতে পারেননি, যদিচ, মায়ের চোখে আমি একটি ভয় ও দ্বিধার ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম, আর বাবার চোখে বিস্ময় ও অস্বস্তি।

পরমানন্দ আবার বলেছিলেন, 'আমি এখনই চাইছি না। এখন ও ছেলেমানুষ, তোমাদের কাছেই থাকুক। আমি চাই, ও খুব ভাল করে লেখাপড়া করুক, খুব ভাল করে। বরং লেখাপড়ায় যাতে কোন বাধা না পড়ে, কোন অসুবিধা না হয়, আমি সেটাকে দেখতে চাই। দরকার হলে, ওর লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ এখন থেকে আমরাই বহন করব।'

বাবা-মায়ের মুখের ভাব একটু বদলেছিল, একটু যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন, বোধ হয় তখনই আমাকে নিয়ে নেবেন না, এটা ভেবেই। তবে তাঁরা আরো কিছু শুনতে চাইছিলেন বলে আমার মনে হয়। আর আমি যেন ব্যাপারটা কিছু সঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তবে আমার মনেও একটা ভয় ঘিরে আসছিল, অথচ একটা কৌতূহল, এবং নিজের অদ্ভুত এলোমেলো সব চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছিল।

পরমানন্দ বলেছিলেন—তোমাদের আজই কিছু বলতে হবে না। তোমরা দেশে ফিরে যাও, নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর, তারপরে স্থির করে আমাকে জানিও। তবে তোমরা যদি ওকে আমাকে দাও, আমি সুখী হব। কিন্তু তার জন্যে শুধু লেখাপড়া নয়, এখন থেকেই ওকে আমি কিছু বলব। প্রধানত ব্রহ্মচর্য বিষয়েই ওকে বলব, তোমাদেরও সে-কথা মনে রাখতে হবে। এমনভাবে ওকে আর দেখা চলবে না, বা ওর সঙ্গে ব্যবহার করা চলবে না, যাতে ও আর দশটা সাধারণ ছেলের মত, সংসার বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে। তোমাদেরও সেটা ভাবতে হবে, এ ছেলেকে দিয়ে তোমরা বংশরক্ষার কথা চিন্তা করবে না। সে জন্যে ওকে ছুটিতে আমার এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে, ওকে যা বলবার তখন আমি সব বলব।

এই পর্যন্ত বলার পর, বাবা বলেছিলেন—'আমি তো এর মধ্যে আপত্তির কিছু দেখতে পাই না, বরং আমার তো মনে হয়, এটা ছোটনের (আমার ডাকনাম।) সৌভাগ্য, আমাদের সকলেরই সৌভাগ্য।'

আমি চোখ তুলতে দেখেছিলাম, মা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তাঁর চোখে আমি সেই মুহূর্তেই এমন একটি আলো দেখতে পাচ্ছিলাম, যা হয়ত স্নেহের, কারণ আমার মনে হচ্ছিল, ওখানে তখন কেউ না থাকলে, মা আমাকে বুকের কাছে নিয়ে আদর করতেন। সেই সময়েই মায়ের চোখ পড়েছিল পরমানন্দর ওপর, মা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আপনার আদেশ হলে'—

পরমানন্দ বলেছিলেন, 'না না, আদেশ বলো না। ওকে দেখে আমার কথাটা মনে হল, ওর মধ্যে আমি কতকগুলো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, তা হল, সত্যবাদিতা, তেজ এবং কী বলব, বড় মিষ্টি, যাকে আমার প্রেমের লক্ষণ বলে মনে হয়। সেই জন্যই, শ্রী-মাধবের সেবক হিসাবে তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি। আমার মনে হয়, ও পারবে।'

বাবা বলেছিলেন, 'ওর কর্মে যদি থাকে মহারাজ, ওকে নিশ্চয়ই তা মানতে হবে। সেটা তো খণ্ডানো যাবে না।'

মা বলেছিলেন, 'ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন, ও যেন উপযুক্তভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারে।'

boiRboi.net

'পারবে।' পরমানন্দ বলেছিলেন, 'ও সব পারবে। দেখ, আমি কররেখা জানি না, কোষ্ঠীও জানি না, কিন্তু অসম্ভব ওর ন্যায়বোধ, এই তোমাদের বলে রাখলাম, ও সর্বত্যাগী।'

তারপরে আমাকে আদর করে বলেছিলেন, 'কি রে, পারবি না ?'

আমি নিজের সম্পর্কে তখন অদ্ভুত চিন্তা করছিলাম, যেন অনেকটা কী বলব, প্রায় ঐশ্বরিক কিছু, এবং আমার মধ্যে যেন একজন মহামানবকে (না-হেসে পারি না এখন, কারণ মহামানব বলতে কী বোঝায়, তা তখন জানতাম না, শুধু ছবিতে দেখা বা কানে শোনা কিছু, সাধকপুরুষ বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁদের কথা মনে হয়েছিল।) দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং আমি যেন একজন ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তির মত নিজেকে মনে করেছিলাম যিনি গল্পে কবিতায় পড়ার মধ্য দিয়ে আমার মনে দাগ কেটেছিলেন। পরমানন্দর কথায় আমি অনেকটা সম্মোহিতের মত ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, 'পারব'।

তিনি বলেছিলেন, 'খুব ভাল করে পড়াশুনো করবি, খুব ভাল করে প্রত্যেক বছর পাস করা চাই, আর ছুটি হলেই আমার কাছে চলে আসবি।'

বাবা-মা সেই সময়, তখনই সিদ্ধান্ত না নিতে পারলেও সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। দেশে ফিরে গিয়ে বাবা মা ঠাকুরমা, এবং আরো কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের শুভার্থী প্রতিবেশী, সকলে মিলে মোটামুটি স্থির করে ফেলেছিলেন, আমাকে তাঁরা দান করবেন। তখন থেকেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, বাড়ির সকলেই আমার দিকে অন্য রকম চোখে দেখছে, এবং ঠাকুরমা ও আরো কেউ কেউ আমাকে বলতেন, 'তুই হলি রাজা। মহারাজ।'

কোনসময়ে আমি কিছু খাবার বা কেনবার জন্যে পয়সা চাইলে আমি শুনতাম, 'পয়সা দিয়ে তুই কি করবি, মোহরের ঘড়া তোর জন্যে রয়েছে।'

এই সমস্ত কথারই প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল আমার মধ্যে, এবং সেই প্রতিক্রিয়ার জোরটা কলেজে ঢোকা পর্যন্তই সব থেকে বেশী ছিল। আমি জানতাম, আমার যাবতীয় খরচই মাধবগড়ের মঠ থেকে আসত। আমি—গ্রীষ্মের, 'পুজোর', বড়দিনের—সব ছুটিতেই মাধবগড়ে যেতাম, মঠে থাকতাম, পরমানন্দ আমাকে নানান উপদেশ দিতেন। আমি সে সব মেনে চলতাম। তিনি আমাকে কতকগুলো স্তোত্র শিখিয়েছিলেন, প্রতিদিন উপাসনার জন্যে, আমি তাই উচ্চারণ করতাম।

এ সবের থেকেও বড় কথা মাধবগড়ের মহারাজার রাজকীয় জীবনযাত্রা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমি শুধু নিজেকে মহারাজ ভাবতে শিখিনি, আমি যেন, তার মধ্যে একটি সুখের সন্ধান পেয়েছিলাম, বিত্তে বৈভবে ক্ষমতায়, আমি যেন এক মহা-পরাক্রমশালী ব্যক্তি হতে যাচ্ছি, একটা অনুভব করতাম, এবং আজ আমি তাই হয়েছি। মুঠো মুঠো সোনা-রুপো-টাকা, কী নেই আমার হাতে।

না, ভুল ভাবছি, তারা আমার হাতে নয়, তারাই আমাকে চারদিকে বেড়া দিয়ে বেঁধেছে, আমি সেই প্রথম দিন থেকে, পরমানন্দ যে সময়ে প্রস্তাব করেছিলেন, সেইদিন থেকেই, একটু একটু করে, আমার স্বাধীনতা বিক্রি করতে আরম্ভ করেছিলাম, আমার পরাধীনতা আমাকে গ্রাস করেছিল। আর পরাধীনতাই ভয় তৈরি করে, নিজেকে সে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যায়। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ তখন আমার

boiRboi.net

ছেলেবেলা থেকে অপেক্ষা করা একটা জায়গাতেই যাবার জন্যে মন ব্যগ্র হয়েছিল। তবু কি একবারও মন অন্যদিকে যায়নি, বিদ্রোহ দেখা দেয়নি? দিয়েছিল, কিন্তু সচেতন-ভাবে নয়, অচেতন রূপে, সম্ভবত ধর্মের ভাষায়, সেই আমার তামসিকতা।

তখন কলেজের শেষ বছর, এখন থেকে আট বছর আগের কথা, দর্শনে অনার্স নিয়ে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বিদ্রোহের লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছিল তার আগেই। কলকাতা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। দাদা কোন রকমে দু-বছর পড়েছিল আমাদের মফস্বল শহরেরই কলেজে। আমি পড়েছি কলকাতায়, হস্টেলে থেকে, কারণ আমাদের আর্থিক অবস্থার জন্যে কখনো আমাকে কোন বিষয়ে অভাব বোধ করতে হয়নি, আমার জন্যে মাধবগড়ের সম্পত্তি ছিল, যদিচ, সে-কথা বাইরের লোকেরা বা কলেজের কেউ জানতো না, পরমানন্দর সেই রকম নির্দেশ ছিল। তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, আমার দাদা একটু বেশি সংসারী মনোভাবের মানুষ ছিল, এমন কি ধর্মে মতিগতি আমার থেকে অনেক বেশি, যে কারণে আমার প্রায়ই মনে হয়, পরমানন্দ ঠিক লোককে বেছে নিতে পারেননি। লেখাপড়ার দিকটা দাদা খুব একটা আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছিল, তা আমার মনে হয় না। ওকে যখন কলেজ ছাড়তে হয়েছিল, তখন ওর মনে আমি কোন ক্ষোভ বা হতাশা দেখতে পাইনি। কলেজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি, কয়েক বছর পরেই বিয়ে, এবং এখন দুটি সন্তানের বাবা। আমার থেকে মাত্র ছ বছরের বড় হলেও, ও এখন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক শান্ত নিরীহ ধার্মিক। বিয়ের আগে পরে, খুব বিশেষ তফাত কিছু দেখতে পাইনি, যাকে বলে যৌবনের আবেগ বা চঞ্চলতা বা একটু বেশি হাসি-খুশি, স্ত্রীকে নিয়ে কখনো একটু এদিকে ওদিকে যাওয়া যা ওর বন্ধুরাও করে থাকে, সে সব কিছুই না, যে কারণে, আমি অবাক হয়ে মনে মনে না-ভেবে পারতাম না, বৌদির কাছে ও যখন রাত্রে যায় (কী অধর্ম !) তখন কী রকম ব্যবহার করে। সন্তানাদি যখন হচ্ছে (দূরে হ সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী।) তখন নিশ্চয়ই দুজনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ভাব আছে, যা বাইরে থেকে দেখলে মনে হত না কখনো, বরং একটা যেন গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। যদি দেখা যেত, বৌদি ওকে দেখলেই মুখ ঢেকে সরে যায়, আর ওর মুখের রঙ ফিরে যায়, তাহলে, তলে তলে কোথাও একটা স্রোত বইছে টের পেতাম, কিন্তু ব্যাপারটা সে-রকম ছিল না, ও যেন তখন থেকেই বাবার মত বয়স্ক পুরনো মানুষের মত ব্যবহার করতো। কিংবা জানি না, ওরকম ভাবের মধ্যেই হয়তো ওর ভাবের খেলা চলতো, যা আমার অনুভব করার ক্ষমতা ছিল না, বৌদিকেও আমার সে-রকম মনে হয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যেই, সে একটি বউয়ের থেকেও শান্ত নিরীহ গিন্নী হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, আমি যখন কলেজের দ্বিতীয় বছরের ছাত্র, তখন থেকেই রাজনীতিতে দীক্ষা হয়েছিল। ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না কখনো, তবু তার মধ্যেই দেশ-বিদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বই পড়া আমার শুরু হয়েছিল, এবং ছাত্র হিসাবে যতটা সম্ভব, ততটাই মেতে উঠেছিলাম, যদিচ, আমার ভবিষ্যতের কথাটা আমি একেবারে ভুলে যাইনি তবু স্বীকার করতে হবে, সেই সময়ে আমার মনে কিন্তু কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস আর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমি ঠিক পথে যাত্রা করিনি। আমার জন্যে, আমার বন্ধুদের কারুর কিছু অহঙ্কার ছিল, কারণ কথা আমি মোটামুটি ভালই

boiboi.net

বলতে পারতাম, (এখনো কি নয়, অন্যথায় এ দু বছর কাটলো কেমন করে।) ব্যবহারেও সকলেই খুশি ছিল। এবং 'সীরিয়স মাইণ্ডেড' বলে আমাকে সবাই সুখ্যাতি করতো। তার ওপরে আমি যখন অ্যাজিটেট করতাম বা ডিমনেস্ট্রেশন-র‍্যালি করতাম, তখন সকলের আনুগত্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করতো।

এসব খবর, বাড়ির থেকেও বড় কথা, মাধবগড়ে স্বয়ং পরমানন্দর কাছেও পৌঁছেছিল, সম্ভবত আমার বাবা-ই বেগতিক দেখে জানিয়েছিলেন যে, আমি ক্রমেই অধর্মের পথে চলে যাচ্ছি, এবং তাঁরা কিছু বলার থেকেও মহারাজ নিজে কিছু না বললে বোধহয় আমি শুনব না। অতএব, উপদেশ আরম্ভ হয়েছিল আবার। আমার একটা স্বভাব আছে, কারুর কথায় প্রতিবাদ করতে হলে, মুখ খুলে করার থেকে, মনে মনে করতেই ভালবাসতাম, তাতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার থেকে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুবিধে বেশি, বিশেষ করে, পরমানন্দর সঙ্গে তর্কের থেকে চুপ করে থাকাই আমার শ্রেয় ছিল, যদিচ, সেই সময়ে তাঁর উপদেশাবলী আমি মেনে নিতে পারিনি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, আমি রাজনীতি করতে গেলে, দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারব না, ঈশ্বরকেও ভুলে যাব। অথচ আশ্চর্য এই রাজনীতি করলেও, একদা যে আমি মাধবগড়ের মহারাজা হব, এ ধারণা আমাকে ছেড়ে যায়নি, আমার অবচেতনে, মহারাজের প্রসাদ, জীবন-যাপন বিত্ত ক্ষমতা, এগুলো ঠিকই ছিল, আমি সে-কথা জানতাম না, কারণ নিজেকে চিনতাম না। পরমানন্দর কথা না মানতে পারলেও, রাজনীতির মাতামাতিটা কমাতে হয়েছিল, পড়াশুনোর ক্ষতিটা আমি করতে চাইনি, যদিচ ইউনিয়নের সেক্রেটারির পদটা আমাকে সহজে ছাড়তে দেয়নি কেউ, এবং আমার সৌভাগ্য একটা ছিল, তার জন্যে আমাকে খুব একটা লড়াই কখনো করতে হয়নি।

তারপরে, অনার্স পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে, রাজনীতি, ইউনিয়ন, আড্ডা একেবারেই কমে গিয়েছিল, সেই সময়েই, (তিলকার পৃষ্ঠোপরি হে মাধবানন্দ, সেই সময়েই তুমি মানবজীবনের জীবধর্মের দরজায় কড়া নেড়ে এসেছিলে, তারপরে কি আর চিৎ অচিৎ ঈশ্বরের এলাকায় এসে এই মহারাজগিরি করা যায়?) আঁখির (ডাকনাম, 'নয়ন যদি নাম হতে পারে আঁখিই বা নয় কেন' আঁখিরই কথা।) সঙ্গে প্রথম আলাপ। তখন সে দ্বিতীয় বছরের ছাত্রী। আলাপ হয়তো প্রথম বছরেই হওয়া উচিত ছিল, কারণ যাদের ডেকোহাঁকো বলা হয়, মেয়েটি সেই দলেরই। একমাত্র এই কারণেই আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় দরকার ছিল না, ডেকোহেঁকো বলতে, যারা রাজনীতি আর ইউনিয়ন নিয়ে মাতামাতি করে। ও সেই দলেরই মেয়ে, অতএব আমার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা উচিত ছিল বলেই ধরতে হবে, যদিচ, বন্ধুমহলে জানাজানি ছিল, ওই একটা ব্যাপারে আমি সকলের থেকে উদাসীন, যে কারণে অনেকের অনেক রেষারেষি প্রতিযোগিতার খবর বা অভিযোগ আমার কাছে আসতো, কিন্তু আমাকে নিয়ে কোন বন্ধুকে কখনো ওই কষ্টটা পেতে হয়নি। পরমানন্দ আমাকে কলকাতার কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি জানতেন মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হবে, মেলামেশাও নিশ্চয়ই, সেইজন্যে স্কুল ফাইনালের পরেই তিনি আমাকে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, তাছাড়া, আসন, ব্যায়াম, খাদ্য (তিনি আমাকে কখনো নিরামিষ খাওয়ার নির্দেশ দেননি, তবু কিছু কিছু খাবার সম্পর্কে তাঁর বারণ

ছিল।) ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেগুলো আমি পালন করতাম এবং আমার অবচেতনে, মেয়েদের সম্পর্কে একটা নিস্পৃহতা বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল, যে কারণে, তেমন কোন কৌতূহল কখনো বোধ করিনি, আমি জানি না, সেটা আমার রক্তেই কিছু পরিমাণ ছিল কিনা, (যদি এসব বিষয়ে ট্র্যাডিশনকে মানা যায়।) কারণ আমাদের পরিবারে নারী-পুরুষের ঘটনা নিয়ে কোন ঢেউ উঠতে দেখিনি, যে কারণে আমার মনে হয়, দাদার বিয়ে হলেও যা হত, না হলেও এক রকমই থাকতো। বিয়ে হয়েছে, অতএব—সন্তান, কিন্তু মূলে মানুষটা যা, তাই রয়ে গিয়েছে। বিয়ের আগেও ও বাজার করতো, মাটি কোপাতো, শাক-সবজী (ফুল-টুল তেমন নয়।) লাগাতো, জল দিত, সংসারের অন্যান্য কাজ করতো, এখনো চাকরি করে, তাছাড়া আগের কাজগুলো একই নিয়মে করে যায়। মাঝখান থেকে একদিন বিয়ে হল, ছেলে হল, তার জন্য ওর কোনই পরিবর্তন ঘটেনি। বাবাকেও আমি প্রায় ওই রকমই দেখেছি, (বর্তমানে আমি পিতৃহীন।) এবং ঠাকুর্দাকে ছেলেবেলায় যে রকম দেখেছি, তাতে মনে পড়ে, তিনি একজন সন্ন্যাসীর মত মানুষ ছিলেন। এমন কি, অনেকের ঠাকুর্দাদের যেমন দেখেছি, তাঁরা নাতি-নাতনীদের সঙ্গে নানান রকম হাসি-তামাশা করেন, তিনি তাও করতেন না। অথচ খিটখিটে বুড়ো ছিলেন না, যাঁদের সম্পর্কে আমার ধারণা, তাঁরা এখনো লোভে কাতর ক্ষমতায় কুলায় না, কমবয়সীদের ঈর্ষা করেন। আমার ঠাকুর্দা সে রকম ছিলেন না, তিনি সদা ভাবুক, সর্বদাই জপের মালা নিয়ে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, বরং ঠাকুরমাকেই দেখেছি প্রতি পদে পদে তাঁর কাছে আসতেন, গায়ের কাপড়টা ঠিক করে দিচ্ছেন, এমন কি, ঠাকুর্দার বুড়ো বয়সে চোখের কোণ দিয়ে বা নাক দিয়ে জল পড়লে তিনি মুছিয়ে দিতেন, ঠাকুর্দা যেমন, তেমনি বসে থাকতেন, খুশি বা বিরক্তি কিছুই বোঝা যেত না। হয়তো এসব তুলনা দিয়ে, আমার আপন রক্তের নিস্পৃহতা, (সত্যিই কি আমি নিস্পৃহ! তবে এত কথা কেন।) বোঝানো যায় না, তবে অনেক পরিবারেই দেখেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানান রকম হাসি-ঠাট্টা-আবদারের ছোটখাটো ঘটনা, যেগুলো কখনো আমার খারাপ লাগেনি। কিন্তু আমাদের পরিবারে বাবা মা এমন কি দাদা বৌদি কাউকেই সে রকম দেখিনি যে কারণে মনে হয় মেয়েদের সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা (কথাটা তো সত্যি নয় অলকেশ!) একটা সময় অবধি নিশ্চয়ই কাজ করেছে। তাছাড়া একটা নিষেধের গলা যেন সব সময়েই শুনতে পেয়েছি। তবু আঁখি (ওর একটা ভাল নামও আছে, সে নামটা সব সময়ে আমার মনে আসে না, কারণ ভাল নামটা ধরে ওকে আমি ডাকতাম না, যে কারণে ওকে আঁখি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না।) নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে এসেছিল।

আঁখি এসেছিল? কথাটা মিথ্যে, সন্দেহ নেই, কারণ, ও কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, আমার নিষেধের বেড়া কেউ ডিঙিয়েছে, কারণ, এ বেড়া যে নিজে ডিঙোতে দেয় না, সেখানে অন্যে এসে ডিঙোতে পারে না। ওটা একটা অজুহাত যে অজুহাতটা অপরকে বলতে ভাল লাগে, শোনায়ও বোধহয় ভাল, যেমন, 'অমুকে অমুককে খারাপ করেছে' বা 'অমুকে চায়নি, তবু অমুক বাধ্য করেছে বলে সে প্রেমে পড়েছে।' আর যাই হোক, খারাপ করা (সামাজিক বোধে যা খারাপ।) বা প্রেমে পড়া ব্যাপারগুলো কেউ কাউকে করিয়ে দিতে পারে না। অতএব বলা উচিত, নিষেধের

বেড়া আমি ডিঙিয়েছিলাম, সেই পুরোপুরি বিকেলে, কোন ছুটির দিনে, কলুটোলার নিরালায়, (কলুটোলাও নিরালা হয় ! কথাটা এই মাধবগড়ে হাতির পিঠে থেকে ভাবতেও অবাক লাগে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, কলুটোলার ভিড়ের তুলনায়, মাঝে মাঝে ও-রাস্তাটাকে আমার নিরালা বলেও মনে হয়েছে ।) বই থেকে মুখ তুলে আমি রাস্তায় নেমে এসেছিলাম ।

আমার অবিশ্যি সত্যি বলতে কি, প্রথম দর্শনে প্রেম (লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট) বা যেন ভাগ্যের দ্বারা স্থির করা মুহূর্তে দেখা, অনেকটা অলৌকিক রোমান্টিক, প্রথম দেখা হওয়ার বিষয়ে, অনেকেই যেমন বলে থাকেন বা লিখে থাকেন, আমার এখনো, যখন কিনা সন্ন্যাসী জীবনের আঁখির কথা মনে পড়ছে, ভাবতেই লজ্জা করে । কারণ, আমি কোন প্রেম অনুভব করিনি, আর আঁখির জবানীতে, 'প্রথম দর্শনে যদি প্রেম হত, তাহলে ও রকম অনেক প্রেম বারো বছর বয়স থেকেই করেছি । (মেয়েটা অবিশ্যি একটু সিধে কথা বলতো ।)

অন্যমনস্ক ছিলাম, দৃষ্টি ছিল পশ্চিমের নয়া অ্যাভিন্যুর দিকে, যে দৃষ্টিতে কোন-কিছুই ধরা-ছোঁয়ার কিছু ছিল না । পেভমেণ্ট ভেজা ছিল, বৃষ্টির জন্যে নয়, জল দেওয়া হয়েছিল, আর শুকনো পাতা এদিকে ওদিকে ছড়ানো । আমার সামনে দিয়ে কেউ আসেনি, কে যেন পিছন থেকে সামনে এসেছিল, শুনতে পেয়েছিলাম, 'খুব টায়ার্ড, না ?'

চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম, হাসতেও হয়েছিল, কারণ মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, আমার দিকেই তাকিয়েছিল, যদিচ সহসা চিনে উঠতে পারিনি । তবু জবাব দিয়েছিলাম, 'তা একটু ।'

'চিনতে পারছি না' একথা বললে যে অনেকে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এ বোধটা আমার ছিল, কিন্তু মেয়েটি, যাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, অকারণ সাজের ঘটাটা তার চোখে আর ঠোঁটে একটু বেশি গাঢ় হয়ে উঠেছিল । অকারণ না বলে উপায় নেই, কারণ মেয়েটি দেখতে ছিল, যাকে সুন্দরী বলা যায়, অর্থাৎ তার চোখ ছিল ডাগর, যে চোখের চাউনিকে বোধহয় নিবিড় এবং সরল, কিংবা গভীর অথচ টলটলে বলা যায়, তার রঙ ছিল ফরসা, গঠন ছিল সুন্দর, যৌবনের যা কিছু চোখে লাগে, (আহা সন্ন্যাসী, বলই না !) ভাল লাগে, সবই ছিল, তার ওপরে ছিল খাঁটি চুলের গোছা, (মরা মেয়ের কেনা চুল নয় ।) এবং গায়ের চামড়ায় স্বাস্থ্যের, কী বলব, দ্যুতিই বলা উচিত, তাও ছিল । সাজের ঘটা দেখে মনে হয়েছিল, প্রেমের অভিসার না হোক, কলেজ-পাড়ায় বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একটু বুকনি আসরের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে । কথাগুলো আমার না জানার কিছু ছিল না, আমার বন্ধুরা অধিকাংশই ও ব্যাপারে অত্যন্ত স্বাভাবিক আর স্বাস্থ্যবান ছিল ।

মেয়েটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, বারকয়েক ঠোঁট টিপে, বেঁকিয়ে, গুটিকয়েক শব্দে, অনেকটা চুড়ি বেজে ওঠার মতই হেসে উঠেছিল । বলেছিল, 'চিনতে পারছেন না, এই তো ? সেকথা বলছেন না কেন ?'

আমাকেও সত্যি কথাই বলতে হয়েছিল (আমি মিথ্যে না বলারই চেষ্টা করি ।) 'দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না ।'

মেয়েটি আবার হেসেছিল, বলেছিল, 'আইভি মজুমদার ।'

boiRboi.net

'ও !'

আবার হেসেছিল, (এবার একটু বিরক্ত হচ্ছিলাম) মেজাজটা, আমার সেই রকমের বলেছিল, 'ছাগলবটি মজুমদার হলেও আপনার ক্ষতি ছিল না, তাই না ?'

কথার ভিতরের খোঁচাটা আমার তৎক্ষণাৎ বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কারণ আইভি মজুমদার বুঝেছিল আমি তাকে ঠিক চিনতে পারিনি, তৎসত্ত্বেও যেন চিনেছি, (যদিচ সত্যি আমি তা করিনি) সে-রকম ভাব দেখিয়েছি, তাই বিদ্রূপ করেই সে জানিয়েছিল, আইভি না হয়ে সে যদি ছাগলবটি হত, অর্থাৎ আইভি যেমন একটা লতার নাম বাঙলা-দেশের জঙ্গলে গজায়, ছাগলবটিও এক ধরনের তেমনি লতা, এবং সত্যি বলতে কি, আইভির মত একটি মেয়েও যে ছাগলবটি লতার কথা জানে, যা আমার ধারণা, কলকাতা তো অনেক দূরের কথা, বাঙলাদেশের দূর গাঁয়েরই আজকের অনেকে জানে না, তাতে একটু অবাক হয়েছিলাম, এবং বিদ্রূপটা ভাল লেগেছিল। (সত্যি মাধবানন্দ !)

বলেছিলাম, 'আইভিতে আর ছাগলটিতে অনেক তফাত বটে, আপনি নিশ্চয়ই আইভি, কিন্তু আমার মনে হয়, আগে বোধহয় আমাদের আলাপ হয়নি।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'স্মৃতিশক্তি দিয়ে।'

আঁখির কাজল ল্যাবড়ানো (ওর নিজের চোখ এত সুন্দর, কাজলটা ল্যাবড়ানো ছাড়া আমার কিছু মনে হয়নি।) চোখ দুটি একটু কুঁচকে উঠেছিল, তবে হাল সহবত রপ্ত ছিল খুবই, তাই হাসিটা ধরে রেখেছিল বোধহয় ঠোঁট ব্যথা করেই। তারপরেই বড়মানুষের সঙ্গে যেমন মেয়েরা কথা বলে, (আমার তখন প্রায় কুড়ি, আর চেহারাটা খুব একটা দশাসই বা ভারী ছিল না।) তেমনিভাবে বলেছিল, 'মশাই, সবাই তো বলে, আপনার মুখে কেবল ভাত-রুটির গন্ধ, কথা তো দেখছি অন্য রকম।'

বলে প্রায় খিলখিল করেই হেসেছিল, যদিচ, তার মধ্যে তিক্ততার আভাস ছিল, তেমন তীব্রতা ছিল না। আর ওর কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি, কারণ, আমি যে বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট খাই না, বা পান অথবা অন্য কিছু, যেমন চা কফি, যে কোন নেশার জিনিসই হোক, এই ইঙ্গিতটাই ছিল ওর কথায়, এবং একমাত্র ওই কথাতেই ধরে নিয়েছিলাম, আইভি নিশ্চয়ই আমাদের কলেজের মেয়ে, অন্যথায় সে খবরটা ওর জানবার কথা নয়। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি কথায় হেরে যাবার মত মফস্বলের ছেলে আমি ছিলাম না, বরং ঠিক বলতে পারার দিকেই আমার ঝোঁক ছিল, যে কারণে বন্ধু-দের বিশ্বাস ছিল, অ্যাজিটেশনে কলেজে আমি বে-জোড়া, এমন কি ডিবেটেও। কিন্তু মুশকিল ছিল এই, চলতি ফ্যাশনের রঙ না মাখালে, কথাবার্তা আচার-আচরণটাকে কেউ হঠাৎ মানতে চায় না, বরং অবাক হয়ে পড়ে, যেটা আঁখির বেলায় ঘটেছিল। কিন্তু ওর কথায় আমি তিক্ততা বোধ করিনি, করলে, আমাকে কলুটোলার পাতা-ঝরা ভেজা পেভমেণ্টে দাঁড় করিয়ে রাখা যেত না, বরং কেমন যেন একটু মজাই লেগে গিয়েছিল। বলেছিলাম, 'আপনার কথা থেকে এবার অন্তত বুঝতে পারছি, আপনি বোধহয় আমাদের কলেজের ছাত্র। (কলেজের মেয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, ভাগ্যিস বলিনি, তাহলেই শুধরে দিত।) কিন্তু মুখের গন্ধের জন্যেই যদি কথার দাম হয়, তাহলে, সত্যি বলতে কি, যে গন্ধ আমার ভাল লাগে না, সেই গন্ধওয়ালা মুখের কথাও আমার অনেক

সময় ভালই লাগে। আমি বোধহয় আপনার মত গন্ধ দিয়ে কথার বিচার করতে পারি না।'

আঁখি শুনছিল, এবং শুনতে শুনতে ঘাড় কাত করে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসেছিল, যে ভাবটার কোন নাম জানি না। হতে পারে, যাকে বলে দুষ্টামি, কিংবা তাও নয়, মেয়েদের ওরকম হাসিকেই বোধহয় মধুর বলে, কিছুই ঠিক জানি না, হেসে বলেছিল, 'সত্যি কফি খান না, সিগারেট খান না, এমন কি, শুনেছি সিনেমাতে যান না, কিন্তু আপনার কথা শুনে তো তা বোঝবার উপায় নেই।'

'কেন নেই, তা অবিশ্যি বুঝতে পারছি না। কফি সিগারেট সিনেমা না হলে যে লোকে কথা বলতে পারে না, তা আমার জানা নেই। যাই হোক, আমি বোধহয় আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি।'

আঁখির চোখের তারা চোখের কোণে গিয়েছিল, ঠোঁটের কোণ টিপে হেসেছিল, বলেছিল, 'ও বাব্বা, লোক তাড়াবার ধরনগুলোও আপনার বেশ জানা আছে দেখছি।' সত্যি বলতে কি, এরকম মজা খুব বেশিক্ষণ ভোগ করার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না, বিশেষত যাকে চিনি না, এবং যার কথার মধ্যে এমন কোন বিষয় ছিল না, যেটা নিয়ে কিছু চালানো যেতে পারে। ও নিজেই আবার বলেছিল, 'ভয় নেই আপনাকে আটকে রাখব না, তবে আপনি আমার দেরি করিয়ে দেননি, আমিই আপনাকে ডেকে দাঁড় করিয়েছি। আপনার যদি ভাল না লাগে, আপনি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন!'

'চটবেন না।'

বলে আমি মুখ ফেরাতেই যাচ্ছিলাম, আর তখনই আঁখি বলে উঠেছিল, 'চটব না, কিন্তু আপনাকে যদি আমি একটা বুদ্ধু বলি, আপনি রাগ করবেন?'

বলেছিলাম, 'আপনার রাগ যদি তাতে কমে, তা হলে অনায়াসে বলতে পারেন। আমি রাগ করব না।'

'মাইরি।'

মেয়েদের মুখে কখনো 'মাইরি' শুনিনি তা বলব না, তবে আঁখি যে-রকম করে বলেছিল, সে-রকমভাবে কখনো শুনিনি, এবং একটু আগেই যে-কথা ভাবছিলাম যে, এমন বিষয়বস্তু নেই যে ওর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, সে ধারণাটা বদলাতে হয়েছিল, কারণ বিষয়বস্তুর থেকে, ওর ভাব-ভঙ্গি আমাকে বেশি খুশি করছিল। 'মাইরি' কথাটা ব্যবহারের প্রবণতা যে আমারও একেবারেই ছিল না, তা নয়, কিন্তু কথার (কথা নয়। বাক্য, পরমানন্দর সে-রকমই নির্দেশ ছিল, আমি কথা বলব না, বাক্য বলব, কিংবা বাণী।) বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম, কেন না, আমার ভবিষ্যতের একটা শর্ত তো ছিলই, আমি কী ধরণের কথা বলব। বুঝতে পেরেছিলাম, আঁখি (তখনো আইভি মজুমদার) চটেছে, তাতে ওকে, কেন জানি না, সৎ আর সহজ মনে হয়েছিল, যে কারণে কথা ভেঙে দিতে না চেয়ে, আমি আর একটু কষেছিলাম। খুব জোরে কয়েকবার মাথা নেড়ে, হেসে বলেছিলাম, 'না।'

আঁখি আমার মাথা ঝাঁকানি দেখে, অন্য কিছু বলব আশা করেছিল, যে কারণে রাগের মধ্যেও, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মানে?'

বলেছিলাম, 'মানে, না।'

'আপনি নিজেকে কী ভাবেন বলুন তো ?'

'অলকেশ ভট্টাচার্য।'

'বুদ্ধু নয় কেন ?'

'কারণ, সত্যি শুনতে চান ?'

'নিশ্চয়ই।'

'অলকেশ বলে।'

মানুষ চটলে যে তাকে নিয়ে কী রকম মজা করা যায়, সেই মুহূর্তে আমি তা খুব ভাল করে বুঝতে পারছিলাম, কারণ যে চটে, সে, চটার একটা ফাঁদ আছে, তার মধ্যে আটকা পড়ে যায়, যেটা হয়েছিল আইভি মজুমদারের, এবং আমি অনুভব করেছিলাম, যাকে বলে 'হাই টাইম', আইভির চলে যাবার পক্ষে তাই হয়েছিল। কিন্তু আমি আর একটু না কষে ছাড়তে পারিনি, বলেছিলাম 'আপনাকে কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি বরং আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি, এ সময়টা আমি একটু ঘুরতেই ভালবাসি।'

অস্বীকার করব না, আমি তখন ভবিষ্যতের মাধবগড়ের মহারাজ মাধবানন্দ, তবু মেয়েরা রেগে গেলে, কোন কোন সময় (সব সময়ে, সব রাগ না) তাদের দেখতে সুন্দর লাগে, সেটা আমি অনুভব করছিলাম। আর আঁখি রেগে বলে উঠেছিল, 'আমি কোথায় যাব তা জেনে আপনার দরকার কী, আর আপনিই বা আমার সঙ্গে যাবেন কেন ?'

কথাগুলো ও এমনভাবে বলেছিল, এবং এতটা গলা তুলে, যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে আমাকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছিল, যে কারণে দু-একজন পথচারী ওর চড়া গলায় আকৃষ্ট হয়েছিল, ফিরে তাকিয়েছিল, এবং ব্যাপারটাকে যদি সে রকম দাঁড় করানো যায়, তা হলে নীতিবাগীশ 'ভদ্রলোকরা', যাঁরা নারীর অপমানে সর্বদাই পথে-ঘাটে হাতগুটিয়ে আছেন কারণ ওসব তাঁরা সহ্য করতে পারেন না, (কী, 'মেয়েছেলের' অপমান ! কিংবা, 'মেয়েমানুষের !' ছি, আমি সত্যি পতিত, এসব কথা এখনো ভাবতে পারি।) তাঁদের হাতের কিছু সুখ (সত্যি সুখ নাকি ?) আমার শরীরের ওপর দিয়ে হয়ে যেতে পারে। আমি ওর চোখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে বলেছিলাম, 'আপনার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আমার তাই মনে হল আপনি যেখানে যেতে চান, সেখানে যেতে আপনার অসুবিধা আছে, বা একলা একলা যেতে চান না।'

'তার মানে কী, আপনি বলতে চান, আপনাকে আমি আমার সঙ্গে যেতে বলছি ? আপনাকে তো আমি চিনিই না।'

ওর ভঙ্গিতে এবং চড়া গলায়, অন্তত একজন যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল একটু দূরে, (নারীর অপমান, যায় কী করে !) তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম, বলেছিলাম, 'আপনি আর একটু লাউড অ্যাণ্ড ডাইরেক্ট না হলে ভদ্রলোক এগোতে পারছেন না।'

'তার মানে ?'

'সত্যি জানতে চান ?'

'চাই।'

boiRboi.net

সত্যি, রাগের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল আঁখি, এবং আমিও কি কোন ফাঁদে পড়ে যাইনি, ভিতরে ভিতরে একটা জেদ এবং রাগ কি আমার মধ্যেও ছিল না, যেটাকে আমি কেবলই মজা বলে ভাবছিলাম। আমি হঠাৎ হাত তুলে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়া ভদ্রলোককে ডেকেছিলাম, 'শুনুন।'

লোকটি বা আইভি, কেউ ভাবতে পারেনি যে আমি ও-রকম ডাকব, যে কারণে, দুজনেই অবাক হয়েছিল, এবং লোকটি যখন এগিয়ে এসেছিল আইভি মজুমদার তখন আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল আমার মতলব বোঝবার চেষ্টা করেছিল বোধহয়। আমি বলেছিলাম, 'আপনি কি শুনতে পেয়েছেন, উনি কী বলছেন?'

লোকটি আইভির দিকে চট করে একবার দেখে নিয়ে, বেশ গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'তা কিছুটা শুনতে পেয়েছি বৈকি।'

'কী শুনতে পেয়েছেন বলুন তো?'

'আপনি বোধহয় কিছু বলেছেন ওঁকে, অথচ উনি আপনাকে চেনেনই না।'

'আচ্ছা, এবার তা হলে বাকীটা শুনুন। আপনি দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাই কাছে আসতে বললাম।'

লোকটি তৎক্ষণাৎ আইভির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

আইভি মজুমদার, যাকে বলে, একেবারে ফুঁসে উঠেছিল, 'কী ব্যাপার তা আপনার জেনে কী দরকার। আপনি আপনার কাজে যান মশাই।'

লোকটি থতিয়ে গিয়েছিল, প্রায় তোতলার মত বলেছিল, 'উনি যে আমাকে ডাকলেন!'

আইভি প্রায় ভেংচে উঠেছিল, 'আপনি চলে এলেন, তবে ওঁর কাছেই শুনুন, কেন উনি ডেকেছেন।'

জ্বলন্ত চোখে আইভি মজুমদার আমার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু লোকটি খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছিল, বলেছিল, 'মানে ঠিক বুঝলাম না। আপনি কোন অসুবিধায় পড়েননি তো?'

'পড়লেই বা তা আপনাকে বলতে যাব কেন? আমি আপনাকে ডেকেছি?'

এবার লোকটি আমার দিকে ফিরেছিল, এবং তার সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতায় বোধহয় একটু নতুনত্বের চমক ছিল, যে কারণে তার হাতের মোটা কব্জি তেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করছিল, 'কী ব্যাপার, আপনি আমাকে ডাকলেন কেন?'

'যে কারণে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন।'

'উনি রাগ করে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন বলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।'

'তা হলেই বুঝতে পারছেন, উনি লোকজনকে কিছু বলতে চাইছিলেন নিশ্চয়। উনি যাতে আপনাকে বলতে পারেন সেইজন্যে আমি আপনাকে কাছে ডেকেছিলাম।'

লোকটি আইভির দিকে ফিরে তাকিয়েছিল, এবং একটা সামান্য ব্যাপার যে এতদূর গড়াতে পারে, তা আমার একেবারেই ধারণা ছিল না, যে কারণে আমি লজ্জা ও অনুশোচনা বোধ করতে শুরু করেছিলাম, আর আইভি লোকটিকে প্রায় ধমকে উঠেছিল, 'আপনি যাচ্ছেন না কেন, আপনি কী রকম লোক!'

boiRboi.net

আমার ধারণা, লোকটা খুবই সাদাসিধে, যারা রাস্তায় নারীর অপমানে হাতা গুটিয়ে ফ্যালে এবং সেটা তার অপরাধ নয়, যে কারণে খানিকক্ষণ প্রায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে, তিক্ত হেসে বলেছিল, 'ও, আপনারা দ্যায়লা করছেন দুজনে!'

বলেই সে চলে গিয়েছিল, এবং আমাদের বয়সের ছেলে ও মেয়ের পক্ষে কী করে দ্যায়লা করা সম্ভব, বুঝতে পারিনি, যদিচ জানা ছিল, ওটা কলকাতার একটা রোয়াকী কথা। ইতিমধ্যে আইভি মজুমদারের কাছে প্রায় কৃতজ্ঞই হয়ে উঠেছিলাম, যেহেতু সে ফরফর করে চলে যায়নি, শেষ পর্যন্ত তার একটা শালীনতাবোধ ছিল, যে বোধ থাকতে গেলে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়, যেটা সে দিয়েছিল। সে ফরফরিয়ে (এ ছাড়া অন্য কথা মনে পড়ে না।) চলে গেলে, ব্যাপারটা খারাপ দেখাতো, নাটুকে তো বটেই, রাগারাগিটা জমে থাকতো, যেটা সে করেনি, আর তাই, আমি না বলে পারিনি, 'দেখুন এ রকম ব্যাপারের জন্যে আমার খুব লজ্জা করছে, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আইভি মজুমদারের চোখে প্রায় জল এসে পড়েছে, যেটাকে আমার মোটেই সস্তা কাহিনীর নায়িকা-সুলভ মনে হয়নি, এবং ও বলেছিল, 'আমাকেই বরং আপনি ক্ষমা করবেন, কেন যে মরতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেছলাম! আচ্ছা. যাচ্ছি।'

এই তিলকার হাওদায় বসে যেতে যেতেও, আমি যেন পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছি, সুন্দরী মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং আট বছর আগের সেই কলুটোলার বিকেলের মতই মনে কষ্ট পাচ্ছি। তিলকার পিছনে পিছনে আগে আগে এখনো একদল লোক, ছেলেবুড়ো চলেছে। রোদ অনেকখানি উঠেছে, এবং হৃদয়ের সানাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আট বছর আগে, সেই রাত্রে পড়তে বসে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম, যে অন্যমনস্কতার মধ্যে গাম্ভীর্যের থেকে হাসির অংশটাই বেশি ছিল, তার সঙ্গে, সেই হাসির জন্যে নিজের প্রতি কিছুটা বিরক্তি, আর অনুশোচনা। নিজেকে আমার খানিকটা অপরাধী মনে হচ্ছিল এবং মেয়েটিকে অসহায় ভেবে, নিজেকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস না করে পারছিলাম না, এত দুষ্টামি আমি জানতাম? অবিশ্যি, সত্যি দুষ্টামি করার জন্যেই সবকিছু করিনি, আইভি মজুমদারের অতিরিক্ত চটপটে ভাব (স্মার্টনেস্?) দেখে, এবং গায়ে পড়ে কথা বলার ভঙ্গি দেখে, এবং গালাগাল দিতে শুনে, (সত্যি, আমি একটা বুদ্ধু!) আসলে আমিও রেগেই গিয়েছিলাম। তারপরে খেতে বসে, এক বন্ধুকে ঘটনাটা বলেছিলাম, সে খুব হেসেছিল। আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম, এ-কথা যেন সে কাউকে না বলে, কারণ মেয়েটির তাতে দুর্গতি, ছেলেরা তার পিছনে লাগবে, এবং আমি জানি, মেয়েদের পিছনে লাগার কাপুরুষোচিত আনন্দ অনেক ছেলেদের খুব ভাল লাগে, যে ইতরামিতে, এমন কি অনেক সময় বয়স্কদের সমর্থন দেখেছি, এবং আমি বুঝতে পারি না, যে দেশে চোর পকেটমারদের ধরা হয়, সে দেশে এদেরও কেন রোজই দারোগারা ধরেন না। বন্ধুকে বলার উদ্দেশ্য, আমার অপরাধবোধের জন্যেই।

বন্ধু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানিয়েছিল, সে জন্যে অনুতাপের কিছু নেই, ওর নাম আঁখি। (শুনেই চমকে উঠেছিলাম, এবং একটি কথাই মনে হয়েছিল, সেই

সোস্যালিস্ট !) আঁখি মজুমদার, শুনেই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, যাকে দেখলেই ছেলেরা (কেউ কেউ) গান ধরে দিত, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' বা 'আঁখি মোর ঘুম না জানে' যদিচ 'না বলে যায় পাছে সে,' কলিটাই বেশি চড়িয়ে গাইতো, বা 'আঁখি হতে ঘুম নিল হরি—মরি মরি।' বন্ধুর কাছে শুনে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ওর কথা, কলেজের নাম-করা মেয়ে, বিশেষ দলাদলিতে, হট্টগোলে, এবং ফ্যাশনে, যদিচ, সত্যি আমার পক্ষে ওকে প্রথম দর্শনেই চিনে ওঠবার কথা নয়, কারণ ওকে আমি দু একবার দেখেছি, যে-দেখাতে মনে করে রাখবার কোন কারণই নেই, ইউনিয়নের ব্যাপারে ও আমার ঘোর শত্রু, এ খবর বন্ধুদের কাছে আমার জানা ছিল। আমরা যাতে ইউনিয়ন না করতে পারি, আমরা যাতে না দাঁড়াতে পারি, সে চেষ্টা আঁখি আর ওর দল সব সময়ে করতো, তা ছাড়াও ছিল ও সোস্যালিস্ট গ্রুপের। কলেজের বাইরেও নাকি ওর নাম ছিল, অল্প বয়সেই ওদের পার্টিতে ওর খুব কদর হয়েছিল, যে জন্যে কেউ কেউ ওকে আঁখি আসফ আলীও বলতো। ও যদি প্রথম দর্শনেই আমাকে ওর আঁখি নামটা বলতো, তা হলে চিনতে অসুবিধে হত না, যদিচ ওরকম একটা বাজে ঘটনা রোধ করা যেত কিনা আমি জানি না, হয়তো আরো তিক্ততর কিছু ঘটতে পারত, যে কারণে, আমি বরং একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম, আঁখি ওর বন্ধুদের বলে, পরের দিন হস্টেল চড়াও হয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে বসবে কিনা। অবিশ্যি, ওর শেষ মুহূর্তেই ব্যবহারে আমার তা মনে হয়নি, এবং সাজগোজের ঘটা ও ব্যবহার দেখে, সেই আঁখি আসফ আলী সোস্যালিস্ট মেয়েটির কথা আমার একবারও মনে হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্যরকম। দু তিন দিন পরে দারোয়ান এসে আমাকে একটা ছোট চিরকুট দিল, তখন আমি মাকে চিঠি লিখছিলাম। চিরকুটে লেখা ছিল, 'আপনার সঙ্গে একটু দরকার, আসতে পারবেন ? আইভি মজুমদার।'

সত্যি বলতে কি, আমি একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো আঁখি ওর বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসেছে, কোথাও তারা অপেক্ষা করছে, আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি করবে, অবিশ্যি হস্টেল থেকে আমিও আমার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে যেতে পারি, গোলমাল করলে তার জবাব দিতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভাবতেই ভাল লাগছিল না। আমি চিরকুটটা আবার পড়েছিলাম, আঁখির মুখটা আমার মনে পড়েছিল, এবং গোলমালের কথা ভেবে আমার হঠাৎ ভীষণ লজ্জা করে উঠেছিল। মায়ের চিঠিটা শেষ না করেই বেরিয়ে পড়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আঁখি হস্টেলের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তখন ওর তেমন সাজসজ্জা ছিল না, চুলে তেল দেয়নি বা শাম্পু করেছিল, যে কারণে ওর গালের পাশ দিয়ে চুলের গোছা নেমেছিল, চোখে কাজল একেবারেই ছিল না ; ঠোঁটে রঙ না, কপালে টিপ না এবং ওকে কেমন যেন বিষণ্ণ আর ভারী দেখাচ্ছিল। মেয়েদের যে মনের কী অবস্থায় ও-রকম দেখায়, আমি সত্যি জানতাম না, কারণ ঝগড়ার দিনের থেকে চিরকুটের সেই দিনটাতেই ওকে দেখতে আমার বেশি ভাল লাগছিল, অথচ ওকে বিষণ্ণ বা ভারও দেখাচ্ছিল যেটা অন্তত ভাল লাগবার কথা নয়।

আমি এসে দাঁড়াতেই, প্রথমে বলেছিল, 'আমার নাম আঁখি, আমার নাম শুনেছেন কখনো ?'

boiRboi.net

হেসে বলেছিলাম, 'হাজারবার। আপনি ওই নামটা বললেই মিটে যেত— ।'

'মিটে যেত না, বলুন আপনি আরো চুটিয়ে আমাকে অপমান করতেন।'

'সত্যি বললে যদি বিশ্বাস করেন, তা হলে বলি, আমি পরশু রাত্রেই খুব অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। যদিও, আপনি ভেবে দেখবেন, আমার দোষ কতখানি ছিল, তবু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি।'

আঁখি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, বোধহয় ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি, বলেছিল, 'তার কারণ আপনি কখনো জানতেন না আমার নাম আঁখি।'

'জানতাম।'

'জানতেন ?'

'জানতাম, আমার এক বন্ধুকে ঘটনাটা বলতেই— !'

'বলে দিয়েছেন ? উঃ তার মানে কলেজের সবাই— ।'

'না আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যাকে বলেছি তাকে বিশ্বাস করেই বলেছি, সে ছাড়া কেউ জানে না, আর তাকেও আমি বলেছি কারণ আমার অপরাধ-বোধটা প্রকাশ না করে পারছিলাম না। কিন্তু আমি জানি এ কথা জানাজানি হলে, শুধু আপনার নয়, আপনাদের সোস্যালিস্টরাও আমার পিছনে লাগত, ওসব আমি পছন্দ করি না।'

আঁখি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, এবং বোধহয় বিশ্বাস করেছিল, কারণ আমার নিজের সম্পর্কেও আমি বরাবরই জানতাম, আমার মুখ, আমার ভিতরের ব্যাপারে একটু বেশি সহজ দর্পণের কাজ করে, যেটা মাধবগড়ে এসে দোষ হিসাবে ভাবতে শিখেছি, এবং নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করছি।

আঁখি বলেছিল, 'আপনি বোধহয় পড়ছিলেন, বিরক্ত করলাম।'

'না, মাকে চিঠি লিখছিলাম এখন।'

আঁখি আবার তাকিয়েছিল, এবং একটা কী কথা ও বলতে চাইছিল, আমি ধরতে পারছিলাম না, (বুদ্ধু !) যে কারণে আমিও ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ও চোখ নামিয়ে পা ঘষছিল, বলেছিল, 'আমি আপনাকে ডাকতে এসেছি।'

'কোথায় ?'

'যেখানেই হোক, কোন জায়গা ঠিক করিনি।'

আমি বোকার মত তাকিয়েছিলাম ওর মুখের দিকে, এবং বোকার মতই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন বলুন তো ?'

আঁখি যেন একটু অবাক হয়েই আমার দিকে তাকিয়েছিল এবং অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখেছিল, বলেছিল, 'কোন কারণ ছাড়া কোথাও যান না ?'

আমি নানান রকম ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু কোন কূলকিনারা পাইনি, তাই বলতে হয়েছিল, 'না, মানে আমি আপনার সঙ্গে কোথায় যাব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আঁখি বলেছিল, 'বেড়াতে।'

'বেড়াতে ?'

'হ্যাঁ, কেন, বেড়াতে যান না আপনি ?'

হঠাৎ জবাব দিতে পারিনি, এবং আঁখি ওর সঙ্গে আমাকে বেড়াতে যেতে বলেছে,

boiRboi.net

এটাই আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছিল। আবার বলেছিল, 'কি পড়া নষ্ট হবে, তাই যেতে পারবেন না ?'

'একটুখানির জন্যে আর কত নষ্ট হবে, সে জন্যে বলছি না। আমি এভাবে কখনো বেড়াতে যাইনি।'

'এভাবে মানে, কোন মেয়ের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ।'

'গেলে কী হবে ?'

'কিছুই না, তবে কখনো যাইনি।'

সত্যি বলতে কি, জীবনে সেই আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম, আমি একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং প্রথম অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই, আমার প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাও আমি অনুভব করেছিলাম, এবং নিষেধাজ্ঞা অনুভব করেছিলাম বলেই, একটা ইচ্ছাও বোধ করেছিলাম, ওর সঙ্গে যাই। আমার বন্ধুরা সকলেই আঁখির মত একটি সুন্দরী মেয়ের ডাক পেলে খুব খুশি হত, আমার ভিতরেও যে সেটা ছিল না, আজ আর আমি তা বলতে পারি না, আর সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছিল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথা বুঝেছিলাম, ও আমাকে সত্যি ডাকছে এবং সেই ডাকতে আসাটা এতই অনাড়ম্বর, অথচ স্বাভাবিক, যা প্রায় শ্রীহীন মনে হয়েছিল, কারণ তার মধ্যে কোন পরিকল্পিত সাজানো ব্যাপার ছিল না। ও যে ভেবেচিন্তে আসেনি সেটা বোঝা গিয়েছিল, এমন কি একটা ছেলেমানুষের মত দাবি নিয়েও এসেছিল, যার মধ্যে যুবতী-সুলভ অহংকারের অর্থাৎ 'আহ্বানের' রঙ ছিল না। আমি তখুনি বলেছিলাম, 'চলুন কোথায় যাবেন।'

আঁখি আবার আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল, 'সত্যি আপনার যেতে ইচ্ছে করছে তো ?'

'তা নইলে যাব কেন ?'

'অন্য কিছু ভাবছেন না তো ?'

'কী রকম ?'

'এই হয়তো আপনাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে, সেদিনের জন্য শোধ তুলব ?'

'এ কথাটা আপনার চিরকুট পাবার পর একবার মনে হয়েছিল, তার জন্যে অবিশ্যি পরে নিজের কাছেই খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম।'

'কেন ?'

'ওরকম ভাবার জন্যে, কেন না, আমার মনে হল, আপনি সে-রকম কিছু করতে পারেন না।'

'কেন ?'

'আমি সব কেন-র জবাব দিতে পারি না।'

আঁখি তাকিয়েছিল আমার দিকে, তারপর পিছন ফিরে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল, আমিও ওর সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছিলাম। আমার আজ পর্যন্ত, অভিজ্ঞতা ও ধারণা থেকে বলতে পারি, কোন ছেলে এবং মেয়েকে ঠিক ওভাবে আমি কোনদিন বেড়াতে যেতে দেখিনি, যাদের পরিচয়ের কারণটা অদ্ভুত, এবং দুজনেই (সম্ভবত) জানে

boiRboi.net

না, তারা কী বলবে, কোথায় যেতে চায়, যদিচ সেটা সম্পূর্ণ ঠিক নয় কারণ আমার মনে হয়, আসলে তারা দুজনেই দুজনের ব্যবহারের জন্যে অনুতপ্ত ছিল এবং দুজনেই দুজনের সান্নিধ্যকে চাইছিল। আমরা অ্যাভিনুর দিকেই গিয়েছিলাম। আঁখি জিজ্ঞেস করেছিল, সে একটা ট্যাক্সি ডাকবে কিনা, তা হলে দুজনে ময়দানের দিকে একটু যাওয়া যাবে। আমি আপত্তি করিনি, এবং ট্যাক্সিতে উঠে যখন চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছিলাম, আমরা কেউ কোন কথাই বলিনি, কেন তা জানি না। আমার মনে হয়, ওর কাছ থেকে কিছু শুনব, এরকম একটা চিন্তা আমার মনে এসেছিল, আর ও কিছু বলবে ভেবেও বলতে পারছে না।

রাস্তার ধারের কাছাকাছি, ময়দানে গিয়ে বসেছিলাম আমরা। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আলোগুলোও জ্বলে উঠেছে, এবং এত লোক আমাদের চারপাশে চলাফেরা করছিল, অথচ আমার মনে হচ্ছিল, কোথাও একটি লোক নেই কেবল আমরা দুজনেই আছি, যেমন এই মাধবগড়ে আমার মনে হয়, আমার কাছে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, মাঝে মাঝে কেবল জয়মনকে দেখতে পাই।

আঁখি রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলেছিল, 'আমি সেদিন আপনার ওপর রেগে গেছলাম।'

'সেটা অনুমান করেছি।'

'কেন বলুন তো?'

'বোধহয় আমার কথাবার্তায়।'

'না। আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি তাই।'

'কিন্তু সেটা—।'

'আপনার দোষ নয় জানি, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অলকেশ ভট্টাচার্যের ওটা দোষ, কারণ সে কেন আঁখি মজুমদারকে চেনে না।'

আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, ও রাস্তার দিকে তাকিয়েই একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'তারপরে ভেবেছিলাম, আপনি ইচ্ছে করে আমাকে চিনছেন না, ভাবতেই আপনাকে বুদ্ধু বলেছি।'

'বেশ করেছেন।'

'কিন্তু আমি সত্যি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, মানে, মিশতে চেয়েছিলাম।'

'বেশ তো।'

'অনেকদিন ধরেই।'

'মেশেন নি কেন?'

'আপনি তো মেয়েদের সঙ্গে মেশেন না!'

'কেন, কলেজের অনেক মেয়ের সঙ্গেই তো কথা বলি, পড়ি, কাজ করি।'

'কিন্তু সেটা মেশা নয়।'

'না তা নয়, কারণ আমার মেশার কথা মনে হয় না।'

'আপনার সম্পর্কে সবাই তাই বলে। কিন্তু কেন?'

তখন আঁখি আমার দিকে তাকিয়েছিল, আর আমি রাস্তার দিকে, যেখানে মাধবগড়

boiRboi.net

ও পরমানন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে-কথা আঁখিকে বলতে পারছিলাম না, কারণ, সে-কথা বলা বারণ ছিল। মিথ্যে কথা বলতেও অসুবিধা হচ্ছিল, আমি সহজে মিথ্যে কথা বলতে পারতাম না। এখন পারি, যেমন হৃদয় মালী ও নটবউয়ের বিষয়, আমার মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়, কারণ আমি যা বিশ্বাস করিনি, তাই বলেছি করেছি। আঁখিকে বলেছিলাম, মনে না হওয়ার কথাই আমাকে শেখানো হয়েছে।'

বুঝতে পেরেছিলাম, আঁখি অবাক হয়েছিল, কথাটা সঠিক বুঝতে পারে নি। আমি আবার বলেছিলাম, 'এমন কোন কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, যার জবাব দিতে পারব না। আপনার এই কথাটাও তাই। তবে, বিশ্বাস করতে পারেন, এমনিতেও মেয়েদের সম্পর্কে বন্ধুদের মত আমার কৌতূহল নেই, তাদের সঙ্গে মেশবার কথা আমার মনে হয় না।'

আঁখি বলেছিল, 'কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়।'

'কোনটা স্বাভাবিক নয়?'

'ছেলে এবং মেয়ে, নিজেদের জন্যে তাদের কোন কৌতূহল না-থাকাটা।'

'তাতে লাভ কী?'

'তাতে লাভ এই, যাদের সঙ্গে সব সময়ে থাকতে হয়, যে মানুষদের সঙ্গে, তাদের ভাল করে জানাই উচিত, তাতে নিজেকেও জানা হয়।'

সত্যি বলতে কি কথাটার মধ্যে কোথাও একটা ভিতরের জোর ছিল যার কোন মৌখিক তর্ক করে জবাব দেবার কিছু ছিল না আমার। আমি চুপ করেছিলাম, আঁখিও অনেকক্ষণ কোন কথা বলে নি। তারপরে সে বলেছিল, 'আমাকে আপনার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই?'

'কি জিজ্ঞেস করব?'

আঁখি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কী দেখতে পেয়েছিলাম, যার কোন ব্যাখ্যা আমার জানা ছিল না, অথচ কোন মেয়ের দিকে তাকিয়ে আমার যা কখন হয় নি, সেই রকম একটা কিছু অনুভব করেছিলাম, আমি যেন কেমন একটা কষ্ট বোধ করেছিলাম, কারণ আমি যেন ভীষণ দুর্গত, আর্ত এবং অসহায় দুটো চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ দেখতে পেয়েছিলাম, আর আমার হঠাৎ নিশ্বাস পড়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী হয়েছে আপনার?'

আঁখি মাথা নিচু করেছিল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলেন নি, তারপরে বলেছিল, 'দেখুন আপনার কাছে মেয়েলী ছলনা করে কোন লাভ নেই, আপনি তার ধারে কাছেও নেই, আমারও অস্বস্তি হবে। তার চেয়ে, আমি একটু নির্লজ্জ হই। কলেজে এসেছি দু'বছর, সতর বছরে এসেছিলাম, আজকালকার বয়সের তুলনায় লোকে আমাকে ছেলেমানুষ বলবে, কারণ তিরিশের নিচে হলেও মেয়েরা এখন ছেলেমানুষ বলে নিজেদের। কিন্তু বয়সটা শরীরে নয়, মনে, সে তুলনায়, বারো বছর বয়স থেকেই আমি অনেক কিছু জেনেছি, দেখেছি। কিন্তু এটা আমার কথা নয়। সতর থেকে উনিশ, এই দু'বছর ধরে আমি কিন্তু সব সময়েই আপনার সঙ্গে মিশতে চেয়েছি।'

'কেন?'

'আপনার মত সব কেন-র জবাব আমিও দিতে পারি না!'

boiRboi.net

আমি কোন কথা বলতে পারি নি, আঁখিই আবার বলেছিল, 'সেদিন আপনার সঙ্গে রাস্তায় কথা বলাটা আচমকা হয়েছে, কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক পুরনো, কারণ অনেকবার কথা বলতে ইচ্ছা হয়েছে। তার পরে আজ ভেবেই এসেছিলাম, আমি যে মিশতে চাই, সেটা আমি বলেই ফেলব। তবু যদি আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব, নিতান্ত মেয়ে হিসেবেই মিশতে চাই, একজন মেয়ে হিসেবে। আমি জানি না, আপনার কোথায় বাধা আছে, আপনি তা জানতে চাইতে বারণ করেছেন, এখন আপনার ইচ্ছা। তবে আমি বোধহয় ভারতীয় নীতিধর্মের বাইরে যাই নি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেটা কী ?'

'মুখ ফুটে পুরুষকে নিজের কথা বলা।'

বলে আঁখি হেসেছিল, সেদিনের প্রথম হাসি, কিন্তু সে হাসির মধ্যে, উচ্ছলতার থেকে বিশেষ গভীরতা ছিল যেন।

* * *

মনে আছে সেদিন ফিরে এসে মায়ের চিঠি শেষ করেছিলাম, এবং আঁখির কথা লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, 'গুরুদেব শ্রীমৎ পরমানন্দ ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি না হওয়া উচিত, তাদেরই একজনের সঙ্গে আজ আমি একলা অনেকক্ষণ কথা বলেছি, মেয়েটির নাম আঁখি মজুমদার।' মনে আছে মা জবাব দিয়েছিলেন, 'সব মায়েরাই মেয়ে, তার জন্যে আমি কিছু ভাবি না। তুমি তোমার নিজেকে ভুলবে না, মেয়েটিকে শ্রীমাধব যেন সুমতি দেন, সুখী করেন।'

আপাত দৃষ্টিতে আমার মায়ের চিঠিটা খুবই নিরীহ, কিন্তু আমি জানতাম, তার প্রতিটি ছত্রের মধ্যেই এক সাবধান করার ইঙ্গিত রয়েছে, যদিচ, মা যা ভেবে সাবধান করতে চেয়েছিলেন, আমি সে-ভাবে সাবধান হতে পারি নি, আঁখিকেও শ্রীমাধবের উচিত সুমতি ভর করে নি, যে কারণে তাকে তিনি সুখীও করতে পারেন নি।

অনার্স পরীক্ষার সময় থেকে, ইউনিভার্সিটির শেষ দিন পর্যন্ত আঁখির সঙ্গে আমি মিশেছি, আমি জীবনের আর একদিক দেখেছিলাম। ছুটি কাটাতে, যখনই দেশে বা মাধবগড়ে গিয়েছি, কখনই আঁখির কথা বলতাম না, কেউ আমাকে জিজ্ঞেসও করতেন না, কারণ কেউ কিছু জানতেন না।

প্রথম আলাপের কয়েকদিন পরেই আমি আঁখিদের বাড়ি গিয়েছিলাম এবং সেখানে যে পরিবারটিকে আমি দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল, একটা অসুখী মানুষ যেমন ব্যসনে, ভূষণে, কথায় ও হাসিতে সব সময়ে ঝকঝক করে, সেই রকম। আমরা যাকে খাওয়া পরার সুখ বলি, নিশ্চিন্ত আরামের জীবন, বাড়ি গাড়ি সে সবই ওদের ছিল, হাল আমলের যা কিছু থাকা উচিত, গৃহসজ্জা থেকে চলাফেরা কথার কেতা, কোনদিকেই ত্রুটি ছিল না। ত্রুটি মাত্র একটি জায়গায়, এক ছাদের তলায় গোটা পরিবারটা বিচ্ছিন্ন অপরিচিত, এমন কি মা মেয়ের মধ্যেও অপরিচয় দুস্তর। এখনকার মন নিয়ে আমার বলতে ইচ্ছা করে, অমন গুহায় লুকিয়ে থাকা পরাধীন মানুষ আগে আর দেখি নি।

আমি আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলাম, আঁখির ভিতরে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, ও মুক্তির সন্ধান করছে। সোস্যালিস্ট হওয়াটা যদিচ ছিল ওর রোমান্টিক ব্যাপার, কিন্তু অল্প বয়সেই, সেটাই এক ধরনের বিদ্রোহ ছিল, যেটা ওর নিজেরও জানা

boiRboi.net

ছিল না তেমন। ওর নিজের কথাগুলো টুকরো টুকরো মনে পড়ে, 'পার্টি' পিকনিকে দুরন্ত আমি ছেলেবেলা থেকেই, ফরেন মিউজিক বাদ দাও, রবি ঠাকুরের "প্রাণ চায় চক্ষু না চায়" বাজিয়েও যা ট্যুইস্ট চালাতে পারি, তোমাদের কলকাতার অনেক বার-ক্যাবারের থেকে তা অনেক এক্সাইটিং। স্ট্রিপটীস বল আর এরোটিক্ বল, ওসব দেখা আর নিজেদের মধ্যে নকল করা জল-ভাত। প্রথম হুইস্কি খেয়েছি তেরো বছর বয়সে, বয়ফ্রেন্ড আর ডেটস্ তখন থেকেই চলেছে! পনের বছর বয়সেই মা হবার ভয়ে আধ-মরা হয়ে গেছলাম, কেন না, মরে যাব বলেই ধারণা হয়েছিল, ওদিকে বাড়ির সবাই ঘেন্না করতেও শুরু করেছিল, অথচ আয়োজন যত, সব তারাই এগিয়ে দিয়েছে, কারণ সবাই নিজের নিজের সন্ধানে, সাধু কেউ নয়, ধরা পড়লেই মুশকিল। ফ্রক পরে যখন মায়ের সঙ্গে নার্সিংহোমে গেছলাম, নার্সটার চোখে ঈর্ষা আর ঘৃণার অন্ত ছিল না।...বুঝতেই পারছো, কুঁড়িতেই কীট, তবু কাব্যি করলে বলতে হয়, ফুটতে হল, মরে যাই নি যাকে বলে, কুসুমিত হলাম, সেটা প্রাণের জোরে কিংবা নিতান্ত রক্তের জোরে, জানি না। এক সময়ে, সবাইকে দোষ দিতে ইচ্ছা করতো, বাবা, মা, দাদা, দিদি, কিন্তু এখন ভেবে দেখেছি, বয়সে ছোট বলেই একমাত্র ওদের দায়ী করব, তা হয় না, সবাইয়েরই এক অবস্থা, নিজের খোঁজে সবাই ছুটছে। জানি, কথাগুলো হয়তো তোমার সব কনসেপ্শনকেই ভেঙে দিল, এবার পালিয়ে যাবে, তবু না জানিয়ে পারছি না, কারণ এই বয়সেই লুকোচুরিতে হাঁপিয়ে পড়েছি, যে কারণে তোমার কাছে ছুটে গিয়েছি। সত্যি বলছি, থামবার জন্যে তোমার কাছে যায় নি, কারণ কেউ থেমে থাকতে পারে না, কিন্তু ও-ভাবে আর ছুটতে পারি না, তোমার সঙ্গে ছোটাও আমাকে।'

আঁখি ওর নিজের জীবনের যে কথাগুলো বলতে পেরে হালকা বোধ করছিল অথচ ধারণা করেছিল, আমি পালাব, সে ধারণাটা ওর ভুল ছিল। বরং বলা উচিত, ওর বলার পরেই ধরা পড়েছিলাম বেশী করে। যদিচ, আমার পারিবারিক পরিবেশ, সর্বোপরি ভবিষ্যতের মাধবগড়ের পক্ষে আঁখির কথা শোনার পর সরে যাওয়াই সব থেকে স্বাভাবিক ছিল তবু রাস্তার ধারে ময়দানের সেই চোখের কথা ভোলবার নয়, আর সেই চোখ দুটোই সব সময়ে আমার সামনে ছিল, এবং যে কথাটা অনেককাল নিজের কাছেও স্বীকার করা যায় নি, সেটা হল আঁখিকে আমি, ভালবেসেছি, যে ভালবাসার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য কিছুই নেই, একেবারে যাকে বলে, সাধারণ পুরুষের মত একটি স্ত্রী-লোককে, অথচ সত্যি আমি পালিয়ে এসেছি। পালিয়েছি, আঁখির নিজেকে প্রকাশ করার ভয়ে নয়, পালিয়েছি নিজের জীবনের স্বাধীনতাকে ভয় পেয়েছি বলে, যে ভয়ের সঙ্গে আজ কয়েক বছর ধরে অনবরত লড়তে হচ্ছে, এবং আমি আমার সিদ্ধান্তে এসেছি।

আমি আমার সব কথাই আঁখিকে বলেছিলাম এবং একথা ঠিক, ও চায় নি, আমি এই জীবন গ্রহণ করি, তার জন্যে ওর যা যুক্তি ছিল সেটা হল, ওকে ছাড়াটা বড় কথা নয়, আমি মানুষ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কথাটার মধ্যে যে বক্তব্য নিহিত ছিল, সেটা আমাকে এতদিন ধরে বুঝতে হয়েছে, কিন্তু তখন আমি আমার শর্ত পালন করতে চলে এসেছিলাম। আঁখির মধ্যে একটা মেয়ে আছে, যে তার চারিদিকে বিধি-নিষেধের অবিশ্বাসগুলোর সঙ্গে নিজের বিশ্বাস নিয়ে লড়তে, কোন দুঃখ-লজ্জাকেই মানতে রাজী

boiRboi.net

নয়, যে কারণে ও বলতে পেরেছিল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানটাকে আমি মেনে নিতে পারব না, তবে আমি তোমাকে বারণও করব না। আমাকে কিছু দিয়ে যাও তুমি।'

'কী দেব ?'

'যা নিয়ে আমি থাকতে পারি। মেয়ে হয়ে বড় কথা বলে লাভ নেই, কোলে একটা থাকলেই থাকতে পারব ভাল।'

'তার পরিচয়।'

'এই সমাজের কাছে ? ছলনায় ভুলিয়ে দেব, কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যে, আর পয়সা ছুঁড়ে দেব মুখের ওপর। আসলে আমি তো ঠিকই জানব।'

কথাগুলোর মধ্যে বিক্ষোভ ছিল, কিন্তু আঁখি নিজেও জানতো ও তা করতে পারবে না। মাধবগড়ে আসবার আগে বলেছিলাম, 'তোমাকে যদি বলে যাই, তুমি সংসার কর সুখী হও, সেটা ঠাট্টার মত শোনাবে, কারণ জানি, সংসার করতে ইচ্ছে হলে তুমি করবেই। তার চেয়ে এই বলে যাওয়া যাক, সময় কী খবর দেয় তা শুনতে থাকি।'

আঁখি বলেছিল 'সেই ভাল।'

বলে, একটু হেসেছিল, আবার বলেছিল, 'তবু, মহারাজ, একটা কথা রাখো বিদায়টাকে মহৎ করার চেয়ে খুব সাধারণ করে দাও, এস আমরা একটু মেয়ে পুরুষের মত ছাড়াছাড়ি করি।'

আঁখির চোখের হাসির অন্য পারে যে জল কলকলিয়ে উঠছে, তার টের পেয়েছিলাম, এবং বিছানায়, আমার বুকের তলায়, (আঃ মাধবানন্দ, মঠের সীমায় ঢুকছ তুমি এখন!) কান্নায় গুটিয়ে যাওয়া মেয়েটা, দেহের সুখের অনিবার্যতা থেকে, যন্ত্রণা বোধ করছিল বেশী।

* * *

রামু আমাকে তেমনি করেই মই পেতে দেয় তিলকা বসবার পর। আমি নেমে, প্রথমেই যাই কাছারিতে, এবং সেখানে রাজসিংহাসনের তুল্য যে মেহগনি কাঠের বিরাট কারুকার্য-করা আসন আছে, তাতেই গিয়ে বসি। সকলেই উঠে দাঁড়ায়, নিচু হয়ে প্রণাম করে। টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো তুলে নিই, রোজই কিছু না কিছু দেখবার এবং সই করবার থাকে, সকলের সব কথা শুনতে হয়।

সরকারী কর্মচারীটিকে দেখলেই, আমার প্রথম মনে পড়ে, রাজনীতির কথা। এই মিলনটা একটা অদ্ভুত, যাদের প্রতিভূ হয়ে সে এখানে খবরদারি করতে এসেছে, যে কারণে আমার ভাবতে ইচ্ছা করে, রাজনৈতিক দল, জনসাধারণকে বলে, তুমি আমাকে মানো, আমি তোমার খাবার পরবার ব্যবস্থা করে দেব। আর ধর্ম বলে তুমি আমার কাছে এস তোমাকে আমি আমার পবিত্রতা দেব। একজন নীতির কথা বলে, আর একজন জাগ্রত দেবতার কথা বলে, এবং তার জন্যে তাদের প্রাপ্য তারা জনসাধারণের কাছ থেকেই নয়, কারণ জীবন যাপন ও আত্মার শান্তি তারা দেয় যদিচ, আমি দেখতে পাই, জনসাধারণ আর ধর্ম ও রাজনৈতিক দল, কারুরই জীবন যাপন ও ধারণের সঙ্গে কোথাও কোন মিল নেই, তাই আমার মনে হয়, ঈশ্বর ও ধর্মে তফাত আছে, রাজনীতি রাজনৈতিক দলে তফাত আছে। জনসাধারণের রাজনীতি আর দলের রাজনীতি এক হয়ে ওঠা কঠিনতম ব্যাপার বলে আমার মনে হয়, সম্ভবত ইতিহাসে এরকম ঐক্য বার কয়েক

boiRboi.net

ঘটেছে, কিংবা ঈশ্বরোপলব্ধি, ধর্মীয় আচরণ বা সঙ্ঘের দ্বারস্থ হবার ধার ধারে বলে মনে হয় না, সেটা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার।

আমার কাছারির কাজকর্ম দেখতে বেশীক্ষণ লাগে না। অনেকটা জমিদারের সেরেস্তা বা দরবারের মতই এ সময়ে আমাকে আরো কিছু কিছু কথাবার্তা শুনতে হয় বলতে হয়, কারণ মাধবগড়ের আমিই প্রধান, আমি মহারাজ। সেখান থেকে বেরিয়ে, আমি মহারাজমহলে যাই আমার বিশ্রামের ঘরে, জয়মন এ সময়ে মিছরির জল নিয়ে অপেক্ষা করে আর কিছুই খাই না, যদিচ পরমানন্দর পরিষ্কার নির্দেশ আছে, ইচ্ছে হলে আমি চা কফি সবই পান করতে পারি, কোন বিধিনিষেধ নেই। তিনি যে সম্প্রদায়ের সাধক, তাদের মোট নিয়মগুলিকে বজায় রেখে, অনেককিছুই তিনি সহজ করে আনতে চান, এমন কি, যাকে বলা যায় কিছুটা যুগোপযোগী—(মডারনাইজেশন ?) চেহারায় দাঁড় করাতে চান, যে কারণে, মাধবগড়ের মোহন্ত যে একজন ফিলজফিতে এম. এ, এ কথাটা প্রচার করতে তিনি সবসময়েই উৎসুক।

মিছরির জলের রুপোর গেলাস জয়মনের কাছ থেকে যখন হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি, তখনই পরমানন্দ এলেন। আমি তাড়াতাড়ি গেলাস সরিয়ে রাখবার জন্য হাত বাড়াতেই, তিনি হাত তুলে বললেন, 'খেয়ে নাও।'

আমি এক চুমুকেই গেলাস শেষ করলাম, জয়মন গেলাস নিয়ে চলে গেল, পরমানন্দ এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার টিকেট তো কাটা হয়ে গেছে, কাল সকালের ট্রেনেই কলকাতা যাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হরিদ্বার যাবার গাড়ি তোমার দুদিন পরে, আগামীকাল কলকাতায় গিয়ে কি দেশের বাড়িতে যাবে ?'

'একবার যাব ভাবছি।'

পরমানন্দ একটু চুপ করে রইলেন, আমি তাঁর কপালের ভাঁজগুলোকে কয়েকবার নড়তে-চড়তে দেখলাম। বললেন, 'চাবিটাবিগুলো—।'

'আপনাকে এখনই দিয়ে যাব ?'

'না তার দরকার নেই, কাল দিলেই হবে। তুমি কিছু চেক সই করে রেখে যেও।'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম! সকলেই জানে, আমি তীর্থে চলেছি, গত বছরও গিয়েছিলাম। আমি রাজার মতই যাই, এয়ারকনডিশনড কোচে (ভেস্টিবুল নয়।) পার্শ্বচর পরিবৃত হয়ে, বহু সরঞ্জাম এবং সুপ্রচুর টাকা নিয়ে আমি যাই, যেটাকে আমার তীর্থযাত্রার থেকে বছরে একবার বেড়াতে যাওয়া বলাই ভাল।'

পরমানন্দ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কলকাতায় আঁখির সঙ্গে দেখা করবে ?'

আমি সন্দেহ করেছিলাম, এ কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। বললাম, 'করব ভাবছি।'

তিনি হঠাৎ কোন কথা বললেন না। আঁখির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর, আমাদের চিঠিপত্র লেখালেখি ছিল, যে কারণে পরমানন্দর কোন এক সময় কিছু মনে হওয়ায়, জানতে চান, বাড়ির চিঠি ছাড়া আর কারুর চিঠি আমার কাছে আসে কি না। আমি জানিয়েছিলাম, আসে এবং আঁখির চিঠির কথা আমি ওঁকে বলেছিলাম, এমন কি,

boiRboi.net

শেষ পর্যন্ত আঁখির কথাও বলেছিলাম। তখন থেকেই চিঠিপত্র তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আঁখি স্বয়ং মাধবগড়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, যদিচ সে আমার কাছে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে আসেনি, নিতান্ত মাধবগড় দর্শনেই যেন এসেছিল, এবং সাধারণ যাত্রীর মতই, আমার কাছে এসে প্রণাম করে, কাছে বসেছিল।

পরমানন্দর চোখকে আমি যেমন তেমন চোখ বলতে পারি না, কারণ এ ব্যাপারটাও তিনি জানতে পেরেছিলেন, এবং নিজে আঁখির সঙ্গে দেখা করেছিলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম। তিনি আঁখিকে মাধবগড়ে থাকতে বলেছিলেন, মাধবগড়ে জমি বাড়ি সবকিছু দিতে চেয়েছিলেন এবং আমার সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাৎ সবই হবে, সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। আঁখি জানিয়েছিলেন, তার পক্ষে সেরকম জীবন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়! আমাকে আঁখি বলেছিল, 'সময়ের খবর জানতে এসেছিলাম।'

'তোমার সময়ের খবর কী?'

'একই।'

'আমারও।'

আঁখি চলে গিয়েছিল, কিন্তু সময়কে যদিচ অন্ধ বলা হয়, তবু কখনো কখনো সে তার গতির মধ্যে এক ভৌতিক খেলা দেখায়, যেটা আমি আমার মধ্যে অনুভব করেছিলাম। আমার তখন থেকে রোজই মনে হত, আমি এখানে কী করছি, পৃথিবীতে আমার কাজ কী ছিল?···

পরমানন্দ শান্ত গলাতেই বললেন, 'দেখা করতে না গেলেই বোধহয় ভাল করবে।'

তিনি চলে গেলেন, আমি ভিতরের ঘরে গেলাম। আমার ভিতরের ঘর, যেখানে জাজিম তাকিয়ে ইত্যাদি দিয়ে বসবার রাজকীয় ব্যবস্থা আছে, এবং আমার শোবার ঘরে, সম্পূর্ণ পিতলের, প্রতিদিন ঝকঝকে করে মাজা প্রকাণ্ড পালঙ্ক ছিল, যার ওপরে হালের 'ডানলোপিলোর' গদী পাতা, এবং সর্বত্রই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ইত্যাদির নানান ধাতুর স্মারকচিহ্ন পঙ্খের দেয়ালে ঝোলানো, তার সঙ্গে টাটকা ফুলের মালা জড়ানো। সমস্ত ঘরেই, ধূপের গন্ধ ছড়ানো, যে গন্ধটাকে আসলে আতরের গন্ধ বলেই মনে হয়। শোবার ঘরের পিছনেই, আমার মহল-সংলগ্ন ছোট পাঁচিল-ঘেরা বাগান, যেখানে, বকুলগাছের গোড়া ঘিরে শ্বেতপাথরের গোল চত্বর তৈরি হয়েছে। গুটি চারেক রডোড্রেনডন গাছ আছে, এখন যাতে লাল ফুল ফুটেছে, ম্যাগনোলিয়ার পাতায় সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে, তা ছাড়া বেল জুঁই আছে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে এবং এই ছোট পাঁচিল-ঘেরা বাগানটাকে সুন্দর করেছে গুটিকয় পাথরের শিশুমূর্তি। বড় বাগানে যাবার জন্যে, একটি দরজা আছে, যে দরজা খোলবার কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ আমি সদর দিয়েই বাগানে যাই, এদিকটাকে বরং আমার মহলের খিড়কি বলা যায়। এদিকটাতে এলেই, গত শরতের এক রাত্রির কথা এখন আমার মনে পড়ে যায়।

* * *

গত শরতের একদিন, দিনটার রঙ পুরোপুরি সোনালী বলা যায়, বিশেষ সাঁওতাল পরগনার এই অংশে, লাল মাটির রোদের ছটায়, এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা দেখা যায়। সেদিন পরমানন্দ সারাদিনই প্রায় আমার মহলে ছিলেন, মনে আছে, তিনি নিজে সেদিন রান্না করেছিলেন, আমাদের দুজনের খাওয়ার জন্যে। সেদিন সারাদিনই তিনি আমাকে

boiRboi.net

মহাভারতের নানান কথা বলেছিলেন। একবেলা খাবার নিয়মটা আমি পুরোপুরিই মানি, কারণ বয়স আমার যাই হোক, দেখেছি, তাতে আমি অনেক সুস্থ ও সবল আছি, এবং আমার কোন কষ্টই হয় না। সন্ধ্যার পরে, সেদিন তিনি আমাকে বিশ্রামের ঘরে, রুপোর পাত্রে করে কিছু পানীয় এনে দিয়েছিলেন। তিনি আমার দ্বিধা ও সন্দেহ দেখে, নিজে একটু খেয়ে দেখিয়েছিলেন যে, আমাকে বিষ দেননি, আমি পান করেছিলাম। তিক্ত ও ঝাঁঝালো সেই বস্তু যে মদ, তা আমি তৎক্ষণাৎ অনুভব করেছিলাম, এবং অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'প্রয়োজন আছে বলেই তোমাকে খেতে বলেছি, শ্রীমাধবের চরণ স্পর্শ করিয়ে তোমাকে দিয়েছি।'

শ্রীমাধবের চরণ নিয়ে আমার তেমন ভাবনা হয়নি, কিন্তু আমার কানে তখন ভাসছিল, 'তেরো বছর বয়সে প্রথম হুইস্কি খেয়েছি' এবং যা খাচ্ছিলাম, তা হুইস্কি কিনা জানি না তবে, রামু বা হৃদয় মালি যা খায়, তা নয় বুঝতে পেরেছিলাম, এবং আঁখি যে ঝোঁকের মাথাতেই খেয়ে থাকুক, তার যে কী রকম কষ্ট হয়েছিল, তা আমি অনুভব করেছিলাম, আর সেই কথা ভাবতে ভাবতেই খেয়েছিলাম। আমি আমার মধ্যে পরিবর্তন বুঝতে পারছিলাম, আমি পরমানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অকারণ হেসে ফেলেছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুলেছিলেন, বলেছিলেন, 'চল।'

'কোথায় ?'

'তোমার শোবার ঘরে।'

আমি তাঁর সঙ্গে আমার শোবার ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম, আমার মহলের বাগানে যাবার দরজাটা খোলা, এবং ঘরের সংলগ্ন শ্বেতপাথরের ঢাকা বারান্দায় অল্প আলোর রেশ। কাছে গিয়ে দেখেছিলাম, দুজন মানুষ রয়েছে, একজন পুরুষ, সম্ভবত দেহাতের কোন অর্থবান সম্পন্ন ব্যক্তি, তার পোশাক দেখে তাই মনে হয়েছিল, আর একটি মেয়ে, যার মুখ ঢাকা ছিল, কিন্তু তার হাতের সোনার গহনা, ফর্সা হাত কোলের ওপর, দেখতে পেয়েছিলাম। পুরুষটি আমাকে ও পরমানন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিল, হাত বাড়িয়ে মেয়েটির ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে, বলেছিল, 'প্রণাম কর।'

মেয়েটি প্রণাম করেছিল, কিন্তু মাথা তোলেনি, এবং তার পোশাক যেন নগ্নতাকে হার মানায়, এমনি পাতলা যদিও শহুরে ছাপটা একেবারেই ছিল না। সে স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা, মুখখানি, যাকে বলে ঢলো ঢলো, তাই, বয়স সম্ভবত, পঁচিশের মধ্যে। পরমানন্দ পুরুষটিকে বলেছিলেন, 'তোমার প্রার্থনা জানাও।'

পুরুষটি আমাকে বলেছিল, 'মহারাজ, এ আমার স্ত্রী। এর সঙ্গে ছেলেবেলাতে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি ডাক্তার কবিরাজ সব দেখিয়েছি, আমার দ্বারা বংশরক্ষা সম্ভব নয়, আপনি দান করুন।'

ব্যাপারটা এতই অভিনব, আকস্মিক এবং অদ্ভুত মনে হয়েছিল, আমি বুঝতেই পারছিলাম না, ব্যাপারটা কী। আমি পরমানন্দর দিকে তাকিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, 'এ সবরকমেই চেষ্টা করেছে, কলকাতার ডাক্তাররা জানিয়েছে, ওর পক্ষে কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু স্ত্রীর আছে। আজ আমি তোমাকে পান্ডু-ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের কথা বলেছিলাম, নীতি আর ধর্মের দিক থেকে ক্ষেত্রজ সন্তানে আমাদের বাধা নেই। আমিও চাই, তুমি এর বংশরক্ষা কর।'

boirboi.net

তখনো একটা বিভ্রান্তি আমার মুখে ও মনে চেপেছিল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম, যদিচ তাকে ভয়ে পাণ্ডুর বা চোখ বুজতে দেখিনি, বরং আশ্চর্য, সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল, এবং দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই, আমার ভিতরে যেন একটা ঝাঁকানি লেগেছিল, আমি চমকে উঠে বলেছিলাম, 'এ কি বলছেন আপনি?'

তখন আমার কাছে সবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। পরমানন্দ বলেছিলেন, 'কেন, তোমার কাছে কি এটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়। এ আমি পারি না, আমার দ্বারা অসম্ভব।'

'কিন্তু আমাদের নীতি ধর্ম—।'

'আমাদের সে নীতি ধর্ম আর নেই, অনেক বদলেছে।'

'এ অনেক আশা নিয়ে এসেছে।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন, এ আমি চিন্তা করতেও পারছি না, কিছু করা তো অনেক দূরের কথা।'

তারপরে স্বামীটিও আমাকে পীড়াপীড়ি করেছিল, পায়ে ধরেছিল, এবং সব থেকে আশ্চর্য, সেই মেয়েটিও (কেন, সত্যি সন্তানধারণের জন্যে?) উচ্চারণ করেছিল 'দয়া করুন।'

আমার এই বয়সটাও যেন ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমি জরাগ্রস্ত। বলেছিলাম, 'আপনারা সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন।'

বলেই আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম, খিড়কির দরজা খুলেই বেরিয়েছিলাম, দেখেছিলাম, সেখানে পালকি এবং বেহারারা অপেক্ষা করছে, এবং সেই প্রথম আমি বিশ্বাস করেছিলাম, ইতিপূর্বে এ ধরনের কাহিনী যা শুনেছি, তা এখানে ঘটেছে, মিথ্যে নয়। তখন আমার আঁখির কথা বারবার মনে পড়েছিল, ওকে সব কথা জানাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, যদিচ আমি জানতাম, তখুনি তা জানাবার কোন উপায় ছিল না। তারপরেও পরমানন্দর সঙ্গে সে বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এ ছাড়া, ওদের বংশরক্ষার উপায় কী ছিল?'

বলেছিলাম, 'যদি মেয়েটি সন্তান চায়, তবে সে আর একটা বিয়ে করতে পারে।'

'হিন্দু মেয়ের ক'বার বিয়ে হয়?'

'শাস্ত্রমতে স্বামী অক্ষম হলে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে। আইনেরও তাই বিধি।'

'কিন্তু কথাটা বংশরক্ষা নিয়ে হচ্ছে, মেয়েটির দু'বার বিয়ে নয়।'

'মেয়েটির বিয়ে হলে যে ছেলে হবে, তাকেই উনি দত্তক নিতে পারেন।'

পরমানন্দ আর কথা বলেননি, যদিচ জানি তিনি খুশী হতে পারেননি।

আজও আমি খিড়কি দরজা খুলেই বাগানে ঢুকলাম। জয়মন ছুটে এসে আমায় গগলস্‌টা হাতে দিল, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমি গগলস্‌টা চোখে লাগিয়ে হরিণের ঘরের দিকে যাই। হরিণ হরিণী দুই-ই আছে, হরিণীটি ছুটে আসে লোহার বেড়ার কাছে। আমি তাকে একটু আদর করি, তারপর হরিণটা আসে। কেন জানি না এ সময়টুকু আমার সব থেকে আনন্দে কাটে। পালিত প্রত্যেকটি পাখিই আমাকে

boiRboi.net

চেনে, এমন কি পুকুরের রাজহাঁসগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আমার রেশমী কাপড়ে দুবার ঠোঁট বুলিয়ে দিয়ে যায়। ময়ূরগুলো যখন জোরে ডাকে, তখন একরকম, এখন যেন ছোট পিকপিপি স্বরে পায়ের কাছে বা ডালে উঠে অনেক কথা বলতে থাকে। আমি গোয়ালের দিকেও যাই, গাভীগুলোকে আদর করি, ওরা ফোঁসফোঁস করে তার জবাব দেয়।

এই আমার জীবন। আমি জানি, কী পরম সুখে আমি আছি। আমার অর্থ বিত্ত সম্মান সুখ, এমন কি, আমি যদি চাই, তবে যে কোন ধরনের উপভোগই করতে পারি। অথচ তার কোন কারণ জানা নেই আর, যেমন কোন অলৌকিক সুখের ভাগ্য নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছি, যাকে রাজভাগ্যই বলা যায়। আমি জানি, কোটি কোটি মানুষ যে জীবন কাটাচ্ছে, কতকগুলো অবস্থার ভিতর দিয়ে, আমি তার বাইরে চলে এসেছি, যে জীবনে আমি কোন রঙ দেখতে পাই না, জীবনের কোন স্বাদই অনুভব করি না, এবং এর ভিতর দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি, আমি মানুষের কাছ থেকে চলে এসেছি। মানুষের কাছ থেকে চলে আসার মধ্যে কোন সুখ নেই, কারণ জেলে থাকার মধ্যে যেমন কোন সুখ নেই, সেখানে যত যত্নেই রাখুক, অনেকটা সেইরকম। আমি খুব সহজভাবেই বুঝতে পেরেছি, ফাঁকি দিয়ে সব ফাঁক ভরাট করা যায় না। ছেলেবেলা থেকে যে পরাধীনতার বেড়া আমি তুলেছি, গত দু-বছর ধরে সেই বেড়াটাকেই আমাকে ভাঙতে হচ্ছে, মানুষের কষ্টের ধনে, শ্রীমাধবের এই প্রতিনিধিত্বের সুখ, বা সুখের বঞ্চনাই বলব, আমি আর ভোগ করতে পারছি না, আমাকে কোটি মানুষের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে, গোটিকের মত এই সিদ্ধান্ত নিয়েই, যেভাবে চলে আসছে সেই ভাবের দল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

*　　　*　　　*

আমি দেখলাম, আবার পরমানন্দ আসছেন। জয়মন তাড়াতাড়ি চলে গেল অন্যদিকে। তিনি এসে আমাকে বললেন, 'তুমি কী করবে স্থির করেছ? তোমার ওপর মাধবগড়ের সুনাম দুর্নাম অনেক নির্ভর করছে।'

আমি জানি, তিনি রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। বললাম, 'কিসের স্থিরতার কথা বলছেন?'

'তোমার কোন সিদ্ধান্ত?'

'আমি কাল বাইরে যাচ্ছি।'

'গতবারের মত, আঁখি কি বিদেশে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে?'

'সে বিষয়ে আমি এখনো কিছুই জানি না।'

গতবার আমি যখন বাইরে গিয়েছিলাম, আঁখি সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। আঁখির মত একটি সুন্দরী আধুনিকা যুবতীর সঙ্গে, (যদিচ আঁখি আগের মত সাজে না, নিজের বাড়িতে থাকে না, সে স্বাধীন জীবনযাপন করে, এবং আঁখি যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ওর হাসিটা বদলে গিয়েছে, যে হাসিটা ময়দানে হেসেছিল, যে চোখ দুটো ময়দানে দেখেছিলাম, সেটাই স্থায়ী হয়ে গিয়েছে, শরীরটা রোগা হয়েছে, অথচ ছেলেমানুষি যদি আরম্ভ করে, এক মুহূর্তেই একটি ছোট্ট মেয়ে হয়ে উঠতে পারে। ও সময়ের বুকে

কান পেতে আছে, আমিও আছি, তবু আমি জানি, ওর থাকার সঙ্গে আমার থাকাটা অনেক তফাত, সত্যি বলতে কি মেয়েটাকে অনেকখানি শেষ করে এনেছি।) যদি মাধবগড়ের মহারাজকে দেখা যায়, যেটা আবার মানুষের ধর্ম-ভাবনায় লাগে, ভণ্ড বলতে আরম্ভ করবে, অথচ আমি তা নই।

* * *

পরমানন্দ বললেন, 'জানি না, আমার প্রস্তাব কেন আঁখি মানছে না। তুমিই বা কেন আঁখিকে একটা ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিচ্ছ না, যত যৌতুক লাগে আর খরচ হোক, সবই আমরা দেব।'

পরমানন্দ তাঁর সংকটের কথা বলছেন, তিনি আমার সংকটের কথা বুঝতে চাইবেন না, সম্ভবও নয়। বললাম, 'আপনি তো জানেন, দুটোর কোনটাই ও মানতে চায় না, মানতে পারেও না। তবে আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ফিরে আসব।'

তাতে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, যাবার সময় খালি বলে গেলেন, 'বাইরে গিয়ে তোমার যদি কিছু পরিবর্তন হয়, সেই আশাই করব।'

আমি জানি, পরমানন্দ ইচ্ছা করলে, আমার অস্তিত্বকে পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, তাতে কোথাও কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু মানুষ তার নিজের কাছে এমনভাবে বাঁধা, যে কারণে উপায় থাকতেও তিনি তা করতে পারছেন না। আমাকে নিয়ে কোথাও তাঁর নিজের সঙ্গে, মঠের ভাবনার সঙ্গেই বিরোধ আছে।

* * *

গত বছরের বসন্তকালে বাইরে বেড়াতে (তীর্থে।) যাবার বিষয় আমার মনে পড়ছে, যখন দিল্লীতে এসে প্রথম আমার সঙ্গে আঁখি দেখা করেছিল। এমন একটা পাগলামিতে ওকে পেয়ে বসেছিল, কোন কিছুই মানতে সে রাজী ছিল না। জানি, আমাকে মাধবগড়ের বাইরে একলা পেয়ে (জয়মন ছিল, এবারও থাকবে।) ও সব ভুলে গিয়েছিল, যে কারণে দর্জি ডেকে, আমার স্যুট পর্যন্ত তৈরী করিয়েছিল, যাতে মাধবগড়ের মহারাজকে ওর সঙ্গে কেউ চিনতে না পারে এবং সত্যি সত্যি, কুলুতে বেড়াতে গিয়ে, আমি পোশাক পরিবর্তন করেছিলাম। আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, বেশীক্ষণ গায়ে রাখতে পারিনি, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, পরমানন্দ, বা সকলের ভ্রূকুটি চোখ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলেছিলাম, এবং তীর্থে না গিয়ে, কুলুভ্যালী গেলেও, আঁখির সঙ্গে আমার কোন নর-নারী সম্পর্ক হয়নি, কারণ আমাদের মধ্যে তখনো সময়ের খবর জানার শর্তটা ছিল, যদিচ, এ-কথা জানাই, আমি অক্ষত কুমার নই।

* * *

পরদিন বিকেল নাগাত আমি কলকাতায় এসে পৌঁছে প্রথমেই গিয়েছিলাম আঁখির ফ্ল্যাটে। জয়মনের সঙ্গে আঁখির পরিচয় আগেই হয়েছিল। সেই রাত্রেই আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব, এবং পরের দিনই রাত্রের মেলে দিল্লী চলে যাব শুনে, আঁখি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'কেন, আমি তা হলে কী করব?'

'তুমি দিল্লীতে এস।'

'তবু তোমার সঙ্গে এখান থেকে যেতে পারব না?'

boirboi.net

'রিজার্ভেশন পাবে কোথায় ?'

'জানালে না কেন একটু ?'

'সব সময় কি জানিয়ে আসা যায় ? আমি তো আশাই করিনি, তোমাকে বাড়িতে পাব, ভেবেছিলাম, তোমার চাকরের জিম্মায় সব রেখে, চলে যাব মায়ের কাছে, কাল ফিরে এসে সব বলব। তাই আজ আর তোমার সঙ্গে কোন কথা নেই, তবে তোমার সঙ্গে কথা অনেক আছে, সময়ের খবর পেয়েছি বলে মনে হয়।'

বুঝতে পারলাম, আঁখি জোরে হাসতে পারল না কারণ গলায় কিছু আটকে গিয়েছিল, চোখ ভিজে উঠেছিল। আমি মুখ ফিরিয়ে জয়মনকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এবার আর হাওড়া নয়, শিয়ালদহ থেকে যেতে হল নদীয়ায় আমাদের বাড়িতে। মাকে খবরটা আগেই জানানো ছিল, তবে রাত্রে বাড়ি আসব, তা ভাবেননি।

মা এসে আলো হাতে দাঁড়াতেই, আমি নীচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিতে যেতেই, মা যেন সাপ দেখার মত চমকে ভয় পেয়ে সরে গেলেন, বললেন, 'এ কি করছ তুমি ?'

অথচ মা দাদাকে তুমি করে বলেন না, তুই করেই বলেন, আমি সে ডাক থেকে বহুকাল বঞ্চিত হয়েছি। এমন কি কোন কোন সময় মনে হয়েছে, আমাকে আপনি বলতে পারলেই মায়ের যেন বেশী স্বস্তি হত। আমি জানি মা কল্পনাই করতে পারেন না, তাঁকে আমি প্রণাম করব, কারণ সে অধিকার আর আমার নেই, আমি সন্ন্যাসী, উপবীত-ত্যাগী, দীক্ষিত, অতএব, নিয়মানুযায়ী আর মায়ের, বাবার (?), দাদা, বৌদি কারুর পায়ে হাত দিতে পারি না। বললাম, 'অনেকদিনই তো দিইনি মা।'

মায়ের গলায় তখনো একটা ভয় ও বিস্ময়ের কাঁপুনি, বললেন, 'অনেকদিন কেন, আর তো কোনদিনই তুমি আমার পায়ে হাত দিতে পার না, তুমি কি আমাকে পাপী করতে চাও ?'

দেখলাম মায়ের চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা, তিনি আমাকে ভাল করে দেখছেন। দাদা-বৌদিরাও এগিয়ে আসেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা। বৌদি তাড়াতাড়ি আমাকে ও জয়মনকে পশমের আসন পেতে দেন। দাদারা ছেলেমেয়েরা এসে আমাকে প্রণাম করে, আমি তাদের কাছে টেনে নিই, হাত ধরে বুকের কাছে টেনে নিই। হাসতে হাসতে মাকে বলি, 'মা, তোমাকেই যদি পাপী করব, তবে আর এ জীবনটাকে নিয়ে এতদিন কী করেছি ?'

আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের মুখে একটা পরিবর্তন দেখলাম, তাঁর মুখ কোমল হল, কিন্তু চোখে জলের আভাস। বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না, আমার মনটা বড় খারাপ লাগছে।'

বললাম, 'খারাপ লাগার কিছু নেই মা, কোন ভয় নেই।'

* * *

আমি বুঝতে পারি, আমার মায়ের কোন বিশ্বাসকেই আমি সহজে টলাতে পারি না, কেবল ভয় আর দুশ্চিন্তা দিতে পারি, কিন্তু তা আমি করতে চাই না। আমাকে বুঝে নিতে হবে, আমাদের কারুরই বিশ্বাস ও ভয়ের জন্যে অপরে দায়ী নই, সবই নিজের, যে কারণে আমি বিশ্বাস করেছি, মানুষের শোক-দুঃখ-সংকট, যা কিছু, সবই তার নিজস্ব, নিজেকেই সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, এবং আর কেউ তার সঙ্গে আছে

boiRboi.net

কিনা সেটা তার ভাববার নয়। যেমন, আজ যে আমি এসেছি, আঁখির কাছে গিয়েছি, এ বিষয়কে যদি কেউ মনে করে, আঁখি চেয়েছে বলে আমি এসেছি, সেটা ঠিক নয়, আমিই এসেছি, আমি আমি, এবং আমার ভিতরে আসবার সেই বেগ যদি না থাকতো, তবে আঁখি হাজার টানলেও আসতে পারতাম না, কিংবা আঁখি না টানলেও আমাকে আসতেই হত। অতএব, আমাকে এইভাবেই ভাবতে হবে, মা যেভাবে আমাকে নিতে পারবেন, তার মধ্যে দুঃখ থাক, তা মাকেই বহন করতে হবে, কিন্তু মাকে দুঃখ দেবার জন্যে আমি কিছু করব না, যেমন মাকে প্রণাম করতে না পেলে, আমার কী হয়, তা মায়ের ভাববার নয়।

দাদা আমার কাছ থেকে একটু দূরে বসলেন, বসার ভঙ্গিটা এমন, যেন আমি একটা অতি মান্যগণ্য পূজ্য কেউ এসেছি। ভাইপো-ভাইঝিদের যে এতটা গায়ের কাছে নিয়ে বসেছি, তাতে সকলেরই অস্বস্তি আমি টের পাই। বৌদিকে যখন 'বৌদি' বলে ডেকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করি, তখনও অস্বস্তি। তারপরেই কখন পাড়ায় খবর চলে যায়, আমি এসেছি, এবং একে একে অনেকেই আসতে থাকে। তাদের কথাবার্তা ভাব-ভঙ্গি দেখলে বুঝতে পারি, তারা যে আমাকে শুধু একজন সন্ন্যাসীই মনে করে, তা নয়, আমি যে, বিশাল অর্থ বিত্ত ক্ষমতার অধিকারী, সেটাও তারা অনুভব করে।

পরদিন দুপুরে খেয়ে যাবার কথা হল। আমার জন্যে বাড়ির কেউই রাঁধবেন না, কারণ রাঁধতে নেই, তাই জয়মনকেই রাঁধতে হয়, এবং তাকে সব ব্যবস্থা মা বৌদিই করে দেন। আমি একটু না বেরিয়ে পারি না। সকালবেলা পাড়ায় বেরোতেই, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, অনেক পরিবর্তন আমার চোখে পড়ে। আমাদের রাস্তাটা নতুন করে তৈরী হয়েছে, আর একটা জলকল বেড়েছে, নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। মেথর যাবার সেই পুরনো রাস্তাটা গাড়ি চলবার মত হয়েছে, দোকানপাট পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, আর ময়লা ফেলার সেই ডিপোটা অপসারিত হয়েছে। পুরনো দিনের অনেক কথা আমার মনে হতে থাকে, সেই বউ, শিল্পী, যে শিল্পী একটু আগেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আমাকে অবাক হয়ে, অনেকটা শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখছিল, (সাজাবার দিনগুলো ওর মনে পড়ে কী?) বলেছিল, 'ভাল তো?' এমন কি সে আমাকে আপনি বলবে না তুমি বলবে, তাও ঠিক করতে পারছিল না। সেটা অনেকেই পারছিল না, আমার পুরনো দিনের বন্ধুরা। কেবল একজনকেই দেখলাম, ছেলেবেলার বন্ধু, তার সম্পর্কে খুবই দুর্নাম, সে নাকি দুশ্চরিত্র, মাতাল ইত্যাদি, আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে অলক, কবে এলি?'

কেন জানি না, আমার ভাল লাগল, কৃতজ্ঞতাও বোধ করলাম, বললাম 'কাল সন্ধ্যায়। কেমন আছিস?'

দেখলাম তার ভাঙা-চোরা মুখে একটু হাসি দেখা গেল, সেটা অনেকটা দুর্গতের মতই আমার মনে হল। বলল, 'চলে যাচ্ছে, কেন না, চলতেই হবে জানিস।'

'বিয়ে-থা করেছিস নাকি?'

'নাঃ, হল না।'

বলে হাসল, এবং আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন সে আমার সৌভাগ্যটা

boiRboi.net

মেপে নিল, তারপর চলে গেল। পাড়ার ভিতর দিকে একটা পুকুর, আর বাঁড়ুজ্যেদের পুরনো বাড়ি, অনেকটা গ্রামীণ আবহাওয়া, সেখানে যেতেই একজনকে দেখলাম, পায়ের কাছে নীচু হয়ে নমস্কার করল, মুখ তুলতে দেখলাম দীপালি, পাড়ারই মেয়ে, প্রায় সমবয়সী, বিবাহিতা। একটু বেশী মোটা হয়ে পড়েছে, দেখে মনে হয় বেশ বড়লোকের গিন্নী হয়েছে। বললাম, 'কেমন আছিস দীপা ?'

'ভাল, আপনি ?'

আপনি ? বরাবর তো 'অলকদা তুমি' শুনে এসেছি, কিন্তু জানি জিজ্ঞেস করার কোন অর্থই নেই। বললাম, 'ভাল। এখন কি এখানেই আছিস ?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন হল এসেছি। গত বছর মাধবগড়ে গেছলাম, আপনাকে দূর থেকে দেখে এসেছি।'

'কেন, দেখা করলি না কেন ?'

'সাহস পেলাম না। এবার গিয়ে দেখা করব, আপনার কাছে একটা দয়া চাই।'

দেখলাম, ওর মুখটা অন্ধকার হয়ে আসছে। বললাম, 'কী রে ?'

বলল, 'আপনার কাছে তো কোন লজ্জা নেই, ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন, (ও-ও তাই দেখেছে, আমাকে ছেলেবেলায় তুই বলতো বড় হলে তুমি।) শুনেছি মাধবগড়ের কবচ ধারণ করলে ছেলেমেয়ে হয়, আমাকে আপনি আসল কবচের ব্যবস্থা করে দেবেন ?'

দীপালির চোখে জল এসে পড়েছে, এবং আমি কী বলব, কয়েক মুহূর্ত ভেবে পেলাম না। ওর জন্যে আমার কষ্ট হল, বুঝতে পারলাম, হয়তো শ্বশুরবাড়িতে, স্বামীর কাছে এ জন্যে বেচারীকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে, তার চেয়ে বড় কথা, নিজেকে ধিক্কার দিতে হচ্ছে মনে মনে। বললাম, 'ডাক্তার দেখিয়েছ ?'

আমার কথায় একটু অবাক হলেও, বলল, 'অনেকবার। তাঁরা তো বললেন, সবই ঠিক আছে।'

'তোমার স্বামীকে দেখেছেন ?'

'ও'র আর দেখবার কী আছে বলুন। উনি স্বাস্থ্যবান লম্বা চওড়া পুরুষ, খুবই সাত্ত্বিক মানুষ, একটা বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত খান না, তাঁকে দেখবার কিছু নেই।'

জানি দীপালির এ বিশ্বাস ভাঙাও কত মুশকিল, এবং ওর কথা শুনেই আমি বুঝতে পারছি, স্বামী ভদ্রলোকটি স্বাস্থ্যবান ও সাত্ত্বিক সেজে বেড়াচ্ছেন, নিজেকে প্রকাশ করতে সাহস করছেন না। তাই আমাকে বলতে হল, 'কবচ তুমি নিও, তবু তোমার স্বামীকে বলো, তিনি যেন একটু ডাক্তার দেখান, চিকিৎসা করান! অনেক সময়, (মিথ্যে বলছি—উপায় নেই।) স্ত্রীর জন্যে স্বামীকেই ওষুধ খেতে হয়। তুমি আমার নাম করে বলো। কবচ তুমি যখন খুশি নিও।'

আবার প্রণাম করে চলে গেল দীপালি। আমি আর একটু বেড়িয়ে আমার ছেলেবেলার জায়গাগুলো ঘুরে ফিরে এলাম। খাওয়া সেরে কলকাতায় চলে গেলাম।

* * *

কলকাতায় এসে দেখলাম আঁখির মুখে আলো নেই, কারণ সে আমাদের সঙ্গে যাবার

boiRboi.net

রিজার্ভেশন পায়নি, যদিচ ওর বাবাকে বললে, এই মুহূর্তেই ভি, আই, পি-র সংরক্ষিত আসন পেয়ে যেতে পারতো, তা ও বলবে না। এমন নয় কি যে, ও বাড়ি থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছে, ওর বক্তব্য হচ্ছে, নিজেকে বুঝতে হলে ওখানে ওর থাকা চলে না।

কিন্তু আমার থাকা চলল না, ব্যবস্থা রইল, তিন দিন বাদে দিল্লীতে গিয়ে ও আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। মাধবগড়ের শিষ্য বা আখড়া প্রায় সর্বত্রই আছে, যদিচ আমি সে সব কোন জায়গাতেই উঠব না এবং বাইরে আমার সে পরিচয়ও থাকবে না, যে কারণে, দিল্লী থেকে আঠারো মাইল দূরে, আঁখির দেওয়া ঠিকানাতেই আমাকে উঠতে হবে। তবু পরমানন্দ প্রায় সর্বত্রই খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয় যে, আমি হরিদ্বারের পথে যাত্রা করেছি, অতএব আমাকে যেন অভ্যর্থনা করা হয়।

* * *

আমি দিল্লী পৌঁছুবার তিন দিন পরেই আঁখি এল, কিন্তু অন্য আঁখি। আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, এবং তার জন্যে একটা ব্যস্ততা বোধ করছিলাম, কিন্তু আঁখিকে দেখে কোন কথাই বলতে পারলাম না, মনে হল, কেউ ওকে প্রচণ্ড প্রহার করে এখানে পাঠিয়েছে।

* * *

বরাবর জানি, ওর প্রণাম করবার তেমন বালাই নেই, বরং গায়ের কাছে এসে জড়াতে চায় যেটা আমিই ওকে চোখ দিয়ে বারণ করেছি, কিন্তু এখানে এসে এবার ও আমাকে প্রণাম করেই, জয়মনকে (জয়মনকে ও দাদা বলে।) নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নিজের মালপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোথায় একটা কী ঘটেছে, একথা আমি অনুমান করতে পারছিলাম, আরো বেশি করেই পারছিলাম, যখন দেখলাম, ও আমার কাছে আসতে চায় না। অথচ ও আমার কাছে কিছুই ভাঙতে চাইল না, যদিচ সিদ্ধান্ত হল, পরদিনই আমরা কাশ্মীর রওনা হব এবং তাই করতে হল, যে কারণে ছুটোছুটি বাঁধা-ছাঁদাতেই দিন ও রাত্রি কেটে গেল। পাঠানকোটে পৌঁছে, প্লেনে করে আমরা শ্রীনগরে গেলাম, এবং শ্রীনগরে নেমেই আঁখি জানালো, নৌকোয় করে সে লেকের ভিতর দিয়ে উলার পর্যন্ত যেতে চায়। অবিশ্যি, আমি জানতাম, উপত্যকার লেকের ভিতর দিয়ে উলার পর্যন্ত যাওয়া যায়, কাশ্মীরী মৎস্যজীবীদের ওটা একটা পথ, এবং আঁখির এই ইচ্ছাটা অনেকদিনের, এবং একটা রোমান্টিক আইডিয়াই বলতে হবে, যদিচ সেটা এত সহজে হয়ে ওঠা সম্ভব বলে আমার মনে হল না, তার জন্যে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা এবং আয়োজন করতে হবে, তাছাড়া, এত তাড়াতাড়ি সবকিছু ছেড়ে, এমন নিরালাতেই বা যাবার কী দরকার। কিন্তু আমি কিছু বললাম না, আমি আঁখিকে দেখেছিলাম, কারণ জানি, ও যা করবে তার জন্যে ওকে আমার কিছু বলার নেই, ও যা বুঝেছে তাই করেছে, এবং নিশ্চয়ই তার কোন প্রয়োজনও আছে। তাছাড়া আমি এভাবে কিছু বাধা দিতে পারি না।

কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা ওর দেখলাম আমাকে বসিয়ে রেখে, জয়মনকে নিয়ে ও নৌকার ও তাঁবুর ব্যবস্থা করে ফেলল এবং মাঝিরাই আমাদের প্রায় দু সপ্তাহের খাবার কিনে মজুত করল, কারণ যাতায়াতে প্রায় এই রকম সময়ই লাগে। এ এক রকম প্রায়, ভ্যালীর

ভিতরে নিরালা যাত্রাই হল। সেইদিন বিকেলেই, একদল হাঁপিয়ে পড়া ঝোড়ো পাখির মত আমরা দুই ঘরওয়ালা একটা বড় বোটে ভেসে পড়লাম। সঙ্গে একটা শিকারাও বাঁধা ছিল। আমার মনে হল, এবার আমি আঁখির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম, আঁখির চোখ অন্যদিকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে, তুমি আমাকে অনায়াসে বলতে পার।'

আঁখির মুখ দেখে মনে হল, নেমে আসা রাত্রির ভয়ে, অনেকটা অসহায় পাখির মত, যার চোখে ঈগল ও সাপের ছায়া। বলল, 'একটু ভাবতে দাও, সেই জন্যেই এভাবে চলেছি।'

সেটা কিছু অনুমান করেছিলাম, নিরালা ওর দরকার, কলরব ভাল লাগছে না, এবং যাত্রাটা সুন্দর, কারণ প্রতিটি রাত-শেষেই নতুন নতুন গ্রাম এবং মানুষ, আর সবই এত সুন্দর, প্রকৃতি ও মানুষ, অনেকটা যেন অবাস্তব বলেই বোধ হচ্ছিল। হিন্দী কথা বোঝে না, এমন গ্রামবাসী মেয়েপুরুষ শিশুদের সঙ্গেও আমরা অনেক কথা বললাম, যদিচ কেউ কারুর কথাই বুঝলাম না।

উলারে পৌঁছেও আঁখি মুখ খুললো না। দু'দিন উলারের ধারে তাঁবুতে বাস করে, আবার ফিরলাম, আঁখি তখন মুখ খুললো, জানালো, পরমানন্দর চিঠি নিয়ে ওর কাছে লোক এসেছিল, আমি যেদিন কলকাতা ছেড়ে আসি, সেদিন রাত্রেই, এবং পরদিন আমার মা-ও এসেছিলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে।

আর আমার কিছু শোনবার ছিল না, সবই যেন ছবির মত দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং আমি আঁখির হাত ধরে টানতে গেলাম, আঁখি যেন আজ মায়ের মতই করে উঠল, মাকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁকে যেমন চমকে উঠতে দেখেছিলাম। বলল, 'না—না না না, আমি বোধহয় তোমাকে ভ্রষ্ট করছি, আমি পাপ করছি এই প্রথম আমার সে কথা মনে হচ্ছে।'

*　　　　*　　　　*

আমি হাসতে গিয়ে হাসতে পারলাম না, দেখলাম, আমার সামনে মাধবগড়েরই বহু যাত্রীদের একটি মেয়ে বসে আছে, আমার মা বৌদিদের মত একটি মেয়ে বসে আছে, যে সংস্কার ও পাপ-বোধের পুরনো ভাবনায় ডুবে রয়েছে। এখন আর তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, কারণ, আমি আমার বেড়া ভেঙেছি, এবং মানুষের কাছে ফিরে আসার একটা পদ্ধতিই আমার জানা আছে, তা হল মানুষের সঙ্গে বাস, এবং তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া, যা মাধবগড়ের মহারাজার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তার একটা ছক, পদ্ধতি, প্রণালী, মন, চরিত্র, ভাবনা আছে, তাকে অন্যত্র রেখে দেয়। আমি ফিরেছি। মাত্র আঁখির জন্যে নয়, যেটা আঁখি ভেবেছে, বা বুঝেছে, আমি ফিরেছি মানুষ যেখানে তার সকল মূল্যে বাঁচছে, সেই মূল্য দিতে, কারণ মানবজন্মে, এমন ঋণ আমি রেখে যেতে পারি না। আঁখি আমার সেই মানবজন্মের অংশীদার, যদি কোন কারণে, সে অংশ খসে যায়, আমার যাত্রা তাতে আটকায় না।

আঁখি বলে যেতে লাগল, পরমানন্দ কী লিখেছেন, মা ওকে কী বলেছেন, এবং ও

boiRboi.net

নাকি অনুভব করেছে, আমার যে জীবন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়েছে, তাকেই ও বিপথগামী করেছে, ওর ভিতরটা নাকি একটা ভীষণ ভয়ে চমকে চমকে উঠেছে।

আমি আমার কথা ওকে বললাম, আমি জীবনকে কীভাবে দেখতে চেয়েছি, যা ও এখন মানতে পারছে না। ও আমাকে অনুরোধ করল মাধবগড়ে আমার জায়গায় ও অবস্থায় চলে যেতে, সে বিষয়ে আমি জানলাম, আমার জীবন ও চিন্তার সকল দায় আমারই।

* * *

আমি মাধবগড়েই ফিরলাম জয়মনকে নিয়ে, পরমানন্দকে সকল কথাই বললাম, এবং ফিরে যাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করেই, এবার যাত্রা করলাম। জয়মনও যেন একটা অলৌকিক ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বাড়িতে গেলাম না, কলকাতায় এলাম, কিন্তু আঁখির কাছে আমার আর যাবার নেই। কিছু টাকাই আমি সঙ্গে আনিনি, যে কারণে প্রথমে আমার বন্ধুদের খোঁজ করতে হল, কিন্তু আশ্চর্য কেউ আমাকে গ্রহণ করল না, হয়তো তারা ভেবেছে, আমি মাধবগড় থেকে বহিষ্কৃত, কোন অপরাধ করে পালিয়েছি। শেষ পর্যন্ত যার কাছে আশ্রয় মিলল, তাকে আমি সে অবস্থায় দেখব ভাবিনি, সে প্রায় কপর্দকশূন্য, আগের অবস্থা নেই, অবিবাহিত, সমস্ত দিক থেকেই প্রায় বঞ্চিত। সে আমাকে বিশ্বাস করে জায়গা দিল কিছুদিনের চেষ্টায়, কলকাতার কাছেই একটা কলেজে আমি লেকচারারের চাকরি পেলাম। কিন্তু তাও বেশী দিন রইল না, কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রিন্সিপাল ডেকে আমাকে বিদায় করে দিলেন, যদিচ, তাঁর কথা থেকেই বুঝতে পারলাম মাধবগড়ের খবর তাঁর জানা, এবং মাধবগড় আমাকে ক্ষমা করতে পারছে না। সেটা বোঝা গেল আরো খবরের কাগজের মাধ্যমে, পরমানন্দর স্টেটমেণ্টে, স্বভাবতই আমি যে বিতাড়িত এভাবেই ঘটনাটা প্রচারিত হল। তার একটা বিষয়ে ধন্যবাদ, আঁখির নামটা জড়ানো হয়নি, হয়তো আঁখির কাছ থেকে তারা কোন সংবাদ পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমার কোথাও চাকরি করে জীবনযাপন বোধ হয় সম্ভব নয়, কারণ সরকারী বা বেসরকারী, এমন কোন জায়গা আছে কিনা সন্দেহ যেখানে মাধবগড়ের ভক্ত নেই। শ্রীমাধবের বিরোধিতা করার সাহস কারোর নেই।

কিন্তু মরবার জন্যে আমি ফিরিনি, বাঁচবার জন্যেই ফিরেছি, আমার অস্তিত্ব আমাকে এই চিন্তা থেকে এক মুহূর্তও নিষ্কৃতি দিতে পারে না, অতএব বন্ধুর পরামর্শে আমরা দুজনেই অজ্ঞাতবাস নিলাম। পরিচয়হীন জীবন নিয়ে, নানান সময়ে, নানান পেশা জীবিকা নিয়ে, দেশে দেশে ফিরলাম, এবং এই নামগোত্রহীন জীবন নিয়ে, কিছুদিনের মধ্যেই শরীর ভাঙতে লাগলো, বিক্ষোভের জন্ম হতে লাগল। অথচ আমার বন্ধুটির কিছুই হয় নি, সে বেশ থাকে। পয়সা বেশী থাকলে মদ্যপান করে, আরো বেশী থাকলে স্ত্রীলোকদের কাছে যায়, কিছু না থাকলে, কিছু পাবার জন্যে চেষ্টা করে। সে বিক্ষুব্ধ নয়, তা নয়, সে-ও বিক্ষুব্ধ, এবং আমি চিন্তা করে দেখেছি, আমার বিক্ষোভের সঙ্গে তার তফাত অনেক। আমার বিক্ষোভ ফিরে আসার কারণ যে

boiRboi.net

পরিবর্তনগুলো ঘটছে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওকে কোথাও থেকে ফিরে আসতে হয় নয়, অবিরাম তিক্ততার মধ্যেই ও বেঁচে থাকতে চাইছে।

মদ্যপানে আমার ইচ্ছা হয় না, স্ত্রীলোক দেখলেই আঁখির কথা মনে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। আমার ঠোঁট বেঁকে ওঠে, আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, অথচ এক এক সময় ভেবে দেখেছি, মেয়েদের প্রতি এই বিচারটা ভুল, প্রথমত সবাই আঁখি নয়, দ্বিতীয়ত, আঁখির দোষ নেই, মিথ্যাচার করেনি, সে যা, তাই তুলে ধরেছে। আসলে, আমারই পরীক্ষা চলল আমি বুঝতে পারছি। আমি ফিরে আসতে চেয়েছি, এসেছি, তাই আমার এতদিনের জীবনটা চীৎকার করছে, যেমন বেলা দুটোর সময় রুটিন বেঁধে খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাবার পর কুকুরটা চীৎকার করে। অতএব এই চীৎকারকে থামাবার জন্যেই আমাকে চেষ্টা করতে হয়।

প্রায় দু বছর লাগে থামতে, এবং সব দিক থেকেই অনেকখানি সুস্থতা আসে। উত্তর-প্রদেশের এক নামকরা ধনী এবং পণ্ডিত বলে খ্যাত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমার সব কথা শুনে বলেন, চাকরি দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু আমিই রাখতে পারব না, কারণ যখন সবাই জানবে, আমি মাধবগড়ত্যাগী বা বিতাড়িত, তখনই একটা সমস্যা দেখা দেবে, অতএব আমি যদি তাঁকে তাঁর কাজেকর্মে সাহায্য করি, তিনিও আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁর জন্যে আমাকে বই পড়ে, সবকিছু জোগাড় করে দিতে হবে। আমি এখন সেই কাজটাই করছি, আমার সেই বন্ধুটিও আছে, সে এক কারখানায় কাজ করে। আমরা এক সঙ্গেই থাকি।

*　　　　*　　　　*

এ ঘটনার মাস ছয়েক পরে আর একটা ঘটনা ঘটল, তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি যে শহরের বাসিন্দা, সেখানে গঙ্গা নদী বহে এবং তীর্থক্ষেত্র বলেও নাম আছে। নদীর কাছেই, পুরনো এলাকায় গরীবদের আস্তানার মধ্যেই আমরা থাকি। ভোরবেলা বন্ধুটি কারখানায় যায়, আমি কাজে বসবার আগে একটু নদীর ধারে বেড়াতে যাই।

একদিন, শীতকাল তখন, ভোরবেলা একটা ময়লা পায়জামা পরে, গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। দেখলাম, নদীর নীচু পাড় থেকে সদ্যস্নাত একজন সন্ন্যাসী আপাদমস্তক গেরুয়া পশমে মুড়ে উঠে এলেন, এবং আমাকে ডেকে বলে উঠলেন, 'মাধবানন্দ ?'

আমি ফিরে তাকালাম, দেখলাম, শ্রীমৎ পরমানন্দ, এবং আরো আশ্চর্য, তাঁর পিছনে পিছনে উঠে এল আঁখি, যার পরনে শাড়ি, গায়ে একটি কাশ্মীরী শাল, হিমের জন্যে মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধা, যার পাশ দিয়ে চুল দেখা যায়। তারপরেই জয়মন।

পরমানন্দ আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাকে সবই বললাম এবং তিনি ক্রমেই যেন অবাক হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদের কথাও জানলাম, তিনি তীর্থে বেরিয়েছেন, নিজেই আঁখিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কারণ এই একলা মেয়েটির জন্যে তাঁর শান্তি নেই।

boiRboi.net

কিন্তু তিনি বারেবারেই আমার দিকে তাকাতে লাগলেন, এবং আঁখি পলকহীন চোখে সব সময় তাকিয়েছিল।

পরমানন্দ বললেন, 'কিন্তু তোমাকে আমি বুঝতে পারলাম না। কেন চলে এলে?

বললাম, 'আপনাকে তো বলেছি। অপরাধবোধে, যেটা আমরা মনে রাখি না।'

'শান্তিতে আছ?'

'স্বস্তিতে আছি।'

'ভবিষ্যৎ?'

'সমষ্টির সঙ্গে, চলমান জীবনের অংশীদার।'

যেন তিনি বুঝতে পারলেন না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর করুণ হয়ে উঠে, হঠাৎ বললেন 'তোমার মধ্যে একটা শক্তি আছে, আমি জানি সে শক্তি তোমাকে তিনিই দিচ্ছেন।'

বললাম 'আপনার বিশ্বাস নিয়ে আমি কথা বলব না।'

তিনি হঠাৎ আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'তিনি তোমাকে সার্থক করুন।'

পিছন ফিরে আঁখিকে বললেন, 'এস মা, আমরা যাই।' তিনি এগিয়ে গেলেন।

আঁখি এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, আমার চোখের দিকে তাকাল, দেখলাম চোখের এ কুলে হাসি ও-কুলে জল। বলল, 'অলক, অনেকদিন সময়ের খবর বয়ে বেড়াচ্ছি, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

নিছক মানুষের মতই বুকের ভিতরটা দুলে উঠল আমার, বললাম, 'তোমার ভাবনা শেষ হয়েছে?'

'অনেকদিন, তোমাকে খুঁজে পাইনি।'

পরমানন্দ ফিরে ডাকলেন, 'আঁখি এস।'

আঁখি ফিরে বলল, 'মহারাজ, আমাকে ওঁর কাছে থাকতে দিন।'

পরমানন্দ এবার অবাক হলেন না। একটু হাসলেন, বললেন, 'তাহলে তোমার যাত্রা অসার্থক হয়নি। বেশ ওর কাছে থাকো, আমি যাই।'

আমি পরমানন্দকেই দেখছিলাম। আঁখির হাতগুলো শালের বাইরে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, ও আমার চাদরের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল। আমি ওর কনকনে ঠাণ্ডা রোগা হাত দুটো ধরলাম, বললাম, 'চল একটু বেড়িয়ে ফিরি।'

আঁখি ছেলেমানুষের মত হেসে ঘাড় কাত করল, আর হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

---

boiRboi.net